রবীন্দ্র-সৃষ্টি-সমীক্ষা

দ্বিতীয় খণ্ড

ডক্টর শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
এম. এ., পি. আর. এস., পি. এইচ. ডি
ভূতপূর্ব রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি
কলিকাতা ১২

রবীন্দ্র-সৃষ্টি-সমীক্ষা
দ্বিতীয় খণ্ড
দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৯৬৯, ১৩৭৬
মূল্য : ২০'০০ টাকা

Rabindra-Sristi-Samiksha
Vol. 2
2nd Edition, 1969
Price : Rs. 20'00

প্রকাশক :
শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক
সি, ২৯-৩১ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা ১২

মুদ্রাকর :
শ্রীধনঞ্জয় প্রামাণিক
সাধারণ প্রেস
১৫এ ক্ষুদিরাম বসু রোড
কলিকাতা ৬

দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকা

গ্রন্থকারের পূর্বপরিকল্পনা-অনুযায়ী চারি খণ্ডে সমাপিতব্য 'রবীন্দ্র-সৃষ্টি-সমীক্ষা'র দ্বিতীয় খণ্ড সম্পূর্ণ হইয়া প্রকাশিত হইল। দ্বিতীয় খণ্ডের আয়তন প্রথম খণ্ডের সহিত তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ বাড়িয়াছে। হয়ত ভবিষ্যৎ সংস্করণে প্রথম খণ্ডকেও আনুপাতিকভাবে কিছুটা সম্প্রসারিত করিতে হইবে। প্রথম খণ্ডের সহিত তুলনায় দ্বিতীয় খণ্ডের কালসীমা আরও দূরব্যাপ্ত। রচনাবৈচিত্র্যও আরও খুঁটিনাটি বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রথম সুনিশ্চিত বিকাশের যুগে উহার বৃত্তপরিধি আপেক্ষিক-ভাবে সুসংহত। ফুল যখন কুঁড়ি হইতে প্রথম পুষ্পপরিণতি লাভ করে বা নদী যখন পার্বত্যসঙ্কট হইতে মুক্তিলাভ করিয়া অবিচ্ছিন্ন ধারায় সমতলভূমি দিয়া প্রথম প্রবাহিত হয়, তখন আঙ্গিক-সুষমা বা পরিচ্ছন্ন তটবন্ধনই উহার প্রাণশক্তির সার্থক প্রতীকরূপে আবির্ভূত হয়। প্রতিভার আদিম উন্মোচনপর্ব অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাগুলিকেই পূর্ণ বিকশিত করিয়া দেখায়—উহার গর্ভকোষস্থ কেশরদলই উহার সৌন্দর্যসত্তার বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্য নিরূপণ করে। পরবর্তী পরিণতিস্তরে নানা শাখা-নদী মূল নদীর সহিত মিশিয়া উহার স্রোতোবেগ বর্ধিত করে, নানা বাহিরের প্রভাব মূল প্রেরণার সহিত যুক্ত হইয়া উহার মধ্যে জটিলতা সঞ্চার করে, ভূগোলের নানা আঁকা-বাঁকা সংস্থিতি উহাকে অলক্ষ্য টানে তির্যক পথে আকর্ষণ করে। বিশেষ করিয়া সমুদ্রসঙ্গমের আসন্নতর প্রত্যয় উহার রক্তে চাঞ্চল্য জাগায় ও উহার ঐক্যকে খণ্ডিত করিয়া বিভিন্ন সত্তার সমষ্টিরূপে উহার স্বরূপকে গহনচারীরূপে প্রতিভাত করে। কাজেই মহাকবির সৃষ্টিরহস্য-উন্মোচনে যতই অগ্রসর হওয়া যায়, অনুসন্ধানকার্য ততই দুরূহতর হয়। আদিম ভাগীরথী-ধারা হইতে যতই পদ্মা, মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি বিভিন্ন কল্লোলিনী-প্রবাহ বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে ততই উহার ধারাবাহিকতা ও অন্তঃসঙ্গতি আরও দুর্লক্ষ্য হয় ও গভীরতর সংশ্লেষ দাবী করে। সুতরাং প্রাকৃতিক নিয়মেই আমার দ্বিতীয়ার্ধের কাজ আরও সূক্ষ্ম অভিনিবেশ ও সমীকরণের দাবী জানাইবে।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারত-উদ্ধার-কাব্যে'র 'দড়ি আগে ছেঁড়ে কিংবা কড়ি আগে পড়ে' এই পরিহাসবিজড়িত বিকল্প এখন আমার নিকট

অমোঘ জীবনসত্যের ভ্রূকুটিদৃষ্টিতে দেখা দিয়াছে। পরন্তু প্রলম্বনরজ্জুর পচনশীলতা বা আশ্রয়-কালকের পতনশীলতা উভয়কেই সমান উপেক্ষা করিয়া আরব্ধ কাজ চালাইয়া যাওয়া ছাড়া আমার উপায়ান্তর নাই। সকল রবীন্দ্রভক্ত পূজকমণ্ডলীর নিকট এই পূজা-উদ্‌যাপনের সমাপ্তিমন্ত্রোচ্চারণের মানস-সহযোগিতা ও শুভকামনা যাচ্ঞা করিতেছি। ইতি—

বিনীত

৩১ সাদার্ন এভিনিউ,
কলিকাতা ২৯
১লা জুন, ১৯৬৯

শ্রীপুলিনবিহারী সেন

রবীন্দ্র-সৃষ্টি-সমীক্ষা

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

রবীন্দ্রগদ্যের তৃতীয় পর্ব (১৮৯৬—১৯০৮, ১৩০৩—১৩১৫)

রবীন্দ্রগদ্যের তৃতীয় পর্বে বিষয়বৈচিত্র্য পূর্ব দুই পর্বেরই অনুরূপ, তবে এখানে কালানুক্রমিক ধারা-অনুসরণের কিছু অসুবিধা অনুভব করা যায়। রবীন্দ্রগদ্যের এই পর্বে রাজনীতি ও সমাজনীতিবিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে প্রায় পূর্বের চিন্তাক্রম ও ভাষারীতিরই অনুসরণ লক্ষিত হয়। ইহাদের ব্যবধান শুধু কালগত, মেজাজ বা রীতিগত নয়। এই পর্বে ধর্ম সমাজনীতির বৃহত্তর বেষ্টনী হইতে মুক্ত হইয়া একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। তথাপি মূলতঃ ইহা সমাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে, সুষম জীবনযাত্রার উপায়-স্বরূপেই আলোচিত হইয়াছে। লেখকের সমাজনিরপেক্ষ ধর্মানুভূতির প্রেরণা, ধর্মপিপাসু চিত্তের অনুসন্ধান-ব্যাকুলতার অভিব্যক্তি দেখিবার জন্য আমাদিগকে 'শান্তিনিকেতন' পর্যায়ের পরবর্তী কালের প্রবন্ধাবলীর জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে। ভাবুকতাময় রচনার সুরু দ্বিতীয় পর্বেই হইয়াছিল। তৃতীয় পর্বে ইহা 'বিচিত্র প্রবন্ধ'-এ সংকলিত রচনাসংগ্রহের মধ্যে আবেগ ও মননের অপূর্ব সমন্বয়জাত সুরসঙ্গতিতে ও অখণ্ড ভাবাবহরচনায় পূর্ণবিকশিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে ভাবপ্রেরণা ও প্রকাশরীতির এমন একটি ঐক্য পরিস্ফুট যে ইহাদের সম্বন্ধে কালগত আলোচনা অপ্রযোজ্য বলিয়াই মনে হয়। ইহাদের মধ্যে 'প্রাচীন সাহিত্য' ও 'আধুনিক সাহিত্য'-এর বিষয়-নির্ভরতা ও তীক্ষ্ন বিচারশক্তিপ্রয়োগ এক মনোলীলাময় ভাবুকতায় সূক্ষ্মতর রূপান্তর লাভ করিয়াছে।

ভাবুকতার আর একটি আশ্চর্য প্রকাশ ঘটিয়াছে রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্র'-সংগ্রহে। বিস্ময়ের বিষয় এই যে এই পত্রগুলি রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের গদ্যরচনাগুলির সঙ্গে সমকালীন। এই পত্রাংশগুলির মধ্যে লেখকের ব্যক্তি-সত্তার উদ্‌ঘাটন ও মানবের প্রাত্যহিক জীবনের সহিত সংযোগ ও

দূরত্বে মেশা এক প্রকারের অদ্ভুত সম্পর্কের পরিচয় আছে। ইহাদের মধ্যে মানবপ্রেম ও দার্শনিক ঔদাসীন্যের টানা-পোড়েনে গঠিত একটি মিশ্র মানস প্রতিক্রিয়া, মননশীল জীবনসমীক্ষা ও সর্বোপরি প্রকৃতির বাহিরের রূপ ও অন্তরের রহস্যের মধ্যে গভীর অনুপ্রবেশ ও সময় সময় এই উভয়বিধ দৃষ্টিভঙ্গীর সমীকরণ ও একাত্মতা আশ্চর্য স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল স্বাক্ষর উৎকীর্ণ করিয়াছে। ইহাদের ভাষা ও রচনারীতি প্রথম পর্বের অন্যান্য রচনার সহিত সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী—অন্তর্গূঢ় ও গভীর রহস্যদ্যোতনার পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী। এই যুগের তর্কসঙ্কুলতা ও বিষয়াচ্ছন্নতা অতিক্রম করিয়া এই পত্রের ভাষা আবেগে কোমল ও মননে মর্যাদাময়, অন্তরানুভূতির উৎস হইতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎসারিত। মনে হয় যে প্রতিভাশালী লেখকের রচনায় বিবর্তনক্রিয়ার কালানুক্রমিকতা সর্বথা স্বীকার্য নহে। এই অপেক্ষাকৃত তরুণ বয়সের পত্রাবলীর মধ্যে লেখকের পরিণত রচনারীতির আশ্চর্য নিদর্শন ত মিলেই। অধিকন্তু তাঁহার ব্যক্তিগত রুচি ও মেজাজ, পারিবারিক জীবনের স্নেহ-কোমলতা ও চতুঃপার্শ্ববর্তী পল্লী-জীবনযাত্রার সহিত অন্তরঙ্গ সহানুভূতির যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা তাঁহার অন্যবিধ রচনায় দুর্লভ। ব্যক্তি-রবীন্দ্রনাথ ও মানব-দরদী রবীন্দ্রনাথ এখানে শুধু শ্রেষ্ঠ ও অনবদ্য শিল্পনিপুণ স্রষ্টারূপে নয়, কিঞ্চিৎ শিথিল ও এলায়িত ভঙ্গীতে, ভাবমুগ্ধ মনের বিচিত্র রূপে ও মনন-কণিকাগুলির অলস রোমন্থনজাত অন্যমনস্কতায়, আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। গুণী এখানে যেন তাঁহার বীণাযন্ত্রে ধীরে সুস্থে তার পরাইতেছেন ও যে অনাগত সঙ্গীত-মূর্ছনা তাঁহার অবচেতন মনে বেগসঞ্চয় করিতেছে তাহারই অস্পষ্ট আভাস যেন অঙ্গুলির যদৃচ্ছ চালনায় অর্ধব্যক্ত করিতেছেন। রবীন্দ্রসাহিত্যে 'ছিন্নপত্রাবলীর' তাৎপর্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কবিমনের এমন স্বচ্ছ প্রকাশ, কবির অন্তর-রহস্যের এমন প্রত্যক্ষ সূত্র-নির্ণয়, ব্যক্তিজীবনের এরূপ শুভ্র উন্মোচন কবির সমগ্র কাব্য-সাহিত্যে কোথাও প্রতিবিম্বিত হয় নাই।

সমালোচনা-সাহিত্যে কবি আর কোন নূতন দিগন্ত উন্মোচন করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার 'প্রাচীন সাহিত্য' ও 'আধুনিক সাহিত্য' এই পর্বের সমালোচনা-প্রয়াসসমূহের সংগ্রহ-গ্রন্থরূপে গৃহীত হইতে পারে। এই গ্রন্থদ্বয়ে সংগৃহীত প্রবন্ধগুলিতে লেখকের পূর্ববর্তী স্তরের সাহিত্যরসবিচারের মধ্যে যে সূক্ষ্ম অনুভব, সুগভীর অন্তঃপ্রবেশ ও রসস্বরূপের নব উদ্বোধনের আশ্চর্য পরিচয় মিলে তাহারই বিচিত্রতর প্রয়োগ চমৎকৃতি জাগায়। এই পর্বে

নূতন কোন দৃষ্টিভঙ্গী সুস্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। পরবর্তী স্তরে রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থবিচার ছাড়িয়া সার্বভৌম সাহিত্যতত্ত্বের স্বরূপনির্ণয়ে বিশেষভাবে মনোযোগী হইয়াছেন ও এই সাহিত্যতত্ত্ববিষয়ক আলোচনাগুলিতে রসাস্বাদন ও দার্শনিক বিচারের অপূর্ব সমন্বয় করিয়াছেন। মনে হয় রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসৃষ্টি যতই বিচিত্রগামী ও পরিণত হইয়া উঠিয়াছে, তাঁহার সমালোচনা ততই সম্পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধের আয়তন-বিস্তার হইতে সংক্ষিপ্ত, আভাসধর্মী দ্যুতিবিকিরণে সংহত হইয়াছে।

সুতরাং তৃতীয় পর্বে বিভিন্ন প্রকারের নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি অন্তর্ভুক্ত ও আলোচিত হইবে।

(ক) ভাবুকতাময় রচনা

নববর্ষা (শ্রাবণ, ১৩০৮)	'বিচিত্র প্রবন্ধ'-এ সংগৃহীত
কেকাধ্বনি (ভাদ্র, ১৩০৮)	"
বাজে কথা (আশ্বিন, ১৩০৯)	"
মাভৈঃ (কার্তিক ,১৩০৯)	"
পরনিন্দা (অগ্রহায়ণ, ১৩০৯)	"
রঙ্গমঞ্চ (পৌষ, ১৩০৯)	"
পনের আনা (মাঘ, ১৩০৯)	"
বসন্ত-যাপন (চৈত্র, ১৩০৯)	"
মন্দির (পৌষ, ১৩১০)	"

(খ) সাহিত্যসমালোচনা

(১) গ্রাম্য সাহিত্য (ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩০৫)—'লোকসাহিত্য'

বাউল সঙ্গীত —সমালোচনা

(২) গ্রন্থ-সমালোচনা

মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস (শ্রাবণ, ১৩০৫)	'আধুনিক সাহিত্য'
সাকার ও নিরাকার (আশ্বিন, ১৩০৫)	"
আষাঢ়ে (অগ্রহায়ণ, ১৩০৫)	"
জুবেয়ার (বৈশাখ, ১৩০৮)	"
কবিজীবনী (আষাঢ়, ১৩০৮)	"

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (শ্রাবণ, ১৩০৯) — আধুনিক সাহিত্য
মন্ত্র (কার্তিক, ১৩০৯) — ”
শুভ বিবাহ (আষাঢ়, ১৩১৩) — ”

(৩) প্রাচীন কাব্যবিষয়ক

কাদম্বরীচিত্র (মাঘ, ১৩০৬) — প্রাচীন সাহিত্য
কাব্যে উপেক্ষিতা (জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৭) — ”
কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা (পৌষ, ১৩০৮) — ”
শকুন্তলা (আশ্বিন, ১৩০৯) — ”
রামায়ণ (পৌষ, ১৩১০) — ”
ধম্মপদং (জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২) — ”

(৪) অভিভাষণ

ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ (বৈশাখ, ১৩১২) — আত্মশক্তি ও সমূহ
সাহিত্যসম্মিলন (ফাল্গুন, ১৩১৩)
সাহিত্যপরিষৎ (চৈত্র, ১৩১৩)

(গ) রাজনীতি ও সমাজনীতি

(১) রাজনীতি

প্রসঙ্গ কথা (১-৫)	জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ, আশ্বিন, কার্তিক, অগ্রহায়ণ, ১৩০৫, ভারতী	আত্মশক্তি ও সমূহ পরিশিষ্ট
মুখুজ্জে বনাম বাঁড়ুজ্জে	ভাদ্র, ১৩০৫, ভারতী	
অপর পক্ষের কথা	আশ্বিন, ১৩০৫, ভারতী	
আলট্রা-কনজার্ভেটিভ	কার্তিক, ১৩০৫, ভারতী	
কণ্ঠরোধ	বৈশাখ, ১৩০৫, ভারতী	রাজা ও প্রজা
নেশন কি ? (শ্রাবণ, ১৩০৮)		
ভারতবর্ষীয় সমাজ	”	
বিরোধমূলক আদর্শ	আশ্বিন, ১৩০৮, বঙ্গদর্শন	আত্মশক্তি ও সমূহ
রাষ্ট্রনীতি ও ধর্মনীতি	কার্তিক, ১৩০৯, বঙ্গদর্শন	
রাজকুটুম্ব	বৈশাখ, ১৩১০, বঙ্গদর্শন	
ঘুষাঘুষি	ভাদ্র, ১৩১০, বঙ্গদর্শন	

ইউনিভার্সিটি বিল (আষাঢ়, ১৩১১)		আত্মশক্তি ও সমূহ
বঙ্গবিভাগ	জ্যৈষ্ঠ, ১৩১১, বঙ্গদর্শন	
দেশের কথা	শ্রাবণ, ১৩১১, বঙ্গদর্শন	
সফলতার সদুপায়	চৈত্র, ১৩১১, বঙ্গদর্শন	
জলকষ্ট (জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়, ১৩১২)		
দেশীয় রাজ্য (শ্রাবণ, ১৩১২)		
ব্রতধারণ (ভাদ্র, ১৩১২)		
অবস্থা ও ব্যবস্থা (আশ্বিন, ১৩১২)		
ইম্পিরিয়ালিজম	বৈশাখ, ১৩১২, ভারতী	রাজা ও প্রজা
রাজভক্তি	মাঘ, ১৩১২, ভাণ্ডার	
বহুরাজকতা	আষাঢ়, ১৩১২, ভাণ্ডার	
দেশনায়ক	জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৩, বঙ্গদর্শন	আত্মশক্তি ও সমূহ
সভাপতির অভিভাষণ, পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনী (১৩১৪)		
ব্যাধি ও প্রতিকার	শ্রাবণ, ১৩১৪, প্রবাসী	
যজ্ঞভঙ্গ	মাঘ, ১৩১৪, প্রবাসী	
সদুপায়	শ্রাবণ, ১৩১৫, প্রবাসী	
দেশহিত	আশ্বিন, ১৩১৫, বঙ্গদর্শন	
পথ ও পাথেয়	জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৫, বঙ্গদর্শন	রাজা ও প্রজা
সমস্যা	আষাঢ়, ১৩১৫, প্রবাসী	

(২) সমাজনীতি

হিন্দুর ঐক্য (১৩০৫)	সমাজ
কোট বা চাপকান (১৩০৫)	
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা (জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৮)	ভারতবর্ষ
নকলের নাকাল ও আলোচনা (১৩০৮)	সমাজ, পরিশিষ্ট
ব্যাধি ও প্রতিকার (১৩০৮)	সমাজ
ভারতবর্ষীয় সমাজ (শ্রাবণ, ১৩০৮)	আত্মশক্তি ও সমূহ
সমাজভেদ (১৩০৮)	ভারতবর্ষ ও স্বদেশ, সংযোজন

বারোয়ারি মঙ্গল (চৈত্র, ১৩০৮)	ভারতবর্ষ
নববর্ষ (বৈশাখ, ১৩০৯)	ভারতবর্ষ
ব্রাহ্মণ (আষাঢ়, ১৩০৯)	ভারতবর্ষ
চীনেম্যানের চিঠি (আষাঢ়, ১৩০৯)	ভারতবর্ষ
অত্যুক্তি (কার্তিক, ১৩০৯)	ভারতবর্ষ
ধর্মবোধের দৃষ্টান্ত (১৩১০)	স্বদেশ
স্বদেশী-সমাজ ও স্বদেশী সমাজের মর্মকথা (ভাদ্র, ১৩১১)	আত্মশক্তি ও সমূহ
ঐ পরিশিষ্ট (আশ্বিন, ১৩১১)	"
বিজয়া-সম্মিলন (কার্তিক, ১৩১২)	ভারতবর্ষ
বিলাসের ফাঁস(১৩১২)	সমাজ
স্মৃতিরক্ষা (১৩১২)	সমাজ, পরিশিষ্ট
অযোগ্য-ভক্তি (১৩১৫)	সমাজ
পূর্ব ও পশ্চিম (১৩১৫)	সমাজ

২

ক. ভাবুকতাময় রচনা

এই পর্বে রবীন্দ্রনাথের ভাবুকতা, একদিকে স্থূল বিষয়নির্ভরতা, অপর-দিকে বায়বব্য কাল্পনিকতাকে অতিক্রম করিয়া এক সূক্ষ্ম মনোলোকব্যাপী অখণ্ড বাতাবরণসৃষ্টিতে সমর্থ হইয়াছে। লেখকের ভাবকল্পনা ও মননদৃঢ়তা অপূর্ব সমাহারে সংহত হইয়া পাঠককে এক গভীরতাৎপর্যমুগ্ধ রসচেতনায় উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে। 'বিচিত্র প্রবন্ধ'-এ সংকলিত প্রবন্ধগুচ্ছে দার্শনিকের লীলাময় জীবনসমীক্ষা শিল্পীর সৌন্দর্যবোধ ও অপ্রমত্ত মননকুশলতার সহিত সমন্বিত হইয়া পাঠকের মনে এক অপরূপ অনুভূতিলোকের উদ্বোধন করে। পরিচিত জীবন ও জগতের অন্তর্লীন সৌরভ যেন এক মায়াবলে নিষ্কাশিত হইয়া লেখকের উক্তিপরম্পরা ও চিন্তাপ্রবাহের গতিবেগে সমস্ত বায়ুমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। বৈষ্ণব কবির মত আমরাও অনুভব করি যে হিয়ার ভিতরে যে সৌন্দর্যবোধ নিষ্ক্রিয় ছিল তাহাকে কোন্ ঐন্দ্রজালিক বাহির করিয়া আনিয়া আমাদের মুখোমুখি স্থাপন করিয়াছেন।

'কমলাকান্তের দপ্তরের' সঙ্গে এক দিক দিয়া এই প্রবন্ধগুলি তুলনীয় —একটি অপূর্ব সংবেদনশীল ব্যক্তিমনকে আশ্রয় করিয়া ইহাদের সুকুমার ভাবমুকুলগুলি উন্মেষিত ও পূর্ণবিকশিত হইয়াছে। তবে বঙ্কিমচন্দ্র পূর্ব হইতেই কমলাকান্তকে একটি উৎকেন্দ্রিক, আফিংখোর চরিত্ররূপে ঘোষিত করিয়াছেন। সুতরাং উহার জীবনভাষ্যের মধ্যে গভীর ভাবাত্মক আবেদনটি খেয়ালী অতিরঞ্জনের বহিরাচ্ছাদনে আত্মগোপন করিয়াছে। উহার পরিধিও যেমন সীমিত, উহার প্রকাশভঙ্গীও তেমনি একমুখীন ব্যক্তি-মানসিকতার কিছুটা উচ্ছ্বাসস্ফীত প্রতিফলন। নিঃসঙ্গ, দাসত্ব-লাঞ্ছিত, সংসারের অসঙ্গতিতে উদ্বেজিত কমলাকান্তের বেদনাময় জীবনপর্যালোচনায় যতটা তীব্রতা আছে ততটা বৈচিত্র্য নাই। বিশেষতঃ লেখক তাহাকে নাটকায়িত করিয়া একপ্রকারের বিশেষ অভিজ্ঞতা ও পরিস্থিতির সহিত তাহার জীবনকাহিনী ও প্রজ্ঞাস্বরূপকে সম্পর্কিত করিয়াছেন। সে উদাসীন বলিয়াই পূর্ণ মানুষ নয় ও তাহার অনুভবক্রিয়ার মধ্যেও পূর্ণতা নাই। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিসত্তা, ভালমন্দ কোন দিকেই, ইহার সহিত সমজাতীয় নয়। তিনি অবশ্য এই প্রবন্ধগুলিতে মাঝে মধ্যে তাঁহার কল্পনা ও রুচির অসাধারণত্ব, গড়পড়তা মানুষের সঙ্গে তাঁহার পার্থক্য পরিস্ফুট করিতে চাহিয়াছেন। সাধারণ সাংসারিক কর্মপাশে আবদ্ধ, চলতি জীবননীতির নির্বিচার-অনুসারী মানুষের সমগোত্রীয় তিনি নন। কিন্তু তাঁহার সত্তার বিচিত্র ও বহুমুখী অনুভূতি, পৃথিবীর রূপরসগন্ধে তাঁহার চিত্তের অতি সূক্ষ্ম ও আশ্চর্য ভাবগ্রাহী সংবেদনশীলতা, জীবনের নানা উদ্দীপনাকেন্দ্র হইতে প্রবাহিত সাধারণের অগোচর চিন্তাতরঙ্গ-সঞ্চারের প্রতি তাঁহার মানস অভ্যর্থনার বিস্ময়কর প্রসার—এ সমস্তই তাঁহার যে পরিচয় পাঠকচিত্তে মুদ্রিত করে, তাহা যেমন অনুভব-সৌকুমার্যে রমণীয় তেমনি উদার দিগন্তব্যাপী বিস্তারে সর্বাত্মক। আমরা কমলাকান্তকে বাউলের একতারা হাতে কল্পনা করি। সে অনেক গ্রন্থপাঠের পরিচয় দিয়াছে, পাণ্ডিত্যের অনেক আড়ম্বর করিয়াছে, কিন্তু এই বিদগ্ধ মানস-রুচির কেন্দ্রস্থলে অধিষ্ঠিত আছেন এক উদাস, ভাবমুগ্ধ, একই সুরের উদ্গাতা সাধক। মাঝে মধ্যে এই একতারা হইতে খুব গভীর সুর অনুরণিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে গায়কের একনিষ্ঠতা ক্ষুণ্ণ হয় নাই। সে আধুনিক রাজনীতি ও সমাজনীতির কথা বলিয়াছে, প্রাচীন বৈষ্ণব ভাবাদর্শকে

দেশপ্রেমের সদ্যোনির্মুক্ত আবেগধারার রূপকে রূপান্তরিত করিয়াছে, কিন্তু তথাপি তাহার এককেন্দ্রিকতা সম্বন্ধে আমাদের ধারণার কোন ব্যত্যয় ঘটে নাই। সে পুরাতন সুরে নূতন কথা বলিয়াছে, কিন্তু তাহার শাশ্বত আদর্শের প্রতিনিধিত্বের প্রতি আমাদের কোন সংশয় জাগে না। কমলাকান্তের একতারার পাশে রবীন্দ্রনাথ যেন সপ্তস্বরবিশিষ্ট বীণাযন্ত্র; প্রেরণার তারতম্যে, অঙ্গুলিস্পর্শের বিভিন্ন রীতিতে, মেজাজ ও দৃষ্টিভঙ্গীর সামান্য ইতরবিশেষে বিচিত্র স্বরমূর্ছনা এই যন্ত্র হইতে নিঃসৃত হইয়া পাঠকচিত্তকে প্লাবিত করিয়া দিয়াছে।

নববর্ষা (শ্রাবণ, ১৩০৮) রবীন্দ্রনাথের উপর কালিদাসের প্রভাবের আর একটি চমৎকার নিদর্শন। গদ্যে-পদ্যে, ছন্দোবদ্ধ ঘনীভূত আবেগময়তায় ও গভীর-উদ্রিক্ত চিন্তা-কল্পনার লীলাময়, অথচ অদৃশ্য ভাবসূত্রগ্রথিত স্বচ্ছন্দ বিচরণে, কালিদাস আধুনিক কবিকে কত বিচিত্র সারস্বত অভিযানে ব্রতী করিয়াছেন তাহা ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয়। অপরের ভাবপ্রেরণাও যে মৌলিক সৃষ্টিতে উদ্দীপ্ত করিতে পারে, কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথের পারস্পরিক সম্পর্ক তাহার প্রমাণ।

'নববর্ষা' প্রবন্ধে বর্ষার স্নিগ্ধ ছায়া কেমন করিয়া পরিচিত জগতের আবরণ উন্মোচন করিয়া আমাদিগকে এক নূতন, অভিজ্ঞতার জীর্ণতামুক্ত ভাবজগতে লইয়া যাইতে পারে, রবীন্দ্রনাথ তাহাই অপূর্ব মোহময় ও অর্থগভীর ভাষার মাধ্যমে ব্যক্ত করিয়াছেন। উজ্জয়িনীর প্রাসাদমালা চিরতরে ধ্বংস হইয়াছে। কিন্তু সেই প্রাসাদশিখরে সঞ্চরমান মেঘ চির নবীনত্বের প্রতীক-রূপে অমর হইয়া আছে।

শুধু দৃশ্য বহির্জগতে নয়, অনুভবগম্য মনোজগতেও মেঘ চিরাভ্যস্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনযাত্রার বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া আমাদের অবদমিত হৃদয়াবেগকে উতলা করিয়া তোলে, বর্তমান জীবনের অভিজ্ঞতার তলায় চাপা 'জন্মান্তরসৌহৃদানিকে এক অনির্দেশ্য আকৃতিরূপে উদ্বুদ্ধ করে। অধিগত তথ্য হইতে অপ্রাপ্য কামনাই সত্যতররূপে দেখা দেয়। মানুষকে নিত্যলোকের কেন্দ্রস্থলে লইয়া হাজির করে।

পূর্বমেঘে নব নব সৌন্দর্যের মধ্য দিয়া অবিরত যাত্রা, বিরহের অধীরতার সহিত পথের বিচিত্র আকর্ষণের মন্থর উপভোগের এক অপরূপ সমন্বয়। উত্তর-

মেঘে নিভৃত আনন্দের মহাতীর্থে সমস্ত যাত্রার অবসান। সমস্ত শ্রেষ্ঠ কাব্যেই এই পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ কোন না কোন রূপে উপস্থিত থাকে—বিচিত্রের বহির্মুখী টান ও একের অন্তর্মুখী প্রশান্ত সার্থকতাবোধ ইহার আদি ও অন্তকে ঐক্যবদ্ধ করে।

(বর্ষার আবির্ভাব পরিচিত জগতে যে অপরিচয়ের রহস্য জাগায়, প্রথাজীর্ণ জীবনে যে অজানা আবেগ-আকূতির যৌবন-চাঞ্চল্য সঞ্চার করে, মানবের মনে যে গভীর আদর্শ-জিজ্ঞাসার অস্বস্তি ও আপাত-বিরোধের সমাধানে প্রগাঢ় তৃপ্তির আস্বাদ পরিবেশন করে, রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটি স্বল্পপরিসরে তাহার পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি। কালিদাসের কাব্যের নূতন ব্যাখ্যার মধ্যে আধুনিক বর্ষামায়ামুগ্ধ মনের সমস্ত দার্শনিক মনন, সমস্ত সৌন্দর্যবোধ, সমস্ত মানস কৌতূহলের বিচিত্র সঞ্চরণশীলতা এক কেন্দ্রীভূত উপলব্ধির অনবদ্য সুষমা লাভ করিয়াছে।)

'পাগল' (শ্রাবণ, ১৩১১) প্রবন্ধের সঙ্গে 'নববর্ষা'র একটি ভাবগত মিল ও পটভূমিকাগত বৈষম্য আছে। আষাঢ়ের নববর্ষার স্নিগ্ধ মেঘচ্ছায়ায় যে পরিচিতের বিলুপ্তি ও অভাবনীয়ের আবির্ভাব, শ্রাবণের এক বর্ষণমুক্ত রৌদ্রোজ্জ্বল দিবসে সেই অনুভূতিরই অতর্কিত পুনঃপ্রকটন ঘটিয়াছে। এই শ্রাবণ-প্রভাতে কোন অজ্ঞাত ভাবাসঙ্গের টানে, লেখকের সাধারণ জীবনকে বিপর্যস্ত ও পরিচিতের তুচ্ছতাকে সবলে বিদীর্ণ করিয়া রুদ্রদেবতার নিয়ম-টুটানো, ব্যতিক্রমধর্মী দহন-দীপ্তি বস্তুজগতে ও মনোরাজ্যে সহসা বিচ্ছুরিত হইয়াছে। 'নববর্ষা'র পরিবর্তনের সঙ্গে 'পাগল'-এর দৃশ্যান্তরের ভাবগত সাম্য আছে, কিন্তু উহাদের মধ্যে ছন্দোবৈষম্য অতি প্রবল। নববর্ষায় যে রূপান্তর ঘটিয়াছে তাহা সনাতন প্রাকৃতিক বিধানেরই অনুবর্তী ; উহা রুক্ষ বিবর্ণতার উপর এক স্নিগ্ধ মায়াবরণ টানিয়া দেওয়ারই অবশ্যম্ভাবী ফল ও স্থির পরিণতি। প্রকৃতির রূপে, কবিচেতনার দিব্যদৃষ্টিতে ও পাঠকের বিচারবুদ্ধিতে এই পরিবর্তনের স্বাভাবিকতার সমর্থন মিলে। 'পাগল'এ কিন্তু এই দৃশ্যপট পালটাইয়াছে ঐন্দ্রজালিক আকস্মিকতার সহিত, এক হঠাৎ-বিস্ফোরিত কবি-কল্পনার বিপর্যয়কারী প্রক্ষেপে। পাগলের আবির্ভাবের সহিত এই প্রসন্ন, রৌদ্রদীপ্ত দিনের কোন মর্মগত সম্পর্ক নাই ; পাঠকের ঔচিত্যবোধও এই চিরাভ্যস্ত রীতির বৈপরীত্যসাধনে সায় দিতে চাহে না। মনে হয় বহিঃপ্রকৃতি এখানে উপলক্ষ্য মাত্র ; রুদ্রের উদ্বোধনে তাহার কোন আন্তরিক

সহযোগিতা নাই। কবির অন্তর-গুপ্ত এই খ্যাপা দেবতাটি নিতান্ত অকারণেই প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছেন ও তাঁহার খেয়ালী তাণ্ডবনৃত্যের অভিঘাতে জীবনের স্থূল বহিরাবরণটি স্থানচ্যুত করিয়া উহার অন্তরালস্থিত উদ্দাম রূপটিকে ক্ষণিকের জন্য অনাবৃত করিয়াছেন। আশ্চর্য এই যে আষাঢ়ের নবমেঘের আচ্ছাদন যে সৌন্দর্য ও মোহমুক্তি ফুটাইয়া তুলিয়াছিল, শ্রাবণের মেঘাবরণ-নির্মুক্ত রৌদ্রটিও সেই একই অপরিচিত, অভ্যাসবন্ধনহীন সৌন্দর্যকে প্রকটিত করিয়াছে। হয়ত আষাঢ়ে যে বর্ষা নূতনকে আবাহন করিয়াছিল, শ্রাবণে সেই বর্ষার অবসানই আবার সেই বৈচিত্র্য-উদ্বোধনের হেতু হইয়াছে। সৃষ্টির যে পাগলামি দৃশ্যতঃ অস্খলিত নিয়মানুবর্তনে প্রচ্ছন্ন থাকে তাহাই ঋতুর সামান্য পরিবর্তনের সূত্র-অবলম্বনে মাঝে মধ্যে প্রখর অভিব্যক্তি লাভ করে, সৃষ্টির বিপরীত ছন্দের হঠাৎ উদ্ঘাটনে অভ্যস্ত জীবনযাত্রাতে নূতন মূল্য আরোপ করে ও সুখ ও আনন্দের পার্থক্যটি আমাদের অনুভূতিতে হঠাৎ উজ্জ্বল করিয়া তোলে। এই প্রবন্ধে লেখকের রচনানৈপুণ্য ও চিন্তাবিস্তার আমাদিগকে মুগ্ধ করে, কিন্তু হয়ত ইহার সুরটি আমাদের মনে কোন চিরন্তন আসনের অধিকারী হয় না।

'বসন্তযাপন' (চৈত্র, ১৩০৯) আর একটি ঋতুসম্ভব রচনা, বসন্তের নবহিল্লোলিত প্রাণোচ্ছলতার সহিত একসুরে বাঁধা। ইহাতে তত্ত্বকথার কিছু ভূমিকা আছে; লেখকের সেই 'ছিন্নপত্র'-যুগের প্রকৃতির সহিত একাত্মতা-বিষয়ক আদিম প্রত্যয়-সংস্কার এই প্রবন্ধের ভাবসত্তার মূলে বর্তমান। কিন্তু কবির মর্মানুবিদ্ধ এই সহজ অনুভবকে বাদ দিলেও ইহাতে লেখকের প্রধান বক্তব্য হইতেছে মানবের যন্ত্রবদ্ধ, অভ্যাসান্ধ জীবনের মধ্যে প্রকৃতির ঋতু-ভেদে যে নিখিলব্যাপ্ত নবরসপ্রবাহ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে তাহার স্বচ্ছন্দ অনুপ্রবেশের আমন্ত্রণ, মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে অন্তরঙ্গ মিলনের সমস্ত কৃত্রিম বাধার অপসারণ। প্রকৃতির প্রাণবিকাশের ছন্দের বিরোধিতায় নয়, উহার একান্ত স্বীকৃতি ও সাঙ্গীকরণেই মানবজীবনের যথার্থ সার্থকতা। মানুষ অভিব্যক্তির যে নিম্নতর স্তরগুলি উত্তীর্ণ হইয়া তাহার বর্তমান পরিণতিতে পৌঁছিয়াছে, উহাদের সহিত সম্পূর্ণ সম্পর্কচ্ছেদে নয়, পরন্তু স্বেচ্ছাবিচরণের স্বচ্ছন্দ গতিবিধিতে, নিগূঢ় আত্মীয়তার অনুভবেই মানবের শ্রেষ্ঠত্ব নিহিত। তাহার যে অতীত জীবনের অতিক্রান্ত অধ্যায়গুলিতে ফিরিবার, প্রাচীন অনুভবগুলিকে পুনরায় জীয়াইবার শক্তি আছে, তাহাতেই তাহার গৌরব।

যেমন যোগফল বা গুণফলের মধ্যে শেষ পর্যায়ের কারণস্বরূপ উহার অন্তর্ভুক্ত সমস্ত ক্ষুদ্রতর সংখ্যাই বর্তমান, তেমনি মানুষের মধ্যে উহার পিছনকার অপরিণত স্তরগুলির পূর্বস্মৃতি সংস্কাররূপে সুপ্ত আছে; এক একদিন কোন বিশেষ প্রেরণায় এই রুদ্ধদ্বারসমূহ হঠাৎ উন্মোচিত হইয়া যায় ও মানুষের মন তাহার প্রাক্তন জন্ম হইতে অপূর্ব স্মৃতিরস আহরণ করে। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত প্রবন্ধটিই মানুষ ও প্রকৃতির এই অসামঞ্জস্যের বেদনায় ক্ষুব্ধ ও আলোড়িত। প্রবন্ধের পরিসমাপ্তিতে এই ক্ষোভ এক অপরূপ কাব্যময় উচ্ছ্বাসে, মানবমনের সর্বাপেক্ষা সুকুমার অনুভূতির আত্মকৃত মূঢ় বঞ্চনায়, করুণরসে মর্মস্পর্শী হইয়া উঠিয়াছে। প্রবন্ধটির আবেদন লেখকের বিশেষ ভাবপ্রত্যয়নির্ভর হইলেও, পাঠকের সার্বভৌম অনুভূতি-সমর্থিত।

'কেকাধ্বনি' (ভাদ্র, ১৩০৮) ঠিক ঋতুসম্পর্কিত না হইলেও ভাবাসঙ্গে ইহা বর্ষাঋতুর মর্মোৎসারিত। বর্ষাপ্রকৃতি যেন উহার ভাবমত্ততা ও আরণ্য-জটিল পরিবেশ, উহার মেঘস্তিমিত অন্ধকার ও অপরিস্ফুট, অন্ধ আবেগরাশি লইয়া উহার কাংস্যকণ্ঠে কথা কহিয়া উঠিয়াছে। উহার আবেদন মিষ্টতায় নয়, বর্ষা-সংপৃক্ত, নানা সূক্ষ্ম উপাদাননির্মিত, এক বিমিশ্র অন্তর-বিহ্বলতার উদ্বোধনে। মানুষের বিরহব্যাকুলতার যে আদিম স্তর বহিঃপ্রকৃতির চঞ্চল, পরিবর্তনশীল রূপের সহিত অতি নিকট-সম্পর্কে আবদ্ধ, কেকারব তাহারই বস্তুময় প্রকাশ ও ভাবময় ব্যঞ্জনারূপে সেই বিরহবেদনাকে প্রত্যক্ষভাবে স্পর্শ করে। প্রকৃতির ইন্দ্রজাল উহার মাধ্যমে অন্তর্লোকের আর্তিকে রূপান্তরিত ও ঘনীভূত করে। ব্যাঙের ডাক, ঝিল্লীরব ও কেকাধ্বনি বর্ষার বিভিন্ন রূপের মধ্যে কেমন করিয়া প্রত্যেকের মর্মানুরূপ এক একটি সুর সঞ্চার করে তাহা লেখক কবিচেতনালব্ধ সূক্ষ্মদর্শিতার সহিত অনুভব করিয়াছেন। কেকাধ্বনিতে নববর্ষার প্রথম উন্মত্ত আলোড়ন ও গাঢ় বর্ণসমাবেশের তীক্ষ্ণ, শ্রবণপীড়াকর, কিন্তু মানসতৃপ্তিদায়ক স্বরোল্লাস; দাদুরীর একটানা কোলাহলে বর্ণবিরল, ধূসর মেঘে অবলুপ্ত, ভাবলেশহীন বোবা প্রকৃতির দূরব্যাপ্ত আত্মপ্রসারণ; ঝিল্লীরব বর্ষান্ধকারের উপর এক শব্দ-যবনিকার প্রক্ষেপে উহার নিবিড়তা-সম্পাদনের মন্ত্রোচ্চারণ। এই তিন প্রকার শব্দের কোনটিই ঠিক মধুর নয়, কিন্তু প্রত্যেকেই প্রতিবেশের সহিত ভাবসঙ্গতিতে বিশিষ্ট-অর্থবহ।

প্রবন্ধের এই অংশে লেখকের কাব্যানুভূতির সূক্ষ্মতা ও কল্পনাশক্তির সমগ্রদ্যোতনার পরিচয় পাওয়া গেল। ইহার সহিত যুক্ত হইয়াছে মননক্রিয়ার

নিগূঢ় পার্থক্য-সচেতনতা। কেকাধ্বনি কর্কশ বলিয়াই ইহার আবেদন সহজতৃপ্ত ইন্দ্রিয়গ্রামকে ছাড়াইয়া মনের ব্যঞ্জনালোক পর্যন্ত প্রসারিত। যে শব্দসমাবেশের মিষ্টত্ব অতিপ্রকট, তাহা একই সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সম্মোহ ও মনের জড়তা উৎপাদন করে। মন ঠিক ইন্দ্রিয়ের উচ্ছিষ্টভোজী নয়; তাহাকে প্রসন্ন করিতে হইলে তাহাকে স্বতন্ত্রভাবে ভোগ নিবেদন করিতে হইবে। বিসদৃশ উপাদানের মধ্যে ঐক্য, বিন্যাসকৌশলে ভাবপরিমণ্ডলের সংহতি-সাধন, জটিল ও দৃশ্যতঃ পরস্পরবিরোধী ভাবের মধ্যে দুরূহ সামঞ্জস্যবিধানের দ্বারা যে সৃষ্টিধর্মিতার পরিচয় দেওয়া হয়, মন সেই সৃষ্টির সার্থক প্রয়োগের মধ্যেই স্থায়ী আনন্দলাভ করে। জয়দেবের ছন্দে নৃত্যশীল শব্দঝঙ্কারের অবিচ্ছিন্ন ও অতিপ্রত্যক্ষ মিষ্টতা ক্লান্তিকর হইয়া উঠে। কালিদাসের কাব্যে ছন্দমাধুর্য সুন্দর ও সমুন্নত ভাবের পাকে পাকে জড়ান থাকে বলিয়াই ইহা কখনই পীড়াদায়ক হয় না, দক্ষিণ বাতাসে মৃদু-সঞ্চালিত পুষ্পগন্ধের ন্যায় ইহা অলক্ষিতভাবে প্রসাদ ও তৃপ্তি বিদীর্ণ করে। এই প্রবন্ধটির মধ্যে একদিকে যেমন অনুভূতির সৌকুমার্য, অন্যদিকে তেমনি মননের অন্তর্ভেদী প্রখরতা। আবেগ ও মননের অপরূপ সমন্বয়ে ইহা গীতিকবিতার আবেদনের সার্বভৌমতা ও ভাবসুষমা লাভ করিয়াছে।

'রঙ্গমঞ্চ' (পৌষ, ১৩০৯) ও 'মন্দির' (পৌষ, ১৩১০) এই দুইটি প্রবন্ধে কলাবিদ্যার অন্তঃপ্রেরণা সম্বন্ধে লেখকের সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত হইয়াছে। ইহারা কলাতত্ত্বের অনুভূতি ও ব্যাখ্যামূলক। 'রঙ্গমঞ্চ'-এ কলাবিদ্যার দৃশ্যপট, অভিনয়কৌশল প্রভৃতি প্রত্যক্ষতা-বিভ্রমসৃষ্টির উপযোগী বাহ্য উপাদানের উপর অতিনির্ভরতা উহার স্বতন্ত্র মর্যাদার পক্ষে হানিকররূপে লেখক অনুভব করিয়াছেন। কাব্যের সঙ্গে সঙ্গীতের বাধ্যতামূলক মিলন উভয়বিধ কলারীতিরই সম্ভ্রমের পরিপন্থী। রামায়ণ আগাগোড়া সুর করিয়া পড়াতে কাব্যমহিমা ধূলিসাৎ হয়; আবার সঙ্গীতের রাগিণীকে কাব্যসৌন্দর্যে ভূষিত করিতে গেলে উহার নিজস্ব সৌন্দর্যটি হীনপ্রভ হইয়া পড়ে। রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয় মন্তব্যটি করিবার সময় হয়ত স্বরচিত গানের কথা ভাবেন নাই। শ্রাব্য কাব্যের সহিত তুলনায় দৃশ্যকাব্যকে বাহিরের সাজসজ্জার উপর কিছুটা বেশী নির্ভরশীল মনে হইতে পারে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁহার রুচির অতিবিশুদ্ধির জন্য এই মতকে ততটা আমল দেন নাই। কাব্য ও নাট্য উভয়ের উপভোগের জন্য তিনি একমাত্র ভাবুকতাকেই অনন্য অধিকার

দিয়াছেন, বহিরঙ্গ আয়োজনের সহযোগিতার উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করেন নাই।

অবশ্য নাট্যকাব্যের আবেদন অভিনেতার সহায়তা ভিন্ন সম্পূর্ণ হয় না, কিন্তু নাটক দৃশ্যপটের সাহায্য কেন গ্রহণ করিবে? দৃশ্যপটের অতিনিখুঁত আয়োজন কার্যতঃ দর্শকের কল্পনাশক্তির প্রতি অনাস্থা। দৃশ্যনিরপেক্ষতার জন্য ও দর্শকের কল্পনাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়ার জন্য যাত্রা লেখকের নিকট অধিকতর রুচিকর। দুষ্মন্তের রথবেগের পরিমাপের জন্য আস্ত রথখানাকে রঙ্গমঞ্চে হাজির করিতে হয় না, দৃশ্যপটের ঘনঘন পরিবর্তনও নাট্যরস-উপভোগের জন্য অত্যাবশ্যকীয় মনে হয় না। পাশ্চাত্ত্য নাট্যকলা বাস্তবের তথ্যভারগ্রস্ত অনুকরণে কল্পনাকে উত্তেজিত করার পরিবর্তে বস্তুপিণ্ডের চাপে তাহাকে পিষিয়া মারে। "কেবল কাব্যরসের প্রাণদায়িনী বিশল্যকরণীটুকু হইলে চলিবে না, তাহার সঙ্গে বাস্তবিকতার আস্ত গন্ধমাদনটা পর্যন্ত চাই।" সুতরাং উপকরণবাহুল্যে ও আয়োজনের আড়ম্বরে যাহাতে দর্শকের কল্পনা ক্লিষ্ট হইয়া না পড়ে লেখক নাট্যপ্রযোজকদের সেই আবেদনই জানাইয়াছেন।

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাট্য-প্রযোজনায় দৃশ্যপটের সরলীকরণ ও উহার মধ্যে সাঙ্কেতিকতার রহস্য-আরোপ সাধিত হইয়াছিল। কিন্তু স্ত্রীলোকের চরিত্র পুরুষের দ্বারা অভিনয় করাইবার দুঃসাহসিকতা রবীন্দ্রনাথও দেখাইতে পারেন নাই। মনে হয় অভিনয়ের দ্বারা নাট্যচরিত্রের সহিত অভিন্নতার ভ্রান্তি উৎপাদন করিতে হইলে স্ত্রী-পুরুষের প্রকৃতিগত ভেদকে উপেক্ষা করা যায় না। সুতরাং এই "স্থূল বিলাতী বর্বরতা" এ পর্যন্ত অপরিহার্যই রহিয়া গেল।

'মন্দির' প্রবন্ধটি 'বিচিত্র প্রবন্ধ'-এর অন্তর্ভুক্ত না হইয়াও সূক্ষ্ম ভাবানুভূতির দিক দিয়া উহারই সমধর্মী। ভুবনেশ্বরের মন্দিরস্থাপত্য এক গভীর ও বিরাট ধর্মকল্পনার পাষাণময় শিল্পরূপ। ইহার অন্তঃপ্রেরণা আসিয়াছে যে সনাতন হিন্দুধর্ম বৌদ্ধধর্মসাধনাকে আত্মসাৎ করিয়া নবযৌবনোৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে তাহারই সদ্যোপ্রবুদ্ধ অনন্তাভিমুখী চেতনা হইতে। এই মিলিত সংস্কৃতির জীবনকল্লোচ্ছ্বাস যেন পাষাণস্তূপে বন্দী হইয়া নিজ প্রাণরহস্যটি প্রস্তরলিপির ঊর্ধ্বমুখী অভীপ্সা ও অনুপম সৃষ্টিসুষমার নীরব ভাষাকে মন্দিরশিল্পের সর্বগাত্রে উৎকীর্ণ করিয়াছে। ভাষারচিত মহাকাব্য বহু সহস্র শ্লোকের মাধ্যমে, বহু বিচিত্র বর্ণনা ও স্মরণীয় মন্তব্যের

সাহায্যে ধীরে ধীরে যে মহান্ ভাবটি ফুটাইয়া তোলে এই মন্দিরমহাকাব্যে তাহার অখণ্ড সমগ্রতা এক অবিভাজ্য প্রয়াসে স্বতঃপরিস্ফুট হইয়াছে। কাব্যের সহিত তুলনায় স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠত্ব এইখানেই।

এই বিরাট সর্বান্তঃশায়ী ভাবটি লেখক তাঁহার অপূর্ব অন্তর্দৃষ্টিবলে সামগ্রিকভাবে অনুভব ও অনবদ্যভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। মন্দিরের বাহিরে জীবনের ভালো-মন্দে মেশা, সুরুচি ও কুরুচিতে ঘেঁষাঘেঁষি, শ্লীল ও অশ্লীলের ভিন্নরঙা সূত্রতন্তুসমবায়ে ঠাস-বোনা সমস্ত পরিচয়টি অনাবৃত হইয়াছে; আর ভিতরে রহস্যময়, দৃষ্টিপ্রতিরোধী অন্ধকারে প্রায় অদৃশ্য দেবমূর্তি একক মহিমায় বিরাজিত। না শিল্পী না ভক্ত—কেহই এই বিসদৃশ সমাবেশের মধ্যে কোন অসঙ্গতি, দেবপরিকল্পনার কোন অসম্মান বা অগৌরব লক্ষ্য করে নাই। দেবমহিমার সঙ্গে মানবজীবনের এই অচ্ছেদ্য, অন্তরঙ্গ সম্পর্কটি, মানবসংসারের সমস্ত সুখ-দুঃখ ও গ্লানি-মালিন্যের অব্যবহিত নৈকট্যে দেবতার অধিষ্ঠান, পাপজীর্ণ, সংগ্রামক্লিষ্ট, ধূলিলিপ্তদেহ মানবের আত্মিক সমুন্নতিতে এই অক্ষুণ্ণ আস্থা বৌদ্ধধর্মের মানবমহিমার আদর্শের সহিত হিন্দুধর্মের দেবপবিত্রতার আদর্শের এক অভূতপূর্ব সমন্বয়। ভুবনেশ্বরের মন্দিরের অভ্রভেদী চূড়া ও মন্দিরগাত্রোৎকীর্ণ মানবজীবনের অসংখ্য খণ্ডচিত্র হইতে এই মহামিলনের বাণী সমস্বরে উদ্‌ঘোষিত হইতেছে। উপনিষদে দুইটি পক্ষীসখার রূপক-কাহিনী, জীবাত্মা-পরমাত্মার ভেদ-অভেদসূচক সম্পর্ক-বৈচিত্র্য, হৃদিস্থিত হৃষীকেশের জানা-অজানায় মেশা অনির্দেশ্য প্রতিষ্ঠা-ভূমি—এই সব সুপ্রাচীন ধর্মতত্ত্ব স্থাপত্যশিল্পের নিপুণ রেখা-সন্নিবেশে, চিরন্তন সৌন্দর্যের লীলাময়তায়, ভাবুকের নন্দনবৃত্তিকে চরিতার্থ করিয়াছে। প্রস্তরশিল্পী যেমন পাষাণের মধ্যে তাহার সৌন্দর্যসৃষ্টিশক্তির অনুপ্রবেশ ঘটাইয়া সুষমাময় মন্দির নির্মাণ করিয়াছে, ভাবুক রবীন্দ্রনাথও তেমনি মন্দিরের দুষ্প্রবেশ্য অন্তরলোকে তাঁহার অনুসন্ধানী দৃষ্টি প্রেরণ করিয়া উহার ভাবব্যঞ্জনার গোপন উৎসটি আবিষ্কার করিয়াছেন।

বাকী কয়েকটি প্রবন্ধ—'বাজে কথা' (আশ্বিন, ১৩০৯), 'মাভৈঃ' (কার্তিক, ১৩০৯), 'পরনিন্দা' (অগ্রহায়ণ, ১৩০৯) ও 'পনের আনা' (মাঘ, ১৩০৯) জীবনপ্রজ্ঞাপ্রসূত রচনা। ইহাদের মধ্যে কোন রহস্যলোকের চকিত আবির্ভাব নাই, আছে বাস্তব জীবনসত্যের উদ্ঘাটন। সচরাচর অভিজ্ঞতা জীবনের একটি সুনির্দিষ্ট, সাধারণীকৃত, সর্বসম্মত নীতিসিদ্ধান্তকেই

উপস্থাপিত করে। কিন্তু মনীষা এই সর্বস্বীকৃত রূপাদর্শের এক অলক্ষিত ফাটলে চোখ দিয়া একটা অচিন্তিতপূর্ব ব্যতিক্রম-আবিষ্কারের চমক জাগায় ও নূতন চিন্তার প্রেরণা দেয়। এই প্রবন্ধগুলি সেই ব্যতিক্রমজাতীয় জীবনসত্যের ইঙ্গিতবাহী।

ইহাদের মধ্যে 'মাভৈঃ' প্রবন্ধটি একটু অত্যুগ্রভাবে নীতিগ্রস্ত—ইহার সুর মাত্রাধিকভাবে আদর্শায়িত। ইহার ভাববৃত্ত কতকগুলি পরস্পর-বিচ্ছিন্ন চিন্তানুক্রমসূত্রে শিথিল-গঠিত, কেন্দ্রানুসরণে সুবলয়িত বা সহজ ছন্দ-পারম্পর্যে শিল্পগ্রথিত নহে। মৃত্যুর জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকিয়া সুখকে তুচ্ছ করা, আবার সেই সঙ্গে মরিতে শিখান নাই বলিয়া পিতামহদের বিরুদ্ধে অনুযোগ জানান যেন ভাবরাজ্যে গুরুচণ্ডালী দোষ, মহিমা ও মর্যাদাহীন অভিমানকে একসূত্রে গাঁথিবার উৎকটপ্রয়াস। অনুরূপভাবে, পতির চিতানলে স্বেচ্ছায় বা লোকলজ্জায় আত্মপ্রাণ-উৎসর্গকারিণী পিতামহীদের গৌরবঘোষণা ও যুদ্ধভীরু বাঙালীর সহিত সমরদক্ষ শিখের দুরতিক্রম্য ব্যবধানের জন্য ভারতীয় ঐক্যসাধনের ও স্বাধীনতালাভের বিলম্বে ক্ষোভ-প্রকাশ—এই দুইটি সম্পূর্ণ বিসদৃশ চিন্তার সংযোজনা মাত্রাজ্ঞানের অভাবই প্রকটিত করে। সর্বাপেক্ষা হাস্যকর অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে নির্ভীকতার মিথ্যা বড়াইএর দ্বারা কাপুরুষতার অপবাদ-খণ্ডনের নির্দেশে। লেখক তাঁহার সাময়িক উত্তেজনায় মনস্তত্ত্বের গোড়ার কথাটাই ভুলিয়াছেন যে যে জাতির মধ্যে ক্ষাত্র আদর্শ সত্যই সুপ্রতিষ্ঠিত নয়, সেখানে ভীরুতা ব্যক্তি-চরিত্রের কলঙ্করূপে গৃহীত হয় না। মোট কথা প্রবন্ধজাতীয় রচনার সুরসঙ্গতিতে এই সমস্ত বড় বড় নীতিতত্ত্ব, নানা বিভিন্ন চিন্তার মধ্যে অসম, অস্থির সংক্রমণ ও তাহাদের যেমন-তেমন করিয়া সংমিশ্রণকে মানান মনে হয়। এখানে সমস্ত উপাদান মিলিয়া কোন অখণ্ড ভাবের বাতাবরণ সৃষ্টি হয় নাই, নানা খণ্ড সুরের সমবায়ে একটি সমগ্র রাগিণী আমাদের চেতনার তারে ধ্বনিত হয় নাই। শেষ অনুচ্ছেদে লেখক তাঁহার অতীত যুগের পিতামহীদের সম্বোধন করিয়া যে প্রশস্তিবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন—"তোমার অক্ষয়-অমর স্মরণনিলয় বলিয়া সেই অগ্নিকে, তোমার সেই অন্তিম বিবাহের জ্যোতিঃসূত্রময় অনন্ত পট্টবসনখানিকে আমরা প্রত্যহ প্রণাম করিব"—তাহাই প্রবন্ধটির মূল সুর, কিন্তু ইহা আসিয়াছে অনেকটা আকস্মিকভাবে, নানা বিচিত্র, বিবাদী ধ্বনির কোলাহলের বাধা অতিক্রম

করিয়া ও এই অবাস্তবের গ্রাসে নিজ বিশুদ্ধ মাধুর্যের অনেকখানি বিসর্জন দিয়া। 'মাভৈঃ' নামের মধ্যে আমরা নীতিবিদ্ ও আদর্শবাদীর গম্ভীর অনুশাসন শুনি, প্রবন্ধশিল্পীর অন্তরঙ্গ সুর ও ভাবমুগ্ধতার উদ্দীপক রম্য কল্পনার স্বগতোক্তি নয়।

'বাজে কথা' (আশ্বিন, ১৩০৯) 'মাভৈঃ'-এর সম্পূর্ণ উল্টা দিকের কথা। 'মাভৈঃ'-এ লেখক যে মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন, 'বাজে কথা'য় তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত মনোভাবেরই উদ্ভাসন। একে যাহার প্রতিষ্ঠা, অপরটিতে তাহার গোটাগুটি অস্বীকৃতি ও অবলুপ্তি। 'বাজে কথায়' মৃত্যুর উত্তুঙ্গ মহিমা ও দুশ্চর কৃচ্ছ্র সাধনের পরিবর্তে আছে জীবনের সমস্ত আদর্শহীন, প্রয়োজনহীন, সহজ আনন্দরসের ভাবতন্ময় উপভোগ। এখানে স্বয়ংপ্রকাশ বিরল আত্মার স্নিগ্ধোজ্জ্বল দীপ্তিতে পরিণামবোধহীন মনুষ্যপতঙ্গের অগ্নিস্নান। যতক্ষণ মানুষ এই সৌন্দর্যের আবেশমুগ্ধ থাকে, ততক্ষণ তাহার তত্ত্ব বা মানবকল্যাণ বা উচ্চ নৈতিক আদর্শ প্রভৃতি সমস্ত বড় বড় ব্যাপারের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে। 'মেঘদূত' এইরূপ অনাবশ্যক কাব্যরচনার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। সমস্ত উদ্দেশ্যের বোঝা ফেলিয়া দিয়া এই মায়াতরীখানি কল্পনার পাল খাটাইয়া অনন্ত সৌন্দর্যের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, কর্তব্য-অকর্তব্য, অপরাধ-অভিশাপের ক্ষীণ কারণ-বৃন্তে এই নন্দন উদ্যানের অদ্ভুত ফলটি ঝুলিতেছিল, রবীন্দ্রনাথ সেই বোঁটার বন্ধনটিকেই কাটিয়া দিয়া ইহাকে বিশুদ্ধ কল্পনালোকের সামগ্রীতে রূপান্তরিত করিয়াছেন—লৌকিক জগতের সহিত ইহার শেষ সংস্পর্শটুকুও ছিন্ন করিয়াছেন। শকুন্তলার শাপের মত এই যক্ষ-শাপও এক রূপক সত্য মাত্র—মানবজীবনের অকারণ, অনিবার্য বিরহাকৃতির একটি সাংসারিক উপলক্ষ্য-কল্পনা। এই প্রেম যদি জগতের অমোঘ নীতি-বিধানের মাধ্যাকর্ষণপ্রভাবিত হইত, এই রত্ন যদি কার্যকারণশৃঙ্খলের এক অদৃশ্য-সুদূর প্রান্ত হইতে বিলম্বিত থাকিত, তবে পার্থিব প্রয়োজনের ত্বরাতাড়িত, নীতিশাসিত মনের অসংজ্ঞান জাড়্য উহার আত্মিক সত্তার আদর্শ সুষমাকে কোন না কোনরূপে ক্ষুণ্ণ করিত। বিরহের আত্মা বিরহের দেহকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া একান্ত স্বাধীন মানস-বিহারে নিজ প্রকৃতিকে উন্মোচিত করিয়াছে। এই যাত্রার কোন লক্ষ্য বা পরিণতি নাই বলিয়াই ইহার কোন বিরতি বা শেষ নাই ; কোন ঔচিত্যবোধ, বিবর্তনের কোন ক্রান্তিসীমা এই সৌন্দর্যাভিসারের সমাপ্তি ঘোষণা করে নাই। লেখক এই কাব্য হইতে

মাত্র দুইটি তথ্য আহরণ করিয়াছেন, মানবজীবন ও ঋতুচক্রের অনবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা।

'বাজে কথা'য় লেখক আর একটি মন্তব্যে 'মাভৈঃ'-এ অনুসৃত পদ্ধতির উপর কটাক্ষপাত করিয়াছেন। 'মাভৈঃ'-এ তিনি উচ্চ অঙ্গের কথা বলিয়া ও 'আবহমান কালের পরীক্ষিত সর্বজনবিদিত সত্যঘোষণায় প্রবৃত্ত' থাকিয়া চাণক্যশ্লোকের যে ব্যক্তি নীরব থাকিয়াই তাঁহার সভাযোগ্যতার পরিচয় দেন তাঁহার সহিত সমধর্মিত্ব মানিয়া লইয়াছেন। অর্থাৎ পরের উপলব্ধ সার্বভৌম সত্য আওড়ানই যে নীরবতার নামান্তর ও সহজ কথার ও নূতন সত্যের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশই যে সভ্যজনোচিত বাক্‌পটুতার একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রমাণ তাহা প্রায় স্পষ্টাক্ষরেই ঘোষণা করিয়াছেন। 'বাজে কথা'র মধ্যেই 'মাভৈঃ'-এর সার্থক সমালোচনা নিহিত আছে।

'পরনিন্দা' প্রবন্ধে (অগ্রহায়ণ, ১৩০৯) জীবনসত্যের নূতন দিকের পরিচয় উদ্‌ঘাটন করার মধ্যে লেখকের যে মৌলিক, সরস সমীক্ষাশক্তি ও পাঠকের যে বিস্ময়মিশ্র তৃপ্তির আয়োজন থাকে তাহা চমৎকারভাবে পরিস্ফুট। সাধারণতঃ নীতিশাস্ত্রের বিচারে পরনিন্দাপ্রিয়তা মানব-প্রকৃতির ঈর্ষা ও বিদ্বেষ প্রভৃতি নিন্দনীয় বৃত্তির লক্ষণরূপেই নির্ধারিত হইয়া থাকে। ইহা ব্যঙ্গরচনার একটি বহুধা-উদাহৃত প্রেরণা যোগাইয়া থাকে। পরনিন্দার আলোচনায়, নীতিশাসিত মন নিন্দুককে নিন্দা করিবার একটা সুন্দর উপলক্ষ্য সংগ্রহ করে। মঙ্গলকাব্যে এয়োগণের পতিনিন্দা অপরের স্বামি-সৌভাগ্যে ঈর্ষাপরায়ণা পল্লীরমণীদের অন্তরদুর্বলতার নিদর্শনরূপে গূঢ় ব্যঙ্গের বিষয়ীভূত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে রসদৃষ্টির সার্থক প্রয়োগে এই অতি-ব্যবহারজীর্ণ প্রথানুসৃতি অতিক্রম করিয়া ভাবের উর্ধ্বলোকে উঠিয়াছেন। তিনি পরনিন্দার সাধারণ কারণগুলিকে অগ্রাহ্য করিয়া গূঢ়তর মনস্তত্ত্বের উপর আলোকসম্পাত করিয়াছেন। নিন্দা লবণ-সমুদ্রের ন্যায় সমস্ত সংসারকে বেষ্টন করিয়া মনের এক দুনিরীক্ষ্য হিতসাধন করিতেছে। নিন্দার প্রকৃত উদ্দেশ্য পাপের সংশোধন নয়, পুণ্যকর্মের প্রতি গৌরবদান। ঈর্ষার কণ্টকবন উত্তীর্ণ হইয়াই সাধুতার পুষ্প পরিপূর্ণ সৌরভে বিকশিত হয়। হৃদয়বানের ব্যথা-বেদনা তাহার লোকহিতকর কর্মের মূল্যবৃদ্ধি করে। লেখক এমন কথাও বলিয়াছেন যে নিন্দা মহত্তেরই প্রাপ্য, অযোগ্য ক্ষুদ্র পাত্রে উহার প্রয়োগ অপব্যয় মাত্র

সমাজনীতি পুনরায় বলিবে যে নিন্দার সামাজিক উপকারিতা উহার যাথার্থ্যের উপর নির্ভরশীল, বিদ্বেষপ্রণোদিত মিথ্যা নিন্দা সর্বথা বর্জনীয়। রবীন্দ্রনাথ আবার এই নৈতিক অনুশাসনের প্রতি তাঁহার অসমর্থন জানাইয়াছেন। প্রমাণসমর্থিত কুৎসা প্রকৃতপক্ষে বিচার, এবং বিচারের গুরুভার নিন্দিত ব্যক্তির পক্ষে অসহনীয় হইবে। যে নিন্দা আপাত-গুরু, কিন্তু বস্তুতঃ লঘু তাহাই সমাজের প্রয়োজনসাধনের পক্ষে যেমন, নিন্দার পাত্রের মানসিক স্বস্তিরক্ষার পক্ষেও সেইরূপ, উপযোগী। সংসারটাকে বিচারালয় বানাইলে তাহা সকলের পক্ষেই শ্বাসরোধী ও অস্বস্তিকর হইয়া উঠে। সুতরাং অকারণ, দায়িত্বহীন নিন্দাই সমাজের বায়ু-চলাচলকে বাধাহীন ও সুখস্পর্শ রাখে।

নীতিবিদ এখনও নিরস্ত হন নাই। তিনি তাঁহার তূণ হইতে তৃতীয় অস্ত্রটি বাহির করিলেন। 'নিন্দা কর, কিন্তু নিন্দিতের প্রতি সমবেদনা দেখাও, উহা উপভোগ করিও না"। এমন একটি নির্দেশ বাস্তব জীবনে সর্বথা অপ্রযোজ্য। শঙ্করাচার্যের 'মোহমুদ্গর'-এ ইহা মানাইবে, কিন্তু নানা রসসংমিশ্রণে বিচিত্রস্বাদ এই সংসারে এই কল্পলোকসিদ্ধ ফলের স্থান নাই। এই তীক্ষ্ণ-রসাল পরচর্চা যদি সমাজ হইতে নির্বাসিত হয়, তবে উহার একটি মূল উপভোগের ধারাই শুষ্ক হইয়া যাইবে। এতদ্ব্যতীত লেখক আর একটি মৌলিক যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। মানুষ নিষ্কামভাবে, আনন্দের উত্তেজনা ছাড়াই পাপ করিবে ইহাই যদি সম্ভব হয়, তবে মনুষ্যজীবনের এই ভয়াবহ পরিণতি সকলকেই সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিবে।

আরও একটি গভীরার্থক মন্তব্যে রবীন্দ্রনাথ বিষয়টিকে মননসমৃদ্ধ করিয়াছেন। মানুষের গোপনের প্রতি একটা মোহ ও প্রকাশ্যের প্রতি একটা অনাদর আছে। এইজন্যই মানবচিত্তের গুহাহিত রহস্যলোকেই তাহার সত্য পরিচয় প্রচ্ছন্ন আছে এইরূপ ধারণা তাহার মনে একটা দৃঢ় প্রত্যয়ের রূপ লইয়াছে। তাহার শিকার-প্রবৃত্তি এই অনায়ত্তের অনুসরণ-সঞ্জাত; প্রত্যক্ষ সত্যের অপেক্ষা ভূগর্ভস্থ মূলের প্রতিই তাহার আকর্ষণ বেশী; কাব্যের সরল সৌন্দর্য অপেক্ষা উহার রূপক তত্ত্বব্যাখ্যা উহাকে বেশী মুগ্ধ করে। যে নিন্দুক সে মানুষের এই সহজাত অন্বেষণ-প্রবৃত্তিরই অনুশীলন করে। সে দৃশ্যমান আচরণ অপেক্ষা সযত্ন-সংবৃত ও নির্জন-প্রকটিত মানস-প্রবণতার সাক্ষ্যের উপরেই অধিকতর গুরুত্ব দেয়। সম্ভাব্য প্রবঞ্চনা হইতে

আত্মরক্ষার মর্যাদাবোধই তাহাকে এই ভূগর্ভখননে ও দুরূহ সত্য-আহরণে প্ররোচিত করে।

সর্বশেষে লেখক বলিয়াছেন যে অহেতুক নিন্দাপাত্র হইতে বিদ্বেষ-প্রভাবিত নিন্দুকই আরও বেশী সমবেদনা-উদ্রেকের অধিকারী।

প্রবন্ধটি প্রতি পদে সাধারণ হইতে অসাধারণ চিন্তাপথে পাঠককে পরিচালিত করিয়া ও নীতিশাসনমুক্ত, সমবেদনাস্নিগ্ধ জীবনরসের পরিচয় দিয়া একটি আদর্শ রচনাপর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে।

'পনেরো আনা' (মাঘ, ১৩০৯) অপূর্ব সরস ভাবরমণীয়তা ও বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের দ্বারা সংসারে অখ্যাত অনাবশ্যকের মহিমা ঘোষণা করিয়াছে। জীবনে নীতির অভিভবকে লেখক এখানেও প্রতিরোধ করিয়াছেন। যেমন প্রাণিদেহে অলঙ্করণবাহুল্য দিয়া সৃষ্টিকর্তার ঐশ্বর্য-উদারতাই অনুমিত হয়, তেমনি মানবসংসারের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অপ্রয়োজনীয় মানুষ তাহাদের গৌরবহীনতার মধ্য দিয়াই সৃষ্টিপ্রেরণার অফুরন্ত বৈচিত্র্য ও অজস্রতার পরিচয় বহন করে। উভয় ক্ষেত্রেই বিভিন্ন উপায়ে একই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে। পশুপক্ষীর ক্ষেত্রে অনাবশ্যক দেহশোভার আতিশয্য আর মানুষের ক্ষেত্রে সৃষ্টিক্রিয়ায় আপাত-উদ্দেশ্যহীন অপচয়শীলতা ভগবানের বে-হিসাবী, বর্ণ-বিলাসে ও ইচ্ছার অকুণ্ঠিত প্রয়োগে লীলাময় সত্তার সাক্ষ্য দিতেছে।

জগতের হিতসাধন নীতিবিদের নিকট খুব প্রিয়, কিন্তু সাধারণ মানুষের নিকট অনেকটা অস্বস্তিকর। সুতরাং উপকারক অপেক্ষা নিষ্কর্মা লোকই সমাজের আনন্দবর্ধনের জন্য অধিকতর উপযোগী। উপকারককে আমরা উপকার দিয়াই চিনি, তাহাদের অন্তরের পরিচয় মোটেই সুলভ নয়। আর যে নিষ্কর্মার দল আমাদের প্রাত্যহিক আনন্দের সঙ্গী, তাঁহাদের হৃদয়ের সবটুকু উত্তাপ ও সৌরভ আমরা সমস্ত অন্তর দিয়া গ্রহণ করি।

যাঁহারা খ্যাতিমান তাঁহারা জীবনে ও মৃত্যুর পরেও বিশেষ অধিকার দাবী করিয়া জনসাধারণকে তাহাদের ন্যায্য অংশ হইতে বঞ্চিত করেন। ইঁহারা জীবনে রিজার্ভ গাড়ীর আরোহী ও মরণে মর্মরস্মৃতিস্তম্ভ দ্বারা পরলোকের সবটুকু জায়গা জুড়িয়া বসেন। সুতরাং বিধাতার ন্যায়বিচার অধিকাংশ লোককে স্মরণের অযোগ্য করিয়া সৃষ্টি করিয়া স্থান-সঙ্কুলানের সমস্যা সমাধান করিয়াছে। এই নামহীন পনেরো-আনা লোক না জানিয়া সৃষ্টির নিগূঢ় অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতেছে।

কিন্তু ইহকালেও কাজ করার তাগিদ ক্রমশঃ উগ্র হইতে উগ্রতর হইয়া উঠিতেছে। নীতিজ্ঞের নিখুঁত ব্যবস্থায় কাজের মূল্যে জীবনের অধিকার অর্জন করিতে হইবে। লেখক এই সঙ্কীর্ণ নীতি সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়াছেন ও জীবনযাত্রার সমস্ত মহিমা, জীবন-সঙ্গীতের সমস্ত মাধুর্য এই ব্যর্থ জনসংঘের পটভূমিকা হইতেই উদ্ভূত, তাহারাই এ জীবন-যজ্ঞের মুখ্য ফলভোগী—তাহাদের পক্ষে এইরূপ দাবী উত্থাপন করিয়াছেন।

এই পনেরো-আনা লোকই জীবন-প্রবাহকে সচল রাখিতেছে। সংসারের সমস্ত গতি, সমস্ত গান, সমস্ত উৎসবানন্দ, উহার মিলন-বিরহের সমস্ত ক্ষণিক উচ্ছ্বাস, হাসি-কৌতুকলীলা, সবই এই ব্যক্তিসঞ্চয়হীন, সমষ্টিধারার সহিত একীভূত, সমবেত প্রাণবেগতাড়িত মানবসমাজেরই শক্তিবিচ্ছুরণ। মানবের এই ব্যর্থতা প্রকৃতির বিরাট অপচয়ের দ্বারা সমর্থিত ও উহারই সঙ্গে সমসূত্রে গ্রথিত। পৃথিবীর অগ্রগতির পক্ষে এক-আনা অপেক্ষা পনেরো-আনা অনেক বেশী প্রয়োজনীয়। ধান না হইলেও বাঁচা যায়, কিন্তু ঘাস না থাকিলে পৃথিবীর রূঢ় আবরণ স্পর্শযোগ্য হয় না। ঘাস যদি ধান হইবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করে তবে কুশের তীক্ষ্ণাগ্র ঔদ্ধত্যে উহার অবাঞ্ছিত পরিণতি।

এমন কি লেখক এই প্রসঙ্গে ভগবানের অবতারের নূতন কারণ নির্দেশ করিয়া প্রচলিত নীতি-সংস্কারের প্রতি চরম কটাক্ষ হানিয়াছেন। পৃথিবী সত্য সত্যই পীড়িত হয় পাপের প্রাদুর্ভাবে নয়, বিশ্বোপকারব্রত নেতৃবৃন্দের দম্ভস্ফীত কর্মোন্মাদের আতিশয্যে এবং ইহাদেরই অত্যাচার হইতে পৃথিবীর রক্ষাই ভগবানের অবতরণের উপলক্ষ্য।

বাতাসে দহনশীল অক্সিজেনের সহিত স্থিতিশীল নাইট্রোজেনের যে অনুপাত, আমাদের সংসারবাতাবরণের ভারসাম্য রক্ষার জন্য এক-আনা পনেরো-আনার মধ্যে সেইরূপ পরিমাণগত অনুপাতই কাম্য।

ভাবুকতাধর্মী রচনার ধারা রবীন্দ্রনাথের 'বিচিত্র প্রবন্ধ' অতিক্রম করিয়া আর পরবর্তী কাল পর্যন্ত প্রবাহিত হয় নাই। ইহার কারণ-অনুসন্ধানেও কোন সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌছান যায় না। রবীন্দ্রনাথের এই রচনাগুলি তাঁহার চল্লিশ বৎসর বয়সের কাছাকাছি লেখা। এই চত্বারিংশৎ বর্ষ কবির যৌবন ও প্রৌঢ়ত্বের সন্ধিক্ষণ, তাঁহার কল্পনালীলা ও জীবনপ্রজ্ঞার অপূর্ব সমন্বয়, শরতের স্বচ্ছদৃষ্টিশাসিত বসন্তবিহ্বলতার

নিদর্শন। এই স্তরে পৌঁছিয়া লেখক মনন ও আবেগকে একই ভাবের আধারে যৌগিক সত্তায় একীভূত করিয়াছেন, গড়্পড়তা অভিজ্ঞতার অনুশাসনের উপর নিজস্ব মৌলিক অনুভূতি ও বিচারবুদ্ধির জয়পতাকা উড়াইয়াছেন, গভীরস্তরশায়ী জীবনসত্যকে একদিকে লঘু রসকল্পনা অন্যদিকে প্রজ্ঞাদৃষ্টির সংমিশ্রণে উপভোগ্যরূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন। লেখকের জীবনে এই প্রজ্ঞাঘন ক্ষণবসন্তের উচ্ছ্বাস দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই; পরবর্তী কালে এই বিরললভ্য সংশ্লেষ আবার উপাদানবিশ্লিষ্টতায় নিবিড়তা হারাইয়াছে। অখণ্ড কাব্যমনস্কতায় লেখকের গদ্য তাঁহার সূক্ষ্ম চেতনার বাহন না হইয়া তাঁহার প্রয়োজনের তীক্ষ্ণ তাগিদ মিটাইবার উপায়-স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে ও উহার শিল্পরূপ উদ্দেশ্যপরতন্ত্রতার তুলনায় গৌণ স্থান অধিকার করিয়াছে। লেখকের মানসসরসতা ও কল্পনালীলা গদ্য ছাড়িয়া গদ্যকবিতা বা লঘু হাস্যরসের কবিতায় খাতে প্রবাহিত হইয়াছে। ক্রমশঃ উপচীয়মান ধর্মবোধ, চিন্তাধারার বিশ্বপটভূমিকায় ক্রমবিস্তার ও দার্শনিক মননের প্রাধান্যও কবিমনের এই গদ্যপরিবেশিত রসধারা শুষ্ক হইয়া যাওয়ার অতিরিক্ত কারণরূপে নির্দেশিত হইতে পারে। কারণ যাহাই হউক, "বিচিত্র প্রবন্ধ"-জাতীয় রচনা রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ-প্রসারিত, দ্বিতীয়ার্ধ সাহিত্যজীবনে আর পুনরাবৃত্ত হয় নাই।

৩

খ. সাহিত্যসমালোচনা

(১) গ্রাম্য সাহিত্য

লোকসাহিত্যের অন্তর্গত এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ পাবনা জেলার পদ্মাবক্ষে গ্রাম্য লোকের দ্বারা বাহিত একখানি ডিঙ্গী নৌকা হইতে শ্রুত একটি পল্লীসঙ্গীতকে উপলক্ষ্য করিয়া সমস্ত গ্রাম্য সাহিত্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ ও উচ্চ সাহিত্যের সহিত উহার সম্পর্ক নির্ণয় করিয়াছেন। এই গ্রাম্য সাহিত্যে কোন উচ্চ ভাব নাই, তবে ছন্দ ও সুরের একটা ন্যূনতম দোলা আছে। পল্লীকবির কল্পনাপ্রসার নাই, কিন্তু পল্লীজীবনের

ক্ষুদ্র, খণ্ডিত, বিক্ষিপ্ত কর্মধারার সঙ্গে একটা নিগূঢ় মর্মগত ঐক্য আছে। এই তুচ্ছ গানের মধ্যে সমস্ত জনপদের মর্মবাণী ধ্বনিত হইয়া উঠে। গ্রামের ছবি, গ্রামের স্মৃতি ইহার সামান্য কথাগুলির ভাঁজে ভাঁজে জড়িত হইয়া এক প্রকারের রস সৃষ্টি করে, যাহা পিতামহীর মুখের ছড়া ও ভিক্ষার্থিনী বৈষ্ণবীর অতি পুরাতন রাধাকৃষ্ণপ্রেমসঙ্গীতের মোহের সহিত তুলনীয়। উচ্চ সাহিত্যে যাহার আকাশাভিমুখী শাখাবিস্তার গ্রাম্য সাহিত্যে তাহারই মাটির রসবাহী শিকড়জাল। এই গানগুলি যখনই রচিত হউক, ইহারা পল্লীব অপরিবর্তিত প্রাণকেন্দ্রের সহিত যুক্ত বলিয়া ইহাদের উপর অতীতের স্নিগ্ধচ্ছায়া চিরবিরাজিত। এতদিনে আধুনিকতার নবপ্রবাহিত উত্তরবায়ুতে এই কবিতার দলগুলি শুষ্ক শীর্ণ হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

ইহার পর লেখক বৈষ্ণব কবিতায় আদর্শবাদ ও শিবদুর্গাবিষয়ক কবিতায় বাস্তব সমাজানুবর্তিতার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করিয়াছেন। বৈষ্ণব প্রেমকবিতা অসামাজিক প্রণয়াকর্ষণকে আদর্শায়িত করিয়া উহাকে সমাজনিন্দার ঊর্ধ্বে মনের কল্পসৌন্দর্যলোকে স্থান দিয়াছে। বিদ্যাসুন্দর কাব্যে মানবপ্রকৃতি সমাজের এই ব্যর্থ অবদমনপ্রয়াসকে ব্যঙ্গবিড়ম্বিত করিয়াছে। বৈষ্ণব কাব্যে যাহা আদর্শায়িত, বিদ্যাসুন্দরে তাহাই উপহসিত। হরগৌরীবিষয়ক কবিতাতে বাঙালী গৃহস্থ ঘরের প্রধান অভিশাপ দারিদ্র্য—একসঙ্গে স্নিগ্ধ কৌতুকহাস্যে বর্জনীয় ও মহিমারূপে অর্চনীয় প্রতিপন্ন হইয়াছে। বৈষ্ণব পদাবলীতে প্রেমের বিশ্বব্যাপকতা ও সমস্ত বন্ধনচ্ছেদী গতিবেগ ও শাক্ত কবিতায় বাস্তব স্বীকৃতির মধ্যে অলৌকিক মাহাত্ম্যের আবিষ্কার উদাহৃত।

প্রবন্ধটির সর্বাপেক্ষা মূল্যবান অংশ লোককল্পনার দ্বারা এই বিষয়-গৌরবের এক দিকে ভাবগত অবনমন, অন্যদিকে পল্লীহৃদয়ের স্নেহ-সুকোমল স্পর্শের সংযোগসাধনের উদাহরণ-সাহায্যে প্রতিপাদন। শিব-দুর্গাবিষয়ক কবিতায় বাঙালী মাতার প্রবাসী কন্যার জন্য বিচ্ছেদ-কাতরতা একটি করুণ, অশ্রুপূর্ণ আবেদন সঞ্চার করিয়াছে। এই স্বামি-গৃহনির্বাসিতা কন্যাকে পিত্রালয়ে আনার জন্য মাতার স্বামীর প্রতি অভিমানসিক্ত অনুযোগ, কিছুটা উদাসীন পিতার জামাতৃগৃহযাত্রা, সেখানে বাপ-মেয়েতে ছদ্মকলহের পর মধুর আতিথ্যভরা তৃপ্তি-রসাস্বাদ,

শিবের অনিচ্ছাকুণ্ঠিত সম্মতি, বাপের বাড়ীতে মায়ে-মেয়েতে মান-অভিমানের প্রলেপ-দেওয়া মিলনের গভীর আনন্দভোগ, শিবের দুর্গাকে ফিরাইয়া আনিতে শ্বশুরালয়ে গমন ও ক্ষীণ আপত্তির পর মেনকার অনিবার্যের নিকট আত্মসমর্পণ—এই সমস্ত বর্ণনার মধ্যে ভক্তিরসের সঙ্গে গার্হস্থ্যরসের কি সুনিবিড় একাত্মতা ফুটিয়া উঠিয়াছে, দেবমহিমা কি অপূর্ব বাৎসল্যরসসিক্ত হইয়াছে! পার্বতীর শাঁখা পরিতে চাওয়া, দারিদ্র্যের অজুহাতে শিবের অক্ষমতাজ্ঞাপন, দেবীর অভিমানে পিতৃগৃহ-গমন, শিবের শাঁখারির ছদ্মবেশে দেবীর অনুগমন, শাঁখা পরিতে দেবীর কষ্ট ও শেষে ধ্যানযোগে শাঁখারির স্বরূপ-উপলব্ধি—এই দারিদ্র্যলাঞ্ছিত দাম্পত্যকলহপ্রখর সংসারচিত্রের মধ্যে দেবমহিমার কি তির্যক স্ফুরণ, কি নিগূঢ় ছদ্মবেশসংবৃতি! রবীন্দ্রনাথ কৈলাস ও হিমালয়কে আমাদের পানাপুকুরেব ধারে, আমাদের আমবাগানের সঙ্গে সম-উচ্চতায় স্থাপিত দেখিয়াছেন। কিন্তু ইহা হইতে দেবমর্যাদার অবনতিসূচক যে সিদ্ধান্তে তিনি পৌঁছিয়াছেন তাহা সর্বতোভাবে সত্য না হইতে পারে। যে পানাপুকুরে হিমালয়শৃঙ্গ প্রতিবিম্বিত হয়, যে আমবাগান দেবলোকের উত্তুঙ্গতার কল্পনা জাগায়, যে সাধারণ জীবনযাত্রার মধ্যে অসাধারণের ব্যঞ্জনা মুহুর্মুহুঃ আমাদিগকে অধ্যাত্ম গৌরবের স্পর্শ অনুভব করায়, তাহা সত্যই শ্লাঘনীয়। কেননা ইহাদের অধিবাসীরা মাটি হইতেই আকাশকে নিজেদের অনুভূতির মধ্যে ধরিয়া রাখিতে পারে।

রাধাকৃষ্ণপ্রেমবিষয়ক গ্রাম্য ছড়া, কবিয়ালদের হাতে কিছুটা বিকৃত হইলেও, মোটের উপর মূল বৈষ্ণব পদাবলীর ভাবমাধুর্য আশ্চর্যভাবে রক্ষা করিয়াছে। এইসব পল্লীকবিদের ভক্তিপূত, নির্মল অন্তঃকরণে এই দিব্য প্রেমের সূক্ষ্ম সৌকুমার্য একপ্রকার সহজ, শিল্পবোধনিরপেক্ষ অনুভব-সংস্কারের কোমল আধারে প্রায় বিশুদ্ধভাবেই বিধৃত হইয়াছে। মথুরাপ্রবাসী কৃষ্ণকে বিরহিণী রাধার সহিত মিলিত করিবার উদ্দেশ্যে বৃন্দাদূতীর অভিযান, রাজসভার ঐশ্বর্যের মধ্যে ব্রজভাবের নিঃশঙ্ক প্রকাশের, ভক্তি ও প্রেমের দাবীতে বিনীত স্পর্ধাভিযোগের উপলক্ষ্য সৃষ্টি করিয়া বৃন্দাবনলীলা-তাৎপর্য যে অশিক্ষিত গ্রাম্য কবির কতটা অস্থিমজ্জাগত হইয়াছে তাহার চমৎকার প্রমাণ দিয়াছে। আর একটি ছড়ায় সুবল শ্রীকৃষ্ণকে আপাদমস্তক বনফুল-আভরণে সজ্জিত করিতে গিয়া রাধা ব্যতিরেকে এই

ফুলসাজ যে অসম্পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণের এই অনুযোগে অকস্মাৎ নিজের ত্রুটি সম্বন্ধে সচেতন হইল। এই ফুলের মেলায় বৃন্দাবনের শ্রেষ্ঠ ফুলের অভাব কিশোর প্রেমিকের সৌন্দর্যরুচিকে পীড়িত করিল। সুবল রাধার খোঁজে গেল ও রাধাকেও কৃষ্ণমিলনের জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতা দেখিল। রাধা শীঘ্রই আভরণ-সজ্জিতা হইলেন, কিন্তু সুপ্রসাধিতা নায়িকা নায়কের জন্য দুইটি বিশেষ উপহার লইয়া চলিলেন—এক, স্বহস্তগ্রথিত ফুলহার, দ্বিতীয় ধেনুচারণরত রাখালরাজের সহিত একাত্মতার প্রতীকস্বরূপ সন্তর্পণে ক্রোড়বাহিত একটি বৎস। হার হয়ত প্রেমিকের অভ্যস্ত প্রণয়প্রকাশচিহ্ন। কিন্তু গ্রাম্য কবি ছাড়া আর কে দধি-দুগ্ধের পসরার সহিত সদ্যোপ্রসূত, ফেন-ধবল ধেনু-বৎসের মধ্যবর্তিতার কল্পনা করিতে পারিত? রাধিকার রূপধ্যানতন্ময় কৃষ্ণের চেতনা সম্পাদন করিতে রাধিকা যে আত্মপরিচয় দিলেন, তাহা সমগ্র বৈষ্ণবদর্শনের সারতত্ত্বনির্যাস—'যে ভাব পড়েছে মনে সেই ভাব আমি'। রাধা কোন স্বতন্ত্র সত্তা নহেন—কৃষ্ণের অন্তর্লালিত ভাবের বহিঃপ্রকাশ মাত্র, বহিরাগত হিয়ার পুত্তলি। ইহার পরে ভাণ্ডীরবনে যুগল-সম্মিলন। গ্রাম্য কবির কল্পনা এখানে মহাজন-কল্পনার সহিত কিরূপ নিশ্চিহ্নভাবে মিশিয়া গিয়াছে—মহাকবিকৃত, বর্ণে ও রেখায় সুসমৃদ্ধ চিত্রের মধ্যে পল্লীকবির অপটু হাতের ভাব-আল্পনা কিরূপ সঙ্গতভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে!

'বাউলের গান' (রবীন্দ্ররচনাবলী—জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ) 'সমালোচনা' অধ্যায় হইতে সংকলিত[১]। ইহাতেও বাউলসঙ্গীত আলোচনা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের লোকসাহিত্যের প্রতি অনুরাগ শতধারায় উচ্ছ্বসিত হইয়াছে। বাউলের গানের মধ্যে বাঙালীর নিজস্ব ভাব ও ভাষা, কোন অনুকরণ-পীড়িত না হইয়া, স্বাধীন মর্যাদায়, নিজ অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তির বেগে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সাধারণতঃ আধুনিক বাংলা লেখা হয় সংস্কৃত না হয় ইংরাজির অনুকরণে। উহা পড়িয়াই মনে হয় যে বাঙালীর হৃদয়ে উহাদের জন্ম হয় নাই, উহারা অন্য সাহিত্যের প্রতিধ্বনি মাত্র। আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায় সর্বজাতির সমপ্রাণতার স্বপ্নে বিভোর—তাঁহারা নিজের জাতির কোন বৈশিষ্ট্য স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত। কিন্তু

[১] ইতিপূর্বে ৩ পৃষ্ঠায় 'বাউল সঙ্গীত' নামে উল্লিখিত।

সর্বমানবিক ঐক্য একাকারত্ব নয়, বৈচিত্র্যের মধ্যে সূক্ষ্মতর মিলনের অনুভূতি। ইহা না হইলে বিভিন্ন জাতির মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের মুক্ত বায়ু প্রবাহিত হইতে পারিত না। প্রত্যেক জাতির মনে যে বিশিষ্ট ভাবাসঙ্গ বিদ্যমান তাহা আক্ষরিক অনুবাদের দ্বারা অনধিগম্য। সুতরাং যে বাউল গানে বাঙালীর ভাব ও ভাষার স্বচ্ছন্দ, স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ, তাহা বর্তমান অনুকরণের যুগে সাহিত্যের এক মহামূল্য সম্পদ।

ইহার পর লেখক কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধার করিয়া বাউল সাধনার ও দৃষ্টিভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য ও বাউল প্রকাশরীতির অকৃত্রিম শক্তি ও সরলতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। যে সার্বভৌম প্রেমের কথা আমরা পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের মাধ্যমে শুনিয়াছি, সেই প্রেমের আত্মবিলোপ ও অধ্যাত্ম প্রযোগ বাউল নিজ অনুভূতি দিয়া নূতন করিয়া আবিষ্কার করিয়াছে। এই প্রেমের বেতার-সংযোগে যে বিশ্বব্যাপী প্রেমের রহস্য আমাদের বৈষ্ণবধর্মসাধনার যন্ত্রে এক বিরাট ঐকতান তুলিয়াছে তাহাও বাউল কবি আমাদের জানাইয়াছে। আত্মকেন্দ্রিকতার সঙ্কীর্ণতা অতিক্রম করিয়া জগৎ-জোড়া প্রেমের জালে ধরা দেওয়াই যে প্রেমসাধনার পরম সিদ্ধি. জগতের সহিত এই সহজ মিলনের ভিতর দিয়াই যে আমাদের আত্মার পূর্ণ সার্থকতা এই নিগূঢ় তত্ত্বও বাউল-গানের রূপক-ব্যঞ্জনার মাধ্যমে অবলীলাক্রমে ব্যক্ত হইয়াছে। অতীতের সঙ্গে বর্তমানের অ-বিচ্ছিন্ন মিলনের দ্বারাই যে প্রাচীন ঐতিহ্য আমাদের নিকট জীবন্ত সত্যরূপে প্রতিভাত হইতে পারে, বৃন্দাবনের প্রকৃতি-সৌন্দর্যের চিরশ্যামলতা আমাদের আঁখিতে স্নিগ্ধ অঞ্জন বুলাইতে পারে, আধুনিক বৃন্দাবনযাত্রীর পূর্ব-আনন্দ-অনুভবে অক্ষমতার জন্য বিলাপই তাহার প্রমাণ। অতীতের রসধারা বর্তমানের প্রণালী বাহিয়া আমাদের জীবনকে স্নিগ্ধ, ভাব-নন্দিত করিতে পারে না বলিয়াই, পূর্ব বৃন্দাবনের তরুলতা শুষ্ক, উহার প্রকৃতি-পরিবেশ আমাদের নিকট আবেদনহীন।

সর্বশেষে লেখক অনুযোগ করিয়াছেন যে প্রকাশক প্রাচীন বাউলগান-সংগ্রহের মধ্যে আধুনিক ব্রহ্মসংগীত ও ইংরাজিনবিশদের রচনাকে স্থান দিয়াছেন। ইহাতে সংগ্রহের সুর কাটিয়া গিয়াছে। ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথ লোকসাহিত্যানুরাগী রবীন্দ্রনাথের নিকট যে তিরস্কার লাভ করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের অনুরাগের অকৃত্রিমতা ও একনিষ্ঠতার ইহা অপেক্ষা আর কি প্রকৃষ্টতর প্রমাণ হইতে পারে?

১৩০৫ সালেই রবীন্দ্রনাথের লোকসাহিত্য-আলোচনার অবসান ঘটিয়াছে। আন্তর্জাতিকতা ও ধর্মবোধের প্রবলতর আকর্ষণে তিনি আর পল্লীগীতির ভাঙাচোরা আসরে ফিরিবার সময় পান নাই। লোকসাহিত্য এখন সম্পূর্ণভাবে বৈজ্ঞানিক গবেষণাকবলিত।

(২) গ্রন্থসমালোচনা

মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস (শ্রাবণ, ১৩০৫), আকার ও নিরাকার (আশ্বিন, ১৩০৫) প্রবন্ধদ্বয় দুইখানি গ্রন্থকে অবলম্বন করিয়া লেখা হইলেও প্রকৃতপক্ষে সাহিত্য-সমালোচনার পর্যায়ভুক্ত নয়, ইতিহাস-প্রতিবেশ ও ধর্মতত্ত্বের আলোচনা। প্রথমোক্ত গ্রন্থপ্রসঙ্গে লেখক মুসলমানের নবোদিত, বিজিগীষু শক্তির সহিত তুলনায় হিন্দু রাজ্যসমূহের দুর্বল নিস্পৃহতার তুলনা করিয়াছেন ও এই উপলক্ষ্যে শক্তিমান, আত্মপ্রসারশীল রাজনীতি ও আত্মসন্তুষ্ট, শান্তিপ্রিয়, নিষ্ক্রিয় রাজনীতির আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করিয়াছেন। আপাততঃ নির্লোভ শান্তিপ্রিয়তা উদারতর আদর্শ বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু অলস অকর্মণ্যতা হইতে জাতীয় জীবনের কোন শুভ ফল প্রত্যাশা করা যায় না। পক্ষান্তরে শক্তিমদমত্ততা প্রশমিত হইলে নবশক্তিসঞ্চারের হেতু হইতে পারে। দেবাসুরের দ্বন্দ্বে দানবেরা একেবারে ঘুমাইয়া পড়িলে, দেবতারাও খুব সজাগ থাকেন না। সুতরাং 'মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস'-পাঠে মুসলমান বিজয়ীদের যতই রক্ত-লোলুপতা প্রকাশ পাক না কেন, তাহার অজেয় প্রাণশক্তি সুসংস্কৃত হইলে কল্যাণের হেতু হইবে। দানবতা অধিকারী হিসাবে ভাল নয়, কিন্তু প্রহরী হিসাবে তাহার কিছুটা উপযোগিতা থাকিতে পারে।

দ্বিতীয় গ্রন্থটিও সম্পূর্ণভাবে লেখকের তত্ত্বালোচনার উপলক্ষ্য হইয়াছে। গ্রন্থকার নিরাকার-উপাসনার অসম্ভাব্যতার ভিত্তিতেই সাকারের পক্ষে যুক্তিপ্রয়োগ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ এই মনোভাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। আকার মনের পক্ষে সুগম, কিন্তু নিরাকার-কল্পনার মাধ্যমেই ভগবৎ-স্বরূপ আমাদের নিকট যথার্থতরভাবে প্রতিভাত হয়। মহৎ আবেষ্টনের মধ্যে ভগবানকে স্থাপন করিয়া তাঁহার উপলব্ধির ব্যর্থ

প্রয়াসও আমাদিগকে তাঁহার প্রতি বেশী অগ্রসর করে। তাঁহাকে মনের মাপে ছোট করিয়া দেখিলে তিনি চির-অপ্রাপ্যই থাকিবেন ও আমাদের ধর্মসাধনা পারলৌকিক বৈষয়িকতায় পর্যবসিত হইবে। মন ভগবানের শেষ না পাইয়া তাঁহার প্রতি যে আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, তাহাতেই তাঁহার মহিমা বেশী উদ্ভাসিত হয়।

যাঁহাদের ভক্তির প্রতিভা আছে সেইরূপ স্বভাবভক্তের কাছে মৃন্ময় প্রতিমার মধ্যে চিন্ময় স্বরূপ মূর্ত হইয়া উঠে। কিন্তু এরূপ সাধকের সংখ্যা অত্যন্ত কম বলিয়া তাঁহাদের দৃষ্টান্ত সাধারণ মানুষের অনুসরণীয় নয়। দেবমূর্তিকে রূপক বলিয়া ধরিলেও প্রথমতঃ রূপকের ব্যাখ্যা ভগবানে আরোপিত সমস্ত মনোবৃত্তির উপর প্রসারিত হয় না, ও দ্বিতীয়তঃ স্থূলের অভিভবে রূপকের স্বচ্ছতা অক্ষুণ্ণ থাকে না। "মাছির পক্ষে মাকড়সার জালে পড়াই আকাশে উড়িবার উপায় মনে করা" কি সঙ্গত হইবে? ভগবানের যে লৌকিক রূপ শুধু সংস্কৃত পুরাণে নয়, ভাষারচিত মঙ্গলকাব্যাদিতে প্রাকৃত জনসাধারণের চিত্তকে অসংখ্য জটিল সংস্কারজালে আবদ্ধ করিয়াছে, প্রচলিত সাকারপূজার অনুসরণে কি তাহা হইতে মুক্তি পাওয়া যাইবে?

লেখকের শেষ সিদ্ধান্ত হইল, সাকার ও নিরাকার উভয়বিধ পূজকদের মধ্যেই অন্তরকে বাদ দিয়া বাহ্যিক পূজার প্রতি প্রবণতা আছে এবং উভয় ক্ষেত্রেই তাহা নিকৃষ্ট। যে পূজার মধ্য দিয়া অন্তরের অনুভূতি জাগ্রত হয় তাই আন্তরিক ও সেইজন্য শ্রেষ্ঠ।

লেখকের যুক্তি-পদ্ধতি অখণ্ডনীয়, কিন্তু ধর্ম কেবল ভগবানের বিরাটত্ব উপলব্ধিতে নয়, তাঁহার সহিত অন্তরঙ্গ মানবিক সম্বন্ধ স্থাপনের উপরেও নির্ভর করে। অর্জুন যখন শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন, তখনই যে তাঁহার ভক্তিবৃত্তির যথার্থ চরিতার্থতা লাভ হইয়াছিল তাহা নহে, তাঁহাকে সখা ও সুহৃদ্রূপে, একান্ত প্রিয়পাত্ররূপে অনুভবেও তিনি ধর্মের মূল আদর্শে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বস্তুতঃ সমস্ত ভারতীয় ভক্তিসাধনাই ভগবানকে দূর হইতে নিকটে আনিবার প্রয়াস। অগণিত সাধক এই পথেই, ভগবানের প্রতি প্রেমভাবপোষণের মাধ্যমেই, ধর্মের নিগূঢ়তায় অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। কাহার কোন্ পথ তাহা পূর্ব হইতেই *নির্ণয় করা যায় না, ফলের দ্বারাই বিচার করিতে হয়। অবশ্য উভয়বিধ সাধনারই বিপদ ও* বিকার আছে। যাঁহারা ভগবানের নিখিলব্যাপ্ত মহিমার দ্বারা অভিভূত, তাঁহারা

অনেক সময় তাঁহার প্রেমময় রূপের উপলব্ধি হইতে বঞ্চিত থাকেন। যাঁহারা বিশ্বদেবকে নিজ পারিবারিক গণ্ডীর মধ্যে সঙ্কুচিত করেন, তাঁহারা ক্ষুদ্র হৃদয়-বৃত্তির জড় আসক্তির ঊর্ধ্বে উঠিতে পারেন না। কিন্তু এই নিগূঢ় ভাবসাধনা ও উহার জীবন-সিদ্ধির ব্যাপারে কেবল যুক্তিসাহায্যে একটা বিশেষ পদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপাদন ধর্মের বাস্তব সমস্যাজটিলতার অস্বীকৃতি বলিয়াই মনে হয়।

'আষাঢ়ে' (অগ্রহায়ণ, ১৩০৫) - দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের এই হাস্যরসের কবিতাগুচ্ছের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যবিচারপ্রতিভা আশ্চর্যভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। তিনি হাস্যরসের কবিতায় নিয়মিত ছন্দের উপযোগিতা সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহাই তাঁহার রসবোধের তীক্ষ্ণতা ও ছন্দো-বিবেকের উৎকৃষ্ট পরিচয় দেয়। হাসির কবিতায় যদি ছন্দের গতি ও মধ্যযতির মুহুর্মুহুঃ নিয়মলঙ্ঘন হইতে থাকে, তাহা হইলে এই অনুসন্ধানের অনিশ্চয়তার জন্যই হাস্যরসের নিবিড়তা ও অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ ক্ষুণ্ণ হয়। কবির ছন্দ ও মিলের উপর অসাধারণ অধিকার বুঝাইতে গিয়া লেখক একটি খুবই সার্থক, অথচ নূতন উপমা প্রয়োগ করিয়াছেন—"উত্তপ্ত লৌহচক্রে হাতুড়ি পড়িতে থাকিলে যেমন স্ফুলিঙ্গবৃষ্টি হইতে থাকে, তাঁহার ছন্দের প্রত্যেক ঝোঁকের মুখে তেমনি করিয়া মিল বর্ষণ হইয়াছে।"

কবির শেষ দিকের কবিতাগুলিতে নিয়মিত ছন্দের প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য করা যায়। ইহাতে একদিকে যেমন প্রতিভার প্রথম উদ্দাম চেষ্টা সংযত হইয়াছে, তেমনি ভাবের নূতনত্ব ছন্দের অভ্যস্ততার সহিত মিলিত হইয়া উজ্জ্বলতররূপে প্রতিভাত হইয়াছে। নূতনত্বের বিস্ময় ও পুরাতনের স্থায়িত্ব—এই উভয়ের সহযোগিতায় হাস্যকল্পনার অস্পষ্ট নীহারিকাপুঞ্জ ধ্রুব নক্ষত্র-দীপ্তিতে পরিণতি লাভ করিয়াছে। হাসির লঘুতার সহিত হৃদয়ানুভূতির গাঢ়তা মিশিয়া, ব্যঙ্গকৌতুকের সহিত মর্মের বেদনানুভূতি যুক্ত হইয়া উহার তরলতাকে গভীর ভাব ও ভাবনার উদ্রেকে বিশেষরূপে অর্থবহ ও স্মরণীয় করিয়া তুলিয়াছে।

হাসির কবিতা সম্বন্ধে এত গভীরার্থক, অন্তর্ভেদী সমালোচনা প্রায়ই দেখা যায় না। ছন্দশৈথিল্যের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী-উচ্চারণ যদিও এক্ষেত্রে হাস্যরসপ্রধান কবিতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ, তথাপি ছন্দোশিল্পের প্রতি রবীন্দ্রনাথ যে সর্বক্ষেত্রেই একটা অসাধারণ গুরুত্ব আরোপ করিতেন তাহা বুঝিতে

কষ্ট হয় না। গদ্যকবিতার সাফাই গাওয়া, এমন কি সময় সময় উহার প্রতি শ্রেষ্ঠত্ব-আরোপের চিন্তা রবীন্দ্রনাথের মনে এখনও উদয় হয় নাই।

'মন্দ্র' প্রবন্ধের তারিখ (কার্তিক, ১৩০৯)—'আষাঢ়ে'-র প্রায় চারি বৎসর পরে। এই কাব্যটি দ্বিজেন্দ্রলালের স্বনামে প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া ইহার সমালোচনায় তাঁহার নামের উল্লেখ আছে। 'মন্দ্র'-সমালোচনায় সমালোচকের আনন্দ ও ঔৎসুক্য স্বপ্রকাশ। এই আনন্দ-পরিবেশনই সমালোচনার মুখ্য প্রেরণা বলিয়া ঘোষিত। গ্রন্থে যে অবলীলাকৃত সাহসিকতা ও প্রবল আত্মবিশ্বাস সর্বত্রসঞ্চারী, অলঙ্কারোক্ত নয় রসের যদৃচ্ছ সংমিশ্রণে কবির যে মৌলিক প্রতিভার নিঃশঙ্ক আত্মনিয়ন্ত্রণ পরিস্ফুট তাহাই সমালোচককে মুগ্ধ করিয়াছে। ইহার মধ্যে যে নটীর মুহুর্মুহুঃ নবায়মান নৃত্যছন্দ, তাহার গতিভঙ্গীর তালে তালে অলঙ্কার-জ্যোতি-বিকিরণের যে নব নব ঝলক, তাহার সহিত পৌরুষের বলিষ্ঠ ব্যঞ্জনা মিশিয়া গ্রন্থখানিকে এক অভাবনীয় যৌগিক-আবেদনমণ্ডিত করিয়াছে। এক উদ্দাম শক্তি বৈশাখী ঝড়ের মত ইহার ছন্দসুষমাকে উলটাইয়া-মুচড়াইয়া বাংলা কাব্যভাষার এক নিয়মশৃঙ্খলচ্ছেদী প্রকাশক্ষমতার পরিচয় দিয়াছে। এই গ্রন্থে নারীসুলভ নৃত্যকলা-কুশলতা ও পুরুষোচিত দার্ঢ্যের সংমিশ্রণ-রচিত কাব্যস্বরূপের পরিচয় দিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ ইহাকে শ্রাবণ-পূর্ণিমারাত্রির সহিত উপমিত করিয়াছেন। হয়ত উপাদানবিমিশ্রতার দিক দিয়া উপমাটি সার্থক। কিন্তু শ্রাবণ-পূর্ণিমা আমাদের কাব্যপাঠপুষ্ট স্মৃতিতে যে ভাবাসঙ্গের উদ্বোধন করে তাহা রোমান্টিক রহস্যপ্রধান, "মন্দ্র"-এর সঙ্গে তাহার সাদৃশ্যবোধ আমাদের সংস্কারবিরোধী। এই প্রবন্ধটি অনেকটা আনন্দের আতিশয্যজাত ও উচ্ছ্বাসপ্রবণ বলিয়া পূর্ব প্রবন্ধের অনুরূপ সূক্ষ্মদর্শিতা ও সমালোচনার মূল তত্ত্বের প্রয়োগনিষ্ঠা ইহার মধ্যে দেখা যায় না। রবীন্দ্রনাথ পাঠককে গ্রন্থখানি পাঠ করিবার উপদেশ দিয়া তাহার নিকট বিদায় লইয়াছেন।

জুবেয়ার (বৈশাখ, ১৩০৮)-এই প্রবন্ধটি ম্যাথিউ আর্নল্ডের 'জুবেয়ার'-পরিচিতি-বিষয়ক প্রবন্ধের রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা ও মন্তব্যসহ সারসংকলন। এই প্রবন্ধে সাহিত্য ও রচনাকলাসম্বন্ধীয় জুবেয়ারের কতকগুলি গভীরার্থক সংক্ষিপ্ত অভিমত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহার সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'নব্য লেখকদের প্রতি উপদেশ' প্রবন্ধের তুলনা করিলেই পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যসাধনা

ও রচনাশিল্প যে কত বেশী অন্তর্মুখী ও সাহিত্যের অন্তঃপ্রকৃতির সহিত কত গভীর ও মননিষ্ঠ পরিচয় হইতে উদ্ভূত তাহা বোঝা যাইবে। বঙ্কিম সাহিত্য-সম্রাটের মত ফতোয়া জারি করিয়াছেন ও তাঁহার নির্দেশ সাহিত্যের নীতি ও লোককল্যাণমূলক দিকেরই সহিত সংশ্লিষ্ট। জুবেয়ার সাহিত্য-সৃষ্টির জন্য জীবনব্যাপী জ্ঞানসাধনা ও তরুণজনোচিত অদম্য ও স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহ—এই উভয়ের সমন্বয় প্রয়োজনীয় মনে করেন। তিনি রচনাকলায় ধ্বনির পরিবর্তে অর্থ, প্রাচুর্যের পরিবর্তে নির্বাচন ও চেষ্টাকৃত সমন্বয়ের পরিবর্তে স্বভাবসিদ্ধ সঙ্গতি কাম্যতর বিবেচনা করেন। তিনি আরও বলেন যে, যে রচনা চিত্তের গভীর স্তর হইতে উদ্ভূত তাহা মনের উপরিভাগে অপরের সারপ্রয়োগে উৎপন্ন ফসলের প্রাচুর্য হইতে বেশী মূল্যবান। নিজস্ব সংস্কৃতির ফল ধার-করা শিক্ষা-সংস্কৃতির কৃত্রিম শস্য হইতে উৎকৃষ্টতর।

রবীন্দ্রনাথ 'শুভবিবাহ' উপন্যাসের মূল্যায়নে সমালোচনা সম্বন্ধে জুবেয়ারের একটি মন্তব্যের সার্থক প্রয়োগ করিয়াছেন—"পূর্বে যাহা সুখ দেয় নাই তাহাকে সুখকর করিয়া তোলা একপ্রকার নূতন সৃজন"। "লেখকের মনের সহিত পরিচয় করাইয়া দেওয়াই সমালোচনার সৌন্দর্য, উহার নিয়মাধীনতা প্রতিপন্ন করা সর্বাপেক্ষা গৌণ কাজ।" "অনেক সমালোচক আকাটা বা খনি হইতে তোলা হীরার বিচার করিতে পারেন না, টাঁকশালে ছাপা মুদ্রারই মূল্য নির্ধারণ করিতে পারেন। তাঁহাদের দাঁড়িপাল্লা আছে, কিন্তু অজানা বস্তুর মূল্য যাচাইএর জন্য নিকষপাথর বা খাদ সোনা গলাইবার মুচি নাই।" "সাহিত্যে রুচিভেদ লইয়া নীতিগত মতপার্থক্যের মত উদ্দীপনা, ক্রোধ প্রভৃতি প্রকাশ একেবারে অপ্রাসঙ্গিক।"

রচনাবিদ্যা সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্যেও অনুরূপ অভিজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় মিলে। "অধিক ঝোঁক অতিরিক্ত চড়া গলায় গান করার মতই সুর নষ্ট করে"; "ভালো করিয়া লিখিতে গেলে স্বাভাবিক অনায়াসতা এবং অভ্যস্ত আয়াসের প্রয়োজন"—অর্থাৎ স্বভাবসিদ্ধ ভাল লিখিবার ক্ষমতা যখন অভ্যাসের দ্বারা অনুশীলিত হয়, তখনই শ্রেষ্ঠ রচনা সম্ভব।

লেখকের সৃষ্টি-প্রাচুর্য সংযত করা সম্বন্ধে জুবেয়ারের এই উপদেশ—"পাঠকের ক্ষুধা অপেক্ষা তাহার তৃপ্তির সীমালংঘনকেই বেশী ভয় করা উচিত"। "প্রতিভা মহৎকার্যের সূত্রপাত করে। কিন্তু পরিশ্রম তাহা সমাধা করিয়া দেয়"—মন্তব্যটি প্রতিভা ও পরিশ্রমশীলতার মধ্যে আমরা

যে বিরোধ কল্পনা করি তাহার অস্বীকৃতি। "যাহা বিস্ময়কর তাহা একবার মাত্র বিস্মিত করে। যাহা মনোহর তাহার মনোহারিতা উত্তরোত্তর বাড়িতে থাকে"—মন্তব্যে সুলভ চমকসৃষ্টি ও স্থায়ী সৌন্দর্য-সৃষ্টির মধ্যে প্রকারগত পার্থক্যের নির্দেশ পাওয়া যায়।

স্টাইলের স্বরূপনির্ণয়ে জুবেয়ার শুধু মন আর সমগ্র অন্তঃপ্রকৃতির মধ্যে পার্থক্য অনুভব করিয়াছেন। শুধু মানস অনুশীলন হইতে যে স্টাইলের জন্ম আর যাহার মধ্যে লেখকের সমগ্র অন্তঃপ্রকৃতি (Soul) প্রতিফলিত হয় দুই স্বতন্ত্র প্রকাশরীতি। ইহা হইতেই Pater-এর (mind in style) ও (soul in style) এর পার্থক্যটি কল্পিত ও বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

বড় লেখকের style-এর অনির্দেশ্যতা বুঝাইতে জুবেয়ার বলিয়াছেন যে ইঁহাদের দৃষ্টি ভাবনাকে ও ভাবনা ভাষাকে ছাড়াইয়া যায়। অর্থাৎ মনের প্রথম আহরণ, উহার ভাবে ঘনীভূত পরিণতি ও ভাষাতে এই ঘনীভূত ভাবের প্রকাশ এই তিন স্তরেই একটা উদ্বৃত্ত শক্তির ব্যঞ্জনা মহৎ styleএর লক্ষণ। "ভালো লেখায় একই কালে প্রচুর ও পরিমিত, ছোট এবং বড় মিশ্রিত থাকে"—অনুরূপ মন্তব্য।

রচনারীতি সম্বন্ধে অন্যান্য অর্থগর্ভ মন্তব্যের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উদ্ধরণযোগ্য।

"অতিমাত্রায় যাথার্থ্যনিষ্ঠা সাহিত্যে ও আচরণে শ্রীর আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করে।"

"যাহারা অর্ধেক বুঝিয়াই সন্তুষ্ট হয়, তাহারা অর্ধেক প্রকাশ করিয়াই খুসী থাকে—এইরূপেই দ্রুত রচনার উৎপত্তি"।

"এক প্রকারের কেতাবি স্টাইল আছে যাহার মধ্যে কাগজেরই গন্ধ পাওয়া যায়, বিশ্বসংসারের গন্ধ নাই"।

"অনেক লেখক আপনার স্টাইলকে ঝম্ ঝম্ করিয়া বাজাইতে থাকে; লোককে জানাইতে চায় তাহার কাছে সোনা আছে বটে"।

"দুর্লভ, আশাতীত স্টাইল ভালো, যদি জোটে; কিন্তু আমি পছন্দ করি, প্রত্যাশিত স্টাইলটিকে"।

জুবেয়ারের এই সমস্ত বিক্ষিপ্ত মন্তব্য দীর্ঘকাল ধরিয়া সাহিত্যতত্ত্বের ও বিচিত্র সাহিত্যকৃতির সুগভীর রসাস্বাদন ও স্বরূপচিন্তাপ্রসূত। ফরাসী সাহিত্যের ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় সাহিত্য আকাডেমির নিয়ন্ত্রণ ও লেখকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার এই কেন্দ্রানুবর্তনের প্রভাবেই হয়ত এই পরিণত

ও প্রজ্ঞামূলক বিধিবদ্ধতা সম্ভব হইয়াছে। ইংরাজি সাহিত্যেও এক ডাঃ জনসন ছাড়া আর কেহ সাহিত্যরুচিনিয়ন্ত্রণের একাধিপতির আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন না। সেখানেও সৃষ্টিধর্মী সমালোচনা শেক্‌স্‌পিয়র ও রোমান্টিক কবিগোষ্ঠীর কল্পনার ঊর্ধ্বাভিসার ও স্বেচ্ছাবিহারের মূল নীতি উদ্ভাবনেই রত ছিল, কবিপ্রতিভার নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন বিধান রচনা করে নাই। বাংলা সাহিত্যে এই সমস্ত নীতিতত্ত্বের প্রয়োগ একেবারেই অসম্ভব মনে হয়। ইহার গদ্যরচনার পরমায়ু মাত্র দেড়শত বৎসরের ও মাত্র দুই তিন জন প্রথম শ্রেণীর রচনারীতিবিশারদের উদ্ভব হইয়াছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতি প্রতিভার স্বতঃস্ফূর্ত উদ্দীপনার সংবেগপ্রসূত, গভীর শিল্পতত্ত্বচিন্তার কোন লক্ষণ ইহার মধ্যে দুর্নিরীক্ষ্য। তাঁহার কাব্য ও গদ্যরীতি আবেগোচ্ছলতার স্রোতোমুখে আত্মসমর্পণকারী ভাবতরণীর ন্যায় অদম্য বেগে উচ্ছ্বসিত; ইহার কোথাও বেগসংযম ও নিয়ন্ত্রণ-প্রয়াসের সচেতন আয়োজন দেখা যায় না। রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা' 'নৈবেদ্য', ও ধর্মবিষয়ক কবিতার পরিধিসঙ্কোচ ও ভাবনিবিড়তার নিরুদ্ধ শক্তি নিজ অস্তিত্বের পরিচয় রাখিয়াছে। কিন্তু মোটের উপর, উচ্ছ্বাস, ভাব ও কল্পনার অপরিমিত, অথচ কবির উদ্দেশ্যের অনুকূল ঐশ্বর্য ও প্রকাশের পরিপূর্ণ উজ্জ্বলতাই রবীন্দ্ররচনার সাধারণ লক্ষণ। অবশ্য ভিতরে ভিতরে এই বিপুল, অফুরন্ত প্রাচুর্যের মধ্যেও কবির শিল্পচেতনা অজ্ঞাতসারে সক্রিয় ছিল, নতুবা এই গদ্য-পদ্য শ্রেষ্ঠ সাহিত্য হইয়া উঠিতে পারিত না। কিন্তু জুবেয়ারের চুল-চেরা বিচার, সাহিত্যখনির আকর হইতে সংগৃহীত তত্ত্বের হীরকখণ্ডগুলির সচেতন প্রয়োগ রবীন্দ্র-সাহিত্যের পক্ষে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়। হয়ত দুই তিন শত বৎসর পরে যদি বাংলা সাহিত্যের আবার নূতন ক্লাসিক্যাল যুগের আবির্ভাব ঘটে ও উহা কোনদিন কেন্দ্রনিয়ন্ত্রণ স্বেচ্ছায় স্বীকার করে, তবে জুবেয়ারের সমালোচনা ও বিচার-পদ্ধতি বাংলা সাহিত্যে প্রযোজ্য হইতে পারে।

'শুভবিবাহ' (আষাঢ়, ১৩১৩)-উপন্যাসের সমালোচনায় অতিপরিচিত বিষয় লইয়াও যে সুন্দর সাহিত্য সৃষ্টি করা যায় তাহার অন্তর্নিহিত কারণগুলি অতি চমৎকারভাবে নির্দেশিত হইয়াছে। আর্টকে কেবল মহত্তের স্তব এই সংজ্ঞা দিলে উহার পরিধি অত্যন্ত সংকীর্ণ হইবে ও সাধারণ পরিচিত জীবনের প্রায় সমস্তটাই উহা হইতে বাদ পড়িবে

পরিচিত বিষয়ের মধ্যে যে অতিপরিচয়ের জড়তা আমাদের মনকে উহার প্রতি ঔৎসুক্যহীন করে, তাহাকে কাটাইয়া উহার মধ্যে নবীন আগ্রহসঞ্চারের দুর্লভ ক্ষমতা এই স্ত্রীরচিত উপন্যাসখানিতে উদাহৃত হইয়াছে। ইহাতে কোন মহৎ শিক্ষা, আদর্শ বা জীবনতত্ত্বের প্রকাশ খুঁজিলে আমরা নিরাশই হইব। গ্রন্থে লেখিকার ভাষার মধ্যে কোন সৌন্দর্যসৃষ্টির প্রয়াস নাই, বা কোন চরিত্রকে উগ্র নাটকীয়তা বা অতি-রঞ্জিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সাহায্যে কৃত্রিমভাবে আকর্ষণীয় করিয়া তুলিবার কোন কৃচ্ছ্রসাধন নাই। অন্তঃপুর-পরিবেশে অনেক লোকের ও কর্মের ভিড়ের মধ্যেও উহার চরিত্রগুলি আপন আপন মৃদু, অথচ সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্যে সজীব ও অবিস্মরণীয় হইয়া আছে। বাংলা সাহিত্যে রোমান্টিক উপন্যাসের প্রাচুর্যের মধ্যে এই বস্তুরসস্নিগ্ধ উপন্যাসটি একটি লক্ষণীয় ব্যতিক্রম, অথচ বাস্তবতার সঙ্গে যে ক্লিন্নতা ও পাশবিকতার ভাবাসঙ্গ অধুনা প্রচলিত হইয়াছে তাহার লেশমাত্র কলঙ্কচিহ্নও এখানে নাই—ইহা শুচি-সংযত, ভগবৎ-সৃষ্টির রাজকীয় মুদ্রাঙ্কিত ও পবিত্র সমাজরুচির পরিচর্যা-লালিত একটি বাস্তব জীবন-কাহিনী।

আমরা আশা করিয়াছিলাম যে এই উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ স্ত্রী-হস্তের কমনীয় স্পর্শের দিকটি ফুটাইয়া তুলিবেন। কিন্তু তাঁহার সমালোচনায় তিনি কেবলমাত্র এই গুণের উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। সহজকে সহজভাবে ফুটাইয়া তোলার মধ্যে যে অসামান্য শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, রবীন্দ্রনাথ তাহাকে ফলের দ্বারা বিচার করিয়াছেন, তাহার অন্তর্নিহিত কারণ বিশ্লেষণ করেন নাই। যাহাকে আমরা বাস্তব জীবনে উপেক্ষা করি, চিত্রশিল্পে বা উপন্যাসে তাহাই আমাদের আকর্ষণ করে কেন—ইহার মধ্যে সৌন্দর্যতত্ত্বের কোন্ নিগূঢ় আবেদন ক্রিয়াশীল, তাহা পরিস্ফুটনযোগ্য। ব্রাউনিং বলিয়াছেন যে শিল্পীকৃত জীবনের অখ্যাত খণ্ডাংশের নির্বাচনেই তাহার আচ্ছাদিত মহিমা সম্বন্ধে আমরা সচেতন হইয়া উঠি। দ্বিতীয়তঃ পাঁচমিশালি, বহু-বিস্তৃত বিশৃঙ্খলার মধ্যে যে সৌন্দর্যসম্ভার, বিরাটসভায় পাণ্ডবদের মত, অগৌরবময় অজ্ঞাতবাস, শিল্পীদত্ত বিশেষ সম্মানেই তাহা আপন স্বাতন্ত্র্যে ভাস্বরতা লাভ করে। সুতরাং জীবনের উপেক্ষিত কাব্যে বা শিল্পে অভিজাত-মহিমায় উদ্ভাসিত হয়। হয়ত সাময়িক পত্রে সমালোচনার জন্য নির্দিষ্ট

স্থানসীমার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ভাবসম্প্রসারণের সুযোগবঞ্চিত ছিলেন।

কবিজীবনী (আষাঢ়, ১৩০৮)—টেনিসনের পুত্রলিখিত কবির জীবনী-আলোচনা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ, কবির লৌকিক জীবন ও কাব্যপ্রেরণা যে কতদূর নিঃসম্পর্ক, সে বিষয়ে তাঁহার সূক্ষ্মদর্শী অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কবির ভাবজীবনের সূত্র যে তাঁহার জীবনঘটনার মধ্যে বিধৃত থাকে এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়াই, আমরা কবির জীবন-চরিতরচনার প্রতি এত গুরুত্ব আরোপ করি। কিন্তু ডান্টে বা গ্যেটে প্রভৃতি দুই-একজন ব্যতিক্রমস্থানীয় কবি ছাড়া আর কাহারও ক্ষেত্রে ব্যক্তি ও কাব্যজীবনের এই পরস্পরসাপেক্ষতা সমর্থিত হয় না। কর্মবীরের জীবন তাঁহার কর্মসাধনার উপর যেরূপ আলোকপাত করে, কবিজীবনে তাহা ঘটে না।

এই জন্য আমাদের প্রাচীন কবিবৃন্দের জীবনতথ্যের পরিবর্তে কিংবদন্তী-কল্পনা তাঁহাদের কাব্যের মূল প্রেরণার বেশী সঙ্কেতবহ। ক্রৌঞ্চমিথুনের দাম্পত্যবিচ্ছেদে শোকাভিভূত হইয়া বাল্মীকির রামায়ণ-রচনায় ব্রতী হওয়া তাঁহার কাব্যের মূল সুর, রাম-সীতার করুণ, অপ্রতিবিধেয় বিচ্ছেদ-বেদনার পূর্বসূচনা। আর দস্যু রত্নাকরের ভক্ত-কবি বাল্মীকিতে রূপান্তর রাম-চরিত্রের মহিমাদ্যোতক। তেমনি মূর্খ, ভার্যাভর্ৎসিত কালিদাসের সরস্বতীর বরপুত্রে অলৌকিক পরিণতিও কালিদাস-প্রতিভার দিব্য রসস্ফুরণ ও স্বতঃস্ফূর্ত সৌন্দর্যসৃষ্টির রহস্য দ্যোতিত করে। এই কিংবদন্তীগুলির মধ্য দিয়া কবির কালের একটি ভাবপরিচয় ও কবির অন্তর্লোকে যে মহৎ আবেগের প্রবল প্রবাহ তাঁহার কাব্যরচনার সম্ভাব্য উৎস তাহাই জনমানসের ঔচিত্যবোধের দ্বারা আশ্চর্যভাবে অনুভূত ও ব্যঞ্জিত হইয়াছে। জনকল্পনায় যে নিত্য-সত্যের কিরণসম্পাত হইয়াছে, কোন সনতারিখসংবলিত ঘটনাপঞ্জীর স্থূল আধারে তাহার ক্ষীণতম আভাও বিচ্ছুরিত হইত না। কবির জীবনচরিত সম্বন্ধে এরূপ সূক্ষ্মদর্শী ও সার্বভৌম সত্যপ্রকাশক আলোচনা পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যেও দুর্লভ।

'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' (শ্রাবণ, ১৩০৯)—দীনেশচন্দ্র সেনের এই সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থখানির পুনর্মুদ্রণকে উপলক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথ ঠিক বাংলা

সাহিত্যের উদ্ভব ও অগ্রগতি, যুগ হইতে যুগান্তরে সাহিত্যের প্রকৃতি ও প্রেরণার রূপান্তর-প্রক্রিয়া অনুসরণ করেন নাই। তিনি বাংলার শাক্ত ও শৈব সম্প্রদায়ের ধর্মবিরোধ ও আর্য ও অনার্যের ধর্মাদর্শের পারস্পরিক প্রভাব ও কালক্রমে উভয়ের মধ্যে সমন্বয়ের ইতিহাসটিই সাহিত্যের মূল কথারূপে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করিয়াছেন। অর্থাৎ ইহা পরিবর্তনশীল প্রকাশ-রীতির অনুসন্ধান না হইয়া উহার অন্তর্নিহিত ভাবধারার প্রতি লেখকের আকর্ষণের পরিচয় দিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের মধ্যে বাঙলা সমাজজীবনের ভাবদ্বন্দ্ব ও ভাবপরিণতির স্তরগুলি বিশেষভাবে জানিতে কৌতূহলী হইয়াছেন।

মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত বিভিন্ন দেবদেবীর দ্বন্দ্ব প্রকৃতপক্ষে আর্য ও অনার্য, হিন্দু ও বৌদ্ধ ও উভয় প্রকার জনসংঘ ও ধর্মাবলম্বীদের নানা জটিল সংযোগে বিমিশ্র সঙ্করজাতিসমূহের উপাসনাকেন্দ্রিক মতবিরোধের ছদ্মবেশী ইতিহাস। যে অনার্য দেবতা বহুপরিমাণে বৌদ্ধ ভাবাদর্শ আত্মসাৎ করিয়া সর্বপ্রথম আর্য দেবমণ্ডলীতে নিজ স্থান করিয়া লইলেন তিনি শিব। কিন্তু মঙ্গলকাব্যগুলির আবির্ভাব-সময়ে শিব পৌরাণিক দেবমহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত, এবং তাঁহারই দৃষ্টান্ত অনুসরণে আরও কয়েকটি অনার্য দেবতা—চণ্ডী, মনসা ও ধর্ম—আর্যদেবতার ভাব-লক্ষণে নিজ অনার্যতার উদ্ভবচিহ্ন কিছুটা আবৃত করিয়া শিব ও বিষ্ণুভক্ত পরিবারের উপাসকমণ্ডলীর মধ্যে পূজালাভের প্রচণ্ড আগ্রহে একটা তুমুল অন্তর্বিপ্লবের সৃষ্টি করিলেন।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই ধর্মবিরোধ ও জাতি-সংঘের কোলাহল ও মিলন, দ্বেষ ও দ্রোহের উগ্রতা ও শেষ পর্যন্ত সমন্বয়ের শান্তি ও দেবকল্পনার উন্নততর রূপান্তরের ভাবস্নিগ্ধতার বিচিত্র প্রক্রিয়াগুলি সমস্ত বোধশক্তি দিয়া অনুভব করিয়াছেন। তিনি শক্তিহীন শিব ও শিবহীন শক্তির সহিত ব্রহ্ম ও মায়ার পরস্পর-বর্জনকারী অসম্পূর্ণতার সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়াছেন ও বৈষ্ণব ভাবাদর্শের প্রভাবে উভয়ের মিলনের মধ্যেই উহাদের পরিপূর্ণ কল্যাণরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। প্রেমের মধ্য দিয়াই উগ্রা চণ্ডী স্নেহময়ী মাতাতে উদ্বর্তিত হইয়াছেন ও স্বার্থসংঘাত-ক্লিষ্ট ও বস্তুভারপীড়িত মঙ্গলকাব্যের অন্তরলোকে শাক্ত পদাবলীর ভক্তি-মাধুর্য সঞ্চিত হইয়াছে। সুতরাং বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের সমস্ত

ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ অধ্যায়গুলির মধ্য দিয়া বৈষ্ণবীয় প্রেমধর্মের জয়পতাকাই অক্ষুব্ধ শান্তিতে উড্ডীন হইয়াছে। এই সমাজচেতনা ও কবিকল্পনার যুগ্ম আবিষ্কারই রবীন্দ্রনাথের নিকট প্রাক্-আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একক ভাবসত্য। ইহা আর যাহা হউক, সাহিত্যের পূর্ণ তাৎপর্যবাহী নয়. ইহার উদ্ভাবনের চমৎকৃতি ইহার একদেশদর্শিতাকে সম্পূর্ণ সংশোধন করে না। সাহিত্যের এই বিশুদ্ধ "ভাবৈকরস" ব্যাখ্যা সমাজতাত্ত্বিক মনের পক্ষে তৃপ্তিকর হইতে পারে, কিন্তু সাহিত্যের বিচিত্র-উপাদানগঠিত কলাসৌন্দর্যের আস্বাদনোৎসুক চিত্ত ইহাতে পরিতৃপ্তি খুঁজিয়া পায় না।

'ঐতিহাসিক উপন্যাস'-এ (আশ্বিন, ১৩০৫) রবীন্দ্রনাথ 'রাজসিংহ'-এ এই বিষয়ে যে মন্তব্য করিয়াছিলেন তাহারই পুনরুক্তি করিয়াছেন। সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক মনোভাবের অতি-প্রাদুর্ভাবে ইতিহাস-রচনায় যে নিশ্ছিদ্র তথ্যনিষ্ঠার আদর্শ অনুসৃত হইতেছে তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে ইতিহাস ও ঐতিহাসিক উপন্যাসের মধ্যে ব্যবধান উগ্র হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের উদ্দেশ্য হইল বৈজ্ঞানিক তথ্যানুবর্তন নয়, ঐতিহাসিক রসের সৃষ্টি। অর্থাৎ ব্যক্তিজীবনের ক্ষুদ্র ও মৃদু স্পন্দনের মধ্যে ইতিহাস-রঙ্গমঞ্চের বিরাট নাটকীয় ও তুমুলবিপর্যয়কারী সংঘটনের দুর্ধর্ষ গতিবেগসঞ্চারের দ্বারা যে বিশেষ রস উৎপন্ন হয় তাহারই সার্থক উদ্বোধন। সাধারণ জীবনের মন্থর, স্তিমিত গতির সঙ্গে মহাকালের রুদ্রচ্ছন্দে আবর্তিত রথযাত্রাকে সংযুক্ত করিয়া দিলে জীবনের যে বিরাট্ বিশ্বরূপ অভিব্যঞ্জিত হয়, ঐতিহাসিক উপন্যাস ক্ষুদ্রের সেই মহনীয়তা ফুটাইয়া তোলে। তাহার জন্য তথ্যগত সত্যভিত্তিক যে পরিবেশ, স্থানকালপাত্রের যে যথাযথ পরিচয়ের প্রয়োজন, ততদূর পর্যন্তই তাহার ঐতিহাসিক যাথার্থ্যের সীমা। ইতিহাসের বারুদখানায় বিস্ফোরণ ঘটাইতে যতটুকু তথ্যসম্মত আয়োজনের দরকার তাহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট। যখন পরিবেশ অগ্নিময় হইয়া উঠে, তখন ঘটনার নিয়ামক পাত্র-পাত্রীগণ সেই অসাধারণ তীব্র আলোকে যে রূপে উদ্ভাসিত হয় তাহাই ঐতিহাসিক উপন্যাসলেখকের নিকট তাহাদের সত্য পরিচয়। খড়-কুটার সাহায্যে বহ্ন্যুৎসব প্রজ্বলিত হইলে আর তাহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের প্রয়োজন থাকে না।

শেক্স্‌পিয়রের 'অ্যাণ্টনি এবং ক্লিয়োপাট্রা' পরিবার-জীবনের রূপমোহের ছবি ; কিন্তু বিশ্বপ্রলয়কারী উত্তাল ঘটনা-তরঙ্গ-তাড়িত হইয়া উহার গতিচ্ছন্দ ও ভাবতাৎপর্য এক নিখিলব্যাপ্ত মহিমায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, এক অপার্থিব সমুদ্রকল্লোলধ্বনিতে মুখরিত হইয়াছে। ইতিহাস-সত্য জানা নিশ্চয়ই কাঙ্ক্ষিত ; কিন্তু ইতিহাস-রস-আস্বাদনে অসামর্থ্য তথ্য-অজ্ঞতা অপেক্ষা অনেক বেশী দুর্ভাগ্যের বিষয় তাহা নিঃসন্দেহ। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রবন্ধের ক্ষুদ্র পরিসরে যেরূপ সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন ও এই দীর্ঘকালের বাদ-বিতণ্ডার যেরূপ সন্তোষজনক রসানুকূল মীমাংসা করিয়াছেন, কোন প্রতীচ্য সমালোচকের তথ্যভারাক্রান্ত ও পাণ্ডিত্য-পাংশুল আলোচনায় তাহার সমকক্ষ কিছু দেখা যায় না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১

(৩) প্রাচীন কাব্যবিষয়ক

'প্রাচীন সাহিত্য'-এ সংকলিত রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা-প্রবন্ধগুলি সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যরসাস্বাদনের আদর্শস্থানীয়। এই রচনাসমূহে কেবল যুক্তিপ্রয়োগে সমালোচনার কোন নূতন মানদণ্ড-আবিষ্কারের প্রয়াস নাই। অবশ্য সূক্ষ্মদর্শিতা ও কাব্যবিচারে অভ্রান্ত সিদ্ধান্তপ্রতিষ্ঠার প্রচুর দৃষ্টান্ত এখানে পাওয়া যায়। কিন্তু এই বিচারবুদ্ধির স্থিরীকরণ এখানে পাঠকের গৌণ লাভ। আমরা যেন এখানে এক প্রবলতর আকর্ষণের মোহিনী শক্তিতে, বিচার করিতে, লেখকের যুক্তিধারার অনুসরণ করিতে ভুলিয়া যাই। এই প্রবন্ধগুলিতে আমরা উপলব্ধি করি এক কবি কেমন করিয়া আমাদিগকে অন্যকালের কবির মর্মলোকে অনুপ্রবেশের ছাড়পত্র দিয়াছেন। কি অপরূপ সুকুমার কল্পনার যাদুতে অতীত যুগের সৃষ্টিরহস্য ভেদ করিয়া সেই যুগপ্রতিবেশের উদার অঙ্গনে আমাদের স্বচ্ছন্দচারণার অধিকার দান করিয়াছেন, সমস্ত যুক্তি-তর্ক, সচেতন মূল্যায়ন-প্রয়াসকে অতিক্রম করিয়া কেমন করিয়া কবির সহজ সংস্কার সমধর্মী কবিগোষ্ঠীর প্রাণস্পন্দনটি অধিগত করিয়াছে, এক যুগের মধুলোভী ভ্রমর কেমন করিয়া অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে বিস্মৃতপ্রায় ভাব-কুসুমের মধুপান করিবার নিভৃত পথের সন্ধান পাইতেছে, 'প্রাচীন সাহিত্য'-এর রচনাগুলি নব-অনুভূত সেই পুরাতন সৌন্দর্যের সদ্যোমধুস্রাবী সুরভিতে মদির, নূতন সঞ্জীবনীমন্ত্রে সদ্যো-উদ্বুদ্ধ কবি-আত্মার লীলাময় রূপের দল-উন্মোচন। ইহা যেন রবীন্দ্র-নাথের প্রজাপতি-নির্মাণদক্ষতার যাদুমন্ত্রে প্রাচীন কাব্যের নবজন্ম-পরিগ্রহ; নীতিজীর্ণ, টীকাবলিজালে সমাচ্ছন্ন কাব্যদেহে নবযৌবন-কান্তি-সঞ্চার; কবিমনোলোকের যে ক্ষণবসন্ত-উচ্ছ্বাসে কাব্যের জন্ম, বহু-শতাব্দী-ব্যবধানে তাহার পুনরুন্মেষ ও চিরন্তনতা-বিধান।

এখন রচনাগুলির আলোচনার দ্বারা উপরিউক্ত মন্তব্যের উপযোগিতা-বিচারের চেষ্টা হইবে।

'কাদম্বরীচিত্র' (মাঘ, ১৩০৬)—যেমন কোন কোন অরণ্যে বৃক্ষাদির আকাশস্পর্শী উচ্চতা, উহার পত্রপল্লবের বর্ণের চক্ষু-বিভ্রান্তিকর গাঢ়তা ও লতা-পাতা-ফুলের রং-এর প্লাবন ও অজস্রতা সেই আরণ্য প্রদেশের কোনরূপ ভূতত্ত্ববৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল, তেমনি 'কাদম্বরী'র রচনাভঙ্গীর অসাধারত্ব উহার প্রতিবেশের সহিত কোন নিগূঢ় কার্যকারণশৃঙ্খলে সম্পর্কিত। উহার মানবিক প্রতিবেশ, উহার অখণ্ড অবসর, উহার উদার চির-অতৃপ্ত সৌন্দর্যরুচি, উহার রাজসভা ও রাজপরিজন-গোষ্ঠীর মেজাজ না বুঝিলে 'কাদম্বরী'র অতিরেকমন্থর, সূক্ষ্মভাবে বর্ণসচেতন ও চিত্রধর্মী গদ্যরীতির অন্তঃপ্রেরণার কোন কারণ আবিষ্কার করা দুরূহ হইবে। রবীন্দ্রনাথ প্রথমেই ভারতবর্ষীয় প্রকৃতির অসাধারণ রুচিবৈশিষ্ট্যের—উহার আখ্যানবিমুখতা ও বর্ণনাতিরঞ্জনের প্রতি পক্ষপাতের—সপ্রমাণ উল্লেখ করিয়াছেন। রামায়ণ-মহাভারত ও কালিদাসের 'মেঘদূত' ও 'কুমারসম্ভব'-এ কবিরা পাঠকের স্বাভাবিক আখ্যানরসপ্রত্যাশাকে কিরূপ নির্মমভাবে ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন তাহার দৃষ্টান্ত উদ্ধার করিয়া পাঠকের রুচি কিরূপ দ্রুত সমাপ্তি অপেক্ষা মন্থর উপভোগের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট ছিল কবি তাহা দেখাইয়াছেন। আঞ্চলিক গল্পসমূহ প্রাদেশিক ভাষায় লেখা বলিয়া তাহারা সাহিত্যে রক্ষিত হয় নাই—উৎসব-দীপালিতে ব্যবহৃত মৃৎ-প্রদীপের ন্যায় প্রয়োজনসিদ্ধির পরে পরিত্যক্ত হইয়াছে। আরও, সংস্কৃত মৃত ভাষা বলিয়া ইহাতে গল্পের বা গীতের প্রবহমানতা নাই, অবিচ্ছিন্ন গতিশীলতার পরিবর্তে হীরকদ্যুতিময় বিচ্ছিন্ন শ্লোকপরম্পরা আছে। সুতরাং সংস্কৃত আখ্যায়িকার অলঙ্কার-পারিপাট্য ও গল্পরসরিক্ততা অনেকটা একই কারণসঞ্জাত ও এই সাহিত্যে যাহাদের রুচি লালিত তাহাদের মধ্যে ঘটনার প্রতি ঔৎসুক্য অপেক্ষাকৃত কম।

অবশ্য এই বিষয়ের আলোচনা রবীন্দ্রনাথ নিজ প্রসঙ্গের প্রয়োজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন, উহাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিবার কোন চেষ্টা করেন নাই। সংস্কৃত সাহিত্যে আখ্যায়িকা প্রধানতঃ মহাকাব্য ও পুরাণের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে ও দেব-ও-ধর্মনীতিমহিমাপ্রতিপাদনের জন্যই ব্যবহৃত হইয়াছে। এগুলি প্রায় সমগ্রভাবেই অলৌকিকতা-প্রভাবিত ও বাস্তবের সহিত ক্ষীণসূত্রে সংসক্ত। মহাকাব্য ও পুরাণ-বহির্ভূত গল্পগুলি—যথা 'হিতোপদেশ', 'পঞ্চতন্ত্র', বা 'দশকুমারচরিত'—হয় সম্পূর্ণভাবে নীতিকবলিত ও সাংসারিক জ্ঞানসূচক, না হয় উৎকটভাবে রাজনৈতিক দুর্নীতি ও

কপটাচারের সমর্থক। ইহাদের মধ্যে মানবিক কূটবুদ্ধির সঙ্গে সম্পূর্ণ অনৈসর্গিক মন্ত্র, অভিচার প্রভৃতি দৈব প্রক্রিয়ার অঘটনসাধনশক্তির মিলন হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষার বাক্যগ্রন্থনজটিলতা ও গুরুগম্ভীর ধ্বনিপ্রয়োগ এই ভাষায় লিখিত গল্পগুলির কৌতূহলরস ও সহজ আকর্ষণী শক্তিকে ক্ষুণ্ণ করিয়া উহাদের ভারকেন্দ্রকে নীতিকথা অথবা উদ্ভট রসসৃষ্টির অভিমুখী করিয়াছে। বোধ হয় সংস্কৃতের এই অনুপযোগিতা ও বিষয়সঙ্কীর্ণতার জন্যই পালি ও প্রাকৃত ভাষায় অধিকতর বাস্তবরসসমৃদ্ধ ও নীতিপ্রভাব হইতে কথঞ্চিৎ মুক্ত, জীবননিষ্ঠ গল্প রচিত হইতে লাগিল। সুতরাং প্রাচীন সাহিত্যে যে জীবনসরভূয়িষ্ঠ, অপ্রাসঙ্গিক বর্ণনার বাহুল্যবর্জিত গল্পের প্রতি আগ্রহ ছিল না তাহা ঠিক নয়। তবে সংস্কৃত সাহিত্যের জীবনদৃষ্টি ও রচনাশৈলী গল্পরসস্ফুরণের পক্ষে ঠিক অনুকূল ছিল না রবীন্দ্রনাথের এই অভিমত আংশিক হইলেও যথার্থ।

রবীন্দ্রনাথ এই সমালোচনায় কাদম্বরীর ন্যায় মন্থরগতি ও অলঙ্কার-বহুল আখ্যায়িকার ভাবপ্রতিবেশটি অতি আশ্চর্য নৈপুণ্যের সহিত পুনরুদ্ধার করিয়াছেন। আধুনিক সাহিত্যের যাহা লক্ষ্য প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের তাহা উপলক্ষ্য মাত্র। চরিত্র ও ঘটনা সংস্কৃত আখ্যায়িকায় সাধারণীকৃত ও গৌণ; বর্ণনার একচ্ছত্র আধিপত্যে উহারা সঙ্কুচিত ও উপেক্ষিত। ময়ূরপুচ্ছনির্মিত বিরাট্‌কায় ব্যজনের মত বর্ণনার বিপুল বিস্তার আখ্যানের মূল উদ্দেশ্যকেই ব্যর্থ, উহার গতিশীলতাকেই নিশ্চলপ্রায় করিয়াছে।

এতদ্ব্যতীত কাদম্বরীর অতি সূক্ষ্ম বর্ণসচেতনতা, উহার বর্ণনায় রংএর অজস্রতা ও বস্তুনিষ্ঠ-পর্যবেক্ষণপ্রসূত, নিখুঁত প্রয়োগ-যাথার্থ্য ঐতিহ্যগত ধারানুবর্তন বা ভারতীয় রুচিবৈশিষ্ট্যের পরিচয় নয়, উহা কাব্যটিরই মৌলিক দৃষ্টিস্বচ্ছতার, ইন্দ্রিয়ানুভবের তীক্ষ্ণতার নিদর্শন। আখ্যানকারের বর্ণসমাবেশ চিত্রাঙ্কনপ্রতিভার সমধর্মী; এক একটি দৃশ্য যেন এক একটি উজ্জ্বল চিত্রকল্পনায় উদ্ভাসিত ও সমস্ত উপন্যাসটি যেন একটি চিত্রশালার ন্যায় প্রতিভাত। রবীন্দ্রনাথ আরও লক্ষ্য করিয়াছেন যে এই চিত্রকল্প বর্ণনাগুলি শুধু বাহিরের রূপেরই যথার্থ অনুলিপি নয়, উহারা অন্তর্লোকেরও কবিত্বময় ভাবদ্যোতনা, অনুভূতিগ্রাহ্য গুণেরও যবনিকা-উন্মোচন। উহার সকাল ও সন্ধ্যার বর্ণালিম্পনসমূহ শুধু উহাদের বহির্দৃশ্যের নয়, ভাবব্যঞ্জনারও

পরিচয়বাহী। ইহার পর লেখক দুই একটি দৃশ্যের চিত্রোৎকর্ষের দৃষ্টান্ত দিয়া তাঁহার অপূর্ব রচনাটির উপসংহার করিয়াছেন।

'কাব্যের উপেক্ষিতা' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৭) রচনাটি ঠিক সাহিত্যসমালোচনা নয়, মহাকবি-রচিত জীবনবৃত্তের খণ্ডিতাংশের শূন্যস্থানপূরণ, কাব্য-দীপালিতে আলোকিত জীবনকাহিনীর পরিধি-বিস্তার, অভিনীত নাটকের পিছনে যে নেপথ্যলোক দর্শকের প্রত্যক্ষদৃষ্টিবহির্ভূত, তাহার কিয়দংশকে পাদপ্রদীপের প্রকাশ্যতায় আনয়নপ্রয়াস। বাল্মীকি ও বাণভট্টের হাত হইতে প্রদীপ লইয়া অনুরূপ কল্পনার অধিকারী আধুনিক কবি নূতন দীপ প্রজ্বলিত করিয়া তাঁহাদের আখ্যায়িকার অন্ধকার অংশে নির্ভীক ভাবে আলোকপাত করিয়াছেন, পূর্বসূরীদের প্রয়োজনসীমিত কোন কোন চরিত্রের অসম্পূর্ণ পরিচয়ের অনিচ্ছাকৃত অবিচারের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ প্রতিবাদ জানাইয়া এই উপেক্ষিতা নারীদের পূর্ণ কাব্যিক অধিকারের দাবী পেশ করিয়াছেন। সাধারণতঃ আমরা কাব্যে উল্লিখিত বিষয় সম্বন্ধেই আমাদের অভিমত প্রকাশ করি, বড় জোর কাব্যের বিভিন্ন চরিত্রকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে কি না তাহারই বিচার করি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সমালোচকের সহিত কবির যে সহজ সম্পর্ক তাহাতে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া কাব্যে অনুল্লিখিত বিষয়ের শূন্যলোকে নিজ কল্পনার বিমান উড়াইয়াছেন ও একটি অলিখিত অধ্যায় সংযোজনা করিয়া মানবিক আবেদনের ত্রুটি সংশোধন করিয়াছেন। ইহা কিন্তু কাব্যবিচার নয়, কাব্যরথচক্রের অমোঘ গতিতে পিষ্ট, বেদনায় মূক, মানবহৃদয়ের প্রতি ন্যায্য মর্যাদাদানের করুণ আবেদন। কবির নির্মম প্রয়োজনে যে সদ্যোবিকশিত ফুলটি পল্লবান্তরালে আত্মগোপন করিতে বাধ্য হইয়াছে, যে হৃদয়টি আপনার সমস্ত দলগুলি না মেলিতে পারিয়া পূর্ণ মানবিক সার্থকতা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথ সেই কাব্যচক্রব্যবচ্ছিন্ন অর্ধস্ফুট সত্তাগুলির অনুচ্চারিত মর্মবেদনা ব্যঞ্জনায় ব্যক্ত করিয়াছেন।

যে দুইটি দৃষ্টান্তের কবি এখানে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাদের প্রতি অবিচার ঠিক এক পর্যায়ের নয়। উর্মিলা শুধু বিস্মৃতা, উপেক্ষিতা। সমস্ত রামায়ণের পটভূমিকা রাম-সীতাকে কেন্দ্র করিয়া পরিকল্পিত। এই কেন্দ্রস্থ দম্পতির জীবন-মহিমা ফুটাইয়া তুলিতে অন্যান্য সমস্ত চরিত্র নিয়োজিত; তাহাদের স্বেচ্ছাবলুপ্তির উপরেই তাঁহাদের নভোস্পর্শী উত্তুঙ্গতা প্রতিষ্ঠিত

লক্ষ্মণের দাম্পত্যজীবনের কাহিনী চিত্রের অন্তর্ভুক্ত করিলে, ঊর্মিলার মনোবেদনা সীতার ভাগ্যহত ও প্রিয়বঞ্চিত জীবনবিপর্যয়ের সহিত যুক্ত হইলে রামায়ণের করুণ রসের অলৌকিক গৌরব ক্ষুণ্ণ হইত, তাহার আদর্শ রূপান্তরিত ও মূল্যান্তরিত হইত। কাজেই বাল্মীকি সমগ্রের ভাবসঙ্গতির জন্য ব্যক্তিকে বলি দিতে বাধ্য হইয়াছেন। ঊর্মিলাকে সীতার দুর্ভাগ্য-সহযোগিনী করিয়া দেখাইলে সীতাচরিত্রের অপ্রতিস্পর্ধী মাহাত্ম্য অবনমিত হইত। কাজেই পাদপ্রদীপের সমস্ত আলোক সীতার উপর কেন্দ্রীভূত করার জন্য ঊর্মিলাকে নেপথ্য-নির্বাসনে পাঠাইতে হইয়াছে। ইহা কাব্যের প্রয়োজনে জীবনের প্রতি অবিচার, কিন্তু ইহার কোন প্রতিকার নাই। ছবিকে দর্শনীয় করিতে হইলে ইহার যতটুকু আঁকা যায় ও যতটুকু বাদ দেওয়া যায়, উভয়ই তুল্যরূপে অপরিহার্য।

কিন্তু 'কাদম্বরী'র পত্রলেখা সম্বন্ধে ঠিক এই কৈফিয়ৎ দেওয়া যায় না। তাহাকে কাব্যমধ্যে যথেষ্ট গুরুত্ব ও সক্রিয় অংশ দেওয়া হইয়াছে। কেবল তাহার অদম্য যৌবনাবেগের পরিবর্তে তাহাকে এক যান্ত্রিক প্রয়োজনের নিকট সর্বতোভাবে অধীনরূপে, নারী-পুরুষের এক অস্বাভাবিক, নিরুত্তাপ সখ্য-সম্পর্কাবদ্ধরূপে দেখান হইয়াছে। দুই ক্ষুরধার নদীপ্রবাহের মধ্যবর্তী নদীগ্রাসকবলিতপ্রায় এক সঙ্কীর্ণ ভূমিখণ্ডই যেন তাহার চির-নিরাপদ আবাসভূমি, তাহার আত্মার চিরনির্ভরযোগ্য আশ্রয়স্থল, কবি এই মিথ্যা কল্পনাকেই সত্যের মর্যাদা দিয়াছেন। ঊর্মিলার ক্ষেত্রে ব্যক্তিসত্তার প্রতি উপেক্ষা, পত্রলেখার ক্ষেত্রে নারী-প্রকৃতির একান্ত অস্বীকৃতি ও নিগূঢ় অবমাননা—এই উভয় চরিত্র-পরিকল্পনার মধ্যে পার্থক্য। ঊর্মিলার আত্মবিলোপ, লক্ষ্মণের আত্মবিসর্জনের মতই, মহান্ আদর্শের নিকট মানবিক সহজ প্রবৃত্তির উৎসর্গ; ইহাতে লেখকের উদ্দেশ্যের সঙ্গে আমাদের সহানুভূতির বিচ্ছেদ হয় না। কিন্তু পত্রলেখার যৌবনতপ্ত, অতৃপ্ত প্রণয়পিপাসার সম্মুখে তাহার একান্ত সুহৃদ্ ও ঘনিষ্ঠ নৈকট্যে অবস্থিত এক সুখস্বপ্নবিভোর তরুণ দম্পতির প্রণয়সুধাপান-মহোৎসবের মত্ত উচ্ছলতা শুধু যে নারীস্বভাবকে উৎকটভাবে লঙ্ঘন করিয়াছে তাহা নহে; লেখক যে তাঁহার অনৌচিত্য বিষয়ে সম্পূর্ণ অচেতন তাহাও আমাদের ক্ষোভের মাত্রাকে অসহনীয় করিয়া তোলে। বাণভট্টের যুগের রাজপুত্রের নারী-সহচরী অতি-আধুনিক কালের তরুণ-সম্প্রদায়ের তরুণী-বান্ধবীর সহিত অনির্দেশ্য সম্পর্কের সামাজিক স্বীকৃতির

বিস্ময়কর পূর্বসূচনা বলিয়া মনে হয়। অবশ্য অতীতে রাজসভার কৃত্রিম প্রথা বর্তমানে নানা নূতন প্রয়োজন ও পরিস্থিতির অনিবার্য ফল ও জীবনের নূতন বিকাশরূপে উদ্বর্তিত হইয়াছে।

গঠনশীল কল্পনার সাবলীল প্রয়োগ, প্রাচীন মহাকাব্য ও আখ্যান-কাব্যের সুরে সুর মিলাইয়া উহাদের চরিত্র-কল্পনার মধ্যে আধুনিক জিজ্ঞাসার সার্থক অনুপ্রবেশ, প্রাচীন সাহিত্যের বিরাট্ প্রেক্ষাপটে পরবর্তীযুগের চিন্তাকল্পনা ও ঔচিত্যবোধের নিপুণ প্রক্ষেপ ও মূল আখ্যানের রন্ধ্রপথে নব সুরোচ্ছ্বাসের বিচিত্র রসসঞ্চার—এই সমস্তই এই রচনার আশ্চর্য কৃতিত্ব। রবীন্দ্রনাথ গীতিকবির মনোভাব ও ব্যক্তিমর্যাদাবোধ লইয়া প্রাচীন কাব্যের নৈর্ব্যক্তিক ও আদর্শপ্রধান রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন ও তাহার আকাশ-বাতাসকে এক নূতন ব্যঞ্জনাময় সুরে উতলা করিয়া তুলিয়াছেন। যজ্ঞের হোমাগ্নি হইতে তিনি বাসরের মিলন-বিরহমধুর, স্নিগ্ধ গার্হস্থ্য প্রদীপ জ্বালাইয়াছেন।

'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা' (পৌষ, ১৩০৮) ও 'শকুন্তলা' (আশ্বিন, ১৩০৯)-এই দুইটি রচনা কালিদাসের কাব্যকলার মধ্যে অতি নিগূঢ় অনুপ্রবেশ ও উহার অপূর্ব রসবিশ্লেষণের নিদর্শন। ইহাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের কাব্য-অভিপ্রায়ের সূক্ষ্মতম ও ব্যাপকতম প্রেরণাটি আবিষ্কার করিয়া কাব্যদ্বয়ের বস্তু-ও-ভাব-সন্নিবেশে তাহা কেমন করিয়া অভিব্যক্ত হইয়াছে তাহা অপূর্ব অন্তর্দৃষ্টির সহিত প্রকটিত করিয়াছেন। মহাকবি না হইলে অপর একজন পূর্বসূরী মহাকবির অন্তরলোকে এরূপ প্রবেশাধিকার, তাঁহার শিল্পকলার রংমহলের গোপন তত্ত্বটির এমন নিখুঁত অনুভব সম্ভব হইত না। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে বহু মনীষী কালিদাসের কাব্য আলোচনা ও তাঁহার অনুপম কবিত্বশক্তির উচ্ছ্বসিত প্রশংসাও করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা কেহই কালিদাসের মনোলোকের, তাঁহার ভাবাদর্শ ও শিল্পকৌশলের এরূপ রসগ্রাহী তত্ত্বনির্ণয় করিতে পারেন নাই। কালিদাস-সমালোচনা রবীন্দ্রনাথের হাতে একটি চূড়ান্ত প্রামাণ্য রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। অথচ এখানে তত্ত্বের সঙ্গে রসের কোন বিরোধ নাই, বরং তত্ত্ব রসের উৎসেরই সন্ধান দিয়াছে।

কালিদাসের নীতিহীন সৌন্দর্যানুরাগবিষয়ক যে ভ্রান্ত ধারণা আবহমান-কাল হইতে প্রচলিত ছিল, রবীন্দ্রনাথ তাহার সম্পূর্ণ নিরসন করিয়াছেন।

তিনি প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে নীতিসংযম ও কল্যাণবোধের অস্খলিত আশ্রয়ভূমি হইতেই কালিদাসের প্রেম-ও-সৌন্দর্য-চেতনা উদ্ভূত ও উহাদের সহিত অচ্ছেদ্য সম্পর্কে জড়িত। 'কুমারসম্ভব' ও 'শকুন্তলা' উভয়ত্রই কালিদাস প্রেমের যে পরিণতি দেখাইয়াছেন তাহাতে তাঁহার এ বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয় প্রমাণিত হয়। প্রেম যতদিন কোন উচ্চতর সংযমকে স্বীকার করে না, যতদিন নিজ উচ্ছ্বসিত আতিশয্যই উহার একমাত্র প্রেরণা, ততদিন ইহা ব্যর্থ ও পরাভব-ধিক্কৃত। যখনই উহা কল্যাণনীতি ও আত্মবিলোপকে নিজ নিয়ন্ত্রী শক্তিরূপে গ্রহণ করিল, তখনই উহা নিজে সার্থক ও সমস্ত প্রতিবেশব্যাপী সার্থকতার হেতু। পাশ্চাত্ত্য দৃষ্টিতে প্রেমের বিবাহান্তিক বা প্রত্যাখ্যান-করুণ পরিণতি একটি অত্যন্ত গতানুগতিক, বর্ণোচ্ছ্বাসহীন পর্যবসান। কাজেই 'কুমারসম্ভব'-এ অকালবসন্তের বর্ণসমারোহময়, অগ্নিপ্রভ কাননপরিবেশে পূর্ণপ্রসাধিতা উমার ব্যর্থ প্রণয়াভিসারের যে লজ্জা-অরুণিমা ও 'শকুন্তলা'-তে প্রণয়স্বপ্নাচ্ছন্না, মিলন-অধীরা ঋষিবালার রাজসভায় প্রত্যাখ্যানের যে নাটকীয় মুহূর্ত তাহাই যবনিকাপাতের প্রকৃষ্টতম লগ্ন বলিয়া মনে করাই এই দৃষ্টিভঙ্গীর পক্ষে স্বাভাবিক।

রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শিতার সহিত তপস্বিনী উমা ও বসন্তপুষ্পাভরণ-সজ্জিতা, মদন ও বসন্তের সহায়তাপেক্ষিণী রাজকুমারীর এবং কণ্বাশ্রমে প্রণয়স্বপ্নবিভোরা ও মরীচীর তপোবনে কৃচ্ছ্রসাধননিরতা শকুন্তলার মধ্যে পার্থক্যটি দেখাইয়াছেন। গৌরীর প্রেম যখন মহেশ্বরের ভস্মবিভূষণ কান্তিকে ভাবের চোখে প্রত্যক্ষ করিল, শকুন্তলার প্রেম যখন দুষ্মন্তের অপরাধকে আত্মবিলোপী ঔদার্যের সহিত ক্ষমা করিতে পারিল, তখনই তাহারা ভোগসীমা উত্তীর্ণ হইয়া মঙ্গলময় বিশ্ববিধানের অঙ্গীভূত হইয়াছিল। কণ্বাশ্রমে গাছপালা লইয়া মাতামাতি, সখীবৃন্দের চটুল পরিহাসমুখরতা, মরীচী-তপোবনে নিঃসঙ্গ, নীরব স্মৃতিরোমন্থনে ও একমাত্র বালকের স্নেহ-পরিচর্যায় তন্ময় এক ভাবগম্ভীর পরিণতি লাভ করিয়াছে। এই পবিত্র সম্পর্কে সংযত প্রেমে, এই গৃহ ও তপোবনের সহজ মিলনেই ভারতীয় প্রেমাদর্শের পূর্ণতা প্রতিফলিত হইয়াছে।

'শকুন্তলা' (আশ্বিন, ১৩০৯) রবীন্দ্র-সমালোচনার বিষয়ের মর্মানুপ্রবেশী শক্তির আর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। গ্যেটের একটি অর্থনিবিড়, ব্যঞ্জনাগর্ভ মন্তব্যকে অবলম্বন করিয়া তিনি 'শকুন্তলা'র অন্তর্নিহিত কাব্য-অভিপ্রায়টিকে

অতি সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করিয়া উহাকে একটি মৌলিক সৃষ্টিরূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন। ভাবিতে আশ্চর্য লাগে যে আমাদের দেশে কালিদাসের এত বিশেষজ্ঞ অনুরাগী থাকা সত্ত্বেও কবির 'শকুন্তলা'-র অখণ্ড ভাবতাৎপর্যটির আবিষ্কার ও উহার হীরকদ্যুতিময় স্বল্পবাক্ প্রকাশ একজন পাশ্চাত্ত্য মহাকবির জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল। উহার নদীপ্রবাহবৎ সরল, কাব্যরসমধুর, নাট্যসংঘাতের বহিশ্চাঞ্চল্য-বর্জিত কাহিনীর মধ্যে যে একটি আত্মিক পরিণতির নিগূঢ় ইতিহাস, মর্ত হইতে স্বর্গে ও ফুল হইতে ফলে নিঃশব্দ উত্তরণের যে অলক্ষ্যপ্রায় গতিচ্ছন্দ প্রচ্ছন্ন তাহা এই বিদেশী ও অনুবাদের সাহায্যে মূলের রসাস্বাদনকারী বিদগ্ধ মনের নিকট প্রথম ধরা পড়িয়া গেল। আমাদের ভারতীয় মহাকবি জর্মন মহাকবির এই সূক্ষ্ম ইঙ্গিতের সম্প্রসারণে 'শকুন্তলা'-রচয়িতার মনের অন্তরালবর্তী জীবন-কল্পনাটি মনোজ্ঞ, রসাপ্লুত ভাবে আমাদের বোধগম্য করিয়াছেন। পূর্ব যুগের প্রাচীন কবির মর্মবাণী পাশ্চাত্ত্য কবির দীপ হইতে সংগৃহীত আলোকে ও স্বদেশীয় আধুনিক কবির আশ্চর্য আলোকবিকিরণশক্তির মাধ্যমে আমাদের নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

গ্যেটের প্রতিভা-বিচ্ছুরিত আলোকবিন্দুকে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার রশ্মিসংগ্রহ ও ঘনীভূত করার অপূর্ব নৈপুণ্যে সমস্ত কাব্যের মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়াছেন ও উহার সমস্ত অস্পষ্ট অংশকে স্বচ্ছ করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি প্রথম দিকে শকুন্তলার কামনার মধ্যে মর্ত্য অসংযম ও আবিলতা ও প্রত্যাখ্যানের মর্মান্তিক দুঃখে উহার পরম বিশুদ্ধিতে উদ্বর্তন-প্রক্রিয়াটি বিস্তারিত আলোচনার দ্বারা দেখাইয়াছেন। শকুন্তলার স্বভাবের মধ্যেও অসতর্ক সরলতার স্বর্গমর্তমিলনের সাক্ষ্যটি পরিস্ফুট হইয়াছে। তাহার তপস্বী পিতা ও অপ্সরা মাতার রক্ত তাহার মধ্যে মিশিয়া তাহাকে একদিকে যেমন স্বভাবধর্মের অনুগত, অন্য দিকে তেমনি উচ্চতর সাধনাতৎপর করিয়াছে। তাহার গান্ধর্ব বিবাহ একদিকে যেমন যৌবন-উদ্দামতার নিকট আত্মসমর্পণ, অন্যদিকে তেমনি অত্যাজ্য পাতিব্রত্য-আদর্শের স্বীকৃতি। তাহার জীবনে যেমন, তাহার বিশেষ দাম্পত্য সমস্যাতে ও উহার সমাধানেও তেমনি, স্বর্গ ও মর্ত হাত মিলাইয়াছে। শকুন্তলার শৈশবস্বর্গ অনুতাপের মধ্যাহ্নতাপে দগ্ধ হইয়াই পরিণামে জীবনের গভীর-অভিজ্ঞতাপ্রসূত, আত্মত্যাগের শান্তিময় অধ্যাত্ম ধামে পৌঁছিয়াছে।

ইহার পর রবীন্দ্রনাথ 'শকুন্তলা'র বিশিষ্টতা-প্রতিপাদনের জন্য উহাকে 'টেম্পেস্ট'-এর সহিত তুলনা করিয়া নিজ সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন। প্রথমতঃ প্রতিবেশ-চিত্রণে প্রস্‌পারোর নির্জন দ্বীপ কেবল নাট্যঘটনার একটি বহিরঙ্গ স্থানাশ্রয় রচনা করিয়াছে। ইহাতে সংসারজ্ঞানহীনা মিরাণ্ডার প্রেম, প্রস্‌পারোর প্রজ্ঞাসম্ভূত অলৌকিক শক্তি ও মানবের সঙ্গে বহিঃপ্রকৃতির অনুকূল-প্রতিকূল আচরণের রূপক তাৎপর্য আত্মবিকাশের সুযোগ পাইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের কোন একাত্মতামূলক সম্পর্ক এখানে গড়িয়া উঠে নাই। ইহার সহিত তুলনায় কণ্বাশ্রমের প্রাণী ও প্রকৃতি নাটকের নায়িকার সহিত এক অনির্বচনীয় নিবিড় প্রীতিসম্পর্কে এক হইয়া উঠিয়াছে। তপোবনমৃগের ক্রীড়াশীলতা, আশ্রমতরুলতার বসন্ত-লাবণ্য সবই যেন শকুন্তলা-প্রকৃতিতে নিগূঢ়ভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে। প্রস্‌পারো যে উদাসীন প্রকৃতিকে মন্ত্রশক্তিতে পরিচর্যায় নিয়োজিত করিয়াছে, শকুন্তলা প্রীতির অমোঘতর আকর্ষণে তাহাকে নিজ সত্তার মধ্যে অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছে। এক গ্রন্থে, বলের নিকট অনিচ্ছুক নতিস্বীকার, অপরে, অকৃত্রিম সমানুভবের দ্বারা সম্পূর্ণ আত্মিক সমীকরণ। 'টেম্পেস্ট'-এ যে সমাধান পাপের শাস্তিমূলক দমনে, 'শকুন্তলা'-য় তাহা আসিয়াছে অনুতাপের গভীরতায় অপরাধের আত্মাবলয়ে। 'শকুন্তলা'-নাটকের অন্তর্গূঢ় সংযম, সমস্ত গোপন-ক্রিয়াশীল দ্বন্দ্ব-সংঘাতের নীরব সংহরণ প্রকৃতির বাহ্যচাঞ্চল্যহীন কর্মসাধনার সঙ্গে একছন্দে গাঁথা। শকুন্তলা-দুষ্মন্তের হৃদয়ে যে বহ্নিশিখা প্রজ্বলন্ত ছিল, তাহার দুই একটি স্ফুলিঙ্গমাত্র লেখকের আশ্চর্য নীরবতার অন্তরাল ভেদ করিয়া বাহিরে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে।

'রামায়ণ' (পৌষ, ১৩১০) ও 'ধম্মপদং' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২—'ভারতবর্ষ') 'প্রাচীন সাহিত্য'-এর অন্তর্ভুক্ত অবশিষ্ট দুইটি প্রবন্ধ। 'রামায়ণ'-এ মহাকাব্যের প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছেন তাহা অধুনা সমালোচনা-তত্ত্বের স্বতঃসিদ্ধ সত্যে পরিণত হইয়াছে। তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। রামায়ণ-মহাভারত ভারতবর্ষের যুগে যুগে পরিবর্তনশীল ঘটনাপ্রবাহের স্মৃতিতে বিবর্ণ-হইয়া-আসা ইতিহাস নয়; ইহা ভারতের চিরন্তন সাধনার চিরস্থির ইতিহাস। রামায়ণের বিষয়বস্তু বীররসপ্রধান বা দেবমাহাত্ম্যঘোষক নয়, ইহা গৃহস্থাশ্রমস্থিত, সর্বগুণসম্পন্ন নরশ্রেষ্ঠের জীবনচরিত। গার্হস্থ্যাশ্রমের আদর্শকে বৃহত্তম ধর্মনীতির পরিপ্রেক্ষিতে, শাশ্বত-ধর্মপ্রেরণার আশ্রয়রূপে দেখানই

ইহার উদ্দেশ্য। উহার অনন্তাভিমুখী সম্প্রসারণ, উহার অসীমাভিসারী দিব্য তাৎপর্য, উহার বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর সন্ধান রামায়ণের একনিষ্ঠ লক্ষ্য। যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রাষ্ট্রগৌরব এই গার্হস্থ্য ধর্মের মহিমা-প্রতিষ্ঠার উপলক্ষ্য মাত্র।

গার্হস্থ্য জীবনের অতিরঞ্জিত মহিমা, সমতলভূমির নভোচুম্বী উচ্চতায় উন্নয়ন, পাশ্চাত্ত্য সমালোচকের মতে, চরিত্র ও ঘটনাসন্নিবেশে আতিশয্যের কারণ হইতে পারে। কিন্তু এই আতিশয্যের সীমারেখা বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন মানে বিচার্য ও জাতীয় ভাবসাধনার মাত্রার উপর নির্ভরশীল। রামায়ণের ক্ষেত্রে ভারতীয় পাঠক যে কোনরূপ আতিশয্যবিড়ম্বনা অনুভব করে নাই, তাহার বাস্তব অভিজ্ঞতার ও সত্যবোধের সীমালঙ্ঘনের যে কোন অবিশ্বাস্যতার দ্বারা পীড়িত হয় নাই, তাহা তাহার বহুশতাব্দী ধরিয়া রামায়ণের আদর্শের একান্ত নিষ্ঠাপূর্ণ অনুসরণের দ্বারাই নিঃসংশয়ে প্রতিষ্ঠিত।

এই উপলক্ষ্যে লেখক সমালোচনার আদর্শ সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। পূজাব আবেগমিশ্রিত ব্যাখ্যাই প্রকৃত সমালোচনা, নিজ ভক্তিবিগলিত বিস্ময় অন্যচিত্তে সঞ্চারিত করাই যে সমালোচকের যথার্থ কাজ রবীন্দ্রনাথ নিঃসংশয়ে এই মতে তাঁহার আস্থা ঘোষণা করিয়াছেন। হয়ত রামায়ণ-মহাভারতের ন্যায় সর্বজনপূজ্য ধর্মগ্রন্থ-আলোচনায় ইহাই সমালোচনার আদর্শ রূপে স্বীকৃতি লাভ করিতে পারে। কিন্তু অন্যবিধ রচনার মধ্যেও এই সশ্রদ্ধ ও অনুকূল মনোভাবই যথাসম্ভব প্রযোজ্য, ইহা সমালোচনার সার্বভৌম মূল সূত্ররূপে নির্দেশিত হইবার যোগ্য। 'রামায়ণ'-এ খণ্ড সত্যের পরিবর্তে পরিপূর্ণতার সাধনাই যে মানবজীবনের শ্লাঘ্যতর আদর্শ ও জীবনচিত্রণকারী মহাকাব্যেরও যে ঐ একই লক্ষ্য, গ্রন্থের রসাস্বাদন ও স্বরূপ-নির্ণয় হইতে রবীন্দ্রনাথ এই সত্য সিদ্ধান্তেই পৌঁছিয়াছেন।

'ধম্মপদং' প্রবন্ধটি মূলতঃ তত্ত্বচিন্তা, সাহিত্য-সমালোচনা নয়। ইহাতে লেখক ইউরোপীয় ও ভারতীয় ইতিহাসের স্বরূপ ও উপকরণের পার্থক্য বিষয়ে তাঁহার বহুধা-পুনরাবৃত্ত মতের পুনরুক্তি করিয়াছেন। 'গীতা'র ন্যায় 'ধম্মপদং'-এর নীতিবাক্যগুলি ভারতে বহুপ্রচলিত ও ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত উপদেশসমূহের সংহত সংগ্রহ। ভারতে তিনটি মতবাদের তাত্ত্বিক বিভেদ ও ব্যবহারিক ঐক্য রবীন্দ্রনাথ চমৎকারভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। মায়াবাদীরা অবিদ্যা-বিনাশের দ্বারা সমস্ত ভেদবুদ্ধির বিলোপ করিতে চাহেন, নিষ্কামকর্মবাদীরা নিষ্কাম কর্মসাধনার দ্বারা কর্মশৃঙ্খলচ্ছেদনের অভিলাষী

আর লীলাবাদীরা ভগবানের লীলা অনুভবের মধ্যে নিজ ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের নিমজ্জনপ্রয়াসী। ইহাদের দার্শনিক ভিত্তি বিভিন্ন হইলেও কর্মসাধনার মধ্যে ঐক্য আছে। এই কর্মসাধনার মূল কথা হইল বাসনাকে খর্ব করা ও কর্মের দ্বারাই কর্মের আধিপত্য হইতে মুক্তি। ভারতবর্ষীয় ধর্মতত্ত্ব যতই দুরূহ হউক, উহাকে কর্মে প্রয়োগ করার বিষয়ে কেহই পশ্চাৎপদ হইতেন না। ভারতবর্ষ বিশ্ব হইতে অবলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা সত্ত্বেও কর্মে নিঃস্পৃহতার সাধনা করিয়াছে। ভারত যদি বিশ্বব্যাপী লোভ-মোহের মত্ততা ও রাষ্ট্রের হিংস্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে, মৃত্যুপণ করিয়াও সচেতনভাবে, আত্মার সমস্ত শক্তিকে জাগ্রত করিয়া কর্মে অনাসক্তির শান্তিময় পথে অবিচল থাকিতে পারে, তবে জগৎকে সে এক নূতন ধর্মে দীক্ষা দিবার অধিকারী হইবে।

সর্বশেষে রবীন্দ্রনাথ অনুবাদককে মূলের আক্ষরিক অনুসরণের আদর্শে স্থির থাকিবার অনুরোধ জানাইয়া ও দুই-একটি দৃষ্টান্ত-উদ্ধারের সাহায্যে এই আদর্শচ্যুতি কিরূপ অর্থবিপর্যয়ের কারণ হইয়াছে তাহা দেখাইয়া প্রবন্ধটির উপসংহার করিয়াছেন। এই প্রবন্ধটি মূলতঃ তত্ত্বাশ্রয়ী হওয়াতে 'প্রাচীন সাহিত্য'-এর রচনাগুলির মূল সুর হইতে খানিকটা ভিন্ন পথের অনুগামী। এখানে প্রাচীন যুগের রসভূয়িষ্ঠ বাতাবরণ পুনর্গঠনের পরিবর্তে আমরা প্রাচীন ধর্মের তত্ত্বকায়া নির্মিতির প্রয়াস লক্ষ্য করি। ইহা অনায়াসে সমাজ-ও-ধর্মনীতি-বিষয়ক প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিত।

২

(৪) অভিভাষণ

রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণ-জাতীয় তিনটি প্রবন্ধ—'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' (বৈশাখ, ১৩১২—'আত্মশক্তি ও সমূহ', জন্মশতবার্ষিকী-সংস্করণ, দ্বাদশ খণ্ড, ৭২০—৭৩৪ পৃষ্ঠা) 'সাহিত্যসম্মিলন' (ফাল্গুন, ১৩১৩) ও 'সাহিত্যপরিষৎ' (চৈত্র, ১৩১৩)—(জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, ত্রয়োদশ খণ্ড, ৮৬৮—৮৮৭ পৃষ্ঠা) এই স্থানেই আলোচিত হইতে পারে। ইহাদের মামুলি পদ্ধতির মধ্যে রাজনৈতিক কর্মপন্থার অনুসরণে আত্মনির্ভরশীলতার অবশ্যপ্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সুদৃঢ় প্রত্যয়ের বারংবার উল্লেখ আছে। সুতরাং এক দিক দিয়া ইহারা পুরাতনের পুনরাবৃত্তি ও সেইজন্য ক্লান্তিজনক। কিন্তু

পক্ষান্তরে ইহাদের মধ্যে সাহিত্যিক গুণের প্রাচুর্য, উক্তি-মন্তব্যের স্মরণীয় তীক্ষ্ণতা ও আবেগের ঊর্ধ্বগ্রামচারী সঙ্গীতকম্পন মাঝে মধ্যে লক্ষণীয় রচনাভঙ্গীবৈশিষ্ট্যরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। গতানুগতিক বিষয় ও আলোচনাক্রমের মধ্যেও রবীন্দ্রমনীষার অতর্কিত স্ফুরণ তাঁহার সাহিত্য-প্রেরণার দীপ্ত স্ফুলিঙ্গসঞ্চারের পরিচয় বহন করে। রবীন্দ্ররচনায় ভস্মের মধ্যেও রত্নদ্যুতি হঠাৎ ঝলসিয়া উঠে বলিয়া ভস্মকেও সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করার মধ্যে বিপদ আছে।

'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ'-এ রবীন্দ্রনাথ যে ছাত্রমণ্ডলীর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা সদ্যোসমাপ্ত হইয়াছে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হইতে পরিষদের কাযে যোগদানের জন্য তাহাদিগকে উদাত্ত আহ্বান জানাইয়াছেন। দেশবাসীর মন হইতে ইংরাজি শিক্ষা ও সাহিত্যের মোহ যে ক্রমশঃ কাটিয়া যাইতেছে ও দেশীয় আদর্শের প্রতি তাহাদের আস্থা ধীরে ধীরে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইতেছে ইহা কালের একটি বিশিষ্ট শুভলক্ষণ। এখন ইংরাজিশিক্ষিত সম্প্রদায়ও দেশবাসীর সহিত মিলন-প্রেরণা আবার নূতন করিয়া অনুভব করিতেছেন। কলেজের শিক্ষা বিদেশীভাবাশ্রিত ও স্বদেশীয় বস্তুসম্পর্কহীন বলিয়া ছাত্রদের মনে কোন স্পষ্ট ধারণা জাগাইতে বা তাহাদের মৌলিক উদ্ভাবনাশক্তিকে উদ্দীপ্ত করিতে অক্ষম হইতেছে। সুতরাং তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তির প্রকৃত স্ফুরণের জন্য তাহাদের জন্য কলেজী শিক্ষার বহির্ভূত স্বাধীনচিন্তাবিকাশের একটি স্বতন্ত্র ক্ষেত্র প্রস্তুত রাখিতে হইবে। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ দেশের ভাষাগত উপকরণ-সঙ্কলনের জন্য প্রত্যেক স্থানে প্রচলিত লোককিংবদন্তী বা আচারপার্থক্যবিষয়ক তথ্যসংগ্রহের কাজে, বা নূতন নূতন লৌকিক ধর্মসম্প্রদায়ের উদ্ভব ও মতবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য-সন্ধান-ব্যাপারে ছাত্রদের নিযুক্ত করিয়া দিলে তাহাদের শিক্ষার অসম্পূর্ণতাও দূর হইবে ও দেশকে ভাল করিয়া চিনিয়া তাহারা দেশসেবার ব্যাপকতর ক্ষেত্রে যোগদানের যোগ্যতাও অর্জন করিতে পারিবে।

ইহার পর রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের নিজের কৈশোরকালের ও তৎকালীন তরুণ সম্প্রদায়ের সদ্যআরব্ধ যৌবনযুগের মধ্যে একটি তুলনা করিয়াছেন। প্রত্যেকেই নিজ যৌবনকালকে স্বর্ণময় বলিয়া ভাবিতে অভ্যস্ত ও পরবর্তী যুগের যৌবনাবস্থাকে তুলনায় ম্লানতর মনে করিয়া থাকে। হয়ত ইহা আত্মশ্রেষ্ঠতার পক্ষপাতমূলক বিভ্রান্তি। রবীন্দ্রনাথ যথাসম্ভব অপ্রমত্ত

বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া তাঁহাদের যুগে তারুণ্যের আশাবাদ যে বর্তমান যুগের তুলনায় আরও দীর্ঘস্থায়ী ও মোহভঙ্গপ্রতিরোধী ছিল এই সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন। কিন্তু আশা-উৎসাহ যদি অভিজ্ঞতাবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কর্ম-প্রয়োগে নবজীবন লাভ না করে তবে উদ্দেশ্যহীন উদ্দামতায় তাহা শীঘ্রই নিঃশেষিত হয়। বৃহৎ ভাব কর্মবন্ধনে আবদ্ধ না হইলে চিন্তাকাশে কুহেলিকার মত ব্যাপ্ত হইয়া স্বচ্ছ দৃষ্টিকে অবরোধ করে। কর্মসাধনাহীন দেশানুরাগ বন্ধ্যা ভাববিলাসে পর্যবসিত হইয়া কেবল আত্মবঞ্চনার মরীচিকা-বিভ্রম জন্মায়। সুতরাং সে যুগের ভাবোচ্ছ্বাস ক্রমশঃ আত্মকেন্দ্রিক বাস্তব-বুদ্ধিতে সঙ্কুচিত হইয়া নিজেকে ব্যর্থ করিয়াছে। ভাবসম্ভোগের নেশায় মহিমাময় আদর্শবাদ আত্মবিস্মৃত আরামশয্যায় কর্তব্যনিষ্ঠার সহিত সম্বন্ধ হারাইয়াছে।

উপসংহারের পূর্বে রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রকৃতি বিষয়ের উদ্দেশ্যপরতন্ত্রতাকে অতিক্রম করিয়া তরুণ সম্প্রদায়ের প্রতি কাব্যোচ্ছ্বাসময় ভাবাবেগপূর্ণ আবেদনে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তিনি তাহাদিগকে পূর্ব যুগের ব্যর্থতা ভুলিয়া নূতন যুগের নব প্রভাতের কর্মোদ্যমে সমস্ত মনপ্রাণ সঁপিয়া দিয়া, কর্মারম্ভের আপাতক্ষুদ্রতার নৈরাশ্যের মধ্যে মহত্তর পরিণতির বীজ প্রত্যক্ষ করিয়া, বাঙলা দেশকে চিনিবার, বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের সেবা করিবার প্রবল আগ্রহের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইবার মহৎ কার্যে আত্মনিয়োগের আহ্বান জানাইয়াছেন।

একেবারে শেষ অনুচ্ছেদে বক্তা নিজ মাত্রাহীনতা ও আতিশয্যপ্রবণতা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া তরুণ শ্রোতৃমণ্ডলীর ঔচিত্যবোধের নিকট মার্জনা চাহিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের শিল্পবোধ যে কিরূপ অতন্দ্র ইহাতে তাহারই প্রমাণ পাওয়া যায়।

'সাহিত্যসম্মিলন'-এ বরিশালের রাজরোষে ব্যাহত সম্মিলনের আয়োজন যে আবার কলিকাতায় পুনরনুষ্ঠিত হইয়াছে, ঐতিহাসিক যোগ-সূত্রের এই বেদনাময় স্মৃতিই ইহাকে অসাধারণ গুরুত্ব দিয়াছে। সম্মিলনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অনেক মহৎ-ভাবাত্মক অথচ কার্যতঃ নিষ্ফল কথা বলা যাইতে পারে, কিন্তু উহার জন্য আকাংক্ষাই দেশের নাড়ীর সঙ্গে উহার নিবিড় যোগ সূচিত করে। বাঙালী জাতি যে ভিতরে ভিতরে একটা ক্রমবর্ধমান মিলনের প্রেরণা অনুভব করিতেছে ও উহাকে কার্যকরী রূপ দিবার জন্য অত্যন্ত

উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে সাহিত্যসম্মিলন তাহারই নিদর্শন। সাহিত্যিকবৃন্দই এই মিলনযজ্ঞের পুরোধা ও এ বিষয়ে নেতৃত্বের অগ্রাধিকার তাঁহাদেরই প্রাপ্য। সাহিত্য প্রয়োজনাতীত আনন্দের বাহন বলিয়া, উহার সৌন্দর্যচর্চায় স্থূলবৃত্তির প্রভাব সর্বাপেক্ষা কম বলিয়া ও উহার রসপরিবেশন বিশেষভাবে জাতির উদ্‌ভূতশক্তিপ্রণোদিত বলিয়া উহার আকর্ষণ সার্বভৌম ও সবচেয়ে অমোঘ। কাজেই সাহিত্যই আদর্শ মিলন-সেতু। ময়ূরের বর্ণচ্ছটাময় পুচ্ছবিস্তার, প্রভাতকালে পাখীর অহেতুক ও অপরিমিত আনন্দ-কাকলী, আষাঢ়-মেঘের ধারাবর্ষণের অজস্র দাক্ষিণ্য—এইসব প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া ও ফলপরিণতিই মানবের সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত। এমন কি যে সমস্ত দেশে বিশুদ্ধ ভাবমহিমা স্বার্থপ্রয়োজনের আধিক্যে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, সেখানে সাহিত্যিক বিকাশও সেই পরিমাণে প্রতিরুদ্ধ। ইংলণ্ড ও জর্মনির সাম্রাজ্যবাদ উহাদের ভাবাকাশের স্বচ্ছতাকে মলিন করিয়াছে ও উহাদের সৃষ্টিপ্রেরণাশক্তির হানি ঘটাইয়াছে। বাঙলা দেশে বৈষ্ণব কাব্যধারা প্রথম বাঙালীজাতিকে আঞ্চলিকতার ভেদরেখা উত্তীর্ণ হইয়া এক বৃহৎ ভাবসঙ্গমে মিলাইয়াছে ও আধুনিক যুগে যে নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্ঞানপ্রবাহ সাহিত্য-স্রোতস্বতীর সহিত মিশিয়া উহাতে বেগসঞ্চার করিতেছে তাহাতে এই নূতন সাহিত্য যে দেশের মিলনতীর্থে পরিণত হইতে চলিয়াছে তাহার সম্ভাবনা স্পষ্ট হইয়াছে।

রাজনৈতিক মর্মবেদনার স্মৃতি যতদূর সম্ভব ভুলিয়া সাহিত্যের গঠন-মূলক কাজে, বৃহৎ উদ্যোগ-আয়োজনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। সাহিত্যিক গোষ্ঠীর মধ্যে প্রীতি-সম্পর্কস্থাপন হয়ত চেষ্টাসাধ্য না হইতে পারে। মাতৃভাষার উন্নতিসাধনও হয়ত ঠিক দলবদ্ধ প্রয়াসসাপেক্ষ নয়। "অনাবৃষ্টির দিনে কী করিলে মেঘের আবির্ভাব হইবে সে চিন্তা মনে আসে ; কিন্তু কী করিলে মেঘের সৃষ্টি হইতে পারে তাহার সিদ্ধান্ত করা যায় না।" কিন্তু পুরাবৃত্ত, ভাষাতত্ত্ব, লোকবিবরণ প্রভৃতির চর্চা ও সংগ্রহ সুশৃঙ্খল আয়োজন ও পরিচালনার দ্বারা সম্ভব। এবং এইরূপ চর্চার উপর সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি ও শক্তিসঞ্চয় শেষ পর্যন্ত নির্ভরশীল। কাজেই সাহিত্যসৌধনির্মাণের পূর্বে উহার ভিত্তিভূমি পরিষ্কার ও মাল-মসলা-সংগ্রহ যে প্রয়োজনীয় তাহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য। দেশের বৃত্তান্তের জন্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মুখাপেক্ষী না হইয়া নিজ চেষ্টায় দেশের পরিচয় উদ্‌ঘাটন যে ভাববিলাসী স্বদেশপ্রেম

অপেক্ষা যথার্থতর দেশাত্মবোধের নিদর্শন সে সম্বন্ধেও কাহারও সন্দেহ থাকা উচিত নয়। শুধু দেশের পণ্য ব্যবহার করিব, দেশসম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান-সঞ্চয়ে উদাসীন থাকিব এই দুই মনোভাবের মধ্যে স্ববিরোধ স্বতঃ-পরিস্ফুট। দেশে জন্মিলেও দেশ স্বদেশ হইয়া উঠে না। নিষ্ঠাপূর্ণ সেবার দ্বারাই সে অমূল্য অধিকার অর্জন করিতে হয়।

উপসংহারে রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের শ্লোক অবলম্বন করিয়া অস্তমিত পূর্বযুগ ও উদয়োন্মুখ নবযুগের মধ্যে পার্থক্য পরিস্ফুট করিয়াছেন ও নবযুগের প্রতিনিধি, আশা-উৎসাহ ও নবচেতনার প্রতীক্ তরুণ ছাত্রদলকে পূর্বসূরীদের শ্লথ হস্ত হইতে দেশচালনার রশ্মিজাল তুলিয়া লইবার যে আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন তাহা প্রথানুগত ভাষণকে কাব্যমহিমায় উন্নীত করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তা এখানে নিবন্ধলেখকের উপর জয়ী হইয়াছে।

বহরমপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অধিবেশন উপলক্ষ্যে তৃতীয় ভাষণটি প্রদত্ত হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ভাষণের প্রারম্ভে বলিয়াছেন যে দেশের সবত্র যে একটা মানসিক অস্থিরতার ঘূর্ণীবায়ু প্রবাহিত হইতেছে আমাদের সমস্ত অসম্পূর্ণ প্রয়াস, সমস্ত নিষ্ফল মিলনোৎকণ্ঠা, সমস্ত উত্তাল উদ্দামতার সমাধি-নীরব নিশ্চলতা তাহারই বহির্লক্ষণ। এই অস্বাভাবিক বেগের তীব্রতা আমাদের নাড়ীতে সঞ্চারিত হইয়া আমাদের মনে যত দুরাশা, যত বাষ্পস্ফীত কল্পনা, যত সাধ্যাতীত কর্মোদ্যম প্রণোদিত করিতেছে। হয়ত এই দেশব্যাপী অধীর চেষ্টা ফলপ্রাপ্তির সময় যে আসন্ন সেই শুভ সংবাদেরই সূচনা।

তাহার পর আবার নিজের কাজের দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করা, অবাস্তব দেশাভিমানকে প্রকৃত দেশানুরাগে রূপান্তরিত করা বিষয়ে সেই অতি-পুরাতন নীতিবাক্যেরই পুনরাবৃত্তি। তাহার পর সাহিত্যপরিষদের কর্মসূচি ও উহার অতিক্ষুদ্র অংশকে কাযকরী করার মধ্যে যে কর্মশক্তির ক্ষুদ্রতা প্রকাশ পাইয়াছে তাহারই আলোচনা। মজার কথা এই যে নিষ্ক্রিয় দর্শকের দলই নিন্দায় মুখরতম, যাহারা সামান্যভাবে কাজ আরম্ভ করিয়াছে তাহাদের দোষ-ত্রুটি উদ্‌ঘাটনে সর্বাপেক্ষা তৎপর। বাঙলা দেশ এখন বিধাতার অভ্রান্ত বিচার ও মূল্যায়নের সম্মুখীন হইয়াছে; সুতরাং এই অগ্নিপরীক্ষার মুহূর্তে যথার্থ আত্মসমীক্ষাই বিধাতার ন্যায়দণ্ডের সম্মুখে দাঁড়াইবার অপরিহার্য প্রস্তুতি। এখন নিজেকে ভুলাইলে চলিবে না; বৃহৎ সংকল্পের শূন্যগর্ভতা

রুদ্ররোষ হইতে রক্ষা করিবে না। ছোট কাজে সাফল্যই আত্মবিশ্বাস উদ্ধারের একমাত্র উপায় ও ভবিষ্যৎ ব্যাপক কৃতকার্যতার অগ্রদূত। "মৌমাছিকে আপনার চাকের মর্যাদা বুঝাইবার জন্য বড়ো বড়ো পুঁথির দোহাই পাড়া সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।"

সাহিত্যপরিষৎ দেশবাসীর সমক্ষে যে কর্তব্যভার উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহাতে সিদ্ধির পরিমাণ বিষয়ে চুল-চেরা তর্ক না তুলিয়া সকলে মিলিয়া সেই কর্তব্যসম্পাদনে সক্রিয় সহযোগিতা করাই এখন একমাত্র কর্তব্য। "দেবপ্রতিমা ঘরে আসিয়া পড়িলে গৃহস্থকে তাহার পূজা সারিতেই হয়।" ছোট কাজ দেখিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিলে চলিবে না, ছোট কাজের বীজ হইতে মহীরুহের উদ্ভবের উপযোগী কৌশল, ধৈর্য ও প্রেম আয়ত্ত করিতে হইবে। মাটির নীচে যে অদৃশ্য ভিত খনিত হয় তাহারই উপর স্থাপত্য শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন নির্মিত হয়। "আমরা একদম চূড়ার উপর, জয়ডঙ্কা বাজাইয়া, ধ্বজা উড়াইয়া দিতে চাই। স্বয়ং বিশ্বকর্মাও তেমন করিয়া বিশ্বনির্মাণ করেন নাই। তিনিও যুগে যুগে অপরিস্ফুটকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতেছেন।" সাহিত্যপরিষদের প্রেরণাস্ফুলিঙ্গ যাহাতে দেশবাসীর সমবেত উদ্যোগের মোটা পলিতার মুখে অবিচ্ছিন্ন শিখারূপে দীপ্ত হইয়া উঠিতে পারে, তাহার আয়োজনই সম্পূর্ণ করা উচিত। এই কর্মপন্থার মধ্যে উদ্দীপনার কোন উপাদান নাই, আছে শান্ত, ধীর তপশ্চর্যা। যাহারা এই উত্তেজনাহীন, শ্রমসাধ্য কাজে ধীরভাবে আত্মনিয়োগ করিতে পারিবে তাহারাই এই মহৎ ব্রতকে সফলতার পথে অগ্রসর করিয়া দিবে।

এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ যুক্তিশৃঙ্খলা ও নৈতিক অনুশাসন প্রয়োগ করিয়াছেন; ইহাকে কাব্যরমণীয়তার স্তরে উন্নীত করিবার জন্য কোন কবিসুলভ আবেদনের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই।

তৃতীয় অধ্যায়

১

(গ) রাজনীতি ও সমাজনীতি

রাজনৈতিক প্রবন্ধ

সাধারণতঃ রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক প্রবন্ধগুলি সাময়িকতায় ক্ষণপরমায়ু-বিশিষ্ট, ক্ষুদ্র উপলক্ষ্যে রচিত ও মননবৈচিত্র্যহীন। ইংরেজকৃত দেশীয় লোকের অবমাননা, ইংরেজের আদালতে পক্ষপাতমূলক বিচারে দেশীয় চিত্তে ক্ষোভ, ইংরেজপ্রণীত নানাবিধ দমনমূলক আইনের অনিষ্টকারিতা ইত্যাদি ইংরাজ-শাসনের বহু-ঘোষিত কলঙ্ক ও অনুদার নীতিরই নিন্দা পূর্বযুগের সহিত ধারাবাহিকতা রক্ষা করিয়াছে। এগুলি ভাষায়, ভাবে ও বিষয়ে কোন অগ্রগতির নিদর্শন বহন করে না।

ইতিমধ্যে আসিয়াছে বঙ্গব্যবচ্ছেদ ও তজ্জনিত প্রচণ্ড ভাব-আলোড়ন। এই প্রবল অভিঘাতে সমগ্র জাতির সত্তায় যে নিদারুণ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে, জাতির সমস্ত চিত্ত মথিত করিয়া যে আবেগের তুফান উঠিয়াছে, প্রতিবিধানের যে দৃঢ়সঙ্কল্প ও পূর্ব আন্দোলনের ব্যর্থতার জন্য যে আত্মানু-সন্ধান জাগিয়াছে তাহার গৌরবস্ফীতি, তাহার ভাবোচ্ছ্বাস রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক প্রবন্ধে তরঙ্গচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। এখন ইংরাজের সুলভ নিন্দার পরিবর্তে জাতির আভ্যন্তরীণ বিভেদজাত দুর্বলতা তাঁহার প্রধান লক্ষ্য হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ সমগ্র বাঙালী জাতির উন্মত্ত বিক্ষোভ ও অধীর প্রতিশোধস্পৃহার দেশব্যাপী উত্তেজনার মধ্যে আশ্চর্য স্থিরবুদ্ধি, ভাবসংযম ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়া ক্ষিপ্ত জনমতের বিরুদ্ধে একাকী দাঁড়াইয়াছেন ও অভূতপূর্ব সাহসিকতা দেখাইয়াছেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মতভেদই রবীন্দ্রনাথের সক্রিয় রাজনীতি-বর্জনে পরিণতি লাভ করিয়াছে। এই উপলক্ষ্যেই দেশের রাজনৈতিক চেতনা ও রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক প্রবন্ধ যুগপৎ এক নূতন মোড় ফিরিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি ক্ষণিক উত্তেজনার বাষ্পনিঃসরণ ছাড়িয়া এক শাশ্বত ভাবভূমিভিত্তিক মূল্যবোধে স্থির হইয়াছে।

রাজনৈতিক প্রবন্ধের একটা তৃতীয় স্তর লক্ষ্য করা যায়। কতকগুলি

প্রবন্ধে লেখক রাজনীতির ভাবাদর্শের মূল সূত্রগুলি বিশ্লেষণ করিয়া বিভিন্ন সমাজে উহাদের পার্থক্য নির্ণয় করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত 'স্বদেশী সমাজ' প্রভৃতি রচনায় তিনি বিদেশী শাসনের সহিত নিঃসম্পর্ক ও শিক্ষা, সমাজপরিচালনা, শিল্পসংগঠন প্রভৃতি জনগণের বৈষয়িক ও মানস উন্নয়নমূলক ব্যাপারে কতকগুলি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে কবিসুলভ আশাবাদ ও উদার কল্পনার যতটা পরিচয় মিলে হয়ত বাস্তব বুদ্ধির ততটা পরিচয় পাওয়া যায় না। স্বাধীন ভারতবর্ষেও আমরা বে-সরকারী জনকল্যাণসাধক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে এপর্যন্ত উল্লেখযোগ্য সাফল্যলাভ করিতে পারি নাই। বরং সরকারের উপর নির্ভরশীলতা দিন দিন বাড়িতেছে। সে যাহাই হউক, রবীন্দ্রনাথ জনগণের সামগ্রিক উন্নতির একমাত্র নির্ভুল উপায় নির্দেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার যদি কোথাও ভুল হইয়া থাকে তবে তাহা আমাদের চরিত্রবল ও সংগঠনকুশলতা-সম্বন্ধীয়।

রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক প্রবন্ধগুলিকে এই ভাবপার্থক্যের অনুসরণে মোটামুটি তিনটি স্বতন্ত্র শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথম, সাময়িক ঘটনা ও বিশেষ দমনমূলক আইনপ্রণয়ন-উপলক্ষ্যে লেখা, যাহার মূল সুর হইল শাসকশ্রেণীর জাত্যভিমান বা নির্বুদ্ধিতার শ্লেষপ্রধান সমালোচনা। দ্বিতীয়, নিজ স্বজাতীয়দের অবাস্তব নীতি ও আত্মচ্ছিদ্রে অন্ধতার জন্য ক্ষোভের প্রকাশ ও সতর্কবাণী-উচ্চারণ। তৃতীয়, রাজনীতি-দর্শনাত্মক মতবাদ ও ধারণার বিশ্লেষণ ও বিশদীকরণ।

সাময়িক ঘটনা ও বিশেষ উপলক্ষ্য-উদ্ভূত

'আত্মশক্তি ও সমূহ'-এ 'প্রসঙ্গকথা' নামে জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, অগ্রহায়ণ, ১৩০৫ এই কয়েক মাস ধরিয়া ভারতী পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত প্রবন্ধসমষ্টি সময়ের দিক দিয়া সর্বাগ্রবর্তী। প্রথম প্রবন্ধে প্লেগদমনের জন্য ইংরাজ সরকার বোম্বাই প্রদেশে যে কঠোর নিয়ন্ত্রণবিধি প্রচলিত করিয়াছিলেন তাহার বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ অভিযোগ জানান হইয়াছে। এই অভিযোগের বিষয়টি যে লেখকের অন্তরকে স্পর্শ করে নাই তাহার প্রমাণ অনেকগুলি বাক্যের মধ্যে অলঙ্কারবহুলতা ও অস্পষ্টতা, যাহা

রবীন্দ্র-রচনায় ক্বচিৎ-দৃষ্ট হয়। প্লেগের সংক্রামকতা-বিস্তার নিবারণের জন্য এরূপ ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ প্রয়োজনীয় ছিল কি না ও উহা বাস্তবে কতটা ফলপ্রদ হইয়াছিল এই মূল প্রশ্নটিই লেখক এড়াইয়া গিয়াছেন। গবর্নমেণ্ট বা গোরা সৈনিকের অন্যান্য বহু-নিন্দিত অত্যাচারের সহিত এই হিতকর স্বেচ্ছাচারসঙ্কোচের দৃষ্টান্তটি জুড়িয়া দিয়া লেখক ইহাকে হেয় ও অপমানকর প্রতিপন্ন করিবার যে চেষ্টা করিয়াছেন তাহাকে ঠিক অপক্ষপাত ন্যায়বিচারের পর্যায়ে ফেলা যায় না। একটি মাত্র স্মরণীয় উক্তি এখানে উদ্ধারযোগ্য :—"প্রত্যক্ষ অপমান যে দেশে সুমন্দগতিতে সুদূর নালিশে গিয়া গড়ায় সে দেশের অপমানেরও শেষ নাই"।

দ্বিতীয় প্রবন্ধে পাশ্চাত্ত্য জাতির ও ভারতীয়ের ঐক্যবোধ কিরূপ স্বতন্ত্র উপাদানে গঠিত তাহা ব্যাখ্যা করিয়া তাহার মধ্যে উভয়ক্ষেত্রে পরজাতি-বিদ্বেষের কি বিভিন্ন রূপ প্রতিফলিত হইয়াছে তাহা লেখক উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। ভারতের জাতীয় সমীকরণ এখনও যে অসম্পূর্ণ রহিয়াছে তাহার কারণ আর্য-অনার্যের ভেদবুদ্ধি প্রশমিত হইয়াও বিলুপ্ত হয় নাই। আমাদের একরূপ সংস্কৃতিগত শিথিল ঐক্য লাভ হইয়াছে, কিন্তু ইহা আমাদিগকে অখণ্ড জাতীয়তাবোধে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই। "রামায়ণ-মহাভারতের সুবিশাল ছন্দঃস্রোতের মধ্যে এই প্রাণপণ যুদ্ধের প্রলয়-কল্লোল এখনও ধ্বনিত হইতেছে"। এই অসম্পূর্ণ ঐক্যসাধনপ্রয়াসের ফলে "ঐক্যের যা ক্ষতি তাহাও ঘটিয়াছে এবং অনৈক্যের যা দোষ তাহাও বর্তমান"। "আমরা অভিভূতভাবে এক, আমরা সচেষ্টভাবে এক নহি"। "সাহেবি অনুকরণ আমাদের পক্ষে নিষ্ফল এবং হিঁদুয়ানির গোঁড়ামি আমাদের পক্ষে মৃত্যু"। লেখক আর্যসমাজের সজীব ঐক্যস্থাপনচেষ্টার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন।

এই মুখবন্ধের পর লেখক ইংরাজের পরজাতিবিদ্বেষ যে সর্বাপেক্ষা প্রবলতম এবং ইহা শুধু এসিয়ার জাতিসমূহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী অন্যান্য ইউরোপীয় জাতিতেও প্রসারিত তাঁহার সেই প্রিয় প্রসঙ্গেই প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। সম্প্রতি ইউরোপীয়ের দ্বারা অনুষ্ঠিত কয়েকটি নৃশংস ভারতীয় হত্যাকাণ্ডের বিষয় উল্লেখ করিয়া লেখক নিম্নোদ্ধৃত তীক্ষ্ণ মন্তব্যে তাঁহার শিকার-লক্ষ্যের অভ্রান্ততার প্রমাণ দিয়াছেন। ইংরাজেরা নিজ দোষ সম্বন্ধে অন্ধ এই কথা বুঝাইতে তিনি অতি চমৎকার একটি দৃষ্টান্ত-অলঙ্কারের প্রয়োগ করিয়াছেন—"আমাদের প্রতি চাঁদের কলঙ্কের

দিক্‌টা ফেরানো আছে, কিন্তু তাহার বিপরীত পৃষ্ঠাটা হয়তো সম্পূর্ণ নিষ্কলঙ্কভাবে নিজের নিকট দেদীপ্যমান।" আবার ইংরাজী পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী ভারতীয়দের ইংরাজ-বিদ্বেষের আশঙ্কাপ্রকাশে অতিমুখর। কিন্তু যখন ইংরাজের দ্বারাই ভারতীয়-হত্যার উদাহরণ পুঞ্জীভূত হইতে থাকে, তখন তাঁহারা একেবারে নীরব—তাঁহাদের এই মুখরতা-মৌনতা আমাদের পক্ষে সমান সাংঘাতিক—এই জটিল স্ববিরোধী তত্ত্বটি বুঝাইবার জন্য তিনি যে বিরোধ-অলঙ্কারের প্রয়োগ করিয়াছেন তাহার উপযোগিতা অসামান্য। "ইংরাজ সম্পাদকগণকে যিনি কাল্পনিক নেটিভ-ভীতির দ্বারা মুখর করিয়া তোলেন তিনিও আমাদের দুরদৃষ্ট, এবং যিনি সাংঘাতিক প্রতিবাদের দ্বারা তাহাদিগকে নিরুত্তর করিয়া দেন তিনিও আমাদের দুরদৃষ্ট।"

তৃতীয় প্রবন্ধটির উপলক্ষ্য অবসরপ্রাপ্ত ছোটলাট ম্যাকেঞ্জি সাহেবের এক বিলাতি ভোজসভায় কলিকাতা মিনিসিপ্যালিটির বাঙালী কমিশনারদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ-উদ্‌গীরণ। এ বিষয়টি এতই সামান্য ও সাধারণ যে কেবল সাময়িক পত্রের পাতা ভর্তি করিবার উপকরণ হিসাবেই ইহার যৎকিঞ্চিৎ মূল্য। তবে রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে একটি গভীরার্থক মন্তব্য করিয়া ইহাকে কিছুটা মর্যাদা দিয়াছেন। বে-সরকারী ইংরাজ অনেকটা মনোভাব প্রকাশে দায়িত্বহীন ও বাঙালীর সঙ্গে তাহার সমান ওজনে উত্তর-প্রত্যুত্তর চলিতে পারে। কিন্তু শাসনপদে অধিষ্ঠিত ইংরাজের পক্ষে এই বাদবিতণ্ডায় নির্লিপ্ত থাকাই শোভন। এখন দেখা যাইতেছে যে বে-সরকারী ও সরকারী ইংরাজের মধ্যে যেন প্রকাশ্য দলবাঁধার লক্ষণ সুপরিস্ফুট হইতেছে। ইহাতে শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক আরও বিকৃত ও জাতিবিদ্বেষ উগ্রতর হইবে রবীন্দ্রনাথের এই আশঙ্কা তাঁহার দূরদৃষ্টিরই পরিচায়ক।

চতুর্থ প্রবন্ধটি পৃথ্বীশচন্দ্র রায়ের The Poverty Problem in India গ্রন্থে উদ্ধৃত লর্ড ফ্যারারের একটি উক্তি-অবলম্বনে পূর্বতন প্রবন্ধের প্রসঙ্গেরই পুনরবতারণা। লর্ড ফ্যারারে সভ্যতার সুদূর প্রান্তসীমায় বাণিজ্যবিস্তার-ব্যপদেশে পাশ্চাত্ত্য বণিকগোষ্ঠীর মধ্যে যে নীতিবিগর্হিত, অনুদার আচরণের প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয় তাহার জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন। এই অসাধুপ্রকৃতি বণিকেরা জাতীয় সম্পদবৃদ্ধির অজুহাতে জাতীয় চরিত্রে কলঙ্কলেপন করিতে দ্বিধা বোধ করিতেছেন না। ভারতবর্ষে অধিকাংশ ইংরাজ বাণিজ্যজীবী বলিয়া ভারতেও এইরূপ বিপদ ঘনীভূত হইয়া

উঠিতেছে। কিছুদিন পূর্বে সাঁওতাল বিদ্রোহের ব্যাপারে ইংরাজি সংবাদপত্রের অসংযত ভাষা ও অজ্ঞানপ্রসূত ভ্রান্ত ধারণা ইংরাজের সরকারী নীতির বিপর্যয় ঘটাইয়াছিল; নিরপরাধ, সুবিচারপ্রার্থী সাঁওতালগণ কেমন করিয়া বিদ্রোহীরূপে পরিগণিত হইয়া বন্দুকের গুলিতে উৎসন্ন হইয়াছিল, সার উইলিয়ম হাণ্টার তাহা বিবৃত করিয়াছেন। এখন ভারতবর্ষে ইংরাজ অধিকাংশই বণিক্‌বৃত্তি বলিয়াই দেশবাসীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষোভ-বিরূপতাকে অতিরঞ্জিত গুরুত্ব দিয়া অযথা আতঙ্কগ্রস্ত হওয়া তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক; এবং ইংরাজ সম্পাদকের লেখনীতেও সেই ভ্রান্ত মত সহজেই প্রতিফলিত হইতে পারে। কিন্তু শাসকশ্রেণীভুক্ত ইংরাজ যে এই উত্তেজনার সংক্রামকতার ঊর্ধ্বে থাকিয়া দৃঢ় ন্যায়নিষ্ঠতা ও সত্যদৃষ্টির সহিত শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতে অভ্যস্ত ইহাই এই অস্বাভাবিক দ্বন্দ্ব-মথিত পরিস্থিতির সুনিয়ন্ত্রণের একমাত্র আশ্বাস ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় সামাজিক ঘনিষ্ঠতার ফলে ও সংঘবদ্ধ মতের চাপে বে-সরকারী ও সরকারী ইংরাজের মধ্যে ভেদরেখা ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইতেছে ও ইংরাজ মহিলার মোহিনী মায়ায় এই একীকরণ-প্রক্রিয়া দৃঢ়ীভূত হইতেছে। সুতরাং এখন শত্রুজাতিপরিবেষ্টিত বিদেশী সৈন্যের ন্যায় সব ইংরাজই আত্মরক্ষার দুর্গকে দুর্ভেদ্য করিয়া তুলিবার চেষ্টাকেই প্রাধান্য দিয়া শাসকের উদার নীতি ও দৃঢ় মনোবল বিসর্জন দিতেছে। ইহাই রবীন্দ্রনাথের চক্ষে ইংরাজ ও ভারতীয়দের সম্পর্কের মধ্যে এক নূতন জটিলতার, এক অপ্রত্যাশিত সঙ্কটের সূচনা করিয়াছে। এই সূক্ষ্মদর্শিতা মাঝে মধ্যে তীক্ষ্ণাগ্র মননে ধারাল রূপ পাইয়াছে। "গত বর্ষে ভূমিকম্পে কারখানাঘরের চিমনিগুলা হাতির শুঁড়ের মত যেমন করিয়া দুলিয়াছিল, বড়োলাট সাহেবের প্রাসাদ এমন দোলে নাই"। অর্থাৎ কি প্রাকৃতিক কি মনোরাজ্যঘটিত আলোড়ন সরকারী অপেক্ষা বেসরকারী মহলেই গুরুতর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছিল।

'প্রসঙ্গকথা'র শেষ প্রবন্ধটিতে বরিশালের নেতা অশ্বিনীকুমার দত্ত রবীন্দ্রনাথের কংগ্রেস-অনুসৃত কার্যক্রমবিরোধিতার প্রতিবাদে তাঁহাকে একখানি পত্র দেন। তাহার মূল বক্তব্য হইল যে বিলাতেও বিরোধীপক্ষ পুনঃ পুনঃ নৈরাশ্য সত্ত্বেও বিধিসম্মত আন্দোলনে বীতস্পৃহ হন না ও প্রচলিত আইনের পরিবর্তনসাধনের জন্য আত্মমত-প্রচারে ব্রতী থাকেন। সুতরাং ভারতে কংগ্রেসও ঐ পথ অবলম্বন করিলে তাহা যে একেবারে ব্যর্থ এরূপ

অভিমত অসমীচীন। রবীন্দ্রনাথ অতি নিপুণভাবে এই সাদৃশ্যমূল যুক্তির অসারতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ইংলণ্ডে বিরোধীপক্ষ সরকারপক্ষের ন্যায়ই প্রবল জনমতের প্রতিনিধি, এবং জনমতের সমর্থনই তাহাদের আন্দোলনকে মর্যাদা ও গ্রহণীয়তা দেয়। কিন্তু আমাদের দেশে কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদনের পিছনে এরূপ কোন শক্তি নাই। সুতরাং কার্যে উৎসাহ নির্ভর করিবে, সরকারের ক্ষণে রুষ্ট, ক্ষণে তুষ্ট খামখেয়ালি অনুগ্রহের উপর নয়, কিন্তু ছোট কাজে সাফল্যের দ্বারা সৃষ্ট আত্মপ্রত্যয়ের উপর। সেইজন্য আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত অনিশ্চিত প্রার্থনা-পূরণ নয়, কতকগুলি কাজের আত্মকর্তৃত্বমূলক দায়িত্বগ্রহণ ও সেই কাজে সিদ্ধি-অর্জন। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি টাটাপ্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানপরীক্ষাশালার জন্য প্রতি প্রদেশে কংগ্রেস কর্তৃক অর্থসাহায্যভাণ্ডার-স্থাপনের ভারগ্রহণের উল্লেখ করিয়াছেন ও সাধারণভাবে দেশের শিল্পবাণিজ্য বিদ্যাশিক্ষা প্রভৃতি জনহিতকর কার্যের আত্মনির্ভরশীল দায়িত্ব-স্বীকৃতিকেও কংগ্রেসের গঠনমূলক কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলিয়াছেন। গভর্নমেণ্টের সুবিচারের উপর নির্ভর করিয়া আমাদের যে তিক্ত অভিজ্ঞতা হইয়াছে তাহা যেন বৈরাগ্য-চেতনারূপে জাতির চিত্তে অক্ষয় হইয়া জাতিকে স্বাধীন কর্মসাধনায় প্রণোদিত করে ও ভিক্ষাবৃত্তির ধিক্কার ও লাঞ্ছনার প্রতি আমাদিগের মনে স্থায়ী বিমুখতা বদ্ধমূল করে। অশ্বিনী-কুমারের কংগ্রেসের পক্ষে ওকালতি রবীন্দ্রনাথের মতকে বিন্দুমাত্র টলাইতে পারিল না। এই প্রবন্ধে যদিও রবীন্দ্রনাথের অভ্যস্ত রচনানৈপুণ্যের কিছু পরিচয় আছে, তথাপি কোন কোন স্থলে অতিভারাক্রান্ত অলঙ্কারপ্রবণতা তাহার রীতির বাঁধুনিকে কিছুটা বিড়ম্বিত করিয়াছে :—"ভিক্ষা যদি পূরণ করিতেন তবে আমাদিগকে কঠিন কর্তব্যপথ হইতে ভ্রষ্ট করিয়া সহজ দেশহিতৈষিতার সুকোমল হীনতাপঙ্কের মধ্যে, ভিত্তিহীন আত্মশ্লাঘা, অমূলক কৃত্রিম উন্নতি, এবং অনধিকারলব্ধ আরামনিদ্রার রসাতলে লইয়া ফেলিতেন"। এখানে যেন লেখকের ভাবপ্রাবল্য তাঁহার ভাষাশিল্পের নিয়ন্ত্রণসীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে!

'মুখুজ্জে বনাম বাঁড়ুজ্জে', 'অপর পক্ষের কথা' ও 'আলট্রা-কনজারভেটিভ' (ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, ১৩০৫ —ভারতী) দেশের নেতৃত্ব লইয়া প্রাচীন জমিদারগোষ্ঠী ও আধুনিক কংগ্রেস রাজনীতিবিদ্‌সংঘের মধ্যে অধিকার-দাবীর আপেক্ষিক যৌক্তিকতার ব্যঙ্গপ্রখর ও শ্লেষউপভোগ্য বিশ্লেষণ।

জননেতৃত্বের স্বাভাবিক অধিকার কাহার—প্রাচীন ভূম্যধিকারী-বংশের প্রতিনিধি রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের অথবা বর্তমান গণ-আন্দোলনের নায়কশ্রেষ্ঠ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের—এই প্রশ্ন রাজা প্যারীমোহনের পক্ষ হইতে উত্থাপিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ মুখুজ্জের এই দাবীকে ব্যঙ্গবিদ্রূপের তীক্ষ্মাস্ত্রে বিদ্ধ করিয়াছেন। রাজা-রাজড়া ধনী হইলেও এদেশে সমাজনেতা নহেন, ইংলণ্ডের অভিজাতবংশীয়দের সহিত প্রজাসাধারণের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহা ইঁহাদের নাই। বর্ণাশ্রমধর্মশাসিত বাঙালী সমাজে কৌলীন্য-প্রথার প্রভাবে ধনী ও দরিদ্রের বৈবাহিক মিলন এখানে প্রাত্যহিক ঘটনা। সম্পত্তিবিভাগের দ্বারা প্রাসাদবাসী ধনী সর্বদাই মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইতেছেন।

তাহা ছাড়া বর্তমান যুগের ভূস্বামীবৃন্দের ধনপ্রয়োগ লোকহিতের জন্য নহে, রাজপুরুষের মনোরঞ্জন ও খেতাবলোলুপতার হীনতর উদ্দেশ্য-অনুপ্রাণিত। ইঁহারা মুসলমান যুগের ভূস্বামীর মহৎ ঐতিহ্যভ্রষ্ট হইয়াছেন। পূর্ব যুগের ধনী রাজপ্রসাদভিক্ষু ছিলেন না, দেশের হিতসাধন করিয়া দেশবাসীর সম্মানভূষিত হওয়াই ইঁহাদের পরম গৌরব ছিল। বর্তমান জমিদারেরা মুখ্যতঃ রাজানুগ্রহভিখারী; জনহিতকর কার্যানুষ্ঠান ইঁহাদের স্বতঃস্ফূর্ত হিতৈষণাপ্রসূত নহে, রাজসম্মানক্রয়ের পরোক্ষ মূল্যদান। কাজেই ইঁহাদের দেশনেতৃত্বের কোন যুক্তিসঙ্গত অধিকার নাই। লেখকের তীক্ষ্ম বাক্যবাণপ্রয়োগের দুই একটি উদাহরণ উদ্ধৃত হইল।

"দাদা ধৃতরাষ্ট্র বড়ো বটে কিন্তু তিনি অন্ধ, সেইজন্য কনিষ্ঠবংশে রাজ্যের ভার পড়িয়াছিল। আমাদের জমিদার-কৌরবপক্ষীয়ের যদি স্বাভাবিক অন্ধতা না থাকিত তবে কনিষ্ঠ কংগ্রেস-পাণ্ডবগণের নেতৃত্ব-সিংহাসনে দাবি থাকিত না।" "ইঁহারা (আধুনিক জমিদারেরা) বনস্পতির ন্যায় বিচ্ছিন্ন বৃহৎ নহেন, ওষধির মত ব্যাপ্ত বিস্তৃতও নহেন। ইঁহারা কুষ্মাণ্ডলতার ন্যায় একমাত্র গবর্নমেণ্টের আশ্রয়যষ্টি বাহিয়া উন্নতির পথে চড়িতে চাহেন।"

উপমার ক্লিষ্ট-প্রয়োগেরও দৃষ্টান্তের অভাব নাই :—"প্রবল ইংরাজ-রাজার সমুচ্চ চুম্বকশৈল অলক্ষ্যে অনায়াসে তাঁহাদিগকে (জমিদারদিগকে) দেশের লোকের নিকট হইতে ছিঁড়িয়া যেন একমাত্র নিজের দিকে আকর্ষণ করিয়া আনিতেছে।"

'অপর পক্ষের কথা'-য় রবীন্দ্রনাথ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দেরও দেশের সহিত

যোগের ঘনিষ্ঠতা একই মানদণ্ডে বিচার করিয়াছেন। জমিদারগণ যদি দেশের সঙ্গে সংযোগহীন, তবে কংগ্রেসের সম্বন্ধেও সেই অভিযোগ পূর্ণ মাত্রায় প্রযোজ্য। কংগ্রেসনেতারা ইংরাজী আদর্শে সভা সমিতি করিয়া, ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা করিয়া, দেশীয় রীতি-নীতি ও জীবনযাত্রা-প্রণালী সর্বতোভাবে বর্জন করিয়া, দেশবাসীর সংস্রব একান্তভাবে পরিহার করিয়া দেশের হিতসাধন করিতে আন্দোলন চালাইতেছে। জমিদারদের মত কংগ্রেসেরও লক্ষ্য ইংরাজের মনোযোগ-আকর্ষণ ও প্রশংসা-অর্জন। বরং জমিদারেরা গ্রামে বাস করেন, কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ সম্পূর্ণ সহরবাসী। "ইংরাজ-রাহুকর্তৃক জমিদারদের যদি অর্ধগ্রাস হইয়া থাকে, ইঁহাদের (কংগ্রেস-নেতাদের) একেবারে পূর্ণগ্রাস।" সুতরাং কোন পক্ষেরই নেতৃত্বের অধিকার যুক্তিসহ বা সুপ্রতিষ্ঠিত নহে। তবে জমিদার অন্ধ, কংগ্রেস অন্ততঃ চক্ষুষ্মান ; সুতরাং অন্ধের দ্বারা নীত হওয়া অপেক্ষা চক্ষুষ্মানের নেতৃত্ব-শক্তির উপর বেশী আস্থা রাখাই বুদ্ধিমানের লক্ষণ।

'আলট্রা-কন্‌জার্ভেটিভ' ছদ্মনামে পাইওনিয়রে প্রকাশিত জমিদারদের জন্য বিশেষ অনুগ্রহ যাচ্ঞা করিয়া লেখা পত্রখানি রবীন্দ্রনাথের ব্যঙ্গবিদ্রূপে জর্জরিত হইয়াছে। এই পত্রের প্রতি নিক্ষিপ্ত ব্যঙ্গের প্রাচুর্য ও তীক্ষ্ণতা ও কৌতুকরসপ্রধান আক্রমণাত্মক মেজাজ যেন রবীন্দ্রনাথকে পঞ্চানন্দী বীভৎসতার কাছাকাছি লইয়া গিয়াছে। লেখকের নামগোপনের কাপুরুষতাই রবীন্দ্রনাথকে ব্যঙ্গের প্রচুরতম অবসর দিয়াছে। "যদি তিনি জাত-সিংহই হন তবে শিকারের পূর্বে একবার গর্জন সহকারে নিজের নামটা ঘোষণা করিয়া দিলেন না কেন?" যাঁহারা উকীল মোক্তার-ইস্কুলমাস্টারের প্রতি অবজ্ঞাসূচক নাসিকাকুঞ্চন করেন, বঙ্গদেশের সামাজিক ও অর্থনীতিক প্রথার ফলে তাঁহাদের পূর্ব বা উত্তরপুরুষ উক্ত নিন্দিত শ্রেণীসমূহেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন বা হইতে পারেন। আমাদের অভিজাতমহোদয় দেশের পৌর-প্রতিষ্ঠানগুলি শিক্ষিত বাঙালীর করায়ত্ত হওয়ার জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন ও উহাদের সদস্যনির্বাচনপদ্ধতির পরিবর্তনের জন্য আবেদন জানাইয়াছেন। আজ যদি সরকার জমিদারী প্রথার অবসান ঘটাইয়া তাঁহাদের এতাবৎকাল-উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধাগুলি লুপ্ত করেন, তখন জমিদার-প্রতিনিধি কি বলিবেন? আসল কথা, উভয় ক্ষেত্রেই অধিকার স্বোপার্জিত নহে, প্রবল রাজশক্তির অনুগ্রহদত্ত ও তাঁহাদের খেয়াল-খুসীতে প্রত্যাহার্য।

কংগ্রেসকে শূন্যগর্ভ বাগ্মিতার জন্য দোষ দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু অধিকার-মুক্ত জমিদারেরা কি ইহা অপেক্ষা কোন সক্রিয়তর আন্দোলনের পথ লইবেন? বরং যদি কোন অবিশ্বাস্য কারণে কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা আসে তবে এই সমস্ত স্তাবকতায় অভ্যস্ত জমিদারনন্দন কি তাঁহাদের চাটুভাষণ ব্রিটিশ সরকার হইতে কংগ্রেসেই স্থানান্তরিত করিবেন না? এই মন্তব্যের মর্মান্তিক যাথার্থ্য স্বাধীনতা-উত্তর ইতিহাসে অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত হইয়াছে।

'কণ্ঠরোধ' (বৈশাখ, ১৩০৫—সিডিশন বিল পাশ হইবার পূর্বদিনে টাউনহলে পঠিত) প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের সাময়িক ঘটনার শাশ্বত তাৎপর্য-উদ্‌ঘাটনের আশ্চর্য ক্ষমতার নিদর্শন। নিরীহ, শান্তিপ্রিয় বাঙালীচরিত্রে এক অজ্ঞাত ভয়ঙ্করত্বের অস্তিত্বের আশঙ্কায় এই বিলটি প্রণীত হইতেছে। ইহাতে বিস্ময় ও ভীতির মধ্যে বাঙালীর একটি সান্ত্বনাও আছে—সে তাহা হইলে শাসকবর্গের চক্ষে নিতান্ত উপেক্ষণীয় নয়। সংবাদপত্রের মাধ্যমে জাতির ক্ষোভের যে অনিবার্য প্রকাশ তাহার পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়া সরকার জাতির মনের কথা জানিবার শেষ উপায়টিও নিজ দুর্বুদ্ধির দ্বারা নষ্ট করিলেন। ইহাতে সংশয়ের অনিশ্চয়তা আরও ঘনীভূত হইবে ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা আরও দুরূহ হইবে। রাজা-প্রজার সম্পর্ক আরও বিকৃত হইবে ও প্রজার যে একটা ধারণা ছিল যে শাসনব্যবস্থার নির্ভীক সমালোচনার দ্বারা সেও শাসনকার্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিতেছে তাহার সেই আত্মপ্রসাদ সম্পূর্ণ ক্ষুণ্ণ হইবে। ইংরাজশাসনের হিতকর দিকটা একেবারে চাপা পড়িয়া উহার নগ্ন পাশবিকতা আরও প্রকট হইবে ও উভয় পক্ষের ব্যবধানকে অনতিক্রমণীয় করিয়া তুলিবে।

এই প্রবন্ধে ভাষারীতির সুষ্ঠু, সবল প্রয়োগ ও ব্যতিক্রমস্থলে কিছু শিথিল, অসংযত প্রয়োগেরও দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইতে পারে। অনিপুণ প্রয়োগের একটি উদাহরণ উদ্ধারযোগ্য—"সুতরাং স্বভাবতই তাঁহার শাসনদণ্ড আনুমানিক আশঙ্কাবেগে অন্ধভাবে পরিচালিত হইয়া দণ্ডবিধির ন্যায়সীমা উল্লঙ্ঘনপূর্বক আকস্মিক উল্কাপাতের ন্যায় অযথা স্থানে দুর্বল জীবের অন্তরিন্দ্রিয়কে অসময়ে সচকিত করিয়া তুলিতে পারে।" ইহাতে গুরু-গম্ভীর শব্দবিন্যাস ও অতিবিসর্পিত বাক্যাংশগ্রন্থনবিস্তার ঔচিত্যবোধ ও ভাষণসংযমের সীমালঙ্ঘন করিয়াছে। ইহাকে রবীন্দ্রগদ্যরীতিতে জনসনের ভাষাপ্রয়োগে অমিতাচারের বিরল দৃষ্টান্তরূপে উপস্থাপিত করা যাইতে পারে। সুষ্ঠু

প্রয়োগের দৃষ্টান্ত সংখ্যায় বেশী ও রবীন্দ্রনাথের স্মরণীয়-উক্তিসমাবেশদক্ষতার পরিচয়স্থল। "প্রত্যেকবার তাঁহাদের সেই হৃৎকম্পের চমকে (কাল্পনিক রাসিয়া-ভীতিতে) আমাদের ভারত-লক্ষ্মীর শূন্যপ্রায় ভাণ্ডারে ভূমিকম্প উপস্থিত হয়, আমাদের দৈন্যপীড়িত কঙ্কালসার দেশের ক্ষুধার অন্নপিণ্ডগুলি মুহূর্তের মধ্যে কামানের লৌহপিণ্ডে পরিণত হইয়া যায়।" "গবর্নমেণ্ট যখন চারি তরফ হইতেই কামান পাতিতেছেন তখন ইহা নিশ্চয় যে, আমরা মশা নহি, অন্ততঃ মরা মশা নহি। "যদি রজ্জুতে সর্পভ্রম ঘটিয়া থাকে তবে তাড়াতাড়ি ঘরের প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া ভয়কে আরও পরিব্যাপ্ত করিয়া তুলিতেছ কেন?" "যদি কখনও কোনো ঘনান্ধকার অমাবস্যারাত্রে আমাদের অবলা ভারতভূমি দুরাশার দুঃসাহসে উন্মাদিনী হইয়া বিপ্লবাভিসারে যাত্রা করে তবে সিংহদ্বারে কুকুর না ডাকিতেও পারে, রাজার প্রহরী না জাগিতেও পারে, পুররক্ষক কোতোয়াল তাহাকে না চিনিতেও পারে, কিন্তু তাহার নিজেরই সর্বাঙ্গের কঙ্কণকিঙ্কিণীনূপুরকেয়ুর, তাহার বিচিত্র সংবাদ-পত্রগুলি কিছু না কিছু বাজিয়া উঠিবেই, নিষেধ মানিবে না।" একদল অবিবেচক নিম্নশ্রেণীর মুসলমানের হঠাৎ ইংরাজের উপর ইষ্টকবর্ষণ যে বিচিত্র অনুমান-পরম্পরার উদ্ভব ঘটাইয়াছিল, তাহার বর্ণনাপ্রসঙ্গে লেখকের উক্তি এই:—"কৌতূহলী কল্পনা হ্যারিসন রোডের প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া তুরস্কের অর্ধচন্দ্রশিখরী রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত সম্ভব ও অসম্ভব অনুমানকে শাখাপল্লবান্বিত করিয়া চলিল।" সন্ত্রাসবাদের আকস্মিক বিস্ফোরণের চমকে রবীন্দ্রনাথের বাঙালী জাতির নিরীহত্ব সম্বন্ধে এই নিশ্চিত প্রত্যয় যে প্রবলভাবে বিচলিত হইয়াছিল তাহা আমরা তাঁহার বঙ্গভঙ্গোত্তর প্রবন্ধ-সমূহের মধ্যে লক্ষ্য করিবে।

২

রাজনীতিতত্ত্বাশ্রয়ী প্রবন্ধাবলী

'নেশন কী' (শ্রাবণ, ১৩০৮), 'ভারতবর্ষীয় সমাজ' (শ্রাবণ, ১৩০৮—আত্মশক্তি) 'বিরোধমূলক আদর্শ' (আশ্বিন, ১৩০৮, বঙ্গদর্শন) 'রাষ্ট্রনীতি ও ধর্মনীতি' (কার্তিক, ১৩০৯, বঙ্গদর্শন) 'রাজকুটুম্ব' (বৈশাখ, ১৩১০, বঙ্গদর্শন), 'ঘুষাঘুষি' (ভাদ্র, ১৩১০, বঙ্গদর্শন—আত্মশক্তি, পরিশিষ্ট, পৃ ৮৮১—৮৯৭) 'ইম্পিরিয়ালিজম্' (বৈশাখ, ১৩১২, ভারতী) 'বহুরাজকতা' (আষাঢ়, ১৩১২,

ভাণ্ডার) 'দেশীয় রাজ্য' (শ্রাবণ, ১৩১২), 'রাজভক্তি' (মাঘ, ১৩১২, ভাণ্ডার) এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে।

এই প্রবন্ধগুলিতে ইংরাজ ভারতবাসীর সম্পর্কবিকারের মধ্যে যে ভাবতত্ত্ব ও আদর্শপার্থক্য ক্রিয়াশীল তাহার স্বরূপবিশ্লেষণের প্রয়াস লক্ষণীয়। 'নেশন কী' প্রবন্ধে ফরাসী ভাবুক রেনাঁর সূক্ষ্ম ও মর্মানুপ্রবেশী স্বরূপনির্ণয়টি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। নেশনগঠনে জাতি, ভাষা, ধর্মমতের ঐক্য ও ভৌগোলিক সংস্থানের অখণ্ডতা উপাদান বটে, কিন্তু উহার প্রাণশক্তি ইহাদের মধ্যে নিহিত নহে। নেশনের মূল ভাব হইল বাহ্যকারণে প্রতিবেশিসূত্রে আবদ্ধ কোন একটি জনসংঘের নিবিড়তর ঐক্যের জন্য মানস আগ্রহ, অতীত কীর্তির স্মৃতিপ্রভাবিত জনগণের বর্তমানেও ঐ উত্তরাধিকার-অবলম্বনে ঐক্যবদ্ধ থাকার আন্তরিক ইচ্ছা ও সেই উদ্দেশ্যে সমষ্টিগত কল্যাণের জন্য ব্যক্তিগত স্বার্থবিসর্জনের একান্ত প্রস্তুতি। অর্থাৎ বহিঃশক্তি যে একত্রাবস্থান অভ্যস্ত করিয়াছে, মানুষের মনের সহযোগিতায় তাহার মিলন-আবেগে রূপান্তরীকরণ।

'ভারতবর্ষীয় সমাজ' প্রবন্ধে এই লক্ষণগুলি ভারত সম্বন্ধে কতখানি প্রযোজ্য তাহারই নিপুণ বিচার। প্রতীচ্য নেশনসমূহে বিজয়ী ও বিজিত জাতিগুলির সমস্ত প্রভেদ লুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে কোন রক্ত বা সংস্কৃতিগত দুস্তর পার্থক্য না থাকায় ইহাদের একীকরণ বিশেষ দুরূহ ছিল না। আফ্রিকা ও আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে সহাবস্থান পর্যন্ত সম্ভব হয় নাই, তাহাদিগকে বিলুপ্ত করিয়া তাহাদের সমাধির উপর ঐক্যসৌধ নির্মিত হইয়াছে। ভারতে ঐক্যসাধনসমস্যা দুরূহতর ছিল ও সেখানে ঐক্যপ্রতিষ্ঠাও পূর্ণতর হইয়াছে। আর্য-অনার্যের দুরপনেয় বর্ণপার্থক্য সত্ত্বেও তাহারা একই ধর্ম ও সংস্কৃতির আশ্রয়ে মিলিত হইয়াছে ও তাহাদের মধ্যে ঐক্যবোধ জাতিভেদ ও বৃত্তিভেদপ্রথার বিচ্ছিন্নকারী প্রভাবের উপর জয়লাভ করিয়াছে। ইহাতে আরও প্রমাণ হয় যে পাশ্চাত্ত্য জাতির ঐক্যবোধ রাষ্ট্রচেতনায় ও ভারতের মিলনানুভূতি সমাজচেতনায় কেন্দ্রীভূত। ইউরোপে নেশন সজীব শক্তি ও যুগপ্রয়োজনের সঙ্গে সমতা রক্ষা করিয়া নিয়মিত। কিন্তু ভারতের সমাজশক্তি অতীতের অন্ধ অনুকরণ, ও বর্তমানের পরিবর্তনশীল সমস্যা সম্বন্ধে উদাসীন। আমাদের পিতামহদের মন ও দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের মধ্যে সজীব নাই, আমরা তাহাদের বিধানকেই

অপরিবর্তিতভাবে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করিয়া আমাদের আর্য উত্তরাধিকারের বড়াই করিতেছি। আমরা সমাজের হিত-উদ্দেশ্য-অনুপ্রাণিত না হইয়াই প্রাচীন প্রথার অপপ্রয়োগ করিতেছি। "শণের দাড়ি-পরা যাত্রার নারদ যেমন দেবর্ষি নারদ, আমরাও তেমনি আর্য।" সেকালে সমাজের প্রতি অঙ্গ সমাজের বৃহত্তর কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই আপন আপন কর্মে রত থাকিত। আমরা এখন মহৎভাববিচ্যুত শাস্ত্রবিধি পালন করিয়াই মিথ্যা গৌরব অনুভব করিতেছি। সুতরাং সমাজচেতনার সহিত অসংশ্লিষ্ট পাশ্চাত্ত্য জাতির রাষ্ট্রাদর্শ অনুসরণে আমাদের যে সত্যকার হিত হইবে তাহা দুরাশা মাত্র।

'বিরোধমূলক আদর্শ' প্রবন্ধে পাশ্চাত্ত্য জাতির ইতিহাস যে জাতিবৈরের স্মৃতি ও উপলক্ষ্যকে সর্বদাই জাগ্রত রাখিয়া তাহাদের পারস্পরিক সম্পর্কে একটা যুদ্ধোন্মাদনার ক্ষেত্র সদা-প্রস্তুত রাখিতেছে রবীন্দ্রনাথের ইহাই মূল বক্তব্য। এই বিরোধের আদর্শ আমাদের অনুসরণীয় নহে, কেননা আমাদের শাস্ত্র অধর্মের আপাতজয়ের মধ্যে উহার নিশ্চিত বিনাশের পরিণাম যুক্ত করিয়া দেখাইয়াছে। রাষ্ট্রনীতির সাময়িক প্রয়োজনে ধর্মনীতির শাশ্বত আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা হারাইলে সর্বনাশকেই আমন্ত্রণ করিয়া আনা হইবে। "আমাদের রাজার এক চোখ কানা বলিয়া আমাদের দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন চোখের উপরে যেন পাগড়ি টানিয়া না দিই।" 'রাষ্ট্রনীতি ও ধর্মনীতি' প্রবন্ধেও ইংরাজের ভারতবাসীর প্রতি বলদৃপ্ত অত্যাচার কোন আইনগত সুবিচার পাইতেছে না ও ভারতীয়দের মৃদু প্রতিরোধও পক্ষপাতপূর্ণ বিচারে গুরুদণ্ড-ভাজন হইতেছে—এই বৈষম্যমূলক দণ্ডনীতি যে আমাদের ধ্রুব ধর্মবোধকে শিথিল করিয়া দিতেছে ইহাই সত্যকার আশঙ্কার বিষয়রূপে উল্লিখিত হইয়াছে। অপরাধের মাত্রার বিচার না করিয়া ফলের দ্বারা বিচার করিলে প্রবল ইংরাজকে উত্তেজিত করা অপেক্ষা শান্তস্বভাব হিন্দুকে অপমানিত করা যে অনেক লঘুতর পাপ তাহা সহজেই স্বীকার্য। "বস্তুতই বারুদে আগুন দেওয়া যতবড়ো অপরাধ, ভিজা তুলায় আগুন দেওয়া ততবড়ো অপরাধ নহে।" "ব্রিটিশরাজ্যে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খাওয়াইবার উপায় বাঘকে দমন করিয়া নহে, গোরুটারই শিং ভাঙিয়া।"

'রাজকুটুম্ব'-এ ইংরাজ-ভারতীয় প্রশ্নে 'নিউ ইণ্ডিয়া'-সম্পাদকের ন্যায়নিষ্ঠার প্রশংসা করিয়াও রবীন্দ্রনাথ তাঁহার একটি মন্তব্যের প্রতিবাদ করিয়াছেন।

এইরূপ অবস্থায় আসীন হইলে প্রাচ্য জাতিরা ইউরোপীয়দের অপেক্ষাও মার্জিত বর্বরতার বেশী প্রমাণ দিত এই আনুমানিক মন্তব্যে রবীন্দ্রনাথ সায় দিতে পারেন নাই। প্রথমতঃ প্রাচ্য জাতির ন্যায় একটা বহু-বিস্তৃত, নানা-ভেদবিচ্ছিন্ন জনসংঘের কোন সাধারণ চারিত্র-লক্ষণ আবিষ্কার করা দুরূহ; দ্বিতীয়তঃ ইউরোপীয়ের ন্যায় একটি ক্ষুদ্র, সংহত সম্প্রদায়ের সহিত এই শিথিল-বিন্যস্ত, বহুজাতিসমন্বিত সত্তার কোন তুলনা অচল। সম্পাদক বলিয়াছেন যে এই অপমানের অবসান ঘটাইতে মুষ্টিযোগই অব্যর্থ চিকিৎসা। এই ঔষধ-নিরূপণের যাথার্থ্য স্বীকার করিয়াও রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে ভারতীয় তরুণের শিক্ষা-দীক্ষা, সামাজিক আদর্শ, সহনশীলতা সবই বলপ্রয়োগ-অভ্যাসের পরিপন্থী। রাজার সম্মান খানিকটা রাজকুটুম্বেরও প্রাপ্য, তবে রাজকুটুম্ব তাঁহার মর্যাদার অভিমানে যে সম্ভ্রম হারাইতেছেন, তাহা আমাদের আত্মসম্মান বৃদ্ধি করিতেছে।

'ঘুষাঘুষি' (ভাদ্র, ১৩১০, বঙ্গদর্শন) প্রবন্ধটি পূর্ব প্রবন্ধের জের টানিয়া চলিয়াছে। পূর্ব প্রবন্ধে ঘুসি খাইয়া ঘুসি ফিরাইয়া দেওয়া ভারতীয়ের পক্ষে কেন দুরূহ তাহারই সমাজতাত্ত্বিক ও নীতিগত কারণ বিশ্লেষণ করা হইয়াছে, কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হয় নাই। হিন্দু যদি তাহার শিক্ষা-দীক্ষা ও সামাজিক আচরণের নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া স্বভাববর্বরতার অনুশীলন করে, তবে তাহার মনুষ্যত্ববোধের সমস্ত বক্ষরক্ত পান করিয়াই উহা পুষ্ট হইবে। দ্বিতীয়তঃ ইংরাজ-ভারতীয়ের এই মারামারি অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতা, কেননা ভারতীয় একজন মানুষ মাত্র আর ইংরাজ সমস্ত শাসকজাতির প্রতিনিধি ও তাহার পিছনে সমস্ত রাজশক্তি সক্রিয় ও উদ্যত। এক্ষেত্রে ভীরুতার অপবাদ প্রহারকারীরই প্রাপ্য, যে মার খাইয়া প্রতিশোধ না লয় তাহার প্রাপ্য নয়। ইংরাজের অত্যাচারের প্রতিরোধের জন্য যদি গুণ্ডামির আশ্রয় লওয়া হয়, তবে রোগ অপেক্ষা ঔষধ কি বেশী অনিষ্টকর হইবে না? ইংরাজকৃত সাময়িক আপদ দূর হইলেও গুণ্ডামির জন্য চিরকাল মাশুল গুণিতে হইবে। তবে অবশ্য ন্যায়নীতিরক্ষার জন্য আমাদের যে প্রতিঘাত-প্রবণতা অভ্যাস করিতে হইবে, তাহার সীমা ও উদ্দেশ্যের বিশুদ্ধি যাহাতে লঙ্ঘিত না হয় সেজন্য আমাদের সযত্ন আত্মসমীক্ষার প্রয়োজন।

ইম্‌পিরিয়ালিজ্‌ম্ (বৈশাখ ১৩১২, ভারতী)—সম্প্রতি লর্ড কার্জন ভারতকে জাতীয়তায় স্বাতন্ত্র্য ভুলিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অন্তর্ভুক্ত হইবার যে

আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন এই আমন্ত্রণের নিগূঢ় উদ্দেশ্য ও সুনিশ্চিত ফলাফল সম্বন্ধে এই প্রবন্ধটি একটি নিপুণ আলোচনা। ভারতের জাতীয়তার প্রসার সাধন ইংরাজের ন্যায় স্বাধীনতাপ্রিয় জাতির একটা প্রত্যাশিত কর্তব্য ও স্বাতন্ত্র্যবিলোপ ইংরাজশাসনের একটি কলঙ্ক। সুতরাং সাম্রাজ্যবাদের বিরাট বুলি আওড়াইয়া এই লজ্জা ও কর্তব্যচ্যুতির গ্লানি আবরণ করা সহজ। শুধু শুধু পশু-পাখীহত্যা অবিমিশ্র নিষ্ঠুরতা, কিন্তু শিকারের নামে এই নিষ্ঠুরতার উপর ক্রীড়ার চিত্তবিনোদন ও যুদ্ধাভিযানের ছদ্মবীরত্ব আরোপ করিলে ইহাকে খানিকটা মার্জিত রূপ দেওয়া সম্ভব। ভারত যদি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে লীন হইয়া যায়, তবে ইহা যত খণ্ডিত থাকে ততই বিলয়ক্রিয়া সুগম হয়। শ্বেত উপনিবেশগুলির ব্যাপার আলাদা—তাহাদের সহিত সম্বন্ধ যৌতুক-দৃঢ়ীভূত দাম্পত্যমিলনের। ভারতের ক্ষেত্রে ইহা দাসত্বের নির্বিচার আত্মসমর্পণ। কাজেই এই প্রস্তাব ভারতকে গ্রাস করার একটি সুচতুর ছলমাত্র। সাম্রাজ্যবাদের বিরাট রথচক্রে আমাদের হৃদয় নিষ্পিষ্ট হইবে ও এই রথের বিপুল ঘর্ঘরশব্দে ও আমাদের অনিচ্ছাদত্ত সম্মতিতে এই মর্মবেদনা জগতের শ্রুতি হইতে আচ্ছন্ন থাকিবে—এই নীরবতা-যবনিকার অন্তরাল-সৃষ্টির জন্যই এই ছলনাময় প্রস্তাবের উপস্থাপনা।

'বহুরাজকতা' (আষাঢ় ১৩১২, ভাণ্ডার)—'রাজকুটুম্ব' প্রবন্ধে ইংরাজ-ভারতীয়ের যে প্রাত্যহিক বিরোধতিক্ত ও অত্যাচার-অপমানকণ্টকিত সম্পর্কের ব্যবহারিক দিকটা আলোচিত হইয়াছিল, এখানে তাহারই অর্থনীতি ও শাসননীতির দিকটির বিচার হইয়াছে। ইংরাজশাসন পূর্বতন শাসনের সহিত তুলনায় ভাল-মন্দ যাহাই হউক, উহার একটি বৈশিষ্ট্য অতি প্রকট—একটা সমগ্র জাতিই রাজসিংহাসনের অধিকারী হইয়া বসিয়াছে। ইহার অর্থনৈতিক চাপ অসহনীয়, উহার ভাবপ্রতিক্রিয়াও মোটেই মানস স্বাচ্ছন্দ্যের অনুকূল নয়, ও উহার শাসনব্যবস্থার ভারসাম্যরক্ষা অতি কষ্টসাধ্য। 'মাহুতের বদলে যদি একটি গোটা হাতিকে সর্বদা বহন করিতে হইত, তবে বাহকটি অঙ্কুশের অভাবকেই আপনার একমাত্র সৌভাগ্য বলিয়া জ্ঞান করিত না"। "যে দেশের ভারকেন্দ্র নিজের এতটা বাহিরে পড়িয়াছে সে মাথা তুলিবে কী করিয়া?"

'দেশীয় রাজ্য' (শ্রাবণ ১৩১২)—এখানে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী ঠিক দেশীয় রাজ্যপরিচালনাব্যবস্থার প্রতিক্রিয়াশীলতার সমর্থন নয়, আমাদের

স্বাধীন প্রচেষ্টার প্রতি আস্থাজ্ঞাপন ও বিলাতী অনুকরণের দূষণীয়তা-খ্যাপন। ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে গ্রহণ করিলেই যে আমরা সুশাসনের অধিকারী হইব ইহা ভুল ধারণা। যে বীর্য ও আদর্শবাদ পাশ্চাত্ত্য রাজনীতি-সংস্থাগুলিকে গড়িয়া তুলিয়াছে তাহাই আমাদের উন্নতির সত্য অবলম্বন। ইহাদের প্রয়োগবিধি ও রূপায়নকলা ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য ও বর্তমান প্রয়োজন অনুসারে সম্পূর্ণ নূতন রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে। ত্রিপুরারাজের শাসনব্যবস্থা আমাদের প্রাচীন আদর্শ ও কর্মপদ্ধতির এখনও-জীবন্ত প্রতিনিধিরূপে প্রাচ্য প্রকৃতির একটা দিক প্রকাশ করিতেছে। ইহারই সঙ্গে নূতন যুগের গতিবেগ, পরিধি-বিস্তার ও ন্যায়নীতির নব আদর্শ মিশাইয়া লইতে পারিলে যে মিশ্র সংস্থার উদ্ভব হইবে তাহাই আমাদের পরিচিত ও মানসতৃপ্তিপ্রদ হইবে ও আমাদের মৌলিক শক্তিবিকাশের সহায়তা করিবে। দেশীয় রাজ্যের যে প্রশাসনিক উন্নতি তাহা পরিমাণে যতই কম হউক তাহা আমাদের স্বাধীনচেষ্টাপ্রসূত, পরানুকরণপ্রভাবিত নয়। যেমন কালীঘাটের পটে ও দেশীয় রাজার গৃহসজ্জায় আমাদের ভারতীয় রীতির বৈশিষ্ট্য নবসৌন্দর্য ও সুরুচি সৃষ্টি করিয়াছে, তেমনি আমাদের দেশীয় রাজ্যগুলির সুসংস্কৃত শাসনব্যবস্থা আমাদের কর্মনৈপুণ্যের নিদর্শনরূপেও মর্যাদা লাভ করিতে পারে।

'রাজভক্তি' (মাঘ ১৩১১, ভাণ্ডার) প্রবন্ধে দিল্লীর দরবারে রাজপুত্র ডিউক-অব কনট-এর আগমন যে কেন ব্যর্থ হইয়া গেল, তাহার কারণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ হিন্দুর রাজভক্তির স্বরূপনির্ণয় করিয়াছেন। এই আগমন ব্যর্থ হইয়াছে কেননা রাজসিক আড়ম্বরে আবৃত রাজহৃদয়ের সহিত প্রজার কোন যোগসূত্র স্থাপিত হয় নাই। রূপকথার রাজপুত্র যেমন সুপ্ত রাজকন্যাকে জাগাইবার জন্য আসেন, তেমনি রাজপুত্রের আগমনের উদ্দেশ্য ছিল প্রজার অন্তর-সুপ্ত রাজভক্তির উদ্বোধন করিতে। কিন্তু "লোহার কাঠির দ্বারা সোনার কাঠির কাজ সারিবার চেষ্টা কেবল যে নিষ্ফল তাহা নহে, তাহাতে উলটা ফল (অপমানের স্মৃতি) হইয়া থাকে।" কার্জনের আড়ম্বরপ্রিয়তা ও রাজপ্রতাপের উৎকট অভিব্যক্তিতে রাজপুত্র আড়াল পড়িয়া গিয়াছেন ও তাঁহার হৃদয়ের প্রকাশ অবরুদ্ধ হইয়াছে।

ভারতের রাজভক্তি ও রাজার প্রতি দৈব মহিমার আরোপ তাহার অন্তরের দীনতার পরিচয় নয়, পরন্তু সমস্ত মঙ্গলসম্পর্কের মধ্যে আদি মঙ্গল-

শক্তির স্পর্ধাস্ফুরণের প্রয়াস। সে গাভীর মধ্যে ও সমস্ত জড়যন্ত্রের মধ্যেও এক প্রণম্য দৈবশক্তির সন্ধান পাইয়া থাকে। রাজশাসন যন্ত্ররূপে পীড়াদায়ক, আর দেবশক্তির প্রত্যক্ষ প্রকাশরূপে আত্মার বরণীয়। ভারতবাসী বহুদিন ধরিয়া ক্ষুদ্র রাজা, ক্ষণিক রাজা, বহুরাজকত্বের দুর্বিষহ অত্যাচার হইতে এক হৃদয়বৃত্তিসম্পন্ন যথার্থ রাজার আশ্রয়ে মুক্তি চাহিয়াছে। কিন্তু ভারত-বাসীর এই হৃদয়সম্পর্কতৃষ্ণা নিবৃত্ত হয় নাই। কেননা "মরীচিকার দ্বারা সত্যকার তৃষ্ণা দূর হয় না।"

এই প্রবন্ধে লেখক মননের স্তর অতিক্রম করিয়া হৃদয়াবেগের দ্বারা চালিত হইবার প্রমাণ দিয়াছেন। প্রবন্ধের প্রারম্ভে ও উপসংহারে যুক্তিতর্কের ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মনোভঙ্গীর পরিবর্তে তিনি আবেগময়তার কল্পনাপ্রধান, অন্তরঙ্গ বাক্যসন্নিবেশ প্রয়োগ করিতে প্রণোদিত হইয়াছেন। তাঁহার গদ্যরচনার মধ্যে তাঁহার কবিপরিচয় গৌণ হইলেও একেবারে অনুপস্থিত নহে। যেখানে দেশবাসীর উদ্যত ভক্তি-অর্ঘ্য ও উন্মুখ আত্মনিবেদন শাসকগোষ্ঠীর অহঙ্কৃত নির্বুদ্ধিতায় প্রতিহত হইয়া ফিরিয়াছে সেখানে যে বেদনা ও ক্ষোভ সঞ্চিত হইয়াছে তাহার মুক্তি শুধু যুক্তির সঙ্কীর্ণ পথে নয়, অদম্য আবেগের উচ্ছ্বসিত স্রোতোপ্রবাহে, কাব্যের তরঙ্গশীর্ষ ভাবসৌকুমার্যে ও প্রত্যক্ষ সম্বোধনের নিগূঢ় ঐক্যবোধে।

৩

বঙ্গবিভাগ, আভ্যন্তরীণ বিভেদ ও আত্মসমীক্ষা

বঙ্গব্যবচ্ছেদকে অবলম্বন করিয়া বাঙলা দেশে যে বিরাট বিক্ষোভ ও জনজাগরণের সূত্রপাত হয়, তাহাই রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক প্রবন্ধের তৃতীয় স্তরের প্রেরণা দিয়াছে। বঙ্গভঙ্গ বাঙালীর রাজনীতি-আন্দোলনে একটি তাৎপর্যময় দিক্‌-পরিবর্তন, উহার মানস জগতে এক অভাবনীয় বিপ্লবের অগ্রদূত। এই ব্যাপারে সমস্ত বাঙালীজাতির হৃদয়াবেগ যে গভীরভাবে উন্মথিত হইয়া সমুদ্রসন্নিহিত নদীস্রোতের ন্যায় অবিচ্ছিন্নতা ও বিপুল গতিবেগ অর্জন করিয়াছে, উহাকে যে শাসকসম্প্রদায়ের সহিত সমকক্ষপর্যায় দ্বৈরথযুদ্ধের আহ্বান জানাইয়া উহাকে জীবনমরণসংগ্রামে

উদ্বুদ্ধ করিয়াছে, দেশাত্মবোধের যে প্রবল প্রবাহে উহাকে সাময়িকভাবে সমস্ত ক্ষুদ্র স্বার্থপরতা ও হিসাবীমনোবৃত্তির হেয়তা হইতে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে, তাহা ঠিক পূর্ব আন্দোলনের অনুবর্তন নয়, এক নূতন ভাবানুভূতি ও কর্মশক্তির বিদ্যুৎপ্রেরণাসঞ্চার। রবীন্দ্রনাথের রচনার মধ্যেও এই নব ভাবাবেগ, এই নব সাধনার ভাস্বর উন্মোচন প্রতিফলিত হইয়াছে। ছোট-খাট উৎপীড়ন-অপমানের গ্লানিময় স্মৃতি, তীক্ষ্ণ শ্লেষাস্ত্র-প্রয়োগে ও মননশীল আলোচনার দ্বারা ইংরাজের দম্ভস্ফীতি ও অন্ধ আত্মপ্রসাদের চূর্ণীকরণ রবীন্দ্রচিত্ত হইতে দূরে অপসারিত হইয়াছে। তাঁহার রচনার মধ্যে বৃহৎ গঠনমূলক আদর্শ, দীর্ঘ সংগ্রামের জন্য আত্মপ্রস্তুতি, আপাতব্যর্থতার মধ্যে পরিণাম-সার্থকতার প্রতি অক্ষুন্ন বিশ্বাস প্রভৃতি উচ্চতর নৈতিক ভাবগুলি উপযুক্ত কল্পনা-ঔদার্য ও প্রকাশ-মর্যাদার সহিত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। সাহিত্যিক উৎকর্ষ ও অনুভূতিগভীরতার দিক দিয়া ইহারা সাময়িকতার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া কালজয়ী মহিমায় স্থির হইয়াছে।

এই স্তরের প্রবন্ধগুলিতে রবীন্দ্রনাথ ইংরাজের দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া নিজ দেশবাসীর উপর কেন্দ্রীভূত করিয়াছেন। জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামে ইংরাজ যাহা করে বা না করে তাহা নিতান্তই গৌণ। বরং ইংরাজের আনুকূল্য অপেক্ষা তাহার বিরোধিতাই, ছদ্ম-সহানুভূতি অপেক্ষা প্রকাশ্য প্রতিবন্ধকতাই জাতীয় জীবনের পক্ষে বেশী হিতকর। ইংরাজের যে নীতি আমাদের বাস্তব অবস্থার যথার্থ পরিচয় দেয়, যাহা আমাদিগকে ঘুম না পাড়াইয়া আমাদের প্রতিরোধশক্তিকে সদাজাগ্রত রাখে, যাহা অনুগ্রহের দান ফিরাইয়া লইয়া আমাদিগকে নিগ্রহের কশাঘাতে জর্জরিত করে, তাহাই আমাদের পক্ষে সত্যকার মঙ্গলপ্রসূ। সমস্ত ভাববিলাস ও অবাস্তব প্রত্যাশা বর্জন করিয়া যাহারা যুদ্ধের নির্মমতার প্রতি পূর্ণমাত্রায় সচেতন থাকে, তাহাদেরই যুদ্ধজয়ের সম্ভাবনা অধিক। সুতরাং পূর্ব পূর্ব স্তরে ইংরাজের প্রতি নিক্ষিপ্ত সমস্ত তীক্ষ্ণাস্ত্র সংহরণ করিয়া রবীন্দ্রনাথ এখানে তাঁহার দেশবাসীর মত্ততাকে অঙ্কুশাহত করিয়া উহাদের চৈতন্য-সম্পাদন করিতে চাহিয়াছেন। শত্রুর প্রতি প্রযুক্ত অস্ত্র কেবল শাণিত হইলেই যথেষ্ট; তার উপর যদি উহা যুক্তিচালিত হয়, তবে উহার লক্ষ্যবেধশক্তি অভ্রান্ত হয়। কিন্তু ভাইএর প্রতি শরসন্ধানে শুধু লক্ষ্যভেদ নয়, হৃদয়বেধ

করিতে হয়। এই বাণ যেন জালা ও প্রলেপ একসঙ্গে বহন করে, রক্তপাত করে কিন্তু ক্ষতকে বিষাইয়া তোলে না। মহাভারতে ভীষ্মের অর্জুনের প্রতি অস্ত্রক্ষেপের ন্যায় আহত করে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আশীর্বাদও জানায়—এইরূপ প্রয়োগ-দক্ষতার দাবী করে। রবীন্দ্রনাথের এই সুরের রাজনৈতিক প্রবন্ধের মধ্যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের উত্তাপের সহিত শুভবুদ্ধি-উদ্বোধনের স্নিগ্ধ স্পর্শের মিলন অনুভব করা যায়।

এই প্রবন্ধগুলিতে অন্তর্দুর্বলতার উদ্‌ঘাটন ও আত্মসমীক্ষার দ্বারা তাহার প্রতিকারের পথ-নির্দেশই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আন্দোলন-বিষয়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সহযোগিতার অভাব ও পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষতিক্ত সম্পর্ককেই অগ্রগতির পথে প্রধান বাধারূপে গণ্য করিয়াছেন। এই বাধা প্রয়োজনের তাগিদে দ্রুত অপসারিত হইবার নয়, দীর্ঘকাল ধৈর্য ধরিয়া নানা গঠনমূলক কাজের দ্বারাই পরস্পরের বিশ্বাস অর্জন করা সম্ভব। এই সমপ্রাণতার অভাবের জন্য তিনি হিন্দুসমাজেরই অনুদার ধর্মবিধি ও পরমত-অসহিষ্ণুতাকে দায়ী করিয়াছেন ও এই সমস্যা-সমাধানের দায়িত্ব প্রাগ্রসর হিন্দুসমাজের উপরই অর্পণ করিয়াছেন। তিনি এই উদ্দেশ্যসাধনের উপায়স্বরূপ নানা কর্মপন্থার নির্দেশ দিয়াছেন। হয়ত সেগুলি অনেকটা কবিকল্পনাপ্রভাবিত ও আদর্শবাদপ্রসূত, ঠিক বাস্তবোপযোগী নহে। অন্ততঃ স্বাধীনতা-উত্তর বাঙলা দেশে কবি নির্দেশিত কর্মপ্রণালী এ পর্যন্ত বাস্তবফলপ্রসূ হয় নাই। তাহা হইলেও ঐরূপ কর্মপন্থার নৈষ্ঠিক অনুসরণ ব্যতীত সমস্যা-সমাধানের অন্য কোন উপায় নাই।

শুধু হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ নয়, কংগ্রেসের মধ্যেই নরমপন্থী ও চরমপন্থী এই দুই দলের কর্মপন্থা লইয়া উগ্র মতানৈক্য ও উভয়ের মধ্যে আপোষহীন সংঘর্ষ রাজনৈতিক সংগ্রামের ভারকেন্দ্রকে বাহির হইতে ভিতরে স্থানান্তরিত করিয়াছে। অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছে যে ইংরাজের বিরুদ্ধে সংঘর্ষ হইতে হিন্দু-মুসলমান ও চরমপন্থী-নরমপন্থীর মতভেদই আরও তীব্র ও তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। সাধারণ শত্রুর সম্মুখীন হওয়া অপেক্ষা অন্তর্ভেদী দ্বন্দ্বনিরসনই আমাদের আশু কর্তব্য রূপে দেখা দিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এই ভ্রাতৃবিরোধে অনেকটা নিরপেক্ষ ছিলেন বলিয়াই তাঁহার পক্ষে উত্তেজনা এড়াইয়া ধীরভাবে সমস্ত বিষয়টি পর্যালোচনা করা সম্ভব হইয়াছে ও তিনি এ বিষয়ে যথেষ্ট পরিমাণ শুভবুদ্ধি ও দূরদৃষ্টির পরিচয়

দিতে পারিয়াছেন। তথাপি সুলভ প্রতিদ্বন্দ্বিতাবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য কর্ম পণ্ড করিতে কৃতসংকল্প ও সদ্যফললাভে উৎসুক পক্ষদ্বয়ের কাহারও তিনি আস্থা অর্জন করিতে পারেন নাই। 'বঙ্গবিভাগ' (জ্যৈষ্ঠ ১৩১১, বঙ্গদর্শন), 'সফলতার সদুপায়' (চৈত্র ১৩১১, বঙ্গদর্শন) 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' (আশ্বিন ১৩১২, আত্মশক্তি ও সমূহ), 'দেশনায়ক' (জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩, বঙ্গদর্শন), সভাপতির অভিভাষণ (১৩১৪, আত্মশক্তি ও সমূহ), 'ব্যাধি ও প্রতিকার' (শ্রাবণ ১৩১৪, প্রবাসী), 'যজ্ঞভঙ্গ' (মাঘ ১৩১৪, প্রবাসী), 'পথ ও পাথেয়' (জ্যৈষ্ঠ ১৩১৫, বঙ্গদর্শন, 'রাজা ও প্রজা'), 'সমস্যা' (আষাঢ় ১৩১৫, প্রবাসী, 'রাজা ও প্রজা'), 'সদুপায়' (শ্রাবণ ১৩১৫, প্রবাসী), 'দেশহিত' (আশ্বিন ১৩১৫, বঙ্গদর্শন)—এই সমস্ত প্রবন্ধ সেই অগ্নিযুগের চিন্তাধারা, কর্তব্যসঙ্কট ও প্রজ্ঞামননপুষ্ট আবেগের নিদর্শনস্বরূপ বর্তমান।

'বঙ্গবিভাগ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ইংরাজ সরকারের দেশব্যবচ্ছেদ ও শিক্ষানীতির প্রতিক্রিয়াস্বরূপ বাঙালীর মনে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে ও ইংরাজবিশ্বাসের মূল পর্যন্ত উচ্ছিন্ন হইয়াছে তাহাই একটি বিশেষ শুভ লক্ষণরূপে লক্ষ্য করিয়াছেন। তথাপি কোথাও কোথাও ভাববিলাসমূলক অনুযোগের রোদনপ্রবণতার জের যে এখনও দেখা যাইতেছে তাহা লেখকের সংযত ব্যঙ্গের উদ্দীপন করিয়াছে। "গাছের মজ্জার মধ্যে কি এই বিশ্বাসই রহিয়াছে যে, কুঠার তাহাকে আলিঙ্গন করিতে আসিয়াছে, ছিন্ন করিতে নহে।" দেশ এখন স্পষ্টবাদী হইয়াছে, স্বার্থের খাতিরেও দুই দিক্ রক্ষা করার দুর্বলতা তাহার নাই। "নদী শুষ্কপ্রায় হইলেও তাহা খুঁড়িয়া কিছু জল পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু চোখের জল খরচ করিয়া মেঘের জল আদায় করা যায় না।" সুতরাং লেখক এই স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রাক্-মুহূর্তে প্রশ্রয় বা অনুগ্রহ প্রত্যাখ্যান করিয়া নির্মম আঘাত ও অপমানকে আত্মশক্তি-উদ্বোধনের একমাত্র উপায়রূপে বরণ করিয়া লইয়াছেন। পূর্বেও তিনি এই নীতি ঘোষণা করিয়াছেন কিন্তু এখন এই নীতির পুনর্ঘোষণার মধ্যে এক অপরিবর্তনীয় সংকল্পের সুর ধ্বনিত হইয়াছে।

এই উপলক্ষ্যে লেখা প্রবন্ধগুলিতে লেখক সম্পূর্ণভাবে যুক্তির উপর নির্ভর না করিয়া আবেগের আশ্রয় লইয়াছেন ও মনে হয় সময় সময় সমস্ত প্রবন্ধের ভাবক্রমের ঔচিত্যসীমা লঙ্ঘন করিয়াও আবেগের অপরিমিত প্রশ্রয় দিয়াছেন। মননপ্রধান রচনায় কাব্যোচ্ছ্বাস যেন সমগ্রের সুরসঙ্গতি অক্ষুণ্ণ

রাখে এই সর্ত লেখক সব সময় পূরণ করেন নাই। তাঁহার অন্তঃসঞ্চিত বিপুল ভাবাবেগ যেন নিম্নোদ্ধৃত বাক্যটিতে মাত্রাতিরিক্ত চড়া সুরে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। "তখনই আমরা যথার্থভাবে অনুভব করিব যে বাংলার পূব-পশ্চিমকে চিরকাল একই জাহ্নবী তাঁহার বাহুপাশে বাঁধিয়াছেন, একই ব্রহ্মপুত্র তাঁহার প্রসারিত ক্রোড়ে ধারণ করিয়াছেন; এই পূর্ব-পশ্চিম হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ বাম অংশের ন্যায় একই সনাতন রক্তস্রোতে সমস্ত বঙ্গদেশের শিরা-উপশিরায় প্রাণবিধান করিয়া আসিতেছে।" যেখানে এই চেতনার অভাবেই আত্মবিরোধ দেখা দিয়াছে ও কবিকে প্রাত্যহিক কর্তব্য-নির্ণয়কারীর ভূমিকায় নামিতে হইয়াছে, সেখানে এই কাব্যরসপ্লাবন বাস্তব পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে বে-মানান মনে হয় না কি?

'সফলতার সদুপায়' (চৈত্র, ১৩১১) প্রবন্ধটি একদিকে পরাধীন জাতির রাজনৈতিক অধিকারলাভের জন্য আত্মপ্রস্তুতির মূলনীতিনির্ণয়ে প্রজ্ঞাদীপ্ত ও স্মরণীয় উক্তিগ্রন্থনে তীক্ষ্ণাগ্র, অপরদিকে অতিদৈর্ঘ্যের জন্য গঠনসুষমাহীন, অতিমুখরতায় অসংযত। অধীন জাতিকে দুর্বল করা, উহার শক্তিকে কেন্দ্রসংহত করার পথে বাধা দেওয়া অদূরদর্শী আত্মঘাতী সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে স্বাভাবিক। তবে শোষণধর্মী রাষ্ট্রনীতি নিজের ধ্বংসকেই ত্বরান্বিত করে ইহাই বিশ্বনীতির অমোঘ বিধান। ইংরাজের ভেদনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-জ্ঞাপন শক্তির অপব্যয় মাত্র। তবে বাংলা সাহিত্যের ক্রমপ্রসারের জন্য যে প্রগতিশীল দেশাত্মবোধ সমগ্র সমাজমানসে পরিব্যাপ্ত হইতেছে, কোন কৃত্রিম উপায়ে তাহার গতিরোধ অসম্ভব। এই অগ্রগতি এতই প্রত্যক্ষ যে উহাকে অস্বীকার করাও বৃথা। "জ্বলন্ত দীপ কি শিখা নাড়িয়া বলিবে—না, তাহার আলো নাই।"

বিলাতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শক্তির উৎস এক ও দেশের হিতসাধন সাধারণ লক্ষ্য বলিয়াই সেখানে বিধিসম্মত আন্দোলন ফলপ্রসূ। কিন্তু বাঙলা দেশে "মাখনের দুধ রহিল গোয়ালাবাড়িতে, আর আমি আমার ঘরের জলে অহরহ আন্দোলন করিতে রহিলাম ইহাতে কি মাখন জুটিবে?" সুতরাং ছোটখাট অস্বস্তিতে অধীর না হইয়া মূল ব্যাধির নির্ণয় ও প্রতিকার আবশ্যক। আমরা দেশসেবার নিম্নতম সোপানে আরোহণ না করিয়াই যদি ইংরাজের নিকট তাহার জাতিস্বার্থবিরোধী উদার শাসননীতির প্রত্যাশা করি তবে সে আশাপূরণ কোন দিনই ঘটিবে না।

এই পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ একটি সমান্তরাল স্বায়ত্তশাসনব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার পরামর্শ দিয়াছেন। ইহা আমাদের বিদ্যাশিক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা ও বাণিজ্যবিস্তারের ভার লইয়া আমাদের দেশসেবার আগ্রহকে বাস্তব রূপ দিবে ও আমাদের সমস্ত বিচ্ছিন্ন প্রতিরোধ-শক্তির ঐক্যবিধান ও কেন্দ্রাশ্রয় রচনা করিবে। এই প্রতিষ্ঠানকে আমরা স্বেচ্ছায় কর দিব ও আমাদের সমস্ত ত্যাগ ও দেশপ্রেম ইহারই নিকট উৎসর্গ করিব। অবশ্য এ প্রস্তাব বাস্তবে কতদূর সম্ভব ও ইংরাজ রাজশক্তি ইহার প্রতিষ্ঠা ও রূপদানে কিরূপ বাধা সৃষ্টি করিবে এ প্রশ্ন রবীন্দ্রনাথ উত্থাপন করিয়া গভীরতর বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হন নাই। আরও আশ্চর্যের বিষয়, তিনি বিশ্বাস করেন যে এইরূপ শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান নিজের দাবীদাওয়া সম্বন্ধে বিদেশী শাসকের নিকট হইতে একটা সম্মানজনক নিষ্পত্তিতে পৌছিতে পারিবে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার দেশের রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে আলোচনার দ্বারাই ক্ষমতা-প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছিলেন। কিন্তু এই পরিণতির পূর্বে দুই বিশ্বযুদ্ধের রক্তাপ্লুত মর্মান্তিক ব্যবধানই এই বৈপ্লবিক অভাবনীয় পরিবর্তনকে সম্ভব করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নকল্পনা বিশ্ববিপ্লবের অগ্নিময় সূতিকা-গারে মানবের বাস্তব প্রয়োজনের সন্ততিরূপে বিকলাঙ্গ জন্মপরিগ্রহ করিয়াছে।

'অবস্থা ও ব্যবস্থা' (আশ্বিন ১৩১২) প্রবন্ধে পূর্বতন প্রবন্ধগুলির ভাববৃত্তের অনুবর্তন ও দৃঢ়ীকরণ হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এখন অনুভব করিয়াছেন যে তাঁহার বহুধা-বিঘোষিত আত্মনির্ভরশীলতার নীতি দেশ-চেতনায় দৃঢ়মূল হইয়াছে, উপদেশের প্রাচুর্যের আপাত-অপচয়ের মধ্যে ফলপ্রাপ্তির দিন আসন্নতর হইতেছে, বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মধ্যে দোলায়িত চিত্ত ক্রমশঃ অবিশ্বাসের দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িতেছে ও বিদেশী শক্তির অনুগ্রহের উপর নির্ভর ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। এই ভাবভূমিকা একটি বিশেষ তাৎপর্যময় পরিণতির পূর্বপ্রস্তুতিরূপে আমাদের সমস্ত শক্তি সংহত করিয়া এক বিরাট কর্মযজ্ঞ অনুষ্ঠানের আহ্বান জানাইতেছে। "প্রবাদ আছে যে ভাগের মা গঙ্গা পায় না, ভাগের কুপোষ্যই কি মাছের মুড়া এবং দুধের সর পায়" (অর্থাৎ যাহারা ভিক্ষাবৃত্তিদ্বারা ভেদ ঘটাইতে চাহে)। এই পরম ক্ষণে সমস্ত বৃথা চেষ্টায় শক্তিক্ষয় সর্বথা বর্জনীয়। "নিষ্ফল চেষ্টায় প্রবৃত্ত শক্তি, ডিম্ব হইতে অকালে জাত অরুণের মতো পঙ্গু হইয়াই থাকে—

সে কেবল রথেই জোড়া থাকিবার উমেদার হইয়া থাকে, তাহার নিজের উড়িবার কোন উদ্যম থাকে না।"

রবীন্দ্রনাথ সবিস্ময়ে ও সপ্রশংসভাবে দেশের এই চিত্তপ্রস্তুতির অগ্রগতি লক্ষ্য করিয়াছেন ও এই মহৎ ভাবপ্রেরণাকে স্থায়ী সংগঠনরূপ দিবার উপায় সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়াছেন। তিনি একজন হিন্দু ও একজন মুসলমানের অধিনায়কত্বে একটি কর্তৃসভা স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন। এই কর্তৃসভা পল্লী-উন্নয়ন, শিক্ষাব্যবস্থা ও বেকারসমস্যা নিবারণের কার্যে বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করিবেন ও সকলেরই বাধ্যতামূলক সহযোগিতা দাবী করিতে পারিবেন। এই পরিকল্পনা যে নিতান্ত অবাস্তব নহে তাহা রুষশাসনাধীন জর্জিয়া, আর্মেনিয়া প্রভৃতি প্রদেশের অধিবাসীবৃন্দের দ্বারা গোপনে পরিচালিত জাতীয় বিদ্যালয় ও বেসরকারী বিচারালয় প্রতিষ্ঠার দ্বারাই প্রমাণিত। বাংলা সাহিত্যও এই ঐক্যবিধানের প্রবল সহায়ক হইবে। ঐক্যশক্তির অসাধ্যসাধন সম্বন্ধে লেখক বলিতেছেন :—"জল যখন জমিয়া কঠিন হয় তখন সে লোহার পাইপকেও ফাটাইয়া ফেলে। আজ আমরা জলের মতো তরল আছি, যন্ত্রীর ইচ্ছামত যন্ত্রের তাড়নায় লোহার কলের মধ্যে শত শত শাখা-প্রশাখায় ধাবিত হইতেছি—জমাট বাঁধিবার শক্তি জন্মিলেই লোহার বাঁধনকে হার মানিতেই হইবে।"

লেখকের আবেগোচ্ছ্বাসে আত্মসমর্পণপ্রবণতা ও তজ্জন্য প্রবন্ধের ভাবসীমা-উত্তরণের নিদর্শনস্বরূপ নিম্নলিখিত বাক্যটি উদ্ধৃত হইল। "যিনি আমাদের দেশের দেবতা, যিনি আমাদের পিতামহদের সহিত আমাদিগকে একসূত্রে বাঁধিয়াছেন, যিনি আমাদের সন্তানের মধ্যে আমাদের সাধনাকে সিদ্ধিদান করিবার পথ মুক্ত করিতেছেন, যিনি আমাদের এই সূর্যালোকদীপ্ত নীলাকাশের নিম্নে যুগে যুগে সকলকে একত্র করিয়া এক বিশেষ বাণীর দ্বারা আমাদের সকলের চিত্তকে এক বিশেষভাবে উদ্বোধিত করিতেছেন, আমাদের চিরপরিচিত ছায়ালোকবিচিত্র অরণ্য-প্রান্তর-শস্যক্ষেত্র যাঁহার বিশেষ মূর্তিকে পুরুষানুক্রমে আমাদের চক্ষের সমক্ষে প্রকাশমান করিয়া রাখিয়াছে, আমাদের পুণ্য নদীসকল যাঁহার পাদোদকরূপে আমাদের গৃহের দ্বারে দ্বারে প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে, যিনি জাতিনির্বিশেষে হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টানকে এক মহাযজ্ঞে আহ্বান করিয়া পাশে পাশে বসাইয়া সকলেরই অন্নের থালা স্বহস্তে পরিবেশন করিয়া আসিতেছেন, দেশের

অন্তর্যামী সেই দেবতাকে, আমাদের সেই চিরন্তন অধিপতিকে এখনো আমরা সহজে প্রত্যক্ষ করিতে পারি নাই। যদি অকস্মাৎ কোনো বৃহৎ ঘটনায়, কোনো মহান্ আবেগের ঝড়ে পর্দা একবার একটু উড়িয়া যায়,…… তবে দেখিতে পাইব যিনি যুগযুগান্তর হইতে আমাদিগকে এই সমুদ্রবিধৌত হিমাদ্রি-অধিরাজিত উদার দেশের মধ্যে এক ধনধান্য, এক সুখ-দুঃখ, এক বিরাট্ প্রকৃতির মাঝখানে রাখিয়া নিরন্তর এক করিয়া তুলিতেছেন, সেই দেশের দেবতা দুর্জেয়।"

এই সুবৃহৎ কবিত্বময়, প্রকৃতিচেতনাদীপ্ত, অন্তশ্ছন্দধ্বনিত ভাবোচ্ছ্বাস যে প্রসঙ্গের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তাহার সহিত সঙ্গতিহীন ও লেখকের মূল উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। এই চেতনা দেশবাসীর মধ্যে জাগ্রত থাকিলে এত বিপুল তর্কযুক্তিদৃষ্টান্ত-সহযোগে, এত শ্লেষ-কশাঘাত-প্রয়োগে তাহাদের ন্যূনতম ঐক্যবোধের চৈতন্য-সম্পাদন করিতে হইত না এবং যতক্ষণ এই বোধ তাহাদের মধ্যে স্থিরত্ব লাভ না করে, ততক্ষণ এই কাব্যাবেদন ও দেবশক্তি-উদ্বোধন তাহাদের অন্তরকে স্পর্শ করিবে না। দীর্ঘ প্রবন্ধে গদ্যশৃঙ্খলাসমাবেশে ক্লান্ত লেখক তাঁহার কাছেই যে কবিলেখনী অলসভাবে তাঁহার দিব্য স্পর্শের প্রতীক্ষা করিতেছিল তাহাকে অকস্মাৎ প্রয়োগ করিয়া কাজের কথার মধ্যে স্বর্গবীণার সুরের অনধিকারপ্রবেশ ঘটাইয়াছেন।

'দেশনায়ক' (জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩, বঙ্গদর্শন)—রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে বাঙলা দেশের মৃত্যুসঙ্কটের এক ভয়াবহ, ব্যঞ্জনাময় বর্ণনা দিয়াছেন ও এই আসন্ন ধ্বংসের সময় সমস্ত অভিমান-কলহের ন্যায় ক্ষুদ্র চিত্তবিক্ষেপের কারণের ঊর্ধ্বে উঠিয়া দেশবাসীকে প্রতিকারচেষ্টায় অবিভক্ত মনোযোগ দিবার আহ্বান জানাইয়াছেন। সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনীর মত কাজ করিতে হইলে সর্বস্বীকৃত নেতৃত্বের প্রয়োজন। এই নেতার মধ্যেই দেশের আত্মা সংহত মূর্তি লইবে ও দেশবাসীর ইচ্ছাশক্তির একাগ্রতা প্রতিফলিত হইবে। সংগ্রামে সফলতা-লাভের উপায়স্বরূপ এই নেতৃত্বস্বীকারকেই লেখক সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়াছেন ও এই সময়ে লিখিত তাঁহার একাধিক প্রবন্ধে এই কর্মনীতির প্রতি তাঁহার অগাধ আস্থার পরিচয় দিয়াছেন। দীর্ঘকাল পরাধীন, অনুগ্রহে অভ্যস্ত জাতির পক্ষে এইরূপ একনায়কত্বের নিকট আনুগত্যের সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে কোন আলোচনা করেন নাই।

'সভাপতির অভিভাষণ—পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনী' (১৩১৪) সমস্ত অভিভাষণের ন্যায় অতিপল্লবিত ও নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের অবতারণায় খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন। তথাপি বঙ্গভঙ্গবিক্ষোভ ও কংগ্রেসের নিদারুণ আত্মকলহের পটভূমিকায় রচিত বলিয়া ইহার সাময়িকতার উর্ধ্বচারী একটা নীতিমূল্য আছে। রবীন্দ্রনাথ এই দলবিরোধে নির্লিপ্ত ছিলেন বলিয়া তাঁহার পক্ষে এই উৎকট উত্তেজনাকে জাতির জীবনীশক্তির নিদর্শনরূপে মানিয়া লওয়া ও মূল লক্ষ্যের সহিত প্রত্যেকের বিভিন্ন কর্মনীতির সামঞ্জস্যরক্ষা করা সম্বন্ধে প্রাজ্ঞ ও অক্ষুব্ধ নির্দেশ দেওয়া সম্ভব হইয়াছে। মতবিরোধের বৈচিত্র্য-স্বীকৃতি ও উদ্দেশ্যের অভিন্নতায় উহার নিয়োগই সাফল্যের একমাত্র উপায়। "যেমন বাষ্পসংঘাতকে লোহার বয়লারের মধ্যে বাঁধিতে পারিলে তবেই কল চলিতে পারে, তেমনি আমাদের মতসংঘাতের আশঙ্কা যতই প্রবল হইবে আমাদের নিয়ম-বয়লারও ততই যন্ত্রের ন্যায় কঠিন হইলে তবেই কর্ম অগ্রসর হইবে।" এখন নির্ধারিত নিয়ম-অনুযায়ী প্রতিনিধি-নির্বাচনও আমাদের কর্মসূচির অপরিহার্য অঙ্গ হওয়া উচিত। এই উত্তেজনার মুহূর্তে সংযম ও সহিষ্ণুতার একান্ত প্রয়োজন ও কোনরূপ আত্মবিস্মৃতি অমার্জনীয় অপরাধ। "আগুন যখন আমাদের নিজের ঘরেই লাগিয়াছে তখন দুই পক্ষ দুই দিক হইতে এই অগ্নিকে উষ্ণবাক্যের বায়ুবীজন করিয়া ইহাকে প্রতিকারের অতীত করিয়া তুলিলে, তাহার চেয়ে মূঢ়তা আমাদের পক্ষে আর কিছুই হইতে পারিবে না।"

হিন্দুমুসলমানের বিভেদদূর ও ঐক্যসাধন বর্তমানের আশু কর্তব্য। সরকারের পক্ষে মুসলমানকে অতিপ্রশ্রয় দিয়া তাহাকে হিন্দুর বিরুদ্ধাচরণে উস্কানি দেওয়া অত্যন্ত আত্মঘাতী নীতি হইবে। "অসন্তোষকে চিরবুভুক্ষু করিয়া রাখিবার উপায় প্রশ্রয়। এ-সমস্ত শাঁখের করাতের নীতি। ইহাতে শুধু একা প্রজা কাটে না, ইহা ফিরিবার পথে রাজাকেও আঘাত দেয়।" মুসলমানের বেশী চাকরি-প্রাপ্তি যদি তাহাদের হিন্দুবিদ্বেষকে প্রশমিত করে, তবে হিন্দুরও প্রসন্নচিত্তে সে ব্যবস্থা মানিয়া লওয়া উচিত।

এক্স্ট্রিমিষ্ট বা চরমপন্থী দলের উদ্ভব আমাদের শাসকগোষ্ঠীর চরম ঔদাসীন্যের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। ইংরাজের চরমনীতি আমাদের অন্তরের অবদমিত বিক্ষোভকে নিদারুণ ঝটিকার রুদ্রমূর্তিতে মুক্তি দিয়াছে। আর এই এক্স্ট্রিমিজমের সংজ্ঞা ও সীমা আমাদের দ্বারা নির্ধারিত নয়, উহা

ইংরাজের মর্জির উপর নির্ভরশীল। আমরা সমস্ত উৎপীড়নের ও ক্ষোভের মধ্যে এক নূতন শক্তিচেতনায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছি।

ইংরাজ সরকারের ভুল-ভ্রান্তি আমাদের অনুকরণীয় নয়। ইংরাজ দেশবাসীর এই নবজাগ্রত শক্তিকে ক্ষমতামত্ততায় অস্বীকার করিলেও আমাদের পক্ষে পাল্টা জবাব হিসাবে ইংরাজরাজশক্তিকে অস্বীকার করা সুবুদ্ধির কাজ হইবে না। "গায়ের জোরে 'হাঁ'কে 'না' করিলে গণিতশাস্ত্র ক্ষমা করিবার লোক নয়।" অনাহূত ঔদ্ধত্য ও অনাবশ্যক উষ্ণবাক্য আমাদের কর্মের দুরূহতাকেই কেবল বাড়াইয়া দিবে।

তাহার পর লেখক গ্রামসংগঠনের অবশ্য-প্রয়োজনীতা সম্বন্ধে, পল্লীবাসীর অসহায়তা দূর করিয়া তাহাদের প্রতিরোধ-শক্তি উদ্দীপ্ত করার আয়োজন বিষয়ে যে সমস্ত মন্তব্য করিয়াছেন তাহা পুরাতনেরই পুনরাবৃত্তি। ব্যূহবদ্ধতা বা অর্গানাইজেশন এখন আমাদের সবচেয়ে জরুরি করণীয়।

উপসংহারে কবি একটি কাব্যোচ্ছ্বাসময় শুভ পরিণতির উজ্জ্বল আশা প্রকাশ করিয়া ভাষণের পরিসমাপ্তি করিয়াছেন। ইহা অপেক্ষাকৃত সংযত ও সুদীর্ঘ অভিভাষণে শ্রোতৃবৃন্দের যে আবেগপূর্ণ প্রত্যাশা জাগিয়াছে তাহারই যথাযথ ও মাত্রাসঙ্গত অভিব্যক্তি।

'ব্যাধি ও প্রতিকার' (শ্রাবণ ১৩১৪, প্রবাসী) গঠনমূলক ব্যবস্থা-অবলম্বনের জন্য সনির্বন্ধ আবেদন। বঙ্গবিভাগব্যাপারে দেশীয় জনমতের প্রতি সরকারের স্পর্ধিত উপেক্ষা আমাদিগকে আমাদের অসহায়তা সম্বন্ধে তীক্ষ্ণভাবে সচেতন করিয়াছে ও আমাদের মনকে সবল প্রতিরোধের উপায়-চিন্তায় প্রবৃত্ত করাইয়াছে। কিন্তু যে কোন প্রকারের যুদ্ধ যথেষ্ট প্রস্তুতি-সাপেক্ষ। ইংরাজে মহত্ত্বের ও উদারতার উপর যদি আমাদের গোপন নির্ভর থাকে, তবে আমাদের যুদ্ধপ্রস্তুতি ব্যাহত হইবে।

হিন্দুমুসলমানের বিরোধের অস্তিত্ব বাস্তব সত্য হিসাবে ও আমাদের অগ্রগতির বাধা হিসাবে স্বীকার করিয়াই আমাদিগকে কাজে নামিতে হইবে। আশু ফললাভের প্রলোভনে যেন আমরা যথার্থ অবস্থার প্রতি চক্ষু বুজিয়া না থাকি। এই আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা অতিক্রম করিতে যে ধৈর্য ও নিষ্ঠার প্রয়োজন তাহার সম্বল যেন আমাদের যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। "যে নৌকায় কোনোমতে ভর সয় মাত্র সেই নৌকায় নৃত্য করিতে শুরু

করিলে যদি তাহার ফাটগুলা দিয়া জল উঠিতে থাকে তবে সেটাকে আমরা এমন অভাবনীয় বলিয়া মনে করি কেন।"

লেখক পরিশেষে তরুণসম্প্রদায়কে উপদেশ দিয়াছেন যে সমস্ত বাহ্য উত্তেজনা ও সংবাদপত্রের সাড়ম্বর প্রচার পরিহার করিয়া ক্ষুদ্র গ্রামে খ্যাতিহীন জনসেবার কাজে একনিষ্ঠভাবে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। দেশকে চিনিতে হইবে, দেশের সমস্যা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে হইবে। আহত আত্মাভিমানের অক্ষম প্রতিঘাতস্পৃহা নীরবে পরিপাক করিয়া ঐ চাঞ্চল্যকে শক্তিবৃদ্ধির প্রয়োজনে লাগাইতে হইবে। "কারণ, উত্তেজনা আড়ম্বরের কাঙাল, এবং আড়ম্বর কর্ম নষ্ট করিবার শয়তান।" নতুবা "আমাদের অদ্যকার সমস্ত আস্ফালন একদিন তিতুমীড়ের লড়াইয়ের সঙ্গে এক ইতিহাসে ভুক্ত হইবে।"

'যজ্ঞভঙ্গ' (মাঘ ১৩১৪, প্রবাসী) মধ্যপন্থী ও চরমপন্থীর অনমনীয় সংঘর্ষ-প্রবণতার ফলে কংগ্রেস-অধিবেশন পণ্ড হওয়ার দুঃখজনক পরিণতির উপর লেখকের মন্তব্য। ইহাতে তাঁহার পূর্ব প্রবন্ধে অভিব্যক্ত আশা কিরূপ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে তাহারই ক্ষুব্ধ স্বীকৃতির সুর শোনা যায়। যে সত্যস্বীকারকে রবীন্দ্রনাথ আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের মূল ভিত্তি রূপে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন তাহা দুই দলের ক্ষমতালোলুপতার দ্বন্দ্বে কার্যতঃ সম্পূর্ণ অবহেলিত হইয়াছে। কবির আদর্শবাদপ্রসূত কর্মনির্দেশের সঙ্গে কদর্য বাস্তব পরিস্থিতির ব্যবধান মর্মান্তিকভাবে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। যাঁহারা নেতৃস্থানীয়, এমন কি সভাপতি পর্যন্ত, অধিবেশনের মূল লক্ষ্য বিস্মৃত হইয়া তুমুল বাদবিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হওয়া ও তর্কযুদ্ধে জয়লাভ করাকেই একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করিয়াছেন। "তিনি (সভাপতি) এমনভাবে কংগ্রেসের হালের কাছে দাঁড়াইয়াছিলেন যেন ঐ চরমপন্থীর দলটা জলের একটা ঢেউ মাত্র, উহা পাহাড় নহে, যেন কেবল প্রবল বাক্যবায়ুতে পাল উড়াইয়াই উহাকে ডিঙাইয়া যাওয়া চলিবে।" "ইঁহারা কবির লড়াইএর দলের মতো উপস্থিত বাহবা ও দুয়োকে অত্যন্ত বড় করিয়া দেখেন।"

রবীন্দ্রনাথ শেষ অনুচ্ছেদে এই আধুনিক যজ্ঞভঙ্গের উপর পৌরাণিক দক্ষযজ্ঞ-নাশের রূপকার্থ সুকৌশলে আরোপ করিয়াছেন। দক্ষ দক্ষতার, সতী সত্যের ও শিব মঙ্গলের প্রতীক। আমরা যদি নিজ বুদ্ধিকৌশলের অভিমানে অন্ধ হইয়া সত্যকে উপেক্ষা করি তবে মঙ্গল আমাদের হস্তচ্যুত হইবেই হইবে।

লেখক আশাভঙ্গের এই দারুণ আঘাতে সংযতগম্ভীর খেদে অভিভূত হইয়াছেন ও তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ কবিসুলভ শুভকল্পনাকে কোনরূপ প্রশ্রয় দেন নাই।

'সদুপায়' (শ্রাবণ ১৩১৫, প্রবাসী) স্বদেশী আন্দোলনের একটি দিক—জোর করিয়া বিলাতী কাপড় ও লবণ বর্জনের দেশব্যাপী প্রবর্তন—প্রয়াস কেমন করিয়া মুসলমান ও নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের প্রচণ্ড বিরোধিতা জাগ্রত করিল তাহারই কারণবিশ্লেষণ ও প্রতিকারব্যবস্থা এই প্রবন্ধের উপজীব্য। ইহাতে লেখক অসাধারণ ন্যায়নিষ্ঠা ও সত্যানুরাগের সহিত স্বীকার করিয়াছেন যে আমরা ইংরাজের প্রতি দ্রুত প্রতিশোধগ্রহণের তাড়নায় দেশবাসীর একটা বড় অংশের আস্থা অর্জন না করিয়াই বলপ্রয়োগে আমাদের আন্দোলনে তাহাদের সমর্থন আদায় করিতে গিয়া ব্যর্থ হইতেছি ও দেশের মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষ বাড়াইয়া তুলিতেছি। স্বাধীন মতবাদের প্রতি মর্যাদা না দিয়া স্বাধীনতাপ্রচার এক অদ্ভুত স্ববিরোধী মনোভাবের প্রকাশ। "সত্য পদার্থ মানুষের হৃদয়বুদ্ধি, মানুষের মনুষ্যত্ব; স্বদেশী মিলের কাপড় অথবা করকচ লবণ নহে।" "ভাই শব্দটা আমাদের কণ্ঠে ঠিক বিশুদ্ধ কোমল সুরে বাজে না—যে কড়ি সুরটা আর সমস্ত স্বরগ্রাম ছাপাইয়া কানে আসিয়া বাজে সেটা অন্যের প্রতি বিদ্বেষ।" এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ আমাদের স্বদেশপ্রেমের অত্যুচ্ছ্বাসের মধ্যে যে দুর্বলতা ছিল তাহা অভ্রান্তভাবে নির্দেশ করিয়াছেন। শাশ্বতনীতির উৎকট লঙ্ঘনে আমাদের দেশাত্মবোধ যে কখনই তৃপ্ত হইবে না, অনিচ্ছুক কর্ণে স্বাধীনতামন্ত্রের দীক্ষা যে ছদ্মবেশী অধীনতারই পূজা, এই নিগূঢ় তত্ত্বটি আশ্চর্য সাহস ও সূক্ষ্মদর্শিতার সহিত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

'পথ ও পাথেয়' (জ্যৈষ্ঠ ১৩১৫, বঙ্গদর্শন) ও 'সমস্যা' (আষাঢ় ১৩১৫, বঙ্গদর্শন) প্রবন্ধদ্বয় রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক আলোচনার শীর্ষস্থানীয়। বাঙলায় রাজনৈতিক বিক্ষোভ যখন সন্ত্রাসবাদের বিভীষিকাময় রূপ লইয়াছে ইহারা সেই অগ্নিময় পরিবেষ্টনীতে আমাদের কর্তব্যনির্ধারণপ্রয়াস, ভারতের শাশ্বতনীতি ও উহার ইতিহাসের নিগূঢ় মর্মবাণীর উদ্‌ঘাটন। সাধারণতঃ এই জাতীয় প্রবন্ধ যে তুচ্ছ উপলক্ষ্যের স্পর্শে ধূলিমলিন, যে সুপরিচিত বাদ-প্রতিবাদের পুনঃ পুনঃ চক্রাবর্তনে অযথা উত্তপ্ত, একই উপদেশ-নির্দেশের যে পুনরাবৃত্তিতে বিস্বাদ, তাহা যাঁহারা এই প্রবন্ধগুলি

আনুপূর্বিক পাঠ করিতে চেষ্টা করেন তাঁহারাই অনুভব করেন। কিন্তু সন্ত্রাসবাদের আবির্ভাবের পর এই ধূম্রাকুল বদ্ধ আবহাওয়া হঠাৎ জাতীয় চেতনায় এবং লেখকের রচনারীতিতে যুগপৎ বিদ্যুৎশক্তিপ্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। লেখক অকস্মাৎ বহ্নিমান্ পর্বতের ধূলি ও বাষ্পে অস্পষ্ট পার্শ্বদেশ ছাড়াইয়া উহার অগ্নিকিরীটী শীর্ষদেশে দিগন্তব্যাপী মুক্তির মধ্যে দাঁড়াইলেন। আপাতলভ্য ফলপ্রাপ্তির উপায়বিচারে, শুধু কথার ঠোকাঠুকিতে, মতের সহিত মতের সংঘর্ষে যে শ্বাসরোধী, অস্বস্তিকর গুমটভাবের উদ্ভব হইয়াছিল, মনের উপর যে বাষ্পাবরণ চাপিয়া বসিয়াছিল, যে কবিকল্পনা বস্তুভারে ক্লিষ্ট হইয়াছিল, গোপন বিপ্লবের দমকা ঝড়ে তাহা ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল, কবির ইতিহাস-চেতনা ও শাশ্বত নীতিবোধ আবার উহাদের স্বচ্ছতা ও দূরসমীক্ষাশক্তি ফিরিয়া পাইল ও কবির অবদমিত নভোচারী কল্পনা ও ভাবাবেগ আবার বাধামুক্ত ধারায় প্রবাহিত হইল। লেখক এই দুইটি প্রবন্ধে রাজনীতির সাময়িকতা, বস্তুসর্বস্বতা ও সদ্যোফললিপ্সু যুক্তি-বিন্যাসের স্তর অতিক্রম করিয়া শাশ্বত নীতির অন্তর্দৃষ্টিগভীরতা, অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎব্যাপী বিরাট কালপরিধিতে স্বচ্ছন্দবিচরণ ও আবেগময় অনুভূতির নির্মল ভাবপরিমণ্ডলে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

বাঙলা দেশে বৈপ্লবিক আন্দোলনের সূচনা এতই অপ্রত্যাশিত যে প্রথম বিস্ময়ের ঘোর কাটাইয়া উঠাই শক্ত। এ যেন জেলের প্রাত্যহিক জাল-ফেলায় নিরীহ মাছের পরিবর্তে বিকটাকার দৈত্যের উঠিয়া আসা। এই অভাবনীয় আবির্ভাবের যথার্থ কারণনির্দেশ ও সূক্ষ্ম বিচার আরও দুরূহ কাজ। লেখক এখানে সাহস করিয়া বলিয়াছেন যে এই সমস্ত যুবক, যতই বিভ্রান্ত ও অদূরদর্শী হউক, বাঙালীর কর্মহীন বাক্‌সর্বস্বতার মূর্ত প্রতিবাদ ও জাতীয় কলঙ্কের মোচনকারী। আর যাহাদের উপর রাজরোষের বজ্র উদ্যত হইয়াই আছে, তাহাদের আচরণের নিন্দা মড়ার উপর খাঁড়ার ঘায়ের মতই নিরর্থক। বিশেষ কোন ব্যক্তি বা দলের উপর ইহার দায়িত্ব-আরোপও ঠিক সুবিচারের আদর্শ হইবে না। "জ্বর যখন সমস্ত শরীরকে অধিকার করিয়াই হইয়াছিল তখন হাতের তেলো, কপালের চেয়ে ঠাণ্ডা ছিল বলিয়াই মৃত্যুকালে নিজেকে সাধু ও কপালটাকেই যত নষ্টের গোড়া বলিয়া নিষ্কৃতি পাইবে না।" আমাদের সর্বব্যাপ্ত মনের আগুনে "ভিজা কাঠ ধোঁয়াইতে লাগিল, শুকনা কাঠ জ্বলিতে লাগিল ও ঘরের কোণে

কোন্‌খানে কেরাসিন ছিল সে আপনাকে ধারণ করিতে না পারিয়া টিনের শাসন বিদীর্ণ করিয়া একটা বিভীষিকা করিয়া তুলিল"—ইহাই বোধ হয় তথ্য ও দায়িত্ববণ্টন উভয় দিক দিয়াই যথার্থ নির্ধারণ।

এই সঙ্কটকালে গভর্নমেণ্টকে ক্ষমার উপদেশ দেওয়াও যেমন দুরাশা, তেমনি পরিস্থিতির গুরুত্ব লাঘব করার চেষ্টাও সত্যের অপলাপ। উচ্চতর নীতির দোহাই পাড়াও হয়ত বিদ্রূপই উৎপাদন করিবে। সুতরাং উত্তেজিত দেশের লোককে যাহা কিছু বলিতে হইবে তাহা নিছক প্রয়োজনের দিক হইতেই। কোন বড় কাজের উচিত মূল্য দিতেই হইবে। "আমার মনের তাগিদ অত্যন্ত বেশি বলিয়া জগতে কোনোদিন রাস্তাও নিজেকে ছাঁটিয়া দেয় না, সময়ও নিজেকে খাটো করে না।"

এই প্রয়োজনের কথা বলিবেন বলিয়া লেখক ভারতের অতীত ইতিহাস মন্থন করিয়া উহার মধ্যে বিধাতার কি নিগূঢ় অভিপ্রায় ধীরে ধীরে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতেছে তাহাই ব্যাখ্যা করিয়াছেন ও এই যুগযুগান্তর-বিকশিত অভিপ্রায়ের সহিত সহযোগিতাসাধনই সাফল্যলাভের একমাত্র উপায়রূপে নির্দেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ ভারতের প্রাচীন যুগ হইতে আগত সমস্ত জাতি যেমন এখানে এক বিরাট সংশ্লেষ-প্রক্রিয়ার অঙ্গীভূত হইয়াছে, ইংরাজের সঙ্গেও সেই একীভবন বিধাতার নির্দেশ। "বিধাতার ইচ্ছার সহিত নিজের ইচ্ছাকে সম্মিলিত করাই সফলতার একমাত্র উপায়; তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে গেলেই ক্ষণিক কার্যসিদ্ধি আমাদিগকে ভুলাইয়া লইয়া ভয়ঙ্কর ব্যর্থতার মধ্যে ডুবাইয়া মারিবে"।

এই ভাবপরিক্রমায় লেখক রাজনীতির আশু প্রয়োজনসিদ্ধির যে কোন উপায়ে দ্রুত ফলপ্রাপ্তির প্রাকৃত মানদণ্ডকে অতিক্রম করিয়া এক বিরাট-ইতিহাস-প্রসারিত, ধ্যানগম্য, ভগবানের কল্যাণ-ইচ্ছার আদর্শকে অবলম্বন করিয়াছেন ও তাঁহার চিন্তাধারা এই বৃহত্তর বৃত্তাশ্রয়ী হইয়া এক দুরূহতম সাধনার প্রতি লক্ষ্যবদ্ধ হইয়াছে।

লেখক বিপ্লব সম্বন্ধে একটি গভীর ভাবসত্য আবিষ্কার করিয়াছেন। বিপ্লবেই যে স্বাধীনতা আসে তাহা ঠিক নয়। যে জাতি পুনর্গঠনের জন্য প্রস্তুত, সেই জাতিই বিপ্লবকে কাজে লাগাইতে পারে। "শুধু মাত্র ভাঙন, নির্বিচার বিপ্লব কোনো মতেই কল্যাণকর হইতে পারে না"। বাঙলায় এই গঠনমূলক প্রস্তুতির অভাব বলিয়াই এখানে শুধু রুষ্ট আবেগের

তীব্রতাই, শুধু শক্তির অকস্মাৎ প্রকাশে ইংরাজের মনে চমক লাগাইবার নাটকীয়তাই আমাদিগকে পূর্ণসিদ্ধিতে পৌছাইয়া দিতে পারিবে না। "ঠাণ্ডার দিনে নৌকার কাছেও ঘেঁসিলাম না। তুফানের দিনে তাড়াতাড়ি হাল ধরিয়া অসামান্য মাঝি বলিয়া দেশে বিদেশে বাহবা লইব এইরূপ আশ্চর্য ব্যাপার স্বপ্নে ঘটাই সম্ভব"। "ফলকে পাকিতে দেওয়াই সে (উত্তেজনাপরায়ণ) ব্যক্তি ঔদাসীন্য বলিয়া জ্ঞান করে, টান দিয়া ফলকে ছিঁড়িয়া লওয়াই সে একমাত্র পৌরুষ বলিয়া জানে। সে মনে করে, যে মালী প্রতিদিন গাছের তলায় জলসেচন করিতেছে গাছের ডালে উঠিবার সাহস নাই বলিয়াই তাহার এই দীনতা"। "স্ফুলিঙ্গের সঙ্গে শিখার যে প্রভেদ উত্তেজনার সঙ্গে শক্তির সেই প্রভেদ"।

উত্তেজনার প্রয়োজন নাই বা উহার কোন শুভ ফল নাই ইহা লেখক বলেন না। কিন্তু উহাকে কাজে লাগাইবার ধৈর্য, প্রস্তুতি ও স্থিরবুদ্ধি না থাকিলে উহা বৃথা নিঃশেষিত হয়। "অভিমান দেরি সহিতে পারে না ; মত্ততা বলে, আমার সিঁড়ির দরকার নাই। আমি উড়িব"। সুকুমার-মতি স্কুলের ছেলেদের এই উত্তেজনা-বহ্নিতে আহুতি দিবার যে প্রবণতা তাহাও আমাদের অধৈর্য ও কাণ্ডজ্ঞানহীনতারই নিদর্শন।

"ইংরেজ-গভর্নমেণ্ট আমাদের পরাধীনতা নয়, তাহা আমাদের গভীরতর পরাধীনতার প্রমাণ মাত্র।" ইংরাজের বাহ্য বন্ধনে আমাদের যেটুকু কৃত্রিম ঐক্য হইয়াছে, তাহাকে যে পর্যন্ত সজীবতর মিলনোপায়ে পরিণত করিতে না পারিব, সে পর্যন্ত ইংরাজের বন্ধনচ্ছেদ আমাদের পক্ষে কল্যাণপ্রসূ হইবে না।

শেষ অনুচ্ছেদে কবি যে ভাবাবেগে উদ্দীপ্ত, কাব্যসৌন্দর্যময়, অধ্যাত্ম-প্রত্যয়ে শাশ্বতসত্যাভিমুখী বাক্যপরম্পরা গ্রন্থন করিয়াছেন তাহা লেখকের মর্মানুভূতিপ্রসূত ও বিষয়ের গুরুত্বোপযোগী। রাজনীতি এখানে একটি জীবনসংস্কৃতিতে রূপান্তরিত হইয়াছে। 'সমস্যা' প্রবন্ধে লেখক তাঁহার বক্তব্যের প্রতি বিরোধ অনুমান করিয়া উহাকে আরও বিশদরূপে উপস্থাপিত করিতে চাহিয়াছেন। এখানে তিনি তাঁহার নীতি যে অবাস্তব ও আদর্শবাদের ধূম্র-নিঃসরণে অস্পষ্ট এই অভিযোগের খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সাধারণতঃ মানুষের হীনতম, সহজতম প্রবৃত্তি ও এই প্রবৃত্তিপ্রসূত কর্মনীতিকেই আমরা বাস্তব আখ্যা দিয়া থাকি। কিন্তু

মানুষের উদার ক্ষমাশীল নীতিই যে অবস্থাসম্পর্কে বাস্তবের মর্যাদালাভের অধিকারী ও বেশী কার্যকরী তাহা সিপাহী বিদ্রোহের পরে লর্ড ক্যানিংএর শমনীতির সাফল্যের দ্বারাই প্রমাণিত হইয়াছে। "মানুষ ঘরভরা অন্ধকারের চেয়ে ঘরের কোণের একটি শিখাকেই মান্য করিয়া থাকে।" "কোনো একটা কথা শাস্তরসাশ্রিত বলিয়াই যে তাহা বাস্তবিকতায় খর্ব, এবং যাহা মানুষকে এত বেগে তাড়না করে যে পথ দেখিবার কোনো অবসর দেয় না" তাহাই যে অধিকতর বাস্তব একথা স্বীকার্য নহে।

'পথ ও পাথেয়' প্রবন্ধে লেখক একটা দিকের উপর বেশী জোর দেন নাই—বর্তমান পরিস্থিতির জন্য ইংরাজের মূঢ় শাসনব্যবস্থার দায়িত্ব। এই প্রবন্ধে তিনি সে দিকটার পূর্ণ আলোচনা করিয়া চিরন্তন মানব-প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করার জন্য ক্ষমতামত্ত ইংরাজশাসককে অভিযুক্ত করিয়াছেন।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহে জাতীয় ঐক্যবিধানের প্রণালী ও আদর্শের বিভিন্নতা সম্বন্ধে লেখক নিজ সুপরিচিত মতের পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। পাশ্চাত্ত্যের ঐক্য, একজাতীয়ের ঐক্য ও ভিন্নজাতীয়ের উৎসাদন। প্রাচ্য ঐক্য সমস্ত জাতিগত পার্থক্য স্বীকার করিয়া ও আচার-অধিকারে কিছুটা পার্থক্য রক্ষা করিয়াও সমস্ত আর্য-অনার্য, অধিবাসী-আগন্তুক সম্পর্কেই একই ধর্ম ও সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্তি। ফ্রান্স ও আমেরিকার আভ্যন্তরীণ বৈষম্য মাত্রাতিরিক্ত হওয়ায় অন্তর্বিগ্রহের দ্বারা তাহাদের স্বাধীনতা অর্জন করিতে হইয়াছে। ভারতের ঐতিহ্য অন্য প্রকার বলিয়া সে পথ ভারতের নয়। ইংরাজকে তাহার সংস্কৃতিগত বন্ধনে বাঁধিয়াই ভারত তাহার বিধিনির্দিষ্ট পরিণতি সফল করিবে।

এই তুলনা কিয়দংশে অপ্রযোজ্য মনে হয়। ভারতের পূর্বতন আগন্তুক সবই ভারতে চিরস্থায়ীভাবে বাস করিয়া ভারতীয় জীবনধারার সহিত এক হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ইংরাজের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কেবল ক্ষণিক ও প্রয়োজনাত্মক। ইহারা কোন দিনই ভারতে স্থায়ী অধিবাসীরূপে বাস করিবে না বলিয়া ইহাদের ক্ষেত্রে পূর্বতন মিলননীতি ঠিক প্রযুক্ত হইবার য়। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ এ আপত্তি পূর্বানুমান করিয়া ইংরাজের সঙ্গে মাদের সম্পর্ককে প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে ও বিশ্ববিধানের অঙ্গীভূতরূপে

দেখাইয়াছেন। ইংরাজও বিধাতার উদ্দেশ্য পূর্ণ না করিয়া আমাদের নিকট বিদায় লইবে না।

শেষ অনুচ্ছেদে কবি আবার কাব্যসুলভ ভাবাবেগের ও প্রকৃতিসৌন্দর্য-বোধের আশ্রয় লইয়া সমস্ত প্রবন্ধটিকে ঊর্ধ্বস্তরে উন্নীত করিয়াছেন। রাজনীতির নিকট লেখকের এই সুরেই বিদায় ঘটিয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায়

সমাজনীতি

১

রবীন্দ্রমানসে সমাজনীতি রাজনীতিরই একটি অঙ্গরূপে গৃহীত হইয়াছে; তাঁহার সমাজকৌতূহল মূলতঃ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-নিয়ন্ত্রিত। সমাজের যে সংস্কার না করিলে আধুনিক রাজনৈতিক পরিবেশের সহিত আমাদের স্বাভাবিক বা অনুকূল সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়া দুরূহ, আধুনিক যুগের আহ্বান আমাদের নিকট ব্যর্থ, আমাদের স্বাধীনতালাভের প্রয়াস প্রমাদময় ও বিড়ম্বনাপূর্ণ, রবীন্দ্রনাথ সেইরূপ সংস্কারের প্রতিই একান্ত মনোযোগী হইয়াছেন। সমাজচেতনার সুস্থতা রাজনীতি-সংগ্রামের মানসপ্রস্তুতির উপাদানরূপেই এত অপরিহার্য। সুতরাং সমাজনীতিঘটিত প্রবন্ধগুলিকে রাজনৈতিক আলোচনার সহায়ক ও সম্প্রসারণরূপেই, উহার নীতিগত ও মানবপ্রকৃতিগত ভিত্তিরূপেই বিবেচনা করিতে হইবে। এইজন্যই এই জাতীয় প্রবন্ধে রাজনৈতিক যুক্তিতর্কের বারবার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছে। উদ্যানপালক ভাল ফল ফলাইবার জন্য যেভাবে মাটি প্রস্তুত করে, রাজনৈতিক ফললাভের জন্য আমাদেরও সমাজপ্রথা ও সামাজিক ঐক্যবোধের সেইরূপ অনুকূল পরিবর্তন সাধন করিতে হইবে। সমাজতত্ত্বের নিস্পৃহ আলোচনা, বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক বা ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসা এইরূপ বাস্তব ফললাভ-আকাঙ্ক্ষার সহিত মিশ্রিত হইয়াই রবীন্দ্রচিত্তকে সমাজসমস্যার দিকে আকৃষ্ট করিয়াছে। ইংরাজের সহিত সংঘর্ষ, প্রাত্যহিক ঘটনার বৈষয়িক অভিঘাত তাঁহার মনে যে উত্তাপ সৃষ্টি করিয়াছিল তাহাই তাঁহার চিন্তারাজ্যে আলোক জ্বালাইয়া তাঁহাকে সমাজ-ইতিহাসের অন্ধকারময় অতীতে অনুপ্রবেশের প্রেরণা দিয়াছে।

অবশ্য ইহা অপেক্ষাও নিগূঢ়তর প্রভাব তাঁহার মানসচেতনায় লক্ষ্য করা যায়। ভারতের ইতিহাস বিধাতার মঙ্গল-অভিপ্রায়ের স্তরে স্তরে উন্মোচিত, ভবিষ্যতের পূর্ণ বিকাশের জন্য প্রতীক্ষমান, এক স্বর্ণ শতদলের ন্যায় তাঁহার ধ্যাননেত্রে প্রতিভাত হইয়াছে। অতীতে উহার যে দলগুলি বিকশিত হইয়াছে তাহারা বাহিরের প্রতিকূল অবস্থা ও অধিবাসীদের

অজ্ঞতা ও অসাড়তার জন্য স্বাস্থ্যের লাবণ্য হারাইয়া বিবর্ণ হইয়াছে। উহাদের মধ্যে রসসঞ্চার, আধুনিক জীবনের সঙ্গে উহাদের প্রকৃত তাৎপর্যের পুনঃসংযোগ, উহাদের মধ্যে প্রবহমান জীবনস্রোতের বেগসংযোজনা—আমাদিগের আশু কর্তব্য। ইহার পর অনাগত কাল যে নূতন পরিণতির প্রত্যাশায় উন্মুখ, তাহার সৌন্দর্য ও সৌরভ রবীন্দ্রনাথের চিত্তে একটি মুগ্ধ আবেশ ব্যাপ্ত করিয়া তাঁহার কবি-কল্পনাকে ভাবমত্ত করিয়া তুলিয়াছে। ইতিহাসের কার্যকারণশৃঙ্খল যেন কবির ধ্যানকল্পনায় সোনা হইয়া উঠিয়াছে। উহার কণ্টকবৃক্ষে কল্পতরুর অসম্ভব ফল ধরিয়াছে, উহার চক্রাবর্তনক্ষুব্ধ বস্তুপিণ্ড যেন শাশ্বত অমৃতরসের স্বচ্ছ আধারে রূপান্তরিত হইয়াছে। ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলী ও কীট্‌স অবশ্য পৃথিবীতে স্বর্গ-অবতরণের কল্পনায় বিভোর হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা নিজ নিজ অধ্যাত্ম অনুভূতিকেই পরম সত্যরূপে গ্রহণের যে কবিসুলভ বিশেষ অধিকার তাহারই প্রয়োগ করিয়াছেন ও কবিতার ইন্দ্রজালে এই অসম্ভবকে সম্ভব করিয়াছেন। বিশেষতঃ জগৎ-ব্যাপারের সঙ্গে তথ্যগত স্বরূপ-পরিচয় তাঁহাদের কাহারও প্রয়োজন মনে হয় নাই। প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ কিন্তু কবির কোন বিশেষ অধিকার দাবী না করিয়াই, নিছক যুক্তি-তথ্যের অনুসরণে, ইতিহাসের বিবর্তনধারার অনুবর্তী হইয়া ভারত-ইতিহাসের এই পরম কল্যাণময় সম্ভাবনাটি, কেবল নিগূঢ় ঐশী লীলাবাদে তাঁহার অবিচল প্রত্যয়ের জোরে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ও ইহারই মানদণ্ডে বর্তমান রাজনীতির কর্মপন্থানির্ণয়ে সাহসী হইয়াছেন। ইতিহাসের নানা ঘাতপ্রতিঘাতজটিল, আপাতউদ্দেশ্যহীন আবর্তন-প্রক্রিয়াকে তিনি যেন ঋতুচক্রের নিশ্চিত পর্যায়ের ন্যায় একান্তভাবে ভগবদিচ্ছানুপ্রাণিতরূপে অনুভব করিয়াছেন ও মানবের পাশবিকতা-বিকৃত, হীনবৃত্তি-কলুষিত ঘটনাপ্রবাহকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ন্যায় মানববিধাতার শুভ অভিপ্রায়ের বাহনরূপে দেখাইয়াছেন। আজ যে সমগ্র এসিয়া ও আফ্রিকা-ব্যাপী রক্তক্ষয়কারী গৃহযুদ্ধ সমস্ত পৃথিবীর শান্তিকে বিপর্যস্ত করিতেছে ও মানুষকে পশুরও অধম করিয়া তুলিতেছে ইহার পিছনেও তিনি কোন্ শুভ কল্যাণকর উদ্দেশ্য আবিষ্কার করিতে পারিতেন ভাবিতে কৌতূহল হয়।

এই নির্বিচার নির্মম হত্যাকাণ্ডের রণক্ষেত্র কোন শুভ পরিণতির সূতিকাগার কিনা ও ভারতবর্ষে পরিবর্তনপরম্পরার মধ্যে বিধাতার বিশেষ

ঐতিহাসিক উদ্দেশ্যসাধনের মর্যাদা-আরোপ ইতিহাসবিধানসম্মত কি না এ বিষয়ে সংশয় থাকিলেও লেখকের সাহিত্যিক প্রয়োজন যে এইরূপ প্রত্যয়ের দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ। রাজনীতি ও সমাজনীতির অস্থির, ঘটনার ঘূর্ণাবর্তে অন্ধগতিতে ধাবমান দৃশ্যপরিবর্তনের মধ্যে ঐতিহাসিকেরা মানবচিন্তার একটা পুনঃপুনঃ বিপথগামী অথচ শেষ পর্যন্ত সুনিশ্চিত অগ্রগতির নিদর্শন লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু এই বিবর্তনধারার বিলম্বিত পথচিহ্ন কবিমানসের পক্ষে যথেষ্ট তৃপ্তিপ্রদ নয়। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় দিব্যচেতনার দিশারী, ভাবকল্পনার প্রেরণায় আদর্শ-সন্ধানী সাহিত্যিকের নিকট কেবল সমাজতত্ত্ববিদের তথ্যবিচার ও বস্তুবিশ্লেষণের বিশেষ কোন আবেদন নাই। তাই তিনি ভারতবর্ষের প্রাচীন, অধ্যাত্মবোধশাসিত অতীত হইতে উহার পাশ্চাত্যপ্রভাবিত শক্তিসংগ্রামবিক্ষুব্ধ আধুনিক যুগ পর্যন্ত একই ঐশী অভিপ্রায়ের অখণ্ড তাৎপর্যের যোগসূত্র অনুভব করিয়াছেন। যে সমন্বয়কারী মনোভাবের মাধ্যমে আর্য-অনার্যের ও বিভিন্ন ভারতীয় ধর্মসম্প্রদায়ের সমীকরণ হইয়াছে তাহাই প্রাচ্য-প্রতীচ্যের দ্বন্দ্বে সমভাবে কার্যকরী হইবে এই প্রত্যয়ই তিনি আন্তরিকভাবে পোষণ করেন। হিন্দু-মুসলমানের নিকটতর অতীতের সম্পর্কে যে এই মন্ত্র খাটে নাই তাহার বাস্তব শিক্ষা তাঁহার আদর্শবাদী মন গ্রহণ করে নাই। তাঁহার কবিমন যে মহৎ কল্পনায় আবিষ্ট হইয়া সামগ্রিক বিষয়ের মর্মোদ্‌ঘাটনে ব্রতী হইয়াছিল, তথ্যপুঞ্জের অন্তরালে যে আবেগপ্রত্যয় অনুভব করিয়াছিল, তাহাই তাঁহার কোন কোন রচনাকে চিরন্তন সাহিত্যিক মর্যাদায় মণ্ডিত করিতে সক্ষম হইয়াছে।

'হিন্দুর ঐক্য' (১৩০৫, সমাজ) 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা' (জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮), 'সমাজভেদ' (১৩০৮), 'ধর্মবোধের দৃষ্টান্ত' (১৩১০), 'ব্রাহ্মণ' ও 'চীনেম্যানের চিঠি' (আষাঢ় ১৩০৯), ও 'পূর্ব ও পশ্চিম' (১৩১৫, সমাজ) প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিভিন্ন সমাজাদর্শ-বিষয়ক প্রবন্ধ। ইহাদের মধ্যে রাজনীতিই সমাজতত্ত্ববিশ্লেষণের মৌলিক প্রেরণা যোগাইয়াছে ও ইহাদের দৃষ্টিভঙ্গীও বহুপরিমাণে রাজনৈতিক। তথাপি এগুলিতে রাজনীতি পশ্চাৎপট রচনা করিলেও সমাজনীতিই মুখ্য আলোচ্য বিষয়। সেইজন্য ইহাদিগকে সমাজনীতি-পর্যায়ে সন্নিবেশিত করা হইল।

'হিন্দুর ঐক্য' (১৩০৫) প্রবন্ধে ইউরোপীয় জাতির সহিত তুলনায়

হিন্দুজাতির ঐক্যবন্ধনের বিভিন্নতা ও উভয় ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার প্রভেদ পরিস্ফুট হইয়াছে। হিন্দুর ঐক্য ঠিক পাশ্চাত্ত্য জাতীয়বাদের আদর্শ অনুসরণ করে নাই—উহার প্রকৃতি ও লক্ষ্য ভিন্নজাতীয়। ইউরোপে সমজাতীয়ত্বের জন্য ঐক্যবোধের ঘনতা, আর হিন্দুদের মধ্যে উপাদান-সাঙ্কর্যের জন্য উহার শিথিলতা ও বিশেষ উদ্দেশ্যমুখীনতা। হিন্দুত্বের পরিধি বৃহৎ ও নানাজাতীয় জনগণের বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার প্রয়াস ইহাতে সুপরিস্ফুট। নিশ্চিহ্ন সমীকরণ নয়, কর্তব্য ও অধিকারের নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে সকলের সহাবস্থানই ইহার লক্ষ্য। ইহাতে যুদ্ধের চিহ্ন বরাবরের জন্য সন্ধির শ্বেতপতাকাতলে জীয়াইয়া রাখা হইয়াছে। সুতরাং আমাদের মধ্যে একটা অদ্ভুত মিশ্রণপ্রক্রিয়া লক্ষিত হয়

আমরা জাতির পূর্ণ শক্তি হইতে বঞ্চিত। "এই দুর্বলতার প্রধান কারণ আমরা অভিভূতভাবে এক, আমরা সচেষ্টভাবে এক নহি।' আমাদের মধ্যে ঐক্যের ক্ষতি ও অনৈক্যের দোষ উভয়ই বর্তমান। আমাদের রাষ্ট্রতন্ত্রীয় একতা সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতা, নানা পরস্পরবিরুদ্ধ আচারব্যবহার ও নৈতিক আদর্শের দ্বারা খণ্ডিত। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার ঝড়ো হাওয়ায় সর্বপ্রথম আমাদের বহিরঙ্গলিপ্ত ধূলিজাল উত্থিত হইয়া আমাদের চিরন্তন প্রকৃতিকে আবৃত ও স্বচ্ছদৃষ্টিকে আবিল করিয়াছে।

তবে লেখক দৃঢ় আশা পোষণ করেন যে, এই বিরোধী শক্তির সংঘাতজনিত ওলটপালটে প্রথম ঝড়ের ধাক্কা কাটিয়া গেলে আমাদের সভ্যতা-সংস্কৃতির যাহা স্থায়ী, যাহা গভীর, যাহা সারবান তাহাই নবজীবন লাভ করিয়া আমাদের ঐক্যবন্ধনকে দৃঢ়তর করিবে। আমাদের মুক্তি আসিবে সাহেবিয়ানার মুগ্ধ অনুকরণে বা হিঁদুয়ানীর অন্ধ জড়ানুবর্তনের পথ ধরিয়া নহে, আমাদের দীর্ঘকালরুদ্ধ স্বভাবধর্মের সর্ববাধাবিদারী উন্মোচনের মাধ্যমে।

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা' প্রবন্ধে ফরাসি মনীষী গিজো কর্তৃক উভয়বিধ সমাজের মূল প্রেরণা বিশ্লেষণ করার পর রবীন্দ্রনাথ উহাদের আপেক্ষিক বিকার ও বাস্তব প্রবৃত্তিফল সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। প্রাচীন প্রাচ্য সভ্যতায় এক একটি একমুখী ভাবের একাধিপত্য। মিশরে পুরোহিততন্ত্র ও ভারতে ব্রাহ্মণতন্ত্র উহাদের সমাজগঠনের প্রাণশক্তিরূপে ক্রিয়াশীল। এমন কি গ্রীসেও একভাবমূলক সমৃদ্ধি অভূতপূর্ব হইলেও স্বল্পায়ু। ইউরোপীয়

সভ্যতায় কিন্তু নানা মতের সংঘর্ষ ও প্রতিযোগিতামূলক সামঞ্জস্য, কাহারও একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ইউরোপীয় সমাজ বিচিত্র মতবাদের বিরোধ ও আত্মরক্ষামূলক প্রয়াসের মধ্য দিয়া একটি অনির্ণীত আদর্শের অভিযাত্রী। সুতরাং ইহা বিশ্ববিধানেরই অনুসারী ও স্রষ্টার নানামুখী কর্মনীতির জটিলসমন্বয়প্রসূত সৃষ্টিরহস্যেরই নির্দেশচালিত। সেইজন্য গত পঞ্চদশ শতকেও ইহার অগ্রগতি অব্যাহত রহিয়াছে।

লক্ষণীয় এই যে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় ইতিহাসের মধ্যেও এই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যসাধনের নিগূঢ়তা দাবী করিয়াছেন। পার্থক্য এই যে পাশ্চাত্ত্য দেশে সংগ্রামপ্রবণতাই স্থায়ী রূপ, পারস্পরিক শক্তিপরীক্ষাই একটা অস্থির ভারসাম্যে সাময়িক নিবৃত্তি লাভ করিয়াছে। বিরোধের অগ্নি আপাত-নির্বাপিত হইলেও সর্বদাই ধূমায়মান ও বিস্ফোরণোন্মুখ। ভারতবর্ষ উহার বিবদমান উপাদানসমূহের মধ্যে উদার দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রাজ্ঞ সামঞ্জস্য-স্থাপনের দ্বারা একটি শান্তিময় পরিণতিতে স্থির হইয়াছে, বিরোধের অঙ্কুর পর্যন্ত উৎপাটন করিয়াছে। তবে প্রতীচ্য দেশের মত এই সামাজিক সন্ধি জাতীয়তার ঐক্যবোধে এখনও উদ্বর্তিত হয় নাই।

যাহা হউক, রবীন্দ্রনাথ গিজোর বিশ্লেষণের যাথার্থ্য স্বীকার করিয়াও তাঁহার আত্মপ্রসাদপুষ্ট সিদ্ধান্তের অনুমোদন করেন নাই। ভারতের বর্ণাশ্রমধর্ম ও পাশ্চাত্ত্যের রাষ্ট্রধর্ম উভয়েই নিত্যধর্মবিরোধী হইয়া তাহাদের আশ্রিত সমাজের অধঃপতনকেই ত্বরান্বিত করিতেছে। ইউরোপে রাষ্ট্রস্বার্থ ও ভারতে আচারনিষ্ঠা এই শাশ্বতধর্মের উপেক্ষা দ্বারা বিকৃত ও ধ্বংসোন্মুখ হইয়া উঠিতেছে। আমরা ইউরোপীয় ছাঁদে নেশন গড়িয়া তুলিতে পারি নাই বলিয়া লজ্জা অনুভব করি। কিন্তু প্রতীচ্য জাতীয়তাবাদের আদর্শে গৌরবান্বিত না হইয়া যদি আমরা আমাদের নিজের ধর্মবোধের বিশুদ্ধি-সাধনে যত্নবান হই, তাহাই আমাদের বেশী কল্যাণকর হইবে।

'সমাজভেদ'-এ প্রাচ্য-প্রতীচ্যে সমাজাদর্শের বিভিন্নতা চীনদেশে কিরূপ সামরিক উৎপাতের সৃষ্টি করিয়াছে রবীন্দ্রনাথ তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। খৃষ্টান ধর্মযাজকেরা চীনে ধর্মপ্রচার ও শিক্ষাবিস্তার করিতে গিয়া কেমন করিয়া চীনাদের হিংস্র আক্রমণের লক্ষ্য হইয়াছে তাহা লইয়া ইউরোপীয় জাতিসংঘ সমস্ত প্রাচ্যদেশবাসীর বিরুদ্ধে বর্বরতার অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছে। কিন্তু ইহা বিভিন্ন আদর্শে লালিত জাতিসমূহের পারস্পরিক

ভুল বোঝাবুঝির একটা দৃষ্টান্ত মাত্র। ইউরোপ যেমন রাষ্ট্রতান্ত্রিক হস্তক্ষেপে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে, প্রাচ্য জাতিও সেইরূপ ধর্মে আঘাত লাগিলে আত্মরক্ষায় নির্মম হয়। এখানে মিশনারিরা চীনের প্রাণমূলে আঘাত হানিয়াছে বলিয়া সমগ্র জাতির নিষ্ঠুর প্রতিরোধশক্তি জাগ্রত করিয়াছে।

লেখক সামাজিক রীতিনীতির পার্থক্যপ্রসূত আরও কতিপয় ভুল বোঝাবুঝির দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করিয়াছেন। ভারতে বাল্যবিবাহের প্রচলন ও বিধবাবিবাহের বিরাগ উহার সামাজিক আদর্শের অনিবার্য ফলশ্রুতি ও এই আদর্শের মত অপরিচিত বিদেশীর নিন্দাভাজন। এইরূপ পাশ্চাত্ত্য-দেশে যুবতী কন্যার কুমারীত্ব উহার বিশেষ সমাজপ্রয়োজনসমর্থিত এবং সামাজিক প্রয়োজনে যাহার উদ্ভব কাব্যসাহিত্যে স্বাধীন প্রেমাবেগের প্রশস্তিতে তাহাই মহিমান্বিত। আমাদের পাতিব্রত্য ও পাশ্চাত্ত্যের কুমারী-প্রেম ভাবসৌন্দর্যে তুল্যভাবে রমণীয়। ইউরোপীয় সমাজে অগ্রগতির সংবেগ-মহিমা ও ভারতীয় সমাজে রাজনৈতিক বিপর্যয়বিরোধী ধর্মনিষ্ঠার গৌরবের যথাযোগ্য মূল্যায়নে অক্ষমতা উভয় সমাজেরই বুদ্ধি-বিমূঢ়তার পরিচয়। সম্প্রতি ইউরোপের অন্ধবিদ্বেষ দিকে দিকে অশান্তির আগুন জ্বালিয়াছে, ভারতের জড় ঔদাসীন্য তাহার নিজের পক্ষে হানিকর হইলেও এখনও বিশ্ববিধানের ভারসাম্য ক্ষুণ্ণ করে নাই। সুতরাং ইউরোপের শুভ-বুদ্ধিসঞ্চার আশু প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। এই প্রবন্ধে লেখক প্রশংসনীয় সমদর্শিতা ও অপ্রমত্ত বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন।

'ব্রাহ্মণ' (আষাঢ় ১৩০৯) প্রবন্ধটির আরম্ভ সাহেব কর্তৃক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণকে পাদুকা-প্রহারের সেই অতিপরিচিত রাজনৈতিক অপমানের কাহিনী দিয়া। কিন্তু এই ভূমিকা হইতে সমাজজীবনে ব্রাহ্মণত্বের আদর্শের পুনরুজ্জীবনবিষয়ক নূতন চিন্তার অবতারণা ও বিস্তার ঘটিয়াছে। ইংরাজ ও ব্রাহ্মণ উভয়েই সম্মানের মিথ্যা মোহে গৌরবের যথার্থ অধিকার-ভ্রষ্ট হইয়াছে। ইংরাজের গৌরব তাহার ন্যায়নিষ্ঠায়, আর ব্রাহ্মণের গৌরব তাহার নিঃস্বার্থ, ধর্মসম্মত সমাজ-পরিচালনায়। উভয়েই কর্তব্যকর্ম না করিয়া অলীক সম্মানের দাবী করিয়া আত্মাবমাননা বরণ করিয়াছে।

পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহে প্রতিযোগিতার তাড়নায়, কর্মোন্মত্ততার সংবেগে উদ্‌ভ্রান্ত মাত্রাহীন অগ্রগতিই চরম উন্নতি বলিয়া বিবেচিত হইতেছে—কোন মনীষীর সতর্ক বাণীই এই পথচলার নেশাকে নিয়মিত করিতে

পারিতেছে না। "বাণিজ্য-জাহাজে উনপঞ্চাশ পালে হাওয়া লাগিয়াছে, উন্মত্ত দর্শকবৃন্দের মাঝখানে সারিসারি যুদ্ধঘোড়ার ঘোড়দৌড় চলিতেছে—এখন ক্ষণকালের জন্য থামিবে কে?"

হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণ তাঁহার প্রশান্ত ধ্যানদৃষ্টি লইয়া কর্মসমুদ্রের এই ঘূর্ণাবর্ত হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছেন ও ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের স্বাভাবিক কর্মপ্রবণতাকে ধর্মের আদর্শে বিধিবদ্ধ করিয়া সমস্ত সমাজে কর্মোন্মত্ততার প্রতিরোধ করিয়াছেন। "সমাজের পদমূলে সমুদ্র অহোরাত্র তরঙ্গিত ফেনায়িত হইতে পারে। কিন্তু সমাজের উচ্চতম শিখরে শান্তি ও স্থিতির চিরন্তন আদর্শ নিত্যকাল বিরাজমান থাকা চাই।"

ইউরোপে কর্মের পরিণামচিন্তাহীন গতিবেগের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া কর্মপাগল জাতি সর্বনাশের পথে ছুটিয়া চলে। ভারতে কর্মের উপর নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বভার না দিয়া সমাজপ্রণালীর সাহায্যে উহার উপর সুশৃঙ্খল কর্তব্যবিধানের সংযম-আরোপের ব্যবস্থা আছে। সেইজন্য রাজনৈতিক দুর্গতি ও পরাধীনতার মধ্যেও ভারতবর্ষীয় সমাজ উহার ব্রাহ্মণ-অংশের মাধ্যমে স্বাধীনতার আদর্শে স্থির ছিল।

এখন ব্রাহ্মণকে তাহার প্রাচীন মর্যাদায় ও আদর্শনিষ্ঠায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার উপায় চিন্তনীয়। লেখক মনে করেন যে বর্তমানে পাশ্চাত্ত্যের সম্মোহন-প্রভাবের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া ও আমাদের নিজ প্রাচীন সংস্কৃতির প্রকৃত মূল্যায়নের জন্য আগ্রহ এই পুনরুদ্ধারকার্যের অনুকূল হইবে। তাঁহার মতে শুধু ব্রাহ্মণের নয়, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের মধ্যেও দ্বিজত্বের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিতে না পারিলে সমাজের প্রাণশক্তি পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব হইবে না। সমগ্র প্রতিবেশের সমর্থনবঞ্চিত ব্রাহ্মণ নিজের বা সমাজের প্রাণ-প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হইবে না, প্রতিবেশের প্রতিকূলতা তাহাকে টানিয়া নিম্নাভিমুখী করিবে। "এক পায়ে দাঁড়াইয়া সমাজ বকবৃত্তি করিতে পারে না।" অতীতের জীবনীশক্তির সহিত সংযোগ রক্ষা না করিলে শুধু নূতনের দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। "নূতনকে সিঁধ কাটিয়া প্রবেশ করাইলেও, নূতনে পুরাতনে মিশ না খাইলে সমস্তই পণ্ড হয়।" "য়ুরোপীয় মানবপ্রকৃতি সুদীর্ঘকালের কার্যে যে সভ্যতাবৃক্ষটিকে ফলবান করিয়া তুলিয়াছে তাহার দুটো-একটা ফল চাহিয়া-চিন্তিয়া লইতে পারি, কিন্তু সমস্ত বৃক্ষকে আপনার করিতে পারি না।"

রবীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহ যে যখন অতীতের মহৎ ভাবে আমাদের সমস্ত সত্তা অভিষিক্ত হইবে তখন আমাদের পুরাতন সভ্যতাবৃক্ষটি "শ্মশানশয্যায় নীরস ইন্ধন"-রূপে নহে, "জীবননিকুঞ্জের ফলবান বৃক্ষ"-রূপে নববিকশিত হইয়া উঠিবে ও তাহাতে "যে পাখিরা প্রভাতকালে তপোবনে গান গাহিত তাহারাই গাহিয়া উঠিবে, দাঁড়ের কাকাতুয়া বা খাঁচার কেনারি-নাইটিঙ্গেল নহে। আমাদের সমাজ যে অদূর ভবিষ্যতে ব্রাহ্মণের নেতৃত্বে পুনর্গঠিত হইবে ও আমাদের চিরকালের প্রকৃতি যে ক্ষণকালের বিকৃতিকে সংশোধন করিয়া লইবে" এ বিষয়ে তাঁহার সুনিশ্চিত প্রত্যয় আমাদিগকে আশ্চর্যান্বিত করে। হয়ত বিবেকানন্দের দৃপ্ত ধর্মচেতনা ও জীবনে ধর্মনীতির বলিষ্ঠ রূপায়ণের জন্য উদাত্ত আহ্বান ও দয়ানন্দের বৈদিক ধর্মভিত্তিক সমাজ-সংস্কার তাঁহার মনে এই প্রবল আশাবাদ উদ্দীপ্ত করিয়া থাকিবে। কিন্তু ভবিষ্যৎকাল তাঁহার এই আশাকে আকাশকুসুমের অতিরিক্ত বাস্তব গঠন দেয় নাই। তাঁহার উপসংহারের কাব্যোচ্ছ্বাসও যেন এই সম্ভাবনার শূন্যগর্ভতাকেই স্ফীত করিয়াছে—আন্তরিক প্রত্যয়ের স্বর তাহাতে ধ্বনিত হয় নাই।

'চীনেম্যানের চিঠি' (আষাঢ় ১৩০৯)—রবীন্দ্রনাথ এই চিঠির লেখককে সত্য সত্যই একজন চীনেম্যান মনে করিয়াছেন ; বিলাতগমনের পর তিনি জানিলেন যে এই লেখক একজন ইংরাজ মনীষী, নাম জন লাউইস ডিকিন্‌সন। যাহা হউক এই ভ্রমের জন্য প্রবন্ধের কোন ক্ষতি হয় নাই। বরং একজন ইংরাজ বুদ্ধিজীবীর দ্বারা সমর্থনের জন্য প্রাচ্যদেশের সমাজ-বিন্যাসের উৎকর্ষ আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ভারতীয় সমাজের প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে মতবাদ এই পত্রের যুক্তি ও বিশ্লেষণের সাহায্যে আরও প্রামাণ্য ও সংশয়াতীত রূপ গ্রহণ করিয়াছে। ভারত পরাধীন বলিয়া তাহার আত্মপক্ষসমর্থনে যে ক্ষীণতা ও দুর্বলতা ছিল, স্বাধীন চীনের পোষকতায় তাহা সম্পূর্ণ অপসারিত হইয়াছে। আর ভারতের রীতিনীতি ও জীবনদৃষ্টি একটি একক জাতির উৎকেন্দ্রিকতা-প্রসূত মনে না হইয়া সমগ্র পূর্বপ্রাচ্য ভূখণ্ডের সাধারণ জীবনদর্শনের মর্যাদা অর্জন করিয়াছে।

এই পত্রগুলিতে ইউরোপীয় সমাজনীতি, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতির যেরূপ তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ হইয়াছে ও উহাদের দোষত্রুটি যেরূপ অকাট্য তথ্যজ্ঞান দ্বারা

প্রমাণিত হইয়াছে তাহাতে রবীন্দ্রনাথের বহুপ্রযুক্ত যুক্তিগুলির সারবত্তা আরও সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। এই পরিচিত যুক্তিসমূহের পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। এককালে মনে হইত যে বাণিজ্যসংযোগ বিশ্ব-শান্তির ভূমিকা রচনা করিবে, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগে যে নির্মম প্রতিযোগিতা ও জীবনমরণ-সমস্যার দৃঢ়সঙ্কল্প আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহাতে ইহাকে যুদ্ধেরই অগ্রদূতরূপে পরিচিত করিতে হয়। পত্রলেখকের আর একটা বিষয়ে আশ্চর্য দূরদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। সুদূর উপনিবেশ-গুলিতে বাণিজ্যবিস্তারের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা যেরূপ উত্তপ্ত আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়াছে তাহা যে ইউরোপের প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সমরানল শীঘ্র প্রজ্বলিত হইবার পূর্বলক্ষণ তাহা বিনা দ্বিধায় ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়।

রবীন্দ্রনাথের মৌলিকতা প্রবন্ধের উপসংহারে পরিস্ফুট হইয়াছে। চীন ও ভারতের সমাজনীতির সাদৃশ্য তাঁহার পূর্বতন মন্তব্যের অভ্রান্ততার পরিপোষক ইহাতেই তিনি সন্তুষ্ট নহেন। এই দুই প্রাচীন দেশের চরম লক্ষ্যের পার্থক্যও তিনি আবিষ্কার করিয়াছেন। চীনের শেষ লক্ষ্য কেবল শান্তি ও সন্তোষের আদর্শানুগতভাবে জীবনযাত্রানির্বাহ। উহার প্রাচীন সমাজ ও পরিবার-ব্যবস্থা এই জন্যই উহার নিকট আদরণীয়। কিন্তু ভারতের পরম সাধনা অনন্তাভিমুখী। তাহার সমস্ত শান্তি ও সন্তোষের অনুসরণ এই শ্রেয়স্কর পরিণতির দিকে। চীন কেবল পাশ্চাত্ত্যের উন্মত্ত ক্ষমতাস্পৃহা ও তজ্জনিত অশান্তি ও জীবনবিকারকে এড়াইতে চাহে বলিয়াই তাহার প্রাচীনের প্রতি অবিচল আনুগত্য। কিন্তু এই নেতিবাচক উদ্দেশ্য ছাড়া তাহার আর কোন উচ্চতর ইতিবাচক প্রেরণা নাই। ভারতের শান্তি ও সন্তোষ-নিয়মিত সমাজবিন্যাস ও জীবনযাপন একটা মধ্যপথবর্তী উপায় মাত্র, জীবনের চরম আদর্শ নয়। তটবন্ধনরক্ষিত নদীর ন্যায় এই জীবনযাত্রা অনন্তসাগরসঙ্গমে পৌছিবার প্রয়োজনীয় বেগসঞ্চয়ের একটা ব্যবস্থা। সংসার চিরজীবন আঁকড়াইয়া থাকিবার জন্য নয়—পরিপূর্ণতালাভের পর ত্যাগের জন্য, আরামের চিরনিবাস নয়—উর্ধ্বারোহণের সোপান মাত্র। চীনের জীবনধারা আত্মসম্পূর্ণ, নীতিসংযম-প্রয়োগের ক্ষেত্র, কোন অনির্দেশ্য অধ্যাত্মলোকে অভিযানের জন্য প্রস্তুতি নয়। "জলধারা যদি সমুদ্রকে চায়, তবে নিজেকে দুই তটের মধ্যে সংহত সংযত করিয়া তাহাকে চলিতে হয়, কিন্তু তাই বলিয়া নিজেকে

এক জায়গায় আনিয়া বদ্ধ করিলে চলে না।" "তাহা হইলে নদীকে ঝিল হইতে হয় এবং স্রোতের অন্তহীন ধারাকে সমুদ্রের অন্তহীন তৃপ্তির মধ্যে লইয়া যাওয়া হয় না।" চীনে সংসারের রথ ধীরে ও রথযাত্রার সম্পূর্ণ সৌন্দর্য উপলব্ধি করিবার উদ্দেশ্যে সুকৌশলে চালিত হয় ; ভারতে সংসার-রথ যথাসময়ে থামিয়া গিয়া আত্মার রথকে অবাধ, অনন্ত গতি দান করে।

'ধর্মবোধের দৃষ্টান্ত' (১৩১০) প্রবন্ধে ইংরাজের নীতিবোধ স্ব-সমাজের বাহিরে কিরূপ অসাড় ও বিকৃত হইয়া পড়িতেছে তাহারই একটি উদাহরণ এই তিব্বত অভিযানের সহায়ক কুলিদের প্রতি বিখ্যাত পর্যটক ল্যাণ্ডরের আচরণ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই সাহেব তাঁহার তল্পিবাহক প্রাণভয়ে কম্পমান ও পর্বতারোহণশ্রমে ক্লান্ত কুলিদিগকে গুলি করিবার ভয় দেখাইয়া ও তাহাদের একজনের প্রতি গুলি লক্ষ্য করিয়া তাহাদের অনিচ্ছুকতাকে জোর করিয়া দমন করিতে তাঁহার মানবিকতার সমস্ত ন্যায়-অন্যায়বোধ বিসর্জন দিয়াছেন। তিনি তাঁহার ভ্রমণকাহিনীতে এই বর্বরতার বর্ণনায় তিলমাত্র অনুশোচনার লক্ষণ দেখান নাই। অথচ ইঁহারাই আবার প্রাচ্যদেশীয়দের জীবনের মূল্যবোধের অভাব লইয়া ব্যঙ্গ করিতে ছাড়েন না। আফ্রিকা ও দক্ষিণ-আমেরিকার উপনিবেশসমূহে আদিম অধিবাসীদের প্রতি ইঁহাদের যে আচরণ তাহা অমানবিক নিষ্ঠুরতার চরম সীমায় পৌছিয়াছে ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রতি অ-পাশ্চাত্ত্য জাতিদের ঘোরতর সন্দেহ উৎপাদন করিয়াছে। ভারতবাসীর প্রতি ইংরাজের কাপুরুষোচিত আক্রমণ ও উহাদের পিলে ফাটাইতে উহাদের বুটের সতত সক্রিয়তা সমগ্র ইউরোপ মহাদেশব্যাপী এই নীতিবিপর্যয়ের গৌণ প্রকাশ মাত্র, জাতীয় দ্বেষবহ্নির ছোটখাট স্ফুলিঙ্গ মাত্র। এই দৃষ্টান্তটি ইউরোপীয় রাজনীতি ও সমাজনীতির পরস্পরসাপেক্ষতারই পরিচয়। রাজনীতির শ্রেষ্ঠত্বাভিমানে যাহার উদ্ভব, সমাজনীতির সম্পর্ক-বৈচিত্র্যের মধ্যে সেই বিষবৃক্ষের পল্লবিত বিস্তার।

'পূর্ব ও পশ্চিম' (১৩১৫, সমাজ) ইহা মূলতঃ ইতিহাসজাতীয় প্রবন্ধ, ভারতের ইতিহাসে অনুস্যূত বিধাতার মঙ্গল-অভিপ্রায়ের যুগযুগান্তর-প্রসারিত উদ্‌ঘাটন। ভারতের ইংরাজশাসনের তাৎপর্য ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থসংঘাতের মানদণ্ডে নয়, এই অন্তরালশায়ী মহত্তর উদ্দেশ্যের মানদণ্ডে বিচার্য। এই ইতিহাসে যাহারই সত্য কিছু দান করিবার আছে তাহারই

ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবার অধিকার আছে। "আমরা মনে করি জগতে স্বত্বের লড়াই চলিতেছে, সেটা আমাদের অহঙ্কার; লড়াই যা তা সত্যের লড়াই।"

এই প্রবন্ধের একটি মন্তব্যে 'সোনার তরী'র ভাবতাৎপর্য সম্বন্ধে কিছু আলোকপাত হয়। জগতে জাতি নশ্বর, কিন্তু বিশ্বসংস্কৃতিভাণ্ডারে জাতির মানসসৃষ্টির ঐশ্বর্য অক্ষয়। সুতরাং জাতির বিলুপ্তিতে পৃথিবীর ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। "গ্রীস এবং রোম মহাকালের সোনার তরীতে নিজের পাকা ফসল সমস্তই বোঝাই করিয়া দিয়াছে; কিন্তু তাহারা নিজেরাও সেই তরণীর স্থান আশ্রয় করিয়া আজ পর্যন্ত যে বসিয়া নাই, তাহাতে কালের অনাবশ্যক ভার লাঘব করিয়াছে মাত্র।" সুতরাং ইংরাজের যেটুকু দিবার আছে তাহা জমা না হওয়া পর্যন্ত তাহাদের অপসারণ বিধাতার অভিপ্রেত নয়। "ইংরেজ জগতের যজ্ঞেশ্বরের দূতের মতো জীর্ণদ্বার ভাঙিয়া আমাদের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।" ইংরাজের সহিত এখন যে বিরুদ্ধতার পীড়ন, তাহা পারস্পরিক সম্পর্কবিকারের সাময়িক প্রকাশ মাত্র। ভারত নিজের ক্ষুদ্রতা ও অন্ধ বিদ্বেষ দ্বারা ইংরাজের ক্ষুদ্রতাকেই আমন্ত্রণ জানাইতেছে। যেদিন ইংরাজের সহিত মিলনকে কেবল রাজনৈতিক প্রয়োজনহিসাবে না দেখিয়া ধর্মবুদ্ধিনির্দেশিত করিয়া দেখিব, যেদিন আমাদের শুভচেতনাকে পূর্ণভাবে জাগ্রত করিয়া ইংরাজের কাছে গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইব সেদিন এই মিলন সার্থক হইবে। রামমোহন রায়, রানাডে, বিবেকানন্দ ও বঙ্কিমচন্দ্র এইরূপ শুভবুদ্ধিপ্রণোদিত আদান-প্রদানের সম্ভাব্যতা প্রমাণ করিয়াছেন। রবীন্দ্র-রচনায় বিবেকানন্দের বিরল উল্লেখের মধ্যে এইটি অন্যতম।

২

সমাজনীতির অন্তর্গত দ্বিতীয় এক শ্রেণীর প্রবন্ধ আপেক্ষিকভাবে রাজনীতি-সংস্রবহীন। ইহারা হয়ত রাজনৈতিক মূল হইতে উদ্ভূত, কিন্তু ইহাদের শাখাপল্লব বৃহত্তর মননক্ষেত্রে প্রসারিত।

'বারোয়ারি মঙ্গল' (চৈত্র ১৩০৮, ভারতবর্ষ), 'স্মৃতিরক্ষা' (১৩১২, সমাজ), 'নববর্ষ' (বৈশাখ ১৩০৯, ভারতবর্ষ), 'অত্যুক্তি' (কার্তিক ১৩০৯, ভারতবর্ষ), 'স্বদেশী সমাজ ও স্বদেশী সমাজের মর্মকথা' (ভাদ্র

১৩১১, আত্মশক্তি ও সমূহ), ঐ পরিশিষ্ট (আশ্বিন ১৩১১, আত্মশক্তি ও সমূহ), 'বিজয়াসম্মিলন (কার্তিক ১৩১২, ভারতবর্ষ), 'অযোগ্যভক্তি' (১৩১৫, সমাজ)।

'বারোয়ারি মঙ্গল'-এ বাঙলা দেশে চাঁদা করিয়া মৃত মনীষীদের স্মৃতি-রক্ষার অচিরপ্রবর্তিত রীতির ভাল-মন্দ সম্বন্ধে খুব সূক্ষ্ম ও মননশীল আলোচনা হইয়াছে। পাশ্চাত্ত্যের অনুকরণে এই সদ্য-আগত প্রথা আমাদের মধ্যে বিশেষ আন্তর সমর্থন লাভ করিতেছে না বলিয়া আমরা ক্ষোভ প্রকাশ করিতেছি। কিন্তু এই প্রথা একদিকে আমাদের মনোধর্মের অনুকূল নয়, অন্যদিকে ইহার আর্থিক বোঝা আমাদের পক্ষে দুঃসহ। আমরা মৃত মহাত্মাগোষ্ঠীকে প্রাতঃস্মরণীয় নামমালার মধ্যে গ্রথিত করি, কিন্তু তাঁহাদের স্মৃতিরক্ষার্থ মর্মরস্তম্ভনির্মাণ অপ্রয়োজনীয় মনে করি।

প্রথমতঃ, এইরূপ সর্বসাধারণের করণীয় দায়িত্বপালন বিষয়ে আমাদের ও ইংরাজের মধ্যে এক গুরুতর নীতিগত পার্থক্য আছে। আমাদের বহু-বিস্তৃত পারিবারিক দায়িত্ব পালন করার পর এইরূপ দেশানুরাগমূলক কাজের জন্য আমাদের উদ্বৃত্ত সঙ্গতির একান্ত অভাব। ইংরাজের পারিবারিক দায়িত্ব ও ব্যক্তিগত বদান্যতার ক্ষেত্র অত্যন্ত সীমাবদ্ধ বলিয়া তাহাদের সাধারণ লোকের এই দিকে অর্থব্যয়ের বেশী ক্ষমতা আছে।

দ্বিতীয়তঃ, ইউরোপীয় জাতির দেশহিতার্থে ব্যয় উহাদের ক্ষমতাপ্রকাশের একটা উপলক্ষ্য ও দলগত উত্তেজনা ও প্রশংসা উহার প্রেরণা। পক্ষান্তরে আমাদের আদর্শ দাতার দান তাহারই কল্যাণবিধায়ক ও এজন্য বাহিরের কোন প্রেরণা অপ্রয়োজনীয়। আমরা সেইজন্য ব্যক্তিকে মঙ্গলকাজে প্রণোদিত করার জন্য পারলৌকিক পুণ্যের প্রলোভন দেখাইয়াছি। এই বহিরাগত ফললাভের উৎকোচের জন্য মঙ্গলসাধনের উদ্দেশ্য অনেকটা বিশুদ্ধি হারাইয়াছে। ধর্মের ব্যাপারে যান্ত্রিকতার উপর নির্ভর করিলে উহার আদর্শ বিকৃত হয়। অবশ্য যেখানে উচ্চ আদর্শ সমগ্র জাতির উপর চাপাইতে হয় সেখানে খানিকটা দলবদ্ধ মতৈক্যসৃষ্টি অপরিহার্য, কিন্তু কল যাহাতে মানব-মনের স্বাধীন স্ফুরণকে অবদমিত না করে সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

স্মৃতিরক্ষার জন্য স্মৃতিচিহ্ননির্মাণ কবি ও শিল্পীর পক্ষে ব্যর্থ। কেননা তাঁহাদের মূর্তিপূজার দ্বারা তাঁহাদের প্রতিভার অনুপ্রেরণা জাগে না। পক্ষান্তরে, দেশহিতৈষী কর্মবীরদের পক্ষে এইরূপ পূজার সার্থকতা আছে,

কেননা তাঁহাদের গুণাবলী সর্বসাধারণের অনুকরণসাধ্য। শেক্‌সপিয়র, বঙ্কিমচন্দ্র বা তানসেনের প্রকৃত স্মৃতিপূজা তাঁহাদের মূর্তিনির্মাণে নয়, তাঁহাদের প্রতিভার সশ্রদ্ধ আলোচনায়।

কিন্তু যেখানে দল বাঁধিয়া চাঁদা তুলিয়া মূর্তিনির্মাণ চলে, সেখানে এই সূক্ষ্ম ঔচিত্যবোধ রক্ষিত হয় না। সেখানে চরিত্রমাহাত্ম্য অপেক্ষা ধনগৌরব বা ক্ষমতার আধিপত্যই অধিকতর শ্রদ্ধাযোগ্য বিবেচিত হয়। ইংলণ্ডের জাতীয় সমাধিমন্দিরে যাহাদের স্মৃতিফলক উৎকীর্ণ হইয়াছে তাহাদের অধিকাংশই প্রভাব ও প্রতিপত্তির প্রতীক্। জীবনচরিতরচনা হাস্যরসিক, ক্রীড়াবিশারদ, অভিনেতা প্রভৃতি সর্ববিধ উৎকর্ষের প্রতি নিয়োজিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রকৃত শ্রদ্ধার্হ নহেন তাঁহাদেরও জন্য আমরা ঘটা করিয়া স্মৃতিতর্পণের আয়োজন করি। এই সমস্ত বারোয়ারি শোকাভিনয়ের কৃত্রিমতা ও শূন্যগর্ভতা এইজন্যই লজ্জাকর মনে হয়।

এখন যুগের পরিবর্তনে আন্তরিক মঙ্গলকামনা দলবদ্ধ লৌকিক আড়ম্বরের রূপ ধারণ করিতে বাধ্য হইতেছে। "ভ্রাতৃভাব এখন ভ্রাতাকে ছাড়িয়া বাহিরে ফিরিতেছে, দয়া এখন দীনকে ছাড়িয়া সংবাদদাতার স্তম্ভের উপর চড়িয়া দাঁড়াইতেছে, এবং লোকহিতৈষিতা এখন লোককে ছাড়িয়া রাজদ্বারে খেতাব খুঁজিয়া বেড়াইতেছে।" এই ঋতুপরিবর্তনের সময় প্রাচীন অভ্যাস ও নবীন অভিলাষের অমীমাংসিত দ্বন্দ্ব আমাদের সমস্ত আচরণকে দ্বিধাগ্রস্ত ও অশোভন করিয়া তুলিতেছে। রূপের সঙ্গে ভাবের মিলন মুহুর্মুহু ব্যাহত হইতেছে। মধ্যবিত্তের দায়িত্ববহুলতা ও ধনীর ভোগ-বিলাসের আতিশয্য বিলাতী-প্রথায় শোকপ্রকাশের সুষ্ঠু রূপায়ণে অপর্যাপ্ত রসদ যোগাইতেছে।

এই অবস্থাসঙ্কটে লেখক আশা করিতেছেন যে এই দ্বন্দ্বে ভারতের ভাবপ্রধান আদর্শই বিদেশী বস্তুপ্রাধান্যের উপর জয়ী হইবে ও আমাদের পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাই আমাদের প্রাচীন ভাবচেতনাকে সমস্ত আবিলতামুক্ত করিয়া উজ্জ্বলতররূপে উদ্‌ভাসিত করিবে। প্রাচীন ভারতসম্বন্ধীয় অন্যান্য আশার ন্যায় এই আশাও বর্তমান জীবনের মরুবিস্তারে মরীচিকার ন্যায় বিলীন হইতে চলিয়াছে।

প্রবন্ধটি সুবিন্যস্ত ও সুলিখিত, কিন্তু মনে হয় লেখক তাঁহার অভ্যস্ত অতিভাষণপ্রবণতাকে এখানেও অতিক্রম করিতে পারেন নাই।

'স্মৃতিরক্ষা' (১৩১২, সমাজ) অতি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ। এখানে লেখক পূজ্য ব্যক্তিদের কীর্তি চিরস্মরণীয় করার জন্য তাঁহাদের নামে মেলা-প্রতিষ্ঠার উপদেশ দিয়াছেন। "জয়দেবের মূর্তি নাই, কিন্তু মেলা আছে।" বরেণ্য-স্মৃতিরক্ষার জন্য আয়োজিত মেলার বৈশিষ্ট্য হইল যে ইহারা স্বতঃউৎসারিত ভক্তিঅর্ঘ্যের ভাবময় আধার। লোকসাহিত্যের ন্যায় লোক-উৎসবও আদর্শপূজার প্রবল প্রেরণায় একীভূত সমষ্টিমানসের সৃষ্টি। বাঙলার প্রধান প্রধান মেলাগুলিকে এখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্মসম্প্রদায়গুলি অধিকার করিয়াছে। জয়দেবের মেলা এখন বাউলগায়কের মিলনক্ষেত্র ও পীঠস্থান। মনে হয় পদ্মাবতীর সঙ্গে তাঁহার প্রেমসম্পর্কবৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করিয়া বাউলগণ তাঁহাকে নিজসম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া দাবী করে। ঘোষপাড়ার মেলাও তেমনি আউলসম্প্রদায়ের অধিকারভুক্ত হইয়াছে। জয়দেবের প্রকৃত চরিত্র ও ধর্মানুভূতি তাঁহার মেলা-উৎসবের মাধ্যমে কতটা প্রতিফলিত হয় তাহা সন্দেহস্থল। তথাপি ইহা অবিসংবাদিত সত্য যে বিভিন্ন ধর্মসাধক সম্বন্ধে জনমনের যে অন্তরঙ্গ পরিচয়লব্ধ ধারণা, শ্রদ্ধাভাজনের প্রতি ভক্তিবিনত চিত্তের যে স্বভাবসিদ্ধ রসাবিষ্ট আর্দ্রতা, ভক্ত-মণ্ডলীর প্রাণে প্রাণে অনিবার্য ভাবাবেগের যে সহজ বৈদ্যুতীসঞ্চার তাহাই এই মেলাগুলিতে কোন সচেষ্ট জটিল আয়োজন ব্যতিরেকেই নিজস্ব সৌরভে বিকশিত হইয়াছে। পরবর্তী-কালের কৃত্রিম রুচিবিকার ও ব্যবসায়বুদ্ধির প্রক্ষেপ ইহাদের আবহাওয়াকে কলুষিত করা সত্ত্বেও আদিম বিশুদ্ধির চিহ্নগুলি সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নাই। কিন্তু এই মেলাগুলি সেই যুগের সৃষ্টি, যখন জনসাধারণের উদ্ভাবনী শক্তি বৈদেশিক প্রভাবমুক্ত হইয়া সাবলীলভাবে, স্বাধীন প্রাণশক্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। বর্তমান যুগে তাহার পুনরুজ্জীবন সম্ভব কি না তাহা বিশেষ সন্দেহের বিষয়। বিশেষতঃ জয়দেব, বৈষ্ণব ও শাক্ত কবিগোষ্ঠীর সহিত বাঙলার পল্লীপ্রাণের যে সহজ নাড়ীর সংযোগ, যে একান্ত আত্মীয়তাবোধ ছিল, আধুনিক যুগের কোন চিন্তানেতা বা কর্মনায়কদের সঙ্গে সেরূপ নিবিড় যোগ প্রত্যাশা করা যায় না। সুতরাং মেলার নামে পরানুকরণদুষ্ট, ধর্মপ্রভাবহীন, উচ্ছৃঙ্খল আমোদের জনসমাবেশক্ষেত্ররচনা কি গুণীর গুণোপলব্ধির সহায়ক হইবে?

'অত্যুক্তি' (কার্ত্তিক ১৩০৯) প্রবন্ধে ইংরাজ ও ভারতবাসীর বিভিন্ন প্রকারের অত্যুক্তিপ্রবণতার পার্থক্যটি সুন্দরভাবে দেখান হইয়াছে। শুধু

গার্হস্থ্য জীবনে নহে, চিন্তাজগতে ও রাজনৈতিক আচরণেও অত্যুক্তির এই ছন্দভেদটি ধরা পড়ে। আমাদের অত্যুক্তি আমাদের অলসবুদ্ধির মাত্রাজ্ঞান-শিথিলতাপ্রসূত। রাজভক্তি আমাদের বস্তুত: যতটুকু আছে, প্রভুর মনোরঞ্জনের জন্য তাহার অতিরঞ্জিত পরিমাণই আমরা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করি। আমাদের ইংরাজ মুনিবেরাও আমাদিগকে তিলমাত্র বিশ্বাস না করিয়া উৎসব উপলক্ষ্যে জগতের নিকট আমাদের রাজভক্তির প্রচার করিয়া থাকেন। এই উভয় প্রকার অত্যুক্তি একই মনোভাবের বিপরীত পিঠ। আমাদের হিন্দু-মুসলমান রাজন্যবর্গের দরবারের আড়ম্বর তাহাদের হৃদয়াবেগের ও মানস উদারতার বহিঃপ্রকাশ। ইংরাজের দিল্লীর দরবারে আড়ম্বর আছে, আনন্দবিতরণের কোন আয়োজনই নাই, ঔদার্যের সঙ্গে উহা একেবারেই নিঃসম্পর্ক। ইংরাজ শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে জনসাধারণের কোন সহৃদয়তার সম্পর্ক গড়িয়াই উঠে নাই। আমাদের উৎসবে যে অমিতব্যয়িতা, যে অবাধ আতিথ্যের আমন্ত্রণ আছে তাহাতে আত্মপ্রচারের আতিশয্য থাকিলেও তাহা অন্তরের সহজ দাক্ষিণ্যধারাপুষ্ট। ইংরাজের অন্ধকূপহত্যার অত্যুক্তি "রাজপথের মাঝখানে মাটি ফুঁড়িয়া স্বর্গের দিকে পাষাণ-অঙ্গুষ্ঠ উত্থাপিত করিয়াছে।"

পাশ্চাত্ত্য ও ভারতীয় অত্যুক্তির মধ্যে আরও একটা প্রকৃতিগত পার্থক্য রহিয়াছে। আমাদের অত্যুক্তি বিশুদ্ধ কল্পনাসঞ্জাত, ইহাকে বাস্তব সত্যের ছদ্মবেশ পরাইয়া ইহার স্বরূপগোপনের কোন প্রয়াস নাই। আমাদের আরব্য উপন্যাস বা পুরাণকাহিনী অনাবৃতভাবে কল্পনাপুষ্ট, ইহাদের গোত্রান্তর ঘটাইবার জন্য লেখকদের কোন অপকৌশল নাই। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য—যথা 'গালিভারের ভ্রমণ-কাহিনী' বা কিপ্‌লিংএর 'কিম্'—অবিশ্বাস্য গল্প বলিলেও উহাকে সত্যের মাপা-জোখা কলাকৌশলে, উহার মাত্রা ও অন্তঃসঙ্গতি বজায় রাখিয়া পাঠকের মনে তথ্যবিভ্রান্তি উৎপাদন করে। বিলাতী অত্যুক্তি রাজকীয় ঘোষণায় ও পার্লিয়ামেন্টের বিধিবদ্ধ আইনে আত্মগোপন করিয়া আমাদিগকে মিথ্যা আশায় প্রতারিত করে। ইংরাজের শাসনপদ্ধতি এই ঘোষিত নীতির মূর্তিমান প্রতিবাদ হইলেও অত্যুক্তির নিপুণ চারুকায আমাদের আশাভঙ্গ ও মনঃক্ষোভের কারণকে জীবিত রাখে। "প্রাচ্য অত্যুক্তির 'অতি'টুকুই শোভা, তাহাই তার অলঙ্কার সুতরাং তাহা অসংকোচে বাহিরে আপনাকে ঘোষণা করে। ইংরেজি অত্যুক্তির 'অতি'টুকুই গভীরভাবে ভিতরে থাকিয়া যায়, বাহিরে তাহা

বাস্তবের সংযত সাজ পরিয়া খাঁটি সত্যের সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া পড়ে।"

লেখক উপসংহারে তাঁহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মত পরিবর্তন করিয়া বলিয়াছেন যে তাঁহার এই প্রবন্ধ প্রতিঘাতস্পৃহা হইতে উদ্ভূত নয়, আত্ম-সতর্কতামূলক এবং পরনির্ভরশীলতার দোষ ও আত্মনির্ভব হওয়ার আবশ্যিকতা সম্বন্ধে তিনি তাঁহার বহু-পুরাতন মতের পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। মনে হয় এই অংশটি তাঁহার প্রবন্ধের মূল অভিপ্রায়ের সঙ্গে ঠিক মিলিয়া যায় নাই ও ইহার জন্য প্রবন্ধটির ভাবসঙ্গতি কিছুটা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। 'অত্যুক্তি' একটি বিশেষ উপলক্ষ্যে লেখা ও বিশেষ-উদ্দেশ্যনিয়ন্ত্রিত। ইহার পদচিহ্ন ঢাকিবার বিলম্বিত প্রয়াস ঠিক সফল হয় নাই।

'স্বদেশী সমাজ ও স্বদেশী সমাজের মর্মকথা' ও উহার পরিশিষ্ট (ভাদ্র ও আশ্বিন ১৩১১, আত্মশক্তি ও সমূহ) সে যুগে রবীন্দ্রনাথের গঠনমূলক চিন্তার উজ্জ্বল নিদর্শনরূপে সমকালীন মনীষিবৃন্দের দ্বারা উচ্ছ্বসিতভাবে অভিনন্দিত হইয়াছিল। ইহার উপলক্ষ্য সামান্য—বাঙলার জলকষ্টনিবারণের জন্য আমাদের গভর্নমেন্টের নিকট আবেদন ও তদুত্তরে গভর্নমেন্টের মন্তব্যপ্রকাশ। লেখকের বক্তব্য, জলকষ্টনিবারণ সমাজের কর্তব্য ও উহার জন্য রাজদ্বারে সাহায্যভিক্ষা সামাজিক কর্তব্যচ্যুতি। বে-সরকারী উদ্যমই আবহমান কাল তৃষ্ণার জল যোগাইয়াছে ও সমাজমনের সজীবতার প্রমাণ দিয়াছে। কৃত্রিম উত্তেজক পানীয়ের অভাবমোচনের দায়িত্ব হয়ত সরকারের বা বণিক সম্প্রদায়ের, কিন্তু জলের জন্য অনাত্মীয়ের দ্বারস্থ হইতে হইবে কেন? "আচ্ছা, না হয় অ্যাণ্ড্রুয়ল-সম্প্রদায় আমাদের চায়ের বাটি ভর্তি করিতে থাকুন; এবং চায়ের চেয়েও যে জ্বালাময় তরলরসের তৃষ্ণা—যাহা প্রলয়-কালের সূর্যাস্তচ্ছটার ন্যায় বিচিত্র উজ্জ্বল দীপ্তিতে উত্তরোত্তর আমাদিগকে প্রলুব্ধ করিয়া তুলিতেছে পশ্চিমদিগ্‌দেবী তাহার পরিবেষণের ভার লইলে অসঙ্গত হয় না।"

এই আত্মকর্তৃত্ব পরের উপর ছাড়িয়া দেওয়ার ফল সমাজদেহে ক্ষয়-বিকারের লক্ষণ প্রকটিত করা। "যে-গাছ আপনার ফুল আপনি ফুটাইত, সে আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টির জন্য তাহাব সমস্ত শীর্ণ শাখা-প্রশাখা উপরে তুলিয়া দরখাস্ত জারি করিতেছে। না হয় তাহার দরখাস্ত মঞ্জুর হইল, কিন্তু এই সমস্ত আকাশকুসুম লইয়া তাহার সার্থকতা কী?" এই স্বাধিকার-

পরিত্যাগ সমাজের প্রাণকেন্দ্রস্থিত ধর্মবোধকে মর্মান্তিক আঘাত হানিতেছে।

লেখক আবার আমাদের প্রাদেশিক সম্মিলনে মেলাপ্রবর্তনের দ্বারা জনসাধারণের চিত্তজয়ের প্রয়োজন বুঝাইয়াছেন। আধুনিক মেলায় যদি দুর্নীতি ও কলুষ প্রবেশ করিয়া থাকে তবে তাহা নিরাকরণের জন্য রাজশক্তির শরণাপন্ন হইলে চলিবে না। বাঙলার হৃদয়ধর্ম যে অক্ষুণ্ণ আছে তাহার প্রমাণ আমাদের রাজনৈতিক অনুষ্ঠানগুলিতে সামাজিক সহৃদয়তাসঞ্জাত উদার আতিথেয়তার মুক্তহস্ত আয়োজন। জাপানে যুদ্ধবিদ্যাকে বিজ্ঞান হিসাবে শেখান হইয়াছে কিন্তু সমস্ত যান্ত্রিক অনুবর্তনের পিছনে জাপানী সৈনিকের পুরুষপরম্পরাগত রাজভক্তি ও আত্মোৎসর্গপ্রবৃত্তি অক্ষুণ্ণ আছে। সুতরাং সমস্ত রাজনৈতিক সম্পর্কজালজটিলতার মধ্যে হৃদয়সম্বন্ধের প্রত্যক্ষতাকে যদি বাঁচাইয়া রাখিতে না পারি তাহা হইলে কাচমূল্যে কাঞ্চন বিকাইব। লেখক এখানে একটা সম্ভাবিত আপত্তির খণ্ডন করিতেছেন। হৃদয়সম্পর্কের ব্যাপ্তি সঙ্কীর্ণসীমাবদ্ধ, ইহাকে ভিত্তি করিয়া একটা সমগ্র দেশব্যাপী উদ্যোগ-আয়োজন চলিতে পারে না, নৈর্ব্যক্তিক বিধি-বিধানের উপর নির্ভর করিতেই হইবে। রবীন্দ্রনাথ এই আপত্তির যুক্তিযুক্ততা স্বীকার করিয়া এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে প্রথম প্রথম আঞ্চলিক সীমার মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজনায়কের ব্যবস্থা করিয়া সারা দেশের জন্য একজন সমাজপতি নির্ধারণ করিতে হইবে। ইহার নির্দেশ অনুসারে সমস্ত মণ্ডল-নায়কেরা নিজ নিজ কর্তব্য পালন করিবেন ও ইহাদের নৈতিক অধিকার হইবে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত আনুগত্যস্বীকার ও পরিচালনা-ব্যবস্থার অর্থভাণ্ডার পূর্ণ হইবে স্বেচ্ছাদত্ত উপায়নে। এই জাতীয় সমাজপতি দেশের দৃঢ়বদ্ধ ঐক্যের জীবন্ত প্রতীকরূপে দেশবাসীর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবেন ও উহাদের দেশকল্যাণবোধকে জাগ্রত রাখিবেন। এই শাসনব্যবস্থার তিনি নামকরণ করিয়াছেন 'সমাজরাজতন্ত্র'।

রবীন্দ্রনাথ সমাজপতির শক্তি ও কল্যাণকর প্রভাবের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তিনি নিজ প্রস্তাবের অবাস্তবতা সম্বন্ধে বিশেষভাবে অবহিত আছেন। তথাপি তিনি হিন্দু সমাজের অতীত ইতিহাস হইতে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে ভারতের এই আত্মগঠনশক্তি বর্তমান। প্রাচীন যুগে ভারতবর্ষ বিরুদ্ধ উপাদানসমূহের মধ্যে সমন্বয়সাধনের যে আশ্চর্য

প্রতিভা দেখাইয়াছিল, সময় সময় অতিসতর্ক রক্ষণশীলতার জন্য তাহা ব্যাহত ও লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলেও এখনও তাহা সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয় নাই। এই ভয়ের জন্যই ভারতবর্ষ বিশ্বের গুরুপদচ্যুত হইয়া আত্মকেন্দ্রিক সঙ্কীর্ণ বৃত্তে ব্যর্থভাবে আবর্তিত হইতেছে। কিন্তু সে যে বিদেশী সভ্যতার সংঘাতে তাহার প্রাচীন গৌরব সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছে ও উহার পুনরুদ্ধারের আন্তরিক চেষ্টায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছে তাহা সুনিশ্চিত।

উপসংহারে লেখক দেশমাতৃকার প্রতি উচ্ছ্বসিত অনুরাগে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ভাবৈশ্বর্যময় ভাষায় দেশবাসীকে মাতার আহ্বানে সাড়া দিবার জন্য আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন। একেবারে সমাপ্তিসূচক বাক্যে "পদাহত অকালকুষ্মাণ্ডের ন্যায় অধঃপাতের সোপান হইতে সোপানান্তরে গড়াইতে গড়াইতে চরম লাঞ্ছনার তলদেশে" সমাধিশয়নের দুর্গতির মধ্যে বাঙালীর অবজ্ঞেয় অনন্ত স্থিতিশীলতার সাদৃশ্যদ্যোতনা রুচি ও সাহিত্যিক ঔচিত্যবোধ উভয় দিক্ দিয়াই প্রবন্ধটির মর্যাদাকে লঘু করিয়াছে। নভোচুম্বী আশাবাদের এই ধূল্যবলুণ্ঠন আমাদের মনে একটি অসঙ্গতিজনিত পীড়া জাগায়।

রবীন্দ্রনাথের এই পরিকল্পনাটি পরীক্ষা করিয়া দেখা প্রয়োজন। ভারতের অধ্যাত্মসাধনার প্রাণশক্তি সম্বন্ধে তাঁহার এতই দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে উহার বর্তমান অবনতির মধ্যেও উহার পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও বাস্তব জীবননিয়ন্ত্রণে প্রয়োগসাফল্য সম্বন্ধে তাঁহার কোনই সংশয় ছিল না। তাঁহার আদর্শাবিষ্ট চিত্ত উদ্দেশ্যের মহনীয়তায় এতই আত্মমগ্ন ছিল যে ইহা উপায়ের অসম্ভাব্যতাকে অত্যন্ত লঘু করিয়া দেখিয়াছে। তাঁহার প্রবন্ধ হইতে প্রবন্ধান্তরে এই অধ্যাত্ম আশ্বাসের মাদকতা তাঁহাকে প্রায় বাস্তবান্ধ করিয়া তুলিয়াছে, তাঁহার ধ্যানকল্পনা তাঁহার বাস্তব দৃষ্টিকে অভিভূত করিয়া কার্যকারণ-শৃঙ্খলগ্রথিত বুদ্ধিগ্রাহ্য জগৎকে অস্বীকার করিয়াছে। তাঁহার কবিচেতনা যেন এখানে তাঁহার চোখে সম্ভব-অসম্ভবের সীমারেখাকে ঝাপসা করিয়া দিয়াছে। মনে হয় তাঁহার কবিদৃষ্টিতে পার্থিব জগৎ যে আদর্শ সুষমার বর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে, ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক ভবিষ্যৎও তাহারই বিচ্ছুরিত দীপ্তিতে ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার ইতিহাসবোধও উহার নিরপেক্ষ বস্তুতান্ত্রিক অস্তিত্ব হারাইয়া অধ্যাত্মসৃষ্টির উপকরণে রূপান্তরিত হইয়াছে, মানবের অগ্রগতির বিজ্ঞান ভগবানের কল্যাণ-অভিপ্রায়ের

হোমানলে সমিধ যোগাইয়াছে। ভারততীর্থ ভারতের ইতিহাস ও ভূগোল-পরিচয়কে, উহার নানা যুগের আদর্শভ্রষ্ট নরনারীর নানা ভুলভ্রান্তি ও বিচারবিমূঢ়তাকে গ্রাস করিয়া আত্মার একক মাহাত্ম্যের ভাবকল্পনাস্বর্গে বিরাজিত হইয়াছে। যে দুর্লভ গুণে ভারতের অগ্রগতির প্রথম অধ্যায় রচিত হইয়াছিল সেই গুণ তাহার পরবর্তী যাত্রাপথে কতখানি স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে, উহার জীবনসাধনার বিশুদ্ধি ও নিবিড়তা যুগান্তরের জটিলতর অভিজ্ঞতা-আহরণকে কতটা নিজ সূক্ষ্মতর স্বরূপে উদ্বর্তিত করিতে পারিয়াছে, আদিম যুগের প্রজ্ঞা শতাব্দীর ঘূর্ণ্যমান ধূলিজালের মধ্যে কতটা অম্লান আছে, এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর না দিয়াই কবি ভারতের জন্মকোষ্ঠী বিচার করিয়া তাহার মধ্যে রাজচক্রবর্তীর লক্ষণ আবিষ্কার করিয়াছেন। কবির পক্ষে যে প্রত্যয় শোভন ও প্রত্যাশিত, যাহা তাঁহার জীবনদর্শনের মূল প্রেরণা, রাজনীতি ও সমাজনীতির তত্ত্ববিশ্লেষণকারী, তথ্যনিষ্ঠ লেখকের পক্ষে তাহা ভাবপ্রমত্ত কল্পনাবিলাস। স্বাধীনতাযুগোত্তর ভারতে এই পরিকল্পনাই কাযকরী করা হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে আদর্শ ও কার্যক্রমে আমরা যে খুব সাত্ত্বিক গুণের পরিচয় দিতেছি অথবা রামরাজ্যের দিকে উল্লেখযোগ্যভাবে অগ্রসর হইতেছি এ দাবী ভারতের ভবিষ্যতে খুব বেশী মাত্রায় আস্থাবান ব্যক্তিও উত্থাপন করিতে সাহসী হইবেন না। লেখক মনে করিয়াছিলেন যে উপযুক্ত কর্মপন্থা নির্দেশ করিলে ও কর্মপথের বাধা অপসারিত হইলেই আত্মার শুভ্র দীপ্তি আমাদের যাত্রাপথকে আলোকিত করিবে। আত্মার আলোকই যে নির্বাপিত হইতে পারে, মানবচরিত্রের বিকারই যে সর্বাপেক্ষা দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি এ সম্ভাবনা আদর্শবাদী লেখকের মনে উদিতই হয় নাই।

'বিজয়াসম্মিলন' (কার্তিক ১৩১২, ভারতবর্ষ)—ধর্মোৎসবদিনের পুণ্য আনন্দনির্ঝরের সহিত রাজনৈতিক চেতনার উৎসজাত নবপ্রবুদ্ধ জাতীয় মিলনাকূতির সংযোগে বাঙালী-চিত্তে যে কূলপ্লাবী ভাবোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি হইয়াছিল, এই প্রবন্ধ ভাষার দৃঢবদ্ধতায় ও মননের ব্যাপ্তি ও বিস্তারে এই যুগ্ম ভাবধারাকে প্রকাশসীমায় সুসংহত করিয়াছে। লেখক এই মিলনকে ধর্মচেতনার যমুনার সঙ্গে নিখিলপাবনী গঙ্গার পবিত্র সঙ্গমক্ষেত্রের সহিত তুলনা করিয়াছেন। এই প্রবন্ধটি বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর 'আমার দুর্গোৎসবের' সহিত তুলনীয়। বঙ্কিমের প্রবন্ধে দুর্গোৎসব

আধার ও আধেয় দুইই; তাঁহার দেশপ্রেম একটা বিশুদ্ধ, বস্তুসম্পর্কহীন ভাবাকৃতিরূপে তাঁহার মাতৃপূজায় নূতন আবেগসঞ্চার ও ইঙ্গিতবেদ্য ফলাকাঙ্ক্ষার কল্পনা আরোপ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে বিজয়ার ধর্মতাৎপর্যের আধারকে বিদীর্ণ করিয়া উহার মধ্যে নবপ্রবুদ্ধ দেশাত্মবোধের উগ্রতর প্রেরণা ও ব্যাপকতর পূজাবিধি নিজেদের স্থান করিয়া লইয়াছে। বঙ্কিমে আবেগই মুখ্য, বাস্তবভিত্তি অনুপস্থিত; যাহা ইচ্ছা হইয়া মনের মাঝারে ছিল তাহাই সুরের মত বাহির হইয়া আসিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের যুগে স্বাধীনতার আদর্শ নানা বাস্তব কর্মপন্থার সহিত সংযোগে রূপের আপেক্ষিক সুস্পষ্টতায় আত্মপরিচয় দিয়াছে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে সমস্যাটির নানা দিক হইতে বিচার ও আলোচনা আছে; এবং তাঁহার বক্তব্যের উপর অভিজ্ঞতার ছাপটি আবেগের তীব্রতাকে সংযত করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ প্রথমেই বলিয়াছেন যে বিজয়ার সামাজিক ও পারিবারিক মিলন-প্রেরণাটি এখন আরও গভীর ও সম্প্রসারিত হইয়া সমস্ত বাঙালী জাতিকে উহার কল্যাণময় প্রভাবের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে। ইহা ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ অনুষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। বিজয়াসম্মিলনের এই নব ভাবপ্রসারে আমরা সমস্ত মিলনের মধ্যে একটি নূতন অর্থগৌরব আরোপ করিতে শিখিলাম ও আমাদের মাতৃভূমির শব্দাত্মকমাত্র রূপ হইতে অখণ্ড স্বরূপটি উদ্ধার করিবার ক্ষমতা লাভ করিলাম। এই নব ঐক্যবোধের প্রেরণায় আমরা প্রত্যেকেই এক অভাবনীয় শক্তি অনুভব করিতেছি এবং সমষ্টিগত জীবনপ্রত্যয়ে মৃত্যুভয়কে অতিক্রম করিয়াছি। যাঁহারা দ্বিধাগ্রস্ত, আপোষবাদী ও বিলাসমোহাচ্ছন্ন ছিলেন তাঁহারা যেন এক নূতন সংকল্পদৃঢ়তা অর্জন করিয়াছেন। এক বৃহৎ সত্য আমাদের অন্তরে উদিত হইয়া আমাদের সমস্ত যাত্রাপথকে আলোকিত করিয়াছে।

লেখক কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা জানাইতেছেন যেন এই মহৎ ভাবাদর্শ জাতীয় জীবনে স্বল্পায়ু না হয়, যেন ইহা আমাদিগকে লক্ষ্যপথে স্থির ও অবিচল রাখিয়া আমাদের সমস্ত হৃদয়দৌর্বল্য ও হেয়তর আকর্ষণ হইতে রক্ষা করে। প্রাকৃতিক শক্তির প্রথম বিস্ফোরণে যে অসংযম-অতিরেক দেখা দেওয়া স্বাভাবিক, স্বদেশপ্রেমের এই দুর্জয় আবেগে, এই প্রতিজ্ঞাকঠোর স্বীকরণেও তাহা ঘটিতে পারে, কিন্তু তাহা যেন আমাদের

নিরুৎসাহ বা ভগ্নোত্তম না করে। সমুদ্রমন্থনের বিষ ও অমৃত যেন আমরা একসঙ্গে পান করিতে প্রস্তুত থাকি।

পরিসমাপ্তিতে লেখক তাঁহার উদ্বেলিত ভাবাবেগ ও উন্মথিত কবিকল্পনাকে বাঙলাদেশের সমস্ত বিচিত্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও মানবজীবনের কর্মভেদে অনন্ত-বৈচিত্র্যসমন্বিত মনোলোকের উপর প্রসারিত করিয়া দিয়া সর্বত্র এই মহান প্রেরণার সমর্থন খুঁজিয়াছেন ও এই অন্তর-উৎসারিত প্রেমানুভূতিকে দিগন্তসীমা পর্যন্ত সর্বব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছেন, এবং তাঁহার সুবিখ্যাত দেশ-প্রেমের গান 'বাংলার মাটি, বাংলার জল'-এ এই ভাবোচ্ছ্বাসের তথ্য ও মানসসঙ্কল্পের প্রতিষ্ঠাভূমিকে সুরলোকে উর্ধ্বায়িত করিয়াছেন। বাঙালীর মানসিকতার একটি মহত্তম, আবেগঘন ও দূরপ্রসারিত পুণ্য অনুভূতি এই প্রবন্ধে স্মরণীয় প্রকাশাধারে বিধৃত হইয়াছে। ইহাতে মনন ও আবেগ, বস্তুবোধ ও কল্পনাপ্রসারের মধ্যে এক অপরূপ সামঞ্জস্য-রক্ষার বিরল পরিচয় মিলে। 'অযোগ্য ভক্তি' (১৩১৫, সমাজ) প্রবন্ধে মননের পরিচয় থাকিলেও ইহার বিষয়বিন্যাসের মধ্যে কিছু বিশৃঙ্খলা অনুভব করা যায়। ইহার ভাবসংযম ও প্রকাশদ্যুতি অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ।

৩

এই পর্যায়ের মধ্যে কতকগুলি তুচ্ছ বিষয়ের আলোচনাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে : 'কোট ও চাপকান' (১৩০৫, সমাজ), 'নকলের নাকাল ও আলোচনা' (১৩০৮, সমাজ ও পরিশিষ্ট), ও 'বিলাসের ফাঁস' (১৩১২, সমাজ) প্রবন্ধগুলি পরানুকরণের মোহে বাঙালী যুবকের পাশ্চাত্ত্য বেশভূষার প্রতি পক্ষপাত বিষয়ে লেখা। ইহাদের দৃষ্টিভঙ্গী হইল অসঙ্গতির আতিশয্যের জন্য এই বিদেশী পরিচ্ছদের সৌন্দর্যরীতিলঙ্ঘন ও তজ্জনিত লেখকের আশঙ্কা-প্রকাশ। সুতরাং এগুলিতে নীতি বা স্বাজাত্যাভিমানই আলোচনার দিক্ নির্ণয় করে নাই, করিয়াছে শোভনতার মানদণ্ড। সাময়িকপত্রের সম্পাদককে যে পাতা পূরাইবার জন্য মাঝে মাঝে কিরূপ তুচ্ছ বিষয়ের অবতারণা করিতে হয়, মাসিকপত্রিকার প্রয়োজনের সঙ্গে সাহিত্যাদর্শের বিরোধ সময়ে সময়ে যে কিরূপ অনিবার্য হইয়া উঠে, এগুলি তাহারই নিদর্শন। রবীন্দ্রনাথের ন্যায়

সূক্ষ্ম রুচি হয়ত সকলের নাই, সুতরাং সাজসজ্জার এই সাঙ্কর্য তাঁহার চোখে যতটা পীড়াদায়ক হইয়া উঠিয়াছিল তাহা সার্বজনীনতার দাবী করিতে পারে না। তবে অবশ্য ব্যঙ্গ-রসিক লেখকদের ইহা উপহাসের একটি স্থায়ী উপাদানে পরিণত হইয়াছিল, কিন্তু গম্ভীর বিষয়ের রচনায় ইহা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে নাই। আর দীর্ঘ অভ্যাসই যে অসঙ্গতির তীব্রতাকে হ্রাস করে ও বিসদৃশকে সুসঙ্গতরূপে প্রতিভাত করিতে সহায়তা করে এই জড়তাধর্মী পরিণতির প্রতি হয়ত রবীন্দ্রনাথ ততটা সচেতন ছিলেন না। সে যুগে ইয়ং বেঙ্গলের উদ্ভট পরিচ্ছদ অপেক্ষা তাহাদের আচরণের বিসদৃশতাই অধিক বিরূপতার উদ্রেক্ করিত। সাহেব অপেক্ষা বাবুর পোষাকই তীক্ষ্ণতায় ও পৌনঃপুনিকতায় ব্যঙ্গের বেশী লক্ষ্য হইত। রবীন্দ্রনাথ যদি এ যুগ পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকিয়া শার্ট-ট্রাউজারপরিহিত বাঙালী যুবকের অবিরল স্রোতে প্রবাহিত মিছিল দেখিতেন তাহা হইলে হয় তাঁহার চোখে এ দৃশ্য সহিয়া যাইত, না হয় তিনি আত্মধিক্কারের আতিশয্যে তুষ্ণীম্ভাব ধারণ করিতেন।

সর্বশেষে 'নববর্ষ' (বৈশাখ ১৩০৯, ভারতবর্ষ) ও 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' (ভাদ্র ১৩০৯, ভারতবর্ষ) এই দুইটি প্রবন্ধ কালের দিক দিয়া বর্তমান পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হইলেও, রচনারীতির অভিনবত্ব ও অনুভূতির অন্তর্মুখিতার দিক দিয়া নবযুগের গদ্যের পূর্বসূচনা ও 'শান্তিনিকেতন' প্রবন্ধমালার সমধর্মী। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতির অগ্রগতি ও ভাবের সূক্ষ্মতা শুধু কালানুক্রমিকতার মানদণ্ডে বিচার্য নহে; কোন কোন বিষয় অপেক্ষাকৃত অপরিণত বয়সে লেখা হইলেও যে তাঁহার অন্তরের গভীর অনুভূতিকে স্পর্শ করিত ও তাঁহার রচনার মধ্যে একটা তথ্যভারমুক্ত, মননগ্রন্থির বন্ধনহীন, স্বয়ংসঞ্চরমান রস-আত্মার উদ্বোধন করিত তাহার প্রমাণ তাঁহার 'ছিন্নপত্রাবলী'তে প্রচুর-বিকীর্ণ। রবীন্দ্রনাথ কখন বাহিরের বিষয় আশ্রয় করিয়া অন্তরের মধ্যে তলাইয়া যাইতেন ও প্রবন্ধসুলভ প্রকৃষ্ট বন্ধনকে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়া যে এক সূক্ষ্ম ভাবসত্তার লীলাসংক্রমণে আত্মনিমজ্জিত হইতেন তাহার রহস্য ভেদ করা যায় না। পরবর্তী স্তরের গদ্যরচনায় যে আত্মমগ্ন বিশ্ববোধের অনুভবঋদ্ধ দল-উন্মোচন তাহারই প্রথম প্রতিশ্রুতি এই প্রবন্ধদ্বয়ে, বিশেষতঃ 'নববর্ষ'-এ লক্ষ্য করা যায়।

'ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রবন্ধে লেখক ভারত ইতিহাসের সমস্ত প্রক্ষিপ্ত বস্তুজালকে সরাইয়া উহার নিগূঢ়তম প্রাণরহস্যের অন্তঃপুরে প্রবেশ

করিয়াছেন। এই বহির্দ্বারবিন্যস্ত, রাজনৈতিক ঝটিকা দ্বারা উৎক্ষিপ্ত, শুষ্ক ঘটনাপুঞ্জের বর্ণনায় লেখক যে মর্মানুপ্রবেশশক্তি ও গাঢ়বর্ণ, তাৎপর্য-দ্যোতনাময় চিত্রধর্মিতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা বিস্ময়কর। দেশের এই সত্য-পরিচয়-আচ্ছাদনকারী বৈদেশিক বিলাসের প্রখর রত্নদ্যুতি ও রক্তোন্মত্ততার ছবিই যথার্থ ইতিহাসের ছদ্মবেশী প্রতিমূর্তিরূপে আমাদের নিকট উপস্থাপিত হইয়াছে। "তাহা ভারতবর্ষের পুণ্যমন্ত্রের পুঁথিটিকে একটি অপরূপ আরব্য উপন্যাস দিয়া মুড়িয়া রাখিয়াছে।"

অন্য দেশের ইতিহাসের আদর্শে ভারত-ইতিহাসের বিচার চলে না। রাষ্ট্রগৌরবের বিবরণ সেই ইতিহাসের অঙ্গ নহে। ভারতের অন্তরাত্মার স্থান কোথায়, তাহার মর্মসত্যের স্বরূপ কি তাহা না বিদেশী না আমাদের চোখে ধরা পড়ে বলিয়াই আমাদের অতীতের সঙ্গে বর্তমানের সংযোগ ছিন্ন, ও অতীতের যে সত্তাচেতনা নানা অলক্ষ্য পথে বর্তমানের অস্থি-মজ্জায়, জ্ঞানপ্রেম-কল্পনায় সংক্রামিত হইয়া তাহাকে পূর্ণতর জীবনীশক্তির অধিকারী করে তাহা রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

এই আশ্চর্য কাব্যসম্ভাবনাপূর্ণ প্রারম্ভের পর রবীন্দ্রনাথ তাঁহার চিরাভ্যস্ত পুরাতন চিন্তাধারার চক্রপথে ফিরিয়া আসিয়াছেন। সেই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, বিসদৃশের মধ্যে সামঞ্জস্যের কথাই ভারত-ইতিহাসের মর্ম-বাণীরূপে এখানে পুনরাবৃত্ত হইয়াছে। আর বিদেশের শিক্ষা যে আমাদিগকে অন্ধ অনুকরণের মোহ হইতে জাগ্রত করিয়া অতীতের প্রাণধর্মের প্রতি সচেতন ও উৎসুক করিয়া তুলিয়াছে তাহাও লেখক বহুবারের মত এখানেও শোনাইয়াছেন। এদেশে আবার আদর্শ গুরু জন্মগ্রহণ করিয়া অতীত-ইতিহাসরচনায় আত্মনিয়োগ করিবে, বিদেশীরচিত বিকৃত ইতিহাস-পাঠের লজ্জা হইতে আমাদিগকে মুক্তি দিবে ও এই কয়েকজন আদর্শ গুরুর মাধ্যমে প্রাচীন ব্রাহ্মণ্যধর্মের যে পুনরুজ্জীবন ঘটিবে লেখক এ সম্বন্ধে নিশ্চিত আশা পোষণ করেন।

লেখকের প্রাচীনভারতসম্বন্ধীয় আশাগুলির মধ্যে এই অংশটি অন্ততঃ আংশিক ও আক্ষরিক সাফল্য লাভ করিয়াছে। দেশীয় ঐতিহাসিকেরা প্রাচীন ভারত-ইতিহাসের অস্থিকঙ্কাল কতকটা পুনর্যোজিত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের গবেষণাধর্মী পুনর্গঠন ভারতীয় আত্মাকে আমাদের প্রত্যক্ষ-গোচর করিতে পারে নাই। এই ইতিহাস মৃত বস্তুর প্রেতভূমি হইতে

আমাদের জীবনের ভাবলোকে নবজন্মপরিগ্রহ করে নাই। মৃতের স্মৃতিচিহ্ন কিছু সংগৃহীত হইয়াছে কিন্তু ইহাদের সহিত জীবনস্পন্দনের কোন সম্পর্ক স্থাপিত হয় নাই। শ্মশানের ভস্মরাশি স্মরণের কৌটায় বিন্যস্ত হইয়াছে কিন্তু উহার উপর দিয়া ভাগীরথীর পাবন প্রবাহ বহিয়া যায় নাই। আর আদর্শ গুরুর পরিকল্পনা এখনও বাস্তব রূপ হইতে বহুদূরে আছে; ইতিহাসনির্মাতাকে আশ্রয় করিয়া প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য আদর্শ এখনও স্বপ্ন হইতে বাস্তবলোকে অবতরণ করে নাই।

'নববর্ষ' রচনায় রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন আশ্রমের গভীর নিস্তব্ধতা ও নববর্ষে প্রকৃতির চিরপুরাতন রূপের নবীকরণের উদ্দীপনবিভাবকে সহায় করিয়া ভারত-আত্মার অন্তর্গূঢ় স্বরূপে প্রবেশ করিয়াছেন। এই অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছে তত্ত্বচেতনার দ্বারা নহে, এক প্রত্যক্ষতর অনুভূতি-নিবিড়তার মাধ্যমে। আশ্রমের স্তব্ধতা ও বিশ্বপ্রকৃতির প্রগাঢ় শান্তি ও স্বতঃস্ফূর্ত আত্মবিকাশের অন্তরালে সমুদয় কর্মপ্রয়াসসংহরণ প্রাচীন ভারতের আত্মসমাহিত, আদর্শে স্থির শক্তির রহস্যটি উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে। পশ্চিমের সমস্ত গলদ্‌ঘর্ম প্রয়াসে, সমস্ত অশ্রান্ত বিক্ষোভচাঞ্চল্যে উহার ধ্যানতন্ময়তা অবিচল। এই সমস্ত সাময়িক চিত্তবিক্ষেপের অবসানের জন্য সে অফুরন্ত ধৈর্যের ভাণ্ডার লইয়া প্রতীক্ষা করিতেছে।

ভারতবর্ষ ধ্যানমগ্ন সন্ন্যাসীর ন্যায় নিজের চারদিকে একটা নিঃসঙ্গতার অবকাশ রচনা করিয়াছে। বিদেশী অভ্যাগতের সম্বন্ধে তাহার কৌতূহল নাই, সেও উহাদের কৌতূহল-দৃষ্টি হইতে সমাবৃত। অপরের প্রতি তাহার আতিথেয়তাও যেমন অসীম, নির্লিপ্ততাও তাহাই। ভারতবর্ষ সমস্ত বৈদেশিক আক্রমণের উৎপীড়ন হইতে এই একাকিত্বের মহিমার দ্বারা সুরক্ষিত।

"ইউরোপ ভোগে একাকী, কর্মে দলবদ্ধ। ভারতবর্ষ তাহার বিপরীত"। ভারতের এই স্বাতন্ত্র্য নানা বিরুদ্ধ প্রভাবের মধ্যেও অক্ষুণ্ণ আছে। প্রতি-যোগিতামূলক সভ্যতায় কর্মের উত্তেজনা উত্তরোত্তর বাড়িয়া থাকে ও ইহার আপাত-ঐশ্বর্য ইহার ভিতরকার ধ্বংসোন্মুখতাকে ঢাকিয়া রাখে। কিন্তু এই কর্মজালের অপরিমিত প্রসারে সামাজিক ভারসাম্য বিচলিত হইতে হইতে অবশেষে এক সর্বাত্মক ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হয়। এই ব্যবস্থায় যাহারা ছোট কাজে নিযুক্ত থাকে তাহারা হীনমন্যতাবোধে পীড়িত

হয়, এমন কি স্ত্রীজাতিও গৃহকর্ম ও সন্তানপালনকে অযোগ্য কর্ম মনে করিয়া লজ্জায় মাথা হেঁট করে। পক্ষান্তরে ভারত তাহার বর্ণাশ্রমধর্মের দ্বারা ও নিষ্কাম ধর্মের আদর্শ-অনুসরণে সকলরকম কাজকেই সমান মর্যাদা দিয়াছে ও সমাজকে এই ছোট-বড়র ভেদবুদ্ধি হইতে মুক্ত করিয়াছে। পাশ্চাত্ত্য নারীর যাহাতে লজ্জা ভারতীয় নারীর তাহাতে গৌরব। আদর্শ হিসাবে, অত্যাকাঙ্ক্ষামূলক জিগীষা বা শান্তি ও সন্তোষ—এই উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ তাহা লইয়া মতভেদ হইতে পারে। উভয়েরই আতিশয্যে বিকৃতি আছে। কিন্তু সেইজন্য পাশ্চাত্ত্য আদর্শের নির্বিচার অনুসরণই যে আমাদের পক্ষে শ্রেয় এ সিদ্ধান্ত মানিয়া লওয়া যায় না। ভারতীয় আদর্শে "প্রতিযোগিতা-চকমকির ঠোকাঠুকিশব্দ ও স্ফুলিঙ্গবর্ষণ নাই, কিন্তু হীরকের স্নিগ্ধনিঃশব্দ জ্যোতি আছে"। ভারত এই আদর্শের প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্যের জন্যই প্রকৃত স্বাধীনতার অধিকারী।

লেখক প্রকৃতির অনাদিকাল হইতে অপরিবর্তিত, অথচ বর্ষে বর্ষে নবায়মান চিরঅম্লান সৌন্দর্যের মধ্যেই ভারতীয় জীবনদর্শনের অবিনশ্বরত্বের দৃষ্টান্তমূলক প্রমাণ পাইয়াছেন। অনুকূল স্থান ও কালের পরিবেশে তাঁহার ভারতের প্রতি আস্থাজ্ঞাপনের মধ্যে এক গভীরতর অধ্যাত্ম প্রত্যয়ের সুর ধ্বনিত হইয়াছে। এই বিশ্বাসে বলীয়ান হইয়াই তিনি ক্রান্তদর্শী ঋষির ন্যায় বর্তমান চটুল ও ক্ষণভঙ্গুর সভ্যতার উপর ভারতীয় আদর্শের চিরন্তনত্বের জয় ঘোষণা করিয়াছেন ও আমাদের অজাত পৌত্রদের এই অমর সত্যদ্রষ্টার নিকট দীক্ষাগ্রহণের আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন।

প্রবন্ধটি লেখা হয় আজ হইতে ঠিক চৌষট্টি বৎসর পূর্বে। এই চৌষট্টি বৎসরে তাঁহার ভবিষ্যৎবাণী যে প্রায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে তাহা দুঃখের সহিত স্বীকার করিতেই হইবে। আজ ভারতীয় রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবস্থা নিজের স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া পাশ্চাত্ত্য ভাবাদর্শের করদ শক্তিতে পরিণত হইয়াছে। বর্ণাশ্রমধর্ম, শান্তি ও সন্তোষভিত্তিক সমাজনীতি, অধ্যাত্মসাধনায় অবিচল স্থিরতা, পরিবর্তনশীল সংসারে ধ্রুব মূল্যসন্ধানের আকূতি—সবই সমুদ্র-সৈকতে বালুঘরের ন্যায় ধুইয়া-মুছিয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক প্রতিভাই কেবল তাঁহাকে অতীত যুগের অগণিত বিধিপ্রণেতা তত্ত্বদর্শী ঋষিগোষ্ঠীর ন্যায় বিস্মৃতিপ্লাবনে ভাসিয়া যাইবার দুরদৃষ্ট হইতে আপাততঃ রক্ষা করিয়াছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

রবীন্দ্রকাব্য—তৃতীয় পর্যায়

নৈবেদ্য ও স্মরণ

১

রবীন্দ্র-সৃষ্টিসমীক্ষার প্রথম খণ্ডে 'ক্ষণিকা' (শ্রাবণ ১৩০৭, জুলাই ১৯০০,) কাব্যের লঘু, বেপরোয়া সুরের অন্তরালে এক নিগূঢ় ভাবপরিবর্তনপ্রস্তুতির প্রচ্ছন্ন আয়োজনের ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছিল। পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'নৈবেদ্য'-এ সেই মানস রূপান্তরের প্রথম পরিণত ফল উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। কালের দিক দিয়া 'ক্ষণিকা'-র সহিত 'নৈবেদ্য'-এর ব্যবধান অতি সামান্য। 'নৈবেদ্য' রচিত হয় ১৩০৭ অগ্রহায়ণ হইতে ফাল্গুনের মধ্যে, 'ক্ষণিকা' প্রকাশের প্রায় চারি মাস পরে। উহার প্রকাশের তারিখ আষাঢ়, ১৩০৮, জুলাই, ১৯০১। কিন্তু অন্তর-ইতিহাসের দিক দিয়া ইহা একেবারে বিপরীত কোটিতে অবস্থিত ও কবি-মানসের এক নূতন দিগন্তের সূচনা। রবীন্দ্রনাথের মনে ভগবৎ-প্রীতি তাঁহার প্রকৃতি-চেতনা ও মানসসুন্দরী-জীবনদেবতা-অন্তর্যামী প্রভৃতি অধ্যাত্মব্যঞ্জনাময় কবি-প্রত্যয়ের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে আভাসিত। উহা এ পর্যন্ত কাব্যের মুখ্য বিষয়রূপে, কবিমনের মূল আশ্রয়রূপে, কেন্দ্রীয় চেতনার প্রবল প্রত্যক্ষতায় আত্মপরিচয় ঘোষণা করে নাই। প্রেমের সূক্ষ্ম উদ্বর্তন, অনন্ত-ভাবনার দিব্য উদ্দীপন ও রহস্যময় জীবনবোধের গূঢ়সঞ্চারী প্রেরণা-রূপে উহার রবীন্দ্রকাব্যলোকে ইঙ্গিতময় আবির্ভাব ঘটিয়াছে। কিন্তু 'নৈবেদ্য'-এ এই ঐশী-চেতনা কবিকল্পনার সমস্ত অপরূপত্ব বর্জন করিয়া, পরিবেশ-রমণীয়তার সমস্ত বর্ণাঢ্যতা উপেক্ষা করিয়া একান্তভাবে নিজ মহিমা ও কবির একনিষ্ঠ ভক্তিনম্রতার অধিকারে কাব্যমধ্যে অবতীর্ণ হইয়াছে। এ যেন বসন্ত ও মদনের মায়াসজ্জাহীনা ও নিজস্ব চরিত্রগৌরবের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীলা রূপরিক্তা রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার নেপথ্যাবরোধমুক্তি। এ যেন আঁধার ঘরের রাজার সমস্ত রমণীয় কল্পনার অন্তরাল হইতে কোষমুক্ত তরবারির ন্যায় ঝলসিত প্রখর আত্ম-উন্মোচন। রবীন্দ্রনাথ 'নৈবেদ্য' ও উহার পরবর্তী কয়েকটি কাব্যগ্রন্থে ভগবান ও তাঁহার কবিসত্তার মধ্যে সমস্ত

অন্তরাল ঘুচাইয়া প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার মহিমাকীর্তন করিয়াছেন, কবিসত্তাকে প্রায় সর্বতোভাবে ভক্তসত্তার নিয়ন্ত্রণাধীন করিয়া ভক্তির হাতেই নিজ কাব্যরথরশ্মি ছাড়িয়া দিয়াছেন। ভক্তির অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রয়োজনে কবিকল্পনার সমস্ত লীলাচপলতা, কাব্যকলার সমস্ত ললিত লাবণ্য বিষয়গৌরবের সম্ভ্রমবোধে আত্মসংহরণ করিয়া লইয়াছে।

'নৈবেদ্য'-এর ভগবান অতি-প্রত্যক্ষ, অতি-জাগ্রত; তাঁহার নীতিবিধান, তাঁহার দণ্ড-পুরস্কার অতি-সুস্পষ্টভাবে নির্দেশিত, অন্তরে তাঁহার অনুশাসন অনপনেয় রেখায় মুদ্রিত। ইঁহার স্বরূপ উপনিষদ-অনুসারী, মানুষের বিবেক-বুদ্ধি ও বিশ্বের ইতিহাস দ্বারা দৃঢ়সমর্থিত। সাধারণতঃ যে রহস্যময় সত্তা আলো-আঁধারিতে গোধূলিমায়ায় অস্পষ্ট থাকিয়া নানা আভাসে-ইঙ্গিতে নিজ অভিপ্রায়কে মানব-অনুভূতিগোচর করেন, যিনি নানা লীলাময় ছদ্মবেশে মানবমনের সহিত গোপন অভিসারে মিলিত হন, মানুষের হৃদয়বৃত্তি ও আদর্শ-কল্পনা হইতে উপাদান লইয়া যিনি নিজ বিগ্রহ রচনা করেন, 'নৈবেদ্য'-এর ভগবান সে-জাতীয় নহেন। তাঁহার প্রকাশ ও আত্মগোপন-প্রক্রিয়া দুইই নির্দিষ্ট নিয়মানুবর্তী; উভয়ই তাঁহার কল্যাণ-অভিপ্রায়ের দ্বারা নিরূপিত। এখানে তিনি পিতারূপে বন্দিত। কান্ত বা দয়িতরূপে মানুষের সহিত সম্পর্ক-মাধুর্য-আস্বাদন তাঁহার উদ্দেশ্য-বহির্ভূত। এখানে তাঁহার প্রতিটি অনুভব, অনুশাসনের রূপে লৌহঅক্ষরবদ্ধ; তাঁহার মাধুর্য-প্রতীতি সম্পূর্ণরূপে তাঁহার আদেশপালনসাপেক্ষ। অবশ্য এই বিধানজালের ফাঁকে ফাঁকে মাধুর্যের ইঙ্গিত ঈষৎ মুক্তির পথ খুঁজিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্ত এখানে যেটুকু সৌন্দর্য সৃষ্টি করিয়াছে তাহা ভগবানের নিকট সম্পূর্ণ আত্মনিবেদনের প্রসাদ-লব্ধ, স্বাধীনভাবে আহৃত নয়। তথাপি ভগবানের অবিমিশ্র ঐশ্বর্যময় মূর্তি-অনুধ্যানে রবীন্দ্রকবিমানস বেশীক্ষণ নিজ স্বভাবসিদ্ধ সৌন্দর্যমুগ্ধতাকে অবদমিত রাখে নাই। তাঁহার রাজমুকুটের অন্তর্বর্তী রত্নদ্যুতি যে কোমল রশ্মিচ্ছটায় মৃদু বিকীর্ণ হইতেছিল তাহাই কবির রূপপিয়াসী কল্পনাকে ক্ষণে ক্ষণে আকর্ষণ করিয়াছে।

এই কাব্যগ্রন্থের প্রথম একুশটি কবিতা ও সমাপ্তিরচনাটি (১০০ সংখ্যক) গীতিকবিতার ব্যক্তিক অনুভূতির সুরে বাঁধা ও গীতচ্ছন্দের ধ্বনিসূত্রে গ্রথিত। এই কয়েকটি কবিতায় কবি নিজ ঈশ্বরসেবার সংকল্প, উহার জন্য আরাধ্য দেবতার কৃপাপ্রার্থনা ও শেষের দিকে নিবিড় উপলব্ধির প্রত্যয়

ভক্তি-নম্র চিত্তে নিবেদন করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে এখনও কাব্যের মূল সুরের উদাত্ত, স্বল্পবাক্ গাম্ভীর্য, বিশ্ববিধানের নিঃসংশয় প্রত্যয়, অমোঘ কর্তব্যের বজ্রকঠোর নির্দেশ সংসক্ত হয় নাই। কবির অন্তর-আকৃতি এখনও তাঁহার ব্যক্তিগত সাধনার সীমা অতিক্রম করিয়া সার্বভৌম অনুশাসনের অমোঘতা লাভ করে নাই। উৎসসন্নিহিত নির্ঝরের ন্যায় ইহা এখনও মৃদুপ্রবাহিনী, কলগুঞ্জনস্বনিতা। এখনও ইহা তরঙ্গবেগ, ধ্বনিকল্লোল ও বিরাট আবেগকে সংযত রাখার যে বিপুলতর আত্মদমনশক্তি তাহা অর্জন করিতে পারে নাই। 'নৈবেদ্য'-এর ভূমিকা উহার পরিণতির পূর্ব-সূচনারূপে একই সুর ও ভাববৃত্তের শাসন স্বীকার করে নাই। যাহার প্রারম্ভ রোমান্টিক আত্মলীন ভজনগাথার মৃদু সুরে তাহা যে ক্লাসিকাল রীতির ধ্বনিময় নিরুচ্ছ্বাস ভাবমহিমায়, শাশ্বত জীবননীতির উদাত্ত-গম্ভীর ঘোষণায় অনন্যতা লাভ করিবে তাহা গোড়া হইতে সুস্পষ্ট হয় নাই। শান্ত স্নিগ্ধ গার্হস্থ্য পূজার এই প্রাভাতিক আরতি যে মধ্যাহ্নের দাবদগ্ধ রুদ্র তপস্যায় ও বজ্রবিদ্যুৎক্ষুব্ধ অপরাহ্ণের আতঙ্কিত প্রসাদ-প্রতীক্ষায় অবসান লাভ করিবে তাহা অনেকটা আকস্মিক মনে হয়। এই পূজার উপচার যে ঘরের নিভৃত কোণ হইতে ভারতের সমষ্টিগত জীবনযাত্রা ও নিখিল বিশ্বের সীমাহীন কর্মশালার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত হইবে, কাব্যের বীজগর্ভে এই মহীরুহপ্রসবের সম্ভাবনা অপ্রত্যক্ষই ছিল।

২

প্রথম কুড়িটি গীতিকবিতাগুচ্ছে ঈশ্বরের সহিত নিভৃত আলাপনের, একান্ত আত্মনিবেদনের অন্তরঙ্গতা, নিষ্ঠা ও হৃদয়াকৃতি সুপ্রকট হইয়া উঠিয়াছে। ইহাদের মধ্যে নিজের ভাবপ্রকাশ ছাড়া আর কোন উচ্চকণ্ঠ ঘোষণা-প্রয়াস নাই। হিন্দুভক্তিশাস্ত্রে সুপরিচিত বৈষ্ণব ও শাক্ত সাধনা-গীতির ন্যায় এখানেও ভগবৎমিলনাতুর কবি-মনের বিনয়নম্র দীনতা ও সহজ অধিকারবোধের প্রসন্ন প্রত্যয় একসঙ্গে পরিস্ফুট হইয়াছে। ভক্তি-বিগলিত অকপট প্রার্থনা এই দুই মনোভাবের মধ্যে সেতু রচনা করিয়াছে। কবির প্রার্থনার মধ্যেই প্রার্থনাপূরণের আশ্বাস সূচিত। যাজ্ঞার অন্তর-উৎসারিত আবেগই উহার ভাষা, ছন্দ ও কায়াব্যূহ নির্মাণ করিয়াছে। কেবল

'তোমার রাগিণী জীবনকুঞ্জে'-শীর্ষক ৪নং পদটি খানিকটা প্রকৃতিসৌন্দর্যাত্মক সচেতন রচনা বলিয়া প্রতিভাত হয়। কবি-প্রাণের ক্ষণিক ভগবৎ-বিমুখতাও ভগবৎ-প্রেমের উচ্ছ্বসিত পুনরাবির্ভাবের আশ্বাসবাহীরূপে তাঁহার প্রত্যয়কে বিন্দুমাত্র বিচলিত করে নাই। বন্ধ দুয়ার যে করাঘাতে খুলিবেই, শুষ্ক মরুভূমিতে যে রসনির্ঝর প্রবাহিত হইবেই এ সম্বন্ধে কবির লেশমাত্র সংশয় নাই (পদ নং ৫ ও ৬)। ৭ হইতে ১৮ সংখ্যক পদ পর্যন্ত নিঃসংশয় প্রত্যয়ের বিজয়শঙ্খনাদ ঘোষিত—মৃত্যুদূতের মুখেও ঈশ্বর-বিধানের নির্দেশ আসিলে কবি তাহা প্রশান্তচিত্তে বরণ করিয়া লইবেন। কবির সহিত ঐশী শক্তির ভাববিনিময়ের প্রথম পালা এই সুরেই অভিনীত হইয়াছে—অনুভবগুঞ্জন স্বয়ংসমুখ ভাষা ও ছন্দে, আকৃতির অন্তরঙ্গতা ও প্রকাশের প্রয়াসহীন সরলতার এই আশ্চর্য-নিবিড় মিলনে রূপ-প্রত্যক্ষতা লাভ করিয়াছে।

. ইহার পর সুর ও রীতির পরিবর্তন ঘটিয়াছে—গীতি-কবিতার পরিবর্তে সনেটধর্মী তত্ত্বনিবিড়তা, গভীরপ্রত্যয়োৎকীর্ণ চতুর্দশপদী পয়ারের ভাব-সংক্ষিপ্তি ও প্রকাশঘনতা। এই পরিবর্তনের স্বরূপটি আলোচনার পূর্বে কাব্যটির ভাবক্রম-পরম্পরার উপলব্ধিপ্রয়াস আলোচনার পক্ষে সুবিধাজনক হইবে।

(১) সংসারের ঘূর্ণ্যমান কর্মচক্রের সহিত ঈশ্বরসত্তার নিবিড় ও অচ্ছেদ্য সংযোগ ও কবির প্রাণচেতনায় ঈশ্বরকেন্দ্রিক বিশ্বানুভূতির সর্বব্যাপ্ত অস্তিত্ব (২২-৩৬)।

(২) ইহার বিপরীত মানস অভীপ্সারূপে বিশ্বসংসারবিবিক্ত নির্জনতায় ঈশ্বরের স্বরূপ-অনুভবের আকাঙ্ক্ষা—প্রকৃতি ও প্রাকৃত ভাব হইতে শান্ত, জীবন-নিগূঢ়সঞ্চারী ঐশী প্রত্যয়ে উত্তরণ (৩৭-৪৬)।

(৩) সংঘাতময়, সংগ্রামক্ষুব্ধ মানবজগতে ভগবৎ-সত্তার অলঙ্ঘ্য বিধানরূপে উপলব্ধি—মাতৃস্নেহের আনন্দ-আবেশের পরিবর্তে পিতৃনির্দিষ্ট কঠোর আদেশের কৃচ্ছ্রসাধ্য পালন (৪৭-৫৬)।

(৪) উপনিষদের ঋষিদের ঈশ্বরবোধের সহিত তুলনা, আধুনিক হিন্দুর ধর্মবিকার ও পাশ্চাত্ত্য শক্তিমত্ততা ও ভোগবাদের আত্মঘাতী মূঢ়তা; ভারতের নবজাগরণ সম্বন্ধে কবির অপরাজেয় আশা (৫৭-৭২, ৯১, ৯২, ৯৫)।

(৫) ব্যক্তিগত অনুভূতি ও স্বদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মাধ্যমে ঐশী প্রত্যয়ের কান্ত উদ্বোধন (৭৩-৭৮, ৮৫-৮৭, ৮৯-৯০)।

(৬) কবির আশাবাদের উপসংহারবাণী (৯৭-১০০)।

প্রথম পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত পদাবলীর মধ্যে একদিকে মানবের উদ্‌ভ্রান্ত কর্মকোলাহলের মধ্যে পরম পুরুষের নীরব, নিঃসঙ্গ উপস্থিতি, অন্যদিকে চরাচরের মধ্যাহ্ন নিশ্চলতার মধ্যে ভগবানের আসন ঘিরিয়া অগণিত অণু-পরমাণু ও জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর অন্তহীন নৃত্যকল্লোল মানবকল্পনার দুই বিপরীত সীমাকে স্পর্শ করিয়াছে। উভয়ের মধ্যে মধ্যাহ্নপ্রকৃতির নিদ্রালস শান্তির চিত্রই কবিকল্পনার অনুকূলতর পরিবেশরচনায় উচ্চতর কাব্যোৎকর্ষসৃষ্টির হেতু হইয়াছে। ইহার পর ২৪, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৮ সংখ্যক পদে কবির জীবনব্যাপী প্রত্যয়—আপাতঅবহেলা ও অন্যমনস্কতার মধ্যে ভগবানের অতর্কিত আবির্ভাব ও তাঁহার প্রসাদের চকিত অনুভব, অপচয়ের শূন্যতার মধ্যে অধ্যাত্মসম্পদের গোপন সঞ্চয়বার্তা—নানা বিচিত্র পারিপার্শ্বিকে, কাব্যচমকের মৃদু-তীক্ষ্ণতার নানা স্তরভেদে অভিব্যক্ত হইয়াছে। এই কবিতাগুচ্ছের পরিপ্রেক্ষিতেই কবির সাধনারীতির কেন্দ্রীয় তত্ত্বনির্ণয়টি—"বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়"—৩০নং পদে ব্যাখ্যাত ও উদ্‌ঘোষিত। জীবনের সমস্ত রস আস্বাদন করিয়াই, ইন্দ্রিয়ের সৌন্দর্য-আহরণের পরিপূর্ণতার মাধ্যমেই তাঁহার মুক্তিসাধনা ও ভক্তিপরিণতি তাঁহার ঈশ্বরমিলনাকূতির সার্থকতা বিধান করিবে এই স্থির প্রতীতি তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ। বিশ্ব এবং বিশ্বনাথ তাঁহার নিকট একই ডোরে বাঁধা বলিয়া একের আকর্ষণ অপরকে তাঁহার অনুভূতিগম্য করিবে। এই প্রসঙ্গে লিখিত আরও কয়েকটি পদে (২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯ সংখ্যক) দেবতার লীলা-নিকেতনরূপে কবি নিজ সত্তার অপরূপত্ব অনুভব করিতেছেন ও তাঁহার বিশ্বাতিসারী, বিশ্বলোপী সর্বাত্মকত্বের স্পর্শের জন্য আবেদন জানাইতেছেন। ইহাদের মধ্যে কবিচেতনা ভক্তিবশ্যতার অভিভব হইতে কিছুটা মুক্ত হইয়া নিজ স্বাতন্ত্র্যের পরিচয়ে সমুজ্জ্বল হইয়াছে। মানসপ্রত্যাগত হংসকদম্বের কলধ্বনির সহিত কবি তাঁহার চিত্তে নিঃশেষিত গীতধারার অতর্কিত উচ্ছ্বাসের পুনরাবির্ভাবকে তুলনা করিয়াছেন, তবে এখানে তাঁহার প্রেরণা ঐশীরহস্যবার্তাপ্রসূত। কবির প্রাণধারায় ভগবৎ-কেন্দ্রিক বিশ্বানুভূতি, ক্ষুদ্র মানব অন্তরে ঈশ্বরের অনন্ত আসনের পরিচয় কবিকে বিস্ময়মুগ্ধ করিয়াছে। কবির সমস্ত অনুভবে ভগবানের সর্বব্যাপী ও অসপত্ন অনুপ্রবেশ ও নিশীথনিদ্রার প্রাক্‌ক্ষণে বিশ্ববৈচিত্র্যের ছায়াবলুপ্তি ও ভগবানের নিঃসীম

ব্যাপ্তি দ্বারা এই শূন্যতায় নিশ্ছিদ্র পূরণ—এইরূপ চিন্তাধারা যেমন কাব্যোৎকর্ষউদ্দীপনের অনুকূল, তেমনি ভক্তিতন্ময়তার মধ্যে অনন্তব্যাপ্তি ও অপরিমেয় রহস্যবোধসঞ্চারের সহায়ক হইয়াছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে ইহার বিপরীতমুখী একটি আকর্ষণ—নির্জনতায় ঈশ্বরের সহিত মিলনাকৃতি—কবিচিত্তকে অধিকার করিয়াছে। ৩৭-৪৬ ও পরবর্তী ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪ সংখ্যক পদ এই মনোভাবেরই অভিব্যক্তি। ৩৭ সংখ্যক পদে এই নিভৃতদর্শনকামনা প্রথম বাণীরূপ পাইয়াছে। কবি সাংসারিক কর্মজালের বহুমুখী চিত্তবিক্ষেপের মধ্যে অতর্কিত ঐশী স্পর্শে সম্পূর্ণ তৃপ্ত নহেন। তিনি সর্ব পার্থিব সংসর্গ পরিহার করিয়া প্রশান্ত নিঃসঙ্গ সান্ধ্য অন্ধকারে শুধু তাঁহারই জীবনের দীপশিখায় আরাধ্য দেবের প্রত্যক্ষ দর্শনের অভিলাষী। যাত্রীদলসংসর্গবিচ্যুত হইয়া মধ্যাহ্নক্লান্তির অবসানে অপরাহ্ণবেলায়ই তাঁহার পূজার সাজি পূর্ণবিকশিত কুসুমে পরিপূর্ণ হইবে, তাঁহার চিত্ত সর্বাত্মক আত্মনিবেদনের জন্য প্রস্তুত হইবে। ভগবানের অনন্ত, ত্বরাপ্রয়োজনহীন অবসর; তাই ভক্তের জীবনান্ত পর্যন্ত প্রতীক্ষা করিতে তাঁহার কোন অসুবিধা নাই—শেষ প্রহরও তাঁহার পূজাগ্রহণের প্রকৃষ্ট সময়। প্রকৃতির ফুলের ন্যায় ভক্তহৃদয়ের ফুল ফুটাইতেও তিনি অটুট ধৈর্যে অপেক্ষমান। বিশেষতঃ সৃষ্টির মধ্যে ভগবানের যে গোপন ইঙ্গিতগুলি অদৃশ্য অক্ষরে বিন্যস্ত আছে, তাহাদের পাঠোদ্ধার ও তাৎপর্যগ্রহণও দীর্ঘ পরিচয়সাপেক্ষ। অক্ষর যতদিন না পড়া যায়, ততদিন লিপির মর্মোদ্‌ঘাটন অসম্ভব। ঈশ্বর সর্বদাই নিজসৃষ্টির অন্তরালে আত্মগোপন-তৎপর; তাঁহার তুচ্ছতম সৃষ্টিও তাঁহার অপেক্ষা আত্মপ্রচারশীল। তাই তাঁহার পরিচয়-উদ্‌ঘাটনের শুভ লগ্নের জন্য ধৈর্যশীল প্রতীক্ষাই একমাত্র উপায়। তাঁহার আহ্বান-ব্যতিরেকেই মানবাত্মার তাঁহার প্রতি নিগূঢ় স্বতঃ-আকর্ষণ। গঙ্গোত্রীমুখ হইতে সদ্যোনিষ্ক্রান্ত নির্ঝরধারা সমুদ্রের কথা না জানিয়াই উহার অমোঘ টান সর্বাঙ্গে অনুভব করে। প্রকৃতি ও কবিচিত্ত সংসারকে নিজ দেয় সম্পূর্ণ চুকাইয়া দিয়াও ভগবানের প্রতি তাহাদের শেষ অর্ঘ্যটি নিবেদন করে। কবি ভাবোন্মত্ত ভক্তিমদিরতার সমস্ত অমিতব্যয়ী, ক্ষণ-নিঃশেষিত বন্যা-উচ্ছ্বাস অপেক্ষা উহার প্রশান্ত, জীবনের সর্বকর্মধারায় প্রণালীবদ্ধভাবে সঞ্চালিত, সর্বপ্রাকৃতআবেগমুক্ত সঞ্জীবনী প্রভাবেরই প্রার্থনা করেন।

আজ প্রকৃতির স্পর্শমোহ হইতে মুক্ত, বিহ্বল সৌন্দর্যাবেশ হইতে পরিশুদ্ধ ঐশী প্রেমের যাত্রা যেন মাতৃস্নেহলোলুপতা হইতে পিতৃনির্দেশের কঠোর-সংযমরুদ্ধ অনুমোদনকৃপণতার আশ্রয়গ্রহণ। ৮০ হইতে ৮৪ পর্যন্ত পদসমূহেও কবি নানাভাবে ঈশ্বরের অচিন্তনীয়, নিঃসঙ্গ মহিমার উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। নিখিল বিশ্বের কল্পনাতীত বিরাট পটভূমিকায়, ভগবানের নীড়রূপের সহিত তাঁহার আকাশরূপের দ্বৈত ভূমিকায়, তাঁহার মাধুর্যরূপের সহিত তুলনায় ঐশ্বর্যরূপের প্রতি পক্ষপাতে, তাঁহার নিকটে ও দূরে, কর্মতটবন্ধনে ও শান্তিসিন্ধুর অগাধ গভীরতায়, ঈশ্বর-সমর্পিত প্রাণে অসংখ্য কর্মধারার একমুখীনতায় তাঁহার বিভূতি-প্রকাশে কবি একই চিন্তা নানা উপমা-রূপক-চিত্রকল্প-মননের মাধ্যমে বিচিত্ররূপে অভিব্যক্ত করিয়াছেন।

এই পর্যায়ের পদগুলির মধ্যে কয়েকটিতে (৪০, ৪৩, ৪৪, ৪৬, ৮১, ৮৩ সংখ্যক পদে) কবিকল্পনা, ভক্তিনিবিড়তা ও মননৈশ্বর্যের সার্থক মিলনে একটি অপূর্ব আস্বাদ্যমানতার যৌগিক রস উৎপন্ন হইয়াছে। এগুলিতে কবির মৌলিক রূপানুভূতি ভক্তির সংযম ও মননের ভাবসংহতি স্বীকার করিয়া এক তপঃস্নাত মহিমায় উত্তীর্ণ ও শুচিশুভ্র আত্মিক দীপ্তিতে দ্যোতনাময় হইয়া উঠিয়াছে। ইহাদেব মধ্যে ভক্তের নীতিমুখ্যতা কাব্য-সৌন্দর্যের অনুরঞ্জনে সাধারণ ভক্তিকবিতার ধূসরতা হইতে রসসৃষ্টির অনির্বচনীয়তায় উত্তীর্ণ হইয়াছে।

তৃতীয় ও চতুর্থ পর্যায়ে ভগবানের পিতৃস্বরূপ ও কঠোর কর্তব্যের আহ্বানের পিছনে অন্তরায়িত তাঁহার স্নেহপরিচয়টি উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। ইহা ৪৭ হইতে ৫৬ ও ৬৪-৬৫ পদ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই পর্যায়ের পদগুলি নৈবেদ্য-এর কেন্দ্রীয় অনুশাসনরূপে উহার ভাবমেরুদণ্ড রচনা করিয়াছে ও বহুল উদ্ধৃতির সাহায্যে সর্বজনীন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাদের ভাব ও ভাষা বৃক্ষকাণ্ডের ন্যায় ঋজু, অনমনীয়, ওজস্বিতায় বিপুলবেষ্টনী ও কাব্যোচিত সুকুমারসৌন্দর্যরিক্ত। এইগুলিতে কবি বক্তব্য বিষয়ের গুরুত্ব ও ভাবমহিমার উপরই নির্ভরশীল, কাব্যের মণ্ডনকলার প্রতি বহু পরিমাণে উদাসীন। ইহাদের ভিতর ভগবৎ-বাণী-প্রচারে সমর্পিতপ্রাণ ধর্মবেত্তার আগ্নেয় সংকল্প, মিল্‌টনীয় দৃপ্ত নীতিচেতনা ও বিশ্ববিধানের অমোঘতার শাশ্বত প্রেরণা কাব্যসৌন্দর্যের সহায়তানিরপেক্ষরূপে আত্মঘোষণা করিয়াছে। অনেকে তাই এই কাব্যের শব্দধ্বনিবৎ উদাত্ত ভাষণরীতি

ও জীবনদর্শনের দ্বারা অভিভূত হইয়া ইহার মধ্যে কাব্যসুলভ সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনার অভাব অনুভব করিয়াছেন। ইহা যেন পর্বতশৃঙ্গের নিঃসঙ্গ মহিমায় শ্যামলতারিক্ত ছায়াহীন উর্ধ্বাকাশে নিজ শির উন্নত করিয়া সেই অদ্বিতীয় পরম একের উদ্দেশে অর্ঘ্য সাজাইয়াছে। এই নৈবেদ্যের থালায় যে পুষ্পরাজি চয়িত হইয়াছে তাহা কণ্টকবিদ্ধ, স্পর্শসুকোমল ও ঘ্রাণমনোহর নয়। এই পর্যায়ে কবি তাঁহার নিভৃত অন্তরলোকের নিগূঢ় বার্তাবহন না করিয়া সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে বিকৃত ধর্মবোধ ও ভগবৎ-বিধানের লঙ্ঘন যে জাতীয় শক্তির অপচয় ও আসন্ন ধ্বংসের সংকেতবাহী তাহারই প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়াছেন। ইহা কাব্য বটে, কিন্তু নিজ দায়িত্বগৌরবে অভিভূত কাব্য। ইহা উচ্চতর ভাবভূমিতে উত্তরণ-প্রয়াসী সোপানাবলীর ন্যায় নিজ উদ্দেশ্যের নিকট আপনার প্রাণসত্তার স্বচ্ছন্দ বিকাশকে বলি দিয়াছে। অবশ্য এইরূপ ধারণা যে সম্পূর্ণ যথার্থ নয় তাহার নিদর্শন পূর্বতন পর্যায়গুলির পদ-আলোচনাপ্রসঙ্গে উদাহৃত হইয়াছে।

ইহারই সহিত সংশ্লিষ্ট উপনিষদের ঋষিদের ঈশ্বরবোধ ও বর্তমান যুগের হিন্দুর সহিত এ বিষয়ে পার্থক্য সম্বন্ধে কবির তত্ত্বসমীক্ষা (৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৭২, ৭৯)। এইগুলিতে উপনিষদতত্ত্বের কাব্যরূপ ও পৌরাণিক হিন্দুধর্মের আদর্শবিচ্যুতি সূক্ষ্ম কবিভাবনা ব্যতিরেকেই বিষয়োপযোগী মননগাম্ভীর্যে স্বয়ংনির্ভর হইয়াছে। ৭২ সংখ্যক কবিতাটিও 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য' নৈতিক আদর্শের সর্বজনগ্রাহ্য ভাবসমুন্নতির গুণে ও সমপরিমাণে কাব্যব্যঞ্জনার আপেক্ষিক অভাবের জন্যও রবীন্দ্রজীবননীতির কেন্দ্রস্থ প্রকাশরূপে অ-বাঙালী সমজদারের বহু-উদ্ধৃতি-ধন্য হইয়া আন্তর্জাতিক বিদগ্ধ সমাজে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। 'নৈবেদ্য'-এর সমস্ত তাৎপর্য ও আবেদন যেন ঐ একটি পদে সংহত হইয়া রবীন্দ্রভক্তের ধ্যানমন্ত্রাবৃত্তির গৌরবে সমাসীন হইয়াছে।

কিন্তু কবিসত্তা কখনও মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির সামবাণী-উচ্চারণে নিজ কাব্যযজ্ঞের পূর্ণাহুতিদানে তৃপ্ত হইতে পারে না। ঋষির কটিলগ্ন অজিনবাস তাঁহার বৈচিত্র্যপিয়াসী, রূপমুগ্ধ মনের চরম আশ্রয় হইতে পারে না। তিনি ঘুরিয়া-ফিরিয়া নিজের মানসবৃত্তির অনিবার্য আকর্ষণে সাধারণ হইতে আত্মগত অনন্ততায়, তত্ত্বসম্বল দর্শন হইতে বিচিত্র-অনুভূতিময়

কাব্যে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হন। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে। তিনি তাত্ত্বিক আলোচনা হইতে ভারতের ভবিষ্যৎ ও নবজীবনপ্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে তাঁহার নিজস্ব আশা ও কল্পনাবিলাসে তাঁহার কবিমনের পরিচয় দিয়াছেন। এই পর্যায় ৬২, ৬৩, ৬৬-৭১, ৯১, ৯২, ৯৫ পদগুলি অধিকার করিয়া বিস্তৃত। কবি ভারতের এই অধঃপতনের যুগেও উহার ভবিষ্যৎ গৌরব সম্বন্ধে আশা পোষণ করেন। ভারতের নবজাগরণ যে আধুনিক জড়বাদী ও শক্তিমত্ত পাশ্চাত্ত্যের আদর্শের বিপরীতগামী হইবে, তাহার প্রভাতের নির্মল আলোক যে তারকাখচিত নৈশ আকাশ ও সূর্যাস্তের রক্তচ্ছটামণ্ডিত প্রলয়দীপ্তির সগোত্রীয় নহে, সে সম্বন্ধে তিনি সুনিশ্চিত। এই নবভারত ত্যাগ ও তপস্যার মহিমায় ভাস্বর হইয়া সম্পদহীনতার মধ্যেও সন্তোষ ও ধৈর্যকে বরণ করিয়া লইবে ও ব্রাহ্মণত্বের প্রাচীন আদর্শকে তাহার জীবনযাত্রায় ও রাষ্ট্রনীতিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবে। ভারতের চিরনবীন প্রকৃতিসৌন্দর্য শাশ্বত ধ্রুবসত্যের প্রত্যয় বহন করে না বলিয়াই ইহা আধুনিক ভারতীয়ের কণ্ঠে কোন নব আশার সঙ্গীতধ্বনি উদ্দীপন করে না। তাহার ঈশ্বরানুভূতি প্রকৃতির চিরপ্রবহমান প্রাণস্রোত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া শাস্ত্রগ্রন্থের জীর্ণ পত্রাবলীর মধ্যে সমাধিলাভ করিয়াছে। ৭০ নং পদে (তোমার ন্যায়ের দণ্ড প্রত্যেকের তরে,) কবির আর একটি উত্তুঙ্গ নীতিঘোষণা—একটি মহান্ জীবনাদর্শকে স্মরণীয় উক্তিবিদ্ধ করিয়া নিখিল মানবচিত্তের নিকট তুলিয়া ধরিয়াছে। অত্যাচারের প্রতিরোধ, নিপীড়িত মানবাত্মার মর্যাদারক্ষা শুধু রাষ্ট্রনীতি নয়, শাশ্বত ধর্মনীতির ও ঈশ্বরাভিপ্রায়ের নির্দেশরূপে অত্যাজ্য কর্তব্যের উচ্চতর বেদীতে সমুন্নত হইয়াছে।

কিন্তু এই নীতিঘোষণার সুরেই কবি কাব্যটির সমাপ্তিরেখা টানিতে পারেন নাই। তাঁহার অন্তররুদ্ধ কবি-আকৃতি তাঁহাকে আরও বিচিত্র অন্তরঙ্গতার প্রেরণায় প্রবর্তিত করিয়াছে। এই পর্বে (৭৩-৭৮, ৮৫-৮৭, ৮৯, ৯০) কবির ব্যক্তিপুরুষ ও তাঁহার চির-প্রবুদ্ধ সৌন্দর্যবোধ প্রবক্তার (Prophet) তত্ত্ব দৃষ্টির একমুখীনতাকে অতিক্রম করিয়া বিচিত্র সৌন্দর্যাকীর্ণ পথে, অভিনব ভাবাসঙ্গের মাধ্যমে চিরসুন্দরের স্পর্শলাভে উন্মুখ হইয়াছে। মাধুর্যমোহ জয় করিতে কৃতসংকল্প হইয়াও তিনি সুন্দরের হাতছানিতে বারে বারে মুগ্ধ হইয়াছেন। মাধুর্য ও ঐশ্বর্যের বিপরীতমুখী আকর্ষণে

শ্রান্ত কবি সুন্দরকে বর্জন না করিয়া একটা আপোষ-রফার আবেদন জানাইয়াছেন—যখনই বিধাতার অমোঘ আহ্বান আসিবে, তখনই যেন তিনি প্রসন্নচিত্তে এই সৌন্দর্যমেলাকে ছাড়িয়া যাইতে পারেন। বিদেশের আতিথেয়তাহীন জীবন-পরিবেশেও যেন তিনি ভগবানের আনন্দধারায় অভিস্নাত হইতে পারেন। বাঙলা প্রকৃতির দিগন্তবিসার শস্যক্ষেত্রের উদার শান্তি, উহার নির্মল নীলাকাশে ঝঙ্কৃত বৈরাগ্যের ভৈরবীগান, উহার নদীর নির্জন তটে তরঙ্গের মৃদু কল্লোলে ধ্বনিত "একাকিনী মাধুরী"র কিঙ্কিণী-শিঞ্জিত, বিশেষতঃ তরুচ্ছায়াস্নিগ্ধ গার্হস্থ্য-জীবনের প্রীতিমাখান কল্যাণবোধ-বর্ণনার নিবিড় আন্তরিকতার মধ্য দিয়াই এই প্রকৃতির প্রতি কবির ভালবাসা নির্ভুলভাবে ব্যঞ্জিত। অথচ ঐশ্বর্যময়ের ডাকে তিনি এই সমস্ত উপভোগের আনন্দবিসর্জন করিতে প্রস্তুত। ইহাতে কবির শ্যাম ও কূল দুই দিকই বজায় রহিল।

৭৫ হইতে ৭৮ পদে কবি এই সৌন্দর্যস্মৃতির স্নিগ্ধ প্রলেপ মনে মাখিয়াই ভগবানের ঐশ্বর্যরূপের প্রতি তাঁহার আনুগত্য জ্ঞাপন করিয়াছেন। সেই জন্যই ইহাদের সুর অতি কোমল ও রূপমুগ্ধের চলচ্চিত্ততার প্রতি প্রশ্রয়-ভিখারী। ইহাদের মধ্যে উদাত্ত-গম্ভীর নীতি-প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে আছে সৌন্দর্যপিয়াসী ভক্তের সসঙ্কোচ ত্রুটিস্বীকার ও মার্জনা-প্রার্থনা। এই ভগবান যে শুধু দণ্ডবিধাতা শাসক নহেন, সৌন্দর্যস্রষ্টা শিল্পীরূপে মানবমনের অসংখ্য বাসনা-কামনার উদ্বোধক ও একনিষ্ঠতার আদর্শচ্যুতির প্রতি সহানুভূতিশীল বিচারক, তাহা ইহাদের মধ্যে সুস্পষ্ট হইয়াছে।

৮৫, ৮৬ ও ৮৭ সংখ্যক পদে অনাবৃষ্টিদীর্ণ সৃষ্টির দাবদাহপ্রশমক বর্ষা-দুর্যোগক্ষুব্ধ প্রকৃতিচিত্রাবলীর আশ্রয়ে কবি দেবতার স্নিগ্ধ স্পর্শ ও চিত্তদাক্ষিণ্য অনুভব করিতে চাহিয়াছেন। ইহাতে হয়ত বৈষ্ণব ঐতিহ্যের খানিকটা প্রভাব লক্ষ্য করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে দয়িতপ্রেমের ভাবাসঙ্গ একেবারেই অনুপস্থিত। ভগবানকে শুধু পিতৃরূপে দেখিয়াই কবিচিত্ত তৃপ্ত নহে, পিতার রুদ্ররোষ যেন মাতার স্নেহসজল অশ্রুব্যাকুলতার দ্বারা মাঝে মধ্যে প্রশমিত হয় ইহাও তাঁহার আকাঙ্ক্ষা। বর্ষাঋতুর প্রতি কবির পুনঃপুনঃ অভিব্যক্ত অনুরাগ এখানে একটি অভিনব ভাবব্যঞ্জনা-সৃষ্টির হেতু হইয়াছে। অবিরলবর্ষণ বর্ষানিশীথে শুধু যে বিরহবেদনা উদ্বেল হইয়া উঠে, হরি বিনা জীবন কাটাইবার ব্যর্থতাবোধ উদ্দাম হয়

তাহা নহে। নিদাঘ অপরাহ্নে মেঘমেদুর আকাশ ও ধারাবর্ষণে স্নিগ্ধ পৃথিবী রৌদ্রদাহক্লিষ্ট প্রকৃতির জ্বালা উপশম করিয়া কর্তব্যভারপীড়িত মানবের মনে ভগবানের প্রসাদদাক্ষিণ্যের নিদর্শন বহন করে ও তাহার সাধনাক্লেশকে সহনীয়, এমন কি রমণীয়ও করে।

কবির ভগবৎ-তত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞতা সত্ত্বেও ভগবান যে তাঁহার প্রিয় ও নিখিলের জীবনস্রোত স্বতঃই ঈশ্বরমুখী এ বিষয়ে তাঁহার সহজ প্রত্যয় ৮৮ সংখ্যক পদে ব্যক্ত হইয়াছে। আর ভগবানই যে সদ্যোজাত শিশুর নিকট অজ্ঞাত সংসারকে মাতার মত স্নেহমমতাময়ীরূপে প্রতিভাত করেন ও জীবনের মত মৃত্যুও যে তাঁহার কল্যাণহস্তের দান, এক স্তন হইতে স্তনান্তরে অপসারণ মাত্র—এ সম্বন্ধে কবির নিশ্চিত বিশ্বাস ৮৯-৯০ সংখ্যক পদে প্রতিফলিত। শেষ পর্যন্ত কবি তত্ত্বঘোষণার উচ্চমঞ্চ হইতে কবি-সুলভ সহজ সংস্কারের রসস্নিগ্ধ সমতলভূমিতে অবতরণ করিয়াছেন। 'নৈবেদ্য' কাব্যটির ভাবভিত্তি ও রস-আবেদন এই যুগ্ম প্রেরণার সামঞ্জস্যের উপর নির্মিত। প্রবক্তার ভূমিকাগৌরবে তিনি কবিমনের সৌন্দর্যমুগ্ধ সরসতা দমিত রাখিলেও একবারে হারাইয়া ফেলেন নাই।

উপসংহারের চারিটি পদে (৯৭-১০০) কবি ঈশ্বরপ্রেমের উপর তাঁহার জন্মগত স্বত্বাধিকারটি নিশ্চিত বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সমুদ্রে ডুব দিলে মাথায় জলপূর্ণ ঘটভারবহনের কোন প্রয়োজন থাকে না। এই দিব্যপ্রেমনিমজ্জিত কবি-আত্মা সেইরূপ তত্ত্বগৌরবের দুর্ভর ভার হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি চাহেন। সাময়িক অবসাদও যে রাত্রি-তমসার অন্ধ চক্ষুতে প্রভাতের নবীন-আলোকসঞ্চারের প্রস্তুতির ন্যায় দেবতার নবকরুণাস্পর্শের অগ্রদূত মাত্র তিনি এ প্রতীতিতেও অটল। ৯৯ পদে কবির জীবনের সর্ব-ক্ষেত্রে প্রয়োগোপযোগী বীর্যের জন্য আবেদন মিনতিতে কোমল, শক্তি-চেতনায় দৃপ্ত ও যুদ্ধঘোষণায় উন্মুখর নয়। শেষ পদে কবি তাঁহার ক্লাসিক্যাল আত্মদমন ও অলঙ্কাররিক্ততা পরিহার করিয়া আবার গীতিকবিতার সুরকোমলতায় ও করুণানির্ভরতায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। এই আপাত-দৃষ্টিতে ঋজুভাষণময়, প্রচারোৎসাহী কাব্যের আদি ও অন্তে গীতের আত্ম-নিবেদনস্নিগ্ধ ভাবমুগ্ধতার বাদল্য জলধারা; মাঝে মধ্যে বন্ধুর শৈলের বক্ষোভেদী নির্ঝরপ্রবাহের ন্যায় মাধুর্যরসের সুপ্রচুর অভিসিঞ্চন। এই নৈবেদ্য-রচনায় কবি ও ঋষির বিভিন্নজাতীয় অর্ঘ্য মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে।

৩

'নৈবেদ্য'-এর পরে রচিত কাব্যগ্রন্থগুলি—'স্মরণ' (৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩০৯ কবিজায়ার মৃত্যু-উপলক্ষ্যে লেখা), 'উৎসর্গ' (ঐ সময় বা তৎপূর্ব কালপর্বে লেখা, ও ১লা বৈশাখ, ১৩২১এ স্বতন্ত্র কাব্যাকারে প্রকাশিত), ও 'শিশু' (শ্রাবণ, ১৩১০) কবির ব্যক্তিজীবনের কয়েকটি আনন্দবিষাদমাখা ঘটনা ও কর্মের সহিত নিবিড়সম্পর্কান্বিত। সাধারণতঃ রবীন্দ্রনাথের কাব্য তাঁহার বহির্জীবননিরপেক্ষ ও অন্তর্জীবনের নিগূঢ় ভাবপ্রেরণা-প্রভাবিত। কিন্তু এই পর্যায়ের কাব্যগুলি এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের জীবন-ঘটনার মধ্যে তাঁহার কবিসৃষ্টির উৎস খুঁজিতে অতি-তৎপর, কবি তাঁহাদের উৎসাহাধিক্যকে নিষেধবাক্যের দ্বারা নিবারিত করিয়াছেন। কিন্তু এই কালপর্বে যে সমস্ত ভাবোচ্ছ্বাস কবিমানসকে আন্দোলিত করিয়া উহাকে রূপসৃষ্টির ছন্দপথে চালিত করিয়াছে, তাহারা কবির ব্যক্তিজীবনের সুখদুঃখের প্রবাহস্ফীত। ১৩০৮ সালের আষাঢ় ও শ্রাবণে তাঁহার জ্যেষ্ঠা ও মধ্যমা কন্যার বিবাহ, ঐ বৎসরে মাঘমাসে বোলপুরে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠা ও ১৩০৯ সালের ভাদ্রমাস হইতে কবিজায়ার পীড়া ও ৭ই অগ্রহায়ণ তারিখে তাঁহার পরলোকগমন, মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাঁহার সদ্যোবিবাহিতা দ্বিতীয়া কন্যার গুরুতর স্বাস্থ্যহানি ও স্বাস্থ্যোদ্ধারের আশায় উহাকে লইয়া হাজারিবাগ ও পরে আলমোড়ায় প্রবাসযাপন ও শেষে ১৩১০ ভাদ্র বা আশ্বিনে তাহার মৃত্যু—কবিমনকে পারিবারিক উৎসব-ব্যসনের চিরাভ্যস্ত চক্রপথে অসহায়ভাবে ঘুরাইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে এক পত্নীবিয়োগশোক ছাড়া আর কোন ঘটনাই তাঁহার কাব্য-আত্মায় কোন কলঙ্কমলিন স্পর্শ সঞ্চার করে নাই। আর পত্নীশোকও তাঁহার চিত্তনির্লিপ্ততার প্রসাদে উচ্চতর ভাবলোকে উদ্বর্তিত হইয়া সমস্ত আবিলতার চিহ্নমুক্ত হইয়াছে। মৃত্যুকে অনন্তের পটভূমিকায় দেখা তাঁহার পক্ষে এত স্বভাবসিদ্ধ হইয়াছিল যে তাঁহার নিজের শোককেও তিনি অতি সহজভাবে তাঁহার অধ্যাত্ম প্রত্যয়ের অঙ্গীভূত করিয়াছেন। এই শোকপ্রকাশের মধ্যে কোথাও অসংবরণীয় আবেগের উত্তাপ নাই, প্রাণের কোন সান্ত্বনাহীন হাহাকার নাই, মর্মান্তিক দুঃখের কোন অবারিত উচ্ছ্বাস কবির আকুলতাকে পাঠকমনে সংক্রামিত করে

না। সবই প্রশান্ত, সংবৃত, অন্তরের গভীরে নিঃশব্দে গৃহীত ও রূপান্তরিত, বিশ্ববিধানের সহিত সমঞ্জসীকৃত। মনে হয় যে নিজ স্ত্রীর মৃত্যুতে কবির যে চিত্তচাঞ্চল্য, তাহা অপেক্ষা তাঁহার 'বলাকা'-র 'তাজমহল' কবিতাটি আরও ঘাতপ্রতিঘাতময় ও গতিবেগে দ্রুতসঞ্চারী। কারণ এই প্রস্তরীভূত শোকের পিছনে নূতন চিন্তার অঙ্কুশ কবিমনকে উত্তেজিত করিয়া উহাকে এক অজ্ঞাত পথযাত্রার আবেগে উদ্দাম করিয়াছে। কবির ব্যক্তিগত শোকে তাঁহার সমস্ত উদ্‌গত অশ্রুধারাকে গ্রহণ ও গ্রাস করিবার জন্য তাঁহার দীর্ঘ-অনুশীলিত জীবনদর্শন প্রস্তুত হইয়াই ছিল। পূর্ব-নির্ধারিত প্রণালীতে প্রবহমান অশ্রুনির্ঝর নিস্তরঙ্গ শান্তিপারাবারের বুকে আশ্রয় লাভ করিয়া শুব্ধ হইয়াছে।

স্মরণের ২৭টি কবিতার মধ্য দিয়া কবির শোকাহত চিত্তের প্রাথমিক বেদনাবোধ; উহার ক্ষতে শান্তিপ্রলেপপ্রয়োগ, বিশ্বসৌন্দর্যের মধ্যে উহার স্মৃতির নিগূঢ় রূপান্তরণ ও শেষ পযন্ত পুনঃপ্রবুদ্ধ জীবনানুরাগের মধ্যে উহার উত্তরণের স্তরগুলি বিন্যস্ত হইয়াছে। দুই মাসের কালসীমার মধ্যে একটি বৃহৎ শোকের অধ্যাত্মীকরণ সম্পন্ন হওয়া কবিমনের আশ্চর্য স্থিতিস্থাপকতার নিদর্শন। তাঁহার দার্শনিক তত্ত্ব যে কেবল কবিসুলভ ভাববিলাস নয়, ইহা যে তাঁহার অস্থিমজ্জাগত সংস্কার ও তাঁহার জীবনচর্যার আশ্রয়ভূমি তাহা তাঁহার এই আচরণে নিসংশয়রূপে প্রতিষ্ঠিত।

কাব্যটির প্রথম সাতটি কবিতার মধ্যে প্রিয়জন হারানোর প্রথম ব্যাকুলতা, শোকাভিভূত চিত্তের আত্মসমীক্ষালব্ধ অপরাধবোধ পূর্বস্মৃতিপর্যালোচনার অশান্ত বৃত্তে উদ্‌ভ্রান্তিচক্রে আবর্তিত হইয়াছে। মনে হয় যে বিচ্ছেদাকুল মনের অব্যবহিত প্রতিক্রিয়া ইহাদের মধ্যে ভাষারূপ পাইয়াছে। মৃত্যু-পথযাত্রী প্রিয়জনের সেবা-শুশ্রূষার নিষ্ফল শ্রম, উদ্বেগকাতর রাত্রিজাগরণের দুর্ভর ক্লান্তি কবির চক্ষুতে এখনও ঘোরের মত লাগিয়া আছে। এই উদ্‌ভ্রান্ত মন লইয়া কবি জগতের আলোক ও সঙ্গীত তাঁহার চক্ষুর আড়াল করিবার জন্য ভগবানের নিকট আবেদন জানাইতেছেন। এ মনোভাব কবির পক্ষে সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত—তথাপি আঘাতের ঠিক পর মুহূর্তেই এইরূপ প্রার্থনাই তাঁহার অন্তঃকরণ হইতে স্বতঃই উত্থিত হইতেছে। তাহার ঠিক পরেই কবি তাঁহার সমস্ত ত্রুটি-অনবধানতার জন্য, তাঁহার সমস্ত কর্তব্যচ্যুতির জন্য অপ্রাপনীয়া মৃতা স্ত্রীর পরিবর্তে ভগবানের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছেন—অকৃতার্থ প্রেম পূজাতে রূপান্তরিত হইতেছে।

স্ত্রীর মৃত্যু তাঁহাকে নিজের মৃত্যুর কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে ও উভয় ঘটনার মধ্যে ব্যবধান দাম্পত্য প্রেমের স্মৃতিরোমন্থনে পূর্ণ করিবার নির্দেশ তাঁহার পরলোকগতা স্ত্রীর নিকট হইতেই আসিতেছে। কবি ইতিমধ্যেই সহসা মরণের শ্বাসরোধকারী পরিবেশ হইতে দূর ভবিষ্যতের মৃত্যুসম্ভাবনার উদারতর পরিসরে মুক্তি খুঁজিতেছেন।

কবিজায়ার গৃহহীন শেষযাত্রা কবির মনে শূন্যতাবোধ জাগাইয়া তাঁহাকে স্মৃতিচর্চায় নিয়োজিত করিতেছে। এই কবিতাটিতে ও ৭নং ও ১০নং কবিতায় কিছু ব্যক্তিগত উল্লেখ অনুভব করা যায়। কিন্তু ৫ ও ৬ সংখ্যক পদে ঘরের অভাব বাহিরে পূর্ণ করিবার আকৃতি, গৃহলক্ষ্মীর বিশ্বলক্ষ্মীতে উদ্বর্তন কবির বিয়োগবিধুর চিত্তে সান্ত্বনার আশ্বাস বহন করিয়া আনিতেছে। কবি ইতিমধ্যেই ব্যক্তিগত আঘাতকে বিশ্বজনীন বিস্তার দেওয়ার মধ্যে সান্ত্বনার উপায় অন্বেষণ করিতেছেন। দুর্বার শোকের এই অনায়াস বশীকরণ, উষ্ণ আবেগের মধ্যে এই বিশ্ববোধের শীতল বায়ুসঞ্চার, সুখদুঃখ-অনুভূতিময় এই হৃদয়বিহ্বলতাকে দার্শনিকতার হিমঘরে স্থানান্তরিত করার এই ত্বরিত আয়োজন যেমন একদিকে কবিমানসের অতিমানবিকতার প্রতি আমাদের বিস্ময়মিশ্রিত শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে, তেমনি অপরদিকে একটা গূঢ় অতৃপ্তিতে যে পীড়িত না করে তাহাও নয়। কবিকে আমরা সব সময় দার্শনিক বর্মাবৃত অবস্থায় দেখিব, কখনও তাঁহাকে খোলা গায়ে ও হঠাৎ-চমকের চকিত আলোকে দেখিব না ইহাতে আমরা সম্পূর্ণ স্বস্তি অনুভব করিতে পারি না। কবির মত আমরাও খানিকটা অসহিষ্ণুভাবে প্রশ্ন করি—'এখানেও তুমি, জীবনদেবতা'!

১১ হইতে ১৩নং পদ পর্যন্ত এই রূপান্তরসাধনের প্রক্রিয়া চলিয়াছে। ইহাদের মধ্যে ব্যক্তিপরিচয়ের স্পর্শ কাব্যসৌন্দর্যের প্রসাধনে ও দার্শনিক সান্ত্বনার গাঢ় প্রলেপে ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়াছে। কবিজায়া পার্থিব জীবনের সমস্ত বিশেষলক্ষণমুক্ত হইয়া নির্বিশেষ জ্যোতির্ময় আত্মারূপে প্রতিভাত হইয়াছেন। আমরা যদি কাব্যটির করুণ ইতিহাস না জানিতাম তাহা হইলে তিনি রবীন্দ্রকাব্যের যে কোন কল্পনামূল নায়িকার সহিত অভিন্ন বলিয়া গৃহীত হইতেন। সুরদাসের রাণীর প্রতি স্তব বা চিত্রাঙ্গদা সম্বন্ধে অর্জুনের রূপমুগ্ধ উচ্ছ্বাসের সহিত একান্ত ঘরোয়া প্রেমের শতস্মৃতিচিহ্নিতা, দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার

রেখাজালে চিত্রিতা এই রক্তমাংসময়ী প্রতিমার প্রতি নিবেদিত অর্ঘ্যের কোন পার্থক্য দেখা যায় না। অর্থাৎ কবির উক্তিগুলিকে কাব্য হিসাবে বিচার করিতে হইবে, হৃদয়ভাবের অকৃত্রিম অভিব্যক্তিরূপে নয়। ইহাদের ইতিহাস সৌন্দর্যশিল্পকেন্দ্রিক, অন্তরঙ্গ জীবনরসনির্যাসের পরিচয়রূপে নয়।

১৪নং কবিতায় খানকয়েক পুরাতন চিঠির সঞ্চয় বাস্তব গৃহজীবনের ইঙ্গিত দিয়াছে, কিন্তু কবির সিদ্ধান্তটি গার্হস্থ্যরসবিকাশের অনুকূল হয় নাই। তাঁহার শেষ প্রশ্ন—পত্নী যেমন অমূল্য সঞ্চয়বোধে এই কালজীর্ণ পত্রগুলিকে রক্ষা করিয়াছিলেন, আর কেহ কি সেই মৃতার স্মৃতিকে সেইরূপ সযত্নে রক্ষা করিবে—তাঁহার ঈশ্বরনির্ভরতার প্রমাণ হইতে পারে, তাঁহার ব্যথাতুর, স্মৃতিবিভোর চিত্তের কোন সন্ধান দেয় না।

১৫ ও ১৬ সংখ্যক পদে কবির অসীম-চেতনা তাঁহার শোকের প্রত্যক্ষ নিবিড়তার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ধীরে ধীরে উহার রূপান্তরসাধন ও উহাকে বিশ্বজীবনছন্দে গ্রথিত করিয়া এক নৈর্ব্যক্তিক নিখিলব্যাপ্ত সত্তার অংশরূপে প্রতিভাত করিতেছে। তাঁহাদের দাম্পত্য মিলন যে আকস্মিক সংঘটন মাত্র নয়, উহা বিশ্ববিধানের অমোঘ নির্দেশ এবং উভয়ের মিলিত জীবন যে নিগূঢ় সৃষ্টিকে অসমাপ্ত রাখিয়া যাত্রা শেষ করিয়াছে তাহা যে পরিপূর্ণতার জন্য নেপথ্যান্তরালে প্রতীক্ষমান এই দৃঢ় প্রত্যয় কবির শোকসংবেগকে বর্তমান হইতে ফিরাইয়া অনাগত ভবিষ্যতের লক্ষ্যাভিমুখী করিয়াছে। এই দিক্-পরিবর্তনে শুধু সান্ত্বনা নাই, নব সৃষ্টির ইঙ্গিতও আছে। ১৪নং পদে যে প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল, ১৬নং পদে তাহার নিঃসংশয় উত্তর মিলিয়াছে। পুরাতন পত্রগুলিরই ভাব-মাধুর্য শুধু রক্ষিত হয় নাই, সমস্ত মর্ত্যজীবনের প্রণয়োচ্ছ্বাস প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য ও নিবিড় আবেশের মধ্যে উহার প্রাণরসকে গাঢ়তর বর্ণ-প্রলেপে ও উদারতর বিস্তৃতিতে চিরসঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে।

৪

২৭ সংখ্যক পদে কবিজায়ার মর্ত্যপ্রীতি প্রকৃতির পরিবর্তনশীল রূপরেখা ও ভাবোদ্দীপনের মধ্যে নিজ মুগ্ধতার স্মৃতিচিহ্ন বিকীর্ণ করিয়া প্রকৃতিরস-পিপাসু কবি-সত্তার সহিত এক যৌগিক উপভোগের একাত্মতা লাভ করিয়াছে। মুগ্ধদৃষ্টির ঐক্যসূত্রে শীতমধ্যাহ্নের উদাস প্রান্তরে, শিরীষবনের

আলোছায়ার মর্মর-কম্পনে কবি ও কবিজায়া যেন একপাত্রে সৌন্দর্যরস পান করিতেছেন। এই অনুভূতি হইতেই কবির মৃত পত্নী যাহাতে কবির জীবনেই বাঁচিয়া থাকেন এই একান্ত আকূতি কবি-হৃদয়ে উৎসারিত হইয়াছে ও ১৭ সংখ্যক পদে ইহারই পরিণতি তাঁহাকে শোকবর্জন ও নবোদ্ভিন্ন জীবনমমতাপোষণে প্রণোদিত করিয়াছে।

১৭ সংখ্যক পদ হইতে শোকের স্তব্ধ অসাড়তা শেষ হইয়া এক নূতন আশা ও আনন্দের সুর বাজিয়াছে। কবিজায়া তাঁহার বিপ্রলব্ধ-স্বামীর শোকাড়ম্বরকে কৌতুকহাসির দ্বারা বিদ্ধ করিয়া উহার অন্তঃসারশূন্যতার প্রতি কটাক্ষ হানিয়াছেন। বজ্র যেমন বর্ষণের স্নিগ্ধতায় উহার রুদ্র রোষকে ব্যঙ্গ করে, তেমনি কবিজায়া কবির বিরহবেদনা যে চিরমিলনেরই প্রতিষ্ঠাভূমি এই সত্য-উপলব্ধিতে তাঁহার শোকাচ্ছন্নতার প্রতি সকৌতুক পরিহাস করিতেছেন। বিচ্ছেদকাতরতার অশ্রুবিন্দুগুলি প্রেয়সীর সীমন্তে মুক্তাপাটিবিন্যাসের মতই শোভা পাইতেছে। কবিজীবনে পরলোকগতা প্রিয়া যে তাঁহার আরও আপনার হইয়াছেন, মৃত্যুর দ্বারা তিনি যে কবিসত্তার অবিভাজ্য অংশে রূপান্তরিত হইয়াছেন এই প্রত্যয়পুষ্ট কবি শোককে প্রকাশ্যভাবে পরিহার করিয়াছেন। ৭ই অগ্রহায়ণ যাঁহার মৃত্যুদিবস, ৬ই পৌষ তাঁহার নবজীবনে অভিষেক। স্থির দার্শনিক প্রত্যয় এক মাসের মধ্যেই কবির সমস্ত চিত্ত-বিভ্রান্তি দূর করিয়া তাঁহাব অন্তররাজ্যে শোকের আধিপত্যলোপ ঘোষণা করিল। আর কোন কবির ক্ষেত্রে শোকের এত ত্বরিত রূপান্তর ঘটার নিদর্শন মিলে না।

১৮, ২১, ২২, ২৩, ২৪ ও ২৬ সংখ্যক পদে কবি তাঁহার মৃত পত্নীর অদৃশ্য আত্মিক প্রভাবে তাঁহার নিজ জীবনকে পূর্ণতর করিবার আবেদন জানাইয়াছেন। দ্রষ্টব্য এই যে এই সমস্ত পদে কবির ভাবদৃষ্টি মৃত হইতে জীবিতের দিকে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছে। কবিপত্নীর যে অংশ মরণশীল তাহার সহিত কবির সম্পর্ক শেষ হইয়াছে। যে আত্মিক সত্তা মরণের উপর জয়ী হইয়া কবিজীবনে নিগূঢ় প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, কবির সমস্ত ঔৎসুক্য তাহারই উপর কেন্দ্রীভূত। গৃহশ্রীরচনায় অভ্যস্ত নৈপুণ্য কবির অন্তর-শ্রীসম্পাদনে নিয়োজিত হউক, কবিজীবন হইতে সমস্ত কলঙ্কচিহ্ন মুছিয়া ফেলিয়া উহাকে ভগবৎ-সাধনার উপযোগী অম্লান বিশুদ্ধি দান করুক ও পূজাসনে উভয়ের মিলিত সত্তা একীভূত হউক ইহাই কবির প্রার্থনা।

২১ নং পদে কবির প্রার্থনা একটি সর্বজনীন স্তোত্রের স্বল্পাক্ষর, উদাত্ত মহিমায় সংহত হইয়াছে। কবি পরলোকগতা সহধর্মিণীর নিকট যে দিব্য প্রেম আকাঙ্ক্ষা করেন, তাহা সন্ধ্যার শান্তির মত দিবসের সমস্ত চিত্তবিক্ষেপ-কারী কর্মজালকে সংহরণ করে, চিত্তের উন্মত্ত, উত্তাল ভাবরাশিকে একখানি গানের মধ্যে পূর্ণতা দেয়। ইহা কঙ্কণের স্বর্ণাভার মত দিনান্তকে রমণীয় করিয়া নিদ্রার মধ্যে সোনার স্বপনের অপার্থিব মাধুর্য উদ্দীপন করিবে ও সায়াহ্নআকাশের বর্ণরাগ চরণের অলক্তকরক্তিমায় বিধৃত হইবে। কবির সমস্ত জীবন যেন এক অদৃশ্য প্রভাবে মৃত্যুর পরিণত রূপ গ্রহণ করে ইহাই কবির কামনা। ২৩ সংখ্যক পদে প্রেমের সর্বাতিশায়ী, সর্বসমন্বয়ী শক্তির মহিমা ঘোষিত। ২৪ সংখ্যক পদেও মৃত্যু যেন গোধূলি-অন্ধকারের মত জীবনের সমস্ত খণ্ডতা-অপূর্ণতার উপর একটি অখণ্ড ঐক্য, একটি অক্লান্ত আনন্দ, মিলনদীপের অকম্পিত শিখার একটি ধ্রুব আলোকসম্পাত আনয়ন করে, পরিপূর্ণ বৃত্তের একটি স্নিগ্ধ বেষ্টনীতে উহার সমস্ত ভাঙ্গাচোরা তির্যক রেখাগুলিকে সুবিন্যস্ত করে, কবি তাঁহার মৃতা স্ত্রীর নিকট তাহাই চাহিয়াছেন। ২৬নং পদে একই ভাবপটভূমিকায় গীতিসুরের পুনরাবির্ভাব শোকমুক্তির আনন্দের বহিঃপ্রকাশ।

এই আত্মশুদ্ধিপ্রক্রিয়ার শীর্ষবিন্দু ২২ সংখ্যক পদটি উহার চরম তাৎপর্যটুকু নিষ্কাশিত ও সংহত করিয়াছে। প্রতি দাম্পত্য জীবন বিশ্বস্রষ্টার আনন্দলীলার একটি আংশিক অভিব্যক্তি ও বিশ্বব্যাপী আনন্দ-ময়তার সহিত একই ছন্দে গ্রথিত। ভগবানের যে আত্মরতি এক হইতে দুই ও দুই হইতে বহুতে সম্প্রসারণের মধ্যে নিহিত, দাম্পত্য প্রেম তাহারই একটি মানবিক প্রকাশ। কবিপ্রিয়া শেষ পর্যন্ত তাহার লৌকিক ও অধ্যাত্ম জীবনের সমস্ত স্তরগুলি অতিক্রম করিয়া এই শাশ্বত রহস্যের কিঞ্চিৎ আভাসরূপে, নিখিল সৃষ্টিআনন্দতত্ত্বের ক্ষণিক উদ্ভাসনরূপে কবিচত্তে তাঁহার শেষ পরিচয়টি মুদ্রিত করিয়াছেন। মৃত্যুশোকতমিস্রায় এই লীলা-রহস্যদ্যোতনা এক দিব্য জ্যোতিতে আত্মঘোষণা করিয়াছে।

১৯ ও ২০ সংখ্যক পদে শোকাচ্ছন্ন কবিচিত্তে বসন্তের মদির আমন্ত্রণের পুনঃপ্রবেশ বর্ণিত হইয়াছে। কবির দাম্পত্য জীবনে বসন্ত বহুদিন উপেক্ষিত ও অভিনন্দনহীন হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে। প্রেম বাঁচিয়া থাকিতে প্রণয়দূত সব সময় যথাযোগ্য অভ্যর্থনা পায় নাই। কবির প্রিয়াহীন ভবনে

আজ বসন্তের অবাধ প্রবেশাধিকার। রাজার অবর্তমানে তাঁহার অনুচর-বাহিত ছত্র-চামর আজ রাজকীয় মর্যাদার উত্তরাধিকারীরূপে নিজ অধিকার-ঘোষণায় কুণ্ঠাহীন। ২০ সংখ্যক কবিতায় বসন্ত বায়ু আজ কবির খোলা বাতায়নে মাতামাতি করিয়া কবির চিত্তকে দোলা দিতেছে, তাঁহার অতীতের হাসি ও কান্নাকে গৃহের বদ্ধ বায়ু হইতে মুক্তি দিয়া বসন্তের নব-প্রস্ফুটিত কুসুমে নূতন জীবনে বিকশিত করিতেছে। মরণের দ্বারে নবজীবনের যে লীলাময় করাঘাত তাহা কবির মৃত্যু-অসাড় প্রাণে নবচেতনার সঞ্চার করিবে।। ২৫ সংখ্যক কবিতাটি কাব্যগুণে বিশেষ সমৃদ্ধ নয় কিন্তু কবির চিত্তজাগরণের ইতিহাসে ইহা নূতন আশায় উৎফুল্ল, নূতন গতিবেগে চঞ্চল ও নবদিগন্ত-অন্বেষণে উৎসুক। ইহা পালতোলা নৌকার রূপকে কবির চিরাভ্যস্ত জীবন-যাত্রার অবিরাম অগ্রগতির প্রতিশ্রুতি। শোকের বন্দরে স্তব্ধ প্রতীক্ষার কালশেষে কবি আবার জীবনস্রোতে তাঁহার নৌকা ভাসাইলেন—এই বার্তাতেই কবির অতীতমুখী জীবন আবার ভবিষ্যতের অনির্দিষ্ট ও অজ্ঞাত লক্ষ্যাভিমুখী হইল।

'স্মরণ' কাব্যগ্রন্থখানি কবিমানসের অসাধারণত্বের এক আশ্চর্য নিদর্শন। ব্যক্তিজীবনের চরম পারিবারিক দুর্ঘটনাও যে তাঁহার চিত্তের চিরাভ্যস্ত ভারসাম্য বিচলিত করে নাই ইহাতে তাহারই অখণ্ডনীয় প্রমাণ নিহিত। কবিমনের নৈর্ব্যক্তিকতা ও ব্যক্তিসত্তার অবদমন বিষয়ে কোন কোন পাশ্চাত্ত্য কবি ও সমালোচকের যে অভিমত তাহাই এখানে অভাবনীয়রূপে উদাহৃত। বিশ্বজীবনের সহিত একাত্মতা লাভ করিতে হইলে ব্যক্তিগত ভাবজীবনের প্রবলতা কিছু পরিমাণে বিসর্জন দিতে হইবে। নিখিলের প্রাণতরঙ্গকে ব্যক্তি-আত্মার গভীরে অবাধ প্রবেশাধিকার দিলে সেই স্রোতে আত্মজীবনের আংশিক নিমজ্জন অবশ্যম্ভাবী মনে হয়। আত্মকেন্দ্রিক জীবনযাত্রাকে বিশ্বকেন্দ্রিক করিতে হইলে অহং-জীবনের সঙ্কোচ উহার একটি অপরিহার্য সর্ত। কাজেই কবিসত্তার স্বভাবমুক্ত প্রকৃতি ও রবীন্দ্রনাথের বিশেষ জীবনদর্শন উভয়ের সম্মিলিত প্রভাব তাঁহার শোকের তীব্রতা হ্রাস ও রূপান্তরে সহায়তা করিয়াছে। তিনি সহজেই দুঃখের ঘন সম্মোহ ভেদ করিয়া তাঁহার ব্যক্তিগত আবেগের স্রোতস্বতীকে নিখিল প্রাণসমুদ্রের বৃহত্তর আধারে বিলীন করিয়া দিয়াছেন। শেলি ও টেনিসন তাঁহাদের শোকগাথায় যে হৃদয়চাঞ্চল্যকে অতিসচেতন দার্শনিক সান্ত্বনায় স্তব্ধ

করিয়াছেন ও দীর্ঘকালের ভাবরোমন্থন-প্রক্রিয়ায় প্রশান্ত আনন্দে পরিণত করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ তাহা এক মাসের মধ্যেই সাধন করিয়া তাঁহার চিত্তগঠনের অনন্যতার প্রমাণ দিয়াছেন। কবির বহির্জীবনে যে কবির অন্তরস্বরূপকে ধরাছোঁয়া যায় না, যে মানুষটিকে মরজীবনের আধি-ব্যাধি, শোক-দুঃখ, স্তুতিনিন্দা বেতসপত্রের ন্যায় কাঁপায় তিনি যে কাব্যজগতে সমস্ত ক্ষণদুর্বলতার অতীতরূপে, বিশ্ববিধানের স্থির, অকম্পিত প্রত্যয়ে শক্তিমান্ হইয়া বিশুদ্ধ আনন্দময় সত্তার অংশরূপে প্রতীয়মান হন—এই তত্ত্ব প্রত্যক্ষ, পরীক্ষিত সত্যরূপে 'স্মরণ'-এর কবিতাগুচ্ছে রূপ ধারণ করিয়াছে।

সপ্তম অধ্যায়

উৎসর্গ

১

'উৎসর্গ' কাব্যটিতে অন্তর্ভুক্ত কবিতাসমূহের ভাবগত যোগসূত্র সম্বন্ধে পূর্ববর্তী সমালোচকদের ধারণা অনেকটা অস্পষ্ট ছিল। সুতরাং তাঁহারা স্বভাবতই এই কাব্যটিকে কেন্দ্রবিন্দুহীন, যদৃচ্ছারচিত কবিতাসমষ্টিরূপেই নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু সম্প্রতি রবীন্দ্রজীবনীকার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ইহার অন্তর্নিহিত অভিপ্রায়টির উপর যে আলোকপাত করিয়াছেন তাহাতে উহার পরিকল্পনাগত ঐক্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে ও উহার গ্রন্থন-তাৎপর্য পরিস্ফুট হইয়াছে। প্রভাতকুমারের বিবরণী হইতে জানা যায় যে মোহিতচন্দ্র সেন যখন রবীন্দ্রকাব্যের ভাবতাৎপর্যমূলক নব-শ্রেণী-বিন্যাসে নিযুক্ত ছিলেন তখন কবি ইহাতে বিশেষ উৎসাহ দেখাইয়াছিলেন। মোহিতচন্দ্রের অনুরোধে তিনি তাঁহার বিভিন্নজাতীয় কবিতাবলীর ভাবপ্রেরণা-পরিচিতিস্বরূপ প্রত্যেকটি শ্রেণীর ভূমিকারূপে এক একটি প্রবেশক কবিতা রচনা করেন। এই প্রবেশক কবিতাগুলিই শেষ পর্যন্ত 'উৎসর্গ'-কাব্যে সঙ্কলিত হইয়া পরবর্তী ও পূর্ববর্তীকালের কিছু সংযোজনার সহিত একত্রিত হইয়া রবীন্দ্রকাব্যের মূল তত্ত্বগুলিকে সূত্রাকারে নির্দেশ করিয়াছে।

এই তথ্যের আলোকে কবিতাগুলি পাঠ করিলে উহাদের বিষয় ও রচনারীতির বৈচিত্র্য এক মূল-উদ্দেশ্যগ্রথিতরূপে প্রতিভাত হয় ও ইহাদের মধ্যে কবির একটি সূক্ষ্ম অনুভব ও আত্মোপলব্ধির পরিচয় পরিস্ফুট হইয়া উঠে। ইহা স্বাভাবিক যে কবি যখন রচনাকার্যে ব্যাপৃত থাকেন তখন সদ্যোপ্রেরণার আবেশ তাঁহার সমস্ত চিত্তকে অধিকার করে এবং তাঁহার কবিমনের পরিণতির স্তর সম্বন্ধে তিনি বিশেষ সচেতন থাকেন না। পরে যখন বহু বর্ষের ব্যবধানে তিনি তাঁহার কাব্য-অতীতকে পশ্চাৎদৃষ্টির সাহায্যে সমগ্রভাবে পর্যবেক্ষণ করেন, তখনই তাহাদের স্বরবদল ও গোপন পরিবর্তনসূত্রটি তাঁহার নিকট সুস্পষ্ট রেখায় অঙ্কিত হয়। বিশেষতঃ যে কবি জীবনদেবতা- ও অন্তর্যামী-তত্ত্বে একান্ত প্রত্যয়শীল তাঁহার মনে

কেন্দ্রশাসনের ধারণাটি কিঞ্চিৎ বিলম্বে আত্মপ্রকাশ করে। যে সমস্ত কবিতাকে রচনাকালে তাৎক্ষণিক-অনুভূতিসঞ্জাত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ বলিয়া মনে হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে পরে অভিপ্রায়গত তারতম্য ও শ্রেণীবিন্যাস-ক্রম ধীরে ধীরে চেতনাস্তরে উত্থিত হয়। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও এই সময় ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে। তিনি সচেতনভাবে নিজ কাব্যবিবর্তনধারাটিকে অনুসরণ ও উদ্‌ঘাটিত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। যাহা পরস্পরবিচ্ছিন্ন ফুলরূপে তাঁহার কাব্য-উপবনে ফুটিয়াছিল তাহাই পরে মাল্যগ্রথিত হইয়া বিভিন্ন স্তবকে সন্নিবিষ্ট হইল। কবি নিজ কাব্যমালঞ্চে শুধু ফুল ফুটাইয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, তিনি মালাকরের ভূমিকাতেও অবতীর্ণ হইলেন।

কিন্তু যাহা আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে তাহা হইল কবির আত্মকাব্যসমীক্ষার গভীরতা ও প্রত্যেক শ্রেণীর কবিতার মর্মবাণীসঙ্কেতের অভ্রান্ত নির্দেশ। তিনি তাঁহার সংক্ষিপ্ত ও ব্যঞ্জনাধর্মী কবিতার মাধ্যমে তাঁহার এক এক রকমের ভাবপ্রেরণাসঞ্জাত কাব্যের যে নিগূঢ় মর্মানুভূতি, তাহাদের জীবনকোষনিঃসৃত আত্মিক সৌরভটি আমাদের অনুভবগম্য করিয়াছেন তাহা কাব্যশিল্প ও কবিচেতনার রহস্যদ্যোতনা এই উভয় দিক দিয়াই অপূর্ব। অবশ্য কালানুক্রমিক যাথার্থ্যের দিক দিয়া হয়ত ইহারা কবিমনের তৎকালীন প্রতিচ্ছবির নিখুঁত বিবৃতিরূপে স্বীকৃত হইতে পারে না। পরবর্তী কালের পরিণত উপলব্ধির কিছু সূক্ষ্মতর ব্যঞ্জনা ইহাদের সহিত অনিবার্যভাবে মিশিয়াছে। 'সন্ধ্যাসংগীত'-এ হৃদয়-অরণ্য ও 'প্রভাতসংগীত'-এ নিষ্ক্রমণ কবি-অনুভূতিতে যে ভাবানুষঙ্গ ও রূপকল্পকে আশ্রয় করিয়া অভিব্যক্ত হইয়াছিল, যে গোধূলি-অস্পষ্টতায় ও তরুণমনসুলভ অতি-উচ্ছ্বসিত মুক্তি-উল্লাসে আত্মঘোষণা করিয়াছিল তাহা যুগান্তরের স্মৃতিচারণায় আরও নিগূঢ়তাৎপর্যময় হইয়া, বস্তু-অতীত সাঙ্কেতিকতার রহস্যচ্ছটায় আরও মায়াময় হইয়া উঠিয়াছে। ইতিমধ্যে তরুণ কবির অভিজ্ঞতা-পরিধি আরও অনেক প্রসারিত হইয়াছে। তিনি আরও বিচিত্র অরণ্যপথে দিশাহারা হইয়াছেন ও নিষ্ক্রমণের নব নব পন্থা তাঁহার নিকট উন্মুক্ত হইয়াছে। বিশেষতঃ তিনি পার্থিব ও অপার্থিব প্রেমের গোলোকধাঁধায় উদ্‌ভ্রান্ত পদচারণা করিয়াছেন। কবিপ্রকৃতির অতিলৌকিক রহস্য তাঁহার মনে নানা ব্যাকুল আবেগ, সংশয়-প্রত্যয়ের দোলা জাগাইয়াছে, প্রকৃতিসৌন্দর্য ও ভগবৎপ্রেম তাঁহাকে অহরহ নূতন দিগন্তের সন্ধান ও নব পথ-অন্বেষণের

প্রেরণা দিয়াছে। সুতরাং 'উৎসর্গ-রচনার সময় যে কবি তাঁহার পূর্বতন কবিতার ভূমিকা রচনা করিয়াছেন, তিনি তাঁহার অতীত কাব্যকৃতির প্রতি পরবর্তী অভিজ্ঞতায় অর্জিত এক অভিনব দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োগ করিয়াছেন। জীবনদেবতার যে প্রচ্ছন্ন, ক্রমোদ্ভিন্ন অভিপ্রায় তাঁহার কাব্যজীবনের সূচনা হইতেই তাঁহার অবচেতন মনে উন্মোচন-প্রতীক্ষায় ছিল তাহারই সুস্পষ্টতর অভিব্যক্তির আলোকে তিনি তাঁহার অতীত রচনাকে নিরীক্ষণ করিয়াছেন। বীজরোপণকারী ব্যক্তি যদি শাখাপ্রশাখাসমৃদ্ধ, পত্রপল্লবে নিবিড় ও বনস্পতির প্রতিশ্রুতিবাহী তরুণ বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া তাঁহার প্রথম সৃষ্টিমুহূর্তের কথা স্মরণ করে তবে তাহা তাহার মুগ্ধ, বিস্মিত দৃষ্টির নিকট যে নূতন ব্যঞ্জনায় প্রতিভাত হয়, 'উৎসর্গ'-এর কবির নিকট 'সন্ধ্যাসংগীত' ও 'প্রভাতসংগীত' সেই অন্তর্গূঢ় তাৎপর্যের বিস্ময়ের প্রকটিত হইয়াছে।

আধুনিক সমালোচকের নিকট কবি ও তাঁহার সম্পাদক-অনুমোদিত শ্রেণীবিভাগ কোন কোন দিক থেকে সম্পূর্ণ গ্রহণীয় বলিয়া মনে হইবে না। ইহার কবিতাগুলি রচনার সময় কবি ও সম্পাদকের নিকট যেরূপ শ্রেণীবিভাগ সঙ্গত মনে হইয়াছিল, এখন কবির কাব্যজীবন-সমাপ্তির পর ও তাঁহার সামগ্রিক কাব্য-পরিক্রমার ফলস্বরূপ তাহার এক-আধটু পরিবর্তন সমীচীন বিবেচিত হইবে। মোহিতচন্দ্র সেন রবীন্দ্রনাথের অনুমোদন-সমর্থিত হইয়া কাব্যটির কয়েকটি পর্যায়-বিভাগ অবলম্বন করিয়াছিলেন। (১) যাত্রা, (২) হৃদয়ারণ্য, (৩) নিষ্ক্রমণ, (৪) বিশ্ব, (৫) সোনার তরী, (৬) লোকালয়, (৭) নারী, (৮) কল্পনা, (৯) লীলা, (১০) কৌতুক, (১১) যৌবনস্বপ্ন, (১২) প্রেম, (১৩) কবিকথা, (১৪) প্রকৃতিগাথা, (১৫) হতভাগ্য, (১৬) সংকল্প, স্বদেশ (১৭), রূপক (১৮), কাহিনী (১৯), কথা (২০), কণিকা (২১), মরণ (২২), নৈবেদ্য (২৩), জীবনদেবতা (২৪), স্মরণ (২৫), শিশু (২৬), গান (২৭), নাট্য (২৮)। এই শ্রেণীগুলির মধ্যে অনেকগুলি স্বতন্ত্র কাব্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। তাহারা রবীন্দ্ররচনাবলীতে বিধৃত ও 'উৎসর্গ' নামে সংজ্ঞিত কাব্যের সীমাবহির্ভূত। সুতরাং এই শ্রেণীগুলি 'উৎসর্গ' কাব্যের আলোচনায় অপ্রাসঙ্গিক হিসাবে বর্জনীয়। মোহিতচন্দ্রের সম্পাদনায় রবীন্দ্রকাব্যগ্রন্থ ১৩১০ সালে প্রকাশিত ও 'উৎসর্গ' স্বতন্ত্র কাব্যরূপে ১৩২১ সালে (ইংরাজি ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে) প্রকাশিত হয়।

অবলম্বিত শ্রেণীবিন্যাসের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে কিছু আলোচনার অবসর আছে। প্রথমতঃ মোহিতচন্দ্র সৃজ্যমান ও অসম্পূর্ণ রবীন্দ্রকাব্যের যে বিষয়-বৈচিত্র্য ও রীতিবৈশিষ্ট্যের আধিক্য লক্ষ্য করিয়াছিলেন তাঁহার সম্পূর্ণ কাব্যবৃত্ত প্রদক্ষিণ করিলে মনে হয় যে উহার অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা কয়েকটি মূলধারার সহিত মিশিয়া গিয়াছে। 'যাত্রা' রবীন্দ্রকাব্যে একটি বহুধা পুনরাবৃত্ত সুর ও বিবিধ-প্রেরণাচালিত। ইহা কখনও বা জীবনদেবতার স্বরূপ-অন্বেষণে অন্তরাকৃতির রূপক, কখনও বা পদ্মায় ঘোর প্রমত্ত গতিবেগের কাব্যপ্রকাশ, কখনও বা ভগবদভিমুখী এষণা, কখনও বা সমাজবিপ্লবমুখী তরুণ প্রাণের দুঃসাহসিক হৃদয়োচ্ছ্বাস, কখনও বা পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান-দর্শনের গতিবাদের, এবং উপনিষদের অধ্যাত্ম অগ্রসরণের মাধ্যমে বিশ্ববিধানের তত্ত্বোপলব্ধি। এতগুলি বিভিন্ন মানসসংবেগকে একটি বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়ত তাহাদের স্বরূপসম্বন্ধে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিতে পারে। 'সোনার তরী'র যাত্রা, 'গীতাঞ্জলি'র যাত্রা ও 'বলাকা'র যাত্রা নিশ্চয়ই কাব্য ও তত্ত্ব উভয় দিক দিয়াই একপর্যায়ভুক্ত, কাব্যগুণে সমধর্মী ও কবির মানসপরিণতির অভিন্নস্তর-নির্দেশক নয়। 'হৃদয়ারণ্য' ও 'নিষ্ক্রমণ' সম্বন্ধেও অনুরূপ তাৎপর্যভিন্নতার লক্ষণ সহজেই আবিষ্কার করা যায়। 'হতভাগ্য' ও 'সংকল্প' পর্যায় দুটিও কবির সাময়িক মনোভঙ্গীর সূচক মাত্র, উহাদিগকে কাব্যচেতনার একটা স্থায়ী নির্দেশ বলিয়া উল্লিখিত করা যায় না। 'কল্পনা', 'লীলা' 'কৌতুক' ও হয়ত 'যৌবনস্বপ্ন' একই মনোভাবের বিচিত্র প্রকাশ, ঋতুভেদে ও বিষয়ভেদে একই মানস তরুর ফলফুলের স্বাদে ও গন্ধে পৃথক রসনির্যাস। বিশ্ব ও লোকালয় হয়ত একইরূপ জীবনসত্যের বৃহৎ ও সঙ্কীর্ণ পরিধিতে দ্বিমুখী উপলব্ধি ও 'সোনার তরী' 'কল্পনা', 'যৌবনস্বপ্ন' 'জীবনদেবতা'র সহিত একই স্বপ্নাবেশে মধুর ও একই বর্ণপ্লাবনে অনুরঞ্জিত। 'রূপক' একটা অনুভব ও উপস্থাপনার বিশেষ রীতি, কিন্তু উহার কাব্য-আবেদন কবির উদ্দেশ্য- ও বিষয়নির্বাচনের সঙ্গে সমতা রক্ষা করিয়া নিগূঢ়রূপে ভিন্নধর্মী। রূপকের তির্যক ব্যঞ্জনা বিভিন্ন প্রকার বাস্তব উপাদান ও জীবনসত্যের সহিত মিশ্রিত হইয়া বিচিত্র ভাবপরিমণ্ডলসৃষ্টি ও রসতৃপ্তি-সাধন করে। রূপকথার রূপক, উর্বশীর রূপক ও 'খেয়া-নৈবেদ্যে'র ঈশ্বর-সন্ধানী রূপক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তু ও রূপকের নামাবলী গায়ে জড়াইয়া দিয়া তাহাদের ভাব ও রূপের বৈচিত্র্যকে বিলুপ্ত করা যায় না। সুতরাং মোহিত-

চন্দ্র-সম্পাদিত রবীন্দ্র-কাব্যে যে বিন্যাসক্রম অবলম্বিত হইয়াছে তাহা শুধু কালানুক্রমিক আলোচনার তুলনায় কবির মানসউৎসের অপেক্ষাকৃত অধিক সন্ধান দিলেও তাহা কাব্যের মর্মমূলের অভ্রান্ত সন্ধান দিতে পারে না।

'উৎসর্গ' কাব্যে অন্তর্ভুক্ত কবিতাবলীর নূতন শ্রেণীবিভাগ এই গ্রন্থে অনুসৃত হইল। বিদগ্ধ পাঠকসমাজ ইহার ঔচিত্য বিচার করিবেন।

ভগবৎবিষয়ক—১, ২, ৬, ১১, ১২, ১৪, ১৫, ১৭, ১৮, ৪২, ৪৬, (প্রথম অংশ) ও সংযোজনা-অংশে ১, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭।

জীবনদেবতাবিষয়ক—৩, ৪, ৫, ১৩, ১৫, ৩৯, ৪৬ (দ্বিতীয় অংশ)।

যৌবনব্যাকুল উদ্‌ভ্রান্তিবিষয়ক—৭, ৮, ৯, ১০।

প্রকৃতিবিষয়ক—২৩, ৩৩, ৩৫, ৩৬; সংযোজনা-অংশে ৯ ও ১০।

স্বদেশবিষয়ক—১৬, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০; সংযোজনা-অংশে ১২ ও ১৩।

মরণবিষয়ক—৩১, ৩৭, ৩৮, ৪০, ৪১, ৪৫।

কবিস্বভাববিষয়ক—১৯, ২০, ২১, ২২।

নারীবিষয়ক—৩৪, ৪৩, ৪৪; সংযোজনা-অংশে ২।

'উৎসর্গ'-এর কবিতাগুলির রচনাকাল যতদূর নির্ধারণ করা যায় তাহাতে মনে হয় ইহা ৩রা ফাল্গুন, ১৩০৭ হইতে ১৩১০ পর্যন্ত প্রসারিত। একটি কবিতা ৪৪নং, জোড়াসাঁকোতে ১৫ই মাঘ ১৩০৯ সালে লেখা; অনেকগুলি হাজারিবাগে চৈত্র ১৩০৯এ লেখা; ও একটি গুচ্ছ আলমোড়ায় বৈশাখ ১৩১০ হইতে আষাঢ় ১৩১০-এর মধ্যে রচিত। কবিজীবনী হইতে জানা যায় যে হাজারিবাগ ও আলমোড়াতে কবি ভগ্নস্বাস্থ্য নিজ দ্বিতীয়া কন্যার স্বাস্থ্য-পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে প্রবাসযাত্রা করেন। আশ্চর্য এই যে এই উদ্বেগ ও অস্বস্তি, জীবনমৃত্যুর সন্ধিস্থলে এই দুঃসহ প্রতীক্ষা কাব্যমধ্যে প্রতিবিম্বিত কবিমানসে কোন উৎকণ্ঠা সঞ্চার করে নাই। কবি তাঁহার শঙ্কাদীর্ণ পারিবারিক প্রতিবেশকে সম্পূর্ণ অতিক্রম করিয়া তাঁহার সহজ চিত্তপ্রসন্নতা ও স্বচ্ছ অধ্যাত্মবোধ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। বরং সদ্যোসংঘটিত পত্নীবিয়োগ পরিশ্রুত হইয়া তাঁহার মনে এক করুণকোমল বিষাদ রাগিণী ধ্বনিত করিয়াছে বা রূপকথচিত তত্ত্বচিন্তার অন্তর্গূঢ় ভাবলোকে স্বপ্নবিহারের প্রেরণা দিয়াছে। যাহা ঘটিয়া গিয়াছে তাহার আঘাতকে আয়ত্ত করিবার প্রয়াস-ব্যাপৃত কবি আসন্ন মৃত্যুর পূর্বগামিনী ছায়ার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন রহিয়া গিয়াছেন।

কবির মানসগঠনের অসাধারণত্বই এই সব মৃত্যুছায়াবেষ্টনীর মধ্যে রচিত কবিতার মধ্যে সুপরিস্ফুট।

আরও একটি শ্লাঘ্য বিশেষত্ব এই কাব্যে উদাহৃত হইয়াছে। কবির ভাষা ও ভাব সমস্ত উচ্ছ্বাস-আতিশয্য বর্জন করিয়া একটি অনায়াস-সামঞ্জস্যের স্থিরতা অর্জন করিয়াছে। তাঁহার তত্ত্বচিন্তা ও ভাবপ্রেরণা যেমন একদিকে অন্তর্ভেদী স্বচ্ছতায় একটি সুনিশ্চিত আত্মসমীক্ষা ও আত্মপ্রত্যয়ে সহজ সংস্কারের অনিবার্যতা লাভ করিয়াছে, তেমনি প্রকাশের দিক দিয়াও তাহা একটি সহজ সাবলীলছন্দে বিধৃত হইয়াছে। কবির অন্তরের প্রেরণা ও বাহিরের রূপবিন্যাস যেন দেহ ও আত্মার মত অখণ্ড সত্তায় মিলিত হইয়াছে। কাব্যবর্ণিত হিমালয়ের অন্তঃরুদ্ধ আগ্নেয় উচ্ছ্বাস ও অপরিমিত ঊর্ধ্বযাত্রার আবেগ যেমন আপনার সীমা-সংযত হইয়া সৌন্দর্যের লীলা-নিকেতন ও মানবের বিশ্রব্ধ আশ্রয়ে পরিণত হইয়াছে, কবির কাব্যেও তেমনি সমস্ত তত্ত্বানুভবের দুরূহতা ও অতিপ্রয়াস শমিত হইয়া উহা একটি অপরূপ সুকুমার লাবণ্যে স্বরূপকে বিকশিত করিয়াছে। দার্শনিক তত্ত্বের ভার লঘু হইয়া উহা স্বতঃস্ফূর্ত চেতনার অঙ্গীভূত হইয়াছে ও স্বচ্ছন্দগতি গীতিনির্ঝরের ন্যায় ভাবপিণ্ডকে কাব্যস্রোতে গলাইয়া ও ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। অবশ্য হিমালয়বিষয়ক কয়েকটি সনেটজাতীয় কবিতায় তত্ত্বগাম্ভীর্য স্থানে স্থানে জমাট বরফস্তূপের মত কাব্যকল্পনার স্বচ্ছন্দ প্রবাহকে প্রতিরুদ্ধ করিয়াছে। হিমালয়ের মহিমা-উপলব্ধির সচেতন প্রয়াস শব্দৈশ্বর্যে ও উপমার জটিল ব্যূহবদ্ধতায় অতিভারাক্রান্ত ও আতিশয্যবিড়ম্বিত হইয়াছে। কবি যেন গিরিরাজের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়াই নিজ কল্পনাকে উচ্চ হইতে উচ্চতর গ্রামে চড়াইয়াছেন ও উহাকে কৃচ্ছ্রসাধনক্লিষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু এই ব্যতিক্রমটুকু বাদ দিলে, কাব্যের অন্য সর্বত্রই শক্তিমানের শক্তি-আস্ফালনহীন লীলাময় ছন্দ পরিব্যাপ্ত। দুরূহকে সহজভাবে প্রকাশের, বিরাটের মধ্যে মাধুর্যসঞ্চারের যে সাধনারহস্য তাহাতে কবি সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইয়াছেন। 'ক্ষণিকা'য় কবি যে চপলতার ছলনায় নিজের একাগ্র অনুভূতিকে লুকাইতে চাহিয়াছিলেন, যে তত্ত্বগভীরতাকে অস্বীকারের ছদ্মঅভিনয় করিয়াছিলেন, হাসির ছটায় যে চোখের জলকে গোপন রাখিয়াছিলেন, সেই দীর্ঘ নেপথ্যপ্রস্তুতি 'উৎসর্গ'-এ পৌছিয়া নিজের প্রচ্ছন্ন অভিপ্রায়কে সার্থক করিয়াছে। আর গভীরের আপাত-প্রত্যাখ্যানের

প্রয়োজন হয় নাই, গভীরকে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াই কবি সহজের সহিত তাহার নিত্যসম্পর্কের সূত্রটি আবিষ্কার করিয়াছেন। 'সীমার মাঝে অসীম তুমি', 'কুঁড়ির ভিতরে কাঁদিছে গন্ধ', 'সব ঠাঁই মোর ঘর আছে' ও জীবনমৃত্যুর হরণপূরণলীলাতত্ত্বদ্যোতক কবিতাগুচ্ছের মধ্যে সূত্রাকারে কবির যে ভাবসমুদ্রমথিত সত্য-সিদ্ধান্ত সঙ্কেতিত হইয়াছে তাহা সাধারণতঃ অতিভাষণমুখর, অতিব্যাখ্যাভারাক্রান্ত রবীন্দ্রকাব্যে এক বিরল-লব্ধ, গূঢ়ভাষী তনিমা-সৌন্দর্যের নিদর্শন।

২

ক. জীবনদেবতা

এইবার 'উৎসর্গ'-কাব্যভুক্ত কবিতালীর পর্যায়ানুযায়ী আলোচনা সুরু হইতে পারে। জীবনদেবতা ও ভগবৎবিষয়ক কবিতাগুলিই কাব্যের মূল সুর রচনা করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের তরুণ জীবনের এক অনির্ণীত লক্ষ্যের অন্বেষণ-ব্যাকুলতা প্রথমতঃ নিজ কবিসত্তার রহস্যস্বরূপ-অনুভবে, ও পরে এক বিশ্বব্যাপ্ত ভগবৎ সত্তার স্থির উপলব্ধিতে কবিমানসকে পৌছাইয়া দিয়াছে। 'উৎসর্গ'-এ আমরা অন্তর্যামী ও জীবনদেবতার বিশ্ববিধান-মহিমায় অভিব্যক্ত ঈশ্বরে রূপান্তরণ প্রক্রিয়া লক্ষ্য করি। 'নৈবেদ্য'-এর সুরের অনুসরণে ও (গীতাঞ্জলি পর্যায়ের কবিতামালার পূর্বপ্রস্তুতিরূপে ভগবানের এই ভক্তিসম্ভ্রমমণ্ডিত, নিখিলজীবননিয়ন্তা রূপটি আমাদের প্রত্যক্ষ হয়। কবির বিস্ময়চেতনা যে পরিমাণে তাঁহার কাব্যরহস্যকেন্দ্র হইতে সমগ্র বিশ্বচরাচরের বিরাট পটভূমিকায় প্রসারিত হইয়াছে, সেই পরিমাণেই তাঁহার ব্যক্তিগত ও কাব্যসত্তাগত দিব্যপ্রেরণার অনুভূতি জগৎস্রষ্টার নৈর্ব্যক্তিক রূপরহস্যে বিলীন হইয়াছে। লীলাকৌতুকময়, মুহুর্মুহু আবির্ভাব-রূপান্তর-বিলয়ে বিভ্রান্তিকর অন্তর্জীবনের দেবতা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী, অব্যভিচারী নিয়মশৃঙ্খলার ধারক, অথচ সেবা ও আনুগত্যের দ্বারা উপলব্ধ এক অনন্ত শক্তিময় ঐশীসত্তায় রূপান্তরিত হইয়াছেন। 'নৈবেদ্য' হইতে গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি পর্যন্ত প্রসারিত কাব্যস্তরে এই রূপান্তর-প্রক্রিয়ার ইতিহাসটি কখনও তির্যক ব্যঞ্জনারূপে, কখনও প্রকৃতি ও প্রেমের নেপথ্যবর্তী

নিগূঢ় তত্ত্বচেতনারূপে কখনও বা সুস্পষ্ট, একান্ত আত্মনিবেদনের প্রত্যক্ষতায় লিপিবদ্ধ আছে।

'জীবনদেবতা' কল্পনাটি 'উৎসর্গ'-এর ৩, ৪, ৫, ১৩, ১৫ (২), ৩৯ ও ৪৬ (২) সংখ্যক কবিতাগুলিতে নানারূপে প্রকাশ পাইয়াছে। ৩ সংখ্যক কবিতায় কবি যখন নিজ সাংসারিক জীবনের স্বল্পবিত্ততার পরিপূরকরূপে কল্পনাজগতের গোপন ঐশ্বর্যের উল্লেখ করিয়াছেন, তখন জীবনদেবতার সহিত তাঁহার স্বপ্নবীথিচারী একান্ত-নিভৃত অন্তরঙ্গ মিলনের রূপেই তাহা ব্যঞ্জিত হইয়াছে। এই বর্ণনা কবিজীবনে জীবনদেবতারই অলক্ষ্য, দুর্লভ সঞ্চরণ নির্দেশ করে। যিনি কল্পনা-ঐশ্বর্যের পসরা লইয়া কবির হৃদয়দ্বারে উপনীত হইয়াছেন, তিনি 'বিদেশী', কেননা তিনি কোন্ অজ্ঞাত দেশের আনন্দবার্তা বহন করিয়া আনেন তাহা কবির ধারণাতীত। তিনি তাঁহাকে বাস্তব জীবনের রূঢ় সংস্পর্শ হইতে দূরে রাখিতে চাহিয়াছেন ও কেবল আনন্দময় অনুভূতির সাহায্যে তাঁহার আবির্ভাব সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইবেন তাহাও জানাইয়াছেন। এ কবিতাটিতে জীবনদেবতার প্রত্যক্ষ বর্ণনা না থাকিলেও কবিচিত্তে তাঁহার আবির্ভাবের পরোক্ষ প্রতিক্রিয়ার দ্বারাই তাঁহার স্বরূপ অনুভববেদ্য হইয়া উঠে।

৪ ও ৫ সংখ্যক কবিতায় প্রেমসুলভ ছলনা ও মুখের কথা ও মনের ভাবের আপাত-অসঙ্গতির দ্বারাই যে জীবনদেবতার স্বরূপ-নির্ণয় প্রহেলিকাময় হইয়া উঠে তাহা কবি বুঝিয়াছেন ও সাধারণ জীবনের চিরাভ্যস্ত ভাব-বিনিময়প্রক্রিয়া যে অন্তর্জীবনের গহনচারী সত্যকে যথাযথ প্রকাশ করিতে অনুপযোগী তাহাও উপলব্ধি করিয়াছেন। যে জীবনের সবটুকু আত্মসাৎ করিতে চায়, সে যে আংশিক দানে তৃপ্ত হইবে না, তাহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য। এই কবিতায় আমরা 'ক্ষণিকা'র লঘুচিত্ততার পিছনে যে নিগূঢ়তর প্রেরণা সক্রিয় ছিল তাহার যথার্থ পরিচয় পাই।

৫ সংখ্যক কবিতায় কবির তাৎকালিক মেজাজ (mood) অনুযায়ী জীবনদেবতার মুখশ্রী ও নিবেদনছন্দও যে পরিবর্তনশীল, তিনি যে ছদ্মবেশে বিভ্রান্তি জাগাইতে অতি-নিপুণ তাহা কবির নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তিনি একদিন আসিয়াছিলেন ম্লানবেশে, কবির দরদী-সমব্যথীরূপে, করুণ মিনতি ও স্নিগ্ধ সান্ত্বনার অঞ্জলিহস্তে। আজ তিনি আসিয়াছেন, লীলাকৌতুকভরে, হাসির আড়ালে প্রেমিকার ছদ্মশাসনভ্রূকুটি উদ্যত করিয়া।

কবি বলিতেছেন যে তিনি এই হাসিমাখা কপটতর্জনের জুয়াচুরি ধরিয়া ফেলিয়াছেন ও জীবনদেবতার পূর্বভূমিকা স্মরণ করিয়া এই অভিনয়চাতুর্যে প্রতারিত হইবেন না। এই কবিতাদ্বয়ের বৈশিষ্ট্য হইল দুরূহ তত্ত্বের অন্তর্নিহিত ভাবসৌরভটির লীলাময় উন্মীলন ও বিকিরণ। তত্ত্ব এখানে ফুলের মত ফুটিয়াছে, নৃত্যের মত দুলিয়াছে, শৃঙ্খলের মধ্যে কিঙ্কিণী বাজাইয়াছে। প্রতিপাদন-সাপেক্ষ সত্য স্বতঃস্ফূর্ত অনুভবের মত সহজ হইয়াছে।

১৩ ও ১৪ উভয় কবিতাই কবিচেতনার বিশ্ববোধস্ফুরণের, অনন্ত কাল ও-স্থানব্যাপী জীবনলীলার প্রতি স্পন্দনের সহিত একাত্মতা-অনুভবের মর্ম-ইতিহাস। কিন্তু প্রথমটি কবির অন্তর্জীবনের অধিষ্ঠানদেবতার সহিত নিবিড় প্রেমমিলনের অন্তরঙ্গস্মৃতি-সুরভিত। দ্বিতীয়টি একই অনুভব হইতে মোড় ফিরিয়া ভক্তিরসসিক্ত পূজার্ঘ্যরূপে ইষ্ট-নিবেদিত। একটি অন্তর্লোকের জন্মজন্মান্তরীণ স্মৃতিগহনচচারী ও নিজ দ্বৈত সত্তার পুলকে রহস্যরোমাঞ্চিত। অপরটি বিশ্বজগতের সর্বত্র বিশ্বপিতার উত্তরাধিকারীরূপে নিজ জন্মস্বত্বপ্রতিষ্ঠায় গৌরবান্বিত। একই মূলভাবের দ্বিমুখী প্রকাশ কবিমনের ঐশী উপলব্ধির সহিত দুই প্রকার সম্পর্কের পরিচয় বহন করে—একটি আত্মসত্তার মূলনিহিত ও যুগে যুগে সেই সত্তার বিবর্তনের সহিত অব্যক্ত, ক্রমোদ্ভিন্ন অভিপ্রায়সূত্রে আবদ্ধ, অপরটি নিখিল বিশ্বের অপরিমেয় বিস্তার ও বৈচিত্র্যের সহিত কবির ক্ষুদ্র ব্যক্তিসত্তার একাত্মতাবোধের মহিমা-ব্যঞ্জক। প্রথমটি রহস্যবোধে অনির্দেশ্য ও নব নব ভাবকল্পনার উৎসরূপে কবিস্বভাবের বিশেষ অনুকূল; বিশেষতঃ পার্থিব প্রেমচেতনার সারূপ্যে ইহা কাব্যপ্রেরণার মূলে অজস্ররসবাহী। দ্বিতীয়টি কবির কাব্য-জীবনের একটি পর্যায়ে মূলসুররূপে আবির্ভূত হইলেও মাঝে মাঝে কাব্যে ভক্তির নম্রতা, আত্মনিবেদনের একাগ্রতা ও উত্তুঙ্গ মহিমার সুরে ফিরিয়া ফিরিয়া আসিলেও স্থায়ী প্রভাবরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। কবি নিজেকে ধ্যানাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেও কবিসুলভ বৈচিত্র্যের আকর্ষণ তাঁহাকে সে আসনে অবিচল থাকিতে দেয় নাই।

১৩ সংখ্যক কবিতাটি প্রণয়মুগ্ধতার সুরে আরম্ভ হইয়া ইহা মানসসুন্দরী-প্রশস্তি কি জীবনদেবতাস্তুতি সে সম্বন্ধে আমাদিগকে দীর্ঘকাল সংশয়ে রাখে। কিন্তু পৃথিবীর আদিম অবস্থা ও মানব ইতিহাসের অতীতযুগের

উল্লেখ প্রেমকল্পনার নিবিড়তাকে ক্ষুণ্ণ করিয়া জীবন-নিয়ন্তার ধারণাই প্রবলতর করিয়া তোলে। অন্তিম স্তবকে অতীত-প্রভাব কবিজীবনে গাঁথিয়া রাখার সুস্পষ্ট উক্তিতে কবিতাটি যে জীবনদেবতার নিগূঢ় ও জন্মজন্মান্তরব্যাপী সম্পর্কবিষয়ক সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ হই। কবির লীলাসঙ্গিনীরূপে যাঁহার প্রথম আবির্ভাব তিনিই যে কবিজীবনের ক্রমাভিব্যক্তির পরিণত স্তরে জীবনগঠনের অন্তর্গূঢ় অদৃশ্য শক্তি ও জীবনের পূর্ণ বিকাশের জন্য দায়িত্বসম্পন্না দৈব প্রেরণা তাহা পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

১৫ সংখ্যক কবিতাটি ঠিক জীবনদেবতাসম্পর্কিত বলিয়া মনে হয় না। ইহা বিশ্ব-সংসারের চিরঘূর্ণ্যমান গতিচক্রের মধ্যে, জীবন-মৃত্যুর দ্রুত-সঞ্চরণশীল অনিত্যতার মধ্যে একটি শাশ্বত স্থির আশ্রয়, এক অচঞ্চল রূপলক্ষ্মীর ধ্রুব অস্তিত্ব-আবিষ্কারের আশ্বাস বহন করে। এই অশান্ত ঘূর্ণীবেগের মধ্যস্থ কেন্দ্রীয় শান্তি ও সৌন্দর্য ভগবদনুভূতিরই প্রকারভেদরূপে ব্যাখ্যাত হইতে পারে, তবে এই তত্ত্বের আবেগময় অনুভব, উহাকে ভুবনলক্ষ্মী ও চিরসুন্দর আখ্যায় সম্বোধন উহার মধ্যে জীবনদেবতাকেও আভাসিত করিতে পারে। তত্ত্বের দিক দিয়া যাহাই হউক, কাব্যানুভূতির দিক দিয়া ইহা বিশ্বজগতের ও মানব-আসক্তির ক্ষণিকতাকেই মূল আশ্রয়রূপে অবলম্বন করিয়াছে ও এই দৃষ্টিভঙ্গীতে ইহা 'বলাকা'র পূর্বসূচনারূপে গৃহীত হইতে পারে। বিক্ষোভের কেন্দ্রে অবিচল প্রশান্তির আবিষ্কার যতটা তত্ত্বচিন্তাপ্রণোদিত, ততটা কবিভাবনার স্বাভাবিক পরিণতি নয় বলিয়াই মনে হয়।

৩৯ সংখ্যক কবিতাটি ৫নং-এর মত সুস্পষ্টভাবেই জীবনদেবতাবিষয়ক। প্রথম যৌবনে জীবনদেবতার লীলা-আবির্ভাব বসন্তকুসুমচয়নের মদিরাবেশময় পটভূমিকায় ঘটিয়াছিল। ইহা কবির তরুণ বয়সের প্রথম প্রেমানুভূতির রক্তিম বর্ণবৈভব ও আবেগবিহ্বলতার মধ্যে নিগূঢ়ভাবে অনুপ্রবেশ করিয়াছিল, ভাবমত্ত প্রণয়গাথার পাতায় পাতায় অদৃশ্য রক্তাক্ষরে ইহার সঙ্কেতলিপি রচিত হইয়াছিল। প্রেমের রূপকে এই অজ্ঞাত দেবতার পূজা অর্ধ-প্রচ্ছন্ন ছিল। কিন্তু পরিণত প্রৌঢ় বয়সে ইহা বর্ষা-দুর্যোগের মধ্যে ভস্মাবৃতদেহ, দীপ্তচক্ষু তাপসমূর্তিতে দেখা দিয়াছে। ইহা কবিকে প্রেমের বিলাস হইতে ত্যাগ-বৈরাগ্যের রিক্ততার মধ্যে আহ্বান করিতেছে। কবিও এই রুদ্র আহ্বানকে স্বীকার করিয়া দেবতাকে তাঁহার সর্বস্ব-সমর্পণের

প্রতিশ্রুতি জানাইতেছেন। এই কবিতাটির মধ্যে 'ভাঙা আলয়ে'র উল্লেখে কবির সদ্যোবিধ্বস্ত গৃহজীবনের মর্মান্তিক স্মৃতি ধ্বনিত হইয়াছে। হাসির ছটা এখন সত্য সত্যই চোখের জলে রূপান্তরিত, কৌতুকস্মিতহাস্য বিশ্ববিধানের অমোঘতার বার্তাবহের মুখে এখন ভ্রূকুটিকুটিলতার রূপ ধারণ করিয়াছে। কবিতাটি রূপকব্যঞ্জনার সার্থক প্রয়োগে, বাহিরের পটভূমিকার সহিত অন্তর্লোকের অনবদ্য সঙ্গতিসাধনে, গূঢ় মিতভাষিতার সংযমে, তত্ত্বকথার নিপুণ কাব্যরসাভিষেকে রবীন্দ্রনাথ যে 'মানসী' 'সোনার তরী'র যুগ হইতে কাব্যশিল্পে, মননগভীরতায় ও অনায়াসসিদ্ধ প্রকাশচারুতায় কতটা অগ্রসর হইয়াছেন তাহার নির্ভুল মানদণ্ড।

৪৬ সংখ্যক কবিতার দ্বিতীয় অংশটি প্রারম্ভে ও মধ্যভাগে জীবন-দেবতার ইঙ্গিতবাহী, উপসংহারে ভগবৎ-ভক্তি-পরিণামী। যে দেবতা তাঁহাকে জন্মে জন্মে নববিকাশের পথে লইয়া যাইতেছেন, নিখিল বিশ্বের অনন্তাভিসারে কবি যাঁহার প্রেরণায় অভিযাত্রী তাঁহার সহিত কবির প্রেমের বন্ধন। কিন্তু এই জন্মজন্মান্তরীণ ক্রমবিবর্তনের চরম উদ্দেশ্য হইল ভগবচ্চরণে প্রণতি-নিবেদনের প্রস্তুতি। সুতরাং জীবনদেবতার দীর্ঘ অভিভাবকত্বের শেষ পরিণতি হইবে কবির দ্বারা ভগবৎ-পূজার যোগ্যতা-বিধানে। এই বিশ্বনাথের চরণপ্রান্তে পৌছাইয়া দিয়াই কি জীবনদেবতা কবি-আত্মার নিকট হইতে চিরবিদায় লইবেন?

খ. ভগবৎ-সত্তার অনুভব

১ ও ২ সংখ্যক কবিতাতে পাখী ও নৌকাযাত্রার রূপকে ভগবৎ-আহ্বানের প্রতি নিঃসংশয় নির্ভরের সুর ধ্বনিত হইয়াছে। এই একান্ত আত্ম-সমর্পণের বিশ্বাস সমস্ত ভক্তি-কবিতারই একটি সাধারণ লক্ষণ। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ইহার বিশেষত্ব হইল ইহাকে রূপকের মাধ্যমে উপস্থাপন ও অতি সরল ভাষা ও স্বতঃপ্রবাহিত ছন্দে ইহার অভিব্যক্তি। ৬নং কবিতায় ভগবৎ-স্বরূপের সংশয়জড়িত ও ক্ষণদীপ্ত নেপথ্য-প্রকাশ, উহার ধাঁধালাগান চকিত উপলব্ধি। এখানে কবি তাঁহার অন্তরে ভগবদনুভূতি স্ফুরিত হইয়াছে কি না সে বিষয়ে সুনিশ্চিত নহেন—ভগবান তাঁহার নিকট স্বীকৃতি-অস্বীকৃতির মধ্যবর্তী গোধূলি-আলোকে অস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত।

এই ভগবান্ অনেকটা জীবনদেবতার সমধর্মী, লীলাকৌতুকে আত্মগোপনশীল ও প্রকৃতি-সৌন্দর্যের স্বচ্ছ আবরণে অর্ধপ্রকাশিত। তবে ইনি যে ভগবান্, জীবনদেবতা নহেন—তাহার প্রমাণ কবি ইহার সহিত কোন অন্তরঙ্গতার দাবী করেন নাই। অন্তর-ব্যাকুলতায় ইঁহার আবির্ভাব অনুমিত ; কথা ও সুরে ইনি বাঁধা পড়েন না ও কবি শেষ পর্যন্ত ইঁহাকে বুঝিবার অভিমান ত্যাগ করিয়া ইঁহার ভালবাসাতেই নিজেকে সিদ্ধকাম মনে করেন। তথাপি ইঁহার সম্বন্ধে তিনি অর্থ না বুঝিয়াই অনেক কিছু লিখিয়াছেন ও ইঁহার পরিচয়ে শ্লাঘাবোধ করেন। এই কবিতাটিতে ভগবান জীবনদেবতার ছল-কলা ও ছদ্মবেশ অবলম্বন করিলেও তাঁহার প্রতি কবির মনোভাবই তাঁহার ভগবৎ-পরিচয় প্রতিষ্ঠিত করিতেছে।

১১ সংখ্যক কবিতাটিতে একটি রূপকের মাধ্যমে কবির ঈশ্বরের প্রতি একান্ত আনুগত্য ও প্রেমনির্ভরতা ব্যঞ্জিত হইয়াছে। নিরক্ষরা স্ত্রী যেমন স্বামীর পত্রখানি পণ্ডিতের দ্বারা পড়াইয়া না লইয়াই তাহা বুকে চাপিয়া ধরে, কবিও তেমনি ভগবত্তত্ত্ব সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ হইয়াও তাঁহার প্রেম-আহ্বানকে অন্তরে গ্রহণ করিতে চাহেন। এই ভাবটি নৈবেদ্য ও গীতাঞ্জলি-যুগের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করিয়াছে ও ইহার শিশুর ন্যায় জ্ঞানহীন সরলতা মর্মস্পর্শীরূপে আমাদের চিত্তে প্রবেশ করে। ১২ কবিতাটিতেও সূর্য ও শিশিরের রূপকে বিরাট বিশ্ব-আত্মার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ব্যক্তিসত্তার মধ্যে অনুপ্রবেশ-তত্ত্ব গূঢ়ার্থ সংক্ষিপ্ততায় প্রকাশিত হইয়াছে। কবির মিতভাষিতা এখানে এক বিরাট সত্যকে কত সহজে আত্মসাৎ করিয়াছে ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয়।

১৪নং কবিতাটিতে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক চেতনা-লালিত অসংশয় বিশ্বাত্মবোধের কাব্যময় প্রকাশ শেষে একটি ভক্তিপরিণতিতে পৌঁছিয়া এক অপূর্ব ভাবসংশ্লেষে সংহত হইয়াছে। এখানে বিশ্বের প্রতি অণু-পরমাণু, প্রতিটি সুদূর নক্ষত্রমণ্ডলীর সহিত একটি নিবিড় আত্মীয়তার আবেগময় উপলব্ধি, বিশ্বব্যাপী প্রেমের ব্যাকুল আহ্বান সম্বন্ধে সচেতনতা কবিমানসে স্থির প্রত্যয়রূপে তাঁহাকে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র অবাধ প্রবেশাধিকার দিয়াছে। মানবজীবনের বিস্মৃতির অন্তরাল হইতে জন্মান্তরীণ স্মৃতি জাগিয়া উঠিয়া কবিকে প্রতি পদার্থের প্রতি এক নিগূঢ় আকর্ষণ অনুভব করাইয়াছে। শেষে প্রণতির দ্বারা বিশ্বদেবচরণে সমগ্র জগতের সহিত তিনি একীভূত

হইয়াছেন। এই জটিল তত্ত্বসূত্রসমূহ কবির অনুভূতিকেন্দ্রে স্বতঃ-আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার কাব্যশিল্পের মাধ্যমে একটি দিব্য সমগ্রতা লাভ করিয়াছে। তত্ত্বজটিলতার এই কাব্যরূপান্তর, উপাদানবৈচিত্র্যের এই প্রাণসমাহার কবির মানস-পরিণতির একটি অপূর্ব নিদর্শন ও 'উৎসর্গ'-কাব্যের প্রায় সমস্ত কবিতাতেই এই লক্ষণ সুপরিস্ফুট।

১৭নং কবিতাতে ভগবানের কোন উল্লেখ নাই, তবে সৃষ্টিতত্ত্বের একটি নিগূঢ় রহস্য,—বিপরীতমুখী দ্বৈত ক্রিয়ার লীলাময় দ্বন্দ্ব—আশ্চর্য অর্থনিবিড়তা ও ইঙ্গিতময়তার সহিত, সূত্রাকারে দ্যোতিত হইয়াছে। দ্বাদশ চরণাত্মক এই কবিতাটি যেন জীবনপ্রেরণার মর্মস্থান উদ্ভিন্ন করিয়া উহার অন্তর্নিহিত সার্বভৌম ভাবসত্যটিকে প্রকাশমুক্তি দিয়াছে। সৃষ্টিরহস্যবিদের দিব্যচেতনা, জীবনতত্ত্বসমীক্ষকের অন্তর্দৃষ্টি ও কবির অমোঘ ভাবপ্রকাশিকা শক্তি—সবই যেন এই ক্ষুদ্র কবিতাটির আধারে নিজ নিজ বিশিষ্ট আবেদন মিশাইয়া একটি যৌগিক সৃষ্টিরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। প্রজাপতির নাভিকুণ্ড-উদ্ভূত সৃষ্টিকমলের সহিতই কাব্যসৃষ্টিলীলা-উৎসারিত এই কবিতাপদ্মটি তুলনীয়।

১৮নং কবিতাটি ঈশ্বরসৃষ্ট বিচিত্র প্রকৃতিসৌন্দর্যের সহিত কবির কাব্যপ্রেরণার নিগূঢ় সম্বন্ধের প্রকাশ। ইহা এবং ১৯, ২০, ২২ সংখ্যক কবিতাগুলি একাধারে কবি-প্রেরণার উৎস ও উহার ভগবদভিমুখিতার সাক্ষ্য দেয়। ইহাদের মধ্যে যেমন কবিস্বভাবের পরিচয়, তেমনি গূঢ় ঐশীলীলার সহিত উহার তদ্‌গতচিত্ততার নিদর্শনও নিহিত। এগুলিকে গীতাঞ্জলি-পর্বের কাব্যগুচ্ছের মর্মকথারূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। ২২ সংখ্যক কবিতায় নৈবেদ্য-এর সুর একটু স্বাতন্ত্র্যের সহিত পুনরাবৃত্ত। উপনিষদের যে ব্রহ্মবাদ নিখিলবিশ্বে এক অদ্বিতীয় পরমসত্তার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়া সৃষ্টির বৈচিত্র্যকে কাযতঃ অস্বীকার করে, কবি সেই একমেব তত্ত্বের সহিত জগতের অফুরন্ত বিচিত্র রূপের প্রতি মুগ্ধতার সমন্বয় সাধন করেন। দার্শনিক তত্ত্বচেতনা তাঁহার রূপপিপাসাকে নির্বাপিত না করিয়া উহাকে আরও উদ্দীপ্ত করে।

৪২, ৪৬(১), ও সংযোজনা-অংশে ১, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ সংখ্যক কবিতাগুলি হয় পথিকের পথ-চলার রূপকে না হয় কবির লঘু কৌতুকের অন্তরালে ঈশ্বরচেতনার অতর্কিত আবির্ভাবদ্যোতনায়, কখনও বা সুরে, কখনও বা তত্ত্বপ্রতিষ্ঠার মননশীল অর্থগাঢ়তায় ভগবানের সহিত তাঁহার

মিলন-আগ্রহকেই পরিস্ফুট করিয়াছে। অবশ্য ইহাদের মধ্যে নূতনত্ব বিশেষ কিছু নাই—ইহারা পুরাতন সুরেরই পুনরাবৃত্তি।

২১ সংখ্যক কবিতাটি কবির অন্তঃপ্রকৃতিরহস্যের এক অনন্য উদ্‌ঘাটন। এই আত্মপরিচয় সম্পূর্ণ ঈশ্বরতত্ত্বনিরপেক্ষ। কাব্যের মাধ্যমে কবির ব্যক্তি-জীবনের স্পর্শ-আবিষ্কারের প্রয়াস যেন মায়ামুকুরে প্রতিবিম্বিত প্রতিচ্ছায়া হইতে কায়ার স্বরূপনির্ণয়ে ব্যর্থতারই অনুরূপ। টেনিসনের জীবনী-সম্বন্ধে কবির যে গল্পরচনা তাহা হইতে আমরা কবির জীবনী ও তাঁহার কাব্য-প্রেরণার মধ্যে কোন কাযকারণশৃঙ্খলের আবিষ্কার-দুরূহতার বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অভিমত জানি। যে সত্য অপরের জীবনঘটনার স্থূলতার মধ্যে আবৃত তাহা তাঁহার নিজের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। এই কবিতাটিতে কবি তাঁহার অত্যুৎসাহী জীবনী-লেখক ও পাঠককে সতর্কিত করিতেছেন যে জীবনীগ্রন্থের মধ্যে তাঁহার কাব্যরহস্যের মূল অনুসন্ধান ব্যর্থ হইবে। কবিসত্তা ও ব্যক্তিসত্তার মধ্যে যে ব্যবধান তাহা কোন তথ্যের সেতুতে সংযুক্ত হইবার নয়। যে ব্যক্তিসত্তা স্থূল জৈব উপাদানগঠিত, যাহা প্রতি নিমেষের ভারজর্জর, যাহা মানবিক দুর্বলতার ব্যাধিগ্রস্ত, তাহার মধ্যে নিত্যমুক্ত, নির্মলজ্যোতিঃ, উর্ধ্বলোকবিহারী, নিখিল বিশ্বে লীলাস্বচ্ছন্দচারী কবি-সত্তার সন্ধান কেমন করিয়া মিলিবে? সংসারজীবনের কাঁটাগাছে দিব্য পারিজাতকুসুম কেমন করিয়া ফোটে, জড়জগতের শৃঙ্খলাবদ্ধ জীব কেমন করিয়া মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব অতিক্রম করিয়া বিশুদ্ধ ভাবলোকের উর্ধ্বগগনে উধাও হয়, বিচিত্র প্রাণলোকের নিগূঢ় রহস্য কি যাদুতে তাহার অধিগত হয়, সে কেমন করিয়া আত্মজীবনের সংকীর্ণতা ছাড়াইয়া বিশ্বজীবনের মর্মমূলে প্রবেশ করে, শেক্‌স্‌পিয়ারের এরিয়েলের মত মর ও অমরজীবনের দ্বৈতসত্তায় প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা কবির ধারণার অতীত। ইহারই কথঞ্চিৎ ব্যাখ্যারূপে কবি নিজ জীবনে অন্তর্যামী-জীবনদেবতার নিগূঢ় লীলারহস্য অনুভব ও বিবৃত করিয়াছেন। যে চিত্রকল্পপরম্পরার দ্বারা রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অন্তর্জীবনের বিদ্যুৎচমকদীপ্ত, দিব্যচেতনায় উদ্ভাসিত, সর্বত্রসঞ্চারী ও গূঢ়প্রবেশী প্রাণলীলাকে ব্যঞ্জিত করিয়াছেন তাহা শেলী অপেক্ষাও মনো-গহনের সত্যবার্তাবাহী, এবং সুস্পষ্টতর উপলব্ধি ও সূক্ষ্মতর প্রকাশসৌন্দর্যে সমুজ্জ্বল। ইহা কবিস্বরূপের তত্ত্বসারকে যে সাবলীল ভঙ্গীতে ও ব্যঞ্জনার সার্থক প্রয়োগে প্রকাশ করিয়াছে তাহা বিশ্বসাহিত্যে অতুলনীয়।

গ. যৌবন-ব্যাকুলতার উদ্‌ভ্রান্তি

৭, ৮, ৯, ১০ এই চারিটি কবিতায় যে অনুসন্ধানের অস্থিরতা, যে অনির্দেশ্য আদর্শের প্রতি অস্বস্তিময় আকর্ষণের ইতিহাস সঙ্কেতিত হইয়াছে তাহাকে রবীন্দ্রকাব্যের কোন বিশেষ কালের বা ভাবপর্যায়ের সহিত যুক্ত করা কঠিন। ইহাকে বিভিন্ন সময়ে ও পরিবেশে উদ্দীপ্ত কবির একটি চিরন্তন মানসধর্মরূপে অভিহিত করাই যুক্তিসঙ্গত। অবশ্য 'সন্ধ্যাসংগীত', 'প্রভাত-সংগীত'-এর যুগ হইতেই এই অন্বেষণ-আকৃতির সূচনা; উহাদের অব্যবহিত পরবর্তী কাব্যসমূহে এই ব্যাকুল অভিসারের যাত্রাপরিণতি, আদর্শ প্রেম ও জীবনদেবতা-কল্পনার অভিমুখে। কিন্তু 'উৎসর্গ'-পর্বে পৌঁছিবার কালে মানসসুন্দরীর প্রেরণা ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে ও জীবনদেবতার প্রতি প্রত্যয় বর্তমান থাকিলেও উহা বিশ্বদেবতার বৃহত্তর ও বাস্তবতর সত্তায় বিলীন হইবার উপক্রম করিতেছে। 'নৈবেদ্য'-এর নীতিবিধানমূলক ও ভক্তিরসপ্রধান মনোভাবের মধ্যবর্তিতায় কল্পনালীলা ক্রমশঃ মহিমাঘোষণার ঋজু কাঠিন্যে ঘনীভূত হইয়াছে, ব্যক্তি-অনুভবের বিশিষ্টতা সার্বভৌম সত্যপ্রতিষ্ঠায় সূক্ষ্মতর ব্যঞ্জনা হারাইয়াছে। তথাপি মনোবিহারের উদ্‌ভ্রান্তি, কল্পলোক-পরিক্রমার এষণা তত্ত্ববন্ধনশিথিলতার মধ্যেও রোমান্টিক কবিচিত্তের সহিত একটা চিরসম্পর্ক রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। 'উৎসর্গ'-এর কবিতাগুচ্ছ কোন নিগূঢ় মরমী প্রত্যয়ের সন্ধান না দিলেও ইহা একটা গভীর ভাবসত্যের সহজ উৎসাররূপে গ্রহণীয়। 'প্রভাতসংগীত'-এর নিষ্ক্রমণ-উচ্ছ্বাসের সহিত ইহাদিগকে একই পর্যায়ভুক্ত করিলে পরিণত জীবনসমীক্ষার সহিত তারুণ্যের একমুখী ভাবাতিশয্যের পার্থক্যবোধ অস্পষ্ট হইবে ও কবির মানস-বিবর্তনের সূত্র-অনুসরণে বাধা দেখা দিবে।

৭ সংখ্যক কবিতায় ('পাগল হইয়া') 'ক্ষণিকা'র ভ্রান্তিবিলাসের মধ্যে একটি গভীরতর আত্মসমীক্ষার রহস্যবিহ্বলতা সঞ্চারিত হইয়াছে। 'ক্ষণিকা'-র স্পর্ধিত অস্বীকৃতি এখানে গূঢ়তর অর্থব্যঞ্জনায় ক্ষুব্ধ ও করুণ হইয়া উঠিয়াছে।—সর্বস্বীকৃত মূল্যবোধের ছদ্মপ্রত্যাখ্যানের অন্তরালে যে নূতন জীবনদর্শন-উন্মেষের আয়োজন চলিতেছিল সেই অনাগতের প্রকাশবেদনা, সেই আদর্শ ও বাস্তবের বঞ্চনাময় ব্যবধান এখানে একটি অন্তর্গূঢ় সুর-মূর্ছনায় ঝঙ্কৃত হইয়াছে।

৮নং কবিতায় ("আমি চঞ্চল হে") কবির অস্থিমজ্জাগত সুদূর-পিপাসা একটি অভিনব গীতিমূর্তি লাভ করিয়াছে। ইহাতে দুর্লভ-অভীপ্সা ছাড়া আর কোন তত্ত্বাশ্রয় নাই বলিয়াই মনে হয়। ইহা যেন কবির নিখিল বিশ্বের আত্মীয়তাবোধের সত্যউপলব্ধির একটি খণ্ড প্রকাশ। সুদূরকে প্রিয় বলিয়া ভাবিতে পারিয়াছেন বলিয়াই ইহার প্রতি এত আকূতি, এত মুগ্ধতা কবিপ্রাণে এরূপ উদাস গীতিঝঙ্কার তুলিয়াছে। কবিচিত্তের ভাবমোহ দ্বিপ্রহরের রৌদ্রমূর্ছিত অলস অবসর, তরুমর্মর ও ছায়ার খেলাকে আবেগের উত্তাপে গলাইয়া এক নীলাকাশশায়ী কল্পনামূর্তির উদ্বোধন করিয়াছে। ইহা কোন স্থির বিগ্রহের নির্দিষ্ট রূপে সংহত হয় নাই, কেবলমাত্র ঈষৎ উন্মেষে কবির গ্রহণৌৎসুক্যকে আরও জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছে। এই সুদূর কবিচিত্তের সমস্ত উন্মুখতা ও উন্মনস্কতার দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া একটি প্রাণময় সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার শিরা-স্নায়ুতে হয়ত জীবনদেবতার তড়িৎ-স্পর্শ আছে, কিন্তু ইহা জীবনদেবতার একটি অপরিণত অনুভবের, একটি ক্ষণিক, অস্পষ্ট চমকের ঊর্ধ্বে উঠে নাই।

৯ নং কবিতায় ('কুঁড়ির ভিতরে কাঁদিছে গন্ধ অন্ধ হয়ে') জীবন-পরিণতি, উহার অস্ফুট সম্ভাবনাসমূহের পরিপূর্ণ তৃপ্তিময় বিকাশ সম্বন্ধে অনিশ্চয়তাই তরুণ প্রাণের কুহরে কুহরে এক বিষাদ-রাগিণী নিঃশ্বসিত করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের আদিম পর্যায়ে হৃদয়-অরণ্য হইতে যে নিষ্ক্রমণ-পথসন্ধান কবিচিত্তকে এক সর্বব্যাপী বিষাদ-কুহেলিকায় পরিব্যাপ্ত করিয়াছিল ইহা সেই অচেনা জগতের বাষ্পাকুলতার সহিত একজাতীয় নয়। প্রথম তরুণ বয়সের হৃদয়ারণ্যে পথ-হারানোর মত পরিণত যৌবনেরও একটা পথসঙ্কট আছে। জ্ঞানদাসের যুগেও যৌবনের বনে পথভ্রান্তি ও তজ্জনিত নিশ্চলতার কথা শোনা যায়। কিন্তু ইহা সংসার ও জীবনের সহিত প্রথম পরিচয়ের বিভ্রান্তি, অতিসরলীকৃত একমুখীন জীবনাবেগের বিহ্বলতার মত নয়। যৌবনশেষে আদর্শ ও বাস্তবের দ্বন্দ্ব আবার নূতন কক্ষপথে আবর্তিত হইয়া নব মরীচিকার বিমূঢ়তা জাগায়। জীবনকে স্বল্প অভিজ্ঞতায় যতটুকু চেনা যায়, ও কল্পনা, রুচি ও আংশিক জীবনবোধের সহযোগিতায় তাহার যে রূপ প্রকটিত হয়, জীবনের অনাস্বাদিত অংশ ও উহার সামগ্রিক পরিচয়-বৃত্তের মধ্যে তাহার নিগূঢ় অস্বীকৃতি প্রচ্ছন্ন। কবির সংবেদনশীল হৃদয়ই এই নবদ্বন্দ্বপর্যায়ের প্রকটনক্ষেত্র। প্রথম বয়সে যাহা মুখ্যতঃ অন্তর-

ও বহির্জগতের বিরোধ ছিল তাহা যৌবনশেষে প্রৌঢ়জীবনে প্রবেশ-সীমায় অন্তরের দ্বৈত প্রেরণার গৃহযুদ্ধরূপে পরিণত হয় ও অন্তর্বিপ্লবের গূঢ়তর হৃদয়ক্ষতে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু ইহা অজ্ঞানান্ধকারে অন্ধ পথসন্ধান নয়; ইহা জীবনের শুভ পরিণামে নিশ্চিত প্রত্যয় আর সেই প্রত্যয়ের আপাত-ব্যর্থতা মনোগহনে যে গোধূলিমায়া প্রক্ষেপ করে সেই আলো-আঁধারের গতিস্তব্ধতার সূচক। যেখানে মানস প্রত্যয় অগ্রগতির জন্য উৎসুক, কিন্তু বাস্তব পরিবেশের অসহযোগ সেই গতিবেগপ্রেরণাকে রুদ্ধ করে, সংকল্প ও কার্য যেখানে সমান ছন্দে চলিতে বাধা পায় সেই বস্তুবাধা-শৃঙ্খলিত, অথচ জীবনপ্রজ্ঞাপুষ্ট আদর্শবাদের অধীর অনুযোগই এই কবিতাটির অন্তঃপ্রেরণার উৎস। কবির আশ্বাসবাণী কুঁড়ির অন্ধ, আত্ম-কেন্দ্রিক গন্ধকোষে প্রবেশ করিয়া ও উহার নৈরাশ্যের প্রতিবাদ জানাইয়া উহাকে পূর্বযুগের 'তারকার আত্মহত্যা'-র পুনরভিনয় হইতে রক্ষা করিয়াছে।

১০নং কবিতায় ('আমার মাঝারে আছে যে কে গো সে') কবির আদর্শ-নির্ণয়ে চলচ্চিত্ততা নারীর আকাঙ্ক্ষাপূরণে অস্থিরমতিত্বের রূপকে ব্যঞ্জিত হইয়াছে। ইহাতে পরিবর্তনশীল নারীহৃদয়ের অতৃপ্তি ও নানা কাম্য পদার্থকে আঁকড়াইয়া ধরিবার আকুলতা অনুরূপ বহির্ঘটনার আবরণে চমৎকারভাবে নির্দেশিত হইয়াছে। বহির্জগৎ ও অন্তর্জীবনের এরূপ সুষ্ঠু সাদৃশ্যব্যঞ্জনা উচ্চাঙ্গের অনুভবশক্তি ও ঔচিত্যবোধের পরিচয় দেয়। আক্ষরিক অর্থ ও গূঢ়ার্থ কবিপ্রতিভার রসায়নে আশ্চযভাবে মিশিয়া গিয়াছে।

৩

ঘ. প্রকৃতিকবিতা ও উহার মধ্যে এক নিগূঢ় সত্তার স্পন্দন

'উৎসর্গ' কাব্যে যে নিসর্গকবিতাগুলি স্থান পাইয়াছে, তাহারা কোন দার্শনিকতত্ত্বনির্ভর না হইয়া তাঁহার বিচিত্র ও স্বতউদ্ভূত অনুভূতির আশ্রয়ে স্বতন্ত্র সত্তায় ও ভাব আবেদনে বিশিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কবিমানস প্রকৃতির রূপরসগন্ধে এমন সূক্ষ্ম সংবেদনশীল হইয়াছে যে এক একটি দৃশ্যের ও ভাব-মুহূর্তের প্রেরণাজাত প্রত্যেক কবিতাই একটি অনন্য রূপে বিকশিত হইয়াছে। ২৩ সংখ্যক কবিতায় নানা কর্মজালে চিত্তবিক্ষেপকারী দিবসের অবসানে

নিঃসঙ্গ সন্ধ্যায় অকস্মাৎ শুক্লজ্যোৎস্নার নিঃশব্দ আবির্ভাব কবির অন্যমনস্ক চিত্তে সৌন্দর্যচেতনার মৃদু আলোড়ন তুলিল। কবি যেন নিজ একাকীত্ব ও নামহীন কোন প্রেমিকের স্নিগ্ধ দৌত্য নিজ অন্তরের গভীরে অনুভব করিলেন। এ যেন আলবালসিঞ্চনে নিবিষ্টা দময়ন্তীর নিকট প্রণয়-সন্দেশবাহী পৌরাণিক রাজহংসের আবির্ভাব। 'চিত্রার' মত এই চন্দ্রালোকের কোন গভীর তত্ত্বতাৎপর্য নাই; ইহা কোন দীর্ঘপোষিত সংস্কারের উন্মূলন ঘটাইয়া চেতনায় কোন বিপ্লব আনে নাই। ইহা মৃদুপদ-সঞ্চারে অনুভূতিতে কেবল একটি নীরব কোমলতাস্পর্শ সঞ্চার করিয়াছে ও যে অজানা সুদূর প্রেমিকের প্রেমবার্তার ইহা বাহক তাহার অভাবে সমস্ত জীবনের ব্যর্থতাবোধ কবিচিত্তে উন্মেষিত করিয়াছে। কবি এই মূক, সৌম্যসুন্দর প্রেমদূতের মুখোমুখি দাঁড়াইয়া কেবল স্বপ্নমুগ্ধ অন্তরে উত্তরের কথাই ভাবিতেছেন। দার্শনিক তত্ত্ব বা অধ্যাত্ম প্রত্যয় এই আমন্ত্রণের কোন বাঁধা-ধরা তাৎপর্য ঠিক করিয়া রাখে নাই। কবির চেতনামূলে এই সৌন্দর্যরস, স্নিগ্ধতার এই পেলব স্পর্শ সঞ্চারিত হইয়া ইহার গভীরশায়ী অতৃপ্তির দলগুলি ফুটাইয়া তুলিয়াছে ও এই মৃদু চমক দক্ষিণ বায়ুর ন্যায় একটি প্রত্যুদ্‌গমন-পুষ্পকে ধীরে ধীরে উন্মোচন করিয়াছে। যদি ইহার মধ্যে কিছু তত্ত্ব থাকে তবে ইহা সন্ধ্যার শান্তি, সদ্য-প্রস্ফুটিত ফুলের গন্ধ, জ্যোৎস্নার হংসধবল মায়া ও চন্দ্রোদয়ের দিব্য আবির্ভাবের সহিত মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে।

৩৩ সংখ্যক কবিতায় আলমোড়ার পার্বত্য দেশে বর্ষামেঘের সমারোহ কবির চিত্তে এক যুগযুগান্তরের প্রিয়জনমিলনের উৎকণ্ঠা-স্পর্শ ঘনাইয়া তুলিয়াছে। এক দৈব সত্তা যেন এই বর্ষাপ্রকৃতির ঘনঘটা ও বিদ্যুৎ-চমকের অন্তর্গূঢ় ভাবচেতনাকে আশ্রয় করিয়া কবির অনুভূতিতে রূপ লইতেছে ও তাঁহার জন্মান্তরীণ স্মৃতিকে উন্মথিত ও উদ্বেল করিতেছে। ঝড়ের ব্যাকুলতার সহিত হৃদয়ের ব্যাকুলতা, প্রকৃতির উন্মত্ত বিক্ষোভের সহিত প্রিয়স্পর্শের উত্তেজনা-রোমাঞ্চ, প্রত্যক্ষ পরিবেশের সহিত স্মৃতি-উদ্বোধিত অতীত-নিমজ্জন ও সুদূরপ্রয়াণের স্বপ্নাবেশ এক আশ্চর্য রাসায়নিক সমীকরণে এক হইয়া গিয়াছে। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও ভাব-মন্থনের বিচিত্র সংমিশ্রণে জীবনদেবতার দিব্য সত্তা নব রূপে আবির্ভূত হইয়াছে ও তাঁহার সহিত বহুজন্মের প্রীতিসম্পর্ক নিবিড় চেতনায় চিত্তকে আবিষ্ট

করিয়াছে। কবি উপসংহারে তাঁহার উচ্ছল হৃদয়াবেগকে শান্ত হইতে বলিয়াছেন ও প্রিয়-আলিঙ্গনের হর্ষ-রোমাঞ্চে তাঁহার ভাবসম্মোহের বিলয়-প্রার্থনা জানাইয়াছেন।

কবিতাটির বৈশিষ্ট্য হইল এক সম্পূর্ণ নূতন পরিবেশে জীবনদেবতার আকস্মিক উদ্বোধনে ও সুপরিকল্পিত প্রাণপ্রতিষ্ঠায়। ইহার মধ্যে প্রকৃতি ও তাহার অন্তর্নিহিত ভাবসত্তার সুষম সমন্বয় ঘটিয়াছে ও জীবনদেবতার লীলা একটা অভিনব প্রাণব্যঞ্জনায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছে। এখানে প্রকৃতিচেতনা মুখ্য ও জীবনদেবতার উদ্ভব তাহারই আনুষঙ্গিক ফলরূপে অনুভূত হওয়ায় কবিতাটি নিসর্গ-কবিতার পর্যায়ভুক্ত হইয়াছে। তবে প্রকৃতি-পরিবেশের মধ্যে কিছুটা অসঙ্গতি থাকায়—যেমন আলমোড়ার শৈল পটভূমিকার মধ্যে বাঙলার পল্লীজীবনদৃশ্য ও কবির সুপরিচিত খেয়া নৌকায় নদীপারের রূপকের অসংলগ্নতার জন্য—ইহা প্রথম শ্রেণীর কাব্যোৎকর্ষের অধিকারী হয় নাই।

হাজারিবাগ-প্রবাসকালে রচিত ৩৫ ('ওরে আমার কর্মহারা') ও ৩৬ সংখ্যক ('আমার খোলা জানালাতে') কবিতাদ্বয়ে চৈত্র মাসের উদাস, বস্তুবিবাগী আবহ কবিচিত্তে একটি বিশেষ mood বা অনুভবমণ্ডলের অপরূপ উদ্বোধনে ব্যঞ্জিত হইয়াছে। প্রথমটিতে কল্পলোকের দ্বারা কবি-চেতনার নিকট উন্মোচিত ও দ্বিতীয়টিতে শ্রান্তি ও সমাপ্তির চিত্রকল্পের অনুষঙ্গলালিত এক অজানা অতিথির নিখিলব্যাপ্ত ছায়াসত্তা ঘনীভূত হইয়াছে। এই দুইটি কবিতায় প্রকৃতির বর্ণনা অপেক্ষা উহার উদ্বোধনী মায়াই, উহার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ অপেক্ষা উহার ভাবসঙ্কেতই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। প্রথম কবিতায় কালের যাদুপ্রভাবে রূপকথার রাজকন্যার কল্পনামূর্তির উদ্বোধন অতি পুরাতন প্রেরণারই পুনরাবাহন মনে হইতে পারে। কিন্তু এই মূর্তির রূপদানে কবির সূক্ষ্ম অনুভবশক্তি ও অতীতচারণাদক্ষতা আশ্চর্যভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। এই বর্ষশেষের উতলা হাওয়ায় অবচেতন মনে সুপ্ত অতীত সংস্কার হঠাৎ লীলাচঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। পুরাতনের শাশ্বত সত্য আবার নবীন জীবনে প্রবুদ্ধ হইয়াছে। যে চিরন্তন ভাব লৌকিক সত্য-মিথ্যার অতীত, যাহা সম্ভব-অসম্ভবের সীমারেখার বাহিরে, জীবনের যে অনন্তরাগিণী যুগশাসন অতিক্রম করিয়া মানবহৃদয়ে অবিরাম ধ্বনিত, তাহাই আজ মন্ত্রবলে ছাড়া পাইয়া কবিমানসকে মুগ্ধ ও ধ্যানাবিষ্ট করিয়াছে। দূর আকাশ, মৌমাছি-

গুঞ্জন, কোমল ঘাস ও ফুলের গন্ধ, বায়ুহিল্লোলে জলের পুলকশিহরণ, নয়নে ঘুমের স্নিগ্ধ সঞ্চার—এই সকলের সহিত মানবজীবন যেন একই ছন্দে গাঁথা হইয়া গিয়াছে। সেই কল্পলোকের প্রণয়িনী, তাহার অতীতের প্রসাধনকলা ও অধুনা-বিস্মৃত ভাষারীতি লইয়া, এই মন্ত্রমুগ্ধ ভাববৃত্তেরই মানবিক প্রতীকরূপে ইহার কেন্দ্রসংহতি ও সার্থকতা বিধান করিয়াছে।

৩৬ সংখ্যক কবিতাটিতেও ('আমার খোলা জানালা') চৈত্রসন্ধ্যায় কবিচিত্তের ভাবাবিষ্টতার সূত্রে জীবনদেবতারূপ দিব্য সত্তার সঞ্চার ঘটিয়াছে। কিন্তু ইহার ব্যক্তিরূপ নানা মিশ্র ভাবানুষঙ্গজালের আবরণ ভেদ করিয়া সুস্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। গোধূলি কবির বাতায়নে আবির্ভূত হইয়াছে নানাবিধ নিঃসঙ্গতা ও কর্মবিরতির স্বপ্নজড়ান নিদ্রা ও বিহগকণ্ঠে সুপ্ত গীতির রেশ বহন করিয়া। এই কর্মজাল-গুটান অবসানের ছন্দেই, লৌকিক ভাল-মন্দ ও কর্তব্যাকর্তব্যের ক্ষণিক দ্বন্দ্বনিরসনের অবসরেই জীবনদেবতার অঞ্চলবায়ু, মৃত্যুস্নিগ্ধ স্পর্শ ও অহংবোধবিলোপী নিঃসীমতা কবি উপলব্ধি করিয়াছেন। অতিথির জ্বালান সন্ধ্যাপ্রদীপটি কবির গৃহকে অনন্ত নীলাকাশে, নক্ষত্রখচিত অনাদি রাত্রির নির্নিমেষ নয়নের অব্যবহিত নীচে প্রসারিত করিয়াছে। কবির বাসভবনের রুদ্ধ আবহাওয়ায় হঠাৎ যেন বিরাট কাল ও স্থান-ব্যাপ্তির সুর, সুদীর্ঘ জীবনপরিক্রমার নিবিড় শান্তি ও বিরতির ভাবসঞ্চয় সঞ্চারিত হইয়া গিয়াছে। ভাবোদ্বোধনের (evocation of mood) এই সাঙ্কেতিক সার্থকতাই কবিতাটির বিশিষ্ট উৎকর্ষ ও প্রকৃতি-চেতনার নিগূঢ়তার নিদর্শন।

সংযোজনা-অংশের ৯ ও ১০ সংখ্যক সনেট-জাতীয় কবিতা দুইটিতেও কবির নিসর্গদৃষ্টির মৌলিকতা ও ভাবস্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট হইয়াছে। প্রথমটিতে কবির পদ্মাপ্রীতির একটি নূতন প্রকাশ দেখি। ইহাতে 'উৎসর্গ'-কাব্যের সাধারণ ভাবধারার অনুবর্তনে পদ্মার বাহিরের প্রমত্ত চাঞ্চল্য ও অন্তরের প্রগাঢ় শান্তির বৈপরীত্য কবির অনুভবে ধরা পড়িয়াছে। পদ্মা যেন কোন প্রেমিকের জন্য তাহার নির্জন অন্তঃপুরে দ্বার-বাতায়নরুদ্ধ কক্ষে বাসরশয়ন বিছাইয়া রাখিয়াছে।

পরের কবিতাটিতে 'কড়ি ও কোমল'-এর সুরে কবি বসন্ত-প্রশস্তি গাহিয়াছেন। বসন্তের কনক-শ্যাম কিশলয়রাজি, উহার যৌবনমদস্রাবী আতপ্ত রৌদ্র, উহার পূর্ণিমানিশীথের চারু-প্রসাধিত প্রিয়মিলনের প্রত্যাশা-

মদির কটাক্ষটি কি নিঃশেষিত হইবার পূর্বে কবি নিজ কল্পনার হিরণ্যপাত্রে অক্ষয়সুধাসিঞ্চিত করিয়া সঞ্চিত রাখিয়াছেন? প্রকৃতি ও প্রেমের নিগূঢ়তম রসনির্যাস এই স্বল্পাবয়ব, মিতভাষী কবিতাটিতে স্মরণীয়ভাবে রক্ষিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের যে স্বল্পসংখ্যক চতুর্দশপদী কবিতায় সনেটের দৃঢ়পিনদ্ধ গঠনবিন্যাস ও আন্তরধর্ম নিখুঁতভাবে রক্ষিত হইয়াছে এটি সেই ব্যতিক্রমস্থানীয় রচনাবলীর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা।

হিমালয়সংক্রান্ত কবিতাগুচ্ছ যদিও প্রকৃতিবিষয়ক, তথাপি উহারা কবির স্বদেশ ও প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি নিষ্ঠাব দ্বারা এমন গভীর-প্রভাবিত যে উহাদের মধ্যে প্রকৃতি-পরিচয় গৌণ ও স্বাদেশিকতার সুরই মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে। উহাদের শব্দৈশ্বর্য ও ভাবজটিলতাও অনেকটা 'উৎসর্গ'-এর সাধারণ কাব্যপ্রকৃতির বিপরীত। সেইজন্য ঐ কবিতাগুচ্ছকে স্বদেশপর্যায়ভুক্ত করাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত মনে হয়।

ঙ. স্বদেশ

১৬, ও সংযোজন-অংশের ১২ ও ১৩ সংখ্যক কবিতা তিনটি স্বদেশ-প্রীতির ভাবোচ্ছ্বাসে স্ফীত। 'নৈবেদ্য'-এ প্রাচীন ভারতের জীবনাদর্শের উদাত্তগম্ভীর প্রশস্তি, এখানে গীতিকবিতার উচ্ছ্বসিত স্রোতে ও হৃদয়াবেগের বিগলিত ধারায় তরলিত হইয়াছে। ১৬ সংখ্যক কবিতায় ভারতের মহিমাময় প্রকৃতিসৌন্দর্যের ভাবমুগ্ধ বর্ণনার মধ্য দিয়া বিশ্বদেবতার কল্যাণ-অভিপ্রায়ের প্রতিফলন ও স্বদেশের সহিত বিশ্বদেবের একাত্মতার প্রতিপাদনই কবির বিশিষ্ট উদ্দেশ্যরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। 'বন্দেমাতরং' মহামন্ত্রে দেশমাতৃকার যে কল্যাণ ও-ঐশ্বর্যময়ী মূর্তিকল্পনা প্রথম কাব্যরূপ পায়, রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধক কবিতা সেই প্রতিষ্ঠিত ধারারই অনুসৃতি।

২৪ হইতে ৩০ পর্যন্ত সাতটি কবিতা আলমোড়া-প্রবাসী রবীন্দ্রনাথের চক্ষে হিমাচলমহিমা প্রাচীন ভারতের অধ্যাত্মসাধনা ও সংস্কারের মূর্ত বিগ্রহরূপে কিভাবে প্রতিভাত হইয়াছিল তাহারই বিস্ময়কর নিদর্শন। ইহাদের ভাব যেমন দুরবগাহ সাদৃশ্যব্যঞ্জনায় নিগূঢ়, প্রকাশরীতিও তেমনি জটিল শব্দব্যূহসমাবেশে ও সুদীর্ঘ সমাসগ্রন্থনে গ্রন্থিসঙ্কুল। এই কবিতাগুচ্ছে

রবীন্দ্রনাথ 'উৎসর্গ'-কাব্যের সহজ সরল রীতির স্বেচ্ছাব্যতিক্রম ঘটাইয়া দুরূহ তত্ত্বগহনে প্রবেশ করিয়াছেন ও বিষয়গৌরবের প্রতিস্পর্ধীরূপে কল্পনাকেও পার্বত্য অভিযানের তুল্য কৃচ্ছ্রসাধনে ব্রতী করিয়াছেন। শব্দ-সমারোহ ও ধ্বনিগাম্ভীর্যের সমস্ত ঐশ্বর্য-উপাদানকে সুদক্ষ সেনাপতির ন্যায় নিয়োগ ও পরিচালনা করিয়া তিনি দুর্গম পথের সমস্ত বাধা জয় করিতে চাহিয়াছেন, ও এই দুঃসাধ্য আয়াসে কিছুটা পথশ্রান্তি প্রকাশ পাইলেও অভীষ্ট ফললাভে ব্যর্থ হন নাই। 'কল্পনা' হইতে কবিচিত্তে প্রাচীন ভারতের ভাবাদর্শপ্রভাবের যে পরিচয় পুঞ্জীভূত, তাঁহার কবিকৃতিতে তৎসম-শব্দবহুলতা ও অতীতনিষ্ঠার যে নিদর্শন ক্রমসঞ্চিত হইয়াছে এখানে সেই প্রবণতাই শীর্ষবিন্দুতে পৌছিয়াছে। কবিজীবনের শেষে রচিত 'প্রান্তিক'-এ এই প্রবণতার আবার নব উন্মেষ ঘটিয়াছে, কিন্তু এখানে সমুদ্র-সঙ্গমসন্নিহিত নদীস্রোতের গতিবেগবৃদ্ধির ন্যায় পরলোকের সীমান্তে উপনীত কবিআত্মার মধ্যে যে দিব্যচেতনার জোয়ার আসিয়াছে তাহারই প্রবল আকর্ষণে দার্শনিক চিন্তা ও অধ্যাত্মঅনুভবের গুরুভার ভাবমহিমা সহজেই কাব্য-তরণীতে বাহিত হইয়াছে। এখানে কিন্তু হিমালয়ের অচল স্তব্ধতা ও ধ্যাননিমগ্ন অবয়ববিপুলতা কবিমনের কোন বেগবান প্রেরণায় গতিস্বচ্ছন্দতা লাভ করে নাই। হিমালয়ের মৌন নিশ্চলতার প্রতি কবি প্রায় একইরূপ মন্থরচারী, পাষাণপ্রতিম আন্তর প্রতিক্রিয়া নিবেদন করিয়াছেন। এ যেন এক মৌনের প্রতি আর এক অর্ধমৌনের ধ্রুপদী ভঙ্গীতে আরতি।

২৪ সংখ্যক কবিতাটির অষ্টকে ও ষট্‌কের দুইটি ভাবধারা কোন অন্তঃসঙ্গতিযুক্ত নয়। প্রথম অর্ধে হিমালয়ের নীরবতা যেন অর্ধপথে প্রতিরুদ্ধ সামসঙ্গীতের উর্ধ্বপ্রয়াণের আকস্মিক নীরবতায় পর্যবসান ও নির্ঝরধ্বনির মাধ্যমে সেই হারানো বাণীর পুনঃপ্রাপ্তির সাধনা। দ্বিতীয়ার্ধে কিন্তু সম্পূর্ণ নূতন ভাবদৃষ্টির প্রক্ষেপ ঘটিয়াছে। এখানে গিরিরাজের আকাশস্পর্ধী বহ্নিবেগউৎসার যেন নিজ অপরিমিত দুরাকাঙ্ক্ষার সীমা-সংহতি লাভ করিয়াছে ও অসীমচরণে এই শান্ত হৃদয়ের পূজা-অর্ঘ্য অঞ্জলি দিয়াছে। প্রথম অংশে যাহা স্বাভাবিক অধিকারের বৈধ পুনরুদ্ধার ছিল, তাহা দ্বিতীয় অংশে অশান্ত হৃদয়োচ্ছ্বাসের ভক্তি-প্রণোদিত আত্মদমনের অর্চনারূপ লইয়াছে।

২৫ সংখ্যক পদে এই দ্বিতীয় অংশের ভাবধারারই কাব্যোচিত সম্প্রসারণ ঘটিয়াছে। আত্মসংযম ও আত্মনিবেদনের পুরস্কারস্বরূপ হিমালয় উহার অগ্নিগর্ভ বিভীষিকার পরিবর্তে লাভ করিয়াছে শ্যামলতামণ্ডিত কোমল সৌন্দর্য ও আশ্রিত নরনারীর আনন্দময় আস্থা। হিমালয়ের 'বিবর্তন-ইতিহাস কবির কল্পনা ও অধ্যাত্ম আদর্শের অনুগামী হইয়া বিশ্বনীতি-বিধানের অঙ্গীভূত হইয়াছে। কাব্যসৌন্দর্যের দিক দিয়াও এই কবিতাটি অনবদ্য রমনীয়তা লাভ করিয়াছে।

পরবর্তী কবিতায় হিমালয়-মহিমা নূতন দৃষ্টিকোণ হইতে কবির কাব্য-প্রেরণাকে আকর্ষণ করিয়াছে। হিমালয় যেন উহার পাষাণস্তরময় পত্রগুলি খুলিয়া অনন্তকাল ধরিয়া এক মহাগ্রন্থপাঠে নিমগ্ন রহিয়াছে। কিন্তু কবি-কল্পনা এই যুগযুগান্তরব্যাপ্ত পাঠতন্ময়তার মধ্যে এক দৈব প্রেমলীলার নিগূঢ় মাধুর্যকোমলতা আবিষ্কার করিয়াছে। হিমালয় যে গ্রন্থের মধ্যে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া নিমজ্জিত তাহা যে শিব-শিবানীর প্রণয়গাথা কবি অকস্মাৎ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন। এই অতর্কিত ভাবপরিণতিকে ঠিক পূর্বাপরসঙ্গতি-বিশিষ্ট বলিয়া মনে হয় না।

পরের কবিতাটিতে (২৭) হিমালয়কে ভারত-তপস্যার পরম ফল ভূমানন্দের মূর্ত বিগ্রহরূপে কবি কল্পনা করিয়াছেন। হিমালয়ের শত শৃঙ্গ যেন শত বাহু ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত করিয়া উপনিষদের অমর আনন্দবার্তা ঘোষণা করিতেছে। ওঙ্কারমন্ত্রধ্বনি ও তপোবনপ্রজ্বলিত হোমাগ্নিশিখাই যেন হিমালয়ের বিরাট মেঘলোকচুম্বী, নিঃশব্দ পাষাণস্তূপে চিরন্তনরূপে বাঁধা পড়িয়াছে। এই সুন্দর কবিতাটির চতুর্থ পংক্তিটিই কেবল ইহার অনবদ্যতার সামান্য ত্রুটি বলিয়া প্রতীত হয়। 'নিষ্কলঙ্ক নীহারের অভ্রভেদী আত্ম-বিসর্জনে' পংক্তিটিতে যেন আলঙ্কারিকতা মাত্রাতিরিক্ত হইয়াছে।

২৮ সংখ্যক কবিতায় ২৬ নং-এর যে হরগৌরী-প্রেমলীলাকল্পনা বিসদৃশ ভাবে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল তাহা স্ববিরোধশূন্য প্রতিবেশে স্বতঃস্ফূর্ত সৌন্দর্য-মহিমায় বিকশিত হইয়াছে। হিমালয় এই প্রেমলীলার সমাধিমগ্ন পাঠকের ভূমিকা হইতে ইহার স্বভাবস্ফূর্তির পীঠস্থানের মহিমায় অধিষ্ঠিত হইয়াছে। হিমালয়ের সর্বত্র এই কোমলে-কঠোরে, এই রুক্ষে-শ্যামলে, এই অচলে-সচলে, এই শিলাস্তূপ-নির্ঝরপ্রবাহে প্রেমালিঙ্গনের একাত্মতা প্রকটিত হইয়াছে। কবির ভাষার মধ্যেও এই দ্বৈত ছন্দের মিলন অপূর্ব সমন্বয় লাভ করিয়াছে।

একদিকে

জটাপুঞ্জতুষারসংঘাত
নিঃশব্দে গ্রহণ করে উদয়াস্তরবিরশ্মিপাত
পূজাস্বর্ণপদ্মদল—

রূপকের নিবিড়, অঙ্গে অঙ্গে একীভূত আশ্লেষের উদাহরণ। অন্যদিকে—

যৌবনেরে ঘিরেছে গান, স্তব্ধেরে করেছে আলিঙ্গন
সফেন চঞ্চল নৃত্য, রিক্ত কঠিনেরে ঐ চুমে
কোমল শ্যামলশোভা নিত্যনব পল্লবে কুসুমে
ছায়ারৌদ্রে, মেঘের খেলায়।

এখানে যেন নৃত্যছন্দে প্রবাহিতা নির্ঝরিণীর গতিবেগ-সমুত্থ সৌন্দর্যফেনপুঞ্জের দ্রুত, ক্রীড়াচঞ্চল অগ্রগতি।

২৯ সংখ্যক কবিতায় উপমাটি অতি জটিল ও কবিতার সর্বাবয়বব্যাপ্ত। ইহার মধ্যে কষ্টকল্পনার অতিশ্রমজনিত ভ্রূকুঞ্চন সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্ন থাকে নাই। ইহা অনেকটা মহাকাব্যিক উপমার মত আয়তনস্ফীত, সনেটের ক্ষুদ্র দেহে ইহাকে অশোভন বোধ হয়। মহাসাগরের তরঙ্গস্ফীতি ছোট সরোবরে তটবিপ্লাবী বিক্ষোভ জাগায়। তা ছাড়া, উপমাতে একটু ত্রুটিও লক্ষণীয়। আলোকপানমত্ত সমুদ্র যেমন যে বাষ্পোচ্ছ্বাসে উহার আনন্দসংবেগ উৎক্ষিপ্ত করে সেই আবেগোৎসার হিমাচলের গুহায় সঞ্চিত ও মেঘাকারে ঘনীভূত হইয়া আবার সমুদ্রকে বর্ষাধারারূপে তাহার দত্ত সম্পদ ফিরাইয়া দেয়, ভারতের অধ্যাত্ম সাধনাও তেমনি হিমালয়ের গুহায় সঞ্চিত থাকে। কিন্তু উহার ঘনীভূত, বর্ষণোন্মুখ পরিণতি ও প্রত্যর্পণ-ক্রিয়াটি এ পর্যন্ত অসম্পূর্ণ আছে। সমুদ্রকে বর্ষাবারি খুঁজিতে হয় না, কবি কিন্তু গুহায় গুহায় এই অনাগত ঐশ্বর্যের অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছেন। সুতরাং সাদৃশ্যটি শেষ পর্যন্ত অঙ্গহীন হইয়াছে।

৩০ সংখ্যক কবিতাটি ভিন্ন প্রসঙ্গে রচিত হইলেও ভাবসূত্রসাম্যের জন্য একই পর্যায়ভুক্ত। জগদীশচন্দ্রের জড় ও উদ্ভিদ্‌জগতে প্রাণচেতনার আবিষ্কার আধুনিক বিজ্ঞানের একটি শ্রেষ্ঠ কীর্তি হইলেও ইহার মূল প্রেরণা প্রাচীন ভারতের অধ্যাত্ম অভীপ্সার সমগোত্রীয়। জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার যথার্থতঃ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগে ঔপনিষদিক ঋষির ধ্যানোপলব্ধি-

প্রসূত ব্রহ্মবাদেরই সমর্থন ও সম্প্রসারণ। সুতরাং রবীন্দ্রনাথও ইহাকে ভারতের অধ্যাত্ম সাধনার অঙ্গীভূত করিয়া দেখিয়াছেন ও জগদীশচন্দ্রকে প্রাচীন ঋষির বংশধররূপে অভিনন্দিত করিয়াছেন। তিনি বহুত্বের ছদ্মবেশের অন্তরালে অদ্বিতীয়ের রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়া ভারতের নিজস্ব ধ্যানদৃষ্টিরই সত্যনিষ্ঠতার নূতন প্রমাণ দিয়াছেন—ইহাতেই তাঁহার আসল কৃতিত্ব। ভাবের ও ভাষার উদাত্ত গাম্ভীর্যে ইহা তাঁহার হিমাচলসংক্রান্ত কবিতাগুচ্ছের সমধর্মী।

চ. মরণ

'স্মরণ'—কাব্য-আলোচনাপ্রসঙ্গে কবিমনে কবিপত্নীবিয়োগের প্রভাবের স্বরূপনির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছি। 'উৎসর্গ'-এর কয়েকটি কবিতা সেই শোকস্মৃতিপ্রভাবিত বলিয়া মনে হয়। রবীন্দ্রনাথ যদিও ব্যক্তিগত শোকোচ্ছ্বাসের কোন প্রশ্রয় দেন নাই ও অতি অল্পদিনে সমস্ত মনোবিকারের বহির্লক্ষণসমূহ হয় সান্ত্বনার প্রলেপে শান্ত, না হয় সার্বভৌম ভাবানুভূতির বিস্তারে উত্তাপহীন বা বিশ্বসৌন্দর্যের অঞ্চলতলে বিলীন করিবার সাধনা করিয়াছেন, তথাপি মাঝে মধ্যে হৃদয়ানলের দুই একটি স্ফুলিঙ্গ তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে বা নৈরাশ্যের গাঢ়তায় ও খেদপূর্ণ অনুযোগে জ্বালার স্পর্শ রাখিয়া গিয়াছে। 'উৎসর্গ'-এর ৩১ সংখ্যক কবিতাটি এইরূপ সান্ত্বনাহীন বিষাদের কৃষ্ণচ্ছায়াচ্ছন্ন। এখানে কবি যে নীরন্ধ্র, আশালেশহীন অবসাদের বর্ণনা করিয়াছেন তাহার মধ্যে যেন সদ্যোনির্বাপিত চিতাগ্নিধূমের দৃষ্টিবিভ্রমকারী অস্বচ্ছতা অনুভব করা যায়। খাঁচার পাখী তাহার হৃদয়বন্ধুকে (ইনি নিশ্চয়ই ঈশ্বর নহেন) ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছে যে তাহার চারিদিকে চিরপ্রলয়রাত্রি কি ঘনাইয়া আসিয়াছে ও প্রভাতের রশ্মি কি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে? এমন কি যে ক্ষীণ আলোকের ছলনা মরীচিকাবিভ্রান্তি সৃষ্টি করে তাহারও কি লেশমাত্র অবশিষ্ট নাই? উপসংহারে পিঞ্জরাবদ্ধ কবি তাঁহার পিঞ্জরমুক্ত দ্বৈত সত্তাকে অনুরোধ জানাইতেছেন যে সে যেন আলোকের অনির্বাণ অস্তিত্বের আশ্বাস ঘোষণা করে—অন্ধ কবি মুদিত নয়নেও সেই গান হইতে

কিছু সান্ত্বনা আহরণ করিবেন। রবীন্দ্রনাথের স্বভাবসিদ্ধ আনন্দবাদের এমন সামগ্রিক ব্যত্যয়, এমন পূর্ণ রাহুগ্রাস আর কখনও ঘটিয়াছে কি না সন্দেহ। ইহা ব্যাধিগ্রস্ত, কাল্পনিক দুঃখবাদের ভাববিলাসলালিত মনের রোগবিকার নয়, ইহা প্রাণপণ প্রয়াসে শোকসংযমে অক্ষম পরিণত প্রজ্ঞার অনিবার্য আত্মবিস্মৃতি, বর্মাবৃত হৃদয়ের কোন্ অরক্ষিত ও অতর্কিতবিদ্ধ অংশ হইতে অকস্মাৎ রক্তস্রাব।

৩৭ ও ৩৮ কবিতা জীবন-মৃত্যু-প্রহেলিকার অপূর্ব লীলারূপ-উদ্‌ঘাটন-প্রয়াস। কবির দার্শনিক প্রত্যয় এখানে জীবন-নাট্যের আপাত-অর্থহীনতার মধ্যে এক নিগূঢ় তাৎপর্য অনুভব করিয়া তাহারই বিস্ময়ানন্দে বিভোর। নাটকে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ হইতে বিরত থাকিলেই, নির্লিপ্তচিত্তে জগৎরঙ্গ পর্যবেক্ষণ করিলেই, বুঝিবার আগ্রহাতিশয্য দমিত হইলেই উহার চরম অর্থ সহজেই প্রতিভাত হইবে। সংসারজটিলতার প্রশান্ত স্বীকরণই উহার মর্মোদ্ভেদের প্রকৃষ্ট উপায়। ৩৮ নং কবিতায় এই তাৎপর্যের স্বরূপটি উপলব্ধ ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আসলে জীবন ও মৃত্যু, পাওয়া ও হারান, আবির্ভাব ও বিলয় সবই এক বিরাট লীলাশক্তির নিখিলব্যাপী ক্রীড়াছন্দের চক্রাবর্তন, সম্মুখ ও পশ্চাৎগতি। ইহার মধ্যে শোকের কিছুই নাই, ইহা কেবল দোলনাতে দোলার মত আনন্দ ও ভয়ের পালা করিয়া আসা-যাওয়া। এই হরণ-পূরণের লীলায় বিশ্বসৌন্দর্যের, সংসারের আনন্দ-সঞ্চয়ের কোন ক্ষয়-ক্ষতি নাই, পরিবর্তনের ছন্দেই ইহার চিরন্তনতা বিধৃত। এই দুরূহ তত্ত্বের লীলার দিক্‌টি কবি ভাষায় ও ছন্দে অপূর্বভাবে অভিব্যক্ত করিয়াছেন, তত্ত্বের রস-ও-সৌন্দর্যপরিণতি চমৎকারভাবে নিষ্পন্ন হইয়াছে।

৪০ ও ৪১ সংখ্যক কবিতা দুইটিতে, একটিতে প্রিয়জনের সহিত শেষ বিদায়ের ক্ষণটিকে করুণস্মৃতিরোমন্থন ও অপূর্ণ সাধের বেদনাগুঞ্জরণের ছন্দে মাধুর্যরসে জীয়াইয়া রাখা হইয়াছে ও অপরটিতে অসহায় একাকীত্বের দুঃসহতা নানা চিত্রকল্পের মাধ্যমে ও ক্ষোভমিশ্রিত স্বীকৃতির মনোভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রথমটিই কবির শোকার্তির যথার্থ পরিমাপক। কবি শোকের প্রত্যক্ষতার উপর রূপকের পাতলা যবনিকা টানিয়াছেন; তথাপি এই আবরণের মধ্য দিয়া গার্হস্থ্য অন্তরঙ্গতা ও দাম্পত্য প্রীতির সুরটি আরও পরিস্ফুট হইয়াছে। যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্মৃতিচিহ্নগুলি সঙ্গে লইয়া কবিজায়া অনন্তপথে যাত্রা করিয়াছেন—হাতে একটি রাঙা

সুতোর রাখী, বেণীতে একগাছি ম্লান ফুলের অযত্নগ্রথিত ও শিথিলবিন্যস্ত মালা, পায়ে এক জোড়া মৌন নূপুর, পুরাতন গানে রচিত বিদায়-সঙ্গীত—তাহাদের উল্লেখে অতৃপ্তি ও সামান্যতার জন্য ক্ষোভ, তাহাদিগকে ঘিরিয়া স্মৃতির আকুল আলুণ্ঠন ও শ্মশানযাত্রার অনুগমন এই সবই সমস্ত আকাশ-বাতাসকে একটি ঘরোয়া সুরে, একটি চাপাকান্নার মৃদুগুঞ্জনে বিহ্বল করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের শোকচিত্র সাধারণতঃ ঝাপসা রঙে আঁকা, তাঁহার শোকের প্রকাশ মৃদুস্বরে কথা বলিতে অভ্যস্ত বলিয়াই বর্তমান ক্ষেত্রে তাহা অন্তঃরুদ্ধ, অবদমিত আবেগের তাপকে আরও প্রবলভাবে বিকীর্ণ করিয়াছে।

মৃত্যুবিষয়ক কবিতাবলীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে ৪৫ সংখ্যক কবিতাটি। ইহা 'মরণ' নামে 'বঙ্গদর্শন'-এ ১৩০৯ ভাদ্রে প্রকাশিত হয়। সুতরাং ইহা কবিজায়ার মৃত্যুর কয়েকমাস পূর্বেই লিখিত ও মৃত্যুর প্রত্যক্ষ অভিঘাত-বেদনার দ্বারা অস্পৃষ্ট। মৃত্যুসম্ভাবনা কবিমনে কোন পূর্বগামিনী ছায়া ফেলিয়াছিল কি না তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিবার উপায় নাই। তথাপি মৃত্যুতত্ত্ব সম্বন্ধে কবির যে একটি সুচিরব্যাপী দার্শনিক কৌতূহল ছিল, মৃত্যুর স্বরূপ-নির্ধারণে তিনি যে একান্ত আগ্রহ পোষণ করিতেন, সেই ভাবসংস্কারপরিমণ্ডলের সহিত ইহা সম্পর্কিত।

এই কবিতাটিতে মৃত্যুর একটি সম্পূর্ণ অভিনব রূপ কবিকল্পনায় প্রতিভাত হইয়াছে। ইহার বীভৎস-সুন্দর, কান্তভীষণ ভাবসাঙ্কর্যের একটি অপূর্ব-সমন্বিত রূপবিগ্রহ যেন ইহাতে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। কবি মরণের নীরব অভ্যাগম, নিঃশব্দপদসঞ্চারে চেতনায় অনুপ্রবেশ ও ঐ চেতনাকে শিথিল-স্তিমিত অবসাদপাশে বেষ্টন করিয়া উহার অসাড়তা-সম্পাদন ঠিক রুচিকর মনে করেন না। তিনি মরণের সহিত বিবাহসম্বন্ধ কল্পনা করিয়া উহার আগমনকে বরাগমনের মত ঐশ্বর্যসমারোহমণ্ডিত দেখিতে চাহেন। মৃত্যুর এই দ্বৈত ভূমিকা রবীন্দ্র-কল্পনায় পূর্ব হইতেই বর্তমান ছিল, কিন্তু এই কবিতাটিতে কোন অজ্ঞাত প্রেরণায় তাহা বর্ণাঢ্য আভায় রঞ্জিত ও বেগবান আবেগ-উৎসারে উৎক্ষিপ্ত হইল। মহাদেবের উদ্ভটবেশচর্চিত, শ্মশানসজ্জা-প্রসাধিত বিবাহ-যাত্রা ও উহার ফলে কন্যার পিতা-মাতা ও কন্যার মনে ক্রমান্বয়ে জুগুপ্সা ও শঙ্কিত আনন্দের সঞ্চার কবিকে এই দ্বৈত ভূমিকার পুরাণ-খ্যাত ও সংস্কারসিদ্ধ উদাহরণ যোগাইয়াছে। মৃত্যুঞ্জয়ের এই মূর্তি আশ্রয় করিয়াই কবির মৃত্যুকল্পনা নানাবিধ উদ্ভট-সুন্দর চিত্রসৌন্দর্যে ও

খেয়ালী ভাবোচ্ছলতায় দূর-বিসর্পিত হইয়াছে। লেখক গৌরীর মত বধূবেশে সজ্জিত হইয়া কম্প্রবক্ষে, শঙ্কা-পুলকমিশ্র অনিশ্চয়তায় বিবাহোত্তর যাত্রায় বরবেশী মরণকে অনুগমন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। মরণ তাঁহার অন্তরে একটি আতঙ্ক-হিম উৎসবরাগিণী বাজাইয়াছে। মরণের অনুগমনে তিনি অভ্যস্ত কাজের অন্যমনস্কতা ও অজ্ঞাত বিপদের সঙ্কেত সমস্ত অগ্রাহ্য করিয়া প্রলয়বন্যার রক্তবরণ জলোচ্ছ্বাসে অবগাহন করিবেন। শঙ্খের শূন্য কুহরে উদাত্ত ধ্বনির মত মৃত্যুর নঞর্থক রিক্ততা হঠাৎ এক সমৃদ্ধ, পরিপূর্ণ আনন্দ-নিবিড়তায় তাৎপর্যময় ও শুভসঙ্কেতবহ হইয়া উঠিয়াছে। মরণের আত্ম-বিলোপ শ্মশানচারীর ভাবানুষঙ্গে জীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতালগ্নের পরম বিকাশে রূপান্তরিত হইয়াছে; হরণ ও পূরণের সমধর্মিতা আশ্চর্যভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে। কীট্‌সের 'richness of death' মহেশ্বরের মহৈশ্বর্যচ্ছটায় বর্ণবৈভব-ঋদ্ধ ভাবসত্যরূপে সৌন্দর্যলোকে শাশ্বত স্থান গ্রহণ করিয়াছে।

ছ· নারী ও নারীপ্রেম

৩৪ সংখ্যক কবিতায় ('আমি যারে ভালবাসি সে ছিল এই গাঁয়ে') এক কল্পনামধুর পল্লী-প্রতিবেশে কবি তাঁহার প্রণয়িনী পল্লীসুন্দরীকে স্থাপন করিয়াছেন। এখানে নারী গৌণ, প্রতিবেশচিত্রই মুখ্য। নারীর ব্যক্তি-সত্তা যেন গ্রামপ্রকৃতিচিত্রের বর্ণবিরল, অথচ মমতাময় ও অন্তরঙ্গ রূপব্যঞ্জনা হইতে উহার মাধুর্য আহরণ করিয়াছে। সমস্ত বর্ণনার উপর একটি অনির্দেশ্যতার কুহেলি-আবরণ যেন কবির প্রেম ও নেপথ্যবাসিনী প্রেমিকাকে রূপকথার মায়ালোকে লইয়া গিয়াছে।

৪৪নং কবিতাটি ('আমাদের এই পল্লিখানি পাহাড় দিয়ে ঘেরা') কবির পল্লীবিয়োগব্যথাকে স্বপ্নানুভূতির মধ্য দিয়া ও রূপকের লঘুস্পর্শে আরও করুণ ও মর্মান্তিকরূপে দেখাইয়াছে। এখানেও পাহাড়ের ধারে ঝরণাতলা সেই নারীর জীবনের কেন্দ্রবিন্দু ও লীলাক্ষেত্ররূপে কল্পিত। ঝরণায় ঘট ভরিবার উপলক্ষ্যেই তাহার সহিত প্রতিবেশিনীদের প্রীতিবিনিময় চলিত। এই ঝরণারই মৃদু ধ্বনি নিদ্রাচ্ছন্ন সেই মেয়েটির স্বপ্নলোকের আঁকাবাঁকা পথে থামিয়া যাইত। হঠাৎ পাহাড় হইতে নামিয়া-আসা এক সন্ন্যাসী দেবদারু-

বনে সেই ঝরণাতলায় আসন বিছাইলেন ও পরদিন প্রভাতে মেয়েটি তাহার সমস্ত চিরপরিচিত প্রতিবেশ হইতে অন্তর্হিত হইল। তাহার পর কবি যেন একদিন তাহাকেই পরিবর্তিত রূপে দেখিতে পাইলেন ও জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে যে নূতন স্থানে সে বাস করিতেছে তাহা পর্বতবাধামুক্ত, অসীমপ্রসারী সমতলভূমি ও সেখানে কৃশকায়া ঝরণাটি পূর্ণতোয়া নদীতে স্ফীত হইয়াছে। মানব সহচরদের অভাবে সে ক্লিষ্ট কিনা সেই প্রশ্নের উত্তরে জানিলেন যে তাহারা সকলেই তাহার হৃদয়মূলে সংরক্ষিত। এখানে সন্ন্যাসীকে মৃত্যুদূত, পাহাড়-ঘেরা ঝরণাঘেঁষা গ্রামকে অনন্ত হইতে অবরুদ্ধ শীর্ণধারায় প্রবাহিত মানবজীবন ও মেয়েটির আকস্মিক অন্তর্ধান ও তাহার রূপান্তরিত সত্তার সহিত সাক্ষাৎ মৃত্যু-অপহৃত প্রিয়জনের সহিত স্মৃতিলোকে মিলনের রূপকহিসাবে নির্দেশ করিলে হয়ত কষ্টকল্পনার প্রশ্রয় দেওয়া হইবে না। সমস্ত কবিতাটির করুণ স্মৃতিচর্যা ও অতীত-উদ্বোধনের মধ্যে একটি বঞ্চিত হৃদয়ের রুদ্ধ কান্না গুমরাইয়া মরিতেছে। রূপকের মধ্যবর্তিতায় আঘাতের তীব্রতার মধ্যে একটি কোমলতা-সঞ্চার, রূঢ় বাস্তবের উপর কল্পনার একটি দূরত্ব-প্রক্ষেপের আর্ত প্রয়াস শোকগাথার প্রখর স্বরূপকে কতকটা মন্দীভূত ও আবৃত করিয়াছে। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে কবিতাটি কবিজায়ার মৃত্যুর মাত্র দুই মাস পরে লেখা ও শোকস্মৃতিভারাক্রান্ত জোড়াসাঁকোই উহার রচনাস্থল। 'স্মরণ'-এর প্রশান্তি সবটাই যে অকৃত্রিম নয় এবং অপ্রশমিত শোকের উদ্বৃত্ত অংশ যে নানা ছল-চাতুরীতে, নানা অস্বীকৃত পরোক্ষ-উপায়ে মুক্তিপথ খুঁজিতেছে তাহা এই কবিতায় প্রমাণিত হয়।

৪৩ সংখ্যক কবিতায় ('সাজ হয়েছে রণ') নারীর যে পঞ্চবিধ রূপকল্পনা করা হইয়াছে তাহা ঠিক রোমান্টিক ভাবাবেগপ্রমত্ত, আদর্শবিলাসমুগ্ধ কবিদৃষ্টির অনুসরণ নয়। ইহার পিছনে বাস্তব অভিজ্ঞতার গাঢ়তা, বৈচিত্র্য ও অনুভূতি-যাথার্থ্যের প্রভাব লক্ষিত হয়। ইহার কবি 'কড়ি ও কোমল', 'মানসী', 'সোনার তরী' ও 'চিত্রা'র স্তরকে অতিক্রম করিয়া জীবনের আরও অনেক দুঃখতপ্ত, ক্লান্তিপরিকীর্ণ পথযাত্রা সমাপ্ত করিয়াছেন। সংসারযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত কবি এখন সুন্দরী নারীর রোগজ্বালানিবারক সেবা, কল্যাণী নারীর পুণ্য অভিষেক, আনন্দময়ী নারীর পথশ্রান্ত প্রবাসীর প্রতি প্রসারিত আতিথেয়তা, বিদায়োন্মুখ পুরুষের প্রতি অশ্রুময়ী নারীর উৎসর্গিত কল্যাণ-কামনা ও ইষ্টপূজায় সহযোগিনী তাপসিনী নারীর উপচার-সম্ভার—সবই

আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন। এখন নারী রূপসম্ভোগ ও আদর্শকল্পনার সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্র হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সংসারের অসংখ্য কর্তব্যসঙ্কটে, যাত্রাপথের নানা বিচিত্র সংঘাতে, কর্মপ্রেরণার বিবিধ শক্তিসঞ্চারে পুরুষের পার্শ্ববর্তিনী হইয়াছে। কবিতাটি কাব্যগুণে বিশেষ সমৃদ্ধ না হইলেও নারীশক্তিকে জীবনের একটি ব্যাপকতর ক্ষেত্রে আবাহনে বিশিষ্ট হইয়াছে।

৩২ সংখ্যক কবিতাটিতেও ('যদি ইচ্ছা কর তবে কটাক্ষে হে নারী') নারীপ্রশস্তি গৃহকার্যনিরতা ও আত্মপ্রশংসায় উদাসীনা কবিজায়ার স্মৃতি-ভাবিত বলিয়াই মনে হয়। 'স্মরণ'-এ কবিপত্নীর যে চরিত্রবৈশিষ্ট্য নির্দেশিত হইয়াছে এই কবিতাটির নারীমহিমাঘোষণা ঠিক সেই আদর্শের প্রতিই শ্রদ্ধাঞ্জলিনিবেদন। শুধু স্মৃতিবর্ণনায় নয়, চরিত্রমাহাত্ম্যেও কবিপত্নী ব্যক্তিসত্তার ঊর্ধ্বে সার্বভৌমতায় উন্নীত হইয়াছেন।

অষ্টম অধ্যায়

শিশু ও খেয়া

১

'শিশু'-পর্যায়ে একত্রিত কবিতাবলী বিভিন্ন সময়ে রচিত ও বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থে সন্নিবেশিত। শিশু-মনের প্রতি ঔৎসুক্য-আকর্ষণ রবীন্দ্রনাথের একটি সহজাত কাব্যপ্রেরণা। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি 'ভারতী', 'বালক', 'ভারতী ও বালক', 'মুকুল' ও 'বঙ্গদর্শন' প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত ও সময়ের দিক দিয়া ইহাদের রচনা ১২৮৭ হইতে ১৩১০ বা প্রায় শতাব্দীপাদ ধরিয়া ব্যাপ্ত। 'রুদ্রচণ্ড', 'প্রভাত সংগীত', ছবি ও গান', 'কড়ি ও কোমল', 'সোনার তরী', 'চিত্রা', 'ক্ষণিকা' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে ইহাদের অনেকগুলি প্রথম অন্তর্ভুক্ত হয় ও কোন কোনটি শেষ পর্যন্ত 'শিশু'-কাব্য হইতে অন্যত্র স্থানান্তরিতও হইয়াছে।

বর্তমান 'শিশু'-কাব্যে সংগৃহীত ৬১টি কবিতার মধ্যে ৩১টি কবিতা আলমোড়া-প্রবাসকালে ৪—৩১ শ্রাবণ ১৩১৩ মধ্যে রচিত। মনে হয় যে পত্নীবিয়োগের দুঃসহ বেদনা ও দ্বিতীয় কন্যার সাংঘাতিক অসুস্থতার উদ্বেগের নিঃশব্দে অন্তর-গভীরে পরিপাকসময়েই শিশু-মনের রহস্য ও শিশুর প্রতি স্নেহানুভবের আবেগ কবিচিত্তে ঘনীভূত রূপ ধারণ করে। শিশুকবিতার পূর্বধারার সহিত এই যুগে লেখা কবিতাগুচ্ছ যেন একটি তীব্রতর স্রোতোবেগ ও সূক্ষ্মতর ভাবসৌকুমার্য সংযুক্ত করিয়াছে। পরলোকগতা মাতা ও পরলোকযাত্রিণী মেয়ের সহযোগিতায় যে অদৃশ্য ট্রাজেডির ভাবপরিমণ্ডল কবিচিত্তে বর্ষামেঘের মত ঘনাইয়া আসিয়াছিল তাহারই ছায়ানিবিড়তার আশ্রয়ে এই কবিতাগুলি শিশুমনের উপরিকার চাঞ্চল্য ভেদ করিয়া মাতার স্নেহকল্পনার মূল রহস্যের অতলে ডুব মারিয়াছে। তথাপি শিশুপ্রকৃতির মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি, শিশুরহস্য-অনুসন্ধানের কৌতূহল কবিমনে ১২৮৭ সাল হইতেই, 'সন্ধ্যাসংগীত' ও 'রুদ্রচণ্ড''-এর যুগ হইতেই প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ১৩১০ শ্রাবণে লেখা কবিতাগুলি মায়ের অনুভূতি দিয়া শিশুমনের মাধুর্য-আস্বাদনের, মা ও ছেলের সম্বন্ধের অন্তরঙ্গতা ফুটাইয়া তুলিবার প্রেরণাকে কবিচেতনায় মুখ্য স্থান দিয়াছে। মনে হয় কবি তাঁহার স্বর্গগতা সহধর্মিণীর

মাতৃমূর্তি স্মরণ করিয়াই, তাঁহাকে সন্তানবৎসলা জননীরূপে অনুভব করিয়াই এই কবিতাগুলি রচনা করিতে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন।

এই কবিতাগুলিকে কয়েকটি পরস্পর-সম্পর্কিত, অথচ স্বতন্ত্রভাবে পরিকল্পিত শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—

(ক) শিশুচরিত্রের খেয়াল-খুশীতে ঋতুপর্যায়-আবর্তনের ছন্দরূপ

(খ) বয়স্ক ব্যক্তির শৈশবস্মৃতিরোমন্থন ও উহারই মাধ্যমে শিশুমন-বিশ্লেষণ, শিশুপ্রকৃতির মাধুর্য-আস্বাদন ও মৃত্যুবেদনার বিমূঢ় উপলব্ধি

(গ) মাতার স্নেহ-কল্পনায় শিশুর প্রতি বিস্ময়রহস্যবোধ ও শিশুর আত্মকথা ও প্রশ্নকৌতূহলের ভিতর দিয়া উভয়ের অপরূপ একাত্মতার প্রকাশ ও দ্বৈতলীলাভিনয়।

(ক) পর্যায়ের কবিতাগুলির আলোচনা করা যাইতে পারে—

এই পর্যায়ের কবিতাগুলি রচনাকালের দিক দিয়া সর্বাগ্রবর্তী ও ভাবের দিক দিয়া কবির আদি যুগের কাব্যের সমধর্মী। 'শীত', 'শীতের বিদায়' ও 'ফুলের ইতিহাস'—যথাক্রমে ১২৮৭, মাঘ, ১২৯২, বৈশাখ ও ১২৮৮ 'রুদ্রচণ্ড'-কাব্যের অন্তর্ভুক্তরূপে লেখা।

শীতের আগমনে বসন্তের দুরন্ত বাল্যপ্রাণোচ্ছ্বাস শুব্ধ হইয়া গিয়া প্রকৃতির অন্তরে নানা বালসুলভ প্রশ্ন জাগাইয়াছে। বসন্ত ছোট ছেলের মত বিশ্বের নিয়মশৃঙ্খলা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। বনানীর এই রিক্ততায় সে কেবল হতবুদ্ধি; সে মনে করে যে শুষ্ক, হৃদয়হীন জ্ঞানের সঙ্গে প্রকৃতির আনন্দহিল্লোলের একটা চিরন্তন বিরোধ। সে কেবল অকারণ আশাবাদে নির্ভরশীল হইয়া সুদিনের প্রত্যাশায় বুক বাঁধিয়া থাকে। তাহার পর বসন্তের নব-উন্মেষে যেন এক ক্রীড়াশীল শিশু জাগিয়া উঠিয়া সমস্ত নবজাত সৌন্দর্যের সহিত খেলায় মাতিয়া উঠে। এই নবোন্মেষিত প্রকৃতির প্রাণকেন্দ্র হইতে শীতের প্রতি একটি স্বতঃস্ফূর্ত বিমুখতা ধ্বনিত হয়—বালকের মত সে বৃদ্ধের সান্নিধ্য-অসহিষ্ণুতা ঘোষণা করে। তাহার রুচির অনুশাসনই তাহার নিকট বিশ্বনিয়মের চরম সত্য।

'শীতের বিদায়' কবিতায় এই বসন্তবালকের স্নেহময় দৌরাত্ম্যে শীত অতিষ্ঠ হইয়া পড়ে। প্রাণলীলার পিচকারীবর্ষণে, খেলায় মত্ত আতিশয্যে, বিশ্বব্যাপী উল্লাসের প্রচণ্ড স্রোতে শীত বিদায় লইতে বাধ্য হয়। ফুলের পরাগবৃষ্টি, উহার

সৌরভপ্রবাহ, সমস্ত চেতন ও অচেতন প্রকৃতির কৌতুক-ষড়যন্ত্র পলায়মান শীতের পিছন পিছন হাততালি দিয়া উহার অন্তর্ধানকে দ্রুততর করে।

'ফুলের ইতিহাস' কবিতাটি শৈশবকল্পনার দুইটি বিপরীত দৃশ্যের সমবায় মাত্র, একটি দুই দৃশ্যে সম্পূর্ণ ক্ষুদ্র নাটক। দিনের শেষে স্বল্পায়ু ফুলের চরম সর্বনাশের ব্যর্থতায় জীবনের পূর্ণ সার্থকতার অবসান হয়। শিশু যদি জীবনের দার্শনিক হইত, তাহা হইলে তাহার দর্শনতত্ত্বে জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে কোন ব্যবধান থাকিত না ও সমস্ত জীবন ফুলের ন্যায় ক্ষণধর্মীরূপে প্রতিভাত হইত। রবীন্দ্রনাথের 'ছবি ও গান'-এ জীবনের যে খণ্ডদৃশ্য ছবির রেখায় ধরা ও গানের সুরে মর্মায়িত তাহারই অনুরূপ প্রবণতা এখানে লক্ষিত।

এই তিনটি বাল্যরচনায় শিশুর একমুখী মনোভঙ্গী ও ক্ষণিকানুভূতি, সমস্ত বিশ্বনিয়মকে একটি কৌতুকময় খেলার হার-জিত রূপে দেখার প্রবৃত্তির ভিতর দিয়া ঋতুর আবির্ভাব-অন্তর্ধান-ছন্দটিকে অনুভব করা হইয়াছে।

(খ) দ্বিতীয় পর্যায়ে অনেকগুলি সুর শোনা যায় —

প্রথমতঃ বাবা অথবা মায়ের সঙ্গে মেয়ের কোমল মায়ামমতামাখান, বিচ্ছেদকাতর, আশঙ্কাদুর্বল ও স্নেহউদ্বেল সম্পর্ক। যথা—

'অস্তসখী' (অগ্রহায়ণ ১২৯১), 'মালক্ষ্মী' (জ্যৈষ্ঠ ১২৯২), 'সাতভাই চম্পা' (আষাঢ় ১২৯২), 'হাসিরাশি' (শ্রাবণ ১২৯২), 'পরিচয়' (কড়ি ও কোমল—১ম সংস্করণের অন্তর্ভুক্ত), 'বিচ্ছেদ' (কড়ি ও কোমল—১ম সংস্করণের অন্তর্ভুক্ত), 'আকুল আহ্বান' (আশ্বিন—কার্তিক ১২৯২), 'উপহার' (চৈত্র ১২৯২), 'আশীর্বাদ' (বৈশাখ ১২৯৩), 'পাখির পালক' (শ্রাবণ ১২৯৩), 'পূজার সাজ' (১৩০২), ও 'কাগজের নৌকা' (১৩০৮)।

'অস্তসখী' কবিতায় অস্তোন্মুখ ক্ষীণ চাঁদ ও প্রভাতের শুকতারার রূপকে সুখসৌভাগ্যরিক্ত ও নিঃসঙ্গ জীবনের ম্লান পথে যাত্রিণী মায়ের সহিত মেয়ের প্রভাতের আলোকরূপ নব আশাবহনের করুণ-মধুর সম্পর্কটি ব্যঞ্জিত হইয়াছে। উষার উদয়ের পূর্বে ও অস্তমিত নক্ষত্রমণ্ডলীর তিরোধানে আকাশের যে ধূসর, বর্ণহীন ছবিটি প্রকটিত হয়, তাহাই কবি অতি সূক্ষ্ম রেখায় ও সংবেদনশীল অনুভবশক্তির দ্বারা চিত্রিত করিয়াছেন। একেবারে

শেষ পংক্তিতে আলোকগ্রন্থি দ্বারা আবদ্ধ বর ও বধূর উপমাটি যেন ভাব-কল্পনার সঙ্গতিকে ক্ষুন্ন করিয়াছে।

'মালক্ষ্মী', 'হাসিরাশি', 'পরিচয়' ও 'উপহার' কবিতাচতুষ্টয়ে বাবা ও ছোট মেয়ের স্নেহবিগলিত, আদরপ্লাবনে উচ্ছ্বসিত, অত্যুক্তি-সমাবেশে অমিতভাষী সম্বন্ধটি যেন আবেগের মহাসাগরে ভাসমান কয়েকটি বিচ্ছিন্ন তথ্যদ্বীপের মত প্রতীয়মান হয়। স্নেহপ্রকাশে অপরিতৃপ্ত পিতৃহৃদয় নিজ অপরিমিত ভালবাসা লইয়া ভাষা ও ছন্দের বন্ধনের মধ্যে কোন মতে প্রকাশ-যাথার্থ্যের দাবী পূরণ করিয়াছে। অনুভবের সত্য যেন অভিব্যক্তির সত্যকে বহুদূরে ছাড়াইয়া গিয়া কষ্টে সমতা রক্ষা করিয়াছে। হাজার নামে প্রিয়-পাত্রকে ডাকিয়া, হাজার উপমা-রূপকে একই স্নেহবুভুক্ষাকে মুক্তি দিয়া, হাজাব কল্পনায় উহাকে সাজাইয়া, ভালবাসার ভাবগদ্গদ ভাষায় আভিধানিক ভাষাকে আচ্ছন্ন করিয়া কবি কোন প্রকারে তাঁহার অন্তরের বিপুল উচ্ছ্বাসকে সর্বজনবোধ্যতার তীরে লাগাইয়াছেন। ইহাদের উপর 'ছিন্নপত্র'-এ উল্লিখিত কবির কনিষ্ঠা কন্যার সহিত তাঁহার যে হৃদয়গলান, মধুক্ষরা সম্পর্কটি বর্ণিত হইয়াছে তাহার সুস্পষ্ট প্রভাব পড়িয়াছে। মায়ের সঙ্গে খোকার যেমন, বাপের সঙ্গে খুঁকির তেমনি একটি বিশেষ আকর্ষণ এখানে একটি অলক্ষ্য আবর্তের ইঙ্গিত দিয়াছে।

'মালক্ষ্মী'তে বাবা মেয়ের চোখে বিষণ্নভাব দেখিয়া উদ্বেগ প্রকাশ করিতেছেন। এই দুঃখ-ভরা জগতে সে যে সুধাবৃষ্টি করে, তাহার জন্ম যে কোন্ অজানা আনন্দলোকে, ও কঠিন কথা শুনিলে সে যে আবার অন্তর্হিত হইতে পারে এ বিষয়ে পিতা সর্বদা ব্যাকুলভাবে সচেতন। সে যে ধরণীর কঠোরতার মধ্যে দেবলোকের প্রসাদ ও পৃথিবীর সমস্ত কোমল, ক্ষণিক সৌন্দর্যের ন্যায় প্রতিবেশের সঙ্গে তাহার সম্পর্ক যে অত্যন্ত শিথিল ও ভঙ্গুর, তাহা ভাবিয়া তিনি সদা-শঙ্কিত। মা-এর মত বাপও সন্তানের রহস্যলোক হইতে উদ্ভবের কথা জানেন, কিন্তু এই অনুভূতি মায়ের কাছে যত গভীর ও নাড়ীর বত্রিশ পাকে জড়ান, বাপের কাছে ততটা নয়। বাপের কাছে সে কেবলমাত্র বিস্ময়, মায়ের কাছে সে সত্তারহস্যের একটি আশ্চর্য প্রকাশ।

'হাসিরাশি'-তে ও 'পরিচয়'-এ ছোট মেয়ের শৈশবলীলা—তাহার মন-ভোলান, সুধাস্রাবী মুখের হাসি ও অঙ্গভঙ্গীর লাবণ্য, তাহার দুরন্তপনার অস্থির তরঙ্গক্ষেপ ও তাহার স্বভাবের মুহূর্তে মুহূর্তে নব নব রূপে দৃশ্যমান,

অসংখ্য বিচিত্র ছন্দে উৎক্ষিপ্ত প্রকাশকে একটি একক নামকরণের মধ্যে বাঁধিয়া রাখার অসম্ভাব্যতা পিতার মনে এক ভাবোদ্বেল মমতার আতিশয্যে তরঙ্গিত হইয়াছে। প্রথম কবিতায় সুকুমার সৌন্দর্যবোধ ও দ্বিতীয়টিতে নির্মল স্নিগ্ধ রসিকতার বায়ুতাড়িত স্নেহের শীকরবৃষ্টি আশ্চর্য কোমলতার ভাববৃত্ত রচনা করিয়াছে।

'উপহার'-এ উপহারদ্রব্যের সাহায্যে স্নেহের বিস্মৃতি-ঠেকান সংরক্ষণের ব্যর্থতা, স্নেহের চির-অতৃপ্ত দাবীর সহিত প্রদত্ত জড় উপকরণের অসামঞ্জস্য, শিশুর চিরচঞ্চল মনকে ও সর্বগ্রাসী আদর-ক্ষুধাকে বাহিরের স্নেহচিহ্ন-সঞ্চয়ের দ্বারা জয় করার দুরূহতা পিতার মমতাময় হৃদয় ক্ষোভের সহিত উপলব্ধি করিয়াছে ও তাহার অনুভূতিতে একটি সূক্ষ্ম বেদনার ছায়াপাত হইয়াছে। এই বেদনা একটি চমৎকার উপমায় ঘনীভূত রূপ লইয়াছে। নদী তাহার উৎসস্থলের পাষাণবন্ধনকে অতিক্রম করিয়া দূর সাগরের দিকে অগ্রসর হয় ও ক্রমেই সেই পিতৃগৃহের কথা ভুলিয়া যায়। কিন্তু পাহাড় হইতে উৎসারিত ঝরণা পিতৃহৃদয়ের চিরন্তন আশীর্বাদের মত নদীর বর্ধিত স্রোতোবেগ ও বিপুলতর বিস্তারের তলদেশে অদৃশ্যভাবে মিশিয়া থাকে। মেয়ের মন সম্মুখদিকে ধাবমান আর প্রৌঢ় পিতার মন অতীত-রোমন্থনের দীর্ঘ অবকাশে নিরুদ্ধগতি—কাজেই একে অপরের নাগাল কেমন করিয়া পাইবে ?

'পাখির পালক'—কবিতায় মেয়ে যে একটি পাখির রঙীন পালক কুড়াইয়া পাইয়া পুলকরোমাঞ্চিত ও ঔৎসুক্যের আতিশয্যে বিহ্বল, মা তাহাকে সামান্য বলিয়া অবজ্ঞা করিয়া মেয়ের মনে নিদারুণ আঘাত দিয়াছে। ইহার ফলে মা ও মেয়ের মধ্যে একটা দুস্তর ব্যবধান গড়িয়া উঠিয়াছে ও মেয়ে তাহার সমস্ত উৎসাহ মায়ের নিকট হইতে গোপন রাখিতে অভ্যস্ত হইয়াছে। এ কবিতাটি মায়ের সহানুভূতির অভাবের একটি বিরল দৃষ্টান্ত। মেয়েটির মন দিয়া পালকটির বর্ণনা একটি আশ্চর্য ব্যঞ্জনাশক্তির অপরূপ প্রকাশ। একটি তুচ্ছ পালক বালিকার রূপমুগ্ধতা ও ভাবোদ্বেলতার মাধ্যমে এক অপূর্ব অনুরঞ্জন লাভ করিয়া নন্দনের পারিজাতকুসুমের মহার্ঘতায় ও সুরভিত পরিবেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই বর্ণনাটি অপেক্ষাকৃত তরুণ কবির কাব্য-শক্তির অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

'পূজার সাজ' (১৩০২) ও 'কাগজের নৌকা' (১৩০৮) পরবর্তী কালের রচনা। প্রথমটিতে নীতিকথার প্রবর্তন হইয়াছে ও দ্বিতীয়টিতে শিশুর

নৌকাভাসান খেলা বয়স্ক কল্পনার উচ্চতর বিন্যাসকৌশল ও গভীরতর ভাবোদ্বোধনের পরিণতি লাভ করিয়াছে। সাধারণতঃ 'শিশু' কবিতাগুচ্ছে কবি নীতিকথার অনুপ্রবেশের কোন প্রশ্রয় দেন নাই। শিশুর রুচি ও কল্পনা যে কাল্পনিক জগৎ রচনা করে তাহাতে সংসার-অভিজ্ঞতার পরিমিতি-বোধের ন্যায় সংসারজ্ঞানপ্রসূত নীতিবোধও অপ্রাসঙ্গিক। পিতা-মাতা ও সন্তানের বাৎসল্য-নির্ভরতারচিত সম্পর্কটি একটি সহজাত বৃত্তি; তাহার মধ্যে ভবিষ্যৎ নৈতিকতার বীজ থাকিলেও তাহা এখনও জীবননীতির দৃঢ় আশ্রয়ভূমিতে শিকড় সঞ্চালন করে নাই। কিন্তু এই কবিতাটিতে এক দরিদ্র পরিবারের দুই ছেলে, মধু ও বিধুর দরিদ্রপিতাসংগৃহীত পূজার পোষাকের প্রতি মনোভাবের পার্থক্য নীতিপ্রচারের অবকাশ দিয়াছে। মধু ধনী প্রতিবেশীর দয়ার উপহার রেশমী পোষাক ও জরির টুপি পাইয়া আত্মপ্রসাদে স্ফীত হইয়াছে; আর বিধু সাদা ধুতিচাদরকেই সানন্দে বরণ করিয়াছে। মাতা এখানে দুই ছেলের আচরণ-পার্থক্য প্রসঙ্গে একটি অতি-সাধারণ নীতিবাক্য উচ্চারণ করিয়া শিশু-কাব্যের সামগ্রিক সুরসঙ্গতির বৈপরীত্য ঘটাইয়াছেন।

'কাগজের নৌকা'—শিশুখেলার অঙ্গ বটে, কিন্তু ইহা যে পণ্য বোঝাই করিয়া স্রোতে ভাসিয়াছে তাহা শিশুকল্পনার লঘু খেয়াল নয়, পরিণত মননের শিল্পসৌন্দর্যসৃষ্টির ওজনে-ভারী সম্ভার। কবি যেন শিশুর হাত হইতে কলম কাড়িয়া লইয়া নিজ গভীরতর অনুভব ও সৌন্দর্যবোধে এই খেলার নৌকাকে পূর্ণ করিয়াছেন। শিশুর খেয়াল-খেলার পিছন হইতে এক অনভ্যস্ত অর্থগৌরব ও ভাবগাম্ভীর্য ক্ষণে ক্ষণে আভাসিত হইয়া পাঠককে এক রূপকতীর্থের সঙ্কেত দেয়। ইহার সহিত এই কাব্যেরই 'মাঝি' ও 'নৌকাযাত্রা' কবিতাদ্বয়ের তুলনা করিলে আসল শিশুকল্পনা ও শিশুকল্পনার ছদ্মবেশধারী পরিণত প্রজ্ঞার পার্থক্যটি বোঝা যাইবে।

দ্বিতীয়তঃ, বিচ্ছেদ, মৃত্যু ও তত্ত্বব্যাখ্যা

'বিচ্ছেদ', 'আকুল আহ্বান' ও 'আশীর্বাদ'—এই তিনটি কবিতা আর একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীর। শিশু-জগৎ ও বাস্তব-জগৎ নানা দিক দিয়া পৃথকধর্মী হইলেও একটি যোগসূত্রে পরস্পর-সম্পর্কিত। দুর্ভাগ্যক্রমে বিচ্ছেদ, সাময়িক বা চিরন্তন, সব রকম অস্তিত্বেরই একটি নিত্যধর্ম। শিশুর অভিজ্ঞতা হইতেও বিচ্ছেদ ও মৃত্যুর বেদনা বা চিত্তবিমূঢ়তাকে সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া যায়

না। প্রৌঢ় জ্ঞানের সংসারে যেমন, শিশুর জগৎ-কল্পনাতেও তেমনি মৃত্যুর দুর্বোধ্য রহস্য ছায়াপাত করে, যদিও এই রহস্যের মানস প্রতিক্রিয়া উভয়ক্ষেত্রে বিভিন্ন। মৃত্যুর স্বরূপনির্ণয়ে শিশুর ন্যায় বয়স্ক ব্যক্তিও প্রায় একই রূপ অসহায় ও অজ্ঞতাবোধপীড়িত। বিশেষ করিয়া শিশুর মৃত্যু জীবনারম্ভের প্রাণবেগচঞ্চল, সর্বানুভূতিতে প্রসারিত, উল্লাসে উদ্বেল সত্তার সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী একটি আকস্মিক ছেদ ঘটাইয়া মনকে তীব্রতর প্রশ্নসঙ্কটে দীর্ণ করিতে থাকে। জীবনরঙ্গমঞ্চে হাজার বাতির রোশনাই জ্বালাইয়া, এক বর্ণাঢ্য অভিনয়ের প্রতীক্ষায় মানস ঔৎসুক্যকে উদ্রিক্ত করিয়া, হঠাৎ এক ফুৎকারে সব আলো নিবাইয়া শূন্য নাট্যশালায় অনারব্ধ অভিনয়ের উপর অতর্কিত যবনিকাপাত কোন এক শ্লেষনির্মম বিধাতার মর্মান্তিক পরিহাসরূপে আমাদিগকে আত্যন্তিকভাবে জীবনবিমুখ করিয়া তোলে। কাজেই শিশু-রাজ্যে নায়কের মৃত্যু মানুষকে আরও সমাধানহীন সমস্যার জালে জড়াইয়া ফেলে। জগৎপারাবারের তীরে আনন্দমত্ত শিশুর দলের কোন ক্রীড়ারস-বিভোর শিশু যদি সেই পারাবার-উত্থিত একটি তরঙ্গের টানে হঠাৎ অতল গভীরে তলাইয়া যায়, তবে সমস্ত ক্রীড়াকৌতুকটির রং ও তাৎপর্য কি কল্পনাতীতভাবে বদলাইয়া যায় না? অবশ্য এই পর্যায়ের কবিতাগুলির মধ্যে এরূপ গূঢ় দার্শনিক তত্ত্বের কোন অবতারণা হয় নাই। এখানে কেবল বঞ্চিত ভালবাসার আকস্মিক বিপর্যয়ে যে করুণরস উছলিয়া উঠে, যে আর্ত প্রশ্ন-পরম্পরা বারবার মনের আকাশে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে, তাহাদেরই সুরের মৃদু রেশটি প্রতিবেশকে অশ্রু-আর্দ্র করিয়া তুলিয়াছে। শিশুরাজ্যের এই সার্বভৌম ও কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ করুণ-অর্থবহ অভিজ্ঞতাটিই এই পর্যায়ের আলোচ্য বিষয়। 'বিচ্ছেদ'-এ ঘরের ছোট মেয়ের সাময়িক অনুপস্থিতিতে সমস্ত বাড়ীর আবহাওয়া কেমন করিয়া নিষ্প্রাণ ও মন্থর হইয়া গিয়াছে তাহারই বর্ণনা আছে। কবিতাটি 'কড়ি ও কোমল'-এর অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু ইহার সুরটি 'ছবি ও গান'-এর মত। ইহা আবেগের ঈষৎ আমেজ-মাখান চিত্রধর্মী বস্তুবিবৃতি। 'আকুল আহ্বান' মেয়ের মৃত্যুতে মায়ের স্মৃতিচারী আকুলতা একটা করুণ বিষাদের সুর ধ্বনিত করিয়াছে, কিন্তু এখানে কোন আবেগ-গভীরতা বা মর্মান্তিক শোকের ছাপ অনুপস্থিত। ইহাদের সহিত তুলনায় খোকা-অংশে 'মাতৃবৎসল', 'লুকোচুরি' বা 'বিদায়' আরও কল্পনালীলায় বিচিত্রায়িত ও তত্ত্বনিগূঢ়তায় গভীরসঞ্চারী। মোট

কথা, খোকা খুকি অপেক্ষা অনেক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, কল্পনাপ্রবণ ও সক্রিয়। খুকি কেবল বাপ-মায়ের স্নেহোচ্ছলতা উদ্রেক করে, তাহাকে ঘিরিয়া তাহার জনক-জননীর ভাবসমুদ্রে জোয়ার আসে, কিন্তু এই আবেগস্ফীতি-উৎপাদনে তাহার কোন সক্রিয় সহযোগিতা নাই। খোকা কিন্তু নানা কল্পনার বাষ্পে ভরপুর বিচিত্র অনুভূতির বাহন; সে বস্তুতে নিরেটঠাসা, নিয়মশৃঙ্খলিত বয়স্ক জগতের বিরুদ্ধে সর্বদা অভিযান চালাইতে তৎপর। তাহার সৃষ্ট জগতের বর্ণপ্লাবন অভিজ্ঞতা-শাসিত জীবনযাত্রার তটভূমি উপচাইয়া তাহার বাঁধ ভাঙ্গিয়া ফেলে ও উহাকে সাময়িকভাবে কল্পলোকে রূপান্তরিত করে। 'শিশু'-কাব্য যখন খুকির কথা বলে তখন ইহা সার্বভৌম বাৎসল্যরসের কাব্য; ইহা যখন খোকার খেয়াল-খুশির আশ্রয়, তখন ইহা রহস্যলোকের সঙ্কেতবার্তাবাহী।

'আশীর্বাদ' কবিতায় পিতার জবানীতে শিশু-কাহিনীর তাৎপর্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহা শিশু-জগৎ সম্বন্ধে বয়স্ক লোকের সমবেদনা ও উহার সৌকুমার্য-অনুভবের জন্য আবেদন জানাইয়াছে। নূতন জগতে প্রথম অতিথিকে সুগভীর মমতা ও বোধশক্তি দিয়া পথ দেখাইবার দায়িত্ববিষয়ে ইহা পিতামাতাকে সচেতন করিয়াছে ও জীবনযুদ্ধের তমিস্রায় যাহাতে উহাদের স্বর্গ হইতে আনা আনন্দশিখা নির্বাপিত না হয় সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে অনুরোধ করিয়াছে। শিশুলীলানাট্যাভিনয়ের উপর প্রৌঢ় প্রজ্ঞার আশীর্বাদ সমাপ্তি-যবনিকা নিক্ষেপ করিয়াছে।

তৃতীয়তঃ, বয়স্কের বাল্যস্মৃতিরোমন্থন—পরবর্তী জীবনের পটভূমিকায় স্মৃতি হইতে উদ্ধারিত শৈশবলীলার মাধুর্য-আস্বাদন—

'বৃষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর' (১২৯২, বৈশাখ), 'সাত ভাই চম্পা' (১২৯২, আষাঢ়), 'পুরোনো বট' এই তিনটি কবিতাকে এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। এইগুলিতে শৈশব অনুভূতিসমূহ পরিণত জীবনের পশ্চাৎ-দৃষ্টিতে আরও করুণ, মায়াঘন ও গভীরার্থদ্যোতক হইয়া উঠিয়াছে। শিশুকালের ঘটনার অন্তর্নিহিত ভাবটি বহিরাশ্রয়চ্যুত হইয়া, সাময়িক বস্তুনির্ভরতার গ্রাসমুক্ত হইয়া অন্তর্লোকে এক স্বতন্ত্র ও চিরন্তন রূপ-সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শিশুর অবোধ মুগ্ধতা স্মৃতির সমাধি হইতে নূতন ভাবাসঙ্গে, অনুরূপ নানা অনুভূতিকণাসমবায়ে এক বিস্তৃত রূপকথারাজ্যের অন্তঃসঙ্গতিতে ও ইঙ্গিতময়তায় সংহত হইয়াছে। শিশুচিত্তে যাহা বিচ্ছিন্ন

বিস্ময়চিহ্নরূপে উদ্ভূত হইয়াছিল তাহা এখন অখণ্ড আবহসৃষ্টির উপাদানরূপে অকল্পিত অর্থব্যঞ্জনায় সংসক্তি লাভ করিয়াছে। যে আকস্মিক চেতনা খদ্যোতদ্যুতির ন্যায় শিশু-মানসের অন্ধকারপুঞ্জে একক আলোকবিন্দুর ক্ষণিক চমক জাগাইয়াছিল তাহা বৃহত্তর অভিজ্ঞতার আধারে স্থির দীপশিখার ন্যায় মনের একটি নির্দিষ্ট প্রকোষ্ঠকে আলোকিত করিয়াছে, মনোরাজ্যের একটি বিশিষ্ট আকৃতিরূপে স্থায়ী আসন পাতিয়াছে। আমরা স্মৃতিচর্যার মাধ্যমে যখন শিশুরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করি, তখন পূর্বের মত অবোধ বিহ্বলতায় নহে, পরিণত শিল্পসাধনার শৃঙ্খলাবোধ ও মনস্তত্ত্বজ্ঞানের সহায়তায় উহার আপাত-নৈরাজ্যের মধ্যে একটা নিয়মিত শাসনতন্ত্রের বিধি-প্রবর্তনপ্রয়াসীরূপে। কাজেই শিশুমানসিকতার পুনর্গঠন ঠিক অতীতের হুবহু অনুকরণ নয়, আদিম সৃষ্টিপূর্ব অণু-পরমাণুর অন্ধ আবর্তন-বেগের একটা কম-বেশী সামগ্রিক ভাববৃত্তে শৃঙ্খলা-বিন্যাস।

'বৃষ্টি পড়ে' কবিতাটিতে এই পরিণত মননের প্রসাধনচিহ্ন সর্বত্র পরিস্ফুট। এক মেঘ-মেদুর, অস্তমেঘরঞ্জিত বর্ষা-সন্ধ্যা একটি গ্রাম্য ছড়ার একটি পংক্তিকে অবলম্বন করিয়া মনে এক নানা-উপাদানগঠিত নিবিড় ভাবমোহ ঘনাইয়া তুলিয়াছে। এই ভাবাসঙ্গের আকর্ষণে নদীর দুই পারে রঙ ও ধূসর বিবর্ণতার বিপরীত সমাবেশ, আকাশে ভ্রাম্যমাণ মেঘের খেলা, মেঘাড়ম্বরবিক্ষুব্ধ সন্ধ্যায় মায়ের স্নেহসান্নিধ্যে ঘরের মধ্যে ছেলেদের দুরন্তপনা ও আলো-আঁধারের ইন্দ্রজাল, রূপকথার ও লোককল্পনার হঠাৎ-উদ্বুদ্ধ স্মৃতি সব একত্র মিশিয়াছে ও এই মিশ্র অনুভূতিজালের মধ্য দিয়া গানের কলির অস্পষ্ট গুঞ্জন উহাদিগকে একটি অদৃশ্য সূত্রে গ্রন্থন করিয়াছে। ইহা ঠিক শিশুর নিজস্ব কথা নয়, শিশুমনের অসংলগ্ন যদৃচ্ছসঞ্চরণবৃত্তিকে কাঁচা মালরূপে ব্যবহার করিয়া উহার শিল্পসৌন্দর্যে উন্নয়ন। গানের উপাধিবাচক প্রথম পংক্তিটির যাথার্থ্য সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ আছে। বৃষ্টি পড়ার সঙ্গে নদেয় বান আসার কোন ভাবসঙ্গত সংযোগ নাই, বরঞ্চ নদীতে বান আসার একটা কার্যকারণগত যোগ আছে। আমরা বাল্যকালে গানটির যে মৌখিক আবৃত্তি শুনিয়াছিলাম তাহাতে 'নদেয়'-এর পরিবর্তে 'নদী-য়' ছিল। প্রাকৃত নদীর স্রোতোবৃদ্ধির মধ্যে অধ্যাত্ম প্রেমের জোয়ার-কল্পনা শিশুমনের ঠিক উপযোগী বলিয়া মনে হয় না।

'সাত ভাই চম্পা' পরিণত কল্পনার সাহায্যে একটি সুপরিচিত রূপকথার

অন্তর্নিহিত চিত্রধর্মিতা ও আবেগ-ব্যঞ্জনার উন্মোচন। চাঁপা ও পারুলের মধ্যে ভাই-বোনের মধুর সম্পর্ক-আরোপ শৈশব দৃষ্টির পক্ষে খুবই স্বাভাবিক ও এই ভাবের আবেশে দুঃখিনী মায়ের কথা মনে পড়াও হয়ত ভাবাসঙ্গের সহজ সূত্রে আকৃষ্ট হইতে পারে। শিশু-চেতনায় ঘরের কেন্দ্রবিন্দু মাতা এবং অন্যান্য সমস্ত স্নেহসম্পর্কের মূল উৎস সন্তানের মাতৃবৎসলতা। বনের সমস্ত জীবনরহস্যের মূল মাতৃস্নেহের সোনার কৌটায় নিহিত; উহার সমস্ত বিচিত্র প্রকাশ—পাতার মৃদু কম্পন, নানা শব্দগুঞ্জন, আকাশ-বাতাসের সব গতিশীলতা, সন্ধ্যার ও গভীর রাত্রির স্তব্ধতা, আলোকস্পন্দন ও নিদ্রাবেশ—সবই মাতৃকেন্দ্রিক ও যে স্বপ্নময়তা এই ফুলপরিবারের বিশুদ্ধতম প্রাণ-নিশ্বাস তাহা মাতৃস্মৃতিবাসিত। বনের এই অপরূপ পরিবেশ-রচনা শিশু-কল্পনার অতীত। কবি এখানে শিশুর মনোগহনে প্রবেশ করিয়া তাহার গোধূলি-আচ্ছন্ন অনুভবপুঞ্জকে কাব্যশিল্পীর ঔচিত্য-ও-সৌন্দর্যবোধের দ্বারা সুসমঞ্জস বিস্তার ও রূপপরিণতি দিয়াছেন।

'পুরোনো বট' রবীন্দ্রনাথের প্রৌঢ় ভাবদৃষ্টির দ্বারা বাল্যস্মৃতির উদ্বোধন। জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে পুকুরের ধারে যে বৃহৎ বটগাছটি ছায়াবিস্তার করিয়া শিশু-কল্পনাকে অবাধ প্রশ্রয় দিত, তাহার আকর্ষণের কথা কবি আমাদের অনেকবার শোনাইয়াছেন। এখানে কাব্যব্যঞ্জনার সোনার জালে শিশু-চিত্তের সেই মুগ্ধ বিস্ময়, কল্পনার সেই বিচিত্র ক্রীড়া, মনোলোকের এই জানা-অজানার দ্বন্দ্বে, সেই ইন্দ্রিয় ও অন্তর্গূঢ় চেতনার বিপরীত আকর্ষণে জাত বিহ্বলতাটিকে চিরতরে ধরিয়া রাখিতে কবি সার্থকভাবে প্রয়াসী হইয়াছেন। বটগাছের প্রারম্ভিক বর্ণনাটি একদিকে যেমন বস্তুনিষ্ঠ, অন্যদিকে তেমনি সূক্ষ্মতর প্রাণদ্যোতনায় ভাবধর্মী। তাহার পর কবি বটগাছের সঙ্গে ছোট ছেলেটির অন্তরঙ্গ, কল্পনামধুর সম্পর্কটি বিস্তারিতভাবে পরিস্ফুট করিয়াছেন। বটগাছটি ও পুকুরকে ঘিরিয়া প্রকৃতি ও প্রাণী-জীবনের যে ক্ষণলীলা অভিনীত হইত তা ছেলেটির মর্মে একটি গূঢ়তর প্রতিক্রিয়ার তরঙ্গ জাগাইত। ছেলেটি যেন এই প্রাকৃত প্রাণযাত্রার সহিত একটি আত্মিক যোগস্থাপনের জন্য উৎসুক হইত। কবি বটগাছের সহিত সংশ্লিষ্ট জীবন-ধারার মধ্যে আরও একটি অতীন্দ্রিয় প্রাণলোকের অন্তর্গূঢ়তা অনুভব করিতেন ও দৃশ্যের অন্তরালে স্থিত এই অনুভূতিবেদ্য ভাবসত্তার সহিত নিজ ব্যবধানে অতৃপ্ত হইতেন। বটগাছের পাতায় পাতায় অদৃশ্য ছেলেমেয়ের ক্রীড়াকৌতুক

ও সাজসজ্জা কল্পনা করিয়া এই নিজঅভিজ্ঞতাবহির্ভূত, কাল্পনিক সাথীদের সহিত খেলিতে আকুল হইতেন। এটা যেন পণ্ডিতভীতিবর্জিত অবিমিশ্র খেলার রাজ্যরূপে তাঁহার নিকট প্রতিভাত হইত।

অপেক্ষাকৃত সংসারাভিজ্ঞতার যুগে কবির এই কল্পজগৎ মিলাইয়া গিয়াছে। বটগাছে আর কল্পনার আশ্রয় মিলে না; তাহার অদৃশ্য অধিবাসীরা বাসা ছাড়িয়া কোথায় আত্মগোপন করিয়াছে। তাহার ছায়ায় আর মায়ার আভাস লক্ষিত হয় না। বটগাছের পাতায় পাতায় সঞ্চরণশীল শিশুবাহিনীর চরণে নৃত্যছন্দের নূপুরনিক্কণ আর কল্পনার কানে বাজে না। যে দিব্য অস্তিত্বের ব্যঞ্জনায় কবিপ্রাণ উন্মনা হইত, সেই ব্যঞ্জনা আজ নিঃশেষে অবলুপ্ত। উপসংহারে কবি দীর্ঘশ্বাসের সহিত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে সেই কল্পনাজগতের শিশুর দল আজ ঘুমপাড়ানি মাসিপিসির দেশে চিরনিদ্রায় নিমগ্ন হইয়াছে।

২

(গ) পর্যায়ের কবিতাগুলির মধ্যে আলমোড়ায় রচিত মা ও খোকার যুগ্ম দৃষ্টিতে প্রতিভাত ভাব-জগতের বর্ণনাটিই 'শিশু'-কাব্যের সর্বাপেক্ষা কৌতূহলো-দ্দীপক ও অধ্যাত্মচেতনানিবিড় অংশ। প্রথম কবিতা 'জন্মকথা'-য় যে নিগূঢ় সমীক্ষার সুর ধ্বনিত হইয়াছে তাহাই নানা কবিতায় নানাভাবে পুনরাবৃত্ত হইয়াছে। এখানে কেবল শৈশব দুরন্তপনার স্নেহবিগলিত উপভোগ নাই, মা ও ছেলে উভয়ের সম্পর্কনির্ণয়ে এক যৌথ রহস্যরসের আস্বাদন, তত্ত্বনিগূঢ়তার সত্যস্বরূপের বিহ্বল অন্বেষণ অনুভব করা যায়। খোকা মাকে তাহার উদ্ভব-রহস্যের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে। মা তাহার উত্তরে বলিতেছে যে এই শিশু ইচ্ছারূপে, দেবারাধনারূপে, উত্তরাধিকারবাহিত রক্তসংস্কাররূপে, যৌবনলাবণ্যের দিব্য সৌরভরূপে, এক সার্বভৌম অস্তিত্বরহস্যের বিশেষ বিগ্রহরূপে, ও স্নেহ ও আশঙ্কার দোলায় লালিত, পাওয়া ও হারানোর সীমারেখায় শ্লথমুষ্টিতে আহৃত এক পরম রত্নরূপে মায়ের অন্তরে অনাদি-অনন্তকাল হইতে আসীন। এই অপূর্ব কবিতায় শিশু পারিবারিক পরিবেশ হইতে নিখিল বিশ্বের বিরাট পটভূমিকায় অপসারিত ও সৃষ্টির চির-অজানা বিস্ময়রূপে প্রতিভাত হইয়াছে। 'খেলা' কবিতায় শিশুর নৃত্যপর বাল-

গোপালমূর্তি কেবল গৃহপ্রাঙ্গণে ক্রীড়ারসমত্তরূপে দেখান হয় নাই, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, আকাশ-চন্দ্র-সূর্য নির্নিমেষে এই মোহন লীলার প্রত্যক্ষদর্শী ও প্রাকৃত মাও জগৎমাতার প্রতিনিধিরূপে এই দিব্য খেলার স্নেহপ্রেরণা যোগাইতেছে। মা ও ছেলের সম্পর্ক সৃষ্টিছন্দের অঙ্গীভূত হইয়া বিশ্বরূপদর্শনের পার্থিব সংস্করণে উদ্বর্তিত হইয়াছে। 'খোকা' কবিতায় খোকার ঘুমের উৎস, দেহকান্তি ও মানসপ্রসাদের মূলপ্রেরণাসন্ধানে বাহির হইয়া কবি মানব-মনের সমস্ত কোমল সৌন্দর্য ও প্রকৃতি-জগতের সমস্ত স্নিগ্ধ আবির্ভাবকে অপূর্ব সাদৃশ্য-ব্যঞ্জনার সহিত উপমা-কার্যে নিয়োজিত করিয়াছেন। তাহার ঘুমের আদি বাস রূপকথাগ্রামে, জোনাকি-জ্বলা বনের ছায়াতে দোলা দুটি পারুল কুঁড়ির মুদ্রিত কোরকের মধ্যে, তাহার হাস শিশু-শশীর কিরণস্নাত শিশিরশীতল শরৎ-মেঘের মৃদুআভাপ্রসূত, তাহার অঙ্গের ননীর ন্যায় কোমল স্পর্শ তাহার মাতার পূর্বজীবনের কিশোরী-মাধুরী হইতে সংক্রমিত, তাহার নিদ্রাশান্তি ঘিরিয়া যে আশীর্বাদের শুচি ভাবমণ্ডল বিরাজিত, তাহা প্রকৃতির কল্যাণ-দাক্ষিণ্য হইতে সঞ্চিত ও নিদ্রাভঙ্গে তাহার বিশ্রব্ধ বিশ্রাম-আসন স্বর্ণকিরণমাখা বিশ্বদোলার দেবনির্ভর আশ্রয়ে। শিশুর লীলামাধুরী পরিস্ফুট করিতে কবি যেরূপ সূক্ষ্মদর্শিতা ও যাথার্থ্যবোধের সহিত কল্পনা ও প্রকৃতিরাজ্যের সমস্ত মধুর, পেলব, পবিত্র ও দেবভাবনির্মল চিত্র ও ভাবসৌন্দর্য আহরণ করিয়াছেন তাহা কাব্যমানদণ্ডে অনুপম ও তত্ত্বচেতনায় সৃষ্টিরহস্যের মূলাবগাহী।

'ঘুমচোরা' কবিতায় তত্ত্বগহনতার পরিবর্তে পাই কল্পনাসমৃদ্ধি। মা ঘুমচোরার খোঁজে প্রকৃতির যে সমস্ত নির্জন, নিঃশব্দ কোণে অভিযান করিয়াছে সেগুলি যে ঘুমের যোগ্য সঞ্চয়-ও-সংরক্ষণভূমি তাহা আমরা স্বতঃই অনুভব করি। 'চাতুরী', 'নির্লিপ্ত', 'কেন মধুর', 'খোকার রাজ্য' ও 'ভিতরে ও বাহিরে' কবিতাগুলিতে তত্ত্বের লৌকিক স্তরে খোকার মনোলোকের অসাধারণতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। শেষ কবিতাটি ছাড়া অন্যত্র শিশুমনের তির্যক-ব্যঞ্জিত অনন্যতা পরিস্ফুট হইয়াছে, তবে ইহারা মুখ্যতঃ তত্ত্বভাবিত নয়। শিশুর লৌকিক জীবনলীলাই ঈষৎ তত্ত্বানুভূতি-স্পৃষ্ট হইয়াছে মাত্র। 'চাতুরী'তে খোকার সমস্ত অসহায়তা ও অক্ষমতা উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ছদ্মাভিনয়ের মত মাতার দৃষ্টিতে প্রতিভাত হইয়াছে। খোকা সব জানিয়া না জানার ভান করিয়া, দেববিভূতি লুকাইয়া অসহায়

মানবশিশুর মত আচরণ করে, মাতৃস্নেহকে আরও প্রবলভাবে আকর্ষণ করিবার জন্য। সে মুক্তির অপেক্ষা বন্ধনের মিষ্টত্ব আস্বাদন করিতে চাহে বলিয়াই স্বেচ্ছায় মায়াবন্ধনে ধরা দিয়াছে। এই সংসারলীলায় সে বৃন্দাবন-লীলায় কৃষ্ণের অংশ অভিনয় করিয়াছে। 'নির্লিপ্ত'-এ এই প্রথম বাবার জবানী শুনিতে পাই। তুচ্ছ বস্তু লইয়া ক্রীড়াবিভোর বালক তুচ্ছতর বৈষয়িকতালিপ্ত পিতার মনে জীবনের সত্য উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগায়। 'কেন মধুর' কবিতায় জগতের বিচিত্রবর্ণ সৌন্দর্য, মাধুর্য ও সঙ্গীতসৃষ্টির কারণ বোঝা যায়, যখন শিশুর হাতে রঙীন খেলনা দিলে, তাহাকে গুনগুন স্বরে গান গাহিয়া ঘুম পাড়াইলে, তাহাকে মিষ্ট ফল খাইতে দিলে মায়ের মন এক অনির্বচনীয় আনন্দে ভরিয়া উঠে। ভগবানের চোখে যে মানব শিশুমাত্র, তাঁহার মাতৃহৃদয়ের তৃপ্তিবিধানের জন্যই সারা বিশ্বে এত রঙের খেলা, এত সঙ্গীতের কলধ্বনি, এত মধুর রসের দাক্ষিণ্য। 'খোকার রাজ্য' ও 'ভিতরে ও বাহিরে' হয়ত পিতারই তত্ত্বচিন্তা কিন্তু এ পিতা মাতৃস্নেহরসে আপ্লুত, মাতারই প্রতিনিধি। মায়ের তত্ত্বভাবনা কোমল ও মধুর ও শিশুর বিশেষ বিশেষ লীলাভঙ্গীর স্বরূপদ্যোতক। বাবার মনের প্রবণতা সার্বভৌম সত্য-আবিষ্কারে, মায়ের পক্ষপাত বিশেষ লীলারসসম্ভোগে। কাজেই উভয়ের দার্শনিকতার মধ্যে একটা স্বরূপ-পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। মা শিশুর মুখের হাসি, চোখের ঘুম, চলার নৃত্যভঙ্গীর মধ্যে অনন্ত সৌন্দর্যের প্রতিভাস অনুভব করিয়া তাঁহার আনন্দরসকে গাঢ়তর করিতে উৎসুক। বাবা শৈশব-কৈশোরের সন্ধিস্থলে উপনীত সন্তানের মনোরাজ্যের সীমা পরিমাপ করিয়া ও উহার অন্তর্নিহিত নিয়মাবলীর ক্রিয়া আবিষ্কার করিয়া উহার স্বরূপনির্ণয়ে আগ্রহান্বিত।

দ্বিতীয় আর এক শ্রেণীর কবিতাতে খোকার জীবনকল্পনার বিচিত্র ছবি অঙ্কিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে খোকার নানা সম্ভব-অসম্ভব কল্পনারঞ্জিত সাধ পাখিশাবকের কচি ডানার মত স্বপ্নসঞ্চরণ করিয়াছে। কখনও সে দিনদুপুরে সন্ধ্যা কল্পনা করিয়া পড়াশুনার বাঁধন হইতে মুক্তি চাহিতেছে। কখনও ফিরিওয়ালা, ফুলবাগানের মালী বা পাহারাওয়ালার মত তাহার নির্দিষ্ট গণ্ডীর বাহিরে স্বচ্ছন্দ বিচরণের দাবী জানাইতেছে। কখনও বা ছাদের কোণার ছায়াটুকুকে রাজবাড়ি বানাইয়া সেই নিভৃত আশ্রয়টিতে রূপকথাকল্পনার অনুশীলন করিতেছে। কখনও বা খেয়াঘাটের মাঝির

মত পারাপারের ও নির্জন, চন্দ্রালোকিত, কাশবনে আচ্ছন্ন জলাভূমিতে বন্য পাখির সঙ্গে মিতালী পাতাইবার স্বপ্ন দেখিতেছে—কিন্তু এই দুঃসাহসিক অভিযানের সঙ্গে মাতৃস্নেহক্রোড়ে নিশ্চিন্ত প্রত্যাবর্তনের কোন বিরোধ সে ভাবিতে পারে না। 'নৌকাযাত্রা'-য় মধুমাঝির পাট-বহার ছেলেখেলাকে নস্যাৎ করিয়া সাত সমুদ্র তের নদীর পারে রত্ন-আহরণের ও তেপান্তরের মাঠ-দর্শনের অত্যাবশ্যকীয় যাত্রার সঙ্কল্প সে স্থির করিয়াছে। বর্ষা-সন্ধ্যার মেঘগর্জন ও বিদ্যুৎবিলাস তাহাকে অভ্যস্ত পড়াশুনার প্রতি উন্মনা করিয়া একদিকে মায়ের স্নেহনিবিড় কোলে আশ্রয়প্রার্থী করিয়াছে, অপরদিকে রূপকথামোহ ঘনীভূত করিয়া, তেপান্তরের মাঠের ও রাজকন্যার খোঁজে বাহির রাজপুত্রের নিরুদ্দেশযাত্রার প্রতি তাহার প্রশ্নপরম্পরাচিহ্নিত কৌতূহল জাগাইয়াছে। এই রূপকথা-আবহের উদ্বোধন শিশুকল্পনার পক্ষে স্বাভাবিকতার সীমা অতিক্রম করে নাই। কেননা ইহার আর্ট লোকগাথার আর্টের সমগোত্রীয়, অতি-অনুশীলনের চিহ্নবর্জিত। আর একটি বর্ষা-কবিতায় কিছু কষ্টকল্পনাপ্রয়োগে ছেলে নবোদ্গত ফুলগুলিকে পাঠশালার ছেলে মনে করিয়াছে ও গ্রীষ্মবর্ষা-ঋতুভেদে উহার কাজ ও ছুটির সময় নির্ধারণ হয় বলিয়া ভাবিয়াছে। এই ছেলের স্কুলে বিদ্যাচর্চা খানিকটা অগ্রসর হইয়া তাহার মনের সরলতা ক্ষুণ্ণ করিয়াছে ও জটিল উপমা-আবিষ্কারের প্রবর্তনা দিয়াছে। এই অকালপক্কত্বের আরও কৌতুককর নিদর্শন মিলে ছেলের দ্বারা মাতার বিরহবেদনার মর্মোদ্ভেদচেষ্টায়। যে ছেলে পিতামাতার সম্পর্কের গূঢ় প্রেরণাটি অনুমান করিতে শিখিয়াছে, সে শৈশবসীমা অতিক্রম করিয়া দাম্পত্য প্রেমোন্মেষের নিষিদ্ধ রাজ্যে পদার্পণ করিয়াছে। বাবার সাহিত্যচর্চার বহির্লক্ষণ ও সাহিত্যরসনিমগ্ন পিতার মাতার দীর্ঘ প্রতীক্ষার প্রতি উদাসীনতা হয়ত মেধাবী ছেলের অনুভবগম্য হইতে পারে, কিন্তু প্রণয়রহস্যের মধ্যে অনুপ্রবেশ, নিয়মিত চিঠি না পাওয়ার মনোবেদনা যাহার দৃষ্টিস্বচ্ছতার নিকট ধরা পড়ে সে ছেলের অসাধারণত্ব অস্বীকার করা যায় না। হয়ত এরূপ দৃষ্টান্ত কবির ব্যক্তি-অভিজ্ঞতা-সমর্থিত।

কয়েকটি কবিতায় খোকা নিজেকে সাংসারিক অভিজ্ঞতায় আরও অগ্রসর মনে করিয়া অধিকবয়স্ক ব্যক্তির আসনে আপনাকে অধিষ্ঠিত করিয়াছে। বড় দাদার সঙ্গে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্রতম বলিয়া সে সাধারণতঃ তাহারই

সহিত নিজ স্থান বিনিময় করিতে বিশেষ উৎসুক। দাদার মুরুব্বিয়ানা ও অবজ্ঞাসূচক মন্তব্য তাহার বাল্যজীবনের তীক্ষ্ণতম অস্বস্তির কাঁটা; সেইজন্য দাদার বয়সে ও মর্যাদায় পৌঁছিতে তাহার অস্বাভাবিক আগ্রহ। নীচের দিকে ছোট বোনের প্রতি দাদার তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ফিরাইয়া দিয়া সে কথঞ্চিৎ আত্মপ্রসাদ পায়। মাঝে মধ্যে তাহার দুরাশা তুঙ্গতর হইয়া বাবা ও মাষ্টার মহাশয়ের সমকক্ষতাস্পর্ধী হয়। এই তাড়াতাড়ি বড় হইবার আকাঙ্ক্ষা শিশুমনের একটা মৌলিক প্রেরণা এবং ইহা নানারূপে আত্মপ্রকাশ করে। 'বীরপুরুষ' কবিতাটি এই প্রবৃত্তিরই একটি বিশেষ অভিব্যক্তি। এখানে প্রাপ্তবয়স্কের দায়িত্ববোধের সহিত শিশুকল্পনায় রূপকথাসুলভ অতিমানবিক বীরত্বপ্রকাশের উপলক্ষ্যসৃষ্টি মিলিত হইয়া ইহার ভাবপটভূমিকা ও তথ্য-কায়া রচনা করিয়াছে। এই কবিতায় শিশুমনের একপ্রকার অভীপ্সা চূড়ান্ত পরিতৃপ্তির চূড়ায় পৌঁছিয়াছে।

'বনবাস'-এ রূপকথার পরিবর্তে রামায়ণ-কাহিনী শিশুর ভাবকল্পনা ও অনুচিকীর্ষাবৃত্তিকে জাগ্রত করিয়াছে ও এই কল্পনাভ্রমণে মায়ের আশ্রয় ভ্রাতৃ-সাহচর্যের রূপ লইয়াছে। মাকে বনগমনের সঙ্গিনী হইতে হইবে না, শুধু বনবাসের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার সমানুভবসম্পন্না শ্রোত্রী হইলেই চলিবে। 'জ্যোতিষ-শাস্ত্র'-এ মাতৃচিন্তা যে শিশুর মনোরাজ্যে কেন্দ্রীয় সর্বময়তায় প্রতিষ্ঠিত তাহা তাহার চাঁদ সম্বন্ধে ধারণাতেও কৌতুকজনকভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। কদমগাছের ডালে আটকা-পড়া চাঁদ বাতায়নমধ্যবর্তী মায়ের মুখের ন্যায় নৈকট্যসূচক ও তাহারই চুম্বননত মুখের ন্যায় শিশুর ছোট করতলে ধারণযোগ্য। চাঁদের দূরত্ব ও আয়তন বিষয়ে শিশুর প্রত্যয়ে যতটা অজ্ঞতা আছে, তাহার চেয়ে বেশী আছে মাতৃসাদৃশ্যবোধের প্রভাব। 'মাতৃবৎসল', 'লুকোচুরি' ও 'বিদায়' কবিতাগুলিতে শিশুমনের যে অংশ এখনও ঘরের খাঁচায় পোষ মানে নাই ও সংসারকে চরম সত্য বলিয়া স্বীকার করে নাই, যাহা মাতৃমমতার কেন্দ্রাকর্ষণ হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়া বিশ্বজীবনের সহিত পুনর্মিলিত হইতে চাহে, সেই উৎকেন্দ্রিক, নিরুদ্দেশ বিলাসী মনোভাবের নানা ছাঁদের অভিব্যক্তি হইয়াছে। আকাশের মেঘ ও নদীর ঢেউ-এর মধ্যে যে অজানা প্রাণচঞ্চল ছেলের দল তাহাদের খেলায় যোগ দিবার জন্য খোকাকে আমন্ত্রণ জানায় সেই সর্বনাশা নিশির ডাক হইতে সে মাতৃস্নেহের অবিচল আশ্রয়ে আত্মরক্ষা করে ও শেষ পর্যন্ত সেই অসাধ্য-

সাধনকারী শক্তিই তাহার এই অ-মানবিক খেলার সাধ মিটাইয়া তাহার জীবনে ঘরছাড়া ও ঘরেফেরার দারুণ দ্বন্দ্বের নিরসন করিতে পারে। এই কবিতায় মৃত্যুবিচ্ছেদের ঈষৎ সম্ভাবনা শিশু-কল্পনার ফাঁকে ফাঁকে বিষাদ-স্পর্শের সঞ্চার করে। 'লুকোচুরি'তে ছেলেখেলার মধ্য দিয়া গভীরতর শোকব্যঞ্জনা অনুভূত হয়। খোকা যদি চাঁপাফুল বা গাছের ছায়ার ছদ্ম-আবরণে তাহার মানবিক সত্তাকে সংহরণ করে, তবে মায়ের সমস্ত স্নেহমমতা এক মুহূর্তে আশ্রয়চ্যুত হইয়া অপরিচয়ের বাধায় মাথা খুঁড়িয়া মরে। এই ছেলেখেলার পিছনে যে একটি দারুণ সত্য প্রচ্ছন্ন আছে, বিশ্বের প্রাণস্রোত হইতে যাহার উদ্ভব তাহার পক্ষে সেই আদিম উৎসে প্রত্যাবর্তন যে কিছুমাত্র অসম্ভব নয়, এই উপলব্ধিই আমাদের চেতনাকে একটি আকস্মিক আঘাতে মুহ্যমান করে। 'বিদায়' কবিতায় মৃত্যুর এই অভিনয়, এই নেপথ্যলীন ছায়ামূর্তি সত্যই বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে, নির্মম ঘটনারূপে জীবনরঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়। তখন বিয়োগাতুরা মা অনুভব করে যে খোকার ছলনা এখন নিষ্ঠুর সত্যে পরিণত হইয়াছে। সেই নয়নানন্দ স্নেহপুত্তলি সমস্ত বন্ধনমুক্ত হইয়া বিশ্বজীবনে বিলীন হইবে ও হাওয়ায়, মেঘাচ্ছন্ন রাত্রির বিদ্যুৎচমকে, বিনিদ্র মাতার চক্ষে জ্যোৎস্না-চুম্বনে, স্বপ্নের বাস্তব-প্রতিচ্ছায়ায়, পূজায় উৎসবের বাঁশির সুরে মায়ের শোকসন্তপ্ত হিয়াকে সান্ত্বনাস্পর্শ দিয়া যাইবে। শেষ পর্যন্ত অস্তিত্বের এই পরোক্ষ সূচনাসমূহ মাতার মনে খোকার অমরত্ব ও খোকার ও মায়ের স্নেহসম্পর্কের অবিনশ্বরত্ব সম্বন্ধে এক স্থির অধ্যাত্ম প্রত্যয় দৃঢ়ীভূত করিয়াছে। মৃত্যুরহস্য শিশুকল্পনার ক্রীড়াশীল, অথচ সহজসংস্কারলব্ধ বিশ্বাত্মবোধ, মাতৃহৃদয়ের নিগূঢ় সত্যচেতনা, ও অনন্তধর্মী মানবপ্রেমের স্বচ্ছদৃষ্টির মাধ্যমে এক নূতন রূপে, এক অভিনব লীলাছন্দে প্রতিভাত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুলীলাতত্ত্ব মা ও ছেলের দ্বৈত সত্তার একীভূত, অথচ পরস্পর-পরিপূরক অন্তরাত্মার অনুভবের মধ্য দিয়া আশ্চর্য সমর্থনলাভ করিয়াছে। ছেলের চোখে ও মায়ের স্নেহসার দিব্য-দৃষ্টিতে দেখিলে মৃত্যুবিভীষিকা উহার অমোঘ বিধানরূপ হারাইয়া স্রষ্টামনের একটি ক্রীড়াছন্দময় প্রকাশরূপে অনুভূত হয়। সৃষ্টিরহস্যের প্রধান সূত্রটি মাতৃমমতা ও সন্তানবাৎসল্যরচিত প্রেমগ্রন্থির মধ্যে বিধৃত হইয়াছে।

৩

খেয়া

রবীন্দ্রমানসে তাঁহার ব্যক্তিসত্তা ও কবিসত্তা যে অন্যোন্যনিরপেক্ষভাবে দুই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কক্ষপথে বিচরণশীল ছিল তাহার চূড়ান্ত নিদর্শন 'খেয়া'-রচনার কালপর্বে আমাদের নিকট প্রত্যক্ষ হয়। এই কাব্যখানি প্রকাশের অব্যবহিত পূর্ববর্তী বৎসরটি বাঙলার রাজনীতিক্ষেত্রে ও কর্মসাধনায় এক তুমুল উত্তেজনা ও আলোড়নের যুগ। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর বঙ্গচ্ছেদঘোষণার দিন। এই দিনটি বাঙালী জাতির চেতনায় যেরূপ মর্মান্তিকভাবে বিদ্ধ হইয়াছিল তাহা বাঙলার ইতিহাসে অভূতপূর্ব। ইহারই প্রতিক্রিয়ায় বাঙালীর রাজনীতি ও স্বাজাত্যবোধ, তাহার সক্রিয় কর্মোদ্যোগ ও জাতীয়তাসাধনা এক সম্পূর্ণ নূতন স্তরে উদ্বর্তিত হইল। এই মর্মঘাতী লাঞ্ছনার বেদনায় বাঙালীর যেন নবজন্ম হইল ও তাহার আশা-কল্পনা-কর্মপ্রেরণা এক অভিনব সংকল্পদৃঢ়তায় কেন্দ্রীভূত হইয়া তাহার সুপ্ত পৌরুষ ও অভিমানবোধকে উদ্দীপ্ত করিল। সে আবেদন-নিবেদনের পথ ছাড়িয়া অত্যাচারী রাজশক্তির সহিত শক্তিপরীক্ষার দ্বন্দ্বে উদ্বুদ্ধ হইল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া যে দেশব্যাপী বিরাট আন্দোলন জাগিয়া উঠিল তাহাতে বাঙালীর সাহিত্য, সমাজ, দেশাত্মবোধ সর্বক্ষেত্রেই যেন একটা বিপুল ভাবাবেগ ও কর্মশক্তির জোয়ার আসিয়া তাহাকে পুরাতন জীবনবোধের নিরাপদ আশ্রয় হইতে এক সর্বনাশা অকূল সমুদ্রে নিরুদ্দেশযাত্রায় ভাসাইয়া লইয়া গেল। এই আলোড়ন 'স্বদেশী আন্দোলন' নামে বাঙলার ইতিহাসে একটি স্থায়ী আসন গ্রহণ করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ সাধারণতঃ রাজনৈতিক উত্তেজনা হইতে যে নিরাসক্ত দূরত্ব রক্ষা করিয়া চলিতেন, সেই উদাসীন নির্লিপ্ততা বজায় রাখা এবার আর তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইল না। এই স্রোতের টান তাঁহাকেও কাব্যসৌন্দর্য-সৃষ্টি ও অধ্যাত্মধ্যানমগ্নতা হইতে জনবিক্ষোভের আবর্তে টানিয়া আনিল। জীবনে বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ গণমানসের এত কাছাকাছি, দেশের উন্মত্ত হৃৎস্পন্দনের এত অব্যবহিত সান্নিধ্যে আর কখনও আসেন নাই। তিনি এ যাবৎ দেশবাসীর স্বাধীনতাস্পৃহাকে নীতিগত সমর্থন জানাইয়াই ক্ষান্ত ছিলেন, প্রত্যক্ষ নেতৃত্বের মদির আস্বাদন গ্রহণ করেন নাই। কেননা দেশের

স্বরাজসাধনার আকাঙ্ক্ষাকে তিনি যে পরিমাণ উৎসাহিত করিয়াছেন, ঠিক সেই পরিমাণেই উহার আতিশয্য ও অসার ভাবালুতাকে তিরস্কৃত ও সংযত করিতেও চাহিয়াছেন। কিন্তু এই যুগসন্ধিক্ষণে যখন জাতি এক নূতন দুর্গম পৌরুষদৃপ্ত পথের অভিযাত্রী হইবার সংকল্প গ্রহণ করিয়াছে, যখন নব-উদ্বুদ্ধ শক্তি লইয়া সে নিজ জন্মগত স্বত্বকে অধিকার করিবার আয়োজন করিয়াছে, তখন হয়ত তিনি ভাবিয়াছিলেন যে এখন তাঁহার নেতৃত্বগ্রহণের যথার্থ আবহাওয়াটি সৃষ্ট হইয়াছে। সুতরাং এখন তিনি অনেকটা অগ্রসর হইয়া জনবাহিনীর পুরোভাগে, উহাকে নির্দেশ ও উদ্দীপনা দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া, নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। অবশ্য এখনও তাঁহার প্রবক্তাসুলভ সতর্কীকরণের সুর অক্ষুণ্ণ আছে। তিনি বার বার বলিয়াছেন যে শুধু অভিমান বা জেদের বশে, শুধু সুলভ আস্ফালনপ্রবৃত্তি সম্বল করিয়া, কোন গঠনমূলক দেশকল্যাণকার্য নিষ্পন্ন করা যাইবে না। রণোন্মাদনার বাষ্পস্ফীত না হইয়া, শত্রুর ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্যের প্রতি মুখ্যত্ব আরোপ না করিয়া, নিঃশব্দ, নিরলস আয়োজন ও কর্মনিষ্ঠার দ্বারা পরিচালিত হইলেই এই দুরূহ ব্রতে সিদ্ধিলাভ সম্ভব হইবে। শিক্ষা ও শিল্পসংগঠন এই উভয় ক্ষেত্রেই সফলতা লাভ করিতে গেলে ধীরভাবে, সূক্ষ্মবিচারবিবেচনার সহিত ও আপাত-ফললাভের সুলভ ও ক্ষণস্থায়ী অহমিকাতৃপ্তির প্রলোভনকে জয় করিয়া সুষ্ঠু কর্মপন্থানির্ধারণ ও কর্মনীতিপ্রয়োগের অপরিহার্য প্রয়োজন। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ পূর্বের মত তাঁহার মূলনীতিতে অবিচলিত থাকিয়া এই দেশব্যাপী উন্মাদনাকে যাহাতে দৃঢ়সংকল্পে পরিণত করিয়া দেশবাসীর প্রবল ইচ্ছাকে যথাযথ রূপ দেওয়া যায় তাহার জন্য অপ্রমত্ত প্রস্তুতি দাবী করিয়াছেন।

এই কালপর্বে রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনা ও কর্মধারার সহিত 'খেয়া'-কাব্যে তাঁহার অন্তর্জীবনের যে নিগূঢ় ভাবপরিচয় কাব্যাকারে প্রকাশিত হইয়াছে তাহার তুলনা করিলে উভয়ে যে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে। এই অন্তর্জীবন ও বহিরঙ্গজীবননিষ্ঠ রচনার বৈপরীত্যই রবীন্দ্র-জীবনীকার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে 'খেয়ার' কবিতাবলীর ভাবব্যাখ্যার মধ্যে কিছুটা বহির্জীবনের প্রভাব কল্পনা করিতে প্রণোদিত করিয়াছে। তিনি ইহাদের কয়েকটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের তাৎকালিক রাজনৈতিক চিন্তাধারার তির্যক প্রভাব অনুমান করিয়াছেন। অবশ্য ইহা

যে কষ্টকল্পনা সে বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন বলিয়া ইহারা যে অধ্যাত্ম অনুভূতির প্রকাশরূপে ব্যাখ্যাত হইতে পারে তাহাও স্বীকার করিয়াছেন। আমার মনে হয় যে 'খেয়া'-কাব্যের দুই একটি কবিতা ছাড়া আর কোথাও রাজনৈতিক চেতনার ছায়াপাত রূপকের অন্তরালেও দুর্নিরীক্ষ্য। কবি যদি তাঁহার অধ্যাত্মবিষয়ক কবিতার মধ্যে বহির্ঘটনার কোন বস্তুতথ্যের সঙ্কেত দিতে চাহেন, তবে তাঁহার মনোভাবে, উপমা-রূপকের প্রয়োগে, ভাষা, ভাব ও ছন্দের পরোক্ষ ব্যঞ্জনায় ও সমস্ত কবিতাটির আবহসৃষ্টিতে এই উদ্দেশ্য-স্থূলতার কিছুটা নিদর্শন থাকিবেই। কাব্যের সমস্ত ইন্দ্রজালের ফাঁকে ফাঁকে বস্তুরসেব কিঞ্চিৎ ইঙ্গিত আত্মঘোষণা করিবেই। কিন্তু 'খেয়া'-কাব্যের কবিতাবলীর মধ্যে এরূপ কোন উপাদান-সাঙ্কর্যের, এইরূপ ভাবলোক ও বস্তুলোকের মধ্যে যাতায়াতের সেতুরচনার কোন চিহ্নই লক্ষিত হয় না। কবি-অনুভূতির অখণ্ড সমগ্রতা এই লীলারস-আস্বাদনে সম্পূর্ণভাবে সমর্পিত, এক অপার্থিব সত্তার আনন্দময় স্পর্শে আত্মবিস্মৃত তন্ময়তায় বিহ্বল।

এই পর্বে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন কর্মসূচীর একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা সঙ্কলন করিলে ও আশুউপলক্ষ্যপ্রভাবিত গদ্যরচনার উল্লেখ করিলে তাঁহার মনের একটি অংশ কিরূপ কক্ষপরিক্রমায় ব্যাপৃত ছিল তাহা সুস্পষ্ট হইবে। ১৯০৫, এপ্রিল (১৩১২ বৈশাখে) সমকালীন সমস্যাবলী সম্বন্ধে দেশনেতৃবর্গের অভিমত-সংগ্রহের বাহনরূপে 'ভাণ্ডার' পত্রিকার সম্পাদনা-দায়িত্বস্বীকার কবির কর্মপরিকল্পনার সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে সংশ্লিষ্ট। বঙ্গচ্ছেদ উপলক্ষ্যে আয়োজিত রাখীবন্ধন-অনুষ্ঠানের সহিত (১৯০৫ ১৬ই অক্টোবর, ১৩১২ ৩০শে আশ্বিন) রবীন্দ্রনাথের সক্রিয় সহযোগিতা এই উপলক্ষ্যে উদ্বেল জনসমুদ্রের সহিত তাঁহার একাত্মতা ও তাঁহার রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ অংশ-গ্রহণের নিদর্শন। বিলাতী বস্ত্র ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবর্জন ব্যাপারে হয়ত তাঁহার পূর্ণ অনুমোদন ছিল না, কিন্তু দেশবাসী যখন এই দুইটি কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করিল তখন এই সঙ্কল্পের বাস্তব সার্থকতাবিধানের জন্য রবীন্দ্রনাথ পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে উভয় আন্দোলনের সহিত নিজ সংযোগ স্থাপন করিলেন। বস্ত্র-বয়কটে যে বস্ত্রের অভাব নিদারুণভাবে প্রকট হইবে তাহা প্রশমনের জন্য রবীন্দ্রনাথ গগনেন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথের সহিত কুষ্টিয়ায় বয়নবিদ্যালয়প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হইলেন এবং প্রজাদিগকে স্বাবলম্বিতায় দীক্ষা দিতে 'পতিসর কৃষিব্যাঙ্ক' প্রতিষ্ঠা করিলেন। যাদবপুরে জাতীয়

বিশ্ববিদ্যালয়প্রতিষ্ঠার ও পাঠক্রমনির্ধারণের জন্য যে কমিটি নিযুক্ত হয় রবীন্দ্রনাথ তাহার মধ্যে অন্যতম প্রধান অংশ গ্রহণ করেন। ১৬ই নভেম্বর ১৯০৫ (৩০শে কার্তিক ১৩১২) ও পরদিন পান্তীর মাঠে জনসভায় রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাবক্রমে 'জাতীয়শিক্ষা-সমাজ'-প্রতিষ্ঠা ঘোষিত হইল। জাতীয়-শিক্ষা-আন্দোলন প্রসঙ্গে 'শিক্ষার আন্দোলন' নামে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ-সংগ্রহগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ একটি ভূমিকা সংযোজনা করিয়া এই বিষয়ে তাঁহার নিজ সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করেন (২৬শে অগ্রহায়ণ ১৩১২)। অগ্রহায়ণ মাসের শেষভাগে রবীন্দ্রনাথ কলিকাতার উত্তেজনাপূর্ণ আবহাওয়া ত্যাগ করিয়া শান্তিনিকেতনে তাঁহার বিদ্যালয়-পরিচালনার কার্যে আগামী চারি মাস আত্মনিয়োগ করেন।

ইহার পর ১৩১৩ সালে নববর্ষের দিন কুখ্যাত বরিশাল প্রাদেশিক সম্মিলনীর অঙ্গীভূত সাহিত্যসম্মিলনীর সভাপতিরূপে রবীন্দ্রনাথ ঐ সম্মিলনীতে বাঙলার নেতৃবৃন্দের উপর যে অসহ্য পুলিশী নির্যাতন চলে তাহা প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করেন। স্বদেশী আন্দোলনের এই চরম অগ্নিবিস্ফোরণের সমস্ত বহ্নিদাহ তিনি দেহে ও মনে অনুভব করেন। এই পুলিশী জুলুমই বাঙলার রাজনৈতিক বিক্ষোভের মধ্যে দাহ্য-উপাদান-সঞ্চারে, শান্ত প্রতিরোধকে সন্ত্রাসবাদের বহ্নিগর্ভ সুড়ঙ্গপথে সঞ্চালিত করিয়া সমস্ত আন্দোলনের মোড় ফিরাইয়া দিল। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিতে এই দিনের মর্মান্তিক বেদনা ও অপমান চিরসঞ্চিত রহিল ও বৃটিশ শাসনের প্রতি তাঁহার যেটুকু আস্থা অবশিষ্ট ছিল তাহা নিঃশেষে বিলুপ্ত করিল। এই অভিজ্ঞতার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়াস্বরূপ বাঙলা রাজনীতি নরমপন্থা ও চরমপন্থী এই দুই বিরোধী শিবিরে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিগত রাজনীতি-বিমুখতা ইহাতে আরও তীব্রতর বিরাগে পরিণত হইল ও ইহার পর হইতে বিশেষ বিশেষ সঙ্কটমুহূর্তে বাণীপ্রচার ও সাময়িক কর্তব্যনির্দেশ ছাড়া তিনি আজীবন রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ হইতে অবসর লইলেন বলা যায়। ইহার অব্যবহিত পরে, ১৫ই বৈশাখ ১৩১৩ পশুপতি বসুর গৃহপ্রাঙ্গণে আহূত জনসভায় তিনি 'দেশনায়ক' প্রবন্ধ পাঠ করেন ও বয়কট আন্দোলনকে সফল করিতে গেলে মতভেদকে আপাততঃ মুলতুবী রাখিয়া একজন নেতার অধিনায়কত্বে যে সুচিন্তিত কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে সে বিষয়ে তিনি সকল দেশপ্রেমিকের নিকট আবেদন জানান। 'ডন সোসাইটির' সামনে

তিনি 'স্বদেশী আন্দোলন' সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করেন তাহাতেও উপরি-উক্ত সতর্কবাণীর পুনরাবৃত্তি আছে ও এই বক্তৃতাটি ১৩১৩, জ্যৈষ্ঠে 'ভাণ্ডার'-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

এই সময় রচিত প্রবন্ধগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও রবীন্দ্রমানসের যুক্তি-অংশ ও ভাবানুভূতির অংশ যে এক সংযোগহীন বিদারণ-রেখায় খণ্ডিত হইয়াছিল তাহা বুঝা যাইবে। এমন কি স্বাজাত্যবোধপ্রসূত দেশাত্মবোধক বাউল সঙ্গীত ও অন্যান্য গানগুলিও 'খেয়া'-র ভাববৃত্তবহির্ভূত। যখন রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনার শকট রাজনীতির পাথর-বাঁধান পথে শাণিত যুক্তিবাদের স্ফুলিঙ্গবর্ষণ করিতে করিতে ও কোথাও কোথাও আবেগের ক্ষণিক দীপ্তি বিকীর্ণ করিয়া এক কল্যাণবোধনিয়ন্ত্রিত আদর্শের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল, তখন তাঁহার কবিকল্পনার দিব্যরথ এক সূক্ষ্ম লীলারস-সম্ভোগের কল্পজগৎ আবিষ্কারের আনন্দপ্রেরণা হইতে উহার জ্যোতির্লোক-প্রয়াণের গতিবেগ সঞ্চয় করিতেছিল। একই মনোলোক হইতে একই সময়ে প্রসূত দুইটি রূপসৃষ্টির মধ্যে কি অতল ব্যবধান!

এই কালপর্বে রবীন্দ্রনাথের গদ্য প্রবন্ধের মধ্যে সর্বাগ্রে রচিত 'সফলতার সদুপায়' (জেনারেল অ্যাসেমব্লি হলে অনুষ্ঠিত জনসভায় ১৩১১, ১৭শে ফাল্গুন পঠিত) ইংরাজের কূটনীতিপ্রসূত, শিক্ষার বাহনরূপে ব্যবহৃত ভাষাবিচ্ছেদ ঘটাইবার ষড়্যন্ত্রের প্রতিবাদ। 'ছাত্রগণের প্রতি সম্ভাষণ' (১৭ই চৈত্র ১৩১১) প্রতি অঞ্চলের নৃতত্ত্ব, পুরাকীর্তি, ভাষাতত্ত্ব, প্রভৃতি বিষয়ের উপকরণ-সংগ্রহকার্যে ছাত্রগণের সহযোগিতা-আহ্বান। এই কার্যে দেশের সহিত পরিচয়ও ঘনিষ্ঠ হইবে ও সাহিত্যপরিষদের কর্মসূচির রূপায়ণে সহায়তাও করা হইবে। ত্রিপুরা সাহিত্যসম্মেলনের সভার উদ্বোধনে 'দেশীয় রাজ্য' নামে প্রবন্ধে (১৭ আষাঢ় ১৩১২) দেশীয় রাজন্যবর্গ যাহাতে বৈদেশিক উপকরণবাহুল্য পরিহার করিয়া স্বদেশীয় রুচি ও শিল্পের পোষকতা করেন তাহার জন্য আবেদন। ইতিমধ্যে আষাঢ়, ১৩১২ সংখ্যায় 'ভাণ্ডার'-এ প্রকাশিত কয়েকটি জাপানী কবিতার ছন্দানুযায়ী অনুবাদ প্রকৃতপক্ষে রুশ-জাপান যুদ্ধে সদ্যোবিজয়ী জাপানের নবার্জিত প্রতিষ্ঠার স্বীকৃতি। কবি-হিসাবে নয়, রাষ্ট্রশক্তিপূজকরূপেই রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি জাপানের প্রতি প্রথম আকৃষ্ট হয়। 'অবস্থা ও ব্যবস্থা'—টাউনহলে ২৫শে আগষ্ট ১৯০৫-এ পঠিত ও ১৩১২, আশ্বিনে 'বঙ্গদর্শন'-এ প্রকাশিত—প্রবন্ধটিও তৎকালীন বাঙলার

বাস্তব সমস্তার দ্বারাই অনুপ্রাণিত। ঐ বৎসরের বিজয়া সম্মিলনীতে (২১শে কার্তিক ১৩১২) প্রদত্ত ভাষণ ও 'বঙ্গদর্শন', কার্তিক, ১৩১২-এ প্রকাশিত প্রবন্ধের মর্মোচ্ছ্বসিত আবেগধারা, কবিত্বময় ভাষা ও চিত্রধর্মী উপস্থাপনারীতি—সবই ধর্মচেতনা নয় রাজনৈতিক আদর্শচিন্তাপ্রসূত। ইহার উপর দেশব্যাপী ভাবালোড়নের তরঙ্গবেগ নিজ স্বাক্ষর মুদ্রিত করিয়াছে। ৭ই পৌষ, শান্তিনিকেতন পৌষ-উৎসবে পঠিত ও 'বঙ্গদর্শন' ১৩১২, মাঘ-এ প্রকাশিত 'উৎসব' প্রবন্ধটিতেও সেই একই সুরের ঝঙ্কার, সেই মিলনাকৃতির পৌনঃপুনিক প্রকাশ কবির ধর্মবোধও যে কতটা রাজনীতিরসপুষ্ট, দেবতার উদ্বোধনে যে জাতির মর্মবেদনা কত গভীরভাবে অনুপ্রবিষ্ট তাহার প্রমাণ দেয়। 'বিলাসের ফাঁস' (ভাণ্ডার, ১৩১২, মাঘ) আপাতদৃষ্টিতে সার্বভৌম জীবননীতি-অনুপ্রেরিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে সমকালীন ভোগবাদের বিকারের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী-উচ্চারণ; যুবরাজের ভারত-আগমন উপলক্ষ্যে রচিত (১৯০৫, ডিসেম্বর) 'রাজভক্তি' প্রবন্ধটিও দিল্লীর দরবারের মাধ্যমে রাজা ও প্রজার যে অস্বাভাবিক সম্পর্ক প্রকটিত হইল তাহার তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ। 'দেশনায়ক' প্রবন্ধেও (বঙ্গদর্শন, ১৩১৩ জ্যৈষ্ঠ) সেই সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির আশুপ্রয়োজনসাধন ও ভবিষ্যৎকল্যাণপ্রেরণার মিশ্র প্রভাব লক্ষণীয়। 'স্বদেশী আন্দোলন' সম্বন্ধে বক্তৃতাটি ('ভাণ্ডার'-এ ১৩১৩, জ্যৈষ্ঠে প্রকাশিত) লেখকমনের একই প্রবণতার সাক্ষ্য দেয়। এইসব প্রবন্ধই যে সমসাময়িক বহির্ঘটনার অভিঘাতে লেখকের মানস প্রতিক্রিয়ার অভিব্যক্তি ও এই উপরিভাগের চাঞ্চল্য ও গভীরের প্রগাঢ় শান্তি ও নিগূঢ় আনন্দানুভূতি যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র উৎসের নির্দেশবাহী, তাহা প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যেই ইহারা পূর্বে আলোচিত হওয়া সত্ত্বেও পুনরালোচিত হইল।

৪

এইবার 'খেয়া' কাব্যের কবিতাগুলি বিষয় ও মেজাজ-রীতি অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীতে বিন্যস্ত করিয়া আলোচনা করা যাইতে পারে।

ক. গূঢ়ার্থবোধক আবহসৃষ্টি

এই পর্যায়ে 'শেষ খেয়া' (আষাঢ় ১৩১২) ও 'খেয়া' (১৫ই শ্রাবণ ১৩১২)

সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য, কেননা ইহাদের মধ্যে সমগ্র কাব্যটির মূলসুরব্যঞ্জনা নিহিত। অবশ্য ইহাদের সাঙ্কেতিক তাৎপর্য সমান গভীর বা রহস্যময় নয়। 'শেষ খেয়া'-য় জীবনের গোধূলিযাত্রার উদাস, ধূসর, স্বপ্নঘন ইঙ্গিতটি আশ্চর্য নিগূঢ়তার সহিত ছন্দের মন্থর, আবিষ্ট গতিতে, চিত্রকল্পের বোধাতীত ব্যঞ্জনায় ও শব্দপ্রয়োগের উদ্বোধনী-শক্তিতে, এক কুহকময় ভাবপ্রতিবেশের মাধ্যমে অভিব্যক্ত হইয়াছে। কবিতাটি চেতনার উপর এমন একটি ঘন যবনিকা টানিয়া দেয় যে ইহার অন্তরালে কোন নির্দিষ্ট অর্থবোধের সন্ধান-প্রেরণা ই নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে। সামগ্রিক অনুভূতি অংশগুলির তাৎপর্য-নিরপেক্ষ হইয়া একটি অখণ্ড, অবিভাজ্য সত্তারূপে স্বয়ংসম্পূর্ণতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন অংশের অর্থ ক্ষণিকের জন্য জ্বলিয়া উঠিয়া কুয়াশার মধ্যে ক্ষীণ নক্ষত্রদ্যুতির ন্যায় এক রহস্যময় সার্বিক দ্যোতনায় বিলীন হইয়া যায়। কবি তত্ত্বের দিক দিয়া এই কথাটাই বলিতে চাহিয়াছেন যে তিনি জীবনের এক সন্ধিস্থলে পৌঁছিয়া সংসারজীবন ও পরপারপ্রস্তুতির মাঝখানে উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে থামিয়া গিয়াছেন। তিনি ঘরেও নাই, পারেও সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া দাঁড়ান নাই—সুতরাং এই মধ্যবর্তিতার চলচ্চিত্ততা তাঁর মনোলোকে নানা জিজ্ঞাসা-কৌতূহলের প্রক্ষেপে তির্যক্‌ভাবে আভাসিত হইয়াছে। কবি কৃতসঙ্কল্প হইয়া শেষ খেয়ার যাত্রী হইবার জন্য এখনও নিজেকে প্রস্তুত করেন নাই; সুতরাং তিনি অপেক্ষমান হইয়া অলস, উদাস মনে যাত্রী-পারাপারের দৃশ্যটি দেখিতেছেন ও বৈরাগ্যের ধূসর রং-এ মনকে রঞ্জিত করিতেছেন। এই ভাববিলাস ও অন্তরানুভূতির চিত্রই কবিতাটির মধ্যে প্রতিফলিত।

'খেয়া' কবিতাটি এরূপ দ্যোতনাময় ও রহস্যঘন হইয়া আমাদের কল্পনাকে আবিষ্ট করে না। ইহা কেবল খেয়া-পারাপারের পরিচিত ব্যঞ্জনাটি, উহার প্রতি কবির গভীরতর পরিচয়লাভের আকূতি ও অনির্দেশ্য চিত্তব্যাকুলতাটি সহজভাবে পরিস্ফুট করিয়াছে। এখানে কবি বাংলাকাব্যের একটি সুপ্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যেরই অনুবর্তন করিয়াছেন, ইহাকে কোন নিজস্ব অনুভূতির ইন্দ্রজালে মায়াময় করিয়া তুলেন নাই। এখানে শুধু ঈষৎ আবেগস্পৃষ্ট অভিপ্রায়-বিবৃতি আছে, কোন তড়িৎস্পর্শবাহী বাতাবরণ-নিবিড়তা নাই।

জগদীশচন্দ্র বসুকে লেখা উৎসর্গ-কবিতাটিতে (২৮শে আষাঢ় ১৩১৩) কবি 'খেয়া' সম্বন্ধে কবির আত্মগত অভিপ্রায়টি ব্যক্ত করিয়া বৈজ্ঞানিকের নূতন

আবিষ্ক্রিয়াটি উহার মর্মবাণী-উদ্‌ঘাটনে কিরূপ সহায়তা করিবে তাহারই কুণ্ঠিত আশা প্রকাশ করিয়াছেন। কবির কাব্যজগতে ইহা একটি লজ্জাবতী লতা—উহার প্রাণচেতনা স্তিমিত, উহার দলগুলি অর্ধবিকশিত, উহার মর্মসৌরভ স্বয়ংপ্রকাশ নয়। রূপক ও তত্ত্বের তির্যকভাষণের পত্রাবরণের তলে ইহার যে প্রাণের কথা, যে গোপন আবেদনটি তন্দ্রাচ্ছন্ন আছে তাহাকে বিজ্ঞানের প্রাণপরিমাপক যন্ত্রের ন্যায় মরমীর স্নিগ্ধ বোধদৃষ্টি দিয়া অনুভব ও পূর্ণ-প্রকটিত করিতে হইবে। এই কাব্যের পূর্ণ সৌন্দর্য দরদী পাঠকের সহযোগিতা-প্রত্যাশী, সম্পূর্ণ কবিশিল্পনির্ভর নয়। জগদীশচন্দ্র যখন জড়ের মধ্যে জীবনস্পন্দন আবিষ্কার করিয়াছেন, যখন মূককে প্রকাশমর্যাদা দিয়াছেন, তখন তিনিই এই ভীরু, অবগুণ্ঠিত, আত্মপ্রকাশকুণ্ঠ কাব্যের আদর্শ পাঠক ও রসবোদ্ধা। তিনিই ইহার ব্যাকুল নীরবতাকে বাণীমুখরিত করিবেন, ইহার স্বপ্নসম্মোহিত অধ্যাত্ম ধ্যানশীলতার তাৎপর্য উন্মোচন করিবেন, ও ইহার মর্মকোষে জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতারযে অলিখিত ইতিহাস স্তব্ধ আছে, যে নানা বার্তাবিনিময়ের ইঙ্গিত মুদ্রিত আছে তাহা সর্বজনবোধ্য ভাষায় রূপান্তরের দায়িত্ব লইবেন ইহাই কবির একান্ত প্রত্যাশা। অর্থাৎ এককথায় কবির ধারণা এই যে এই কাব্যটির রূপক-নির্মোকের আচ্ছাদনে যে নিগূঢ় জীবনসত্য আত্মগোপন করিয়াছে তাহার প্রকৃত তাৎপর্যগ্রহণ ও মর্মোপলব্ধি সহানুভূতিশীল পাঠকের আনুকূল্য-সাপেক্ষ। কবির এই ধারণাটি কাব্য-সমালোচনারীতিকে যে নির্ভুল পথনির্দেশ করিবে তাহা স্পষ্টই বোঝা যায়।

'ঘাটে' (২৭শে ভাদ্র, ১৩১২) সেই খেয়াপারের ইচ্ছাটিকেই নূতন দৃষ্টিকোণ হইতে দেখার প্রয়াস। কবি এখন পারে যাওয়ার আকুতিকে দমন করিয়া ঘাটে বসিয়া অপরের নদী-উত্তরণ দেখিয়াই ও পালের হাওয়া অঙ্গে লাগাইয়াই সন্তুষ্ট। তাঁহার পারের বিলম্ব আছে বলিয়া তাহার জন্য ক্ষোভপ্রকাশ নিরর্থক। বরং পরপারের দিকে লোলুপদৃষ্টিতে না চাহিয়া বর্তমান জীবনের পূর্ণ সদ্ব্যবহারই তাঁহার নিকট কাম্যতর মনে হইতেছে। তাঁহার কল্পলোকের মূল তাঁহার বাস্তব প্রতিবেশের মধ্যেই নিহিত। ভাবিতে আশ্চর্য লাগে যে খেয়াপারের যে অভিলাষ কবির মনে এক নিবিড় স্বপ্নাবেশ ঘনাইয়া তুলিয়াছিল ও সংসারযাত্রার সমস্ত আবেগকে গোধূলিছায়াচ্ছন্ন করিয়া স্তিমিত করিয়াছিল, তাহা এক মুহূর্তে কাটিয়া গিয়া কবিচিত্তে জীবন-স্বীকৃতির বোধটি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

সুনির্দিষ্ট রূপক-অভিপ্রায়হীন, অথচ গূঢ় অনির্দেশ্য ব্যঞ্জনার উদ্দীপকরূপে আরও কয়েকটি কবিতা এই পর্যায়ভুক্ত হইতে পারে। 'নীড় ও আকাশ' (১২ই চৈত্র ১৩১২), 'বিদায়' (১৪ই চৈত্র ১৩১২), 'পথের শেষ' (১৪ই চৈত্র ১৩১২), 'সমুদ্রে' (৭ই বৈশাখ ১৩১৩), 'সমাপ্তি' (১০ই বৈশাখ ১৩১৩), 'গান শোনা' (১২ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩) প্রভৃতি কবিতাগুলির মধ্যে রূপকের অর্ধ-প্রচ্ছন্ন, সমান্তরাল তাৎপর্য লক্ষ্য করা যায় না, অথচ উহাদের মধ্যে একটা সামগ্রিক আবহ-দ্যোতনা, আক্ষরিক অর্থের অন্তঃশায়ী একটা নিগূঢ় ভাবগুঞ্জন অনুভূতিরাজ্যে আবেশ সৃষ্টি করে। উহাদের আবেদনের মধ্যে যেন একটা দিব্যসৌরভ, একটা অতীন্দ্রিয় ইঙ্গিত অনুবাসিত হইয়া আছে। 'নীড় ও আকাশ'-এ কবির জীবনমমতা ও জীবনপরিচয়হীন আদর্শ-অভিসারের সুরগত পার্থক্যটি অপূর্ব সঙ্কেতময় আবহনির্মিতির মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত হইয়াছে। জীবনের শত বিচিত্র সুর কবির অনুভবে এক ইন্দ্রজালময় ঐকতানে মিলিত হইয়াছে। ভাব-গন্ধ-শব্দস্পন্দন সবই চেতনার একটি কেন্দ্রে সংহত হইয়া কবিমনের এক অদৃশ্য সমীকরণশক্তির সন্ধান দিয়াছে—এই ধ্বনিসমন্বয়ে দ্বিপ্রহরের নৈঃশব্দ্যের মধ্যে কীটের বৃক্ষকাণ্ড-বেধের অতি মৃদু, প্রায় অশ্রুত ঘর্ষণশব্দচ্ছায়াটিও নিজ বৈশিষ্ট্যের রেশ রাখিয়া গিয়াছে। এই শত-পাকে-জড়ান মৃত্তিকাসঙ্গীতের সহিত তুলনায় আকাশের গান সর্বচিহ্নবর্জিত, সকলভাবাসঙ্গমুক্ত একটি নীরব শূন্যতাবোধ মিশাইয়াছে। কবি শেষ পর্যন্ত আলোছায়ার বিচিত্র গানের প্রতিই তাঁহার পক্ষপাত ঘোষণা করিয়াছেন।

'বিদায়' কবিতায় কবির স্বভাব-উদাসীন মনোভাবের পিছনে রাজনৈতিক প্রয়াসবিমুখতার প্রভাব আবিষ্কার হয়ত কষ্টকল্পনা নয়। এটি 'খেয়া'-কাব্যের ভাবমগ্নতার অন্যতম অসাধারণ ব্যতিক্রম বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে। কিন্তু এখানেও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে কবি তাঁহার রাজনৈতিক বীতস্পৃহতার কোন কারণ নির্দেশ করেন নাই—কবিমনের এক আকস্মিক প্রেরণাই তাঁহার জীবনপথপরিবর্তনের হেতুরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। রাজনীতির ভূত কবিকে ছাড়িবার পূর্বে তাঁহার মনে কোন তিক্ততা সঞ্চার করে নাই, নিজ অশুভ অশুচি অভিভবের কোন স্থায়ী ক্ষতচিহ্ন রাখিয়া যায় নাই। তিনি জীবনের এই অধ্যায়কে খুব লঘুভাবে বিচার করিয়াছেন ও তাঁহার মোহমুক্ত কবিস্বভাবের নিকট সানন্দে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

একই দিনে রচিত 'পথের শেষ' কবিতায় আবার আত্মলীনতার সুরই সমস্ত বাহ্যকারণনিরপেক্ষরূপে প্রাধান্য ঘোষণা করিয়াছে। ইহার সহিত 'ক্ষণিকা'র ভাববৃত্ত ও 'খেয়া'-র মূল সুরের সাদৃশ্য সহজেই লক্ষণীয়। কবির পথিকবৃত্তি তাঁহার কর্মদায়িত্বের সমস্ত শাসন অস্বীকার করিয়া নিজ খেয়ালকে অবাধ প্রশ্রয় দিয়াছে। পথ তাহার মোহমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কবিকে ডাক দিয়াছে ও কবি পথের বাঁকে বাঁকে অজানা প্রত্যাশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছেন। শেষে কিন্তু ক্লান্ত পথচারী উপলব্ধি করিয়াছেন যে তাঁহার সমস্ত নূতন প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়াছে, আকস্মিক সৌভাগ্যের প্রসাদযাচ্ঞার দিন তাঁহার উত্তীর্ণ হইয়াছে, ও একের উপরেই তাঁহার সমস্ত আশা কেন্দ্রীভূত। তিনি নদীর ধারে বসিয়া খেয়াতরীর আবির্ভাবের জন্য অপেক্ষা করিবেন। ইহাতেই কিন্তু প্রমাণ হইল যে তাঁহার খেয়াযাত্রার সময় এখনও আসে নাই। তাঁহার 'খেয়া'-কাব্যে যাহা প্রকাশ হইয়াছে তাহা শেষ সিদ্ধান্তের অলঙ্ঘ্যতা নয়, তাহা অনাগত, কিন্তু কাম্য পরিণতির জন্য মানসজল্পনা ও প্রস্তুতি।

'সমুদ্রে' স্থির সঙ্কল্পের পরিবর্তে সদ্যউন্মেষিত একটি আকস্মিক উপলব্ধির নিকট অ-প্রতিবাদ আত্মসমর্পণের সুরটিই প্রধান। কবি নিতান্ত খেয়ালের বশে ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আকর্ষণে ঘাট হইতে তরী ভাসাইয়াছেন, ইহাতে তাঁহার ইচ্ছাশক্তির কোন সক্রিয় সমর্থন ছিল না। শান্ত, নিস্তরঙ্গ নদীতে ভাসিতে ভাসিতে হঠাৎ তিনি সমুদ্রের মোহানায় আসিয়া পড়িয়াছেন ও প্রমোদযাত্রা একটি কৃচ্ছ্রসাধ্য অভিযানে রূপান্তরিত হইয়াছে। সূর্যাস্তকালের ঘনায়মান অন্ধকার, তটরেখার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি, তারা-চমকিত নিঃসঙ্গতা ও সিন্ধুশকুনের তীরাভিমুখী পক্ষসঞ্চালন এই দৃশ্যপরিবর্তনের স্বরূপলক্ষণ তাঁহার মনে মুদ্রিত করিয়াছে। যখন সমুদ্রের বায়ুপ্রবাহ ও তরঙ্গবেগ তাঁহার যাত্রার অপ্রত্যাশিত পরিণতিরূপে তাঁহার চেতনায় অনুবিদ্ধ হইয়াছে, তখন এই অজ্ঞাত, অকূল আবির্ভাবকে তিনি অন্তরে বরণ করিয়াই লইয়াছেন। বিনা আহ্বানে অনিবার্যভাবে সমাগত এই রহস্যময় সত্তাকে, বাহিরের এই অযাচিত অভিভবকে তিনি অন্তরের সমর্থন জানাইয়াছেন। পারঘাটের তরী যখন কবিকে অকূল সমুদ্রে বহন করিয়া আনিয়াছে, তখন কবি তাঁহার সঙ্কীর্ণ জীবনধারার এই অপরিমেয় বিস্তারকে অন্তরের বস্তুতে রূপান্তরিত করিতে উৎসাহই বোধ করিয়াছেন।

'সমাপ্তি'-তে একটি বিপরীত ভাবান্তরের চরম প্রতিক্রিয়া রূপ পাইয়াছে।

কবির নৌকাযাত্রা এখন সারা—হাওয়া ও স্রোতের অভাবই এই অগ্রগতির প্রতিরোধের কারণ। এখন নদীপথ হইতে অস্তসূর্যে রঙীন তটভূমির প্রতিই তাঁহার দৃষ্টি প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছে। কিন্তু দূরাভিযানের প্রেরণা তাঁহার এখনও অক্ষুণ্ণ। তিনি এখন তারার অস্পষ্ট আলোকে মেঘসূচনায় অজানাআশঙ্কাময় আকাশতলে, ও স্মৃতি ও কল্পনার হঠাৎ-ভাসিয়া-আসা চেতনাপ্রবাহের ক্ষীণ সন্ধানসূত্র অবলম্বনে সমস্ত পরিচিত জীবনচিহ্নগুলির বিলুপ্তিতে দিক্‌দর্শনহীন মেঠো পথে নিরুদ্দেশযাত্রায় ব্রতী হইবেন। কিন্তু ইহারই পরবর্তী অন্তিম স্তবকে কবি এই যাত্রার কল্পনা প্রত্যাহার করিয়া গৃহাঙ্গনে প্রদীপ-জ্বালানো প্রতীক্ষার নিশ্চলতায় ও বিক্ষিপ্ত চিত্তবৃত্তির জাল-গুটানো আত্মসংহরণে তাঁহার অভিযানের সমাপ্তি ঘটাইয়াছেন। সুতরাং কবিতার বিভিন্ন স্তবকগুচ্ছের মধ্যে একটি ভাববিন্যাসের স্ববিরোধ দেখা দিয়াছে। ইহা শুধু জল হইতে স্থলে প্রত্যাবর্তন নয়, সমুদ্রের অসীম বিস্তার হইতে পল্লীপথের অজানা বিপদ্-সঙ্কেতের মধ্যে পদক্ষেপ নয়, ইহা গতির পরিবর্তে নির্লিপ্ত প্রশান্তির ও সর্বকর্মপ্রয়াসহীন ধ্যানস্তব্ধতাকেই কবির ভবিষ্যৎ আদর্শরূপে নির্বাচন করিয়াছে।

'গান শোনা'-কবিতায় কবি একটি মেঘান্ধকার, নির্জন বর্ষা-অপরাহ্ণ ও প্রবলবর্ষণ সন্ধ্যা ও রাত্রির ঘনীভূত বৃষ্টিপাতধ্বনির যবনিকা যে অদৃশ্যতার অন্তরাল রচনা করিয়াছে সেই স্তিমিত-গোপন পটভূমিকায় গানের স্বপ্নাচ্ছন্ন আকৃতিটিকে ব্যঞ্জিত করিয়াছেন। গানটি যেন প্রতিবেশের রহস্যময় অস্পষ্টতা ও গায়কের আত্মপ্রকাশকুণ্ঠার মর্মবাণীটির সুরময় অভিব্যক্তি। অপরাহ্ণে নবমেঘের নীচে নদী যখন আসন্নবর্ষণচ্ছায়ায় ছলছল, যখন সান্ধ্য সাথীদের অনুপস্থিতিতে শ্রোত্রীর চিত্ত প্রত্যাশাচঞ্চল, যখন ঘরের কোণে সঞ্চীয়মান অন্ধকারে গায়কের মুখ অপ্রত্যক্ষ ও অনুমিত, তখনই এই গান এই অবগুণ্ঠিত আবহাওয়ার অন্তঃস্পন্দনকে মুক্তি দিবে। অপরাহ্ণ যখন সন্ধ্যায় আচ্ছন্নতর হইবে, তখন ঘনায়মান বৃষ্টি যেন ভিজেমাটির ঘাস ও পাতার গন্ধ ও বনের নিঃশ্বাসের সহিত মিশিয়া গিয়া সমস্ত চরাচরের ভাবনির্যাসে অনুবাসিত হইবে, জড় ও উদ্ভিদ্‌জগতের প্রাণচেতনাটি বহন করিয়া আনিবে। গভীর রাত্রিতে বায়ুবেগসঞ্চালিত বৃষ্টিধারা মানবের জাগ্রত জীবনের ধ্বনিপরিচয়কে, সমস্ত নিশীথরাত্রির হৃৎস্পন্দনকে নিজ ছন্দের প্রবলতর সত্তার অবগুণ্ঠনতলে মুছিয়া দিবে। এই বস্তুবৈচিত্র্যবিলোপী

অনুভবসর্বস্ব মুহূর্তে প্রদীপ জ্বালিলে সমস্ত মোহজাল ছিন্ন হইয়া যাইবে, ভাবসম্মোহিত বস্তুজগৎ আবার স্বতন্ত্র সত্তায় আত্মঘোষণা করিবে ও যে গান এই মুগ্ধতারই অন্তর্লোকের দিব্য উন্মোচন তাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ধ্বনিবন্ধন হইতে খসিয়া গিয়া দেহহীন স্মৃতি ও কল্পনার আঁধারে অনুরণন তুলিতে থাকিবে। এই কবিতাটির মধ্যে পরিবেশ-দ্যোতনার অসাধারণত্ব কবিকল্পনার সূক্ষ্ম উদ্বোধনশক্তির পরিচয় দেয় ও উহার একটি গূঢ়ব্যঞ্জনায় পাঠকের রসচেতনাকে সচকিত করিয়া তোলে।

৫

খ. দিব্যব্যঞ্জনাগর্ভ নিসর্গ-কবিতা

এই পর্যায়ে নিম্নলিখিত কবিতাগুলি অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে—

'ঘাটের পথ', 'প্রভাতে (১৪ই শ্রাবণ ১৩১২), 'গোধূলিলগ্ন' (২৯শে পৌষ ১৩১২), 'বিকাশ' (২৪শে মাঘ ১৩১২), 'টিকা' (২৬শে মাঘ ১৩১২), 'বৈশাখে' (৭ই বৈশাখ ১৩১৩), 'দীঘি' (২৭শে বৈশাখ ১৩১৩), 'জাগরণ' (১৪ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩), 'ঝড়' (১৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩), 'বর্ষাপ্রভাত' (৭ই আষাঢ় ১৩১৩), 'বর্ষাসন্ধ্যা' (৯ই আষাঢ় ১৩১৩), 'চাঞ্চল্য' (১৩ই আষাঢ় ১৩১৩)।

এই কবিতাগুলি প্রকৃতির দিন-রাত, সকাল-সন্ধ্যা, ঝড়-বৃষ্টি প্রভৃতি নানা ছন্দপরিবর্তনের নিগূঢ় ভাবদ্যোতনা ও বর্ণাঢ্য রূপচিত্রের অপরূপ সহযোগিতায় এক যৌগিক সত্তারহস্যের উন্মোচন করিয়াছে। মনে হয় যে ইহাদের স্বল্পায়তন খণ্ড চিত্রগুলি যেন এক একটি দিব্য অনুভূতির আধার-রূপে মনকে নূতনভাবে আবিষ্ট করে। প্রকৃতির ক্ষিপ্র-নির্বাচিত ও স্বল্প রেখায় অঙ্কিত দৃশ্যগুলি যেন এক অলৌকিক জীবনাবেগের অন্তরঙ্গতায় এক নবচেতনার ইঙ্গিত দিয়াছে। ইন্দ্রিয়গম্য সৌন্দর্যবোধ, অনির্দেশ্য মানস আকূতি ও উত্তেজনা এবং অস্পষ্টভাবে উপলব্ধ, ধরা-ছোঁয়ার অতীত একটি অধ্যাত্ম সত্যের আভাস মিলিত হইয়া এই প্রকৃতিকবিতাগুলিকে একটি স্বতন্ত্র রসপর্যায়ে উন্নীত করিয়াছে। প্রকৃতির স্পর্শে কবির অন্তরলোকের একটি গভীরশায়ী ভাবচেতনা যেন রসমূর্তির সুস্পষ্টতায় বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। 'খেয়া'-কাব্যের কেন্দ্রীয় সুরটি প্রকৃতির ভাবচঞ্চল ইঙ্গিতময়তার

মধ্য দিয়া যতটা অভিব্যক্ত হইতে পারে, কবিমনের সূক্ষ্ম অধ্যাত্ম অভীপ্সা বহির্জগতের ক্ষণিক রূপচমকের মধ্যে যতটা নিজ ভাবগহনতার প্রতিচ্ছবি বিম্বিত দেখিতে পারে, এই কবিতাগুলির মধ্যে সেই চরম উদ্বোধনশক্তিই উদাহৃত হইয়াছে। প্রকৃতির সৌন্দর্য-ছবির অন্তরালে কবি-আত্মার চিন্ময় জ্যোতিঃ একটি দিব্য ভাস্বরতা বিকীর্ণ করিয়াছে। অথচ ইহাদের মধ্যে কোন সুস্পষ্ট রূপক-অভিপ্রায় আবিষ্কার করা যায় না বলিয়া, প্রাকৃতিক ও অধ্যাত্ম উপাদান সমমর্যাদায় পরস্পর-সংসক্ত হইয়াছে বলিয়া এবং ইহাদের অন্তরালে ভগবৎ-সত্তার কোন প্রত্যক্ষ উপলব্ধি ঘটে না এই কারণেও ইহাদিগকে রূপক বা ভগবৎ-তত্ত্ব কোন পর্যায়েই ফেলা যায় না। অন্যান্য কাব্যের মত এই নিসর্গকবিতাগুলি শুধু তত্ত্বচেতনার বাহন হয় নাই, একটি প্রগাঢ় অধ্যাত্ম আবেগের বিচিত্র প্রেরণাকে প্রকৃতির রূপরসগন্ধের নানা ছন্দে লীলায়িত করিয়াছে।

'ঘাটের পথ', ও 'দিঘি' কবিতাদ্বয় বিষয়ের অভিন্নতার মধ্যে মানস উৎসুক্যের ও অধ্যাত্ম আবেগের ছন্দোবৈচিত্র্যের ইঙ্গিত দিয়াছে। অপরাহ্ণ-বেলায় ঘাটে গিয়া ঘট ভরিবার যে পুরনারীসুলভ সংস্কার একটি চিরাভ্যস্ত প্রয়োজনবোধের উদ্বর্তিত পরিণতি তাহাই এখানে এক অনির্দেশ্য ব্যাকুল আহ্বানের ন্যায় আত্মার গভীরে অপ্রশমিত চাঞ্চল্য জাগাইয়াছে। ঘর হইতে ঘাটের স্বল্প ব্যবধানটুকু এক নিগূঢ় অস্বস্তিবেদনার অতলস্পর্শী অনুরণনে, উন্মথিত আত্মজিজ্ঞাসার ফোয়ারা-উৎসারে অপূর্ব দ্যোতনাময় হইয়া উঠিয়াছে। এই ক্ষুদ্র প্রাত্যহিক গার্হস্থ্য ঘটনাটিকে ভেদ করিয়া যেন এক ভাবমহাসমুদ্রের কল্লোল অসীমের সুরটিকে মুখরিত করিয়াছে। প্রকৃতির দুর্যোগ, নূপুরশিঞ্জিতের অনুষঙ্গী ঝিল্লী-সঙ্গীতদ্বারা মন্দ্রিত, খদ্যোতচমকিত রুদ্ধবায়ু সন্ধ্যার রহস্য, পড়ন্ত বেলার আকাশে কপোতের কূজন ও কুসুমগন্ধের অলস সঞ্চরণ, নীলাকাশশায়ী কোন অদৃশ্য সত্তার আনন্দঘন প্রতীক্ষা, মাথার উপরে গাছের পাতার ও দিঘির চঞ্চল ঢেউয়ের মধ্যে একটি গোপন বার্তার আদান-প্রদান—এ সমস্তই এই আশ্চর্য মানসঅভিসারের বাতাবরণ ও পথচলার ছন্দ রচনা করিয়াছে। মনে হয় যে 'খেয়া'র কেন্দ্রীয় সুরের সহিত এই প্রাত্যহিক গৃহকৃত্যটির এক অদৃশ্য যোগসূত্র আছে, গ্রামের দিঘির সহিত কোন এক অপ্রত্যক্ষ সুঁড়িপথে পরমজীবন-সত্য-সাগরের জোয়ার-ভাঁটার সংযোগ ঘটিয়াছে। কবিমনের যে অ-প্রস্তুতি তাঁহাকে তীর

ও শেষখেয়াযাত্রার মধ্যপথে আটকাইয়া রাখিয়াছে, তাঁহার ঘাট ও কুলহারা নদীর মধ্যে চূড়ান্ত নির্বাচনে বাধা দিয়াছে, তাহাই যেন এক গূঢ় অতৃপ্তি ও অভিমানের রূপকে এই পল্লীবধূর ঘাটে যাওয়ার উৎসুকতাকে অবদমিত ও বিলম্বিত করিয়াছে। বৃন্দাবন হইতে মথুরার স্বল্প ব্যবধান-অতিক্রমণে শ্রীমতীর যে অলঙ্ঘ্য মানসবাধা তাহারই যেন একটা নূতন রূপ এই পরপারযাত্রী আত্মার জীবনতটবন্ধনে আপাত-নিশ্চলতার মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে।

'দিঘি' কবিতাটিতেও দিঘির স্বচ্ছ, শীতল গভীর জলবিস্তারের মধ্যে অনুরূপ এক অধ্যাত্ম তাৎপর্যগভীরতা সংক্রামিত হইয়াছে। গ্রীষ্মসন্ধ্যায় দিঘির কূলে কূলে ভরা সুখস্পর্শ জলরাশির মধ্যে অবগাহনে যে তাপজুড়ানো তৃপ্তি ও আরাম তাহাই এখানে কোন সচেতন অভিপ্রায়ের দ্বারা নয়, কবির কল্পনাপ্রসার ও আবেগপ্রগাঢ়তার সহায়তায় একটি গূঢ়তর অর্থব্যঞ্জনা-উদ্দীপনের অবসর দিয়াছে। দিঘির যে প্রাথমিক পরিচয় কবিতাটিতে পাই, তাহাতেই উহার দ্বৈত ভূমিকার ইঙ্গিত মিলে। ইহা কর্মমুখরিত দিন ও নিঃশব্দ, স্বপ্নকুহকমণ্ডিত রাত্রির মধ্যবর্তী হইয়া চিত্তকে উন্মনা করে ও জীবনকে এক অপার্থিব অনুভূতি-আস্বাদনের জন্য প্রস্তুত করে। এই দিঘিতে সাঁতার দিয়া শুধু যে দিবসের তাপক্লেশ নিবারিত হয় তাহা নয়, 'সকল-হারা দেশের' নিরঞ্জন উপলব্ধি জন্মে। গোধূলিশান্তির মধ্যে, আকাশ ও ধরণীর ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর জীবন-স্পন্দনের অপূর্ব সঙ্কেতভরা পটভূমিকায় এক দিব্য ধ্যানচেতনার অন্তর্গূঢ় সত্য ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিয়াছে। দিঘি-প্রশস্তির দ্যোতনায় কবি যে কল্পনা-ঐশ্বর্যের পরিচয় দিয়াছেন তাহাই উহার স্বরূপনির্দেশক—এ দিঘি সমস্ত ভৌগোলিক সীমা ছাড়াইয়া, সমস্ত পার্থিব প্রয়োজনকে অতিক্রম করিয়া মনোহংসের বিহারসরোবরের রূপ লইয়াছে।

সোজাসুজি রূপকের ছাঁচে ফেলিলে ইহাদের মায়াপ্রতিবেশটি সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়।

কতকগুলি কবিতা—'প্রভাতে' (১৪ই শ্রাবণ ১৩১২), 'গোধূলিলগ্ন' (২৯শে পৌষ ১৩১২), 'বিকাশ' (২৪শে মাঘ ১৩১২), 'টিকা' (২৬শে মাঘ ১৩১২), 'বর্ষাপ্রভাত' (৭ই আষাঢ় ১৩১৩), ও 'বর্ষা-সন্ধ্যা' (৯ই আষাঢ় ১৩১৩)—প্রকৃতির একটি বিশেষ ক্ষণের উন্মেষিত

সৌন্দর্যের মধ্যে কবির মনের দিব্য উপলব্ধির একটি দৃঢ়প্রত্যয়সঞ্জাত অথচ বিহ্বল আনন্দোচ্ছলতার সুর সঞ্চারিত করিয়াছে। কবি হঠাৎ নিসর্গসৌন্দর্যের অভ্যন্তরে একটি আত্মিক হর্ষোদ্বেলতার মাদকতা অনুভব করিয়াছেন। প্রকৃতির শুভলগ্ন তাঁহার অন্তরের ভাবমুগ্ধতার রং-এ অনুরঞ্জিত হইয়া এক গূঢ়তর প্রেরণা বিকিরণ করিয়াছে। মনের আলো বাহিরের রূপের সহিত মিশিয়া তাঁহার চেতনায় এক মায়ালোকের উদ্বোধন ঘটাইয়াছে। এই নব আবিষ্কার কোন তত্ত্বে নির্দিষ্ট আকার না লইয়া, কোন রূপক-অভিপ্রায়ের শৃঙ্খলে আবদ্ধ না হইয়া উহার জন্মমুহূর্তের পুলকাবেশকে অবিকৃত রাখিয়া উহাকে আরও দ্রুতস্পন্দিত ও আবেগঘন রূপ দিয়াছে। প্রভাতের নির্মল আলোক, প্রদোষের অনুরাগরঞ্জিত গোধূলি-আবরণ, বর্ষাঋতুতে সকাল ও সন্ধ্যার বিশেষ স্নিগ্ধতা ও ভাবোদ্দীপন সবই যেন একটি অলৌকিক দীপ্তিতে অভিস্নাত ও প্রকৃতিরাজ্য হইতে মানসচেতনায় স্থানান্তরিত হইয়া একটি অনাস্বাদিতপূর্ব স্বরূপ-মাধুর্যের আস্বাদন দিয়াছে। কবির সমস্ত অন্তর্জীবনে যেন মুহূর্তের মধ্যে এক অভাবনীয় রূপান্তর ঘটিয়াছে, অনুভূতির এক নূতন দ্বার খুলিয়া গিয়াছে।

'প্রভাতে' সারারাত্রি বর্ষণের পর তাঁহার মনের সরোবর ভরিয়া উঠিয়াছে ও প্রাণের এই কূলে কূলে ভরা পরিপূর্ণতার মধ্যে নিশ্চিত প্রত্যয়ের একটি অমল শতদলপদ্ম শোভায় ও গন্ধে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। কবিমনের অতলস্পর্শ রহস্যসাগর যেন উহার অন্তরশায়ী রত্নটিকে মুক্তি দিয়া উহাকে সুস্পষ্ট অনুভবগোচর করিয়াছে। বহিঃপ্রকৃতির অকৃপণ দাক্ষিণ্য যেন অন্তর্জীবনে পূর্ণমাত্রায় প্রতিবিম্বিত হইয়াছে ও এই বাহির ও ভিতরের একান্ত সহযোগিতায় এক আনন্দময় নিগূঢ় অধ্যাত্ম সত্য উপলব্ধি ও বিশ্বাসের পূর্ণতায় প্রত্যক্ষবৎ ধরা দিয়াছে। 'গোধূলি-লগ্ন'-এ আত্মার মধ্যে এই প্রত্যাশিত আবির্ভাবটি শুধু নিবিড় আনন্দের নৈর্ব্যক্তিকতায় নিঃশেষ হয় নাই, দাম্পত্য প্রেমের আসন্ন মিলনের আশায় উতলা ও প্রগাঢ়তম অনুরাগের রং-এ রঙীন হইয়াছে। অনুরাগরঞ্জিত সন্ধ্যার আকাশ কবিচেতনায় মিলনের পুলকময় প্রতীক্ষা ও প্রস্তুতি ঘনাইয়া তুলিয়াছে ও দিনের তুচ্ছ, বিক্ষিপ্ত কর্মবিড়ম্বনার সঙ্গে প্রিয়মিলনোৎসুক্যে সম্পূর্ণ নিবেদিত যামিনীর পার্থক্যটি পরিস্ফুট করিয়াছে। এই মধুরতম সমর্পণক্ষণে সমস্ত কাজের অবসান, সমস্ত অবাঞ্ছিত আগন্তুকের ভিড় হইতে মুক্তি। এখন কেবল দয়িতের জন্য প্রসাধন

ও আনন্দের অবারিত, অনবগুণ্ঠিত লীলাবিলাস। এখানে কবি যদিও তত্ত্বের ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন, তথাপি তিনি যাত্রাপথে সন্ধ্যাকাশের সমস্ত বর্ণসমারোহ, জীবনের সমস্ত বিচিত্র স্মৃতি ও স্বাদ এবং কর্মবন্ধনমুক্ত ও এক পরম অনুভবনিষ্ঠ চিত্তের সমস্ত উল্লাস-সংবেগকে সঙ্গে লইয়াছেন। কবি কোন পূর্বনির্দিষ্ট মানস-প্রক্রিয়ার অনুবর্তী না হইয়া, লৌকিক বিবাহের সমস্ত পুলকশিহরণ ও প্রত্যাশা-চাঞ্চল্যকে, উহার মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান-বৈচিত্র্যকে এই তাত্ত্বিক পরিণয়ের উপচাররূপে সাজাইয়াছেন।

'বিকাশ' ও 'টিকা' কবিতা দুইটিও প্রভাতের অম্লান উজ্জ্বলতার মধ্যে মনের অধ্যাত্ম অনুভবরহস্যের উন্মেষকাহিনী। পদ্মাতীরে শিলাইদহে এই সূর্যোদয়, প্রভাতের এই আত্ম-উদ্‌ঘাটন কবিমনকে অনুরূপ আত্মবিস্তারে, বিশ্বমধ্যে আপনার ব্যক্তিসত্তাকে ছড়াইয়া দিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। 'টিকা'-তেও নবোদিত, অরুণবরণ সূর্য যেন কবির ললাটে একটি জ্যোতির তিলক পরাইয়া দিয়াছে ও কবিচিত্তে এই দিব্যস্পর্শটি আজীবন অম্লান রাখিবার সঙ্কল্প জাগাইয়াছে। দুইটি কবিতাতেই প্রকৃতির নবীন আভা যেন কবিমনের একটি রুদ্ধ দুয়ার খুলিয়া দিয়াছে, প্রকৃতির দান যেন কবির অসংশয় স্বতঃসিদ্ধ আনন্দপ্রত্যয়রসে জারিত হইয়া এক নূতন অর্থগূঢ়তা লাভ করিয়াছে।

'বর্ষাপ্রভাত' ও 'বর্ষাসন্ধ্যা' কবিতাদ্বয় একজাতীয় হইয়াও যেন একটু স্বতন্ত্রপ্রকৃতির। 'বর্ষাপ্রভাত' অনেকটা কীট্‌সের ইন্দ্রিয়চেতনালালিত রসকল্পনা (sensuous imagination) ও পুরাণস্মৃতিসঞ্চরণের লক্ষণাক্রান্ত। বর্ষাস্নাত আকাশে প্রভাত-আলোক যেন সোনার মায়ার বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিয়াছে। উহার আলোকের অজস্র ধারা যেন আধার হইতে উপ্‌চাইয়া পড়িয়া একটি অবাস্তবতার ও অপচয়ের ধারণাকে পরিস্ফুট করিতেছে, ইহা অঞ্জলি ছাপাইয়া দিক্‌-দিগন্তরকে প্লাবিত করিয়া একটি মধুসঞ্চয়ে অতিপূর্ণ মৌচাকের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। এখানে কবি তাঁহার ভাবসম্মোহ ব্যক্ত করিবার জন্য অনুভূতির গভীরে অবতরণ না করিয়া তাঁহার কল্পনাকে পৌরাণিক স্বর্গে বহির্মুখী সৌন্দর্যের সন্ধানে প্রেরণ করিয়াছেন। প্রভাতের এই অপরিমিত ঐশ্বর্য যেন লক্ষ্মীর ও ইন্দ্রাণীর দিব্যপ্রভাব-উৎসারিত— পৃথিবীর ঐশ্বর্যে স্বর্গের ছটা লাগিয়াছে। উপসংহারে কবির ভাবপরিণতি একটি নূতন রূপ লইয়াছে। কবি এই সমৃদ্ধ, দেবকান্তি আলোকপ্রবাহে

মনকে অভিষিক্ত করিয়া সমস্ত অতৃপ্ত কামনা-বাসনার পরপারে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, চাই-না-কিছুর স্বর্গসীমায় পৌঁছিয়া মনের খোঁজা-পাওয়ার চির-অবসান ঘটাইয়াছেন।

'বর্ষাসন্ধ্যা'য় সেই প্রশান্ত, চাওয়া-পাওয়ার অতীত পরিপূর্ণতাবোধ কবিচিত্তের সমস্ত অন্বেষণ-ক্ষোভের আন্দোলনকে স্তব্ধ করিয়াছে। এমন কি, পূর্বগামী কবিতাগুচ্ছের মত এখানে আনন্দের আতিশয্য ঘোষণা করার উত্তেজনা, নিজ সুখের কথা প্রচার করার অদম্য আবেগও শান্ত হইয়াছে। তিনি কি পাইয়াছেন তাহা তিনি জানেন না, তবে তিনি যে আর কিছু চাহেন না সে সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিত। তিনি কোন নীরব অভিসারযাত্রার পথিকের যে ক্ষণিক স্পর্শ অনুভব করিয়াছেন, লুপ্ততারা, বর্ষণমুখর বর্ষাসন্ধ্যায় জুঁইফুলের গন্ধে ও স্বপ্নমেদুর বৃষ্টিধারাপাতে তিনি যে অদৃশ্য সত্তার আলিঙ্গন-বন্ধনে বাঁধা পড়িয়াছেন তাহাই তাঁহার মনের অভাববোধের সম্পূর্ণ উন্মূলন করিয়া তাঁহার অন্তরে সুধার উৎস উন্মোচন করিয়াছে ও তাঁহাকে আকাঙ্ক্ষাহীন গ্রহণশীলতার মন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছে। এখানে কল্পনা ও অনুভূতির সক্রিয়তা আছে কিন্তু এই ঈষৎ আভাসগুলি তাঁহার জিজ্ঞাসাকে তীক্ষ্ণ না করিয়া তাঁহাকে সমাধানের শান্তরসে নিমজ্জন করিয়াছে। এই কবিতাগুলি সমজাতীয় হইলেও প্রতিটির মধ্যে ভাবের ও সুরের স্বরলিপির সূক্ষ্ম পার্থক্য অনুভূত হয়।

'বৈশাখ' (৭ই বৈশাখ ১৩১৩), 'জাগরণ' (১৪ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩), 'ঝড়' (১৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩) ও 'চাঞ্চল্য' (১৩ই আষাঢ় ১৩১৩)—কবিতাগুলির স্বাদ একটু ভিন্ন রকমের। বৈশাখের তপ্ত হাওয়া মাঠের নিঃসঙ্গতা ও মধ্যাহ্নের ভ্রমরগুঞ্জনের সহিত মিশিয়া কবিচেতনায় একটি মৃদু আবেশ সঞ্চার করিয়াছে। আমলকি ও মহুয়াগাছের পত্রপল্লবে ক্ষীণনিঃশ্বসিত উষ্ণ বায়ু কবিকে একটি অজানা সত্তার স্পর্শে উন্মনা করিতেছে ও প্রখর রৌদ্রতাপে বাঁধের জলে আলোর চকিত কম্পন যেন কবিচিত্তের মরীচিকার ছবি দূর দিগন্তে অঙ্কিত করিতেছে, মনের অস্থির শিহরণকে বহির্জগতে প্রতিফলিত করিতেছে। শেষ সন্ধ্যার ছায়া দিঘির জলে ঘনাইয়া আসিলে কবিমনে প্রত্যয় জাগিয়াছে যে পল্লীবধূর কলসে জল ভরার মত তাঁহার অলস-রোমন্থনরত মনেও কিছু শূন্যতা-পূর্ণ-করা অনুভূতি সঞ্চিত হইয়াছে। 'কল্পনা' কাব্যে গ্রীষ্ম ও বর্ষার বর্ণৈশ্বর্যময়, ধ্বনিসমারোহমুখর, সৃষ্টিরহস্যের নিগূঢ়-তাৎপর্যবাহী, প্রাচীন ভারতের জীবনচর্যার স্মৃতিবাসিত ঋতুকল্পনা এখানে

একটি ঘরোয়া অন্তরঙ্গ ভাবপ্রেরণার সূক্ষ্ম, পলাতক ইঙ্গিতের উদ্বোধন করিয়াছে। বৈশাখ এখনে রুদ্র তপস্যার প্রতীক সন্ন্যাসীমূর্তিতে দেখা দেয় নাই, মনের বীণায় একটি মৃদু, ঈষৎ-অনুভবগম্য অনুরণন, একটি আত্মলীন গুঞ্জনধ্বনি তুলিয়াছে। ঋতু যেন এখানে বিষাণ ছাড়িয়া মেঠো বাঁশি বাজাইয়াছে, বিরাটের বৃহৎ ভাবাদর্শের অনুশীলন হইতে বিরত হইয়া একটি ভীরু অস্পষ্ট সত্তাকে অন্তর্লোকের বিজনতা হইতে রূপলোকে প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছে। বর্ষার আর সে শ্যামসমারোহ, সে ছন্দ-উল্লাস, সে প্রণয়ভাবাসঙ্গের সমৃদ্ধ প্রতিবেশ নাই—সে এখন রাত্রির প্রহরে প্রহরে ধারাপাত ও মেঘগর্জনের ছন্দে এক অস্পষ্ট অধ্যাত্ম উৎকণ্ঠা বা স্বতউৎসারিত আনন্দ-প্রত্যয়ের ব্যঞ্জনায় তাহার অন্তর্নিহিত বাণীটি কোন উপায়ে অনুভূতির দ্বারে পৌঁছাইয়া দেয়। ভাবিতে আশ্চর্য লাগে যে, যে প্রচণ্ড প্রাকৃতিক শক্তি কালবৈশাখীর ঝড়ে ও বর্ষার প্রমত্ত স্রোতোচ্ছ্বাসে মানুষের বহির্জীবনে ও অন্তর্জীবনে একটা তুমুল আলোড়ন জাগায়, যাহা সৌরমণ্ডলের অনন্ত যাত্রা-ছন্দের অঙ্গীভূত ও সমধর্মী ও মানবজীবনের যুগযুগসঞ্চিত ভাব ও রসধারায় ঐশ্বর্যময়, তাহা উহার অবয়ব-বিশালতা সঙ্কুচিত করিয়া কবিচিত্তে এক ক্ষুদ্রতম মন্ময় সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও নানা সূক্ষ্ম অনুভবজালে নিজ অস্তিত্বের ক্ষীণ সঙ্কেত দিয়াছে। কল্পনা-কাব্যে ঋতু-বর্ণনা নিশ্চয়ই ভারতীয়-ঐতিহ্য ও সংস্কারের দ্বারা প্রভাবিত, কিন্তু উহাই উহার একমাত্র পরিচয় নয়। হয়ত পাশ্চাত্ত্য কাব্য ও জীবনাবেগের, বিশেষতঃ শেলির কল্পনার প্রচণ্ড ভাবোচ্ছ্বাস ও জীবনাদর্শের দুর্বার অভীপ্সা রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার স্বাভাবিক কক্ষপথ হইতে কিছুটা বিচ্যুত করিয়াছে। 'বর্ষশেষে' রবীন্দ্রনাথ যে কল্পনাসমুন্নতির পরিচয় দিয়াছেন ও জীবনাতৃপ্তির যে বহ্নিজ্বালাময়, স্ফুলিঙ্গ-বর্ষী অন্তর্দাহকে ভাষায় ও ছন্দে ব্যক্ত করিয়াছেন, বৈশাখের প্রখর, দুঃসহ মধ্যাহ্নতাপে যে দুশ্চর তপস্যার প্রতিবেশ আঁকিয়াছেন, তাহা যেন খানিকটা পশ্চিমের জীবনসংগ্রামতীব্রতার প্রতিফলিত রূপ। সাধারণতঃ আমাদের কল্পনা এতটা উচ্চভাষী, আমাদের কাব্যসঙ্গীত এতটা চড়া সুরে বাঁধা থাকে না। কল্পনা-কাব্যে ভারতীয় অধ্যাত্মবোধের মর্মমূলে বৈদেশিক ভাবাতিশয্য হয়ত অজ্ঞাতসারেই অনুপ্রবেশ করিয়াছিল। 'খেয়া'-য় আবার কবি শাশ্বত ভারতীয় জীবনসংস্কারের ও সৌন্দর্যচেতনার আত্মসমাহিত ধ্যানোপলব্ধির স্নিগ্ধ গোধূলিচ্ছায়ায় ফিরিয়া আসিয়াছেন।

'জাগরণ', 'ঝড়' ও 'চাঞ্চল্য' কবিতা তিনটিতে একই প্রকারের অনুভূতির স্পন্দন, এক অভাবিত প্রত্যাশার স্ফুরণ বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমটিতে কৃষ্ণপক্ষের ম্লান জ্যোৎস্নার আলো-অন্ধকারে, শুব্ধ, স্বপ্নমূছিত, অভিশাপগ্রস্ত বনভূমি, এবং সুপ্তিমগ্ন, ভাঙ্গা দুয়ার ও বাদুড়-অধ্যুষিত জীর্ণ গৃহের নিরানন্দ পরিবেশে হঠাৎ যেন কাহারও আবির্ভাবসূচনায় অশান্ত মনের প্রতীক্ষা-চাঞ্চল্য এক বৈপরীত্য-চমক জাগাইয়াছে। অবসন্ন, নিঃশেষিতপ্রাণ প্রাকৃতিক পটভূমিকায় মানবাত্মার সম্পূর্ণ অতর্কিত নবচেতনা-উন্মেষ বিপরীতের মধ্যে এক অপূর্ব সুরসঙ্গতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। 'ঝড়'-এ ঝটিকাক্ষুব্ধ বাদল রাতে কবিচিত্তে যে উত্তেজনার সঞ্চার হইয়াছে তাহার পরিণতি ঘটিয়াছে স্মৃতি ও কর্মোদ্যমের চরম অবলুপ্তিতে শূন্য, সমস্ত কামনা ও বাসনার অতীত এক অতলস্পর্শ মানস-নির্লিপ্ততার স্বর্গপ্রয়াণে। এই ভাবঘন নির্বাণের স্বরূপ কবির নিকট সুস্পষ্ট নয়। কাজল মেঘে ঘনিয়ে-উঠা সজল ব্যাকুলতা ও এলোমেলো হাওয়ায় উড়ন্ত এলোমেলো কথা এই ধ্যানসমুদ্রের গভীর হইতে উত্থিত বহির্মুখী জীবনলক্ষণের বুদ্‌বুদপুঞ্জ। অশান্তের আবির্ভাব কিন্তু এই প্রগাঢ় শান্তিরই অগ্রদূত। 'চাঞ্চল্য'-এ এই চঞ্চলতা আসন্ন ঝড়ের পূর্বসূচনায় বনভূমি, নিস্তরঙ্গ দিঘিজল ও সাংসারিক কার্যের যন্ত্রবদ্ধ কর্তব্যে শৃঙ্খলিত মানবমনে যুগপৎ সংক্রামিত হইয়া এক অদৃশ্য প্রভাবের নিকট তাহাদের ত্বরিত আত্মসমর্পণের নির্দেশ জারি করিয়াছে। এই পর্যায়ের কবিতায় কবির মানসপটে বর্ণবিরল, কিন্তু ইঙ্গিতময় কয়েকটি রেখায় উৎকীর্ণ স্বল্পসংখ্যক প্রকৃতিদৃশ্যের অন্তরাত্মা কবির স্বচ্ছদৃষ্টির নিকট একটি সত্তাচেতনা আভাসিত করিয়াছে ও তাঁহার উৎসুক চিত্ত ও সূক্ষ্ম রূপনির্মিতির আধারে বাঁধা পড়িয়াছে।

৬

গ. রূপকতত্ত্ব ও রূপকলীলা

'খেয়া'-কাব্যের মূল সুর কখনও আক্ষরিক, কখনও সঙ্কেতময় রূপকাশ্রিত। কবি 'শেষ খেয়া'-য় যে গোধূলিগহন ভাবলোকের দ্বার উন্মোচন করিয়াছেন তাঁহার কাব্যের অধিকাংশ কবিতাই সেই রহস্যরাজ্যেই বিচরণশীল। ইহারা নানা পরোক্ষ ইঙ্গিত ও আখ্যানের মাধ্যমে এই গূঢ় আকূতি ব্যক্ত করিয়াছে—

প্রত্যক্ষ অর্থের পিছনে একটা অপ্রত্যক্ষ সত্যের আভাস দিয়াছে। এক শ্রেণীর কবিতায় তত্ত্বই প্রধান, ছদ্মআবরণের অন্তরাল হইতে একটা সুনির্দিষ্ট ভাবসত্যই আত্মঘোষণা করিয়াছে। ইহারা রূপকের দ্বিস্তরবিন্যস্ত তাৎপর্য-প্রতিপাদনেই রত ও রূপক-অভিপ্রায়ের বহির্লক্ষণই ইহাদের মধ্যে প্রকট। কিন্তু আর এক শ্রেণীর কবিতায় তত্ত্বের লীলারূপই রূপকপ্রয়োগের মধ্যে উদ্ভাসিত। রূপকের সীমিত অর্থবন্ধন ছাড়াইয়া ইহারা মনকে এক অনির্দেশ্য অনুভূতিলোকে দূরাভিযানে প্রেরণা দেয়। কবির কল্পনা ও সৌন্দর্যবোধ তত্ত্বচেতনার প্রভাব অতিক্রম করিয়া স্বাধীনভাবে স্ফুরিত হয়, প্রতিপাদনের দায়িত্ব অস্বীকার করিয়া অনুভবমুগ্ধতায় উত্তীর্ণ হয়। এই দুই শ্রেণীর পার্থক্য বুঝাইতে ও উহাদের মধ্যে রূপকের সাধারণ অস্তিত্ব নির্দেশ করিতে উহাদিগকে যথাক্রমে রূপকতত্ত্ব ও রূপকলীলা এই দুই স্বতন্ত্র অভিধায় চিহ্নিত করিতে হয়। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী ভগবৎপ্রেমকাব্যগুলিতেও—'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য', 'গীতালি'-তেও অনুরূপ দুইটি শ্রেণী—তত্ত্বপ্রধান ও অনুভূতিপ্রধান—পৃথক্ করা যায়।

রূপকতত্ত্ব পর্যায়ে নিম্নলিখিত কবিতাগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে—

'শুভক্ষণ', 'ত্যাগ' (১৩ই শ্রাবণ ১৩১২), 'আগমন' (২৮শে শ্রাবণ ১৩১২), 'দুঃখমূর্তি', 'দান' (২৬শে ভাদ্র ১৩১২), 'বাঁশি' (২৯শে শ্রাবণ ১৩১২), 'কৃপণ' (৮ই চৈত্র ১৩১২), 'কূয়ার ধারে' (৯ই চৈত্র ১৩১২), 'জাগরণ' (১০ই চৈত্র ১৩১২), 'ফুলফোটানো (১১ই চৈত্র ১৩১২), 'হার' (১২ই চৈত্র ১৩১২), 'বন্দী' (১লা বৈশাখ ১৩১৩), 'প্রতীক্ষা' (১৭ই বৈশাখ ১৩১৩), 'প্রচ্ছন্ন' (২রা আষাঢ় ১৩১৩) ও 'অনুমান' (৪ঠা আষাঢ় ১৩১৩)। ইহাদের মধ্যে সাধারণ লক্ষণ এই যে ভগবৎ-মিলনের জন্য ভক্তের যে আকূতি তাহা রবীন্দ্রমনোভঙ্গীতে সুপরিচিত কয়েকটি তত্ত্বাশ্রয়ীরূপকের মধ্যে ব্যক্ত হইয়াছে। ভগবান যে রাজাধিরাজ, ভক্ত যে অতি দীন ও উভয়ের মধ্যে যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান, তাহা ভগবানের ভক্তবৎসলতার দ্বারা অবলুপ্ত হয়। ভগবানের প্রতি নিবেদিত সর্বাপেক্ষা বেশী মূল্যবান উপহারও কখনও কখনও আপাতদৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়; কখনও তাঁহার তুচ্ছতম সেবাও তাঁহার প্রসাদলাভে ধন্য হয়। ভগবানের প্রেমলাভের জন্য ভক্ত প্রেমার্থিনী দীনা নারীর ন্যায় প্রতীক্ষা করে ও নানা অসম্ভব আশা-কল্পনা, নানা আশা-নৈরাশ্যের ক্ষুব্ধ দ্বন্দ্ব, প্রকৃতি-জগৎ হইতে সংক্রামিত নানা সূক্ষ্ম অনুভূতি-

প্রবাহ এই সাধনার বৈচিত্র্য ঘটায় ও উহার মধ্যে রসের সঞ্চার করে। এই সমস্ত মানসলীলার মধ্যেও কিন্তু তত্ত্ববন্ধন দৃঢ় থাকে বলিয়াই উহাদের স্বরূপনির্ধারণে আমাদের কোন অনিশ্চয়তা থাকে না। রূপকের এই পরোক্ষ-ব্যঞ্জনা কবির ভাবের অকৃত্রিমতা, ভাষার সরলতা ও বাউলসুলভ একটা উদাসীন, মুগ্ধ দূরসন্ধানপ্রবণতার সাহায্যে ঘনীভূত হয় ও তত্ত্বকে কাব্যরূপ দেয়।

'দুঃখমূর্তি' ও 'বন্দী' কবিতায় দুঃখের মধ্যে ভগবানের আবির্ভাব ও নিজের শক্তি-আস্ফালনের বাঁধনে নিজবন্দিত্ব সোজাসুজি তত্ত্বপ্রতিষ্ঠারূপে উপস্থাপিত হইয়াছে। 'হার' কবিতাতেও রূপকবর্জিত তত্ত্বপ্রত্যয়ের একেশ্বর প্রাধান্য। 'আগমন' ও 'দান' কবিতাদ্বয় সমকালীন বাঙলা-জীবনের বহির্বিক্ষোভপ্রভাবিত সংগ্রাম-সংকল্পকে ভগবানের নির্দেশরূপে গ্রহণের প্রত্যয়দৃঢ় ঘোষণা। মনে হয় ইহাদের মধ্যে 'বলাকা'র বিশ্বব্যাপী প্রলয়-রোলের পূর্বগামী অনুরণন শোনা যায়। এই দুর্যোগের সুরই এই পর্যায়ের শান্তরসপ্রধান, প্রণয়ের প্রতীক্ষাব্যাকুল কবিতাগুচ্ছের মধ্যে ইহাদিগকে স্বাতন্ত্র্য দিয়াছে। 'বাঁশি'তে রূপক-উদ্দেশ্য যদিও স্পষ্ট হয় নাই, তথাপি প্রেমনিবেদনের মোহভরা মাধ্যমরূপে ইহা প্রণয়বিহ্বলতার ভাবাসঙ্গের সহিত চির-সম্পৃক্ত ও নারীর অতৃপ্ত প্রেমপিপাসা ইহাকে পূজার অর্ঘ্যোপচারে সাজাইতে ব্যগ্র হইয়াছে। মনে হয় বৈষ্ণব কবিতার 'বংশীশিক্ষা' রবীন্দ্রনাথের অপৌত্তলিক মনে খানিকটা অজ্ঞাত প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকিবে। ভগবানের ওষ্ঠে যে বাঁশী বিশ্বজগৎকে সম্মোহিত করে ও প্রেমিকার চিত্ত জয় করে, ভক্ত তাহাকে লইয়া শৈশবখেলার সাধ মিটাইতে চাহিয়াছে।

'জাগরণ', 'ফুলফোটানো', 'প্রতীক্ষা' ও 'অনুমান' এই কবিতাকয়টিতে রূপক প্রণয়লীলার আবেগবিহ্বল, খেয়ালী কল্পনাবৈচিত্র্যের রেখাজালের অন্তরালে কিছুটা অস্পষ্ট হইয়াছে। তথাপি সমস্ত অলঙ্কৃত পশ্চাৎপটের সম্মুখে তত্ত্বের আত্মপ্রকাশটি অনুভব করা যায়। 'জাগরণ' নামে প্রথম কবিতাটিতে প্রেমিকা সখীর মধ্যবর্তিতা নিবারণ করিয়া দয়িতের স্পর্শে নিজ সত্তার জাগরণ কামনা করিয়াছে। সখীকে যদি তত্ত্বের প্রতিনিধি ধরা যায়, তথাপি এই তত্ত্বপ্রত্যাখ্যানের মধ্যেই তত্ত্ব নিগূঢ়ভাবে বর্তমান। প্রেমের ছলাকলাবিস্তারে প্রেমিককে বন্দী করার পরিকল্পনাই ত তত্ত্বসঞ্জাত। 'প্রতীক্ষা', ও 'অনুমান' কবিতা দুইটিতেও প্রকৃতির প্রতিবেশরচনায় কবি

সূক্ষ্ম-অনুভবপ্রয়োগে ও সার্থক ব্যঞ্জনা-উদ্দীপনে প্রতীক্ষাতত্ত্বের গুরুত্ব অনেকটা হ্রাস করিয়াছেন ও কবিতার সামগ্রিক আবেদনটিরও কিছু রূপান্তর ঘটাইয়াছেন। তথাপি প্রতীক্ষা প্রেমের এমন একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ যে ইহা সত্ত্বেও প্রণয়সাধনাতত্ত্বই মুখ্য হইয়া দেখা দিয়াছে। 'অনুমান'-এ ভীরু প্রেমিকা-চিত্তের আত্মবঞ্চনা ও বাস্তববিমুখতা, প্রত্যক্ষ হইতে অনুমানের উপর অধিক নির্ভরশীলতা প্রেমের একটি মনোবৃত্তিরূপে ব্যক্ত হইয়াছে।

'ফুলফোটা' এই তত্ত্বপ্রত্যয়ের চরম পরিণতি। ফুলের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের রূপকে কবি অতি চমৎকারভাবে প্রয়াসহীন একান্ত ভগবৎনির্ভরের উপরই তাঁহার চরম ফলপ্রাপ্তির আশা ন্যস্ত করিয়াছেন। মনের ফুলও বনের ফুলের ন্যায় ভগবৎ-করুণার কিরণে স্বতঃবিকশিত হইবে ইহাই তাঁহার সহজ, অত্যাজ্য সংস্কার।

রূপকবিলাসের মাধ্যমে তত্ত্বনিরপেক্ষ রহস্যানুভূতির আভাস-সঞ্চার এই জাতীয় আর একটি শ্রেণীর কবিতাবলীর মধ্যে পরিস্ফুট। ইহাদের মধ্যে 'বালিকা বধূ' (১৫ই শ্রাবণ ১৩১২), 'অনাহত' (২৬শে শ্রাবণ ১৩১২), 'মুক্তিপাশ', 'অনাবশ্যক' (২৫শে শ্রাবণ ১৩১২), 'অবারিত' (১৫ই পৌষ ১৩১২), 'লীলা' (২০শে পৌষ ১৩১২), 'নিরুদ্যম' (৬ই চৈত্র ১৩১২), 'পথিক' (৮ই বৈশাখ ১৩১৩), 'সার্থক নৈরাশ্য' (১৯শে আষাঢ় ১৩১৩) ও 'সব পেয়েছির দেশ' (৯ই আষাঢ় ১৩১৩) উল্লিখিত হইবার যোগ্য। 'বালিকা বধূ', 'অনাহত' ও 'মুক্তিপাশ' চিরসিদ্ধ বর-বধূর সম্পর্কের মাধ্যমে ভক্ত ও ভগবানের পারস্পরিক সম্বন্ধের স্বরূপটি দ্যোতনা করিতে চাহে বলিয়া রূপকতত্ত্বের অন্তর্ভুক্তরূপে প্রতীয়মান হইতে পারে। কিন্তু উহাদের মধ্যে কবিস্বভাবের তত্ত্বসীমা-অতিসারী সৌন্দর্যস্পৃহা ও জীবনানুরাগ এত সুপরিস্ফুট, ও উহাদের ভাবাবেদন এতই নব-আস্বাদবাহী যে উহাদের তত্ত্ব-পরিচয় গৌণ হইয়াছে। 'বালিকা বধূ' যে ভক্ত-ভগবানের সম্বন্ধদ্যোতক তাহা কেহ স্মরণ করাইয়া না দিলে আমাদের মনে স্বতঃ-উদ্ভূত হয় না। নববধূর সলজ্জ সঙ্কোচ, তাহার শৈশবক্রীড়াবিভোরতা, তাহার পতির প্রথম প্রেমনিবেদনে রুচিবিমুখতা, পতির পূজ্যতাস্বীকারে ভীতিমিশ্র অনীহা, কেবল দুর্যোগরজনীতে দয়িতের প্রেমালিঙ্গনে আশ্বাসময় আত্মসমর্পণ এমন একটি মধুর দাম্পত্যচিত্রকে আমাদের মুগ্ধ কল্পনার নিকট স্তরে স্তরে ফুটাইয়া তোলে যে এই মানবিক রসের মাধুর্যতন্ময়তায় আমরা উহার অন্তর্নিহিত

রূপকতাৎপর্যটি সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হই ও হঠাৎ চমকের সহিত উহার বিলম্বিত উপলব্ধি আমাদের চিন্তাশক্তির নিকট যেন অনিচ্ছাসহকারে প্রতিভাত হয়। 'অনাহুত' কবিতাটিও এই একই প্রসঙ্গের অনুসরণ। বাতায়নবর্তিনী, তরুণ মনের স্বপ্নাবিষ্টা, জগৎসংসারের রূঢ় বাস্তবতা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞা নববধূ ঘোমটার ফাঁকে ও গবাক্ষের অন্তরাল হইতে জীবনের যে মায়াময় রূপটি প্রত্যক্ষ করে, দুঃখদারুণ অভিজ্ঞতার সহিত পরিচিত হইবার পর তাহা কতই না করুণ, বঞ্চনাময় ও অবাস্তব বলিয়া প্রতীতি জন্মে। এই রূপকে সংসারানভিজ্ঞতা ভগবৎস্বরূপ সম্বন্ধে উদ্‌ভ্রান্ত, অলীক ধারণার মানদণ্ডরূপে ব্যঞ্জিত হইয়াছে। এখানেও আমরা ভাব ও চিত্রকল্পের স্বয়ংসম্পূর্ণ আবেদনে মুগ্ধ হইয়া উহাতেই আমাদের সৌন্দর্যবোধের পূর্ণ পরিতৃপ্তি উপভোগ করি, তদতিরিক্ত কোন গূঢ়তর অর্থের এষণা আমাদের মনে নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে। তত্ত্বকাঠিন্য এখানে আবেগবিগলিত হইয়া উহারে মর্মকোষের সৌরভ সমস্ত অনুভূতিক্ষেত্রে ছড়াইয়া দিয়া একটা রসবিহ্বলতার সৃষ্টি করিয়াছে। 'মুক্তিপাশ'-এ প্রেমিকার সেই সনাতন প্রতীক্ষা সুপ্তিমগ্ন অচেতনতায় অবসিত হইয়াছে। কিন্তু নিদ্রাভঙ্গে চরাচরব্যাপ্ত মুক্তি-উল্লাসের অবারিত হিল্লোল ও এই বন্ধনমুক্তির ফাঁদে স্বভাব-পলাতক আত্মাকে চিরবন্দী রাখার অপূর্ব মন্ত্র-প্রয়োগ দয়িতের আবির্ভাবের নিশ্চিত নিদর্শন ও সমস্ত সংশয়ের সর্বকালীন নিরসন রূপে মনে অক্ষয় আসন পাতিয়াছে। এখানেও আনন্দের প্লাবনে তত্ত্বের চড়া কোথায় ভাসিয়া গিয়া অদৃশ্য হইয়াছে।

'অনাবশ্যক', 'অবারিত', 'লীলা', 'নিরুদ্যম' কবিতা কয়টিতে তত্ত্বের ক্ষীণ ইঙ্গিত হয়ত দুর্নিরীক্ষ্য নয়, কিন্তু ইহাদের প্রেরণা মুখ্যতঃ কবি-মেজাজেরই প্রতিফলন। প্রথম কবিতাটিতে নানা বাস্তবপ্রয়োজনাতীত উপলক্ষ্যে দীপপ্রজ্বলননিবিষ্ট একটি নারী কবির গৃহপ্রদীপ জ্বালানোর পৌনঃপুনিক আবেদনে উদাসীন রহিয়া গিয়াছে। কখনও সে জলে ভাসাইবার জন্য, কখনও বা আকাশপ্রদীপের ঊর্ধ্বচারিতার তাগিদে, কখনও বা দীপালি-মহোৎসবে নিজ ক্ষুদ্র দীপকে সাজাইয়া দিতে সে আলোকবর্তিকা নিবেদন করিয়াছে। দিব্য অধ্যাত্মপ্রেরণায় উৎসর্গিত এই প্রাণের প্রদীপ যেন অকারণ অমিতব্যয়িতার আলোকবিলাস। অথচ কবির ন্যূনতম গার্হস্থ্য প্রয়োজন মিটাইতে নারীর সম্পূর্ণ অনাগ্রহ। যে শিখা গৃহজীবনে উত্তাপ ও তৃপ্তি দিতে পারিত, গৃহকে শূন্যতার গ্রাস হইতে রক্ষা করিতে পারিত

তাহারই ভাববিলাসপূরণে অপব্যয় কবিচিত্তে একটি করুণ ক্ষোভ জাগাইয়াছে, এবং কবিতাটির তত্ত্বার্থ যাহাই হউক না কেন ইহা এই আশাভঙ্গের মৃদু অনুযোগের সুরে অনুরণিত।

'লীলা'য় তত্ত্বার্থ সুস্পষ্টতর। মেঘ যেমন সূর্যালোকের বিচ্ছুরিত-রশ্মিরঞ্জিত, ক্ষণে ক্ষণে বিচিত্র ও পরিণামে বিলয়শীল বাষ্পঘনিমা, কবিও তেমনি এক জ্যোতির্ময় সত্তার সহিত এক নিগূঢ় আত্মিক ঐক্যে বাঁধা ও তাঁহারই দিব্য লীলার অনুষঙ্গী। শ্রাবণনিশীথে বর্ষণের পর মেঘ যেমন প্রভাতরবিকরোজ্জ্বল নভোনীলিমায় নিশ্চিহ্ন হইয়া মিশাইয়া যায়, জীবাত্মাও তেমনি তাহার ক্ষুদ্রজীবনব্যাপী, নানা রঙে রঙীন বর্ণবিলাস শেষ করিয়া পরমাত্মার শুভ্র, নিরঞ্জন জ্যোতিতে নিজ স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিবে। সুতরাং তত্ত্বচেতনা কবিমনের পশ্চাৎপটে সক্রিয় থাকিলেও কবিতার ভাববিস্তার ও অবয়বসুষমা সম্পূর্ণভাবে কাব্যানুভূতিকেন্দ্রিক। ইহার ঠিক পরের 'মেঘ' কবিতাটি তত্ত্ববন্ধনযুক্ত, খেয়ালী কল্পনার অলসভ্রমণসঞ্জাত।

'অবারিত' ও 'নিরুদ্যম' এই দুইটি কবিতায় রবীন্দ্রজীবনীকার কবির সমকালীন রাজনৈতিক বন্ধন-অসহিষ্ণু চিত্তের প্রতিফলন দেখিয়াছেন। হয়ত তথ্য হিসাবে কবির পলায়নী মনোবৃত্তির কিছুটা প্রভাব ইহাদের মধ্যে উপাদানরূপে বর্তমান আছে। কিন্তু ইহা সত্য হইলেও ইহাদের কাব্যপ্রকাশে ও কবির চিরাভ্যস্ত মেজাজের নিখুঁত অনুবর্তনে ইহাদের মধ্যে সাময়িকতার সমস্ত চিহ্ন বিলুপ্ত। কবির যে সুর এখানে ফুটিয়াছে, তাহার মধ্যে তাঁহার রাজনৈতিক আদর্শচ্যুতির জন্য বিন্দুমাত্র কৈফিয়তের সঙ্কোচ নাই, আছে তাঁহার চিরন্তন কবিপ্রকৃতির স্বচ্ছন্দ লীলাময় প্রকাশ। তিনি তাঁহার উদার, সার্বভৌম আতিথেয়তার উল্লেখে তাঁহার গৃহে সব শ্রেণীর লোকের অবাধ প্রবেশাধিকারকে স্বীকৃতি দিয়াছেন। যাহারা তাঁহার দুয়ারে সর্বদা যাতায়াত করিয়া তাঁহার বিশ্রব্ধবাসের ব্যাঘাত জন্মায় তাহাদের পরিচয়ের যে সূত্রের কথা তিনি বলিয়াছেন তাহা তাঁহার বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের বা সামগ্রিক জীবন-সংস্কারের স্বতঃস্ফূর্ত আত্মীয়তাবোধ। এই পরিচয়সূত্র সহকর্মিতামূলক নয়, সকলের প্রতি উন্মুক্তপ্রাণ ভালবাসার সহজ আকর্ষণ। এই ছাড়পত্র কেবল কবির অন্তরদ্বারে প্রবেশের সনন্দ দেয়, ভূতপূর্ব রাজনৈতিক নেতার কর্মশালায় নয়। প্রভাত-আলোয় উৎফুল্ল তরুণ পথিকের দল, মধ্যাহ্নে ক্লান্ত, অবসরপ্রত্যাশী কর্মিগোষ্ঠি, রাত্রির ঝিল্লীমন্দ্রিত অন্ধকারে ও আকাশের

উদাস, নীরবতা-ভরা অঞ্চলতলে প্রচ্ছন্নপরিচয় একক কোন ভীরু অতিথি —সবাই কবির দরজায় ভিড় করে ও সকলেরই প্রতি তাঁহার অবারিত আমন্ত্রণ। এই চিত্রকল্প, ভাবানুষঙ্গ ও সূক্ষ্ম কাব্যশিল্পের মধ্যে রাজনীতির স্থূল অবলেপ যদি বা থাকে, তাহা এক অচেনা রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছে।

'নিরুদ্যম'-এ মধ্যাহ্নছায়ায় সুপ্তিমগ্ন কবিকে ফেলিয়া যখন তাঁহার সহ-যাত্রীরা তাঁহার উপর সানুকম্প অবজ্ঞা বর্ষণ করিয়া রৌদ্রতপ্ত পথে অগ্রসর হইয়া গেল, তখন সকলের মত কবির মনেও কিছুটা হীনম্মন্যতাবোধ জাগ্রত হইয়াছিল। কিন্তু বনভূমির অপূর্ব ছায়াস্নিগ্ধতা ও আলোছায়াকম্পন, আম্রমুকুলের গন্ধ ও মৌমাছিগুঞ্জনে গ্রথিত মায়াময় প্রতিবেশ যখন কবি-চেতনায় গভীরভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার জীবনকে প্রগাঢ় শান্তি ও কৃতার্থতাবোধে অভিসিঞ্চিত করিল, তখন এই অতৃপ্তি অজ্ঞাতসারে কুয়াশার মত মিলাইয়া গেল। নিদ্রাভঙ্গে কবি চমকিত হইয়া আবিষ্কার করিলেন যে চরম সিদ্ধির প্রসাদ অযাচিতভাবে তাঁহার অলস শয়নের শিরোদেশে প্রতীক্ষমাণ। ইহাতে প্রমাণ করে যে যে দুর্গম পথে কবি সকলের সঙ্গে তাঁহার যাত্রা সুরু করিয়াছিলেন তাহা অধ্যাত্ম সাধনার পথ, রাজনীতির স্থূলবস্তুপরিকীর্ণ, লালসাপঙ্কিল কণ্টকমার্গ নয়। সুতরাং রাজনীতির প্রভাব এখানেও বিশেষ প্রকট হয় নাই।

'দিনশেষে' (৮ই বৈশাখ ১৩১৩) ও 'পথিক' (৮ই বৈশাখ ১৩১৩) একই দিনে লেখা দুইটি কবিতাতে রূপকের ঈষৎ দ্যোতনা দিগন্তসীমায় তড়িৎস্ফুরণের ন্যায় মনে একটা অনির্দেশ্য ঔৎসুক্য জাগায় ও আবহকে কিঞ্চিৎ ঘোরাল করিয়া তোলে। প্রথমটিতে একটি ভাঙা অতিথিশালায় যাত্রাবিরতি ও আতিথ্যসৎকারের একান্ত আয়োজনরিক্ততা আবহাওয়ার একটি বিষণ্ণ-মন্থর পরিবর্তনের করুণ ভাবটি মুদ্রিত করে। মনে হয় যে, যে উৎসব-প্রাঙ্গণে অতীতে একদিন তীর্থযাত্রীর মেলায় জীবন্ত বিশ্বাসের বার্তাবিনিময় চলিত, তাহাই কালজীর্ণ হইয়া এখন নিরানন্দ, নিষ্প্রদীপ পথক্লেশ-অপনোদনের মাথা বাঁচাইবার চালাটুকুতে মাত্র পর্যবসিত হইয়াছে। আত্মার তৃপ্তিপ্রদ সজীব ধর্মাশ্রয় এখন জীর্ণ প্রথাসংস্কারের প্রাণহীন কোটরে আসিয়া ঠেকিয়াছে। কিন্তু এখানে গূঢ় অর্থই প্রধান না হইয়া ক্ষয়ের অবসাদ ও নৈরাশ্যই মূল স্বরের মর্যাদা লাভ করিয়াছে।

'পথিক' কবিতাটিতে ভাবকল্পনাটি প্রথানুগত—পথপাগল প্রেমিককে

গৃহের মায়াবন্ধনে বদ্ধ করার চেষ্টার আকুল ব্যর্থতা। অধ্যাত্ম জীবন ও সংসারজীবনের এই শাশ্বত বিরোধ, ধর্মসাধনাক্ষেত্রে এই বিপরীতমুখী আকর্ষণ ধর্মজগতের একটি সুপরিচিত সমস্যা। কিন্তু এখানেও তত্ত্ব অপেক্ষা উভয় জগতের প্রতিবেশরচনা ও প্রণয়ীকে ধরিয়া রাখিতে প্রেমিকার মর্মান্তিক আকূতি কবির বিশিষ্ট কল্পনার উদ্দীপক হইয়াছে। চিত্রকল্পের নব উদ্ভাবন ও প্রয়োগ, দয়িতমানসের অস্থিরতার উৎসসন্ধানের আগ্রহই পুরাতন ভাবকে নবীন কুহকশক্তিমণ্ডিত করিয়াছে। শেষে প্রেমিকের পলায়ন-উন্মুখতাকে সংযত করিবার জন্য নারী সমস্ত প্রমোদবিলাসকে স্তব্ধ করিয়া কেবল পরদিনের প্রভাত পর্যন্ত গার্হস্থ্য জীবনের নিরুদ্বেগ শান্তি ও আশ্রয়ই তাহার প্রতি নিবেদন করিয়াছে। ভালবাসার টানে না হউক, কেবল নিরাপত্তার জন্যই যেন দয়িত এই আতিথেয়তাকে উপেক্ষা না করে, ইহাই নির্মোহ প্রেমের করুণ প্রার্থনা।

'সার্থক নৈরাশ্য' কাব্যোৎকর্ষের দিক দিয়া বিশেষ কৃতিত্বের দাবী করিতে পারে না, কিন্তু 'খেয়া'-কাব্যের প্রত্যয়নিবিড়তার আনন্দময় সুর ইহার মধ্যে ধ্বনিত। আঁধার রজনীর সমস্ত নীরন্ধ্র নৈরাশ্য ও কৃপণ অনুগ্রহভিক্ষার পটভূমিকায় হঠাৎ এই নবপ্রবুদ্ধ আশার সূর্য সমস্ত জীবনদিগন্তকে প্রসন্ন ও আলোকোজ্জ্বল করিয়াছে, এবং এই অতর্কিত শুভ পরিণতির জন্য কবি গত রাত্রির কলুষান্ধকারের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছেন। তামসী নিশির অবসাদগাঢ়তার চিত্রটির মধ্যেই কবির অনুভব ও প্রকাশশক্তির লক্ষণীয় স্ফুরণ ঘটিয়াছে।

'খেয়া'-কাব্যের ভাবসাধনা চরম পরিণতির ক্রান্তিবিন্দুটি খুঁজিয়া পাইয়াছে 'সব পেয়েছির দেশ'-এর মধ্যে। 'শেষ খেয়া'য় যে পরপারের আহ্বান কবির নিকট পৌঁছিয়াছে তাহা এখনও চরম সঙ্কল্পের রূপ লয় নাই, কিন্তু ইহবিমুখতার গোধূলিছায়া যে তাঁহার কাব্যাকাশকে ব্যাপ্ত করিয়াছে তাহার পরিচয় সর্বত্র পরিস্ফুট। এই ধূসর, নির্মোহ জীবনযাত্রায় তিনি রূপকের স্তিমিত নক্ষত্রদীপ্তিতে পথ দেখিয়া চলিয়াছেন। সমগ্র জীবন-ব্যাপারটি উহার প্রত্যক্ষ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আবেদনটি হারাইয়া, উহার বস্তুগত স্পষ্টতা ও ভাবগত আবেগোচ্ছলতা সংবৃত করিয়া একপ্রকার তির্যক ইঙ্গিত-ময়তায়, রূপকাবগুণ্ঠিত হইয়া তাঁহার নিকট প্রতিভাত হইয়াছে। এই সর্ব-দিগন্তব্যাপী কুহেলিকাজালকে ভেদ করিয়া কিন্তু মাঝে মধ্যে অধ্যাত্ম-

অনুভবের আনন্দনিবিড় প্রত্যয়ের দিব্য উদ্ভাস তাঁহার মানস জগতে এক ত্যাগবৈরাগ্য ও পরমপ্রাপ্তির সহাবস্থানরচিত একটি মিশ্র, আলোআঁধারি আবহাওয়া বিকীর্ণ করিয়াছে। সমস্ত বিচিত্র জগৎ তাঁহার অনুভূতির ফাঁক দিয়া অধরা বাষ্পের ন্যায় গলিয়া গলিয়া পড়িতেছে, কিন্তু এই শিথিল মুষ্টির মধ্যে একটি দিব্যরত্ন-অধিকারের নিশ্চিত আশ্বাস তাঁহার চেতনা-নৈরাজ্যের মধ্যে একটি রাজকীয় স্বত্ববোধের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

বৈরাগ্যের, জীবনবিমুখতার পটভূমিকায় এই সুনিবিড় চরিতার্থতাবোধ, সন্ধ্যার অবসাদে এই নবপ্রভাতের প্রাণচেতনা, ত্যাগের পত্রপুটে ভোগমধুর আস্বাদন একটি ইতিবাচক, ভাবাত্মক বাতাবরণরূপে 'সব পেয়েছি'র মধ্যে ঘনীভূত রূপে প্রকট হইয়াছে। ইহা নিছক রূপকথার কল্পনাবিলাস নয়, রূপক-শুক্তির অন্তঃসঞ্চিত প্রত্যয়মুক্তাবিন্দু, খেয়া-কাব্যের ভাবাভিসারের ঈপ্সিততম যাত্রাশেষ। নদীর ঘাটে খেয়ানৌকার দো-মনা প্রতীক্ষায় যাহার আরম্ভ, 'সব পেয়েছির দেশ'-এর আকাঙ্ক্ষারহিত, পরিপূর্ণ তৃপ্তি ও প্রসন্নতায় তাহার পরিসমাপ্তি। কবি ঘুরিয়া ফিরিয়া রূপকথার রাজ্যেই তাঁহার আশ্রয় পাইয়াছেন, কিন্তু এই রূপকথাজগৎ শিশুমনের সৃষ্টি নয়, প্রৌঢ় সাধনার পরিণত ফল, পরপারযাত্রার পূর্ণ ঐহিক প্রস্তুতি। বোধ হয় যীশু খৃষ্টের সেই অমর বাণী—'স্বর্গরাজ্য শিশুদের' রবীন্দ্রনাথের এই কবিতায় বাস্তব প্রয়োগ লাভ করিয়াছে—শিশুমনের আদর্শ মায়াজগৎই অধ্যাত্ম সাধনায় চরম ফলের প্রতীক্ ও প্রতিচ্ছবি। বৈতরণী-সৈকতভূমি হইতে স্বপ্নসুষমার সাধনালব্ধ প্রসন্ন স্বীকৃতির মধ্যে এক পদক্ষেপের ব্যবধান মাত্র। 'সব পাওয়ার দেশ' সব-ছাড়ার বৈরাগ্যের প্রতিষেধক ও পরিপূরক—আসক্তির দিকের নদীতীর ভাঙ্গিয়া যেন প্রসন্নতার দিকের বিপরীত তটভূমির প্রসার।

৭

ঘ. ভগবৎমিলনের উপলব্ধি ও ভগবৎ-তত্ত্ব

এই পর্যায়ে 'মিলন' (২৩শে মাঘ ১৩১২), 'বিচ্ছেদ' (২৪শে মাঘ ১৩১২), 'সীমা' (২৫শে মাঘ ১৩১২), 'ভার' (২৫শে মাঘ ১৩১২) ও 'প্রার্থনা' (২০শে আষাঢ় ১৩১৩) অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে।

'মিলন' ও 'বিচ্ছেদ' নিসর্গকবিতার অন্তঃপাতী 'প্রভাতে' ও 'টিকা'-র প্রায় সমধর্মী। প্রথমটিতে ভগবৎমিলনের নিবিড় আনন্দ ও দ্বিতীয়টিতে

বিশ্বসঙ্গীতের সহজ সুরের সহিত সুর মিলাইতে অক্ষমতাজনিত ক্ষোভ প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রকাশ প্রত্যক্ষ ও রূপকের মধ্যবর্তিতাহীন, প্রকৃতিকবিতায় ঐশী-অনুভূতি প্রকৃতিসৌন্দর্যের পরোক্ষ প্রতিফলনরূপে আভাসিত। এখানে অধ্যাত্ম আকৃতি মুখ্য, যদিও ইহা নিসর্গসৌন্দর্যের উপাদানপুষ্ট। মিলনের যে আনন্দ তাহা ভগবৎস্বরূপের সহিত একাত্মতা-বোধপ্রসূত, উহা ঐশী সত্তার অব্যবহিত স্পর্শসঞ্জাত। হৃদয়রাজার উল্লেখ ও তাঁহার সহিত নীরব ভাববিনিময় এখানে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত। আলোক-বাতাস-প্রভাতকিরণ সবই ভাগবতী চেতনার অঙ্গরূপে কবি-হৃদয়ে অনুপ্রবিষ্ট। 'প্রভাত-সংগীত'-এর বিশ্বমিলনানন্দ ভগবানকে বাদ দিয়া অনুভূত; উহারই পরিণত, চেতনাঘনরূপ ভগবানের অঙ্গকান্তিবিচ্ছুরণরূপে এখানে কবিমানসে গূঢ়তর ব্যঞ্জনায় প্রগাঢ় শান্তির উদ্দীপক। তরুণ, সদ্যো-বাধামুক্ত মনের প্রথম বিশ্বপরিচয়ে যে হর্ষোদ্বেলতা উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছিল তাহা বিশ্বেশ্বরের মধ্যবর্তিতায় প্রজ্ঞাঘন ও নিখিল ছন্দের অঙ্গীভূত রূপে নব তাৎপর্যে উদ্ভাসিত। এই আনন্দ রূপকের আধারে পরিবেশিত নয়, স্বয়ং-সম্পূর্ণ লীলাময়তায় ছন্দায়িত।

'বিচ্ছেদ' কবিতাটি আরও সূক্ষ্ম অনুভূতিবৃন্তে বিধৃত। বোধ হয় কবি তাঁহার রূপকবিলাসপ্রবণতাকে কৃত্রিম আতিশয্যজ্ঞানে উহাকে বিশ্বছন্দের সহজ সুরের ব্যতিক্রম মনে করিয়াছেন। মানুষের কবিতা আভাস-ইঙ্গিতের তির্যক পথে ভগবৎস্পর্শাতুর—প্রত্যক্ষ উপলব্ধির সুরে তাঁহার স্বরূপ-অনুধাবনে অক্ষম। কবি এই কবিতায় সৃষ্টির সহজ সুরের যে নিদর্শনগুলি দিয়াছেন তাহা সহজ সৌকুমার্যে ঋজুগতি ও অব্যর্থলক্ষ্য।

"যেমন সহজ ভোরের জাগা,
স্রোতের আনাগোনা,
যেমন সহজ পাতায় শিশির,
মেঘের মুখে সোনা,
যেমন সহজ জ্যোৎস্নাখানি
নদীর বালু-পাড়ে,
গভীর রাতে বৃষ্টিধারা
আষাঢ়-অন্ধকারে।

মানবহৃদয়ে ভগবৎ-প্রত্যয় তেমনি সহজসংস্কারগত, জটিল মননক্রিয়া-

নিরপেক্ষ ও কৃত্রিমঅলঙ্করণবর্জিত হইবে। বিশ্বের প্রাণবায়ুর সঙ্গে উহার অনায়াস মিলন থাকিবে। কিন্তু নূতনত্বের মোহ, প্রয়াসক্লিষ্ট উপস্থাপনারীতি, গূঢ়ভাষণের চাতুরীপ্রবণতা সহজ পথচলার পরিপন্থী হইয়া দাঁড়ায়। মানুষ স্বরচিত টীকাভাষ্যে ঐশী অনুভবের স্বতঃস্ফূর্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

'সীমা' ও 'ভার' কবিতাদ্বয় সোজাসুজিভাবে ভগবৎতত্ত্বাশ্রয়ী। সরল উক্তিপরম্পরার মাধ্যমে ভগবান ও মানুষের সম্পর্কতত্ত্বটি এখানে স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে। ভগবৎ-নির্দেশিত সীমার মধ্যেই মানুষের যথার্থ অধিকার ও এই সীমালঙ্ঘনেই তাহাব ভারসাম্যচ্যুতি। আর ভগবানের ভার বহা ও স্বকৃত বৃথা কাজের বোঝার চাপ সহ্য করা নীতি ও বিশ্ববিধানের দিক্ দিয়া সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। এই কবিতা দুইটিতে কত সহজ কথায় ও স্বল্পায়াসে কবি গূঢ় ধর্মতত্ত্ব ব্যক্ত করিয়াছেন ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয়।

'প্রার্থনা'-য় মনুষ্যত্বে অবিচল থাকার সঙ্কল্পে, কোন নৈতিক কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা নয়, সহজ বিশ্বাসে নিখিলপ্রাণযাত্রার সহিত সামঞ্জস্যের সহায়তায়ই কবি সিদ্ধিলাভ করিবেন। অনায়াস গ্রহণশীলতাই আত্মমর্যাদালাভের প্রধান উপায়। নিখিলের সহিত আত্মীয়তাগৌরবেই কবি মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে পারিবেন। চারিত্র-নীতি এখানে ধর্মানুভবের স্বতঃস্ফূর্ত ফলরূপে প্রদর্শিত।

আর কয়েকটি কবিতা—যথা 'কোকিল' (২৯শে বৈশাখ ১৩১৩), 'হারাধন' (১০ই আষাঢ় ১৩১৩)—কোন শ্রেণীভুক্ত না হইয়া স্বতন্ত্র প্রেরণার অভিব্যক্তি। প্রথমটির মধ্যে যেন 'কল্পনা'-কাব্যের অতীতপ্রীতির পুনরাবৃত্তি, রূপান্তরিত জীবনছন্দে একমাত্র স্থির সৌন্দর্যসূত্রের প্রতীক্ কোকিলের ডাকের প্রতি মোহাকর্ষণের প্রকাশ। 'হারাধন'-এ অকাল-মৃত্যুর জন্য মানবিক অনুশোচনা ও দিব্যলোকবাসীর মৃত্যু-অস্বীকৃতির বৈপরীত্য মানুষ ও দেবতার দৃষ্টি-পার্থক্য ফুটাইয়া তুলিয়াছে। এই কবিতাদ্বয়ের সঙ্গে 'খেয়া'র মূলভাবের বিশেষ কোন সংযোগ আছে বলিয়া মনে হয় না।

'নৈবেদ্য'-হইতে 'খেয়া' রবীন্দ্রকাব্যপর্বের এক অধ্যায়ের ভাববৃত্ত সম্পূর্ণ করিয়াছে। এই পর্বে রবীন্দ্রকবিমানস নানা বিচিত্র পরিবর্তনের স্তর অতিক্রম করিয়া এক অধ্যাত্মরসঘন আত্মনিবেদনের গীতিসাধনার পথে প্রবেশোন্মুখ হইয়াছে। এই যাত্রায় কবির পরিণত যৌবনের আবেগোচ্ছ্বাস

ও রূপমুগ্ধতা স্তিমিত, তাঁহার কল্পনালীলা সংযমিত, রূপ হইতে তত্ত্বের দিকে তাঁহার অগ্রগতি সুস্পষ্ট, ভাবানুভবে ও প্রকাশশিল্পে সহজ-সাধনা তাঁহার করায়ত্ত ও সমস্ত পার্শ্ব-আকর্ষণমুক্ত ঐশস্বরূপের প্রতি তাঁহার লক্ষ্য কেন্দ্রীভূত। 'নৈবেদ্য'-এ তিনি ভগবানের মহিমা-স্তোত্র রচনা করিয়াছেন, তাঁহার লীলা অপেক্ষা শক্তির প্রতিই বেশী আকৃষ্ট হইয়াছেন। 'স্মরণ'-এ তিনি পত্নীশোকের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তাঁহার অধ্যাত্ম প্রত্যয়ের দৃঢ়তার পরিচয় দিয়াছেন। 'শিশু' কবিতায় তিনি এই শোকাবর্তের দূরোৎক্ষেপী প্রতিক্রিয়ায় শিশুর মনোগহনে প্রবেশ করিয়া উহার বিচিত্র রহস্য অনুভব করিয়াছেন, জীবন-শেষের করুণ ম্লানিমা হইতে জীবনোন্মেষের নবারুণরাগের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়াছেন, তাঁহার ভাবজগতের কেন্দ্র শ্মশান হইতে ছেলেমেয়েদের খেলাঘরে লইয়া গিয়াছেন। 'উৎসর্গ'-এ তাঁহার অতীত কবিতার সূত্র-অন্বেষণপ্রসঙ্গে তিনি তাঁহার নূতন জীবনবোধ ও ভাবদৃষ্টির নিগূঢ় ইঙ্গিতের মাধ্যমে নিজ অগ্রগতির মর্মোদ্ঘাটন করিয়াছেন। সর্বশেষে 'খেয়া'য় কবি তাঁহার ইহকালবিমুখতা ও পরকালের জন্য আকূতি ব্যক্ত করিয়াছেন সর্বব্যাপ্ত রূপকানুভূতির মাধ্যমে। এই রূপক এই কাব্যের উপর একদিকে গোধূলিমায়া বিস্তার করিয়াছে, অন্যদিকে অস্তসূর্যের রক্তরশ্মিবিচ্ছুরণে দিব্য-লোকের একটি সার্থক ইশারা দিয়াছে। এই সন্ধ্যার সন্ধিক্ষণে পৌঁছিয়া কবি তাঁহার পরবর্তী স্তরের ভক্তিপ্রধান ভগবৎসাধনার জন্য আপনাকে মনের দিক দিয়া ও কাব্যকলার দিক দিয়া সর্বপ্রকারে প্রস্তুত করিয়াছেন। এইখানেই এই কাব্যধারা-অনুসরণের সাময়িক বিরতিরেখা টানা গেল।

নবম অধ্যায়

রবীন্দ্রনাটকের দ্বিতীয় পর্ব (১৩১৫-৩১, ১৯০৮-২৪) তত্ত্বনাটকের সাধারণ লক্ষণ—শারদোৎসব, ঋণশোধ

১

এই পর্বে রবীন্দ্রনাটক বাস্তবসংঘাতময় মানবরাজ্য ছাড়িয়া এক অধ্যাত্ম-ব্যঞ্জনাময় তত্ত্বলোকে প্রবেশ করিয়াছে ও এই তত্ত্বচেতনাসম্ভব সূক্ষ্ম ভাবানুভূতিকে রূপক-সাঙ্কেতিকতার সহায়তায় নাটকীয় প্রত্যক্ষতাদানে সচেষ্ট হইয়াছে। এই অতীন্দ্রিয় রহস্য সম্পূর্ণ প্রকাশ করা যায় না, আভাসে ইঙ্গিতে, বহির্ঘটনা ও চরিত্রচিত্রণের অন্তর্নিহিত ভাবদ্যোতনায় উহাকে অনুভূতিগম্য করিতে হয়। বস্তুপ্রাধান্যকে যথাসম্ভব ক্ষুণ্ণ করিয়া দেহান্তরালস্থিত আত্মার জ্যোতিকে সুষ্ঠু সঙ্কেতের দ্বারা বহিরাবরণের বাধামুক্ত করিয়া ইহাকে অন্তর্লোকের ভাবসত্যরূপে উপলব্ধির নিবিড়তায় ঘনাইয়া তুলিতে হয়। রবীন্দ্র-কাব্য দীর্ঘকাল ধরিয়া যে সীমা ও অসীমের মিলনসাধনে নিবিষ্ট ছিল, মানবপ্রেম ও সৌন্দর্যমুগ্ধতার আড়ালে আবৃত অতীন্দ্রিয় ব্যঞ্জনাকে পরিস্ফুট করিবার যে দুরূহ তপশ্চর্যায় ব্রতী ছিল, রূপের আধারে অরূপকে প্রত্যক্ষ করিবার যে দৃষ্টিস্বচ্ছতা অনুশীলন করিতেছিল, সেই পূর্বপ্রস্তুতিই তাঁহার এই নাট্য-রূপান্তরের প্রেরণার মূলে। তিনি কবিরূপে যে নিগূঢ় অনুভূতি আস্বাদন করিয়াছেন তাহাকেই নাটকীয় আধারে পরিবেশন করিতে তাঁহার এই যুগে ঔৎসুক্য জাগে। কাব্যসত্য নাট্যরূপে আরও উজ্জ্বল ও সর্বজনগ্রাহ্য হইয়া উঠিবে ইহাই ছিল তাঁহার গূঢ় প্রত্যাশা। সংলাপ ও সংঘাতময় ব্যক্তি-আচরণের মধ্যে তত্ত্ব ভাবের আলো-আঁধারি অস্পষ্টতা হইতে প্রত্যক্ষ জীবনলোকের দেহ ধারণ করিবে, অথচ ভাবজগতের কিছুটা কুহেলি-অন্তরাল এই জীবন-প্রত্যক্ষতার চারিদিকে একটি বেষ্টনী রচনা করিবে এই অভিপ্রায়ই তাঁহাকে নাট্যরচনায় প্রণোদিত করিয়াছিল।

অবশ্য এই জাতীয় নাটকের ঘটনাবিন্যাস ও চরিত্রসৃষ্টির কলাকৌশল সাধারণ নাটক হইতে অনেকটা স্বতন্ত্র প্রকৃতির হইবে। অতীন্দ্রিয় রহস্যদ্যোতনাই যাহার উদ্দেশ্য তাহার ঘটনা-আবরণ ও চরিত্রের মধ্যে জীবনারোপ বস্তুভারমুক্ত ও স্বচ্ছ হওয়া প্রয়োজন। কেননা ইহাদের কাজ

হইবে অন্তরালস্থিত সূক্ষ্ম অধ্যাত্ম সত্যের ইঙ্গিতদান। বস্তু যদি প্রবল হইয়া বা পাত্র-পাত্রী যদি অতিরিক্ত প্রাণোচ্ছল হইয়া উঠিয়া নাটকের সাঙ্কেতিক তাৎপর্য হইতে আমাদের চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করে, তাহারা যদি ভাবকেন্দ্রিক না হইয়া স্বয়ং সম্পূর্ণ হইতে চাহে তবে নাটকের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে। সুতরাং বস্তুসংস্থানের নিবিড়তা বা চরিত্রের স্বাধীন জীবনস্পন্দনের তীব্রতা এই নিগূঢ় অন্তঃপ্রেরণা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতে হইবে। মূলতঃ ইহাদের কাজ হইবে ঘটনা, চরিত্র ও নাট্যসংঘাতের অন্তরঙ্গ সহযোগিতায় একটি কুহকময় ভাবপরিবেশ-রচনা। এই ভাবপরিমণ্ডলের অদৃশ্য হাতে নাট্যনিয়ন্ত্রণসূত্রটি বিধৃত থাকিবে ও উহারই মাধ্যমে উহার চূড়ান্ত রসনিষ্পত্তি স্বাদবৈচিত্র্য লাভ করিবে। যেমন আবহাওয়ার মুহুর্মুহু পরিবর্তনশীলতার উপর, উহার আলো-আঁধারের সূক্ষ্ম মাত্রাভেদের উপর, উহার স্বচ্ছতা-অস্বচ্ছতা, উহার হাওয়া-গুমটের উপর, একটি কালবিভাগের সমস্ত জীবনযাত্রার মানসরূপটি নির্ভর করে, তেমনি রূপক-সাঙ্কেতিক নাটকে বাতাবরণের সামগ্রিক প্রভাবই আমাদের চেতনার সংবেদনশীলতার ছন্দকে বাঁধিয়া দেয়। এই জটিল ভাববিকিরণই একটি অখণ্ড সত্তায় সংহত হইয়া নাটকের কেন্দ্রাধিষ্ঠিত হয় ও উহাদের সমস্ত উপাদান-সমাহারের মধ্য দিয়া আমাদের রসচেতনায় সূক্ষ্মভাবে সংক্রামিত হয়। যেমন পাশ্চাত্ত্য কোন কোন দেশে whispering gallery-র কথা শোনা যায়, তেমনি তাহারই অনুরূপ প্রত্যেকটি রূপক-সাঙ্কেতিক নাটক এক একটি প্রতিধ্বনিময় আবহ বিস্তার করে। ইহাতে ছোট কথা বড় হইয়া উঠে, জড় ও স্থূল বস্তু সূক্ষ্ম অধ্যাত্মরূপে উদ্ভাসিত হয়, ইন্দ্রিয়ের বাণী অতীন্দ্রিয় রহস্যবার্তার ইঙ্গিত বহন করে ও প্রত্যক্ষ অর্থের রন্ধ্রপথ দিয়া এক দিব্য ব্যঞ্জনা আমাদের উৎসুক ও উন্মনা করিয়া তোলে। অবশ্য এই অশরীরী সত্তার উদ্বোধন সব নাটকে একই প্রকার নিবিড়তা লাভ করে না। কোথাও কোথাও লেখকের সচেতন রূপক-অভিপ্রায় সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়া আমাদের বোধশক্তিকে ভাব হইতে ভাবান্তরে সংক্রমণের সূত্রটি সহজেই ধরাইয়া দেয়। কোথাও কোথাও এই সূত্রটির সন্ধান না পাইয়া আমরা অনুমানের গোলোকধাঁধায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিহ্বল হইয়া পড়ি ও দীর্ঘ জল্পনা-কল্পনার পর হঠাৎ এই নিগূঢ় সত্যটির নিঃসংশয় উপলব্ধির বিদ্যুৎ-চমকের মত আমাদের স্বতঃ-অনুভবকে উদ্দীপ্ত করিয়া তোলে। কোথাও বা আধুনিক অর্থনীতি ও রাজনীতির সমস্যা নাট্যকারের রূপক-কল্পনাকে

উত্তেজিত করিয়া সমস্যাটির বাস্তব সংঘর্ষের অন্তরালে এক গূঢ়তর আত্মিক তাৎপর্যের দিক্‌টি উদ্‌ঘাটিত করে। রবীন্দ্রনাথের নাটকের মধ্যে এই সবগুলি প্রবণতাই উদাহৃত হইয়াছে।

রূপক-সাঙ্কেতিক নাট্যপ্রথা রবীন্দ্রনাথের পূর্বে অনেক পাশ্চাত্ত্য নাট্যকারের দ্বারা অনুসৃত হইয়াছে এবং হয়ত এই জাতীয় নাটক-রচনার প্রেরণায় রবীন্দ্রনাথ ইঁহাদের দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রভাবিত হইয়া থাকিবেন। মেটারলিংক, হাউপট্‌ম্যান, আন্দ্রিভ ও কবির সমসাময়িকদের মধ্যে ইয়েট্‌স ও সিঞ্জ এই দিক দিয়া রবীন্দ্রনাথের অগ্রবর্তী ও হয়ত পথ-প্রদর্শক। কিন্তু অধ্যাত্ম সত্যকে নাটকীয় রূপদানে রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণভাবে নিজ মৌলিক তত্ত্বানুভূতির উপর নির্ভরশীল ও তাঁহার অবলম্বিত প্রণালীও নিজ উপলব্ধি-নির্ভররূপে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অতীন্দ্রিয় রহস্য ইউরোপীয় নাট্যকারদের নিকট যেরূপে প্রতিভাত হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বচেতনা ও শিল্পায়নকৌশল তাহা হইতে সম্পূর্ণ নূতন পথের নির্দেশ অনুসরণ করিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে মৃত্যুরহস্য মেটারলিংকের The Intruder or Interior ও Yeats-এর Wise Man নাটকে যে দৃষ্টিভঙ্গীতে উপলব্ধ হইয়াছে রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর'-এ তাহার কোন প্রতিফলন নাই। মেটারলিংকের নাটকে এক ভীতিবিহ্বল প্রতীক্ষা ও রহস্যময় জীবনাবসানের আবহাওয়া সৃষ্ট হইয়াছে ও আত্মহত্যা দ্বারা মৃত্যুর জীবনযন্ত্রণা-এড়ানো, সান্ত্বনাময় রূপটি উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। তাঁহার অন্যান্য নাটকে মরণের সহিত প্রেমের জটিলসম্পর্ককল্পনা দ্বারা প্রেমকেই প্রাধান্য ও মৃত্যুকে গৌণ শক্তির স্থান দেওয়া হইয়াছে। ইয়েট্‌সের Wise Man-এ মৃত্যুর জন্য চিত্তপ্রস্তুতি ও নরকযন্ত্রণানিবারণের উপায়রূপে অলৌকিকত্বে আস্থাশীল ব্যক্তির সহিত মুমূর্ষুর সাক্ষাৎকার নির্দেশিত হওয়ার ফলে ঈশ্বরবিশ্বাসের জয়ঘোষণাই ইহার ফলশ্রুতি। কিন্তু ইহাতে মৃত্যুর রহস্যঘন রূপের কোন ছায়াপাত অপেক্ষা শাস্ত্রতত্ত্বব্যাখ্যাই অধিকতর পরিস্ফুট। ইহাদের সহিত তুলনায় রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' নাটকে মৃত্যু শিশুমনের চিরজাগ্রত কৌতূহল, উহার অজানা জগৎকে জানিবার অতৃপ্ত পিপাসার সহিত সংশ্লিষ্টরূপে, কিশোরচিত্তের নূতনত্বমোহের স্বাভাবিক পরিণতিরূপে উপস্থাপিত। উহার বোধাতীত অনুভূতির মধ্যে স্নিগ্ধতা আছে। প্রগাঢ় শান্তি আছে, কোন ভীতি-চমকের বিমূঢ়তা নাই। অধ্যাত্ম সত্যের অনুভবেও যেমন, উহার ভাবাসঙ্গরচনায়,

উদ্বোধনদক্ষতায় ও ফলশ্রুতিনিরূপণেও তেমনি রবীন্দ্রপ্রতিভার অনন্যতা সুপ্রতিষ্ঠ।

২

অবশ্য সংকেতরীতিনিষ্ঠ সমস্ত নাটকই যে অধ্যাত্মভাবানুপ্রাণিত তাহা না হইতেও পারে। অন্য কোনও প্রকার গূঢ় জীবনসত্য ব্যঞ্জিত করিবার জন্য এই রীতির প্রয়োগ হইয়া থাকে। জীবনে যে প্রভাব অলক্ষিত, সুদূর-অতীতাশ্রয়ী, অবচেতনসঞ্চারী তাহা সময় সময় বিশেষ ভাবঘন মুহূর্তে, অন্তর্দ্বন্দ্বের তীব্রতম সঙ্কটসন্ধিতে, নাটকীয় চরিত্রের প্রত্যক্ষ আচরণে সক্রিয় হইয়া উঠে। তখন অকস্মাৎ অন্তরের গহন স্তর হইতে এক অদৃশ্য সত্তা জাগিয়া উঠিয়া চরিত্রের যে সচেতন ব্যক্তিসত্তা তাহার সহিত একটি দ্বৈত সংগ্রাম বাধাইয়া দেয়। পূর্বপুরুষের রক্তধারাবাহিত প্রভাব, অবদমিত সংস্কার, অনায়ত্ত কোন আকাঙ্ক্ষা বিস্মৃতির আবরণ ভেদ করিয়া চেতনার উপরিতলে স্ফুরিত হয় ও নাটকীয় পাত্রপাত্রীর জীবন সঙ্কল্পের মধ্যে সংশয় ও বিরোধের বীজ বপন করে। ইহারই ফলে কোন কোন কল্পনাপ্রবণ নাট্যচরিত্রে নানারূপ স্বপ্নবিভ্রান্তি দেখা দেয়, কোন প্রতীক্-চিহ্ন তাহার স্বগতভাবনার মধ্যে পুনঃপুনঃ আবর্তিত হয়। হয়ত অতিপ্রাকৃত প্রেতমূর্তিও প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে। শেকস্‌পিয়ার যদি তাঁহার হ্যামলেট ও ম্যাকবেথের সমাধিস্থ পূর্বজীবন খনন করিয়া দেখিতেন তবে হয়ত তিনি তাহাদের অদ্ভুত আচরণের একটা সুসঙ্গত, জীবনানুগামী ব্যাখ্যা পাঠককে উপহার দিতে পারিতেন ও তাহাদের অনুমানবিলাসের স্বেচ্ছাবিহারকে কতকটা সংযত করিতে পারিতেন। কিন্তু শেকস্‌পিয়ারের যুগে অবচেতনতত্ত্ব সাহিত্যস্বীকৃতি-বঞ্চিত ছিল, সুতরাং তাঁহার প্রতিভা এই পিছন-ফিরিয়া-দেখা স্মৃতি-উদ্‌ঘাটনের সহায়তা ছাড়াই তাঁহার চরিত্রাবলীর পুনর্গঠন করিয়াছেন। তাঁহার নাটকে যে সংকেতগুলি সুকৌশলে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণভাবে প্রত্যক্ষ জীবনের আলোক-উৎস হইতে বিকীর্ণ। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য নাট্যকারদের মধ্যে ইব্‌সেনের অনেকগুলি নাটকে এই সংকেতরীতির চমৎকার প্রয়োগ দেখা যায়। শেক্‌স্‌পিয়ার হ্যামলেটের মুখ দিয়া মানব-জীবনের দুজ্ঞেয়তা সম্বন্ধে যে সাধারণ উক্তি করিয়াছেন তাহা কিন্তু

সাঙ্কেতিক সন্ধানের আকস্মিক বিদ্যুৎ-চমকে দীপ্ত হইয়া উঠে নাই, সাধারণ নাট্যরীতির শিল্পপ্রজ্বলিত স্থির দীপালোকেই যতদূর সম্ভব আভাসিত হইয়াছে। অতি-সাম্প্রতিক যুগে কোন কোন নাট্যকারগোষ্ঠী এই সঙ্কেত-ধর্মিতার অতিরিক্ত প্রয়োগ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে জীবন শুধু জিজ্ঞাসাচিহ্ন-পরম্পরার হেঁয়ালি মাত্র, ইহার কোথাও কোন সমাধানের পূর্ণচ্ছেদ বা অর্থসঙ্গতির বিরাম-যতি নাই। রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় কোন কোন নাটকে, যেমন 'মুক্তধারা'-য়, যন্ত্ররাজবিভূতি-নির্মিত সূর্যাস্তকে-আড়াল-করা, আকাশে-মাথা-তোলা, অশুভশক্তিমত্ত যন্ত্রের বারবার উল্লেখে ও সুমনের মার মর্মভেদী রোদনগুঞ্জন ও ভৈরবপূজকদের স্তবমন্ত্র-উচ্চারণের পৌনঃপুনিক অবতারণায় এবং 'রক্তকরবী'-তে নাটকের নামকরণে ও রঞ্জন ও নন্দিনীর নাট্যরূপকল্পনায় ও নাট্যক্রিয়ায় এই গূঢ় প্রতীকী প্রয়োগের সার্থক নিদর্শন পাওয়া যায়।

এইবার রবীন্দ্রনাথের রূপক-সংকেতমিশ্র নাটকগুলির কালানুক্রমিক তালিকা-সংকলনও আলোচনা করা যাইতে পারে।

(ক)

(১) শারদোৎসব (১৩১৫) ও উহার পরবর্তী রূপান্তর ঋণশোধ

(২) রাজা (পৌষ ১৩১৭) ও উহার পরবর্তী রূপান্তর অরূপরতন (মাঘ, ১৩২৬)

(৩) অচলায়তন (১৫ই আষাঢ় ১৩১৮) ও উহার পরবর্তী রূপান্তর গুরু (১লা ফাল্গুন ১৩২৪)

(৪) ডাকঘর (১৩১৮)

(৫) ফাল্গুনী (১৫ই ফাল্গুন ১৩২২)

(৬) মুক্তধারা (১৩২৯)

(৭) রক্তকরবী (১৩৩১)

(৮) কালের যাত্রা (৩১শে ভাদ্র ১৩৩৯)—রথের রশি, কবির দীক্ষা, রথযাত্রা

(৯) তাসের দেশ ১৩৪০, পরিবর্তিত ১৩৪৫

(খ)

(১০) প্রায়শ্চিত্ত (রোমান্টিক উপন্যাসের নাট্যরূপ) (৩১শে বৈশাখ ১৩১৬) ও উহার পরবর্তী রূপান্তর পরিত্রাণ

(১১) মুকুট (বাল্যরচনা উপন্যাস হইতে নাট্যীকৃত)

৩

এই পর্যায়ের প্রথম নাটক 'শারদোৎসব' (৭ই ভাদ্র ১৩১৫) ও উহার পরবর্তী রূপান্তর 'ঋণশোধ' (তারিখ ?) একসঙ্গেই আলোচিত হইবে। লক্ষ্য করিতে হইবে যে প্রথম তিনটি সঙ্কেত-নাটক 'শারদোৎসব', 'রাজা' ও 'অচলায়তন' প্রত্যেকটি সম্বন্ধেই লেখক এই রূপান্তর-প্রেরণা অনুভব করিয়াছেন। তাঁহার এই পরিবর্তনের যে অভিপ্রায় তিনি ঘোষণা করিয়াছেন তাহা হইল উহাদের গাঢ়তর নাট্যসংহতিবিধান। রবীন্দ্রনাথ এই জাতীয় অতীন্দ্রিয়-অনুভূতিমূলক, অমূর্তভাবকেন্দ্রিক, অন্তর্লোকের অনির্দেশ্য প্রেরণা-ভিত্তিক রচনাগুলির নাট্যরূপ সম্বন্ধে কখনই নিঃসংশয় হইতে পারেন নাই। ইহাদের রূপদান বিষয়ে কবির ভাবুক ও শিল্পীসত্তার মধ্যে একটা অমীমাংসিত দ্বন্দ্ব তাঁহাকে সর্বদা দোলায়মান রাখিয়াছে। বহির্দ্বন্দ্বপ্রধান ও চরিত্রাশ্রয়ী নাটকগুলি সম্বন্ধে তিনি যে সংশয়পীড়া ও দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের অভাবের পরিচয় দিয়াছেন, অন্তরানুভূতিবিষয়ক ও তত্ত্বদ্যোতক নাটকগুলির মধ্যে তাহা যেন আরও ঘনীভূত হইয়াছে। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, রূপান্তরিত নাটকগুলি যে নাট্যগুণে উৎকৃষ্টতর হইয়াছে সে প্রতীতিও পাঠকের জন্মে না। হয়ত নাটকীয়তার পুষ্টিসাধন অপেক্ষা তত্ত্ব-উদ্দেশ্যের সুস্পষ্টতর নির্দেশ লেখকের মনে মুখ্য প্রেরণারূপে কার্যকরী হইয়াছে। লেখকের দ্বিতীয় চিন্তা যে প্রথম চিন্তার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর অনুপ্রেরণা যোগাইয়াছে তাহাও জোর করিয়া বলা যায় না। বরং অনেক সময় প্রথম ভাবকল্পনার আবেশগাঢ়তা ও স্বতঃস্ফূর্তি পুনর্বিচারের দ্বারা, ম্লানতর হইয়াছে মনে হয়—অনুভূতির জন্ম-ক্ষণের সরসতা সচেতন উদ্দেশ্যপরতন্ত্রতার ফলে কিছুটা শুষ্ক-শীর্ণ হইয়াছে। মনের ফুল শিল্পচিত্রিত রূপান্তরে হয়ত নূতন বর্ণ ও গঠন-সুষমা অর্জন করিয়াছে, কিন্তু সুবাসের অপচয়ে লাভ অপেক্ষা ক্ষতির পরিমাণই বেশী দাঁড়াইয়াছে। তত্ত্বচেতনার সূক্ষ্ম সারনির্যাসকে ইন্দ্রিয়গোচর, আবেগ-সঞ্চারী,

সংঘাতনিবিড় রূপ দিতে গেলে যে বিশেষ নাট্যসংস্কার ও নাট্যকলা-প্রয়োগের সহায়তা অপরিহার্য তাহা ঠিক রীতিসিদ্ধ নাট্যাদর্শের অনুবর্তনে অপ্রাপণীয়। মনের প্রকাশভীরু, পলাতক, সুকুমার উন্মেষগুলিকে নাট্য-চরিত্রের বর্ণাঢ্য ও সংঘাতচঞ্চল ছদ্মবেশ পরাইতে হইলে, প্রস্‌পারোর মত ঐন্দ্রজালিকের যাদুমন্ত্র যেমন এরিয়েলের বায়ব্য সত্তাকে নিজ ইচ্ছাধীন ও উদ্দেশ্যানুকূল রূপ দিয়াছিল তদনুরূপ দিব্যশক্তির অধিকারী হইতে হইবে। মনে হয় যে রবীন্দ্রনাথ অনেক সময় সচেতন শিল্পকলানির্ভরতার জন্য অন্তর-উপলব্ধির স্বতোবিকাশের, লীলাবিলাসস্বাচ্ছন্দ্যের কিছুটা হানি করিয়াছেন। শরতের আনন্দচঞ্চলতা, ভগবৎস্বরূপের নিগূঢ় উপলব্ধিরহস্য, ধর্মসংস্কারের মূঢ় আনুষ্ঠানিকতা, বসন্তের অন্তর্লীন জীবনসত্য—ইহাদিগকে অতিরিক্ত তথ্যভারাক্রান্ত না করিয়া, ইহাদের সহজ নাটকীয় ছন্দটুকুর অতিরেকবর্জিত লীলাময় প্রকাশ—ইহাই এই নাটকগুলির যথার্থ শিল্পরূপ ও এই ছন্দোময়তার স্বতঃস্ফুরণই নাট্যকারের শক্তির আসল পরীক্ষা।

'শারদোৎসব'-এ শরৎ ঋতুর আনন্দহিল্লোল, প্রাত্যহিক কর্মবন্ধনের মুক্তি-উল্লাস ও প্রকৃতির নবীনপ্রাণলীলাপ্রভাবিত মানবাত্মার প্রসন্ন আত্মোপলব্ধিই নাট্যপ্রেরণার মূল উৎস। প্রকৃতি ও মানবাত্মার এই প্রফুল্ল আত্ম-উন্মোচনই কবিস্রষ্টার মনোজগতে নূতন রূপ পাইয়াছে। ভাবিয়া দেখিতে গেলে এই আনন্দের উত্থান-পতন ও নব নব উদ্ভাবনশীলতা ছাড়া ইহার মধ্যে আর কোন নাট্য-উপাদান নাই। পূর্ণতোয়া নদীর তরঙ্গোচ্ছ্বাস, নির্মল আকাশে শাদা মেঘের খেলা, কাশগুচ্ছের শুভ্র চামর-দোলানো আমন্ত্রণ আর কিশোর মনে নানারূপ কল্পনা ও ঔৎসুক্যের বিচিত্র, অধীর তৃপ্তিসন্ধানের মধ্যে কোন নাটকীয় দ্বন্দ্বজটিলতার স্পর্শ নাই। আলো যেমন উহার আত্ম-নিক্ষিপ্ত ছায়ার সহিত খেলার অভিনয় করে, বিড়ালছানা যেমন উহার চঞ্চল লেজকে নিজ আমোদের সাথীরূপে কল্পনা করে, তেমনি ঋতুর আনন্দবিভোরতা আত্মরতির উপায়রূপে এক কাল্পনিক বিরোধশক্তিকে মূর্তি দিয়া উহারই সহিত অপ্রাকৃত নাট্যরস উপভোগের গূঢ় তৃপ্তি অনুভব করিয়াছে। পুরুষ ও প্রকৃতির মত একই সত্তা দ্বিধাবিভক্তরূপে প্রেমের সাধ মিটায়। কবিও তেমনি হর্ষবিহ্বলতার বক্ষোপঞ্জর হইতে আনন্দবিমুখতার এক ছায়ামূর্তি নিষ্কাশিত করিয়া, অশরীরী সত্তার উপর তত্ত্বপ্রলেপসংযোগে উহার অবিমিশ্র ভাবসারে কিঞ্চিৎ বস্তুঘনত্ব আরোপ করিয়া, নাটকের

বাহিরের ঘটনাবৈচিত্র্য ও অন্তরের সংঘাতপ্রেরণার প্রবর্তনে উহার মধ্যে নাট্যক্রিয়ার প্রতিভাস ফুটাইয়াছেন। বালকের দল, ঠাকুরদাদা, রাজসন্ন্যাসী সকলেই তত্ত্বতঃ নানা নামে একই আনন্দোচ্ছ্বাসের বহুরূপী তরঙ্গ। বালকেরা এই তরঙ্গের সূর্যকিরণোজ্জ্বল, প্রবহমাণ জলকণাসমষ্টি; ঠাকুরদাদা তাহার সমস্ত পরিণত জীবনপ্রজ্ঞা দিয়া এই আনন্দ-উচ্ছলতাকে সমষ্টিরূপের ছন্দোবিন্যস্ত করিয়াছে। তাহার জীবনপ্রজ্ঞা তাহাকে অস্তিত্বের আনন্দরস আকণ্ঠ-পানের প্রেরণা দিয়াছে ও উহার শ্রেষ্ঠত্ব-প্রত্যয়ে স্থির রাখিয়াছে। সে কিন্তু উহার তত্ত্বদর্শী-পদে এখনও উন্নীত হয় নাই। বালকগণ ও ঠাকুরদাদা যে রুচির অধিকারে রসের সহজ ভোক্তা, রাজসন্ন্যাসী তাহার দার্শনিক তত্ত্বভূমিতে আরূঢ় ও তাহার অন্তঃপ্রকৃতির স্বরূপজ্ঞ। তিনি এই অন্তর্দৃষ্টিবলে রাজকর্তব্যের খেলাধূলা ছাড়িয়া ছেলেখেলার তত্ত্বসাধনার মর্মভেদ করিয়াছেন ও বিশ্বের আনন্দযজ্ঞে হোতার পদে অভিষিক্ত হওয়াকেই মানবজীবনের চরম আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এই তত্ত্বজ্ঞতাই তাঁহাকে শরৎকালের আগমনে পার্থিব রাজার দিগ্বিজয়-অভীপ্সাকে প্রকৃতি ও মানবের মিলিত আনন্দোৎসবে, দেশজয়কে আত্মসমীক্ষায়, রূপান্তরিত করিবার শক্তি দিয়াছে। পশুশক্তির দ্বারা পররাজ্যজয়ের অপেক্ষা আনন্দমিলনের সংবেগে পরের হৃদয়-জয় ও নিজ অন্তঃস্বরূপের যথার্থ পরিচয়লাভ যে মহত্তর আদর্শ এই স্বচ্ছদৃষ্টির বলে তিনি এই নূতন সত্যের উপলব্ধি ও প্রয়োগে সিদ্ধকাম হইয়াছেন। এই অপার্থিব আনন্দের আস্বাদনের জন্যই বালকেরা না বুঝিয়া ও ঠাকুরদাদা কতকটা গূঢ়তর সত্যের আভাস পাইয়া তাঁহার নেতৃত্ব মানিয়া লইয়াছে ও ঠাকুরদাদা ইহারই সাধনার জন্য তাঁহার জীবনসঙ্গী হইবার প্রার্থনা জানাইয়াছে। 'রাজা' নাটকে রাজপ্রকৃতির বিশ্বনিয়ন্তা, প্রহেলিকা-কুটিল রূপের পরিবর্তে এখানে বিশ্বরাজের প্রতিনিধি এক সার্বভৌম রাজচক্রবর্তীর আনন্দময়ত্বের দিক্‌টা প্রকট হইয়া ভগবৎস্বরূপের নানামুখী বিচিত্র প্রকাশের ইঙ্গিত দিয়াছে।

এই আলোর খেলার বিপরীত দিক্‌টা ফুটাইবার জন্য আর কয়েকটি বাস্তবজীবনাশ্রিত, প্রচলিত সংস্কারের অধীন চরিত্র পরিকল্পিত হইয়াছে। এই দুই জাতীয় চরিত্রের মধ্যে আদর্শবৈপরীত্যের যে ক্ষীণ সংঘাত আরোপিত হইয়াছে তাহাতেই এই অন্তর্লোকের কাহিনীর বাহ্য নাট্যরূপের বীজকণা নিহিত আছে। এই রক্তমাংসের মোড়কে মোড়া চরিত্রগুলির

মধ্যে প্রধান লক্ষেশ্বর। তাহার মধ্যে যেটুকু স্থূলত্ব, যেটুকু মানবিক সংস্কারের পাতলা মৃত্তিকা-প্রলেপ আছে তাহাই নাট্য-দ্বন্দ্বের বীজরোপণভূমির উপলক্ষ্য হইয়াছে। লক্ষেশ্বর তাহার হীন বিষয়াসক্তির জন্য এই আনন্দরাজ্য হইতে স্বেচ্ছানির্বাসিত, নিজ লোভ ও সন্দিগ্ধচিত্ততার সঙ্কীর্ণ অন্ধকূপে বন্দী। যেখানে তাহার প্রতিবেশের আর সকলেই আনন্দসাগরের প্লাবনে ভাসমান, প্রকৃতির অকৃপণ দাক্ষিণ্যে ও নিজ নিজ অন্তরের ঐশ্বর্যের দান-প্রতিদানের খেলায় পুলকমত্ত ও কলুষমুক্ত, যেখানে সে-ই আত্ম-কেন্দ্রিকতার অন্ধকার কোটরে আবদ্ধ কীটের ন্যায় একটি শোচনীয়, নিঃসঙ্গ ব্যতিক্রম। যেখানে সকলের ধনভাণ্ডার প্রকৃতিসৌন্দর্যের অজস্রতায় অফুরন্ত ও সার্বভৌম ভোগাধিকারের আশীর্বাদে নির্মল, সেখানে তাহারই ধন মাটির তলে পোঁতা, সতর্ক প্রহরার দ্বারা সংরক্ষিত, আশঙ্কা ও উদ্বেগের আবিল বাষ্পস্পর্শে মলিন। এই ধনের লোভই তাহাকে সন্ন্যাসীর দিকে দ্বিধাগ্রস্তভাবে প্রথম আকর্ষণ করিয়াছে, ধাতব স্বর্ণ অন্তরের হীরামণি-মাণিক্যের দিব্য দীপ্তির প্রতি লোলুপতা জাগাইয়াছে। এই অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রভাবেই সে নাটকীয় চরিত্ররূপে বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছে। নির্দ্বন্দ্ব আনন্দরাজ্যে সে-ই একমাত্র দ্বন্দ্বের প্রতীকরূপে আত্মস্বাতন্ত্র্যে অধিষ্ঠিত হইয়াছে। সকলেরই গতি একমুখী, সে-ই একমাত্র দ্বিমুখী গতির বিপরীত আকর্ষণে আন্দোলিত হইয়াছে।

উপনন্দ স্বভাবতঃ এই বিশ্বব্যাপী আনন্দে যোগ দিতে উৎসুক, কিন্তু তাহার অবিচল কর্তব্যবোধ তাহাকে অপরিহার্য কার্যশৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখিয়াছে। যে সমবয়সী বালকদের সঙ্গে খেলায় মাতিতে ও ছুটির নেশা উপভোগ করিতে আগ্রহী, কিন্তু যে অতন্দ্র শৃঙ্খলাবোধ সমস্ত যথার্থ আনন্দের মূল উৎস, তাহার প্রতি আনুগত্যই তাহাকে আনন্দোৎসবে যোগদানে বাধা দিয়াছে। নাটকটির তত্ত্ববীজ, উহার শারদোৎসব হইতে ঋণশোধে রূপান্তর, তাহারই চরিত্র-মূল-নিহিত। সে-ই নাটকটিকে বিশুদ্ধ আনন্দরস-উপভোগ হইতে বিশ্ববিধানের অনুবর্তনের অত্যাজ্য দায়িত্বপালনে, অবিমিশ্র হৃদয়োৎসার হইতে দ্বন্দ্বসঙ্কুল, বাস্তব সঙ্কটভূমিতে স্থানান্তরিত করার উপলক্ষ্য হইয়াছে। কাঁটাগাছে রসাল ফল ফলার ন্যায় কঠোর কর্তব্যনিষ্ঠার আপাত-শুষ্ক ডালেই জগতের নয়নরঞ্জন সৌন্দর্যপল্লব বিকশিত হইয়াছে। নিখিলব্যাপ্ত সৌন্দর্যপ্রবাহের অঙ্গীভূত হইতে হইলে নিখিলের অন্তর্লোকশায়ী নিয়ম-

শক্তিকেও স্বীকার করিতে হইবে—সৌন্দর্য যাহার বহিঃপ্রকাশ, নিয়মানুবর্তিতা তাহার মূলগত প্রচ্ছন্ন প্রেরণা। উপনন্দ অজ্ঞাতসারে এই নিগূঢ় সার্বভৌম সত্যের সাধনা করিয়াছে। 'শারদোৎসব'-এ যাহা পরোক্ষভাবে আভাসিত, 'ঋণশোধ'-এ তাহাই নাটকের সচেতন তত্ত্বাশ্রয়রূপে উপস্থাপিত। রবীন্দ্রনাথ কবিসুলভ সহজ অন্তর্দৃষ্টিবলে অনুভব করিয়াছিলেন যে শরৎপ্রকৃতির প্রাণৈশ্বর্য ও মানবমনে তাহার প্রতিফলন উৎকৃষ্ট গীতিকবিতার উৎস হইতে পারে, কিন্তু উহার মধ্যে নাটকীয় মর্মবস্তুর একান্ত অভাব। তাই তিনি পরবর্তীকালে নাটকের অনুকূল প্রতিবেশরচনার উদ্দেশ্যে রূপমাধুর্য অপেক্ষা তত্ত্বকাঠিন্যকে মুখ্য স্থান দিয়াছেন। ইহাতে নাটকীয় অন্তরাত্মার প্রেরণা কতদূর কার্যকরী হইয়াছে তাহা সংশয়স্থল, তবে নাটকীয় রীতির প্রতি বাহ্য আনুগত্য দেখান হইয়াছে।

আর এই পর্যায়ের তৃতীয় ব্যক্তি সামন্তরাজ সোমপাল রাজচক্রবর্তী বিজয়াদিত্যের বিপরীতরূপে উপস্থাপিত। সে সন্ন্যাসীর অলৌকিক শক্তির আশ্রয় লইয়া নিজ মর্যাদাবৃদ্ধি করিতে চায়। সন্ন্যাসী তাহাকে দ্ব্যর্থক আশ্বাসবাণী শোনাইয়া ও বিজয়াদিত্যের অহংবোধ খর্ব করিতে তাহার আন্তরিক সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়া তাহার ভ্রান্ত ধারণাকে পুষ্ট করিয়াছে। শেষ পর্যন্ত সন্ন্যাসীর প্রকৃত পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হইলে পর সোমপাল নিজ আত্মপ্রসারস্পৃহার জন্য লজ্জিত হইয়া বিজয়াদিত্যের বিশ্বস্ত অনুচররূপে আপনার পূর্ব স্থানে ফিরিয়া গিয়াছে। বৈরাগ্যনিষ্ঠ ও প্রতিষ্ঠালোলুপ দুই রাজচরিত্রের মধ্যে এইভাবে আদর্শপার্থক্য দেখান হইয়াছে।

৩

নাটকের নিগূঢ় মর্মনির্যাস নাটকীয় ঘটনার স্থূল আধারে যতটা বিধৃত না হইয়াছে তাহার অপেক্ষা বেশী সঞ্চিত হইয়াছে উহার অন্তর্ভুক্ত গানগুলির সূক্ষ্ম সাঙ্কেতিকতার স্বর্ণপাত্রে। এই গানগুলিই যেন নাটকের ভাবসত্তাকে কাব্যের সঙ্কেতময়তায় ও সুরের ইন্দ্রজালে পাঠকের অনুভূতিগম্য করিয়াছে। উহার গীতিধর্মিতাই উহার তত্ত্বাশ্রয়ী ও নাট্যসংঘাতদ্যোতক বহিরবয়বকে অতিক্রম করিয়া উহার গোত্রপরিচয় দিয়াছে। গানই উহার আসল স্বরূপ, নাটকীয়তা উহার ছদ্মবেশ মাত্র, এই ধারণাই পাঠকের মনে প্রবল হইয়া

উঠে। নাটকটির গানগুলির ভাববস্তু বিশ্লেষণ করিলেই এই সত্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে। রৌদ্রোজ্জ্বল, সদ্যোমেঘমুক্ত এক শরৎপ্রভাতে ছেলেদের ছুটির আনন্দরসবিভোর চিত্তের অস্থিরতাই নাটকের প্রথম গানে উহার সুরটি বাঁধিয়া দিয়াছে। এই গানে সদ্যোলব্ধ পুলকোচ্ছ্বাসের মদির উদ্‌ভ্রান্তি ভাষা পাইয়াছে—বালকেরা কোন্ খেলায় মাতিয়া তাহাদের এই অসহ্য আনন্দ-বেগকে মুক্তি দিবে তাহা খুঁজিয়া পাইতেছে না। শেষ পর্যন্ত দুইরকম খেলার কথা তাহাদের মনে জাগিয়াছে—কেয়াপাতের নৌকা গড়িয়া তাল-দীঘির জলে ভাসান ও রাখাল ছেলের মত বাঁশী বাজান ও চাঁপার ফুলের রেণুতে লুটোপুটি করা। ইহাদের মধ্যে একটি প্রত্যক্ষভাবে পূর্ণতোয়া নদীর গতিবেগ-প্রভাবিত, আর একটি উহাদের স্মৃতিকল্পনা হইতে আহৃত। এই প্রথম গানে বন্ধনমুক্তির তীব্র আনন্দ তাহাদিগকে দিশাহারা করিয়াছে ও তাহাদিগকে একই সঙ্গে শরৎপ্রকৃতির প্রাণচাঞ্চল্যের অনুস্মৃতি ও কল্পলোক-রোমন্থনের দিকে আকর্ষণ করিয়াছে। ছুটির অভাবনীয় রোমাঞ্চই ধূয়ারূপে এই গানের মূল সুর ধ্বনিত করিয়াছে। আনন্দের এই প্রথম উচ্ছ্বাসেই বাধা আসিয়াছে লক্ষেশ্বরের বিরোধিতায় ও উপনন্দের লক্ষেশ্বরের নিকট ঋণশোধের প্রস্তাবে। তবে লক্ষেশ্বরের শিবিরেও যে তাহাদের গোপন সহায়ক আছে তাহার নিদর্শন মিলে লক্ষেশ্বরের ছেলেরও উৎসবের প্রতি ঔৎসুক্যে ও বাপের নিষেধের অনিচ্ছুক অনুবর্তনে। স্বয়ং লক্ষেশ্বরের মনেও যে উদ্‌ভ্রান্তির ছোঁয়াচ লাগিয়াছে তাহারও প্রমাণ পাই তাহার স্বগতভাষণে।

দ্বিতীয় গানে ঠাকুরদাদার নেতৃত্বনির্দেশ এই উৎসবমত্ত বালকদের উল্লাসকে একটা লক্ষ্যাভিমুখী করিয়াছে ও আবেগমুক্তির একটা বিশেষ পথের সন্ধান দিয়াছে। ইতিমধ্যে সন্ন্যাসীর প্রবেশ ও দূর গাছতলায় উপবিষ্ট ঋণশোধরত উপনন্দের সহিত বার্তাবিনিময় ছেলেদের ক্রীড়াশীলতাকে আর একটু উত্তেজিত ও বস্তুনিষ্ঠ করিয়াছে। উপনন্দের সঙ্গে সমস্যা ও সন্ন্যাসীর সঙ্গে সমস্যার তত্ত্বব্যাখ্যা এই আনন্দরাজ্যে প্রবেশ করিয়া ছুটির আবেশকে কিছুটা দ্বান্দ্বিক রূপ দিয়াছে। যাহা ছিল বিশুদ্ধ আবেগের নিরাবলম্ব বাষ্পবুদ্বুদ তাহা কতকটা বস্তুসংস্পর্শে, কতকটা বিরুদ্ধ তত্ত্বের বীজনবায়ুতে কিয়ৎপরিমাণে ঘনীভূত রূপ লইয়াছে, নির্দিষ্ট আকারে দানা বাঁধিয়াছে। উপনন্দের কর্তব্যনিষ্ঠ নিঃসঙ্গতা ঠাকুরদাদার নিকট অবিমিশ্র দুঃখের কারণ-রূপে প্রতিভাত হইয়াছে। সন্ন্যাসীর নিকট তাহা কিন্তু প্রকৃতি-সৌন্দর্যের

একদিকে মূল উৎস ও অপরদিকে মধ্যমণিরূপে নূতন তাৎপর্য পরিগ্রহ করিয়াছে। ঋতুদাক্ষিণ্যের ও ছুটির আনন্দের রূপে যাহা ফুল হইয়া ফুটিয়াছে তাহারই প্রচ্ছন্ন উদ্ভবসূত্র এই ঋণশোধের দায়িত্বস্বীকৃতির মধ্যে নিহিত। অর্থাৎ প্রকৃতি ও মানবমনের সমস্ত পুষ্পিত রমণীয়তার বিপরীত দিকে আছে বিশ্ববিধানের অতন্দ্র আয়োজন-ক্রিয়া ও আনুগত্যনিষ্ঠা। এই ভাবকল্পনা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের Ode to Duty-র নীতির শাশ্বত অমোঘতার ও উহারই সৌন্দর্য-রূপান্তরের তত্ত্বকথা স্মরণ করাইয়া দেয়। পার্থক্যের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এই নীতির উদ্বোধন ঘটে ঋতু ও মানবচিত্তের হঠাৎ-উন্মেষিত প্রাণৈশ্বর্যের বিহ্বল প্রেরণায়। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থে ইহা চিরন্তন ও উপলক্ষ্যনিরপেক্ষ, নববিকশিত ফুল হইতে চিরনবীন নভোমণ্ডল পর্যন্ত প্রসারিত। রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য-গলানো ও চিত্তপ্রসাদজাত তত্ত্বচেতনা অপেক্ষা ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রাত্যহিক জীবনে উপলব্ধ ও শাশ্বতসমীক্ষাপুষ্ট দার্শনিকতা গভীরতর প্রত্যয়সিদ্ধ।

দ্বিতীয় গানটি ঠাকুরদাদার নির্দেশে গীত, তবে ইহার মধ্যে প্রকৃতিতে ও ছেলেদের মনে যে আনন্দের উদ্বেলতা, যে সর্বত্রব্যাপী খেলার মুক্তি তাহারই মাদকতা মাখানো। ধানের ক্ষেতে ও আকাশে যুগপৎ আজ ক্রীড়ার কৌতুকময়তা ছড়ান, এই দুই রকমের প্রকৃতি-বিস্তার যেন আজ ক্রীড়াক্ষেত্রে রূপান্তরিত। আজ পতঙ্গ ও পাখীর মধ্যেও উন্মনা আনন্দমত্ততা তাহাদের জীবনচেতনার মূল স্পন্দনরূপে উৎসারিত। আজ বদ্ধগৃহ হইতে নিষ্ক্রমণের আবেগ ও সমস্ত বহির্বিশ্বকে আত্মসাৎ করিবার অদম্য দিগ্বিজয়স্পৃহা চিত্তকে অধিকার করিয়াছে। আজ নদীর স্রোতোবেগজাত ফেনরাশির সঙ্গে পাল্লা দিয়া বাতাসে লঘু উল্লাসসংবেগের দ্রুত সঞ্চরণ পরিব্যাপ্ত। আজ কর্মহীন আবেশে অকারণ বাঁশীর সুরই এই নেশার একমাত্র পর্যাপ্ত মুক্তি। এই গানটিতে শরৎ-প্রকৃতি ও মানবমনের একই ভাবস্রোতে অবগাহন ও নিমজ্জন উভয়ের গূঢ় একাত্মতার নিদর্শন।

ঠাকুরদাদা ও সন্ন্যাসীর মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গী ও জীবনবিচারের সূক্ষ্ম পার্থক্যটি ঠাকুরদাদা-গীত তৃতীয় গানে ও সন্ন্যাসীর সংশোধনমূলক চতুর্থ গানের পাশাপাশি বিন্যাসে ধরা পড়িয়াছে। ঠাকুরদাদার গানে এই আনন্দলগ্নে দুঃখকে অতিক্রম ও জয় করার সচেতন প্রয়াসটি সন্ন্যাসীর কানে বে-সুরো ও শরৎপ্রভাতের প্রকৃতিবিরোধী বলিয়া ঠেকিয়াছে। আজ দুঃখের অস্তিত্ব

আনন্দের জোয়ারে ভাসিয়া গিয়া মানবমনের প্রত্যক্ষ অনুভূতিচ্যুত হইয়া বিশ্বতত্ত্বের পরোক্ষতায় আশ্রয় লইয়াছে। আজ দুঃখের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া উহার সচেতন প্রতিরোধের কোন প্রশ্ন উঠে না। এই মুহূর্তে সংগ্রামের দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা, হাল-না ছাড়ার প্রাণান্তিক প্রয়াস একেবারেই নিরর্থক। যেখানে আনন্দের বিজয়রথ অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিতে স্বতঃঅগ্রসর, সেখানে ছিন্নভিন্ন ও পর্যুদস্ত শত্রুবাহিনীর প্রতি গুরুত্ব আরোপের কি প্রয়োজন আছে? এই ম ব্যটি রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম সমালোচনার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত। গানের ভাব ও ভাষা হয়ত 'বলাকা'র আবহে ঠিক মানাইত, কিন্তু 'শারদোৎসব'-এর একচ্ছত্র উৎসবময়তায় উহার কোন প্রাসঙ্গিকতা নাই।

সন্ন্যাসীর গীতে ইহারই প্রতিবাদ ব্যঞ্জিত হইয়াছে। মানুষের যদি দুঃখ থাকে তবে তাহা আজ শরৎলক্ষ্মীর স্বর্ণথালায় অভিনন্দন-অর্ঘ্য সাজাইবার মুখ্য উপাদান। যাঁহার পায়ের কাছে চন্দ্রসূর্য-জ্যোতিষ্কমণ্ডলী অবহেলিত মালার ন্যায় ধূলিতলে নিক্ষিপ্ত, মানবের সত্তাবিগলিত অশ্রু তাঁহার গলার মুক্তাহার ও বক্ষের কৌস্তুভমণির গৌরবে স্থান পাইবে। সমগ্র বিশ্ব-জগৎ যাঁহাকে প্রসাধিত করিবার জন্য উহার সমস্ত উপকরণ-সম্ভার লইয়া প্রস্তুত থাকিয়াও উপেক্ষিত, সেই নিখিল সৌন্দর্যোপহারের প্রতি উদাসীনা জননী কিন্তু প্রসাদমূল্যে মানবের দুঃখরচিত অলঙ্কার ক্রয় করিতে উৎসুক। মায়ের দত্ত ধন-ধান্য-ঐশ্বর্য সম্বন্ধে মানুষ নিরাসক্ত, কিন্তু মানুষের দুঃখের অর্ঘ্যের অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে জননী এত নিঃসংশয় যে তিনি তাঁহার প্রসাদকে উহার অগ্রিম মূল্যরূপে ঘোষণা করিয়াছেন। এইখানেই মানুষের দুঃখতাপপীড়িত জীবনের অনন্য গৌরব। গানটি তত্ত্বোপযোগিতার দিক্ হইতে অত্যন্ত সঙ্গত, কিন্তু গান হিসাবে খানিকটা কৃত্রিমপ্রয়াসক্লিষ্ট ও সচেতনভাবে কাব্যগন্ধী। সুতরাং ইহাকে গান না বলিয়া গীতিকবিতার পর্যায়ভুক্ত করাই উচিত মনে হয়।

দুইটি গান প্রশস্তিমূলক—একটি রাজপ্রশস্তি ও অপরটি শরৎলক্ষ্মী-প্রশস্তি। প্রশস্তির যে সাধারণ লক্ষণ—স্তোত্রগাম্ভীর্য ও অলঙ্কারমুখর, শব্দাড়ম্বরময় ভাষা—এই দুইটিতেই পাওয়া যায়। সন্ন্যাসীর প্রথম গীতে শরৎসৌন্দর্যের ঐশ্বর্যময়ী মূর্তিকল্পনার যে সূচনা দেখা যায়, তাহারই উদাত্ত মন্ত্ররূপ দ্বিতীয় গীতে সুপ্রতিষ্ঠিত।

শারদলক্ষ্মীর আবাহন ও আগমনী-অভিনন্দন 'বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ'

ও 'অমল ধবল পালে' প্রারম্ভপংক্তিচিহ্নিত দুইটি পরবর্তী গানে যথাক্রমে স্পষ্টতরভাবে ব্যঞ্জিত। প্রথমটিতে মনের অনির্দেশ্য আকৃতি প্রকৃতিসৌন্দর্য ও মানবকল্পনার অন্তরঙ্গ যোগে অনুপ্রেরিত, কাব্যব্যঞ্জনাময় রূপপ্রতিমা-নির্মাণে সার্থক দেহবন্ধনে ধরা দিয়াছে। ছেলেদের উন্মনা অধীরতা ও অস্পষ্ট ভাবচাঞ্চল্য এক মূর্তিমতী, প্রসন্না ঐশ্বর্যদেবীর অঙ্গ-লাবণ্যে ও মানস-দীপ্তিদ্যোতনায় মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। যাহা পূর্বে অদম্য উল্লাসের অকারণ খেল মাত্র ছিল, তাহা এখন সুনির্দিষ্ট পূজাবিধির দৃঢ়বদ্ধ মন্ত্রসংহতিতে ঘন হইয়া উঠিয়াছে। প্রথম কয়েকটি পংক্তিতে অর্ঘ্যসঞ্চয়, পরে মূর্তিকল্পনা ও আহ্বান, বিচিত্র ভাবাসঙ্গের সহযোগে স্বরূপদ্যোতনা, পরিণামে পূজার প্রসন্ন শান্তি ও সান্ত্বনার ফলশ্রুতি। শরতের স্বর্ণবীণায় যে সঙ্গীত ঝরিয়া পড়িতেছে তাহা মেঘান্তরাল হইতে সূর্যকিরণের ন্যায় অশ্রুনিষিক্ত চিত্তে আনন্দস্পর্শ বহন করিয়া আনিতেছে। দেবীর অলকের পরশমণি উহার ক্ষণদীপ্তির ঝলকে ঝলকে দুঃখভারাক্রান্ত মনে স্নিগ্ধ সান্ত্বনার প্রলেপ বুলাইতেছে ও শেষ পর্যন্ত মনোগহনে সঞ্চিত সমস্ত আঁধারকে ক্রমভাস্বরতায় বিলীন করার আশ্বাস দিতেছে।

এই চমৎকার কবিতাটিতে Keats-এর Ode to Autumn-র সহিত তুলনীয় আশ্চর্য গূঢ় কল্পনালীলায় প্রকৃতিসত্তার মানবীয়তাকরণ সিদ্ধ হইয়াছে। মানবের সৌন্দর্যমুগ্ধতা ও মানবমনের উপর প্রকৃতির নিগূঢ়চারী প্রভাব যুগপৎ এই কবিতাটির মধ্যে আত্মিক সমন্বয়ে সংগ্রথিত হইয়া এক দুর্লভ কাব্যচরিতার্থতা লাভ করিয়াছে। তবে ইহা ঠিক গানের সাবলীল, স্বতঃস্ফূর্ত উৎসার নয়, ইহা কাব্যনির্মিতির নিখুঁত নৈপুণ্যে, গভীরতর ভাবকল্পনার অভিব্যক্তিরূপে শিল্পোৎকীর্ণ সৃষ্টি।

দ্বিতীয় গানটি ঋতুকবিতা হিসাবে ও প্রকৃতির অন্তরপরিচয় রূপে অনবদ্য সৃষ্টি, কিন্তু শারদোৎসবের মূল সুরের সহিত উহার বিশেষ কোন সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে হয় না। ঠাকুরদাদা ও সন্ন্যাসীর অনুপ্রবেশে ছেলেদের চিন্তালেশহীন, স্বতঃ-উৎসারিত আনন্দপ্রবাহে কিছুটা তত্ত্বগভীর আবর্তের সঞ্চার হইয়াছে। তবে এই তত্ত্ব কিশোর-চিত্তের কর্মবন্ধনমুক্তির অহেতুক ও সহজসংস্কারপ্রসূত পুলকচাঞ্চল্যের উদ্বর্তিত রূপ ও উহারই সমধর্মী। সন্ন্যাসী ও ঠাকুরদাদা উভয়েই খেলার মধ্যবর্তিতায় শরৎলক্ষ্মীর দিব্যসত্তার অনুভব ও আরতি করিয়াছেন ও ছেলেদেরও ঐরূপ পরোক্ষভাবে শরৎশ্রীর

স্বরূপের আভাস দিয়াছেন। কিন্তু এই গানটিতে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব জীবনদর্শন যেন আরোপিত হইয়াছে। বালকের অজানা আকৃতির সঙ্গে কবির অস্থিমজ্জাগত সুদূরাভিসারমোহ মিশিয়া গিয়া এক চিররহস্যময়, অনির্দেশ্য আদর্শব্যঞ্জনার উদ্ভব হইয়াছে। ছেলেদের ছোট হর্ষপল্বলে যেন মহাসাগরের সুর আসিয়া মিশিয়াছে। সাগরপারের রত্ন-অন্বেষী, অপার্থিব সিদ্ধিসন্ধানী নৌ-যাত্রা, অজানা কাণ্ডারীর সুর-বাঁধা যন্ত্রে নব মন্ত্রের সাধনা প্রভৃতি রবীন্দ্রকাব্যে অতি-পরিচিত কল্পনা ও চিত্রকল্প 'শারদোৎসব'-এর অভ্যস্ত ভাববৃত্তকে ছাড়াইয়া আমাদিগকে কোন্ গহন অনুভূতির রাজ্যে উধাও করিয়া দেয়। সন্দেহ হয় যে এই মায়া-অভিযানে শুধু উৎসবচঞ্চল ছেলের দল নয়, এমন কি সন্ন্যাসী ও ঠাকুরদাদার মত তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরাও সহযাত্রী হইতে পারিয়াছেন কি না। আমরা শরতের পরিচিত ভাবাসঙ্গকে ছাড়াইয়া, নাটকের জনাকীর্ণ, সংলাপ-স্পন্দিত রঙ্গমঞ্চ পিছনে রাখিয়া, শুধু কবির নীরব সঙ্কেত-অনুসরণে এক অকূল মহাসাগরের কোন নিঃসঙ্গ দ্বীপের অভিমুখে পাড়ি দিই।

শেষ গানটি শরতের আলোকপ্রসন্নতা ও রূপসঙ্কেতকে অবলম্বন করিয়া ঋতুর সত্তাটিকে ভগবৎপ্রতিমার দ্যোতনারূপে প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। ইহা শরতের দৃশ্যসৌন্দর্য ও পুষ্পপেলবতা, উহার আলোছায়ায় বোনা অঙ্গাবরণ ও উহার মেঘবিচ্ছুরিত জ্যোতীরেখার ক্ষণিক চমক প্রভৃতির সার্থক প্রয়োগে বিভিন্ন ইঙ্গিতগুলিকে ভগবৎ-অনুভূতির ভাবগভীরতা ও ভক্তিঘনতা দিয়াছে। তথাপি যেন মনে হয় যে ইহার মধ্যে শারদোৎসবের কেন্দ্রীয় সুরটি যথাযথ প্রতিফলিত হয় নাই। ইহা যেন গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালির ভাবাবহ হইতে আনীত হইয়া কথঞ্চিৎ বিসদৃশভাবে নাটকের ভাবমণ্ডলে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। শরৎকে লক্ষ্মীরূপে কল্পনা করা আর উহাকে 'নয়নভুলানো' আখ্যা দিয়া ঐশী বিগ্রহরূপে উপলব্ধ করা ঠিক যেন একজাতীয় ভাবসাধনা নয়। শরৎ-শ্রীর বিচ্ছুরিত দীপ্তিতে উহাকে অর্ধদেবীত্বে উন্নয়ন আর উহাকে স্বয়ং-সম্পূর্ণ ঈশ্বরত্বে প্রতিষ্ঠা একস্তরের রূপকল্পনা নয় ও যেখানে নাট্যঘটনার পর্যায়ে পর্যায়ে প্রকৃতি হইতে প্রকৃতির অধিদেবতার ক্রম-উন্মোচন নাটকীয় পরিণতির সঙ্গে একসূত্রে গ্রথিত, সেখানে এই হঠাৎ উচ্চগ্রামে সুর-চড়ান ভাবাতিবেগ এই সূক্ষ্ম সঙ্গতিকে ক্ষুণ্ন করে।

ঋতুনাটকের মধ্যে 'শারদোৎসব'ই শ্রেষ্ঠ স্থানের অধিকারী। ইহাতে

প্রকৃতিলীলা, তত্ত্ব, নাট্যঘটনা ও গান—এই সমস্ত উপাদানের যথাযথ বিন্যাসে একটি যৌগিক রস সৃষ্ট হইয়াছে। অন্য কোন ঋতুনাটকে এরূপ সংমিশ্রণ-কুশলতার পরিচয় নাই। 'ঋণশোধ'-এ নাট্যরসের যে স্বাদপরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহা এই প্রসঙ্গে পরবর্তী আলোচনার বিষয় হইবে।

৩

ঋণশোধ (১৯২১)

'শারদোৎসব'-এর মধ্যে যে ঋণশোধ-তত্ত্ব, আনন্দ-উচ্ছ্বাসের মধ্যে দার্শনিক তাৎপর্য-আরোপের যে উদ্দেশ্য সচেতনভাবে প্রবর্তিত হইয়াছিল তাহার বোধ হয় একটা কারণ ছিল তরল আবেগকে নাটকের ঘনীভূত রূপ দিবার প্রয়োজনের কিছুটা বিলম্বিত অনুভব। 'ঋণশোধ'-এ তত্ত্বপ্রেরণাই নাটকের মূলীভূত ভাববীজরূপে প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। এখানে আগে তত্ত্বপ্রতিষ্ঠা, পরে শরৎকালের ঋতু-উৎসবের মধ্যে তাহার দৃষ্টান্ত-সংযোজনা। অবশ্য এই নূতন ভাবকেন্দ্র হইতে যাত্রারম্ভ যে অধিকতর নাট্য-লক্ষ্যাভিমুখী সে বিষয়ে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌছান যায় না। নাটক দৃশ্যকাব্য বলিয়া ইহা অমূর্ত অনুভূতিকেন্দ্রিক হইলেও প্রত্যক্ষ আবেদনের দাবী করে। যদি অতীন্দ্রিয় ভাবও ইহার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু হয়, তথাপি ইহাকে সার্বভৌম ও নিঃসংশয় জীবনসত্যের পর্যায়ভুক্ত হইতে হইবে। ইহার উপলব্ধি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হইলেও সর্বজনবেদ্য হওয়া চাই। যে অনুভূতি সহজ প্রত্যয়রূপে সকলেরই অন্তরশায়ী, রক্তপ্রবাহে স্পন্দমান সংস্কাররূপে সর্বচেতনাপরিব্যাপ্ত তাহাই কেবল নাট্যসংলাপ ও অভিনয়কলার মাধ্যমে উপস্থাপনাযোগ্য। এই মানদণ্ডে 'রাজার' ভাবপ্রেরণা 'ঋণশোধ' বা 'ফাল্গুনী'র তত্ত্বসঙ্কেত হইতে অনেক বেশী নাট্যোপযোগী। শরৎপ্রকৃতির মধ্যে ঋণশোধের তত্ত্বতাৎপর্য-সন্ধান রবীন্দ্রনাথের মৌলিক আবিষ্কার হইতে পারে, কিন্তু এই তত্ত্বের মূল সাধারণ ভাবসংস্কারের সমর্থনহীন। একক সত্য যতই নিগূঢ় ও দ্যোতনাময় হউক না কেন, উহা যতই শ্রেষ্ঠ দার্শনিক মননের উদ্রেক করুক না কেন, উহা নাটকীয় রসসৃষ্টির উপযোগী উপাদানে হীন হইবে। 'রাজা' নাটকে ভগবৎ-স্বরূপের যে রহস্য রূপ পাইয়াছে তাহার দ্যোতনা সূক্ষ্ম ও ইঙ্গিতময় ভাববিন্যাস ও গূঢ়ার্থক প্রকাশভঙ্গীর সাহায্যে সাধিত হইলেও পাঠক ও দর্শক

নিজ অন্তরের আলোকে তাহার চরম তাৎপর্যটি বুঝিতে ও অনুভব করিতে কোন অসুবিধা বোধ করে না। সমস্ত রূপক আবরণ ও তির্যক ভাষণ-চাতুরীর যবনিকাজাল ভেদ করিয়া উহার অন্তর্নিহিত তত্ত্বদীপ্তি আমাদের অনুভব-গভীরতায় যে স্বচ্ছ প্রতিবিম্ব ফেলে তাহার একটা প্রধান কারণ কবিদৃষ্টির সঙ্গে আমাদের দৃষ্টির স্বতঃস্ফূর্ত সমকেন্দ্রিকতা। যে অগণিত প্রকৃতিপ্রেমিক পাঠক শরতের সোনার রৌদ্রে মুগ্ধ হইয়া নিজ অন্তর-কপাট উন্মোচন করিয়া শরতের আহ্বানকে বরণ করিয়া লইয়াছে তাহাদের মধ্যে কয়জন এই তত্ত্বের লোহার জাল-বসান জানালার অন্তরাল রচনা করিয়া এই পুলকহিল্লোলের স্বচ্ছন্দ প্রবেশকে অবরুদ্ধ করিয়াছে? ঋণশোধ শরৎসৌন্দর্যের প্রাণলাবণ্যের পিছনে প্রচ্ছন্ন তত্ত্বের অস্থিকঙ্কালের স্থান লইতে পারে, কিন্তু ইহা কখনই প্রত্যক্ষভাবে আমাদের ঋতু-উপভোগের, উহার স্বাদবৈচিত্র্যের হেতুরূপে অনুভূত হয় না। এই তত্ত্ব সৌন্দর্যপ্রবাহ-বাহিত পলিসঞ্চয় নয়, উহা স্রোতের বাধারূপ ভারী প্রস্তরখণ্ডের সহিতই তুলনীয়।

এখন 'ঋণশোধ'-এর বহিরঙ্গ ও অন্তঃপ্রকৃতি যে নূতন কলারূপের সাহায্যে নির্মিত হইয়াছে তাহার আলোচনা প্রয়োজন। নাটকের আরম্ভে বস্তুস্থাপনা ও তত্ত্বনির্দেশের অভিপ্রায়ে নাট্যঘটনার প্রবেশকস্বরূপ একটি ভূমিকা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহাতেই উহার তত্ত্ব-উদ্দেশ্যটি প্রকাশ্যভাবে ঘোষিত হইয়াছে—নাটকের গতি-পথে ধীরে ধীরে স্বতঃউন্মোচনের প্রতীক্ষা করে নাই। যে বিজয়াদিত্য 'শারদোৎসব'-এ সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে আত্মস্বরূপ অবগুণ্ঠিত রাখিয়া পাঠকমনে প্রত্যাশার কৌতূহল ও হঠাৎ-প্রকাশের নাট্যচমক জাগাইয়াছিল, সে এখানে সুরু হইতেই তাহার সভাসদবৃন্দের মতকে উপেক্ষা করিয়া তাহার সংকল্প দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিয়াছে। সে সৈন্যাভিযান ও দেশজয়ের রাজপ্রথাসম্মত মনোবৃত্তির প্রতি বিমুখতা জানাইয়াছে। সে রাজকর্তব্যের বোঝা ঝাড়িয়া ফেলিয়া সাধারণ মানুষের মত ঋতুর আনন্দোৎসবে মনপ্রাণ সমর্পণে প্রস্তুত হইয়াছে। ঋণতত্ত্বের ধারণাটি তাহার মনে প্রথম অঙ্কুরিত হইয়াছে মন্ত্রী ও সেনাপতি কর্তৃক পিতৃঋণ-পরিশোধের অবশ্যকর্তব্যতার উপদেশদানের পটভূমিকায়। পিতৃঋণের পরিবর্তে বিশ্বপ্রকৃতির আনন্দ-ঋণ-পরিশোধের অগ্রাধিকার সম্বন্ধে শেখর কবিই তাহার মনে প্রেরণার বীজ বপন করিয়াছে। প্রকৃতির সৌন্দর্যমাধুর্যকে

অন্তরের আনন্দউৎসব দিয়া পরিশোধ করা রূপশিল্পী ও প্রকৃতিপ্রেমিক কবিরই প্রত্যক্ষ দায়িত্ব। রাজা কেবল কবিপ্রেরিত হইয়াই কাব্যের রসভোক্তারূপে এই আত্মভোলা আনন্দাভিযানে যাত্রা করিয়াছে। কবি ও রাজার মধ্যে সংলাপের মাধ্যমেই নাটকের এই তত্ত্ববীজ অঙ্কুরিত ও পুষ্ট হইয়াছে। রাজা সুরসেন বীণকারের অপূর্ব সুরঝঙ্কার-উপভোগের জন্যই প্রকৃতির এই আমন্ত্রণ-রক্ষার আগ্রহ দেখাইয়াছে। এই উপলক্ষেই রাজকর্তব্য ও আত্মচিত্তৃপ্তির বিপরীত আকর্ষণের মধ্যে একটা সামঞ্জস্যস্থাপনের অবসর জুটিয়াছে। স্পর্ধিত সামন্তরাজ সোমপালের শাসনব্যাপারেই রাজনীতি ও আত্মবিস্মৃত আনন্দমিলনের আপেক্ষিক শক্তির চূড়ান্ত পরীক্ষা হইবে। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে শরৎ-প্রকৃতি রাজার মনে কোন অদম্য পুলক-চাঞ্চল্য সঞ্চার করে নাই—দিগ্বিজয়স্পৃহার গৌণ প্রভাবের মাধ্যমেই তিনি উহার রস-আবেদনকে অনুভব করিয়াছেন।

রূপান্তরিত নাটকের আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন হইল কবিশেখররূপ নূতন চরিত্রের সংযোজনা। তাহার আবির্ভাবে রাজসন্ন্যাসী ও ঠাকুরদাদার ভূমিকার গুরুত্ব অনেকটা হ্রাস হইয়াছে। সে-ই নাটকমধ্যে কেন্দ্রীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। শরতের আনন্দসুরটি তাহারই অন্তরে প্রতিভাত হইয়াছে ও সমস্ত তত্ত্বতাৎপর্যব্যাখ্যায় ও উৎসবের আয়োজনে সেই নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছে। ছদ্মবেশী রাজসন্ন্যাসী ক্রীড়ারত বালকদের মনে যে ঔৎসুক্য জাগাইয়াছিল তাহা এখন পরদেশীরূপে পরিচিত কবিশেখরেই আকৃষ্ট হইয়াছে। সন্ন্যাসীর প্রবেশের চমক এখানে অনেকটা মন্দীভূত—রাজা এখানে পরদেশীর তুলনায় অনেকটা ম্লানরূপে প্রতিভাত। রাজার পূর্বতন সংলাপ রক্ষিত আছে, কিন্তু এই সংলাপ ও তত্ত্বব্যাখ্যার মৌলিকতা অনেকটা ক্ষুণ্ণ। এমন কি ছেলেদের খেলাব্যাপারেও ঠাকুরদাদার স্বভাব-নেতৃত্ব যেন কিছুটা শেখরে অর্শিয়াছে। রাজা ও ঠাকুরদাদা উভয়েই শেখরের উপচ্ছায়ারূপে ও শেখরের নির্দেশচালিত হইয়া তাহারই ভাব ও ভাষার প্রতিধ্বনি করিয়াছে। সুতরাং শেখরকে বাড়াইতে গিয়া নাট্যকার আর দুইটি প্রতিষ্ঠিত চরিত্রের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য হইয়া পড়ে। ঠাকুরদাদা ত স্বেচ্ছায় শেখরের হাতে নিজ নেতৃত্ব সমর্পণ করিয়াছেন, শেখর কিন্তু উদারতাবশতঃ ঠাকুরদাদাকে তাহার সিংহাসনের কিছুটা অংশ ছাড়িয়া দিয়াছে। কিন্তু রাজনৈতিক রাষ্ট্রব্যবস্থাতেও যেমন, তেমনি শিশুর

মনোরাজ্যেও, যুগ্ম রাজার সম-অধিকার প্রকৃতিনিয়মবিরোধী। এমন কি রাজা সোমপাল বিজয়াদিত্যকে জয় করার জন্য যে সন্ন্যাসীর অলৌকিক শক্তির শরণাপন্ন হইয়াছে তাহাও শেখরের মধ্যস্থতায়। শরৎপ্রকৃতির রূপমায়া তাহারই অন্তরে প্রথম স্ফুরিত ও পরে সেই কেন্দ্রসঞ্চয় হইতে সমস্ত প্রতিবেশ-বিচ্ছুরিত হইয়াছে। সে-ই যেন নূতন নাটকে ঋতুর মানবিক প্রতিরূপের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া, ঋতুর আমন্ত্রণকে সমৃদ্ধতর তাৎপর্য দিয়া, রূপকে রসে পরিণত করিয়া সর্বসঞ্চারী সত্তায় নিজ আত্মার ছাপ রাখিয়াছে। এই সর্বসঞ্চারিত্ব নাট্যঘটনায় তাহার ভাবদৃষ্টিকেই প্রাধান্য দিয়াছে। সে ক্বচিৎ বিরল মুহূর্তে পাদপ্রদীপ হইতে নেপথ্যলোকে আত্মগোপন করিয়াছে। লক্ষেশ্বরের সঙ্গে শেখরেরই প্রথম সাক্ষাৎ ও এই সাক্ষাতের ফলেই নাটকের প্রথম দ্বন্দ্বসূচনা। তাহার পরেই যখন ঠাকুরদাদা ছেলেদের উৎসবের মহড়াতে ব্যাপৃত, তখন সেই উৎসবমত্ত কিশোরদলের মধ্যে তাহার অনুপ্রবেশ ও সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠা। তাহার পরে সন্ন্যাসীর প্রবেশের অব্যবহিত পূর্বে শেখরের নেপথ্যপ্রয়াণ ও ক্ষণিকের জন্য উপনন্দ, ছেলের দল, ঠাকুরদাদা ও সন্ন্যাসীর হাতে রঙ্গমঞ্চ-অধিকারের সুযোগপ্রাপ্তি। অল্পক্ষণ পরেই তাহার পুনরাবির্ভাব, সন্ন্যাসীর সঙ্গে আলোচনা, ও ছেলেদের দলকে ভাঙাইয়া লইয়া প্রস্থান। আবার রঙ্গমঞ্চের শূন্যতার অবসরে সোমপালকে লইয়া তাহার পুনঃপ্রবেশ। তাহার পরে উপনন্দ, লক্ষেশ্বর ঠাকুরদাদা ও সন্ন্যাসীর নিকট নাট্যঘটনার নিয়ন্ত্রণভার দিয়া তাহার কিঞ্চিৎ দীর্ঘ অনুপস্থিতি। এই ফাঁকে সন্ন্যাসীর সঙ্গে লক্ষেশ্বর ও সোমপালের বোঝাপড়া ও উপনন্দের প্রবোধদানের ব্যাপারে সন্ন্যাসীরই কর্তৃত্ব। এইটুকু সংকীর্ণ অবসরই নাট্যভূমিকায় শেখরের একাধিপত্যের ক্ষণবিরতি। অর্থাৎ এই অংশে শেখরের সক্রিয়তার অভাব। এই স্বল্পস্থায়ী অবসরের পর তত্ত্ব-অধিকৃত লক্ষেশ্বরের সঙ্গে তাহার যৎসামান্য হেঁয়ালিচর্চা। আবার বালকদের লইয়া তাহার পুনঃপ্রবেশ ও শারদোৎসবের আয়োজন-স্বরূপ উৎসবের পৌরোহিত্যস্বীকৃতি। ইহারই অঙ্গরূপে ফুল-আহরণ, অর্ঘ্যরচনা, আবাহন-গান, ধ্যানসঙ্গীত, দেবী সারদার প্রত্যক্ষ আবির্ভাব-প্রত্যয়-সঞ্চার, নদীর ধারে ধারে পরিক্রমার নায়কত্ব ও সর্বশেষে সমবেত সমাপ্তি-সঙ্গীতের মধ্য দিয়া আনন্দযজ্ঞে পূর্ণাহুতিদান—সর্বত্রই তাহার নেতৃত্ব-পরিচয় শরতের বর্ণোচ্ছ্বাস ও ভাবোচ্ছলতার সঙ্গে পাল্লা দিয়া স্বয়ংদীপ্ত। মোটামুটি দেখা

গেল যে প্রথম তত্ত্বপ্রতিষ্ঠা ও উহার উৎসবে রূপদানের সমস্ত প্রক্রিয়াই তাহার উদ্ভাবনা-প্রসূত। আর ব্যাখ্যাপ্রয়োগে ও লৌকিক আপোষ-মীমাংসায় তাহার অংশ গৌণ। তত্ত্ব ও আনন্দ উভয়েরই অঙ্কুর তাহার সৃষ্টিচঞ্চল মনের ঔৎসুক্যসিঞ্চিত হইয়াই উদ্ভিন্ন হইয়াছে। তাহার পর তত্ত্বের দিকে তাহার আপেক্ষিক ঔদাসীন্য ও আনন্দরসের পূর্ণ বিকাশের দিকে তাহার ঝোঁকই তাহার সক্রিয়তার বিশেষ লক্ষণরূপে পরিস্ফুট।

নবপরিকল্পনায় রচিত নাটকটির মধ্যে সন্নিবিষ্ট অনেকগুলি গানই নূতন ও শেখরের দৃষ্টিভঙ্গিদ্যোতক। শরতের প্রথম প্রভাত বিষয়ী-ব্যক্তির বিষয়াসক্তিনিরসন ও একপ্রকার অনির্দেশ্য অস্থিরতার মাধ্যমে প্রতিফলিত। উহার আরম্ভ ছেলে[redacted]সব-কলরবে নয়, বয়স্ক মনের উদাস কল্পসৌন্দর্যসন্ধানে। নাট[redacted]র্বে যে প্রবেশক গানটিতে নাটকীয় সুরের পূর্বাভাস সূচিত, [redacted]হাতে শরৎ মুখ্য নয়, উপলক্ষ্য মাত্র। হৃদয়ের অজানা আকূতি ঋতুকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশমুক্তি খুঁজিয়াছে। অকথিত বাণীর বিহ্বলতা আজ শরতের শিশিরের হিমেল স্পর্শে, ঝরা শিউলি ফুলের অজস্রতায়, ক্ষণবর্ষণ মেঘের দমকা বৃষ্টির ছাঁটে উহার পলাতক সত্তাকে ঈষৎ আভাসিত করিতেছে। সুতরাং শরৎ নাটকে মূল সুর নয়, এক অতীন্দ্রিয় ভাবব্যঞ্জনার ক্ষণাভিব্যক্তির বাহন মাত্র। ঋতুর এই গৌণ ভূমিকা তত্ত্বের দিক্ দিয়া যতই ইঙ্গিতবহ হউক, নাটকীয় রসঘনত্বের ঠিক অনুকূল নয়।

প্রথম গানটিই এই ভাবের পরিপোষক। ইহা নাটকের ভাবাবহ হইতে স্বতঃউদ্ভূত নয়, নাটকের সহিত অসংশ্লিষ্ট কাব্য ('গীতাঞ্জলি') হইতে সঙ্কলিত। ইহা কিশোর মনোরাজ্য হইতে বহুদূরবর্তী যৌবন-কল্পনার আত্মরতিপ্রসূত। ইহার মধ্যে ছেলেদের সরল, চিন্তালেশহীন ক্রীড়ারস-নিমজ্জন নাই, আছে তরুণ প্রেমের কল্পকুসুমফোটানো এলোমেলো বসন্তপবনের মাদকতা। সমস্ত নাটকের ভাবপটভূমিকাই যেন এই আবহে রূপান্তরিত।

দ্বিতীয় গানটিও রাজকর্তব্য ছাড়িয়া অভিযান-উন্মুখ রাজার মনে বৈরাগ্য-উদ্দীপনের উদ্দেশ্যে গাওয়া, এক স্বপ্নলোকের ইঙ্গিতে বিধুর ও রহস্যময়। এ যেন আমাদিগকে শরতের রৌদ্রোজ্জ্বল, প্রাণচঞ্চল, বালভোগ্য জগৎ হইতে দূরে সরাইয়া এক মায়াঘন অনুভূতি-গহনতায় নিমজ্জন করে।

যে জগতে মেঠো ফুল তারার বাঁশির মন্ত্রে চোখের জলে ভিজিয়া উঠিয়া এক অলৌকিক চেতনার সুর ছড়ায় তাহা যে শরতের পরিচিত, কিশোর মানবকদের আনন্দ-কোলাহল-মুখরিত, প্রাকৃতরসোচ্ছল পরিবেশ তাহা চেনা যায় না। এখন নাট্যকার এই গীতিভূমিকার দ্বারা কোন্ রূপলোক-প্রবেশের জন্য আমাদের আমন্ত্রণ জানাইলেন সে বিষয়ে আমাদের মন সংশয়মুক্ত হয় না। এই তত্ত্বকায়াপ্রক্ষিপ্ত ছায়ার ঘোমটা মূল নাটকের সহিত ভাববিরোধদ্যোতনায় যতটা উদ্‌ভ্রান্ত করে, ততটা রসতৃপ্তি দেয় না। যেখানে নাটকের ঘটনা ও সংলাপ প্রায়ই অপরিবর্তিত, সেখানে ভাবভূমিকার এই পরিবর্তন নাটকের অন্তরসত্যের সহিত সামঞ্জস্য-হীন মনে হয়।

এই কল্পমায়াচ্ছন্ন পরিস্থিতি হইতে আমরা হঠাৎ ছেলেদের ছুটির খুশি ও ক্রীড়াকৌতুকের আবহাওয়ায় জাগিয়া উঠি। আবার সেই লক্ষেশ্বর লক্ষীপেঁচার কর্কশ চীৎকার, আবার ঠাকুরদাদার আত্মবিস্মৃত চিরনবীনত্বের অভিনয়। উপনন্দের সঙ্গে লক্ষেশ্বরের সন্দেহদিগ্ধ বিতণ্ডা, ছেলেদের লইয়া ঠাকুরদাদার উৎসবরাজের ভূমিকাগ্রহণ আমাদের পুরাতন নাটকের জগতে ফিরাইয়া লইয়া যায়। তফাতের মধ্যে নূতন নাটকে রাজসন্ন্যাসীর নকীবরূপে শেখরের অবতারণা ও লক্ষেশ্বরের মনে প্রভাববিস্তার। তাহার পরে ঠাকুরদাদা ও বালকগণের প্রবেশ ও তাহাদের দ্বিতীয় গান। এই গানটি গাওয়া শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে শেখরের প্রবেশ ও ঠাকুরদাদা কর্তৃক উহাকে পরদেশী-আখ্যা-দান। ইহার পরে শেখরের সঙ্গে বালকদের পরিচয় ও ঠাকুরদাদার সঙ্গে উহার সংলাপের কথা আগেই উল্লিখিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে শেখর নিজেকে মনভোলা লোক ও অপরের মন ভোলানই তাহার জীবনব্রত এই আত্মপরিচয় দিয়াছে। এই উপলক্ষ্যে শেখর নিজ মানসিক অবস্থা বোঝাইবার জন্য একটি তৃতীয় নূতন গান গাহিয়াছে। এই গানে তাহার মনভোলা যে অজানার টানে ও ইহাই যে তাহার উদাসীনতার উৎস তাহাই সে জানাইয়াছে। হয়ত ঠাকুরদাদার বিষয়নিঃস্পৃহ মন ইহার গূঢ় অর্থ খানিকটা বুঝিয়াছে, কিন্তু ক্রীড়ামত্ত ছেলেদের নিকট ইহা দুর্বোধ্য হেঁয়ালিরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকিবে। ছেলেদের ক্রীড়াসক্তি তাহাদের দুর্বোদ্বেলতার প্রকাশ, কর্মবিমুখতার নিদর্শন নয়। সুতরাং হয়ত শেখরের অনাসক্তির মধ্যে তাহারা তাহাদের ন্যায় ক্রীড়ামত্ততার

সাধারণ যোগসূত্র অনুভব করিয়াছে, তাহার ভাবাদর্শের সম্পূর্ণ তাৎপর্য তাহাদের অনধিগম্য রহিয়াছে। এই খেলাচঞ্চল জগতে ভাবমুগ্ধতার অনুপ্রবেশ সমস্ত আবহাওয়ার সহিত মিশিয়াছে কিনা সন্দেহ। এ যেন দুই স্তরের চিন্তাধারার আকস্মিক, ভাবসঙ্গতিহীন সংযোগ মাত্র। শেখর এই গান গাহিয়া নূতন স্থান দেখিবার কৌতূহলে বাহির হইয়া পড়িল।

এই ফাঁকে সন্ন্যাসী প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু শেখরের উপস্থিতির দ্বারা সকলের মনে যে ভাবতরঙ্গ হিল্লোলিত হইয়াছে স.ন্যাসীর আগমন তাহাতে কোন নূতন ঢেউ তোলে নাই। এই নবাগত ঢেউএর উচ্ছ্বাস নূতন করিয়া কাহারও মানসতটে প্রতিহত হয় নাই। ঠিক পূর্বেকার আচরণ ও সংলাপের হুবহু অনুবর্তন হইয়াছে। ইতিমধ্যে শেখর পুনঃপ্রবেশ করিয়া সন্ন্যাসীকে তাহার পরদেশী নামের সার্থকতা বুঝাইয়াছে। ঠাকুরদাদা ও সন্ন্যাসীর মধ্যে প্রথম পরিচয়ে শেখরই মধ্যবর্তী হইয়াছে। শেখরের চতুর্থ গানে এই মনোমধ্যে বিরাজিত অন্তর্যামী পুরুষটির স্বরূপ বর্ণনা পাই। এটি গান ও কবিতা হিসাবে খুবই চমৎকার, তবে কতদূর নাট্যোপযোগী তাহা বিচারসাপেক্ষ। এই মনের মানুষের উপস্থিতির জন্যই সমস্ত বিশ্ব কবির নিকট সৌন্দর্যময়। তাহার জীবনে ও গানে তাঁহারই স্পর্শরোমাঞ্চ সদা-সক্রিয়। তাহার গানের মধ্যে তাঁহারই সুর অনুরণিত, দুঃখের দোলায়, বাস্তব বিস্মৃতিতে ও প্রতি খণ্ড মুহূর্তের পূর্ণতায় তাহার জীবন এক অপূর্ব সুরসঙ্গতিতে বাঁধা। কিন্তু এই তত্ত্বকথাই যদি নাটকের মর্মসত্যের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে শরতের আর বিশিষ্ট ভূমিকার কি অবশিষ্ট থাকিল? দার্শনিকতার সর্বজনীনতা ঋতুর আবেদন-বৈশিষ্ট্যকে গ্রাস করিয়া দিল।

এই গানের প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ ছেলেরা অদ্ভুত গল্প শুনিবার লোভে ঠাকুরদাদার মায়া কাটাইয়া কোপাই নদীর তীরভ্রমণেও এই নবাগত পথিককে পথপ্রদর্শকরূপে মানিয়া লইল। ইহার পর সন্ন্যাসীর সঙ্গে উপনন্দের সংলাপের মাধ্যমে সুরসেনের সহিত উপনন্দের সম্পর্ক ও তাঁহার সুরপ্রতিভার প্রতি রাজার আকর্ষণের সূত্র উদ্‌ঘাটিত হইল। প্রসঙ্গক্রমে কবিপ্রতিভা ও সুরপ্রতিভার সমন্বিত্বও স্বীকৃতি লাভ করিল।

ইহার পরবর্তী স্তরে শেখরের প্রবেশে বিশ্বঋণশোধের জন্য প্রয়োজনীয় আনন্দ-অভিনন্দনের তত্ত্বকথা আবার উঠিয়াছে ও সন্ন্যাসী গদ্যে ও শেখর গানে জিজ্ঞাসু ঠাকুরদাদার নিকট এই তত্ত্বস্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছে। শেখরের

গানে (দেওয়া নেওয়া ফিরিয়ে দেওয়া) ভগবানের সঙ্গে ভক্তের প্রীতি-ও-প্রেমবিনিময় একটি সার্বভৌম অধ্যাত্ম সত্যরূপে উপস্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে প্রসঙ্গক্রমে শরৎ ঋতুর প্রকৃতিসৌন্দর্যের মধ্যে এই দান-প্রতিদানের দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হইলেও ঋতুর বিশেষ প্রাধান্য রক্ষিত হয় নাই। ইহাতে শরৎ যেন অনন্তনিয়মচক্রে আবর্তিত নিখিল বিশ্বের একটি ক্ষুদ্র বিন্দুরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। বিশ্বের অসংখ্য অণু-পরমাণুর মধ্যে শরতের প্রাণৈশ্বর্য যে এই সর্বব্যাপী আদানপ্রদানক্রিয়ার একটি অনন্য রাখীবন্ধন তাহার কোন স্বীকৃতি দুর্নিরীক্ষ্য। তা ছাড়া, পূর্বে শরৎ-প্রশস্তির যে বিশিষ্ট সুরটি রাজসন্ন্যাসীর মুখে ধ্বনিত হইয়াছে তাহা এখন শেখরের প্রতি আরোপিত। সুতরাং রাজা ও রাজকবির যে লৌকিক সম্বন্ধ, নাটকে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত দিকটিই প্রতিপাদিত। এখন ঋণশোধের ভাব-কল্পনার স্রষ্টা শেখর, আর রাজা তাহারই মুগ্ধ ও বিনীত অনুবর্তী। 'উপনন্দের কর্তব্যনিষ্ঠার তাৎপর্য-আবিষ্কারের কৃতিত্ব শেখর ও সন্ন্যাসী উভয়ের মধ্যেই সমবিভক্ত।

আরও তাৎপর্যময় পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে সন্ন্যাসীর যে গানটি (তোমার সোনার থালায় সাজাব আজ) ঠাকুরদাদার একটি দুঃখবরণের গানের সংশোধনরূপে পরিকল্পিত ছিল, তাহা এখন শেখর-কবিতে আরোপিত, ও ঠাকুরদাদার গানটি পরিত্যক্ত। এই পরিবর্তন অবশ্য শেখরের মুখেই মানায় বেশী, ও সে হিসাবে অধিকতর নাট্যোপযোগী। তবে ইহাতে রাজার মধ্যে শুধু যে সংসারবিরাগী সন্ন্যাসী নয়, সৌন্দর্যমুগ্ধ কবিসত্তাও ছিল, রাজচরিত্রে যে ত্রিবিধ মহিমার সমন্বয় হইয়াছিল তাহা অস্বীকৃত ও অবলুপ্ত।

শরদোৎসবের আবাহনগানটি 'আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ' ঠাকুর-দাদার পরিবর্তে এবার শেখরের নায়কত্বে গাওয়া। ঠাকুরদাদা কেবল অন্যতম সহযোগীর গৌণ ভূমিকায় অধিষ্ঠিত। শারদোৎসব-মেলার পরিকল্পনাটির উদ্ভাবন অবশ্য সন্ন্যাসীরই অনুভবপ্রসূত। বেদমন্ত্রউদ্‌গীতি, যাহা সন্ন্যাসীর ধর্মসংস্কারের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল, তাহা কবি-পরিচালিত গানের আসরে পরিত্যক্ত। কিন্তু মৌলিক ভাবকল্পনাটি বাদ দিলে, উহার রূপায়ণ, প্রাণ-প্রতিষ্ঠা ও তাৎপর্যব্যাখ্যা—সবই শেখরের কবিচেতনার মুদ্রাঙ্কিত। সন্ন্যাসীর বৈরাগ্যবোধ অপেক্ষা কবির সৌন্দর্যচেতনাই এখানে শরৎ-লক্ষ্মীর

স্বরূপ-সন্ধানে সার্থকতর পথনির্দেশক—এবং উহাই বেশী স্বাভাবিক। পরবর্তী গানটি (লেগেছে অমল ধবল পালে) নূতন নাটকে আগমনী-গানের পরিবর্তে ধ্যানের গান নামে আখ্যাত। হয়ত ইহাতে বিশেষ কোন ভাবান্তরের ইঙ্গিত নাই।

পরবর্তী ঘটনান্তরগুলি পূর্বতন নাটকের সহিত অভিন্ন। সমাপ্তি-সঙ্গীতটি (আমার নয়নভুলানো এলে) হয়ত পুরাতন নাটকে যে পরিমাণে ভাববৃত্তবিরোধী ছিল, তত্ত্বপ্রধান পরিবর্তিত রূপে ততটা ব্যতিক্রমধর্মী বলিয়া মনে হয় না। পূর্বসন্নিবিষ্ট গানগুলির ভাবসঙ্কেতের সোপানাবলী বাহিয়া আমরা শরৎলক্ষ্মীর এই ভগবৎ-সত্তায় উত্তরণের ক্রান্তিশীর্ষটি সহজেই স্পর্শ করি। অন্ততঃ নাটকীয় ভাবের ক্রম-উদ্বর্তনের দিক দিয়া এই চরম পরিণতিটি সঙ্গততর মনে হয়। উৎসবপ্রাঙ্গণের সমতলভূমি হইতে তত্ত্বদুর্গমতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে হইলে ভাবক্রমের যে কয়েকটা সিঁড়ি অতিক্রম করিতে হয়, তাহার ব্যবস্থা নাটকের প্রথম রূপ হইতে পরবর্তীরূপান্তরেই পর্যাপ্ততর। আয়োজন-প্রাচুর্য সত্ত্বেও নাটকীয় ফলশ্রুতির সমস্ত সম্ভাবনা সিদ্ধ হইয়াছে কিনা তাহা স্বতন্ত্রভাবে আলোচ্য।

সর্বশেষে এই পরিবর্তন-পরম্পরার ভিতর দিয়া নাট্যরস কতটুকু পরিপক্কতর হইয়াছে, নাটকের আবেদন কতটা রসতৃপ্তি দিয়াছে সে বিষয়ে দুই একটি কথা বলিয়াই আলোচনার উপসংহার করিব। নাট্যকার তাঁহার নূতন পরিকল্পনার গূঢ় ইঙ্গিত-অনুসরণে ঘটনাবিন্যাস বা মানবিক উপাদানের আমূল রূপান্তর সাধন করেন নাই। তিনি চরিত্র-গুলির সক্রিয়তার একটু আধটু মাত্রাভেদ ঘটাইয়া তাঁহার নব তত্ত্বদৃষ্টিকে নাট্যরূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় সুরের পরিবর্তনে যে সমস্ত নাটকটিরই বহির্বিন্যাস ও অন্তঃপ্রকৃতিকে নূতন রূপবৃত্তে প্রমূর্ত করিতে হয়, এই কলাসত্য সম্বন্ধে তিনি বেশ অবহিত ছিলেন না। নূতন শাঁসকে তিনি পুরাতন খোলসেই আবদ্ধ করিতে চাহিয়াছেন। গানের মধ্যে যে গভীরতর ভাবব্যঞ্জনা নিঃশ্বসিত হইয়াছে তিনি তদুপযুক্ত শ্বাসকোষ গঠন করিতে পারেন নাই—আত্মার মাপে দেহ তৈয়ারী হয় নাই। উৎসবের উচ্ছলতার মধ্যে যে গৌণ আধ্যাত্মিকতা, ছেলেদের ও শিশুস্বভাব ব্যক্তিদের খেলাধূলার মধ্যে যে স্বভাবনির্লিপ্ততা আভাসিত হইয়াছিল তাহা রাজ-

সন্ন্যাসীর উপস্থিতিতে কিছুটা তত্ত্বঘনত্ব পাইলেও পুরাপুরি তত্ত্বনিষ্ঠ নাটকের নাট্যরূপবিকাশের পক্ষে যথেষ্ট নয়। প্রকৃতিসৌন্দর্য ও মানবের আনন্দ-লীলার মধ্যে তত্ত্বের যে আভাস আকাশ-বাতাসে লঘু সুবাসের ন্যায় সঞ্চরণশীল ছিল তাহাই যখন মূল নাট্যপ্রেরণারূপে দেখা দিল, তখন পূর্ব প্রতিবেশে তাহাকে কুলাইল না। সুতরাং পূর্বসংলাপ ও চরিত্র-সংঘাত, পূর্ব ভাবাশ্রয়ের পটভূমিকা নূতন উদ্দেশ্যসাধনের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী হয় নাই। প্রকৃতির মধ্যে তত্ত্বের ইঙ্গিত যত সহজে প্রবেশ করে, সচেতন তত্ত্বপ্রতিষ্ঠার ভাবদেহগঠনের সেইটুকু পর্যাপ্ত নয়। রাজসভাসদের আচরণে কখনও কখনও রাজমহিমার কিছু অংশ স্ফুরিত হইতে পারে, কিন্তু যেখানে রাজমহিমা পরিস্ফুট করাই মুখ্য বিষয় সেখানে সভাসদের বেশভূষা ও প্রকৃতিস্বরূপের মধ্যে নিগূঢ়তর ব্যঞ্জনা-শক্তির প্রয়োগ অপরিহার্য। ঠাকুরদাদা, বালকগণ, লক্ষেশ্বর, সোমপাল এমন কি রাজসন্ন্যাসী ও আনন্দের মধ্যে তত্ত্বচেতনার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু নূতন নাটকে ঠাকুরদাদা ও রাজা উভয়েই অনেকটা ম্লান ও নিষ্ক্রিয়। কবি তাঁহাদের হাত হইতে নিয়ন্ত্রণরশ্মি কাড়িয়া লইয়া নিজেই সর্বনিয়ন্তা রূপে অধিষ্ঠিত। আর তাঁহার নিবিড়, সর্বাত্মক ও অন্তরঙ্গ ঐশী অনুভূতি তাঁহার গানের মধ্যে নূতন ভাবচক্র রচনা করিয়াছে। এই সূক্ষ্ম, নিগূঢ় একাত্মতার জগতে স্বয়ং শারদলক্ষ্মীকেও কিছুটা অবান্তর ও নিশ্চিত গৌণ মনে হয়—এখন তাঁহার রূপ ভগবৎ-জ্যোতির বিচ্ছুরণ মাত্র। নূতন নাটকে ঠাকুরদাদা ও রাজার অপ্রধানত্ব ও কবিদৃষ্টির রসকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠা উহার নিগূঢ় প্রকৃতি-পরিবর্তনের অভ্রান্ত নিদর্শন। কেন্দ্রবিন্দুর স্থানান্তরে যে বৃত্তপরিধিরও অনিবার্য পরিবর্তন ঘটে ইহা শুধু জ্যামিতিক নয়, মানবিক সত্যও বটে।

দশম অধ্যায়

রাজা, অরূপরতন

১

'রাজা' (পৌষ ১৩১৭) ও উহার পরবর্তী রূপান্তর 'অরূপরতন' রবীন্দ্রনাথের সাঙ্কেতিক নাটকপর্যায়ের দ্বিতীয় উদাহরণ। 'রাজা' রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ সাঙ্কেতিক নাটক ও তত্ত্বদ্যোতনার নিগূঢ় নিবিড়তায় উহা বোধ হয় সমগ্র বিশ্ব-সাহিত্যে অতুলনীয়। অন্যান্য নাটকে যাহা কেন্দ্রীয় ঐশী-সত্তার ঈষৎ তাৎপর্য-আভাস, জ্যোতির্মণ্ডলবিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন আলোকরশ্মি এখানে তাহারই মূল রহস্যের সমগ্রদ্যোতনা। ভগবানের স্পর্শ আমরা মাঝে মধ্যে চকিত দীপ্তির ন্যায় অনুভব করি ও নাটকের মাধ্যমে এই আলো-আঁধারি ইঙ্গিতময়তাই আমাদের ভাবানুভূতি ও রসবোধকে তৃপ্ত করে। 'রাজা'-নাটকে কিন্তু ভগবৎ-স্বরূপের রসনির্যাস, তাঁহার গহন ও বিচিত্র প্রকাশের কেন্দ্রসত্য নাটকীয় সমগ্রতায় ও রূপ নির্মিতিতে নিবিড়ভাবে উপলব্ধ ও প্রত্যক্ষীকৃত। এখানে তত্ত্ব ও উহার অনুভবদ্যোতনা মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে ও নাটকের সংঘাত ও দ্বন্দ্বনিরসনের মধ্যে বিদ্যুৎশক্তিময় হইয়া উঠিয়াছে। পরমপুরুষের যে অনির্বচনীয়তা উপনিষদকারের বহুঘোষিত ও সর্বস্বীকৃত সত্য, যাহার স্বরূপনির্দেশের দুরূহতা স্বয়ং তত্ত্বদর্শী ঋষিদের বর্ণনাশক্তির অতীতরূপে নানা বিপরীতগুণের সমাবেশে কথঞ্চিৎ আভাসিত, রবীন্দ্রনাথ পৌরাণিক যুগের প্রতিমাকল্পনার সহজ পথ ছাড়িয়া ও ভগবৎ-তত্ত্বের অজ্ঞেয়তা পূর্ণমাত্রায় স্বীকার করিয়া অতি অপূর্বভাবে নাটকীয় রূপের মধ্যে সেই অসাধ্যসাধন সম্পন্ন করিয়াছেন। কাব্যে শব্দের ইন্দ্রজাল ও ছন্দের হিল্লোলের সাহায্যে একটি গূঢ় সঙ্কেতবহ ভাববৃত্ত উদ্বোধন করা অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু নাট্যকারের পক্ষে একটি প্রত্যক্ষ অবলম্বন অপরিহার্য। তাঁহাকে নাট্যকাহিনী, নাটকীয় চরিত্রসংঘাত ও কুশল তত্ত্বব্যঞ্জনা দ্বারা তত্ত্ববোধটি এমন নিবিড়ভাবে ফুটাইতে হইবে, যাহাতে একটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, বস্তুরসঘন অনুভূতি জীবনের বিচিত্র আবেদনপুষ্ট হইয়া অভিনয়সাহায্যে দর্শকের মনে জীবন্ত, আবেগঘন সত্যরূপে ফুটিয়া উঠে। সুতরাং নাট্যকারকে কবি অপেক্ষা দুরূহতর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে

হইবে ও তত্ত্বকে জীবনের নানা-অঙ্গবিন্যস্ত, ইন্দ্রিয়সমকায়বেদ্য রূপে দেখাইতে হইবে। আবহসৃষ্টিতে ও ব্যঞ্জনাউদ্দীপনে সূক্ষ্মতর কলাকৌশল ও রূপ-নির্মিতির পরিচয় দিতে হইবে। নাটকের এক পাদ তত্ত্বলোকে ও অপর পাদ বস্তুলোকে স্থাপন করিয়া উভয়ের সঙ্গতিবিধান করিতে হইবে, ও তত্ত্বের মধ্যে জীবনধর্মিতা সঞ্চার করিতে হইবে। 'রাজা' নাটকে রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি-প্রতিভার এই বিরল সমন্বয় সাধন করিয়াছেন।

এই নাটকে ভগবান আচরণে ও সংলাপে, রহস্যাবৃত অন্তর্বর্তিতা ও স্বরূপদ্যোতক প্রকাশ্যতার মিলনে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। তিনি একদিকে মুগ্ধ প্রেমিক, অপরদিকে নির্মম নিরপেক্ষ বিধাতার বিভিন্ন, অথচ সর্বসমন্বয়ী ভূমিকায় নিজ পরিচয় অনুভূতিগোচর করিয়াছেন। একদিকে তাঁহার বিশেষ প্রিয়পাত্র ও অনুগ্রহভাজন আছে অথচ সকলের নিকটই তিনি একই প্রত্যাশা করেন ও সমদর্শী রূপে প্রতিভাত হন। সুরঙ্গমা, ঠাকুরদাদা ও রাণী সুদর্শনার সহিত তাঁহার যোগ অতীব অন্তরঙ্গ, ইহারা বিশেষ সাধনাবলে ভগবানের অন্তর্লোকে প্রবেশাধিকারী। অপর সকলের সহিত তাঁহার যোগ চকিত আভাসে, বিচিত্র ইঙ্গিতময়তায়। তাহারা তাঁহার সত্তারহস্য সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি না করিয়াই মাঝে মধ্যে, কখনও জ্ঞাতসারে, কখন বা অজ্ঞাতসারে তাঁহার স্পর্শ অনুভব করে। ভগবানের নিখিল-ব্যাপ্ত অস্তিত্ব খণ্ডিত, অস্পষ্ট বিকার ও অপূর্ণতায় তাহাদের মনে ঈষৎ দিব্যলোকচেতনার ন্যায় বিরল মুহূর্তে সঞ্চারিত হয়। রবীন্দ্রনাথ এই নাটকে ভগবৎ-তত্ত্বের বিভিন্ন দিক নানা উপায়-বৈচিত্র্যের মাধ্যমে, নানা সংশয়-সন্দেহ-অস্বীকৃতিতে ধাঁধালাগান বিহ্বলতার ভিতর দিয়া স্ফুরিত করিয়াছেন। এই পরম রহস্য কাহিনীতে ও গানে, একাত্ম আত্মনিবেদনের নিবিড়তায় ও উদ্ধত বিদ্রোহের স্পর্ধিত প্রত্যাখানে, বিহ্বল অনিশ্চয়তায় ও অভিমান-ভরা বিশেষ অধিকারের দাবীতে, ভক্তের স্থির উপলব্ধিতে ও সংশয়বাদীর ভীরু সুবিধাসন্ধানে, তীব্রতম মনোবৃত্তির উত্তেজনায় ও অসাড় মনের ঔদাসীন্যে, এমন কি প্রাকৃত জনসাধারণের মূঢ় সংস্কার-উন্মত্ততায়, বসন্তোৎসবের প্রগল্‌ভ প্রমত্ততায় ও প্রেমের তৃপ্তিহীন অস্বস্তিতে—নানা দিক দিয়া, নানা পথে ভগবানের সত্তাসৌরভ আকাশ-বাতাসে ও মানবচিত্তে বিকীর্ণ হইয়াছে। সকলে মিলিয়া পরমপুরুষের একটি প্রাণময় বিগ্রহ এক অদৃশ্য মৃণালসূত্র হইতে বিকশিত রসসায়রের শতদল কমলের ন্যায় অপরূপ বর্ণে ও গন্ধে আত্ম-

উন্মোচন করিয়াছে। সমগ্র যুগের ধ্যানসাধনা ও দিব্যচেতনালালিত ভগবৎ-স্বরূপের সারনির্ধাস আর কোথাও এত নিগূঢ় মর্মানুভূতির সহিত ও পরিপূর্ণ প্রত্যয় রূপে সাহিত্যসৌন্দর্যের আধারে ধৃত হয় নাই।

২

'রাজা' নাটকটি বিশটি দৃশ্যে বিভক্ত হইয়া একটি নাটকীয়ভাবদ্বন্দ্বের শীর্ষ সমাধানে পৌঁছিয়া স্থির হইয়াছে। ইহার মূল সমস্যা হইল রাণী সুদর্শনার রূপ-মোহ ও একমাত্র উহারই মধ্যবর্তিতায় ঐশী উপলব্ধির মূঢ় আকৃতি। তাহার নিকট ভগবান্ কেবল প্রেমময় ও সৌন্দর্যস্বরূপ, সুতরাং সে তাঁহাকে অবিমিশ্র সৌন্দর্যসার রূপেই দেখিবার জন্য আগ্রহান্বিত ও ভগবানকে যে কেবল রূপ-চেতনার দ্বারাই অনুভব করা যায় সে সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয়। সে প্রিয়তমা মহিষীর অভিমানভরা অনুযোগের সহিত তাঁহাকে সুকুমার রূপজগতে প্রত্যক্ষ করিবার বিশেষ অধিকারের দাবী করে। কিন্তু ভগবান তাহাকে রূপানুভবের ছলনা সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া তাহাকে অপ্রত্যক্ষ, কেবল অন্তরের গহনে অনুভবগম্য এক অতীন্দ্রিয় সত্তারূপেই তাঁহার সহিত মিলনসাধনার উপদেশ দেন। তাহার মুখ্য পরিচারিকা সুরঙ্গমা অনুতাপ ও ভয়াবহ শাস্তি-সংশোধনের মধ্য দিয়াই ভগবৎ-তত্ত্বদর্শিতায় আরূঢ় হইয়াছে। সেই তাহার অভ্রান্ত অনুভবশক্তির বলে ভগবানের আবির্ভাব ও রহস্যময় স্বরূপের মর্ম-উদ্ঘাটন করিতে পারে ও সেই সুদর্শনার সঙ্গে প্রেমিক ভগবানের মিলনদূতী। সুরঙ্গমা দাস্যসাধনায় সিদ্ধ ও সর্ব অবস্থায় তাঁহার অভিপ্রায়ের নিকট অভিমান-হীন হইয়া একান্তভাবে আত্মনিবেদনশীল। আর যে দ্বিতীয় ব্যক্তি ভগবৎ-ইচ্ছার বাহন ও সর্বতোভাবে তাঁহার প্রতি সমর্পিতচিত্ত, সে সখ্য-সাধনায় সিদ্ধ উৎসবপাগল ঠাকুরদাদা। ঠাকুরদাদাই ভগবানের গণসংযোগ-অধিকারিক ও প্রাকৃত জনসাধারণের নিকট তাঁহার স্বরূপতত্ত্বব্যাখ্যাতা। ঠাকুরদাদা সমস্ত ঋতু-উৎসবে অধিনায়কত্ব করিয়া ভগবানের আনন্দময় সত্তার আভাস জনচিত্তে সঞ্চার করে ও সমস্ত প্রাকৃত আনন্দের ধারা যে শেষ পর্যন্ত পরমানন্দ-তীর্থসঙ্গমে স্রোত মিশায় তাহা উপদেশ ও দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রতিষ্ঠা করে। এই দুইজন বিশেষ তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিই কিন্তু ভগবানের স্বরূপনির্দেশে অক্ষম। তাহারা নিগূঢ়ভাবে ভগবৎ-বার্তা অনুভব করে, কিন্তু রহস্যভেদে অপারগ। তাহাদের প্রভু ও সখা তাঁহার উদ্দেশ্যের যতটুকু প্রত্যয় তাহাদের মধ্যে

সঞ্চারিত করেন তাহাই তাহারা ব্যক্ত করে, কিন্তু তাঁহার অন্তর্লোক তাহাদের অজানা। তাহারা নকীব ও দূতের কাজ করে, কিন্তু ঐশী-স্বরূপের মন্ত্রণাকক্ষে তাহাদের কোন প্রবেশাধিকার নাই। এই ভূমিকা-পরিচয়কে আশ্রয় করিয়াই নাটকের সূত্রপাত।

প্রথম দৃশ্যে মনের গহন অন্ধকার কক্ষে, দুর্ভেদ্য রহস্যের যবনিকান্তরালে রাজার সহিত সুদর্শনার মিলন ও উহাদের মধ্যে ভাববিনিময়। সুরঙ্গমা এই মিলনে মধ্যবর্তিনীর কাজ করিয়াছে। সেই রাজার প্রকৃত-পরিচয় সুদর্শনাকে প্রথম শোনাইয়াছে, তাহার রূপকৌতূহলকে তিরস্কার করিয়াছে ও নিজ অভিজ্ঞতা বিবৃত করিয়া তাহার ভ্রান্ত ধারণা-অপনোদনের প্রয়াস পাইয়াছে। রাজা যখন সেই অন্ধকার মিলনকক্ষের দ্বারে করাঘাত করিয়াছেন, তখনই সেই ধ্বনি প্রথম তাহার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে ও সেই দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছে। ইহার পর রাজা ও রাণীর মধ্যে বিশ্রম্ভালাপ; রাণী প্রত্যক্ষ রূপজগতে তাঁহার দর্শনের জন্য আকূতি জানাইয়াছে ও রাজা, তিনি যে কোন বিশেষ মূর্তির মধ্যে তাঁহার বিশ্বব্যাপী ও বিচিত্রমুখী অস্তিত্ব সংকোচন করিতে অনিচ্ছুক ও এই সীমাবদ্ধতার মধ্যে তাঁহার অসীম সত্তার যে যথার্থ পরিচয় বিকৃত হইবে, তাহা বুঝাইয়াছেন। রাজা ও রাণী, ভগবান ও ভক্তের মধ্যে মতবিভেদের মৃদু ঘাত-প্রতিঘাত একদিকে তাঁহাদের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে নাটকীয় আবেগ সঞ্চার করিয়াছে, অন্যদিকে তত্ত্বের শুষ্ক কঙ্কালকে অপূর্ব কাব্যদ্যোতনাময় চমৎকারিত্ব দিয়াছে। উহার ভাবতাৎপর্যটি যেমন তত্ত্বনিষ্ঠ, তেমনি কাব্যরমণীয়তামণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। সুদর্শনা রাজার রূপকল্পনা করে প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য-সম্ভারের মধ্যে, রাজা সুদর্শনাকে অনুভব করেন যুগযুগান্তরব্যাপী সাধনা-ধারা ও রূপ-বিকাশের মধুরতম পরিণতি রূপে। মানুষ ও ভগবান্ পরস্পরের মনোদর্পণে পরস্পরের যে আদর্শ প্রতিবিম্বিত দেখেন তাহা যেমন অপরূপ তেমনি অবর্ণনীয়—উহার মধ্যে উভয়েরই ছায়া-প্রতিচ্ছায়ার যুগ্ম মাধুর্য দীপ্তি মিলাইয়াছে। শেষ পর্যন্ত রাজা আগামী বসন্তোৎসবের মধ্যে নিজ প্রত্যক্ষ আবির্ভাবের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, তবে সুদর্শনার উপরেই তাঁহাকে চিনিবার ভার ন্যস্ত করিয়াছেন। অন্তর্ধানের অব্যবহিত পূর্বে তিনি সুরঙ্গমাকে দাসীর বেশ ত্যাগ করিয়া উৎসবসজ্জায় সজ্জিত হইবার নির্দেশ দিয়াছেন—উৎসবের প্লাবনে সমস্ত সাধনাক্রমের পার্থক্য আনন্দের এক প্রবল

উচ্ছ্বাসে যেন ধুইয়া মুছিয়া যায় ইহাই তাঁহার নিগূঢ় সঙ্কেত। এই দৃশ্যে তিনটি গান—একটি প্রত্যুদ্গমনের জন্য প্রতীক্ষমাণ স্বয়ং রাজার মুখে ও অপর দুইটি তাঁহার সর্বশক্তিমত্তা ও অনন্যনির্ভরতার অকুণ্ঠ স্বীকৃতিস্বরূপ ও রূপাকর্ষণের বঞ্চনাময়তার অভিব্যক্তিরূপে সুরঙ্গমার মুখে আরোপিত হইয়াছে। তিনটি গানই কাব্যাংশে শ্রেষ্ঠ ও নাটকীয় ঘটনার মর্মদ্যোতনায় সার্থক।

দ্বিতীয় দৃশ্যে বসন্তউৎসবে নানা দেশ হইতে প্রমোদ-উৎসুক জনতার ও নাগরিকবৃন্দের ভিড় ও রাজা সম্বন্ধে তাহাদের প্রত্যয়-পার্থক্যের সঙ্কেতসূত্র আভাসিত। বিদেশী অভ্যাগত ও স্থানীয় নাগরিক সকলেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে সমবেত হইয়াছে ও চটুল সংলাপ ও সরস বাদানুবাদের মাধ্যমে জনতার খেয়ালি মেজাজ ও স্বভাবের ছোটখাট বৈষম্য ব্যক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে রাজার প্রকৃতি-রহস্য সম্বন্ধে তাহাদের কৌতুকজনক অনুমানের তত্ত্বপিচকারী-উৎক্ষিপ্ত লঘু শীকরধারা দোলের আবিরের প্রমত্ত নৃত্যের সহিত মিলাইয়া বর্ষণ করিয়াছে। এই জনসংঘের মধ্যে কেহ রাজার প্রত্যক্ষদর্শনের অভাবকে অরাজকতার নিশ্চিত লক্ষণ বলিয়া মনে করে। কেহ বা নিজ মানসআদর্শের প্রতিচ্ছবিরূপে রাজাকে কুরূপ ও কুৎসিত কল্পনা করিয়া আমোদ পায়। কেহ কেহ বা মতবাহুল্যে বিভ্রান্ত হইয়া সত্যনিরূপণের জন্য ঠাকুরদাদার নির্দেশ খোঁজে ও তাহাকে পরম আশ্রয়রূপে ভগবানের আসনে বসাইয়া তাহার নির্দেশকেই চূড়ান্ত মর্যাদা দেয়। এই জনকোলাহল ও তাহাদের উৎসবমত্ততা বায়ুতাড়িত নদীজলের স্রোতোচাঞ্চল্য ও সূর্যকিরণদীপ্ত চূর্ণতরঙ্গের নৃত্যহিল্লোলের সাদৃশ্য মনে পড়াইয়া দেয়। ইহারই মধ্যে ঠাকুরদাদা উৎসবনেতারূপে ঋতুর সঙ্গে ছন্দ মিলাইয়া প্রথম বালক-দল ও তাহার পর বাউলদলের সহিত গানে ও নাচে সমস্ত আমোদ-প্রমোদের অন্তর্নিহিত তত্ত্বকেন্দ্রের অভিমুখে এই উতলা উচ্ছ্বাসকে পরিচালনা করে। বালকদল বসন্ত-আবাহনের মাধ্যমে চিরনবীনের আবির্ভাবকে অভিনন্দন জানায়, বাউলেরা বাঁধাধরা পথের অনধিগম্য নিগূঢ় হৃদয়ানুভূতির সৌরভে মনের মানুষের মধুচক্রের খোঁজ পায় ও ঠাকুরদাদা নিজে সংসার-বিধাতার আত্মসংহরণের মধ্যে মানব-স্বাধীনতার মর্যাদা-আরোপের যে প্রচ্ছন্ন অভিপ্রায় আছে তাহা উদ্ঘাটিত করে। একদল আবার ভগবানের নর্মসখারূপে ঠাকুরদাদারই মুক্ত সদানন্দময় স্বভাবকে আমাদের নিকট পরিচিত করে।

এই প্রমত্ত জনবুদ্বুদস্ফীতির মধ্যে কিন্তু একটি গোপনচারী গভীর অন্তঃপ্রবাহের জোয়ার অনুভূত হয়। প্রথমতঃ রাজার অদৃশ্যতার সুযোগ লইয়া একজন মেকী রাজা রাজকীয় আড়ম্বর ও শোভাযাত্রার সহিত আত্মঘোষণা করে। রাজদর্শনে উৎসুক, আত্মসার্থকতা-অন্বেষী সুবিধাবাদী কিছু কিছু লোক তৎক্ষণাৎ এই ছদ্মরাজার প্রতি ভক্তির আতিশয্য দেখাইয়া তাহার প্রসাদ-যাচ্ঞা করে। একজন মাত্র লোক রাজপরিচয়ে সম্পূর্ণ নিঃসংশয় না হইতে পারিয়া ঠাকুরদাদার তত্ত্বদর্শিতার নিকট সত্য যাচাই-এর প্রার্থনা জানায়, ও ঠাকুরদাদার সন্দেহনিরসনের মধ্যে আসল রাজার প্রকৃত তত্ত্বপরিচয় খানিকটা সুপরিস্ফুট হয়। যিনি বিশ্বরাজ তিনি পার্থিব রাজন্যবৃন্দের মত শক্তি ও ঐশ্বর্যের আস্ফালন করেন না, ঐশ্বর্যছটায় মুগ্ধদৃষ্টি স্তাবকের প্রসাদলোলুপ আনুগত্যের অঞ্জলি-কামনা তাঁহার স্বভাববিরোধী। পাগলের একটি গানে এই দৃশ্যের উপসংহার ঘটিয়াছে। এই গানটি প্রথম দৃশ্যের সুরঙ্গমা-গীত সমাপ্তিগানের সহিত মনোভাবে এক, কিন্তু তাৎপর্যে বিপরীত। প্রথমোক্ত গানে যে বহির্মুখী, সদাচঞ্চল রূপাকর্ষণ ভগবৎ-সাধনার বিরোধী রূপে দেখান হইয়াছিল, পাগলের গানে সেই স্বর্ণমৃগের অনুসরণ, সেই উদাস, উতলা ভাবের আসক্তিহীনতা, মনের সেই স্বচ্ছন্দভ্রমণ ও বহির্নিরপেক্ষতা ভগবৎ-সাধনার অনুকূলরূপে নব ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত হইয়াছে। মনে হয় ঠাকুরদাদার স্বভাব-নির্লিপ্ততার মর্মবাণীটিই এই গানে আভাসিত।

তৃতীয় দৃশ্যে একদিকে উৎসবের কেন্দ্র-পরিণতি ও অপরদিকে রাজনৈতিক জটিলতাজালের ব্যাপ্তি ও নবসূত্রসংযোজনা। প্রথমে উৎসবের ধারারই অনুসরণ করা যাইতে পারে। এই দৃশ্যে ঠাকুরদাদার উৎসবক্ষেত্রের প্রত্যন্ত প্রদেশ অতিক্রম করিয়া উহার মর্মকেন্দ্রে, কুঞ্জবনের দ্বারদেশে পৌছিয়া উৎসবরাজের আমন্ত্রণ-প্রতীক্ষা—প্রিয়মিলনের শেষ বাধা-অপসারণের প্রস্তুতি। ঠাকুরদাদার স্বয়ং-গীত গানে (আজি কমল মুকুলদল খুলিল) প্রাকৃত নৃত্যগীতাত্মক হর্ষোচ্ছ্বাসের এক নিগূঢ়তর অপ্রাকৃত আনন্দরসে উত্তরণের, ছোট ছোট শাখানদীর তরঙ্গে গা ভাসাইয়া এক মহানন্দসঙ্গমে অবতীর্ণ হওয়ার চরম সার্থকতার ইঙ্গিতটি সূচিত। অন্যান্য নাচগানের দলগুলিও ক্রমে কুঞ্জবনের তোরণদ্বারে সমবেত হইল। ইতিমধ্যে নারী-বাহিনীও উৎসবতরঙ্গতাড়িত হইয়া সেই দ্বারেই হাজির ও ঠাকুরদাদার সঙ্গে

রসালাপের মাধ্যমে তাহাদের নিকট তাহার অন্তরের আরও ঘনিষ্ঠ পরিচয়-উদ্‌ঘাটন। এই সংক্ষিপ্ত দৃশ্যে ঠাকুরদাদার নির্দিষ্ট স্থান বাহির মহল পার হইয়া অন্দর মহলের ঠিক প্রবেশদ্বারে। এখনও আনন্দসঞ্চয়ের মর্মকোষে গুঞ্জনরত ভ্রমরের প্রবেশের সময় হয় নাই—এখনও শেষ যবনিকা বিদীর্ণ হইবার প্রতীক্ষায় স্তব্ধ। ইহাতে ঠাকুরদাদার ভূমিকাটি মুখ্যতঃ উৎসব-প্রমত্ততার নেশাকে এক চরম পরিণতির দিকে আগাইয়া দেওয়ার উদ্যমে, একটা সর্বত্যাগী মনের পরম প্রাপ্তির আবেশময়তায়, সমগ্র জীবনমৃত্যু, সমগ্র সৃষ্টি-প্রলয়, সমস্ত বিপরীতমুখী বিশ্বগতির উত্তাল ছন্দের সহিত ক্ষুদ্র সমষ্টিগত মানবজীবনের মিলনসাধনে। গৌণতঃ ইহা তত্ত্বব্যাখ্যার রূপই লইয়াছে। নাগরিকবৃন্দের সহিত সংলাপে ঠাকুরদাদার নিজ ভক্তি-সমর্পণের একনিষ্ঠতা ফুটিয়াছে, তাহার শোক-দুঃখ-দুর্ঘটনার মধ্যে অবিচলিত ভগবৎ প্রত্যায়ের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে ও শেষ গানে (বসন্তে কি শুধু কেবল) প্রমোদের অন্তর্নিহিত গভীরতর সুরটি ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। বসন্তের উৎসবঅর্ঘ্য যে কেবল ফোটা ফুলে নয়, ঝরা পাতাতেও রচিত-হয়, ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে মণিমুক্তা ও মৃত্তিকাস্তূপের যে সমান স্থান আছে, সুবোধ ও অবোধ সব রকম লোকেই যে তাঁহাকে পূজা নিবেদনের অধিকারী, এই তত্ত্বসত্যটিই অভিব্যক্তি পাইয়াছে। এই সমাপ্তিগীতটিতে উচ্ছল-চটুল, বিহ্বল, আত্মবিস্মৃত মাদকতার মধ্যে যে আসন্ন ট্রাজেডির সুরটি প্রচ্ছন্ন আছে, ঘটনা যে হাসিগান-খেলাধূলার মধ্যে একটি অনাগত সমস্যাজটিলতার গ্রন্থিগুরে প্রবেশোন্মুখ তাহারই সার্থক পূর্বাভাস মিলিয়াছে।

রাজনৈতিক ধারার দুইটি অন্তর্ঘাত ও বহির্ঘাতের শাখা একটি বিক্ষুব্ধ ঘূর্ণাবর্তে স্রোত মিশাইয়াছে। বসন্তোৎসবের আমন্ত্রণে প্রতিবেশী রাজ্যের সাতজন রাজা অতিথিরূপে আসিয়া আততায়ীরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা চতুর ও দৃঢ়মনা কাঞ্চীরাজ সহজেই মেকী-রাজার অন্তঃসারশূন্যতা ধরিয়া ফেলিয়াছে ও তাহাকে শিখণ্ডী খাড়া করিয়া ও তাহার রাজসহযোগীদের চলচ্চিত্ততার সুযোগ লইয়া মহিষী সুদর্শনাকে অঙ্কশায়িনীরূপে লাভ করিবার দুঃসাহস পোষণ করিয়াছে। নাটকের রূপকার্থে মহিষীকে অপহরণ, ঈশ্বরের প্রেয়সী-পদের জন্য প্রেমসাধনারত তাঁহারই দ্বিতীয় সত্তাকে তাঁহার হৃদয় হইতে উৎসাদনই সৃষ্টিমূলনিহিত অদৃশ্য ধর্মরাজ্যনিয়ন্তাকে মর্মান্তিক বেদনা দিবার শ্রেষ্ঠ উপায়। ভগবদভিপ্রায়কে

বিধ্বস্ত করিয়াই ঈশ্বরবিদ্রোহী ঐশী মহিমাকে নিদারুণ আঘাত হানে। শঠ, ছদ্মবেশী ছলনার অন্তরাল হইতেই প্রকাশ্য ঔদ্ধত্যের বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন করা যথার্থ রণকৌশল। তাই সুবর্ণকে ক্রীড়নকরূপে ব্যবহার করিয়াই নীতিহীন অশুভশক্তির প্রতীক্ কাঞ্চীরাজ প্রেমরাজ্যে বিপ্লব বাধাইল। বসন্তোৎসবের আনন্দমিলনে কূটকৌশল ও পশুবলের শয়তান অনুপ্রবেশ করিল। এই সর্বাত্মক ইডেন উদ্যানে সর্পপ্রবেশের ন্যায় অধ্যাত্ম-নৈরাজ্য-সৃষ্টির বীজ এই ভাবেই রোপিত হইল। নাট্যকার তাঁহার রূপক-অভিপ্রায়ের সহজেই-অনুমেয় অর্থসীমায় আবদ্ধ না থাকিয়া, তাঁহার কল্পনার মুক্ত প্রসারের উদার আবহে তাঁহার এই অপূর্ব উদ্ভাবনাকে জীবনধর্মী ও নাট্যাবেগচঞ্চল করিয়া তুলিয়াছেন। নাটকপাঠের সময় আমরা এই অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের প্রতি সচেতন না থাকিয়া এক রোমাঞ্চকর ঘটনা-সংঘাতের স্রোতে অনিবার্যভাবে ভাসিয়া যাই।

এই উৎসবনদীর তরঙ্গলীলা অষ্টম দৃশ্য পর্যন্ত বিচিত্র ভাবপরিণতির বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করিয়া প্রসারিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে চতুর্থ দৃশ্যে রাণী সুদর্শনার উৎসবমত্ততার সংক্রামকতায় উদ্‌ভ্রান্তি ও রূপমোহের নিকট আত্মসমর্পণ। এই সার্বভৌম রসোচ্ছলতার ছোঁয়াচে তাহার প্রেমব্যাকুলতা উদ্বেল হইয়া শুভবুদ্ধি হারাইয়াছে ও সে রূপের নেশায় সুবর্ণকেই রাজা বলিয়া ভুল করিয়া তাহারই নিকট মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছে। রাজাব পরীক্ষায় যে শোচনীয়রূপে হারিয়াছে। ঋতুরাজের মানবিক প্রতিরূপ কিশোর গায়কদের গানের ভাব ও সুর পূর্ণিমার জ্যোৎস্না-মদিরার সহিত মিশিয়া তাহার শিরায় শিরায় মাদকতা সঞ্চার করিয়াছে ও তাহার মানস উদ্‌ভ্রান্তিকে অসংবরণীয় করিয়া তুলিয়াছে। এই সঙ্কট-মুহূর্তে স্বচ্ছদৃষ্টি সুরঙ্গমার পরিবর্তে প্রাকৃতবুদ্ধির প্রতীক্ রোহিণী তাহার দূতীগিরিতে নিয়োজিত হইয়াছে ও এক রূপমরীচিকার নিকট তাহার প্রণয়-নিবেদনের বাহন হইয়াছে। অন্তরের দুর্বলতা ও বিভ্রান্তি পরপুরুষের লুব্ধ কামনাকে বলাৎকারের প্রশ্রয় দিয়াছে। রূপমোহ রাণীর অন্তরে যে সুড়ঙ্গ খুঁড়িয়াছে তাহাই কাঞ্চীরাজের ধর্ষণ-অভিযানের রাজদ্বারকে উন্মুক্ত করিয়াছে। রূপের গলায় সমর্পিত বরমাল্য অপমানের শৃঙ্খল হইয়া তাহার কণ্ঠে ফিরিয়া আসিয়াছে। এই কর্তব্যনির্ণয়ের অনিশ্চয়তা তাহার মনে যে ক্ষীণ অনুতাপের বাষ্পসঞ্চার করিয়াছে তাহার সগুফল অভিমানের মেঘে

ঘনীভূত হইয়া তাহার চিত্তাকাশকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। এই দৃশ্যটি সুনিপুণ মনস্তত্ত্ববিদের দ্বারা পরিকল্পিত ও নিখুঁত কলাকুশলতার সহিত রূপায়িত।

পঞ্চম দৃশ্যে আনন্দোৎসবের শীর্ষবিন্দুউৎক্রান্তি ঘোষিত। উৎসবের নৃত্যগীত শেষ পর্যন্ত সুর চড়াইতে চড়াইতে অনুরাগরঞ্জিত হোলিখেলার উন্মত্ততায় পৌঁছিয়াছে। এই অ-পৌরাণিক দোললীলায় ভগবান ও ভক্ত উভয়েই আবীরে লাল হইয়া উঠিয়াছে ও উচ্ছ্বাসের প্রগল্‌ভ মত্ততায় চরাচর ও চরাচরের স্বামী, নিখিল বিশ্ব ও বিশ্বনিয়ন্তা সমস্ত ভেদ ভুলিয়া একই মঞ্চে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। ঠাকুরদাদার উৎসব নেতৃত্ব এই শীর্ষবিন্দুতে, এই অভেদাত্মক একত্ব-প্রত্যয়ে উন্নীত হইয়া চরম সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। সে গোপনে তাহার অনুচরগণকে জাগাইয়াছে যে স্বয়ং উৎসবরাজ তাহাদের সঙ্গে খেলায় মাতিয়াছেন। তাঁহার শুভ্র নিরঞ্জনতা এই নিখিলব্যাপী কুঙ্কুমবর্ষণে অনুরঞ্জিত হইয়াছে ও তাঁহার মানসপদ্মটি রক্তকমলের রূপ ধারণ করিয়া এই স্রোতোবেগে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। 'যা ছিল কালো ধলো' গানটি এই সৃষ্টিব্যাপ্ত আনন্দযজ্ঞের পূর্ণাহুতি। নারীর দল ও নাচের দলও এই মত্ততার আবেশে দিশাহারা হইয়াছে। এই তাণ্ডবের অবসানে সুরঙ্গমা ও ঠাকুরদাদা—ভগবৎসাধনার দুই শ্রেষ্ঠ বিগ্রহ নির্জন আত্মসমীক্ষায় পরস্পরের মধ্যে বার্তাবিনিময় করিয়াছে ও প্রমোদোদ্যানের অন্দরমহলে, অনুভূতির গহনতম কেন্দ্রে প্রবেশোন্মুখ হইয়াছে। সুরঙ্গমার অন্তরতম মনে এক আসন্ন বিপর্যয়ের অশুভ সঙ্কেত ছায়াপাত করিয়াছে ও ঠাকুরদাদাও ঠিক প্রবেশের মুখে কাঞ্চীরাজের দ্বারা বন্দী হইয়া নূতন পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছে। 'পুষ্প ফোটে কোন্ কুঞ্জবনে' গানটিতে ভগবানের অন্তরঙ্গজনের কাছে তাঁহার সত্তার নিগূঢ় সৌরভের নির্জন উৎসের সংবাদ কোন অদৃশ্যপথে তাহার অনুভূতিতে আসিয়া পৌঁছে, বসন্তবায়ুর মাদকতা ও ফাল্গুনপুষ্পোৎসবের বহিরাবরণ ভেদ করিয়া উহাদের অন্তরপ্রেরণার গোপন বার্তা সঞ্চারিত হয় তাহারই সঙ্কেত ব্যঞ্জিত।

৩

প্রমোদ-উদ্যানের আর একটি বিরলপথিক অংশে এইবার নাটকের দৃশ্য পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ইহা রাণীর প্রাসাদে পৌঁছিবার পথ, রাজার খাসমহলের অব্যবহিত সন্নিহিত। এই অন্তঃপুরসংলগ্ন পুষ্পবাটিকা

রাজার চিড়িয়াখানা, তাঁহার আদরের পোষমানা প্রাণীদের বিশ্রব্ধ আশ্রয়। ইহাদের সহিত ভগবানের সহজ সংস্কারগত যোগ। আসন্ন ঝটিকার পূর্বলক্ষণ এখানেই প্রথম প্রকটিত হইয়াছে—অবোধ জন্তুদের সংস্কারশাসিত অন্তরে এই সর্বনাশের পদধ্বনি এক মানবচেতনাতীত ভীতিবিহ্বলতার অস্ফুট শিহরণ জাগাইয়াছে। যাহারা ভগবানের নিত্যসেবার অর্ঘ্যরচয়িতা, তাঁহার পূজার ফুলের লালন ও মাল্যগ্রন্থন করে, তাহাদেরই অবচেতন মনে বিপদ-সঙ্কেতের প্রথম বার্তা পৌঁছিয়াছে। কাহারও অদৃশ্য নির্দেশে তাহারা কলুষস্পর্শদূষিত ভগবানের এই প্রিয় লীলাকুঞ্জ ছাড়িয়া নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটিয়াছে। রাণীর পরিচারিকা রোহিণী, যে রাণীর রূপবিভ্রমের অশুচি উপহার তাহার কামনালুব্ধ রাজন্যবর্গের নিকট পৌঁছাইয়া দিবার কাজে মধ্যবর্তিনী হইয়াছিল, এই অতর্কিত বিভীষিকা-উপলব্ধিতে হতবুদ্ধি হইয়াছে। সর্বনাশের দ্বিতীয় লক্ষণ আততায়ী নৃপতিদের মধ্যে পারস্পরিক সংশয়-সন্দেহের উদয়, তাহাদের সহযোগিতার বন্ধনচ্ছেদন। এই বিপর্যয়ে রোহিণী উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া আসল রাজার শরণ মাগিয়াছে। পশুশালার প্রাণীদের এই অনভ্যস্ত ভয়ত্রস্ততার চিত্র, পাখীদের নিদ্রাসুকোমল নীড় ছাড়িয়া ব্যাকুল পলায়ন, জ্যোৎস্নাপ্রশান্ত দিগন্তের চোখে উদ্‌ভ্রান্ত রক্তদৃষ্টি সবই আশ্চর্য কুশলতার সহিত প্রলয়সঙ্কেতের বাণী বহন করিয়া এক অপরূপ আবহসঙ্গতিসৃষ্টিতে নিয়োজিত হইয়াছে।

সপ্তম দৃশ্যে ভগবৎদ্রোহী মুখ্য সহযোগিদ্বয়—আত্মপ্রত্যয়মত্ত কাঞ্চীরাজ ও ভণ্ড প্রতারক রাজবেশী—উভয়েরই মুখোস খুলিয়াছে। রাজমর্যাদা-লোলুপ, ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাক সুবর্ণ সুদর্শনার সামনেই তাহার জুয়াচুরি স্বীকার করিয়াছে। চরম সঙ্কটমুহূর্তে মেকী রাজা নিজ ছলনার মুকুট ধূলায় ফেলিয়া আসল রাজার শরণাপন্ন হইয়াছে। কাঞ্চীরাজের অন্তরের প্রতিক্রিয়া অহংকারের লৌহকঠিন সংযমে বহিঃপ্রকাশরুদ্ধ, শুধু অনুভব-অনুমেয়। সে এই অবিচলিত নীরবতার দ্বারা স্বয়ং ঈশ্বরের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে আত্মমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শুভশক্তির পরাকাষ্ঠার ন্যায় অশুভশক্তির পরাকাষ্ঠারও যে একটা প্রহেলিকাধর্মী আত্মনির্ভরতা আছে, পূর্ণিমার মত অমাবস্যারও যে একটা নিজস্ব মহিমা আছে, ভগবৎদ্রোহ যে ভগবদ্‌ভক্তিরই একটা ছদ্মবেশ, এই গূঢ় সত্য যেমন আমাদের পুরাণে স্বীকৃত, তেমনি রাজার নিজের প্রসন্ন অনুমোদনের দ্বারাও সমর্থিত।

এতক্ষণ পরে, অগ্নিবলয় হইতে দৈবপ্রসাদে উদ্ধারের পরে সেই পরিচিত অন্ধকার কক্ষে সুদর্শনা ও রাজার পুনঃসাক্ষাৎ। সুদর্শনা এবার রাজাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছে তাঁহার সর্বনাশা বহ্নিদীপ্ত রূপে—তাহার আকাঙ্ক্ষিত রূপসৌকুমার্য ও পুষ্পপেলবতার সম্পূর্ণ বিপরীত মূর্তিতে। রাজা সুদর্শনার চোখে ধূমকেতুর মত করাল, ঝড়ের মেঘের মত ভয়ঙ্কর, ও বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের উপর সন্ধ্যাব রক্তিম ছটার ন্যায় দুঃসহরূপে প্রতিভাত হইয়াছেন। রাজার প্রেমস্নিগ্ধ প্রকৃতি অবশ্য অপরিবর্তিত। রাণীর অবিশ্বাসিতা, তাহার মানস-প্রস্তুতির অভাব, তাহার সত্যগ্রহণে অক্ষমতা সবই তিনি ক্ষমার উদার চক্ষে দেখিয়াছেন ও এসবই ভগবানেরই গূঢ়ইচ্ছাপ্রসূত বলিয়া জানাইয়াছেন। কিন্তু রাণী এখনও রাজার মিলনের জন্য যোগ্য হন নাই। যে আগুন বাহিরে নির্বাপিত তাহা অভিমানের শিখায় প্রবলতরভাবে অন্তরে প্রজ্বলিত। তাহার রূপমোহের আত্ম-অহমিকা চূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু এই ভগ্নস্তূপের উপর অভিমান নিজ আকাশস্পর্শী দুর্গ নির্মাণ করিয়াছে। এই বহ্নিজ্বালা এখনও অনুতাপের কল্যাণপরিণামী শিখায় স্থির হয় নাই—ইহা উন্মত্ত সর্বগ্রাসী উল্কার মত যাহা কিছু শুভ তাহাকে নির্বিচারে ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছে। নিজ ভুলের গ্লানি সে রাজার উপর চাপাইয়াছে ও নিজের নির্বুদ্ধিতার ফলস্বরূপ রাজার প্রতি তাহার বিমুখতা অসহনীয় বিরাগের পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে। এমন কি সে সুরঙ্গমার সান্নিধ্যও সহ্য করিতে অক্ষম। শূলবিদ্ধ বৃশ্চিকের ন্যায় সে আত্মপুচ্ছদংশনেই নিজ অক্ষম রোষের আগুন ছড়াইয়াছে। সে আত্মঘাতী মূঢ়তায় আত্মপীড়নে নিজ সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করিয়াছে ও স্পর্ধিত ঘোষণার সহিত তাহার প্রিয়তমকে চির-প্রত্যাখ্যান জানাইয়াছে। তথাপি সুরঙ্গমার স্বচ্ছ দৃষ্টি এই প্রলয়মত্ততার রমণীয় উপসংহারপর্ব প্রত্যক্ষ করিয়াছে ও সে রাজার চিরপ্রেমিকা সত্তার আশ্বাসদীপস্বরূপ এই অন্ধকারমজ্জিত কিন্তু পরিণামে আলোকধন্য মানবাত্মাটির অনুগমন করিয়াছে। এই দৃশ্যে রাজার একটি গান (আমি রূপে তোমায় ভোলাব না) ও সুরঙ্গমার দুইটি গান (ভয়েরে মোর আঘাত করো ও আমি তোমার প্রেমে হব সবার কলঙ্কভাগী) এই অগ্নিজ্বালাময় দৃশ্যটির মর্মনিঃশ্বাসটি কুহরিত করিয়াছে। ইহাতে রবীন্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠ নাটকীয় শক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

৪

সুদর্শনার পিতৃগৃহপ্রয়াণের সহিত নাট্যঘটনা জটিলতার একটি নূতন স্তরে প্রবেশ করিয়াছে। তাহার পিতৃগৃহে অভ্যর্থনা স্বামিত্যাগিনী কন্যার ন্যায়ই বিরূপ হইয়াছে। তাহার মনোরাজ্যে একটি নব আলোড়ন দেখা দিয়াছে। দয়িতের সহিত বিচ্ছেদের পর সে মনের গভীরে একটি মান-ভাঙানো বিশেষ আদর প্রত্যাশা করিতেছিল। হয়ত রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা হইতে এই অভিমানতত্ত্ব তাহার মনে স্ফুরিত হইয়াছিল। প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত নায়িকার মত সেও মনে মনে তাহার প্রেমাস্পদের নিকট হইতে একটি সোহাগভরা অনুনয়—প্রসাদভিক্ষার গোপন আশায় উৎফুল্ল হইতেছিল। কিন্তু এই প্রেমিক রাজা বৃন্দাবনলীলার প্রত্যক্ষ অনুসরণকারী নহেন—তিনি মাথুরবিরহের নায়ক শ্রীকৃষ্ণের মত অমোঘ নীতিশক্তিতে দৃঢ়। তিনি ভিতর হইতে অনুতাপ জাগাইয়া পাষাণ হৃদয়কে বিচলিত করেন। তাঁহার প্রত্যক্ষ অনুনয়ের দ্বারা তিনি চিত্তশুদ্ধিক্রিয়াকে খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ রাখেন না। সুদর্শনা ও সুরঙ্গমার মধ্যে সংলাপে তাঁহার এই অস্খলিতনিয়মানুবর্তী দৃঢ় অনমনীয়তাই উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। তাঁহার প্রেমের স্বর্ণ কোন প্রশ্রয়ের খাদে উহার নির্মলতাকে হ্রাস করে না। আর অপদার্থ রূপবান সুবর্ণের স্মৃতি রাণীর মন হইতে এখনও নিঃশেষিত হয় নাই—তাহার চিত্ত এখনও বাহিরের রূপচ্ছটায় পতঙ্গবৎ প্রলুব্ধ। এই রূপ-প্রত্যক্ষতার মাধ্যমে তাহার অসীম প্রেমিককে দেখিবার দুর্বলতা তাহাকে প্রশ্রয়-কাঙাল করিয়াছে, তাহার স্বরূপ-উপলব্ধির পথে বাধা দিয়াছে। সে এখনও সুবর্ণের স্মৃতিরোমন্থনে রত। তাহার প্রতি আগ্রহ-কৌতূহল এখনও দুর্বার। অসার রূপের বিরুদ্ধে কোন কথা না শুনিতে সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সুরঙ্গমার মত আজীবন প্রতীক্ষার মন্ত্রে সে এখনও দীক্ষিত হয় নাই—একান্ত আত্মসমর্পণের সোপান বাহিয়াই যে তাহাকে রাণীর সিংহাসনে উঠিতে হইবে এই ধ্রুব সত্য সে এখনও শিখে নাই। সুরঙ্গমার গানে (আমি কেবল তোমার দাসী) এই তত্ত্বটি বাণীরূপ পাইয়াছে।

পরবর্তী দৃশ্যে সুদর্শনার এই অভিমান-অন্ধতার সুড়ঙ্গপথ দিয়া বহিরাক্রমণের ঢেউ আবার গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। একনিষ্ঠ প্রেমের নিরাপদ আশ্রয় ছাড়িয়া সে সপ্তরাজার পরস্পরবিরোধী কামনার স্রোতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। শুধু তাহার নিজের নয়, তাহার পিতৃবংশেরও

সে সর্বনাশসাধনের পথ প্রশস্ত করিয়াছে। আক্রমণকারী রাজাদের মধ্যে কাঞ্চীরাজ আবার শৌর্যদৃপ্ততা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও দৃঢ়সংকল্পে নিজ অসাধারণত্বের পরিচয় দিয়াছে। তাহার মধ্যযুগীয় সামন্তরাজের ছদ্মবেশী পরিচয়ের অন্তরালে একজন আধুনিক কূটকৌশলী রাজনীতিক ও উপায়-উদ্ভাবনদক্ষ বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিসম্পন্ন নাস্তিকের সত্তা প্রচ্ছন্ন আছে। সুবর্ণকে এখনও সে তাহার অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিতেছে, কিন্তু গত পরাজয়ের পর সুবর্ণর যে তত্ত্ববুদ্ধি ও হীনম্মন্যতা বোধ জন্মিয়াছে তাহা কাঞ্চীরাজের আত্ম-প্রত্যয়কে ম্লান করে নাই। সে পুনরায় নিজ ভাগ্য ও শক্তিপরীক্ষায় বদ্ধ-পরিচয় হইয়াছে। অন্তঃপুরে যুদ্ধের উদ্বেগপূর্ণ সংবাদের সহিত কিছু আত্মসমীক্ষার কাজও সুরু হইয়াছে—সুদর্শনা এখন তাহার অবচেতন মনে তাহার প্রত্যাখ্যাত প্রেমিকের বাঁশীবাজান আবেদন মাঝে মাঝে অনুভব করে। এই মুহূর্তে তাহার পিতার পরাজয় ও বন্দিত্বের সংবাদ তাহার অঙ্কুরিত উপলব্ধিকে আবার গভীর নৈরাশ্যের তিমিরে ঢাকিয়াছে।

পরবর্তী দৃশ্যে বিজয়োৎফুল্ল রাজন্যবর্গের মধ্যে সুদর্শনা-লাভের চরম পুরস্কার সম্বন্ধে নানা বিরোধসূচনা কণ্টকিত হইয়াছে। চতুর কাঞ্চীরাজ কিন্তু অন্তর্বিভেদের সম্ভাবনাটি সুকৌশলে এড়াইয়া গিয়া রাণীর স্বেচ্ছা-নির্বাচনের উপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্তগ্রহণের প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছে। এইখানেই সুবর্ণের সহযোগিতা তাহার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। সে যথার্থ অনুভব করিয়াছে যে সুদর্শনার রূপমোহ রূপাধারের দিকেই নিজ পক্ষপাতিত্ব ঘোষণা করিবে। তাহার রাজছত্রতলে যে শূন্য রূপমরীচিকা কায়া ধরিয়াছে তাহাই অমোঘ শক্তিতে তাহার দিকে চরম স্বীকৃতির বরমাল্য আকর্ষণ করিবে। যে বহ্নিতে সুদর্শনা-পতঙ্গ ঝাঁপ দিবে তাহার দীপ্তি শৌর্যপ্রজ্বলিত বলিয়া, চন্দ্রমার স্নিগ্ধ কান্তির পিছনে প্রখর সূর্যকিরণ ক্রিয়াশীল বলিয়া, রূপের প্রতি অর্পিত মাল্য শেষ পর্যন্ত শক্তির কণ্ঠলগ্ন হইবে।

ইতিমধ্যে স্বয়ংবর-সভায় সুদর্শনার উপস্থিতির তাগিদ আসিয়াছে রাজদূত সুবর্ণের মাধ্যমে। এইবার সর্বপ্রথম রূপের অসারতা সুদর্শনার চক্ষে প্রতিভাত হইয়াছে। সে সুন্দরের মোহাবরণ সরাইয়া পরম সত্যের যথার্থ পরিচয়লাভের জন্য প্রস্তুতি অর্জন করিয়াছে। সকল-রূপ-ডোবান অন্ধকারের পরম জ্যোতিঃ তাহার নিকট উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। সে অন্ধকারের সকল বিশেষ আকৃতি-লোপ-করা অসীম রহস্যের মাধুর্য উপলব্ধি করিয়া,

সুরঙ্গমার সগোত্রীয়া-পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। এই চরম সঙ্কটক্ষণে রাণী এখন তাহার অনুতাপের গভীরতা দিয়া আত্মবিশুদ্ধি ও দৃষ্টিস্বচ্ছতা লাভ করিয়াছে। সমাপ্তি-সঙ্গীতটি (এ অন্ধকার ডুবাও তোমার অতল অন্ধকারে) সত্যদর্শনে ভাস্বর ও আত্মনিবেদনের ঐকান্তিকতায় মধুর হইয়া বাজিয়াছে। যে শ্বাসরোধী তিমিরতল হইতে সে রূপলোকপ্রয়াণের জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছিল সেই দুঃসহ তিমিরবেষ্টনী আজ পরম রহস্যের অনুকূল আশ্রয়রূপে তাহার একান্ত কামনা-সাধনার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। সেই অতল, অপরিমেয় অন্ধকারের মধ্যেই সে আবার দয়িতের মিলনবাসর পাতিয়াছে। পরিবর্তনের চক্রগতির এক পর্যায় এখানেই শেষ হইল।

স্বয়ংবর-সভায় উৎকণ্ঠিতভাবে প্রতীক্ষমাণ বরমাল্যপ্রত্যাশী রাজাদের মধ্যে নানা জল্পনা-কল্পনার মধ্য দিয়া তাহাদের মানস অস্বস্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহাদের মধ্যে উপায়দক্ষ কাঞ্চীরাজই তাহার জয় সম্বন্ধে নিশ্চিত ও নিঃসংশয়। সে স্থিরনিশ্চয় যে আশা-নৈরাশ্যের দ্বন্দ্ব ও কামনার চাঞ্চল্য যে লক্ষ্যকে দোদুল্যমান রাখে তাহা প্রজানিয়ন্ত্রণের শরসন্ধানে অমোঘ বিদ্ধ হয়। তাহার শেষ ফল সম্বন্ধে কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব নাই। শেষ পর্যন্ত তাহার কিন্তু একটু হিসাবে ভুল হইয়াছে। যে প্রত্যাশিত ভীরু-কোমল পদধ্বনির জন্য সকলেই উৎকর্ণ হইয়াছিল, সেই পদধ্বনি যখন শ্রুতিগোচর হইয়া কাঞ্চীরাজের মনে নিশ্চিত প্রত্যয় উদ্দীপন করিল, তখন দেখা গেল যে তাহা বরমাল্যের আমন্ত্রণ নয়, বিশ্বরাজসভায় বিচারের আহ্বান। রাণী সুদর্শনা নয়, পরমেশ্বরদূত ক্রীড়ারসমত্ত ঠাকুরদাদাই ও সমরক্ষেত্রের পতাকাবাহী, এই কঠোর অনুজ্ঞার বাহক। কাঞ্চীরাজই এই নির্দেশকে শক্তিপরীক্ষার আহ্বানরূপে গ্রহণ করিয়াছে এ অন্যান্য রাজগণ তাহাদের সংশয়দোদুল মন লইয়া তাহারই প্রত্যয়দৃঢ় নেতৃত্বের পশ্চাদনুবর্তী হইয়াছে। ফাল্গুন-উৎসবের অধিনেতা ঠাকুরদাদাই এই শোণিতোৎসরের অগ্রদূতরূপে দেখা দিয়াছে—আবীর-কুঙ্কুমবৃষ্টি ও হৃদয়রক্তবিসর্জনের উৎসার একই রঙে রাঙা হইয়া এক অভিন্ন সাধন-প্রক্রিয়ার অঙ্গরূপে প্রতিভাত হইয়াছে।

এইবার সমস্ত বহিঃসংঘাতের অবসান ও অবিচল শান্তির প্রতিষ্ঠা। নাটকের সব কয়টি পাত্রপাত্রী দ্রোহবুদ্ধিমুক্ত হইয়া ভগবানে একাত্ম আত্ম-নিবেদনে তাঁহারই মন্দিরে মিলিত হইয়াছে। বিদ্রোহী রাজাদের অশান্ত লাফালাফি·মাতামাতির উপর এক চির-যবনিকা নামিয়া আসিয়াছে—এক কাঞ্চীরাজ ব্যতীত অন্য সকলেই নেপথ্যলোকে তাহাদের তুচ্ছতাকে লুকাইয়াছে। চরম নিষ্পত্তির দিনে কেবল রাণী সুদর্শনা ও কাঞ্চীরাজ ধূলিধূসর পথের প্রতিটি কণ্টকবেধ সহ্য করিয়া তীর্থযাত্রায় পাশাপাশি চলিয়াছে। ইহার পরও সুদর্শনার আর একটি ভাববিপর্যয়ের স্তর অতিক্রম করার আছে। সে যুদ্ধজয়ের পর বিজয়ী রাজার অভ্যাগম-অভ্যর্থনা-প্রতীক্ষায় চঞ্চল হইয়াছে। কিন্তু এখানেও নিদারুণ ঔদাসীন্য—তাহার সমস্ত আশাকে বিড়ম্বিত করিয়াছে। তাহার মনে অভিমান আবার নূতন দল মেলিয়াছে। সে সুরঙ্গমা ও ঠাকুরদাদার নিকট রাজার স্বরূপতত্ত্ব খুঁজিয়াছে। কিন্তু উভয়ের উত্তর একই। ভগবৎ-প্রকৃতি চিররহস্যাচ্ছন্ন, কেবল নির্বিচার আত্মসমর্পণই, তাঁহার ইচ্ছায় আপনার স্বতন্ত্র ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিলয়ই রহস্য-ভেদের একমাত্র দীপশিখা। সুদর্শনার অন্তরে চিরনির্বাপিত হইবার পূর্বে অভিমান ও আত্মপ্রীতির বহ্নিশিখা, প্রত্যাখ্যানের উদ্ধত অগ্নিস্রাব শেষবারের মত বিস্ফোরিত হইয়া উঠিয়াছে।

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ দৃশ্যে মন্দিরদ্বার চির-উন্মোচিত হইবার পূর্বে দুইটি পার্শ্বঘটনাবিবৃতি আছে। প্রথম দৃশ্যটি যুদ্ধের গতিবিধি ও ফলাফল সম্বন্ধে প্রাকৃত জনসাধারণের মানস আলোড়ন ও ঐশী বিধান সম্বন্ধে কৌতুককর বিভ্রান্তি। ইহাদের সংলাপে জানা গেল যে ভগবানের অস্ত্র কাঞ্চীরাজের একেবারে মর্মভেদ করিয়াছিল ও বিচারের শেষে বিচারক তাহাকে নিজ সিংহাসনের দক্ষিণ পার্শ্বে স্থান দিয়াছিলেন। একনিষ্ঠ দ্রোহ-বুদ্ধি যখন প্রতিকূলতা ছাড়িয়া ভগবৎ-শক্তির অনুকূল হয়, তখন সে বিশ্বরাজের রাজমহিমার অংশভাক্ হইয়া থাকে। যে বিরোধে অনমনীয়, অবস্থান্তরে সে সেবাভক্তিতেও অনন্য। অবশ্য এই বিধানরহস্য জনসাধারণের প্রাকৃত বুদ্ধির নিকট দুরধিগম্য। ইহারা এই তথাকথিত বিচার-বিভ্রাটকে বিশ্বনিয়ন্তার খেয়ালপ্রসূত অবিচার বলিয়াই মনে করে।

পরবর্তী দৃশ্যে ঠাকুরদাদার উৎসবের সূত্রধাররূপে কোন প্রমোদোদ্যানে নয়, সর্বসাধারণের রাজপথে অন্তিম আবির্ভাব। রণক্ষেত্রের ছোঁয়া যে ঠাকুরদাদার মনে স্থায়ী দাগ ফেলে নাই, তাহার উৎসবমত্ততা যে তাহার অত্যাজ্য প্রকৃতি-লক্ষণ তাহা এই দৃশ্যে পরিস্ফুট হইয়াছে। এই দৃশ্যের যে বসন্ত-প্রশস্তি (আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে) তাহা দ্বিতীয় দৃশ্যে বসন্ত-আবাহনের গানটির (আজি দখিন দুয়ার খোলা) গভীরতর অনুরণন। প্রথম গানে বসন্তের প্রথম পুষ্পোৎসব ও উহার কিশলয় ও ফুলের প্রাচুর্যের মধ্যে আনন্দময়ের অস্তিত্বের ঈষৎ আভাস। দ্বিতীয়টিতে বসন্তের স্থির পরিণতি ও মানবচিত্তে উহার গূঢ়তর প্রভাব ব্যঞ্জিত। প্রথমটিতে অনুভবের ক্ষণিক চমক, হঠাৎ আবির্ভাবের বিধুরতা, দ্বিতীয়টিতে বসন্তের রূপ ও প্রভাবের পরিণত পূর্ণতা। প্রথমটিতে প্রবেশের ইসারা, দ্বিতীয়টিতে আসনপ্রতিষ্ঠার আমন্ত্রণ। শারদোৎসব'-এও অনুরূপ ঋতু-আবেদনের ক্রমগভীরতা লক্ষণীয়। প্রথমটিতে মদির আবেশ, দ্বিতীয়টিতে বসন্ত-মাধুর্যকে জীবনে আত্মসাৎ করিবার, মানবপ্রকৃতির অঙ্গীভূত করিবার দুরূহতর সাধনা। প্রথম গানে যাহার প্রাথমিক আবাহন, দ্বিতীয়টিতে তাহারই প্রশস্তি ও মর্মনির্যাসপানের নির্দেশ।

শেষ দুই দৃশ্যে এই নাট্যবীণা হইতে বিচ্ছুরিত সুরবৈচিত্র্য অপরূপ ঐকতানে সমগ্র বিচ্ছিন্ন রাগিণীকে সংহরণ করিয়া এক রহস্যঘন, সৌম্য-সুন্দর মহারাগিণীতে সংহত ও স্তব্ধ হইয়াছে। পূর্বেকার সমস্ত সংক্ষোভ ও আত্মদ্বন্দ্ব, সমস্ত মর্মদাহী আলোড়ন ও প্রচণ্ড অনুশোচনা, ব্যর্থ কামনার সমস্ত উন্মত্ত তরঙ্গগর্জন এক মহাসাগরের প্রগাঢ় শান্তিতে ও প্রসন্ন নৈঃশব্দ্যে বিলীন হইয়াছে। মানব-হৃদয়ের অশান্ত রণক্ষেত্রের উপর এক নীরব আত্মোপলব্ধির যবনিকা নামিয়া আসিয়াছে। যে রাজপথ ভগবানের মন্দিরাভ্যন্তরে নিষ্ঠাবান অন্বেষীকে লইয়া যায়, সেখানে আজ চারিটি অপগতমোহ সাধকপ্রাণের শোভাযাত্রা একযোগে পথপরিক্রমায় চলিয়াছে। দুই সিদ্ধ সাধক সুরঙ্গমা ও ঠাকুরদাদা এই যাত্রাতে আছেই, উহাদের সঙ্গে সঙ্গে সদ্যোনবজীবনদীক্ষিত কাঞ্চীরাজ ও সুদর্শনাও তীর্থযাত্রী হইয়াছে। সুদর্শনা এখন সকল অভিমান, সকল রূপগর্ব, সকল বিশেষ প্রশ্রয়ের আকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিয়া নিঃসর্ত আত্মনিবেদনে স্বরূপতত্ত্বে প্রবিষ্ট হইয়াছে। কাঞ্চীরাজও তাহার ঔদ্ধত্য ও দ্রোহবুদ্ধির রাজবেশকে

সেবকের গেরুয়া রঙে রাঙাইয়া লইয়াছে। সুদর্শনা ও কাঞ্চীরাজ, একজন রাণীর, অপর জন সমস্পর্ধিতার ভূমিকা ছাড়িয়া সেবক-সেবিকার অখ্যাত, কিন্তু প্রসাদধন্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। এই দৃশ্যে সুরঙ্গমার দুইটি গান—'অন্ধকারের মাঝে আমায় ধরেছ দুই হাতে' ও 'ভোর হল বিভাবরী' এই মহারূপান্তরের আন্তরব্যঞ্জনাটি ফুটাইয়া তুলিয়াছে।

দৃশ্যের মধ্যপথে ঠাকুরদাদা প্রবেশ করিয়া এই তীর্থপ্রয়াণে অংশগ্রহণ করিয়াছে। ঠাকুরদাদা সুদর্শনার দীন বেশে ক্ষুণ্ণ হইয়া তাহার জন্য রাণীর উপযোগী মর্যাদার ব্যবস্থা করিতে চাহিয়াছে, কিন্তু সুদর্শনা সে ছদ্মসম্মান প্রত্যাখ্যান করিয়া তাহার দাসীবেশকেই 'চরম্তন মনোভাবের প্রতীকরূপে অবলম্বন করিয়াছে। ঠাকুরদাদার আবির্ভাব কেন্দ্রস্থিত বসন্তোৎসবকেই নাটকের প্রাণসত্তারূপে পরিচিত করিয়াছে। এই ধূলিধূসর উৎসবহীন পথযাত্রা বসন্তোৎসবের শেষ লীলারূপ। একবার ফাল্গুনের প্রমত্ত আনন্দোচ্ছ্বাসে, দ্বিতীয়বার দোললীলায় আবীর-রাঙা মাদকতায়, তৃতীয়বার রণক্ষেত্রে শোণিতোৎসবে, ও চতুর্থ ও শেষবার ধূলিমাখার ধূসর নিরঞ্জনতায় এই বসন্তবিহ্বলতার বারবার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছে। শেষে ধূলিমহোৎসবই ভগবৎ-উপলব্ধির সর্বশ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তিরূপে মহিমান্বিত হইয়াছে।

বিংশ দৃশ্যে ক্ষুদ্র পরিসরে অন্ধকার কক্ষের লীলাভিনয়ের উপর শেষ যবনিকাপাত হইয়াছে। সুদর্শনা তাহার অন্ধকার সাধনায় পুনঃপ্রতিষ্ঠার মিনতি জানাইয়াছে ও তাহার পূর্ব অভিমান সম্পূর্ণ পরিহার ও তজ্জনিত রূপপক্ষপাতের মোহমুক্তি নিবেদন করিয়াছে। প্রত্যুত্তরে রাজা এই সিদ্ধ ভক্তকে প্রত্যক্ষদর্শন, রূপলোকে অবাধ মিলনের পূর্ণ আশ্বাসে ধন্য করিয়াছেন। অস্ফুট, ভ্রান্ত তত্ত্বোপলব্ধির প্রদোষমায়া হইতে আলোকিত, সৌন্দর্যময় বিশ্বে, বিশ্বেশ্বরের সহিত পরিস্ফুট পরিচয়ে সে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

৬

পরিশেষে নাটকটির নাটকীয় উৎকর্ষ সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করিয়াই এই আলোচনার উপসংহার টানা যাইতে পারে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে তত্ত্বীজকে পূর্ণ নাটকীয় রূপে বিকশিত করিতে হইলে, উহাকে নাট্যপ্রেরণায় জীবনধর্মী করিতে হইলে তত্ত্ববেষ্টনীর সঙ্কীর্ণতা যথাসম্ভব উদার মানবিক

বিস্তৃতির মধ্যে ছড়াইয়া দিতে হইবে। যে তত্ত্বচেতনা অতিপ্রকট উদ্দেশ্যের লৌহগণ্ডীতে আবদ্ধ, যাহার মধ্যে মানবজীবনের বিচিত্র আবেগ ও প্রাকৃত কলকোলাহল সঞ্চারিত না হয়, মুক্ত সূর্যালোক ও আলো-হাওয়ার স্বচ্ছন্দ প্রবেশাধিকার না থাকে, তাহা শীর্ণ অঙ্কুরাবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া মানবাত্মার পল্লবঘন, শাখা-প্রশাখাপ্রসারিত স্নিগ্ধ আশ্রয়নীড় রচনা করিতে পারে না। এক হিসাবে অতিরিক্ত তত্ত্বাবিষ্টতা নাট্যরসের স্বতঃস্ফূর্তির বিপরীতধর্মী। তত্ত্বের পূর্বনির্ধারিত ছকে মানবজীবনের যে অংশটুকু ধরা দেয়, তাহা স্বচ্ছন্দ বিকাশের পরিপন্থী। তত্ত্বকে অতিক্রম করিয়াই তত্ত্বনাটককে জীবনরসঋদ্ধ করা যায়। যেখানে পদে পদে সচেতন উদ্দেশ্যের বাঁধন, অঙ্গে অঙ্গে রূপকের শৃঙ্খল, সেখানে জীবনরক্তপ্রবাহ মন্দীভূত হইয়া তত্ত্বধূসরতার পিছনে নিজ সতেজ লাবণ্যকে অন্তরায়িত করে। আধুনিক যুগের তত্ত্বনাটকে যে যত বেশী তত্ত্বনিয়ন্ত্রণকে অতিরিক্ত গুরুত্ব না দিয়া স্বাধীন কল্পনার স্বয়ংক্রিয়তায় উহার আত্মিক সত্যের লীলাময়তাকে স্বীকৃতি দিতে পারে, নিগূঢ় ব্যঞ্জনাসাহায্যে তত্ত্বের অন্তর্নিহিত ভাবসত্তাকে উন্মেষিত করিতে পারে, তাহার হাতে তত্ত্বনাটক ততই প্রাণবেগসমৃদ্ধ হয়। রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' নাটক এই মানদণ্ডে অধ্যাত্ম-সাঙ্কেতিক নাটকগোষ্ঠীর মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করে। এখানে নাট্যকার পরিপ্রেক্ষিত ও রূপায়ণের উদার বিস্তারে তত্ত্বকে রূপদীপ্তি দিয়াছেন ও প্রত্যক্ষরসে অভিষিক্ত করিয়াছেন। আমরা সংঘাতের নিজস্ব আকর্ষণে তত্ত্বের কেন্দ্রশাসন হইতে একদিকে মুক্তি অন্যদিকে উহার মর্মরস-আস্বাদনের সমন্বয় অনুভব করি। 'আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে' ভাবটি শুধু রাজার স্বরূপপরিচয় নয়, নাটকখানিরও প্রকৃতিনির্দেশক।

৭

রূপান্তরিত 'অরূপরতন'-এ (১৯১৯) রবীন্দ্রনাথ এই নাটকের অঙ্গবিন্যাস ও ভাবকেন্দ্রসংস্থাপনে যে পরিবর্তন করিয়াছেন তাহাতে উহার প্রথম কল্পনার শ্রেষ্ঠত্ব আরও পরিস্ফুট হইয়াছে। নিজ প্রতিভার স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশকে তত্ত্বপ্রাধান্যের সচেতন নির্দেশে শৃঙ্খলিত করিয়া তিনি নিজ সৃষ্টির সহজ লাবণ্যকে বিড়ম্বিত করিয়াছেন। এই পরিবর্তনপরম্পরা অনুধাবন করিলেই এই মন্তব্যের সার্থকতা প্রতীয়মান হইবে।

প্রথমেই রাজার ব্যক্তিসত্তা ক্ষুণ্ণ করিয়া তাঁহাকে প্রধানতঃ তত্ত্বপ্রতীকের বর্ণহীনতায় উপস্থাপিত করা হইয়াছে। নাটকের পক্ষে ভগবান্‌কে যতটা মানবসারূপ্যে আভাসিত করা যায়, ততই উহা নাটকীয় আবেদনসম্পন্ন হইবে, অবশ্য তাঁহার তত্ত্বরূপকে বিকৃত না করিয়া। 'অরূপরতন'-এ লেখক ঠিক এই প্রমাদগ্রস্তই হইয়াছেন। 'রাজা'তে নাট্যারম্ভে সুদর্শনার সহিত রাজার দীর্ঘপরিচয়ের জন্য উভয়দিকেই প্রেমোন্মেষ ঘটিয়াছে ও সুদর্শনার বিশেষ অন্তরঙ্গতা কার্যতঃ স্বীকৃত হইয়াছে। উভয়ের মধ্যে সংলাপে এই অপরিণত পূর্বরাগের ভাবমুগ্ধতা স্বতঃস্ফুট। 'অরূপরতন'-এ এই প্রাথমিক মনোভাবদ্যোতনা সুরঙ্গমার মধ্যবর্তিতায় পরোক্ষভাবে ব্যক্ত ও তত্ত্বভূমিকাটি অতিমাত্রায় সুপরিস্ফুট। এখানে রাজার প্রেমিকরূপকে আচ্ছন্ন করিয়া তাঁহার বিধানপ্রণেতা রূপটিই প্রধান হইয়াছে। সমস্ত পরবর্তী নাট্যপরিণতির মূলতত্ত্বটি গোড়াতেই পূর্বকথনের দ্বারা সুনির্দিষ্ট হওয়াতে উহার অভাবনীয়তার চমকটি অঙ্কুরিত হইবারই সুযোগ পায় নাই। দীর্ঘ মিলনের ফলে সুদর্শনার মনে অদর্শনের যে ক্ষোভ ও অতৃপ্তি সঞ্চিত হইয়াছে প্রেমাস্পদকে প্রত্যক্ষ দেখিবার উদগ্র আকাঙ্ক্ষাই তাহার অনিবার্য প্রকাশ। পরবর্তী নাটকে কিন্তু এক বিশেষ সমস্যার সচেতন নিয়ন্ত্রণ উহার নাট্যস্বাধীনতার মূলোচ্ছেদ করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে রাজার সক্রিয়তাও তাঁহার তত্ত্বসর্বস্বতার আড়ালে চাপা পড়িয়াছে। তাঁহার নিজের কথা এখন সুরঙ্গমার টীকা-ব্যাখ্যায় সমাচ্ছন্ন। সুরঙ্গমাই এখানে নেত্রীত্ব লইয়া নাটকের নিয়ন্ত্রণরশ্মি নিজ হাতে তুলিয়া লইয়াছে—তাহারই কণ্ঠে ভগবদভিপ্রায় বাণীরূপ পাইয়াছে। এই পরিবর্তনে তত্ত্বজ্ঞ যতটা দার্শনিক জিজ্ঞাসার সমাধান লাভ করে, নাট্যরসামোদীর রসাকাঙ্ক্ষা ততটা মেটে না। সুদর্শনার প্রথম সাক্ষাতেই বিশেষ অনুগ্রহের দাবী নাট্যস্বভাববিরোধী মনে হয়। তাহার সহিত প্রথম পরিচয়েই সে কেন প্রশ্রয়প্রার্থী হইল, দয়িতসম্পর্কের গাঢ়তা কোন্ আবর্তনে পরিণতি লাভ করিল, সে বিষয়ে সংশয়বোধ আমাদের মাত্রাজ্ঞানকে পীড়িত করে। রাজার নেপথ্যলোকে চিরনির্বাসন তাঁহার প্রেমস্বরূপকে আমাদের নিকট অপরিস্ফুট রাখে ও সুরঙ্গমা ও ঠাকুরদাদার জবানীতে তাঁহার পরোক্ষ প্রকাশ আমাদের নিকট শাস্ত্রনিরূপিত ঐশীশক্তির অনুমান ও আপ্তবাক্যসৃষ্ট খণ্ডরূপই উদ্‌ঘাটিত করে। নাট্যকারের মূল প্রেরণাই ইহার দ্বারা ব্যর্থ হইয়াছে। প্রবেশক-দৃশ্যে গানগুলিও রবীন্দ্রনাথের অস্থিমজ্জাগত প্রত্যয়-

সংস্কারের সাধারণ প্রতিফলনরূপে প্রতিভাত হয়, নাট্যসংঘাতপ্রসূত সত্যো-উপলব্ধির রসনির্যাস তাহাদের মধ্যে দুর্লভ। ভগবানের মুখে যে গান তাঁহার প্রকৃতিরহস্যদ্যোতক, সুরঙ্গমার মুখে তাহা কবিচেতনার ভাবমুগ্ধতার বাহন। প্রসঙ্গবহির্ভূত এই গানগুলি যদৃচ্ছসংকলিত বলিয়াই ঠেকে। বিশেষতঃ ভগবানের মুখে যে গান তাঁহার প্রণয়োন্মুখতার নিদর্শন, সুরঙ্গমার মুখে সেই গান আরোপিত হইয়া সত্তাসৌরভহীন হইয়াছে।

বসন্তোৎসবের দৃশ্যগুলিও ঘটনাবাহুল্যে ও ত্বরিতরসনিষ্পত্তিতে ভারাক্রান্ত হইয়া নাটকীয় ছন্দভ্রষ্ট হইয়াছে। নাট্যকার যে ভাবসত্যটি নানা লোকের ভিড়ে, নানা দৃষ্টিভঙ্গীর সংঘর্ষে, প্রাকৃত জনসংঘের উদ্দাম রসোচ্ছলতায়, আনন্দের গতিবেগে, ধীরে ধীরে ক্রমিক উন্মোচনে আমাদের অনুভূতিতে প্রত্যক্ষবৎ অনুপ্রবিষ্ট করিয়াছিলেন, নব সংস্করণে তাহা অত্যন্ত অশোভন দ্রুতির সহিত তত্ত্বপ্রতিপাদনমুখ্য হইয়া নাটকীয় প্রাণস্পন্দন হারাইয়াছে। রাজা সুদর্শনাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে উৎসবক্ষেত্রে নানা মূর্তি ধরিয়া, নানা ব্যক্তির প্রাতিভাসিক ছদ্মবেশের ভিতর দিয়া তিনি ভক্ত সাধকের স্বচ্ছ দৃষ্টিতে আত্ম-উদ্‌ঘাটন করিবেন, তাহা 'রাজা' মূল নাটকে আক্ষরিকভাবে ও মর্মসত্যরূপে পূর্ণ হইয়াছে। নাট্যকার এই বৈচিত্র্যসূত্র-অবলম্বনে তাঁহার সামগ্রিক পরিচয়ের সন্ধান পাইয়াছেন ও পাঠকের মনেও সঞ্চারিত করিয়াছেন। প্রত্যেকটি ঘটনাবৃত্তের আবর্তনচক্র যেন দাগ কাটিয়া কাটিয়া মনে গভীর রেখায় অঙ্কিত হইয়াছে। প্রতিটি দৃশ্যের মধ্যে ঈষৎ কালব্যবধান এই প্রত্যয়টি নানা দিক হইতে বদ্ধমূল হইবার অবসর দিয়াছে—প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র অনুভব এক কেন্দ্রাভিমুখী হইয়া এক জটিল ধারণাকে রূপের প্রত্যক্ষতায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। প্রাকৃত জনসাধারণের কাব্যকল্পনা আর রাজসংঘের ভগবৎদ্রোহী ঔদ্ধত্য ও অধিকারলিপ্সা স্বতন্ত্র কক্ষ-আবর্তনের ভিন্ন ভিন্ন পথে এক মহাসঙ্গমে মিশিয়াছে। আহ্নিক গতিসমূহ এক অপরিমেয় রহস্যের চারিদিকে বিরাট কক্ষ-পরিক্রমায় এক বিশালতর বৃত্তরচনায় সংহত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে সুদর্শনার চিত্তচাঞ্চল্য ও রূপবিভ্রান্তি, ছদ্মরাজার অভিনয়, ঠাকুরদাদা ও সুরঙ্গমার তত্ত্বব্যাখ্যা, প্রতিযোগী রাজগণের ষড়যন্ত্র-কুটিলতা, প্রলয়-অগ্নির আভাস ও লেলিহান শিখা, রাজার প্রবোধবাণী, সুদর্শনার অভিমান ও বিমুখতা দ্বিতীয় হইতে অষ্টম দৃশ্য পর্যন্ত প্রসারিত ও ক্রমবিন্যস্ত হইয়া এক সুদূরপ্রসারী আলোড়নকে আমাদের নিকট প্রত্যক্ষ

অনুভবগম্য ও নাটকীয়রসঋদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। এই উদার-বিস্তৃত পরিবেশে ভাববীজ রূপসুষমা ও রসনিবিড়তায় পূর্ণ হইবার অখণ্ড অবসর পাইয়াছে। এই পরিবেশকে সঙ্কুচিত করিলে মূল ভাবটি রসোত্তীর্ণ হইতে পারিবে না—তত্ত্বলোককে অতিক্রম করিয়া প্রাণলোকে প্রবেশাধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে।

দুর্ভাগ্যক্রমে রূপান্তরিত নাটকে ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে। মূলের সাতটি দৃশ্য এখানে দুইটি মাত্র দৃশ্যে সঙ্কুচিত হইয়া রুদ্ধশ্বাস ঘটনাবাহুল্যে রস-পরিণতিকে ব্যাহত করিয়াছে। তত্ত্বাবিষ্ট নাট্যকার নাট্যপ্রয়োজন ভুলিয়া তত্ত্বপ্রত্যয়কে রসানুভূতিতে পরিণত হইতে দেন নাই। ঘটনার পর ঘটনা-স্রোত আসিয়া যে পলিমাটিতে প্রত্যয়ের বীজ অঙ্কুরিত হইতে পারিত তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। আমরা দার্শনিকের সমাধান পাই, রসতৃপ্তি হইতে বঞ্চিত থাকি। লেখক নিজের মীমাংসাকে পাঠকের উপর চাপাইয়া দিয়াছেন, পাঠকের স্বতঃঅনুভূতি জাগ্রত করিবার কোন চেষ্টাই করেন নাই। বীক্ষণাগারের কৃত্রিম প্রক্রিয়া জীবনের স্বতঃসিদ্ধ সত্যে ও ছন্দে মুক্তি পায় নাই। সুতরাং নাট্যকারের আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছে—পূর্বনির্ধারিত তত্ত্বের পীড়নে পাঠকের মানস প্রত্যয়স্ফূর্তি সাধিত হয় নাই। রাজার কণ্ঠ-উচ্চারিত প্রবোধ যেমন তাঁহার প্রেমিক সত্তার উদ্ভাসনে তাঁহাকে জীবন্ত নায়ক রূপে দেখায়, সুরঙ্গমার পরোক্ষ তত্ত্ব-আশ্বাস সেই প্রাণস্পন্দন সঞ্চারিত করিতে পারে না। আগুনের জয়গান (আগুনে হল আগুনময়) রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন প্রসঙ্গে উদ্‌গীরিত বহ্নিস্তুতিকে অনেকটা পুনরাবৃত্তিমূলক করিয়া তুলিয়া উহার বিশেষ অধ্যাত্ম তাৎপর্য হারাইয়াছে।

সুদর্শনার পিতৃগৃহপ্রয়াণ নাট্যঘটনার একটি সুনির্দিষ্ট স্তররূপে মূল নাটকে যতটা সূক্ষ্মভাবদ্যোতক হইয়াছে, রূপান্তরিত সংস্করণে উহা নব পরিণতির সেরূপ কোন সু-চিহ্নিত স্তর নির্দেশ করে না। ইহার সঙ্গে সঙ্গে অব্যবহিতভাবে যুদ্ধকোলাহল ও উহার আতঙ্কবিমূঢ়তা সন্নিবিষ্ট হওয়ায় কোনটিই স্বতন্ত্র ভাব-উদ্বোধনে সহায়তা করে নাই। ঘটনা ও পরিবর্তন-পরম্পরা দুঃস্বপ্নের মত ভিড় জমাইয়া আমাদের বোধশক্তিকে আবিল করে—উহাদের বিশৃঙ্খল সমাবেশ হইতে কোন সুস্পষ্ট তাৎপর্যবোধ নিষ্ক্রান্ত হয় না। বহ্নিপ্রলয়ের মধ্যে রাজার আবির্ভাব ও সুরঙ্গমার দৃঢ়বিশ্বাসে সুদর্শনার উদ্ধারলাভ যতটা তত্ত্বসম্মত হইয়াছে, ততটা নাটকীয় রসের অনুকূল হয় নাই।

এক অজ্ঞাত শক্তির ফুৎকারে যুদ্ধের ঘনঘোরঘটার ছিন্নভিন্ন হইয়া অন্তর্ধান, রাজাদের পারস্পরিক অভিজ্ঞতা-বিনিময়, কাঞ্চীরাজের পরাজয়, বিচার ও প্রসাদলাভ, সুদর্শনার লজ্জা ও অভিমানবোধজনিত আদর-প্রত্যাশা, ঠাকুর-দাদার প্রবেশ ও ভগবৎ-তত্ত্বব্যাখ্যা, বিক্রমবাহুর আত্মসমর্পণ ও পথিচরবৃত্তি, সুদর্শনার অভিমান-গলানো একান্ত আত্মনিবেদন, ভ্রান্তিরজনীর অবসানে তিমিরবিদার অরুণোদয়—এতগুলি দৃশ্যপরিবর্তন ও ভাবসংঘাত সবই যেন একনিঃশ্বাসে ছায়াবাজির মত দ্রুত সঞ্চরণ করিয়া ফিরিয়াছে। সদা-চঞ্চল তরঙ্গরাশিভঙ্গ যেমন হ্রদের প্রতিবিম্ব-নির্মলতা ও গভীরতাবোধকে প্রতারিত করে, এখানেও ঘটনার দ্রুতউৎক্ষিপ্ত লহরীলীলা তেমনি কোন অখণ্ড ভাব-তাৎপর্যকে জমাট বাঁধিতে দেয় না। চতুর্থ দৃশ্যের ক্ষুদ্র পরিসরে এত বিচিত্র ও বিভিন্নরসবাহী ঘটনার সমাবেশের প্রতিক্রিয়ায় আমরা বিহ্বল-বিমূঢ় হইয়া পড়ি, ও কোন সুসম্বদ্ধ রস-পরিণতির আস্বাদন হইতে বঞ্চিত হই। এমন কি শেষ ক্রান্তিবিন্দুতে, যেখানে আঁধার কক্ষে রাজা একবার মাত্র প্রত্যক্ষভাবে আবির্ভূত হইয়া সুদর্শনার নিকট নিজ লীলারহস্য ব্যক্ত করিয়াছেন ও তাহাকে প্রেয়সীর অন্তরঙ্গতায় ও বিশেষ অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, সেখানেও যেন পরম সমাপনের সুর ঠিকমত বাজে না। ভগবানের আত্ম-উদ্‌ঘাটন ও প্রত্যক্ষ রূপলোকে অবতরণও তত্ত্বকুয়াশাঢাকা হিমাচলশীর্ষের মত পূর্ণ মহিমার সূর্যরশ্মিতে ঝলমল করিয়া উঠে নাই। তত্ত্ববিদের নিকট মানবমনের গোপনচারী কবি-নাট্যকার স্বেচ্ছাপরাজয় বরণ করিয়াছেন। এই দৃশ্যে বিন্যস্ত গানগুলিও নাটকের নিবিড়সঙ্গচ্যুত হইয়া যেন রবীন্দ্রনাথের সাধারণ জীবনদর্শন ও উতলা অনির্দেশ্য মনোভাবের বাহন হইয়া উঠিয়াছে। এগুলি যেন নাট্যঘটনার সূত্রবন্ধন ছাড়াই সোজা কবির কাব্যপুষ্পোদ্যান হইতে উৎকলিত হইয়াছে। ঠাকুরদাদার সর্বনাশ-প্রশস্তি, সুরঙ্গমার পথচলার মন্ত্রস্তুতি ও ভগবানের আহ্বানে উৎকর্ণতাব্যঞ্জনা, ও সুদর্শনার কণ্ঠ-নিঃসৃত অরূপবন্দনা নাট্যরসসিঞ্চিত না হওয়ায় প্রত্যাশা-ঘন চরম মুহূর্তটিকে ঠিক ফুটাইতে পারে নাই। ইহাদের অপেক্ষা 'রাজা'র সমাপ্তি-সংগীত (ভোর হল বিভাবরী) তিমির-বিদারী নবঅভ্যুদয়ের মহিমা-স্তোত্ররূপে অপরূপ ভাবসার্থকতায় ও সুরগাম্ভীর্যে অনন্য-আবেদনবাহী হইয়াছে। এইখানেই এই রহস্যময় অন্তর্জীবননাটকের শেষ যবনিকাপ্রক্ষেপ অপূর্ব সঙ্গতি, এমন কি অনিবার্য পরিণতির পূর্ণচ্ছেদ টানিয়াছে। ইহার

নিঃসঙ্গ মহিমাকে গীতিবাহুল্যের ভিড়ে ক্ষুণ্ণ করা anti-climax বা বিপরীতমুখী অবরোহণের লক্ষণাক্রান্ত মনে হয়।

'রাজা' হইতে 'অরূপরতন'-এ নামান্তর নাটকখানির জীবনধর্মিতা হইতে তত্ত্বচেতনার পর্যায়ে গোত্রান্তরও সূচিত করে। রূপ ও মানবহৃদয়ের আবেগ-সংঘাতের মাধ্যমে অরূপতত্ত্বের স্বরূপব্যঞ্জনাই রবীন্দ্র-নাটকের বিশেষত্ব। সৃষ্টির যে দুরধিগম্য কেন্দ্র হইতে রংএর অফুরন্ত বৈচিত্র্য, আনন্দের চিরপ্রবহমাণ নির্ঝর, হৃদয়ের প্রেম ও সৌন্দর্যের অনন্ত প্রস্রবণ উৎসারিত হইতেছে, ভগবান স্বয়ং অদৃশ্য থাকিয়া সৃষ্টিলীলার বিচিত্র ছন্দে যে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন, সেই রূপের মধ্যে অরূপের আভাস পরিস্ফুট করাই, ব্যক্তিসত্তার মধ্যে ভাবরহস্যের উদ্ভাসন—ইহাই রবীন্দ্রনাটকের সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ও অঙ্গবিন্যাসের প্রধান কৃতিত্ব। হিন্দু পুরাণ ও ভক্তিশাস্ত্র যে রূপপ্রতিমা-নির্মাণের দ্বারা ঐশী সত্তাকে অনুভবগম্য করিয়াছে, সেই অতিরসায়িত, অতিবাস্তব পথ রবীন্দ্রনাথ অনুসরণ করেন নাই। আবার উপনিষদের নিগূঢ় সত্যদৃষ্টি ও সমস্ত রূপাতীত অতীন্দ্রিয়তাও তাঁহার রূপবিভোর মন সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করে নাই। এই রং ও বর্ণশূন্যতার মিলনে, দর্শনতত্ত্বকে রূপ ও রসে অভিষিক্ত করিয়া, প্রেম ও সম্ভ্রমের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করিয়া, অচিন্তনীয় কল্পনা ও আবেগময় হৃৎস্পন্দন ও কর্মসংঘাতের মধ্যে মিতালি পাতাইয়া তিনি যে পরমপুরুষের অনুপম বিগ্রহ সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা ধর্মচেতনার দিক্ দিয়া যেমন অনন্য, শিল্পসৌন্দর্যের দিক্ দিয়াও তেমনি অনবদ্য হইয়াছে। ধর্মরহস্যদ্যোতনা যে সাহিত্যের প্রাণ, সেই সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার স্থান অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

একাদশ অধ্যায়

অচলায়তন (১৯১১) ; গুরু (ফেব্রুয়ারী, ১৯১৮)

১

'অচলায়তন' (১৫ই আষাঢ় ১৩১৮) ও উহার পরবর্তী রূপান্তর 'গুরু' (১লা ফাল্গুন ১৩২৪) পূর্ব নাটকের ন্যায় অন্তর্গূঢ় অধ্যাত্ম-চেতনার কোন সূক্ষ্ম, অতীন্দ্রিয় উদ্‌ভাসন নয়। ইহা শাস্ত্রনির্দিষ্ট ধর্মতত্ত্বের বাস্তব প্রয়োগের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গাতিরঞ্জনের মাধ্যমে প্রতিবাদজ্ঞাপন। হিন্দুধর্মের যে মূঢ়, সংস্কারান্ধ আচারসর্বস্বতা সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে উহার প্রস্তরীভূত, বস্তুসংস্পর্শহীন শূন্যতা-বিকারের লক্ষণরূপে এক শ্রেণীর স্মৃতিশাস্ত্রশাসিত ধর্মব্যবসায়ীর জীবনচর্চায় প্রকট হইয়াছিল তাহাকেই নাট্যকার তীক্ষ্ণ বিদ্রূপাস্ত্রে বিদ্ধ ও উহার অসারতা উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে এই ব্যঙ্গচিত্রে প্রকৃত হিন্দুধর্মের নিগূঢ় প্রাণস্পন্দনটি, উহার সাধনার যথার্থ ক্রমটি, উহার পরম সিদ্ধির আনন্দটি ফুটাইয়া তুলিবার কোন প্রয়াসই নাই। উহার অন্তর্জীর্ণতা এতই সুপ্রকট যে এক মহাপঞ্চক ছাড়া উহার একনিষ্ঠ, প্রত্যয়দৃঢ় সাধক নাটকে আর দ্বিতীয় কোন ধর্মনেতা নাই। উহার আচার্য স্বয়ং অন্তবিরোধক্লিষ্ট, যাহা আচরণ করেন তাহাতে কোন নির্মল আত্মপ্রসাদ ও চিত্তশুদ্ধির শান্তি অনুভব করেন না। উপাচার্য এতটা দ্বিধাদ্বন্দ্ববিচলিত না হইলেও তাঁহার প্রত্যয়মূল যে খুব দৃঢ় নয়, তাহা সুস্পষ্ট। এক উপাধ্যায় অনেকটা আচারনিষ্ঠতার জালে বন্দী হইয়া সম্পূর্ণ আত্মতৃপ্ত। অন্যান্য তরুণ ও বালকেরা অনুশাসনের পাষাণভারে পিষ্ট ও দিনকৃত্যের ঘূর্ণাচক্রে বিভ্রান্ত হইয়া একপ্রকার অহেতুক আতঙ্কে দিশাহারা ও সহজআনন্দবঞ্চিতরূপে যান্ত্রিক জীবনযাত্রায় তাহাদের তারুণ্যশক্তির অপচয় ঘটাইতেছে। তাহারা এক হিসাবে 'বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়' এই প্রবাদবাক্যের সার্থকতা বিধান করিয়াছে। তাহারা প্রত্যেকটি বন্ধনের গোঁড়া সমর্থক, প্রতিটি পরিবর্তনের ঘোরতর বিরোধী, অপরের স্খলন-ত্রুটির প্রতি অতিসচেতন ও ক্ষুদ্রতম অপরাধের জন্য কঠোরতম প্রায়শ্চিত্ত-শাস্তি-প্রয়োগে প্রতি উৎকটভাবে আগ্রহশীল। তাঁহাদের যন্ত্রবদ্ধ ধর্মাচরণের অন্তরালে এক শাশ্বত অত্যাচারী ও পীড়নপ্রবণ মনোভাবের ছদ্মবেশী অস্তিত্ব সহজেই অনুভব করা যায়।

তাহারা প্রতি সঙ্কটমুহূর্তে অমোঘ নেতৃত্বনির্দেশের জন্য প্রতীক্ষমাণ ও প্রত্যাশাপরায়ণ। অচলায়তন-আশ্রমের আভ্যন্তরীণ পরিবেশ এই সমস্ত উপাদানে নির্মিত।

এখন এই শিলীভূত ধর্মচর্যার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ কোন্ কোন্ প্রতিকূল ও বিদ্রোহোন্মুখ শক্তিসমাবেশ করিয়া নাটকীয় দ্বন্দ্বের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা অবধানযোগ্য। এই বিরোধী শক্তিদের মধ্যে সর্বপ্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছে তরুণ পঞ্চকের অশান্ত, চির-অতৃপ্ত হৃদয়-বিক্ষোভ। প্রবহমাণা নির্ঝরিণীর সঙ্গে স্রোতোরোধী শিলাখণ্ডের, মুক্ত আকাশে বিহার-বিলাসী পাখীর সহিত লৌহপিঞ্জরের যে ক্ষুব্ধ, বাধাব্যথিত সম্পর্ক, পঞ্চকের চিরকিশোর, দিগন্তসন্ধানী তরুণ প্রাণোচ্ছলতার সহিত আশ্রমের বিধিনিষেধ-বিড়ম্বিত, শ্বাসরোধকারী পরিবেশেরও ঠিক সেই সম্পর্ক। সে প্রতি মুহূর্তে আশ্রমের শাসনশৃঙ্খলকে অস্বীকার করিতে চাহিয়াছে, প্রতি মুহূর্তে আশ্রমচর্যার সহিত তাহার মুক্তিব্যাকুলতার রক্তাক্ত সংগ্রাম ঘটিয়াছে, কিন্তু এই উতলা মনোভাব, এই অনির্দেশ্য আকূতি নিজশক্তিতে কোন নিষ্ক্রমণপথ রচনা করিতে পারে নাই। মলয় সমীর পাষাণ প্রাচীরকে যতটুকু টলাইতে পারে, তাহার চিত্তব্যাকুলতা হাজার বৎসরের সঞ্চিত সংস্কারের বিরুদ্ধে সেইরূপ নিষ্ফল মাথা কুটিয়াছে। সে রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর-সন্ধানের একটা দিকের প্রতীক্ রূপে নাটকে অবতীর্ণ হইয়াছে।

ইহার সহিত যুক্ত হইয়াছে আশ্রম-পরিচালকগোষ্ঠীর আত্মসমীক্ষার অস্বস্তি, দৃঢ় আশ্রয়ভূমির অভাব। স্বয়ং আচার্য অনুভব করেন যে আশ্রমের জীবনপদ্ধতি মূল ধর্মপ্রেরণা হইতে ক্রমশঃ সরিয়া গিয়াছে, উপায় ও উদ্দেশ্যের মধ্যে ব্যবধান দিন দিন দুস্তর হইয়া উঠিতেছে। সেইজন্য তিনি চলচ্চিত্ত, অমোঘ শাস্ত্র-বিধানে সঙ্কুচিত, মানবিক আবেদনের নিষেধে দণ্ডপ্রয়োগে শিথিলহস্ত। তিনি অন্তর্দ্বন্দ্বের দুর্বলতায় পঞ্চকের উড়ুউড়ু, বাঁধনছেঁড়া মনোভাবের প্রতি সহানুভূতিশীল, মানবিক আবেগের স্বয়ংসম্পূর্ণতায় অর্ধবিশ্বাসী, ও সুভদ্রের অপরাধের প্রতি প্রশ্রয়পরায়ণ। যাহা পঞ্চকের মধ্যে এলোমেলো বায়ুহিল্লোলরূপে সদাচঞ্চল, ও সুভদ্রের ক্ষেত্রে বালকসুলভ কৌতূহল-উচ্ছ্বাসের মধ্যে অকস্মাৎ স্পন্দিত, যাহা নিষেধের উপরে সুস্থ প্রাণচেতনাকে মর্যাদা দিতে উৎসুক, তাহা আশ্রমের প্রধান কর্তৃপক্ষীয় ব্যক্তির মধ্যে দীর্ঘকালসঞ্চিত সংশয়রূপে নিগূঢ়ভাবে ক্রিয়াশীল, ধূমাকারে অন্তরনিরুদ্ধ

বিদ্রোহের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। অগ্নিকণার সহিত অনুকূল বায়ুর সহযোগিতা যে বহ্ন্যুৎসবের সৃষ্টি করে, আশ্রমের মধ্যে গভীর অন্তর্দ্বন্দ্ব ও উপরিতলের বিক্ষোভের গোপন সম্মিলনে আশ্রম-প্রতিবেশে সেই বিপ্লবের নীরব আয়োজন চলিয়াছে। উপাচার্য যদিও কোন প্রকাশ্য বিক্ষোভে আত্মপ্রকাশ করে নাই, তথাপি তাহার অংশ ভিজেকাঠের, সে যথাসময়ে এই আগুন জ্বালাইবার কাজে বিলম্বিত ইন্ধন যোগাইয়াছে। উপাধ্যায় মোটামুটি আশ্রমশৃঙ্খলার কঠোরতার দিকেই পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়াছে, তথাপি তাহার নিজস্ব কোন ব্যক্তিত্ব নাই। সে মহাপঞ্চকের সহকর্মীরূপে তাহার অটুট মনোবলের, দৃঢ় প্রত্যয়নিষ্ঠার প্রতিধ্বনি করিয়াছে, আশ্রমশাসনের বজ্রধ্বনির সহিত তাহার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর মিশাইয়াছে। কিন্তু প্রলয়মুহূর্তে, আসন্ন ধ্বংসের অভ্যাগমে এক মহাপঞ্চক ছাড়া আর কাহারও জীবনমরণপণ প্রতিরোধশক্তি দুর্জয় গর্জনে আত্মঘোষণা করে নাই।

লক্ষ্য করিবার বিষয় যে রবীন্দ্রনাথ যে ধর্মের বিকৃত রূপটির বিদ্রূপাত্মক চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন তাহার সুস্থ, জীবন্ত আদর্শের কোন সৃষ্টিধর্মী পরিচয়ই তিনি দেন নাই। যাহার যান্ত্রিক প্রাণহীনতা তাঁহার রসবোধ ও নাট্য-চেতনাকে উদ্রিক্ত করিয়াছে তাহার সতেজ লাবণ্যচ্ছটা তাঁহার কল্পনাকে একেবারেই উদ্দীপ্ত করে নাই। যে লুপ্তাবশেষ কঙ্কালের প্রতিচ্ছায়াকে তিনি কপটসম্বর্ধনা জানাইয়া ও পুষ্পমাল্যভূষিত করিয়া শ্মশানযাত্রার পথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন, তাহার যৌবনপ্রাণোচ্ছলতা সম্বন্ধে তাঁহার কোন কৌতূহলের নিদর্শন সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। যে দেবমন্দির এখন শূন্যতার বেদী-শিলায় পর্যবসিত তাহার মধ্যে নিশ্চয়ই যে কোন কালে জীবন্ত বিগ্রহমূর্তি ছিল, পাষাণস্তূপ যে এককালে প্রাণবীজের আধার ছিল ও ভগবৎ-প্রেরণার উৎস ছিল এই ঐতিহাসিক সত্য সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ অচেতন। বরং তাঁহার গদ্য প্রবন্ধগুলিতে ও শান্তিনিকেতন পর্যায়ের ভাষণগুলিতে তিনি হিন্দুধর্মের মর্মবাণী অতি সূক্ষ্মদর্শিতার সহিত অনুভব ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু নাট্যশিল্পে তাঁহার এই সত্যদৃষ্টি সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হইয়া সঙ্কীর্ণ একদেশদর্শিতা ও বিকৃত বিচারবুদ্ধির আশ্রয়ে লঘুতরল ব্যঙ্গমনোভাবকে পুষ্ট করিয়াছে মাত্র। নাট্যকারের উদার ও সমদর্শী জীবনবোধ, অপক্ষপাত ও গভীরসঞ্চারী সমীক্ষার এখানে একান্ত অভাব। এমন কি যে গুরু এই ধর্মচেতনার প্রথম প্রবক্তা ও আদিম উৎস, তিনিও ইহার প্রাচীরবেষ্টনীকে ভূমিসাৎ করা অপেক্ষা উহার মৃতদেহে

নবীন প্রাণসঞ্চারের আর কোন সুষ্ঠু উপায় উদ্ভাবন করিতে পারেন নাই। আদিধর্মগুরু ফিরিয়া আসিয়াও নবমন্দিররচনার কোন পরিকল্পনা যোগাইতে অসমর্থ হইয়াছেন। অঙ্গারস্তূপের মধ্যে সুপ্ত অগ্নিকণাকে ফুৎকারে পুনরুজ্জীবিত করার তিনি কোন পথ খুঁজিয়া পান নাই। বিধর্মী, প্রাণচঞ্চল, ভোগসর্বস্ব, শক্তিদৃপ্ত উৎপাদকগোষ্ঠীর সহায়তায় প্রাচীন সংস্কৃতিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া তিনি তাঁহার কর্তব্য শেষ করিয়াছেন। প্রাচ্যের ধমনীতে পাশ্চাত্ত্য রক্তসঞ্চারে সুপ্তিময় জাতির বাস্তববোধ ও ঐহিক কল্যাণ নবশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হইবে, বিশ্বের অগ্রগতির শোভাযাত্রার সহিত সে সমতালে চলার ক্ষমতা অর্জন করিবে তাহা সুনিশ্চিত। কিন্তু তাহাতে তাহার পারত্রিক বিশুদ্ধি কতটা সাধিত হইবে, ভারতীয় ধর্মসংস্কৃতির শাশ্বত ধ্যানাসন, ঐশী-চেতনার নির্মলতা কতটা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে এই প্রশ্নের কোন উত্তর মিলে না। ভারতীয় অধ্যাত্মবোধের নবসংস্কারের জন্য যে বিপুল মূলধন প্রয়োজন, তাহা গুরুর অনিশ্চিত প্রশ্রয়শিথিল নেতৃত্ব, আচার্য-উপাচার্যের আত্মপ্রত্যয়হীন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, পঞ্চকের উতলা চিত্তের অনির্দেশ্য-চাঞ্চল্য ও প্রকৃতিপ্রীতি, শোন-পাংশুদের বলিষ্ঠ কর্মসাধনা, এমন কি দর্ভকদের ভক্তিরসতরল সরল আত্মনিবেদনের সমবেত সঞ্চয় হইতে সংগৃহীত হইবে কি না সন্দেহ।

'অচলায়তন'-এর প্রতিবেশ-চিত্র সম্পূর্ণ করিতে হইলে পরিপূরক ও বৈপরীত্যমূলক দুইটি সন্নিহিত সমাজগোষ্ঠীর উহার সহিত অন্তঃসম্পর্কের বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজন। ইহাদের মধ্যে শোনপাংশু ('গুরু'তে যূনক নামে পরিবর্তিত) গোষ্ঠী হিন্দুসমাজবহির্ভূত ও হিন্দুধর্মসাধনার সহিত অসংশ্লিষ্ট। ইহারা প্রগতিশীল, কর্মচঞ্চল ও বৈষয়িক উন্নতিসাধনে রত পাশ্চাত্ত্য জাতির প্রতিনিধি। ইহাদের উদ্বৃত্ত শক্তি সর্বদাই তাহাদিগকে কর্মের ঘূর্ণীচক্রে আবর্তিত রাখে, মুহূর্তের জন্যও উচ্চতর অধ্যাত্ম চিন্তায় আত্মসমাহিত হইবার অবসর দেয় না। ইহাদের সমস্ত প্রেরণাই বহির্মুখী, অন্তঃসমীক্ষা উহাদের সম্পূর্ণ প্রকৃতিবিরোধী। ইহারা তীক্ষ্ণ বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন, হিন্দুধর্মের জটিল বাধানিষেধ ও ক্রিয়াকলাপে সম্পূর্ণ আস্থাহীন। অচলায়তনের জীবনাদর্শের প্রতি তাহাদের সুগভীর উপেক্ষা ও কৌতুকস্মিত অবজ্ঞা। দাদাঠাকুর তাহাদের উৎসবজীবনের পুরোধা ও নিয়ামক, উন্নততর ভাবচিন্তার একমাত্র প্রতীক্। অবশ্য ইহাদের উপর দাদাঠাকুরের প্রভাবের সূত্রটি ঠিক ধরা পড়ে নাই। দাদাঠাকুর নিজে শোনপাংশুদের সহিত তাঁহার অন্তরঙ্গতার

ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে ইহারা অজ্ঞাতসারে তাঁহারই নিগূঢ় অভিপ্রায়ের অনুবর্তী। ইহারা সচেতনভাবে কোন উচ্চতর ভাবাদর্শের নিয়ন্ত্রণ না মানিলেও ও উহাদের স্বাধীন ইচ্ছাকে নিরঙ্কুশ প্রাধান্য দিলেও অজ্ঞাতসারে সৃষ্টির ক্রমবিবর্তনের পথে একটি অপরিহার্য অংশ পূরণ করিয়া বিশ্বকল্যাণের সহিত সহযোগিতা করিয়াছে। সৃষ্টিনিয়ন্তার কল্যাণময় উদ্দেশ্যসাধনের জন্যই ইহারা অচলায়তনের বিরুদ্ধে অভিযানে ও উহার মুক্তিবিরোধী প্রাচীরবেষ্টনীর ধ্বংসকার্যে অগ্রণী হইয়াছে, বিধাতার অস্ত্ররূপেই কুসংস্কারের প্রাচীন দুর্গকে ধূলিসাৎ করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে অশ্রান্ত কর্মোদ্যম ও আদিম জাতিসুলভ অকপট সারল্যের এক অদ্ভুত মিশ্রণ ঘটিয়াছে। ইহাদিগকে সভ্যতার কৃত্রিম বিকারজীর্ণ, অতিবিলাসী, শক্তিমত্ত পাশ্চাত্ত্য জাতির সহিত এক করিয়া দেখা যায় না। যাহারা এত আত্মসচেতন, তাহারা দাদাঠাকুর ও পঞ্চকের সহিত এত অন্তরঙ্গ হইল কি করিয়া সেই সংযোগরহস্যটি নাট্যকার পরিস্ফুট করেন নাই। ইহাদের নাচ-গান-উৎসব সবই কাজের ছন্দে গাঁথা, ইহাদের কলাচর্চা ও আনন্দ কর্মসাধনারই লাবণ্যদীপ্তি, শ্রমকর্কশ কর্মচক্রঘর্ঘরের অনুগামী আবহ-সঙ্গীত।

দর্ভকশ্রেণী হিন্দুসমাজেরই অন্ত্যজ অস্পৃশ্য অংশ ও হিন্দুধর্মসাধনার আনুষ্ঠানিকতাবর্জিত ভাবরসে বিভোর। উহারা সরল, অনার্য জাতি, অনাবিল ভক্তি ও একান্ত আত্মনিবেদনই তাহাদের ধর্মচেতনার প্রাণবস্তু। অচলায়তনের গুরু তাহাদের অহেতুক প্রীতি ও ভক্তির পাত্র গোঁসাই। তাঁহার কোন তত্ত্বকথা না বুঝিয়াই তাহারা তাঁহার অদৃশ্য আকর্ষণে সম্মোহিত। হয়ত নাট্যকার এই ইঙ্গিতই করিতে চাহিয়াছেন যে উচ্চবর্ণের হিন্দুধর্ম উহার আদিম বিশুদ্ধ রূপে এই স্বচ্ছন্দপ্রবাহিণী প্রাণময়ী আবেগধারারূপিণীই ছিল। পরে শুষ্ক জ্ঞানচর্চার প্রভাবে ও অনুষ্ঠানবাহুল্যের শিলাসঞ্চয়ে উহার নির্বল স্রোতধারা অবরুদ্ধ হইয়া উহা আচারের মরুভূমিতে নিজ উচ্ছলতা হারাইয়া ফেলিয়াছে। ভগবানকে লাভ করিবার যান্ত্রিক অনুষ্ঠান-জটিলতাই তাঁহার সহিত উপাসকগোষ্ঠীর মিলনের পথে তাঁহার প্রত্যক্ষ অনুভূতির পক্ষে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা সৃষ্টি করিয়াছে। অর্থহীন সাধনা-প্রক্রিয়া পর্বতপ্রমাণ আচরণপুঞ্জ স্তূপীকৃত করিয়া সিদ্ধিকে সম্পূর্ণভাবে আড়াল করিয়া মাথা তুলিয়াছে। আচার্যের অন্তরাত্মা ইহারই অস্পষ্ট উপলব্ধিতে সংশয়াকুল হইয়া উঠিয়াছে। তিনি প্রাণের নিভৃত কন্দর হইতে এই অতিবিধিবদ্ধ,

মানবমনের স্বাধীনস্ফূর্তিবিরোধী, প্রকৃতিবিমুখ আচারমূঢ়তার কোন সমর্থন পাইতেছেন না। দর্ভকদের ক্ষেত্রে যে প্রেমোন্মত্ততা অবারিত, গোঁসাই-এর যে অবাধ গমনাগমন ও প্রীতিবিনিময়, আচার্য তাহার স্বাদ হইতে বঞ্চিত। যে ধর্মবোধ রামানন্দ, কবীর, নানক, বৈষ্ণব সহজিয়া ও বাউল প্রভৃতি হিন্দুবিধিবহির্ভূত সাধকদের মর্মস্থল হইতে উৎসারিত, তাহাই রবীন্দ্রনাথের অন্তর-সমর্থিত ও তাহারই প্রতীকরূপে তিনি দর্ভকদের স্বতঃস্ফূর্ত ভগবদাকূতি ও ভক্তিরসকোমলতাকে কল্পনা করিয়াছেন। দর্ভকপল্লীর দৃশ্য দুইটি (অচলায়তন ৪ ও ৬) আত্মনিবেদনের অকপটতায় ও আড়ম্বরহীন সরল ভক্তির আবেগে যে একটি হৃদয়ের প্রত্যক্ষ পরিচয় উদ্ঘাটিত করিয়াছে, তাহাই সংশয়পীড়িত আচার্যকে মনের টানে আশ্রমছাড়া, উপাচার্যকেও সর্বাপেক্ষা বেশী মুক্তিব্যাকুল, পঞ্চককে অনিবার্য বেগে আকর্ষণ করিয়াছে। ইহাদের সংস্রবে পঞ্চকের মনে তাহার চিররুদ্ধ আবেগনির্ঝর অজস্রধারায় উৎসারিত হইয়াছে ও তাহার অন্তর্গূঢ় নিসর্গপ্রীতি মুক্তি লাভ করিয়াছে। এই প্রতিবেশে প্রায়শ্চিত্তের কঠোর শাসনে নিষ্পেষিত ও পাপবোধের তাড়নায় আত্মনিগ্রহে প্রস্তুত শিশু সুভদ্রের করুণ অসহায়তা আচার্য ও পঞ্চকের মন এক অসহ্য মর্মবেদনায় উতলা করিয়া তুলিয়াছে। এখানেই বজ্র, বিদ্যুৎ ও বর্ষাপ্লাবন আকাশ-বাতাসের দুঃসহ গুমটভাবকে বিদীর্ণ করিয়া মুক্তির মন্ত্র শোনাইয়াছে। আচার্যের সঙ্গে গুরুর বোঝাপড়া, অচলায়তনের ভবিষ্যৎ আদর্শনিরূপণ ও নূতন আচার্য-নিয়োগ প্রভৃতি নাটকের পরম সিদ্ধান্তগুলি এইখানেই ঘোষিত হইয়াছে। দর্ভকেরা যদিও শান্তিপ্রিয় ও শোণপাংশুদের ন্যায় দুর্দম যুদ্ধনিপুণ নয়, তথাপি তাহারা তাহাদের সরল বিশ্বাস লইয়া আশ্রমকে আসন্ন ধ্বংস হইতে বাঁচাইবার জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত সহযোগিতায় প্রস্তাব করিয়াছে। সুতরাং নাটকের সমস্যা-সমাধানের বিশিষ্ট পটভূমিকারূপে ইহার মধুর ভাবপরিবেশ নাটকঘটনায় একটি কেন্দ্রীয় অংশ গ্রহণ করে।

২

এইবার মূল নাটকের দৃশ্যবিন্যাসের সূত্রটি লক্ষ্য করা যাইতে পারে। প্রথম দৃশ্যে অচলায়তনের আশ্রমে পঞ্চকের মন্ত্রশিক্ষার বৃথা প্রয়াসের ও অন্যান্য আশ্রমিকদের তাহার প্রতি পরিহাস ও মহাপঞ্চকের ভর্ৎসনার বর্ণনা

দিয়া নাটকের আরম্ভ। পঞ্চকের প্রথম ও দ্বিতীয় গানে তাহার উতলা চিত্তের পরিচয়; গুরুর আগমনবিষয়ে পঞ্চকের মহাপঞ্চকের নিকট জিজ্ঞাসা; সুভদ্রের পাপ ও অনুশোচনা ও তাহার দুঃসাহসের জন্য বালকদলের ভীতি-মিশ্র কৌতূহল, উপাধ্যায়ের নিকট সুভদ্রের অপরাধস্বীকার ও এই ব্যাপারে আশ্রমকর্তৃপক্ষের মধ্যে তুমুল আলোড়ন ও তাহার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা। আচার্য ও উপাচার্যের মধ্যে আশ্রমের সাধনাপদ্ধতি সম্বন্ধে আত্মসমীক্ষা-সূচক আলোচনা ও আচার্যের অস্বস্তি-কণ্টকিত সংশয়বোধ; ইহারই ফলে মহাপঞ্চক-নির্দেশিত ও উপাধ্যায়-সমর্থিত প্রায়শ্চিত্তবিধিতে আচার্যের অসম্মতি ও মহাপঞ্চকের নেতৃত্বে আশ্রমিক সংঘের আচার্যের প্রতি বিদ্রোহ-ঘোষণা। এই অঙ্কে আমরা আশ্রমের জীবনচর্যা, উহার মানবিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও আভ্যন্তরীণ বিরোধের একটি প্রাথমিক চিত্র পাই। এখানে গুরুর আবির্ভাব-সম্ভাবনাকে একটি সুদূর ইঙ্গিতরূপে প্রথম আভাসিত করা হইয়াছে ও ইহাই যে নাটকের কেন্দ্রীয় ঘটনা তাহা যতদূর সম্ভব অ-ঘোষিত রহিয়াছে। নিদাঘ-অপরাহ্নে প্রথম বিদ্যুৎস্ফুরণের ন্যায় ইহা ঋতুপরিবর্তনের সঙ্কেতবাহী ও আশ্রমের আকাশ-বাতাসে বিক্ষোভ-মেঘের ক্রমসঞ্চার ও বিপর্যয়-ঝটিকার পূর্বাভাসসূচক।

দ্বিতীয় দৃশ্যে শোণপাংশুদের জীবনযাত্রা ও উহার অন্তর্নিহিত আদর্শের বিবরণ। পঞ্চক আশ্রমের বদ্ধবায়ু ও শোণপাংশুদের মুক্ত জীবন-উল্লাসের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করিয়াছে। অবশ্য পঞ্চকের গানগুলির সূক্ষ্ম তাৎপর্য যে এই বস্তুবাদী, অধ্যাত্মচিন্তাবিমুখ, কর্মপাগল জনসংঘ অনুভব করিয়াছে তাহা সন্দেহ। তবে তাহাদের নৃত্যগীত ও অস্থির মানসচাঞ্চল্যের সংস্পর্শ পঞ্চকের সংশয়পীড়িত মুক্তি-কামনাকে আরও পরিস্ফুট রূপ দিয়াছে। ইহাদের মধ্যে দাদাঠাকুরবেশী গুরুর আবির্ভাব একটু অসাধারণ মনে হয়। কেন না গুরুর অনুকূল আবির্ভাবক্ষেত্র হইল আত্মসমীক্ষাপরায়ণ, অন্তর্মুখী একাগ্রতা, যাহা ইহাদের মধ্যে একেবারেই নাই। হয়ত নাট্যকার এই ব্যঞ্জনাই ফুটাইতে চাহিয়াছেন যে যাহারা উচ্চতর তত্ত্বচিন্তাহীন হইয়াও সরল ও সতেজ জীবনমদিরাপায়ী তাহারা বাস্তববিমুখ মূঢ় কৃচ্ছ্রসাধনরতজাতি অপেক্ষা ভগবৎস্বরূপের অধিকতর সন্নিহিত। এখানে দাদাঠাকুর ও পঞ্চকের মধ্যে সুদীর্ঘ তত্ত্বালোচনা হয়ত খানিকটা নাট্যরসবিরোধী ও অতিপল্লবিত। উহাদের মধ্যে শোণপংশুদের জীবনতত্ত্বসমীক্ষা লইয়াও কিছু ভাববিনিময়

হইয়াছে। এই পরিস্থিতিতে আচারমূঢ়দের দ্বারা চন্দ্রকের অন্ধসংস্কার-প্রণোদিত হত্যার সংবাদ ও দাদাঠাকুরের উদ্দীপ্ত রোষ শোণপাংশুদের বিজয়াভিযানকে উত্তেজিত করিয়া অচলায়তনের ধ্বংসের প্রথম প্রয়াস রূপে দেখা দিয়াছে। ইহাতে শোণপাংশুদের সহিত আশ্রমবাসীদের জীবনাদর্শের পার্থক্য ও কুসংস্কারের মূলোচ্ছেদে প্রাণোচ্ছল বৈশ্যশক্তির প্রভাব নির্দেশিত হইয়াছে। সুতরাং নাটকের রূপবিবর্তনে ইহার একটি প্রধান অংশ আছে।

তৃতীয় দৃশ্যে ক্ষণিক দৃশ্যপরিবর্তনের পর আবার লেখক আমাদিগকে অচলায়তন আশ্রমে ফিরাইয়া আনিয়া সেখানকার পরিস্থিতির পরবর্তী স্তরের চিত্র দেখাইয়াছেন। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে এই ঘটনাবলীর সমস্তটাই রূপান্তরিত 'গুরু' নাটকে প্রথম দৃশ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। নাটকীয় কলাকৌশলের দিক দিয়া ইহা অবাঞ্ছিত পরিবর্তন বলিয়াই মনে হয়। জীবনের মত নাটকেও আমরা ঘটনা-পরিণতির একটি স্তরবিন্যাস দেখিতে চাই। সমস্ত বীজ যদি সঙ্গে সঙ্গে অঙ্কুরিত হয়, বীজ ও অঙ্কুরের মধ্যে যদি উপযুক্ত পরিমাণ কালব্যবধান না থাকে তবে নাটকের জীবনানুবর্তিতা ক্ষুণ্ণ হয়। 'গুরু'-তে আশ্রমের সমস্ত ধূমায়িত বিক্ষোভ সঙ্গে সঙ্গে প্রজ্বলিত হওয়ায় এই ক্রমপরিণতির স্বভাবপর্যায়টি বিপর্যস্ত হইয়াছে। দ্রষ্টব্য যে পরবর্তী রূপান্তরে লেখকের পূর্বনির্দিষ্ট তত্ত্বপ্রেরণা জীবনের সহজ বিকাশছন্দটিকে লঙ্ঘন করিয়াছে। এই তৃতীয় দৃশ্যের মধ্যে আশ্রম-তরুণদের সংশয় ও আচার্যের শিথিলতা সম্বন্ধে দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব, তাহাদের নিকট আচার্যের ত্রুটিস্বীকার, পঞ্চকের নৃত্যোল্লাস ও মহাপঞ্চকের ভর্ৎসনা, মহাতামস ব্রত-সাধনে সুভদ্রের সংস্কারপ্রণোদিত প্রায়শ্চিত্তের জন্য ব্যগ্রতা, রাজার আবির্ভাব, অদীনপুণ্যের দর্ভক-পল্লীতে নির্বাসন ও মহাপঞ্চকের আচার্যপদে বরণ প্রভৃতি ঘটনা প্রথম দৃশ্যের ঘটনাসংস্থাপনের সার্থক পরবর্তী স্তর রূপে দেখান হইয়াছে।

চতুর্থ দৃশ্যে আশ্রমের উপকণ্ঠস্থিত, অথচ আশ্রমের জীবনসাধনা হইতে সম্পূর্ণ বিবিক্ত দর্ভকপল্লীর পরিবেশে নাটক প্রবেশ করিয়াছে। দর্ভকদের ভাবপ্রবণ ও ভক্তিরসাতুর জীবনপরিমণ্ডলে পঞ্চক নিজ স্বতঃস্ফূর্ত আত্মপ্রকাশের অনুকূল আবহাওয়ার সন্ধান পাইয়াছে ও তাহার অন্তররুদ্ধ গীতধারা বাধাহীন উচ্ছলতায় উৎসারিত হইয়াছে। তাহার সঙ্গে দর্ভকদের মনের সুর সম্পূর্ণ মিলিয়া গিয়াছে ও পঞ্চকের নৃত্যোল্লাস দর্ভকদের প্রাণোৎ-সারিত আকুল শরণাগতির সহিত একই ছন্দে গ্রথিত হইয়াছে। ইতিমধ্যে

নির্বাসিত আচার্য দর্ভকপল্লীতে আসিয়াছেন ও দর্ভকদের দ্বারা অকৃত্রিম ভক্তিনিবেদনে সংবর্ধিত হইয়াছেন। পঞ্চক ও আচার্য পরস্পরের নিকট নিজ নিজ অন্তরনিরুদ্ধ আকূতিকে উন্মুক্ত করিয়াছেন ও পঞ্চক এখানকার আকাশে-বাতাসে আসন্ন বর্ষার স্নিগ্ধতা অনুভব করিয়াছে। আচার্য যেন এই নির্মল প্রতিবেশে তাঁহার অতীন্দ্রিয় অনুভূতির সূক্ষ্মতার সাহায্যে আচার-মূঢ়তার উৎপীড়নক্লিষ্ট বালক সুভদ্রের চাপাকান্না শুনিতেছেন। উপাচার্যও আসিয়া আচার্য ও পঞ্চকের সঙ্গে যোগ দিয়াছেন ও আশ্রমের সঙ্কীর্ণ শাসনব্যবস্থার প্রতি প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। আশ্রমনীতির বিরুদ্ধে বহির্বিক্ষোভ ও উহার মধ্যে অন্তর্বিরোধ আরও প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। এদিকে বর্ষার প্রথম আভাস মেঘের শ্যামসমারোহে ঘনীভূত ও বজ্রধ্বনিতে সোচ্চার হইয়া উঠিয়া আতপক্লিষ্ট মনের শান্তিস্নানের আশাকে উদ্দীপ্ত করিয়াছে। দর্ভকগোষ্ঠী তাহাদের উদ্দাম বর্ষাপ্রশস্তির গানের মাধ্যমে পঞ্চক ও আচার্যের নিগূঢ়তর ভাবধারামোচনের সহিত তাল মিশাইয়াছে। সবসুদ্ধ দৃশ্যটি একটি স্নিগ্ধ প্রশান্তরসে আমাদিগকে নিমজ্জিত করে।

'গুরু'-তে এই চতুর্থ দৃশ্যটি কিছুটা সংক্ষেপীকরণ ও পরিবর্জনসহ উহার তৃতীয় দৃশ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। বর্জনক্রিয়া প্রধানতঃ গান ও তত্ত্বালোচনার উপরেই পড়িয়াছে। পঞ্চকের প্রথম ও দ্বিতীয় গান (এই মৌমাছিদের ও সকল জনম ভরে), দর্ভকদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় গান (আমরা তারেই জানি) ও (উতলধারা বাদল ঝরে) এবং আচার্যের মিলিত সঙ্গীত (ভুলে গিয়ে জীবনমরণ) এগুলি পরবর্তী রূপে স্থান পায় নাই। তত্ত্ববর্জনের দৃষ্টান্তস্বরূপ আচার্যের সঙ্গে পঞ্চকের আলোচনার খানিকটা অংশ (পৃঃ ৪০১ ও পৃঃ ৪০৩—৪০৪ রবীন্দ্ররচনাবলী ৬ষ্ঠ খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ) উল্লিখিত হইতে পারে। ঘটনাও কিছু কিছু অনাবশ্যকবোধে পরিত্যক্ত হইয়াছে। উপাচার্যের প্রবেশ ও দর্ভকদলের অভ্যর্থনা-সমারোহ এই দুইটিও ঘটনাবর্জনের অন্তর্ভুক্ত।

'গুরু'-র তৃতীয় দৃশ্যে পূর্বনাটকের ষষ্ঠ দৃশ্যের কিছু কিছু অংশ গৃহীত হইয়াছে। এই সংযোজিত অংশগুলির মধ্যে ৪১১—৪১২ পৃষ্ঠায় দাদাঠাকুর বা গুরুর সঙ্গে আচার্যের সাক্ষাৎ ও গুরুর ধর্মতাৎপর্যব্যাখ্যা ও আচার্য-অনুসৃত নীতির ভ্রান্তিনিরসন এবং আশ্রমপরিচালনার নূতন ব্যবস্থা ও ভবিষ্যৎ আদর্শ-নির্ণয় প্রভৃতি নাটকের শেষ ফলশ্রুতির, চরম মীমাংসার কথা শোনা যায়।

এই সমস্ত বিষয় নাটকের শেষ পরিণতির সমাপ্তি-ঘোষণারূপে 'অচলায়তন'-এর উপসংহার-দৃশ্যে সন্নিবিষ্ট। কিন্তু 'গুরু' নাটকে সেগুলি ঘটনাবৃত্তের যে স্তরে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে তাহা অনেকটা অসাময়িক ও ইহার ফলে শেষ দৃশ্যের গুরুত্ব অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে। যে ক্রমবর্ধমান গতিবেগ ও শীর্ষ-উন্নয়ন নাটকের প্রাণ, এখানে সেই স্বাভাবিক ক্রমের বিপর্যয় ঘটিয়া পাঠকের প্রত্যাশাকে ঊর্ধ্বগামী করা অপেক্ষা বরং নিম্নগতিমুখীই করিয়াছে। এ যেন সিঁড়ির ঊর্ধ্বারোহণ অপেক্ষা অবতরণেরই সঙ্গে বেশী মেলে।

অবশ্য এক্ষেত্রে যে পরিবর্তন-পরম্পরা সাধিত হইয়াছে তাহা সবই যে অপকর্ষের হেতু হইয়াছে তাহা বলা যায় না। নাট্যকার এখানে গীতি-উচ্ছ্বাস ও তত্ত্বালোচনার আতিশয্যকে বহু পরিমাণে সংযত করিয়া নাট্যকলা-নীতির প্রতি আনুগত্যই দেখাইয়াছেন। মূল নাটকে হয়ত এই দুইটি প্রবণতার অতিবিস্তার কিছুটা নাট্যরসবিরোধী। কিন্তু এই পরিবর্জনের ফলে দর্ভক-পল্লীর জীবনচিত্র ও নাটক-সমস্যা-সমাধানে উহাদের প্রভাব কিছু পরিমাণে অস্পষ্ট হইয়াছে। শোণপাংশু ও দর্ভক এই দুই জাতির জীবনাদর্শ যদি হিন্দুধর্মাদর্শের পরিপূরকরূপে পরিকল্পিত হইয়া থাকে, তবে নাট্যকার এই উদ্দেশ্যসঙ্কোচ ও মাত্রাতিরিক্ত দ্রুতগতির বিধানে কিয়ৎপরিমাণে উহাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিয়াছেন। নাটকে প্রাসঙ্গিক ও আপাত-অপ্রাসঙ্গিকের সমাবেশে জীবনের যে পূর্ণতার চিত্র ফুটিয়া উঠে, তত্ত্বপ্রবণতার অতিকঠোর নিয়ন্ত্রণে সেই স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের বাধা ঘটে ও উদ্দেশ্যের কঙ্কাল অঙ্গসৌষ্ঠবের মসৃণতাকে ভেদ করিয়া অতিমাত্রায় প্রকট হয়। হয়ত নাটকের তত্ত্ববস্তুটি ফুটাইবার অতি-আগ্রহে রবীন্দ্রনাথ জীবনধর্মের এই স্বভাবনিগূঢ়তার প্রতি কতকটা উদাসীন হইয়াছেন। আরও একটি গুরুতর পরিবর্তন রূপান্তরিত নাটকের মানবিক আকর্ষণকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। মূল নাটকে পঞ্চকের অনুভূতির মাধ্যমে ধর্মবোধের সহিত প্রকৃতি-চেতনার, ঘোরতর গ্রীষ্মতাপের পর নববর্ষার বিদ্যুৎ-বজ্রধ্বনি-ধারাপাতের স্নিগ্ধ অভিষেকের যে ব্যঞ্জনাময় সম্পর্ক আভাসিত হইয়াছে তাহাতে নাটকটির ভাবাবহ এক নিগূঢ় অর্থ-দ্যোতনায় মায়াময় হইয়া উঠিয়াছে। 'গুরু'তে এই ঋতুর শ্যামস্নিগ্ধ স্পর্শ অনেকটা শীর্ণ-সঙ্কুচিত হইয়া তত্ত্বকাঠিন্য রূঢ় নগ্নতায় প্রকটিত হইয়াছে। ইহা নাটকের সঙ্কেতশক্তিকে অনেকটা সীমাবদ্ধ করিয়াছে।

৩

'অচলায়তন'-এর পঞ্চম দৃশ্যে শোণপাংশুদের অভিযান ও গুরুর আগমন-সম্ভাবনা আশ্রমিকদের মনে যুগপৎ আশা-আশংকার দোলা জাগাইয়াছে। উপাধ্যায় ও মহাপঞ্চকের মধ্যে সংলাপে সঙ্কট যে আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে, এই সংবাদ আমাদিগকে নাট্যকাহিনীর চরম সমাধানের পথে অনেকখানি অগ্রসর করিয়া দিয়াছে। আমরা উপাধ্যায়-প্রমুখাৎ শুনিতে পাই যে আশ্রমের প্রাচীর-বেষ্টনী ভূমিসাৎ হইয়াছে ও গুরুর শাস্ত্রবিধান-অনুযায়ী প্রত্যুদ্‌গমনের সমস্ত আয়োজন অর্থহীন হইয়া পড়িয়াছে। এই অবস্থাসঙ্কটে মহাপঞ্চকের অটুট মনোবল ও নিজ ধর্মাদর্শে অবিচল আস্থা তাহার চরিত্রের যথার্থ মহনীয়তা ঘোষণা করিয়াছে। সুবিধাবাদী দলের তাহার নেতৃত্বের প্রতি বিদ্রোহ তাহাকে আত্মবলি দিবার সংকল্পে দৃঢ়তর নিষ্ঠা দিয়াছে। এই পরিস্থিতিতে বালকদলের নৃত্যোল্লাস ও তাহাদের অনভ্যস্ত আলোক-বন্দনা সর্বনাশের মধ্যে মুক্তির ইঙ্গিত বহন করিয়া আনিয়াছে। বালকদলের নির্ভরতাবোধ মহাপঞ্চকের আত্মপ্রত্যয়ের দ্বারা সমর্থিত হইয়া আশ্রম-পরিবেশ আবার নূতন আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। ইতিমধ্যে শঙ্খবাদক ও মালী গুরুর আগমনবার্তা জানাইয়াছে। মনে হয় ধর্মের সমস্ত কৃত্রিম আয়োজন-বাহুল্যের মধ্যে শঙ্খধ্বনি ও পুষ্পার্ঘ্য তাহাদের আদিম বিশুদ্ধি অক্ষুন্ন রাখিয়াছে—সমস্ত জটিল অনুশাসনজালের মধ্যে ভগবদুপলব্ধির প্রথম অকৃত্রিমতা তাহাদের মধ্যেই সংরক্ষিত। সেইজন্য গুরুপূজকদের মধ্যে তাহাদেরই অন্তরাত্মা ভগবানের আবির্ভাব সম্বন্ধে প্রথম নিশ্চিত প্রত্যয় অনুভব করিয়াছে।

সঙ্গে সঙ্গে যোদ্ধবেশে শোণপাংশুদের উপাস্য দেবতা দাদাঠাকুরের প্রবেশে একটি নাটকীয় ক্রান্তিমুহূর্ত সৃষ্ট হইয়াছে। মহাপঞ্চক ও উপাধ্যায়, যাহারা কোনকালেই গুরুর সাক্ষাৎ দর্শনধন্য হয় নাই, গুরুর অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে সংশয়ান্বিত। পার্থক্যের মধ্যে উপাধ্যায় পরোক্ষ-প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া গুরুর নিকট আনুগত্য-জ্ঞাপনে উৎসুক; মহাপঞ্চক কিন্তু শাস্ত্রীয়প্রমাণ-নিরপেক্ষভাবে গুরুর অস্তিত্ব-স্বীকারে পরাঙ্‌মুখ ও তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-ঘোষণায় সোচ্চার (যে ভগবান্ শাস্ত্রীয় প্রক্রিয়া ব্যতিরেকেই আত্মপ্রকাশ করেন তাঁহার নিকট সে কিছুতেই মাথা নত করিবে না।) যে অকুতোভয়ে

অস্পৃশ্য শোণপাংশুদের দেবতাকে অস্বীকার ও তাঁহার আদেশকে দৃঢ়ভাবে প্রতিহত করিয়াছে। সে জীবনমরণপণ প্রতিরোধ-সঙ্কল্পে অবিচল রহিয়াছে। দাদাঠাকুর মহাপঞ্চকের মহত্ত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছেন ও তাহার বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগের ব্যর্থতা ঘোষণা করিয়াছেন। ইতিমধ্যে আশ্রমশিশুর দল তাহাদের শৈশবসরলতা ও ক্রীড়ারসমত্ততার জন্য গুরু-প্রতিশ্রুত মুক্তির অবাধ আনন্দকে বরণ করিয়া লইয়াছে। ইহারাই আশ্রমবাসীদের মধ্যে প্রথম নূতন গুরুকে সহজ অনুভবের স্বীকৃতি দিয়াছে। মহাপঞ্চক কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রত্যাখ্যানে অটল আছে।

'গুরু'র চতুর্থ দৃশ্য নাটকের অন্তিম দৃশ্য। ইহাতে মূলের পঞ্চম দৃশ্যের পৃঃ ৪০৪ হইতে পৃঃ ৪০৬* ও বালকদের নৃত্যোল্লাস, শঙ্খবাদক ও মালীর আগমনঘোষণা, মহাপঞ্চকের সহিত দাদাঠাকুরের বিতণ্ডা পৃঃ ৪০৭—পৃঃ ৪১০ পর্যন্ত বিষয়-বস্তু-সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার সহিত ষষ্ঠ দৃশ্যের পৃঃ ৪১৩—পৃঃ ৪১৫, পৃঃ ৪১৬* পৃষ্ঠার বিষয়বস্তু ও একেবারে শেষ অংশ—সুভদ্রের প্রতি গুরু ও পঞ্চকের প্রবোধদান-বিষয়—সংযোজিত হইয়াছে। পঞ্চম দৃশ্য হইতে গৃহীত অংশগুলি হইতে কতকগুলি গান 'আলো, আমার আলো', ও শোণপাংশুদের গানটি পরিত্যক্ত হইয়াছে। তত্ত্বালোচনার বাহুল্য ও সংলাপের কোন কোন অংশও বাদ পড়িয়াছে। ইহাতে শোণপাংশু ও দর্ভকদের ভূমিকা অনেকখানি ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। ইহাতে যে উপসংহারসূচক গানটি 'ভেঙেছে দুয়ার, এসেছে জ্যোতির্ময়', ঠিক নাটকের বিষয়বস্তুর মর্মবাণীরূপে নাট্যঘটনার সহিত অচ্ছেদ্যসম্পর্ক-যুক্ত নয়; ইহা মৃত্যুপ্রশস্তি, বিভিন্ন ভাবাসঙ্গ হইতে কৃত্রিমভাবে আরোপিত মনে হয়। এই পরিবর্তনের ফলে যে নাটকীয় সঙ্গতি অনেকটা ব্যাহত হইয়াছে এই অভিমত পূর্বেই ব্যক্ত হইয়াছে। 'অচলায়তন'-এর ষষ্ঠ দৃশ্যে দর্ভকপল্লীর গান (আমি যে সব নিতে চাই) ও দর্ভকদের আশ্রম-অভিযান-প্রতিরোধে সোৎসাহ সহযোগিতার প্রস্তাব, আচার্য, পঞ্চক ও দর্ভকদের মধ্যে দাদাঠাকুর, গোঁসাই ও গুরুতত্ত্বের বৈচিত্র্যের মধ্যে অভিন্নতা-বিষয়ক তত্ত্বালোচনা, পঞ্চকের গান (আর নহে আর নয়,), মালীর দ্বারা আচার্যের নিকট, গোঁসাইরূপে পরিচিত গুরুর আগমন-ঘোষণা, দর্ভকদের গোঁসাই-এর প্রতি আতিথ্য-নিবেদন, আচার্য ও গুরুর ধর্মতত্ত্ব-আলোচনা ও পঞ্চকের মীমাংসা, শোণপাংশুদের নবধর্মব্যবস্থায় স্থাননির্দেশ; সুভদ্রের

* পৃষ্ঠাসংখ্যা রবীন্দ্ররচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণের নির্দেশক।

প্রায়শ্চিত্ত-ক্ষালন ও একজটার ভীতিমুক্তি, মহাপঞ্চক, পঞ্চক ও শোণপাংশুদের ভবিষ্যৎ কর্মনীতিনির্ধারণ—এইগুলির ভিতর দিয়া নাটকীয় ঘটনাচক্র পূর্ণতায় পৌঁছিয়াছে। এই উপসংহারের মধ্যে নাটকের ক্রিয়ার একটি সর্বাঙ্গীণ তৃপ্তিপ্রদ পরিণতি ঘটিয়াছে। ইহাতে প্রত্যেক অংশের একটি যথাযোগ্য স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে, সমস্ত বিপরীতমুখী ঘটনাসূত্র একটি কেন্দ্রে সংহত হইয়াছে। এই দিক দিয়া সাঙ্কেতিক নাটকের মধ্যে এই নাটকের স্থান অপেক্ষাকৃত গৌণ ও বহিরঙ্গমূলক হওয়া সত্ত্বেও ইহা জীবনপরিবেশের উদার বিস্তার ও সূক্ষ্ম সঙ্গতিবোধ ও প্রাণোচ্ছলতার প্রসাদে তত্ত্বসঙ্কীর্ণতার সীমা অতিক্রম করিয়াছে; তত্ত্বের মধ্যে জীবনধর্মিতা রূপ পাইয়াছে। 'গুরু'-তে কোন কোন দিক দিয়া নাটকীয় সংহতি নিবিড়তর হইলেও উহার জীবনরস অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ ও উদ্দেশ্য-নিয়ন্ত্রিত ধারায় সঙ্কুচিত।

দ্বাদশ অধ্যায়

ডাকঘর ও ফাল্গুনী

ডাকঘর (১৯১১, ১৩১৮)

'ডাকঘর'ই একমাত্র সাংকেতিক নাটক, যাহাকে রবীন্দ্রনাথ পুনর্বিবেচনার ফলে কোন নূতন রূপ দেন নাই। ইহা হইতে সঙ্গতভাবেই অনুমান করা যাইতে পারে যে ইহার অন্তর্নিহিত তত্ত্বপ্রেরণার রূপবিন্যাস সম্বন্ধে তাঁহার ভাবুকসত্তা ও শিল্পীসত্তার মধ্যে কোন অন্তর্বিরোধ দেখা দেয় নাই—দার্শনিক ও রূপকার এ বিষয়ে সম্পূর্ণ ঐক্যমতে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বস্তুতঃ 'ডাকঘর' কবিমনের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সূক্ষ্মতম ভাবানুভূতি; উহার উদ্ভব ও বিকাশ কুঁড়ি ও পুষ্পের ন্যায় একই সুকুমার উন্মেষের দল-উন্মোচন, লঘুতম নাট্যদেহ-বিধৃত বিশুদ্ধ গীতমূর্ছনা। ইহার নাট্যরূপ ও গীতিরূপ সম্পূর্ণভাবে একাঙ্গীভূত, উহাদের মধ্যে কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্বের চিহ্নমাত্র বিলুপ্ত। চন্দনকাষ্ঠের অন্তর্লীন সুবাসের মত উহার তত্ত্বকথা সৌরভের ন্যায় উহার ভাবদেহে অনুলিপ্ত। বাঁশের বাঁশীর যেমন বস্তুবেষ্টনী ও রন্ধ্রগুলির যুগপৎপ্রয়োগে সবই এক সুরসৃষ্টির সূক্ষ্ম উদ্দেশ্যসীমিত, উহার ফাঁক ও অবয়বঘনত্ব যেমন মুক্তি ও অবরোধের ফুৎকারবায়ু সঙ্গীতরূপান্তরে নিয়োজিত, তেমনি এই নাটকের তথ্যবিন্যাস ও ভাবব্যঞ্জনা উভয়ে মিলিয়া এক অখণ্ড, যৌগিক আবহসঙ্গীত রচনা করিয়াছে। 'ডাকঘর'ই রবীন্দ্রনাথের সাঙ্কেতিক নাট্যগোষ্ঠীর মধ্যে এক সার্থকতম ভাবসঙ্গতির বাহন—উহার তত্ত্ব, উহার নাট্যকৌতূহল ও উহার অন্তরতম রস-আবেদন, উহার অনির্বচনীয় মর্মনির্যাস সবই এক পরম পরিণামের তীর্থসঙ্গমে উত্তরণের হেতু হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুচেতনা ও অসীম প্রয়াণের আকূতি একটি রোগক্লিষ্ট, বঞ্চিত বালকমনের করুণ দিবাস্বপ্নকল্পনার মাধ্যমে অপরূপ অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। বালকচিত্তের পৃথিবীর রূপরসগন্ধের জন্য মর্মান্তিক আকুলতা, উহার বিশ্বসৌন্দর্যের ও মানবসংসারের নিত্যনূতন দিকের সহিত পরিচয়লাভের একান্ত ও অতৃপ্ত কৌতূহল অমলের মানসলোকে মরীচিকাজাল সৃষ্টি করিয়া

উহার সুপ্ত ইচ্ছাকে বস্তু ও দৃশ্যরূপ দিয়াছে। সে মনে মনে যাহা কামনা করিয়াছে তাহারই প্রতিচ্ছবি বাহিরে প্রক্ষেপ করিয়াছে। নাটকের সমস্ত দৃশ্য ও মানব পরিবেশ এই গূঢ় মানস-উৎস হইতে কায়া লইয়াছে। মনের আকাঙ্ক্ষাই বারংবার আবর্তনের ফলে ঘন ও প্রত্যক্ষ সত্য হইয়া উঠিয়াছে। কিশোর-কল্পনাই যেন নীহারিকার গ্রহে পরিণতির মত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপে ও রূপকের স্বচ্ছতম তত্ত্বদ্যোতনায় নব মানসমূর্তি লইয়াছে। মাধব দত্তের উদ্বেগ, কবিরাজের কঠোর অনুশাসন, লাঠিতে পুঁটুলি-বাঁধা পর্যটকের ঝরণা পার হইয়া অজ্ঞাত পথ-পরিক্রমা, দইওয়ালার হাঁক ও শামলী নদীর ধারে পাঁচমুড়া পাহাড়ের তলায় অবস্থিত গ্রামের পল্লীজীবনচিত্র, ডাকঘরের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে প্রহরীর সন্দেশ, চিঠির প্রত্যাশা, ছেলেদের দলের সঙ্গকামনা, রাজদূত ও রাজকবিরাজের আবির্ভাব, এমন কি সুধার প্রেমে অমরতালাভের করুণ আকুতি—এ সবই যেন জীবনপ্রত্যয়লীন রূপকথার মায়ারাজ্য হইতে চকিত ঝলকের মত এক ক্ষণিক স্বপ্নসৌন্দর্যে অভিষিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। মনের যে গোপন সুড়ঙ্গপথ দিয়া কিশোরচিত্তে স্বপ্নের আনাগোনা চলিতে থাকে এইসব দৃশ্য ও নরনারীগুলি সেই গোধূলিরহস্যময় পথ দিয়া নাটকের বস্তুলোকে স্বপ্নবিভ্রমের মত যবনিকাপ্রক্ষিপ্ত ছায়াছবির ন্যায়, চেতনালোকে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে। ইহারা বাস্তব জগতের মাধ্যাকর্ষণশক্তি ও বিশ্বাস-যোগ্যতার সত্য সম্পূর্ণ মানিয়া লয় নাই।

এমন কি যাহারা এই স্বপ্নসম্মোহের আদর্শবিরোধী সেই মোড়ল ও কবিরাজও রূপকথাবর্ণিত রাক্ষসের ন্যায় এক কাল্পনিক বিভীষিকার অতিবর্ধিত বিগ্রহরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। উহাদের নখর-দংষ্ট্রা ও সাংসারিক বুদ্ধির অতিরেক পর্যন্ত বস্তুকাঠিন্যমুক্ত হইয়া, স্বচ্ছ দর্পণের উপর কলঙ্কচিহ্ন স্বরূপ, অপ্রাকৃত সত্তায় নিজ সত্য পরিচয়কে আচ্ছন্ন রাখিয়াছে। এই সমস্ত চরিত্রের মধ্যে রবীন্দ্রনাটকে সুপরিচিত ঠাকুরদাদা ও তাহার প্রতাকী সভা ঈষৎ রূপান্তরিত হইয়া এই রূপকথারাজ্যের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়াছে। সে যেন বয়স্ক ব্যক্তির দ্বারা শিশুসাহিত্যরচনার ন্যায় নিজ অভিজ্ঞতা ও সংসারজ্ঞানের সঞ্চয় হইতে সচেতন উদ্ভাবনী-শক্তির প্রয়োগে কিশোর কল্পনাকে পুষ্ট ও পরিতৃপ্ত করিবার উপকরণ যোগাইয়াছে। ঠাকুরদাদা অমলের মনের গতি বুঝিয়া সেই কল্পনারোমন্থনকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তাহার জ্ঞানভাণ্ডার হইতে নূতন নূতন বিস্ময়ের চমকে উহাকে রোমাঞ্চিত

করিয়াছে। সে যেন মায়াদীপটিকে বাস্তব সত্যের ঝাপটা হইতে বাঁচাইয়া তাহার মনের অবিরল তৈলনিষেকে উহার কম্পিত শিখাটিকে স্থির রাখিতে প্রয়াসী হইয়াছে।

এই নাট্যবেশী গীতনির্যাসের মধ্যে যে তত্ত্বকথার সূক্ষ্মদ্যোতনা অনুভব করা যায় তাহাও উহার রূপকথাধর্মী ভাবাবহের মতই অমূর্ত ও বস্তুভারহীন, মৃদু সৌরভের মত উহার আকাশ-বাতাসে লঘুসঞ্চরণশীল। উহা প্রতিপাদনের বিষয় নয়, অনুভূতির গভীরে স্বয়ংপ্রকাশ। উহার রূপক অর্থ উহার সমস্ত সংলাপে ও মানব আচরণে, উহার সমস্ত করুণ, সূক্ষ্মসঞ্চারী জীবনকল্পনায় ও আকুতিময়তায় ওতপ্রোতভাবে অনুরণিত, অমলের বঞ্চিত, উৎসুক মানস প্রেরণার প্রতিটি দীর্ঘশ্বাসে মৃদু-উচ্ছ্বসিত। নাটকের তত্ত্বকথাকে উহার পরিবেশ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া কোন সুনির্দিষ্ট দার্শনিক তাৎপর্যে বিন্যস্ত করা যায় না। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুস্বরূপবিষয়ে প্রত্যয় অমলের মনের রঙে রঞ্জিত হইয়া, অমলের দৃষ্টিভঙ্গীতে রূপান্তরিত হইয়া কবির সাধারণ অধ্যাত্ম মতবাদ হইতে একটি সম্পূর্ণ পৃথক সত্তা অর্জন করিয়াছে। ইহা জাতিতে রাবীন্দ্রিক হইয়াও প্রকাশছন্দে অনন্য। ডাকঘরের পরিকল্পনাটির পিছনে যে ভাবসত্য নিগূঢ়ভাবে ক্রিয়াশীল, নাটকের কোন কোন স্থলে তাহার সচেতন ব্যাখ্যার প্রয়াস আছে। জীবন-ব্যাধি হইতে মৃত্যু যে মানবকে মুক্তি দিয়া তাহাকে অসীম বিস্তারের মধ্যে লীলাসঞ্চরণের অবাধ স্বাধীনতা দেয়, পৃথিবীর সমস্ত বাধা-নিষেধ, সমস্ত নিয়মবন্ধন যে একটি মুহূর্তে অর্থহীন হইয়া পড়ে, শতপাকে আবদ্ধ মানবাত্মা যে পরিপূর্ণ আত্মোপলব্ধির আনন্দ আস্বাদন করে, ভগবান্ যে বিভিন্ন ঋতুতে মানবের কাছে তাঁহার আনন্দদূত প্রেরণ করিয়া তাহাকে আপনার লীলাসাহচর্যে আহ্বান জানান, রবীন্দ্র-মনোজগতের এই সুপরিচিত ভাবপ্রত্যয় এই নাটকে উহার তত্ত্বনির্দিষ্টতা হারাইয়া এক বালক-চিত্তের করুণ মাধুরীতে ও স্বপ্নকল্পনার ইন্দ্রধনুবর্ণে অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে। সত্যের শুভ্রজ্যোতি যেন ঈষৎ বেদনাসিক্ত, সজল আবহাওয়ায় সাতটি বিভিন্ন বর্ণে বিশ্লিষ্ট হইয়া বর্ণবৈচিত্র্যের রঙ্গীন মায়া রচনা করিয়াছে। সমস্ত ঘটনা, সমস্ত দৃশ্যবর্ণনা, সমস্ত আবেগদ্যোতনা অমলের রুগ্ন মনের গোধূলিচ্ছায়া হইতে বিসর্পিত হইয়া সেই উৎসমুখেই তাহাদের সমস্ত ক্ষীণ বর্ণালিম্পন সংহরণ করিয়া লইয়াছে। দিগন্তের ইন্দ্রজাল অন্তমুহূর্তে মৃত্যুর তিমিরনিশীথে নিজ ক্ষণিক খদ্যোতদীপ্তি নির্বাপিত করিয়াছে।

'ডাকঘর'-এর সহিত রবীন্দ্রনাথের পরবর্তীকালের 'গৃহপ্রবেশ' নাটকের একটি গূঢ় আত্মিক সাদৃশ্য অনুভব করা যায়। একটিতে যেমন তরুণ কল্পনার, অন্যটিতে তেমনি প্রেমবঞ্চিত যৌবনের অতৃপ্ত ক্ষোভ ও অপ্রশমিত, আত্মবঞ্চনাপ্রবণ মনোবেদনার অলীক সান্ত্বনা-সন্ধান সমস্ত নাটকীয় দ্বন্দ্বের প্রকৃতি নিরূপণ করিয়াছে। একটিতে সদ্যকিশোর মনের অনভিজ্ঞ জীবনাস্বাদ-লোলুপতা, অপরটিতে প্রতারিত প্রেমচেতনার রুগ্ন কল্পনাজালবয়ন ও অপ্রাপ্ত বঞ্চিত তৃপ্তির স্বপ্নাশ্রয়ব্যাকুলতা নাটকের বিষয়বস্তু ও সূক্ষ্মভাবআত্মার মূল কারণ রূপে পরিকল্পিত। উভয়ত্রই মনোগহনের উৎক্ষিপ্ত এক অদম্য অভিলাষই নাট্যরূপে উদ্বর্তিত ও নাট্যপ্রেরণার উৎস। অবশ্য অমলের সহিত তুলনায় যতীনের মনোজগৎ আরও জটিল ও উহার অন্তর্দ্বন্দ্ব আরও মর্মচ্ছেদী। অমল কেবল সংসারে সদ্যোপ্রবিষ্ট, জগৎ সম্বন্ধে উহার জ্ঞান অপেক্ষা উহার জানার আগ্রহ প্রবলতর ও আরও সুদূরচারী, উহার কল্পনা আরও নিরঙ্কুশ ও বাধাবন্ধহীন। জীবন ও জগৎ তাহার সম্মুখে অজানা রোমান্স-রাজ্যের মত আরও ইঙ্গিতময়, আরও অনন্ত-প্রসারিত। যতীন সংসারবৃক্ষের সুস্বাদুতম ফল যৌন আকর্ষণের মদিরতা আস্বাদন করিয়াছে ও তাহার জাগতিক সুখকল্পনা সমস্ত দাম্পত্য প্রেমের তৃপ্তিসাধনে কেন্দ্রীভূত। এই প্রেমসাধনা তাহার সমস্ত চিন্তা ও জীবনসমীক্ষাকে এমন নিবিড়ভাবে অভিভূত করিয়াছে, যে ইহা তাহার জাগ্রতের ধ্যান-ধারণা ও কল্পনাস্বপ্নের সমস্ত উদ্‌ভ্রান্তির উপর, তাহার রোগবিকারগ্রস্ত মনের সমস্ত অনুভবশক্তির উপর এক নিশ্ছিদ্র একাধিপত্যে স্থিরপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে। সে মণিকে অবলম্বন করিয়া তাহার সমস্ত কুহকজাল, তাহার আত্মবঞ্চনার সমস্ত জটিল মোহপাশ বয়ন করিয়াছে। সে স্বেচ্ছাকৃত অন্ধতায় নিদারুণ সত্যের ক্ষীণতম রশ্মিটিকেও তাহার চেতনা হইতে রুদ্ধ রাখিয়াছে। তাহার সহিত তুলনায় অমলের কল্পনাবিহার অনেকটা স্বাভাবিক ও অনভিজ্ঞ কিশোরমনের সহজ প্রবণতারূপে প্রতিভাত হয়। একজন সরলতার প্রদোষান্ধকারে রঙীন কল্পনার বর্ণবৈভব ছড়াইয়াছে, আর একজন জানিয়া শুনিয়া না-জানার ভান করিয়াছে, অপ্রিয় সত্যকে স্বীকার করিবার সাহস হারাইয়া সূর্যালোকের প্রবেশপথ বন্ধ করিয়া অলীক সান্ত্বনার কৃত্রিম তিমিরে বঞ্চনাস্বপ্নের বাতি জ্বালাইয়াছে। ইংরাজ কবি ব্লেকের 'Songs of Innocence' ও 'Songs of Experience' এর মধ্যে যে ভাবব্যবধান তাহাই যেন এই দুই নাটকের সত্তাপার্থক্য নির্ণয় করিয়াছে।

কিশোর মনের রোগপাণ্ডুর মোহাঞ্জনস্নিগ্ধ দৃষ্টিবিভ্রমের সহিত অপগতমোহ পরিণত যৌবনের চরম নৈরাশ্য-প্রতিরোধী ব্যর্থ করুণ আকৃতির পার্থক্যই এই দুইটি নাটকের অন্তর্নিহিত ব্যবধানের পরিমাপক। অমল নিজের স্বপ্নে বিশ্বাস করে, কিন্তু যতীনের ক্ষেত্রে উহা প্রত্যয়-সমর্থনহীন। অমলের স্বপ্ন একটা সার্বভৌম প্রতীকী সত্য, কিন্তু যতীনের স্বপ্ন একটা ব্যক্তি-অভিজ্ঞতারই বিভ্রান্তি মাত্র। উভয়ের মধ্যেই ব্যাধিজীর্ণ বিকারের চিহ্ন সুপরিস্ফুট, তবে বালক অপেক্ষা প্রৌঢ়ের মানস অবক্ষয় আরও দুশ্চিকিৎস্য ও আরও করুণ সহানুভূতির উদ্দীপক।

ফাল্গুনী (ফেব্রুয়ারি ১৯১৬, ১৫ ফাল্গুন ১৩২২)

তত্ত্বনাটকপর্যায়ে 'ফাল্গুনী'র স্থান অন্যান্য নাটকের সহিত তুলনায় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। প্রথমতঃ ঋতুনাটক হিসাবে ইহা 'শারদোৎসব'-এর সগোত্রীয়। কিন্তু শারদোৎসব-এ ঋতুর আনন্দোচ্ছ্বাস ও প্রাণোচ্ছলতাই মুখ্য প্রেরণা; উহার তত্ত্বব্যাখ্যা এই সৌন্দর্য-উৎসবের অনুগামী ভাবযোজনামাত্র। উহাতে উহার মূল প্রকৃতির বিশেষ কোন বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না। শরৎলক্ষ্মীর কল্পনা ও ঋণশোধের দার্শনিকতা ঋতু-আবেদনের প্রত্যক্ষতাকে আড়াল করে নাই। প্রকৃতি হইতে প্রকৃতির অধিদেবতা ও উহার অন্তর্নিহিত জীবনদর্শন আমাদের অনুভূতিকে কোন অপরিচিত ভাবজগতে লইয়া যায় না। প্রকৃতির রূপৈশ্বর্য অতি সহজেই প্রকৃতিদেববাদের (pantheism) ও জীবননীতির ন্যূনতম ভাবসঙ্কেতের মধ্যে নিজ সীমা খুঁজিয়া পায়, টীকাভাষ্য কখনই মূল গ্রন্থকে ছাড়াইয়া যায় না। 'ফাল্গুনী'তে কিন্তু বসন্তের সৌন্দর্যলীলাকে অতিক্রম করিয়া কবির দার্শনিক উপলব্ধি মুখ্যরূপে প্রতীয়মান হয়। এই বসন্ত শরতের মত ঋতুসত্তাপ্রধান নয়, উহার মর্মসত্য কবির বিশেষ তত্ত্বভাবানুবাসিত। আমরা যখন 'ফাল্গুনী' পড়ি, তখন উহার ঋতু-পরিচয় যেন কবির একটি বিশিষ্ট দার্শনিক প্রত্যয়ের দ্বারা অভিভূত হইয়া আমাদের নিকট এক যৌগিক তত্ত্ব রূপে, অভিনব তাৎপর্যের বাহন রূপে দেখা দেয়। এ বসন্ত যেন উহার অঙ্গকান্তি হইতে এক নূতন রূপক-রশ্মি ছড়াইয়া এক

জটিল দর্শনতত্ত্বের যবনিকা ভেদ করিয়া, এক মৌলিক রহস্যদীপ্তিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। এ বসন্ত ঠিক ইন্দ্রিয়বেদ্য বসন্ত নয়, অধ্যাত্ম অনুভূতির সঙ্কেতময় বসন্ত। 'ফাল্গুনী'র বসন্ত শুধু মধুঋতু নয়, ইহা প্রণয়সম্মোহঘন, বিলাসশ্লথ, স্বপ্নাবিষ্ট কোন কালখণ্ড নয়। ইহা ছদ্মবেশনিপুণ, মায়াবী, সৃষ্টিতত্ত্বদ্যোতক একটি মানস অভিযানের প্রেরণা। ইহা মানবমনকে উধাও করে, আপাতপ্রতীয়মান অভিজ্ঞতার অন্তর্লীন নিগূঢ়তর জীবনতত্ত্বের সন্ধান দেয়, জীর্ণ জরা-কঙ্কালের মধ্যে চিরযৌবনের অক্ষয় অস্তিত্ব অনুভব করে। ইহা মৃত্যুর অন্ধকার গুহায় প্রবেশ করিয়া সেখানকার বন্দী নবীন প্রাণশিখাকে উদ্ধার করিয়া আনে। ইহা নির্বাপিত অঙ্গারভস্মের মধ্য হইতে শাশ্বত জীবনহোমাগ্নির অনির্বাণ তেজস্ফুলিঙ্গকে নূতন করিয়া প্রজ্বলিত করে। এই সৃষ্টিপ্রেরণার সহায়ক ঋতুর নবীন করপুটে প্রাণরহস্যের বীজমন্ত্র নিগূঢ়নিহিত। ইহা সৃষ্টির সৌন্দর্যের সহিত স্রষ্টার বিভূতি মিশাইয়া গোত্রান্তরিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ এই নাটকের আর একটি অসাধারণ বৈশিষ্ট্য সহজেই লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত তত্ত্বনাটকেই কবির দার্শনিক প্রত্যয়ের পিছনে কোন-না-কোন সার্বভৌম অধ্যাত্ম সত্যের সমর্থন অনুভববেদ্য। এই সার্বজনীন প্রত্যয়-সমতাই লেখক ও পাঠকের মধ্যে একটি যোগসূত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া নাট্য-আবেদনের মূল প্রেরণা যোগায়। 'শারদোৎসব' 'রাজা', 'অচলায়তন', 'ডাকঘর'—সর্বত্রই কবির ব্যক্তিগত মতবাদ সার্বভৌম স্বীকৃতির সহায়তায় দৃঢ়ীভূত ও সহৃদয়-হৃদয়সংবেদ্য হইয়া উঠিয়াছে। নাট্যকার যে নব সাঙ্কেতিকতার পথে আমাদিগকে চালনা করিয়াছেন, আমাদের মনোলোক সে নির্দেশ-অনুসরণে পূর্ব হইতেই প্রস্তুত থাকে। কবির আমন্ত্রণ-দাক্ষিণ্য গ্রহণ করিবার জন্য আমাদের প্রসন্ন স্বীকৃতি চির-উৎসুক। এই সম-ঔৎসুক্যের মধ্যবর্তিতা ছাড়া নাট্যরস শুধু লেখকের শিল্পকৌশলে ও অনুভব-সূক্ষ্মতায় এক তরফা জমিয়া উঠিতে পারে না। 'শারদোৎসব'-এ শরৎলক্ষ্মীকে দেখিবার জন্য আমাদের কল্পনা উন্মুখ হইয়াই আছে। 'রাজা' ও 'অচলায়তন'-এ উপনিষদের ব্রহ্মবাদ, বৈষ্ণব রসতত্ত্ব ও আচারমূঢ়তার প্রতি অনাস্থা প্রত্যেকটি ভাবুক চিত্তকে কবির ভাবগ্রহণের জন্য অনুকূল করিয়াই রাখিয়াছে। 'ডাকঘরে'-এ অমলের অনির্দেশ্য ব্যাকুলতা ও সংসারবন্ধনমুক্তির আকূতি প্রতি অন্তর্মুখী চিত্তেই প্রতিফলিত হয়। এই সমস্ত ক্ষেত্রে

নাট্যকার ও নাট্যরসিকের মধ্যে একটি সহজ মিলনসেতু তাহাদের ব্যবধানকে বহু পরিমাণে দূরীভূত করিয়া একটি সাধারণ বিনিময়ক্ষেত্র রচনা করিয়াছে। কিন্তু 'ফাল্গুনী' এই নিয়মের ব্যতিক্রমস্থানীয় বলিয়াই মনে হয়। এখানে কবির যে বিশিষ্ট প্রত্যয় তাহা একান্তভাবে তাঁহার নিজস্ব ও রসিকগোষ্ঠীর সহজসমর্থনবঞ্চিত। বার্ধক্যের পিছনে যৌবনের ছদ্মবেশী অস্তিত্ব, শীতের ঝরাপাতার আবরণ ভেদ করিয়া চিরনবীন প্রাণশক্তির বর্ষে বর্ষে পুনরাবির্ভাব বহিঃপ্রকৃতির পক্ষে যতটা প্রত্যক্ষ সত্য, মানবজীবনে তাহা ততটা স্বয়ং-প্রকাশ নয়। এই সত্যের উদ্ভাসন এক বিশেষ রীতির দার্শনিক চিন্তার সিদ্ধান্ত হইতে পারে, কিন্তু সাধারণ তত্ত্বদর্শীর মনে ইহা সহজ প্রত্যয়-সংস্কাররূপে এখনও অঙ্কুরিত হয় নাই। এই জটিলচিন্তাপ্রসূত তত্ত্বনীতি রবীন্দ্রজীবনদর্শনের একটি বহু-উপলব্ধ মানস সত্য তাহা সুনিশ্চিত, কিন্তু যে পর্যন্ত উহা সাধারণ জীবনসমীক্ষাপরায়ণ চিন্তাশীল ব্যক্তির স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকৃতি লাভ না করিবে সে পর্যন্ত উহা নাট্যরসসৃষ্টির অনুকূল হইবে না। বুদ্ধিগ্রাহ্য মতবাদের মধ্যে জীবনশক্তিসঞ্চারের জন্য সে স্বভাবসিদ্ধ সমানুভূতির অপরিহার্য প্রয়োজন, মনে হয় 'ফাল্গুনী' নাটকে তাহার অভাব আছে। ইহা রবীন্দ্রনাথের মননলোক উত্তীর্ণ হইয়া শাশ্বত রসলোকে প্রবেশাধিকার পায় নাই।

ইহারই সহিত অচ্ছেদ্যভাবে সংশ্লিষ্ট আর একটি তৃতীয় বিশিষ্ট লক্ষণ আমাদের নিকট প্রতীয়মান হয়। এই পর্যায়ের অন্যান্য তত্ত্বনাটকে রবীন্দ্রশিল্প-নির্মিতির মধ্যে কিছুটা অস্থিরচিত্ততা, বিরোধ ও অসামঞ্জস্যের চিহ্ন দেখা যায়। মনে হয় যে রবীন্দ্রপ্রতিভার মূল প্রকৃতির সঙ্গে নাট্যধর্মের সহজ সমন্বয় হয়ত পূর্ণভাবে সাধিত হয় নাই। তিনি তাঁহার অন্তরসঞ্চিত উপাদান-বৈচিত্র্য ও ভাবসম্ভারকে পুরাপুরি নাট্যরীতির সুনির্দিষ্ট ছাঁচে মিলাইয়া দিতে কোথায় যেন একটা দুর্লঙ্ঘ্য বাধা অনুভব করিয়াছেন। তাঁহার মানস-গঙ্গায় যে বিচিত্রগামিনী স্রোতস্বতী প্রবাহিত হইয়াছে তাহা বারবার নাটকের প্রথানিরূপিত তটবন্ধনকে অস্বীকার ও উল্লঙ্ঘন করিয়াছে। তাঁহার মনের সবটা যেন নাটকের আধারে সম্পূর্ণ প্রকাশস্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিতেছে না এই সংশয় নাট্যকার ও পাঠক উভয় পক্ষকেই পীড়িত করে। রবীন্দ্রমানসে কতকগুলি ভাব পুনঃপুনঃ আবর্তনশীল, এক অত্যাজ্য আকর্ষণে তাহারা শিল্পনিয়ন্ত্রণকে অগ্রাহ্য করিয়া কবিচিত্তের স্থায়ী সংস্কাররূপে আত্মঘোষণামুখর।

রবীন্দ্রনাথের এই সিদ্ধ ভাবগুলির মধ্যে ঐশী-স্বরূপতত্ত্ব, প্রকৃতির প্রাণচেতনা ও মানবমনের সহিত উহার নিগূঢ় সাঙ্কেতিক সংযোগ, ত্যাগ-বৈরাগ্য-সংসার-অনাসক্তিমূলক জীবনদর্শন, গীতি-উৎসার ও অমূর্ত অনুভূতির অন্তর্মুখী ভাবনা তাঁহার সর্ববিধ সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে মনোজগতের কায়েমী অধিবাসীরূপে নিত্যপ্রভাবশীল। এগুলি সবই তাঁহার কাব্যে ও নাটকে প্রকাশ না পাইলে তাঁহার সম্পূর্ণ মানসলোক তাঁহার শিল্পদর্পণে প্রতিবিম্বিত হয় না। এখন নাটকের প্রথাসিদ্ধ রীতি ও অখণ্ড রূপসংহতির আদর্শ এই বিচিত্র ভাব-সম্ভারের অন্তরঙ্গ সংশ্লেষের পক্ষে সর্বতোভাবে অনুকূল নয়। সুতরাং তিনি নাটকের রূপকল্পের দাবী মিটাইতে গিয়া তাহার অন্তঃপ্রেরণাকে স্ববিরোধ হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি দিতে পারেন নাই। তাঁহার প্রকৃতির কোন না কোন উপাদানকে তিনি খর্ব বা ক্ষুণ্ণ করিতে বাধ্য হন। প্রায়শই দেখা যায় যে গীতিপ্রেরণা বা দর্শনতত্ত্ব অতিপ্রবল হইয়া নাট্যসামঞ্জস্যের ভারসাম্য কমবেশী বিচলিত করে ও তাঁহার আঙ্গিকবিন্যাসের আদর্শে বারবার বিপর্যয় ঘটায়। নাট্যকাররূপে তাঁহার শিল্পীসত্তা, কবিসত্তা ও ভাবুকসত্তার মধ্যে একটা চিরন্তন টানাপোড়েনের অন্তর্দ্বন্দ্ব কখনই পরিপূর্ণ সমন্বয়সুষমায় স্বস্তিকর অবসান লাভ করে না। রবীন্দ্রনাথ নাটক লিখিয়া খুব বিরল ক্ষেত্রেই তাঁহার শিল্পবোধের ষোলআনা অনুমোদন লাভ করিয়া অবিমিশ্র আত্মপ্রসাদ-ধন্য হইয়াছেন। চির-অতৃপ্ত আত্মসমালোচনার অঙ্কুশে অহরহ আহত হইয়া তিনি অস্থির পরীক্ষা-নিরীক্ষার চক্রে বারবার আবর্তিত হইয়াছেন ও নিজ গঠিত প্রতিমার মুহুর্মুহু রূপান্তরসাধনে তিনি নিজে বিব্রত হইয়াছেন ও পাঠককে বিব্রত করিয়াছেন।

তাঁহার এইরূপ চিরাভ্যস্ত প্রবণতার মধ্যে 'ডাকঘর' ও 'ফাল্গুনী' দুইটি ব্যতিক্রমস্থানীয়। উহাদের ফলশ্রুতি অভিন্ন হইলেও লক্ষ্য ও প্রেরণার মধ্যে পার্থক্য লক্ষিত হয়। 'ডাকঘর'-এ নাট্যজটিলতাকে সম্পূর্ণ পরিহার করিয়া গীতি-অনুভবের সরল ও একমুখীন আদর্শ প্রতিষ্ঠিত। সুরমূর্ছনার মধ্যে নাটকের মৃদু হৃৎস্পন্দন যতটা অনুভবগম্য, শিশুমনের করুণ স্বপ্নকল্পনা যতটুকু বস্তুছায়া ও নাট্যদ্বন্দ্বের আভাস-প্রক্ষেপে সমর্থ, রবীন্দ্রনাথ তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার নাটকের পরিকল্পনায় ও রূপায়নে তিনি ইহার বেশী রক্ত-মাংসের নিবিড়তা বা ভাবজটিলতার প্রতি আগ্রহের পরিচয় দেন নাই। কাজেই ধূসর গোধূলিচ্ছায়ার মত একটি একরঙা মনোজগতের

ছবি সন্ধ্যাবেলাকার বর্ণহীন হ্রদে তারকার ঝিকিমিকি আলোতে-দেখা আকাশের ন্যায় এই নাট্যমুকুরে অপরূপ সুষমায় প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। নাট্যকার ও পাঠক উভয়েরই প্রত্যাশা উহাতে পরিপূর্ণ তৃপ্তিলাভ করিয়া আর্টের চরম আনন্দে মনের সমস্ত প্রশ্নের সমাধান করিয়াছে। 'ফাল্গুনী'-তে লেখক নাটকের জটিল রীতি ও রূপকল্পনাকে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করিয়া নিজ অন্তরের প্রতি অখণ্ড দৃষ্টি দিয়াছেন। তাঁহার মনের সমস্ত তত্ত্ব ও উহার সহিত জড়িত সমস্ত আকূতি-আবেগ, তাঁহার গীতিপ্রাণতা ও রূপকব্যঞ্জনার প্রতি নিষ্ঠাতিশয্য ইহার মধ্যে তিনি উজাড় করিয়া দিয়াছেন, নাট্যরীতির কৃত্রিম অনুশাসনের প্রতি একেবারেই লক্ষ্য দেন নাই। তাঁহার মানস-ঐশ্বর্যের স্বচ্ছন্দ প্রকাশ কতটা নাটক হইল কি না হইল সে দিকে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন। চরিত্রগুলি ব্যক্তিসত্তায় সংহত হইয়া উঠিল কি না, গান ও তত্ত্বকথা কতটা নাট্যবন্ধনকে স্বীকার করিল, তাঁহার মানস ভাবোৎসারের অজস্রতা কি পরিমাণে নাট্যকেন্দ্রিকতাবিন্যস্ত হইল প্রভৃতি শিল্পগত কূট প্রশ্নের প্রতি তিনি পুরাপুরি উপেক্ষা দেখাইয়াছেন। নাট্যশাসনের বাধা তাঁহার অন্তরাত্মাকে এত দুঃসহভাবে পীড়িত করিতেছিল, যে এই সুদীর্ঘ অবদমনের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ তিনি 'ফাল্গুনী'-তে তাঁহার ভাবুকচিত্তের সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিলেন। ফুলের অপেক্ষা সূত্রবন্ধনের প্রাধান্যকে তিনি সরাসরি খারিজ করিয়া দিলেন। আর্টের প্রথাবদ্ধতা স্রষ্টার লীলাবিহারকে শৃঙ্খলিত করিবে ইহার বিরুদ্ধে তাঁহার সমস্ত সত্তা বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানাইল। ফল হইয়াছে যে 'ফাল্গুনী', নাটকের কোন পূর্বনির্দিষ্ট আঙ্গিকবিন্যাসরীতিই মানিয়া লইতে পারে নাই। ইহা জাবালি-শিষ্য সত্যকামের ন্যায় কোন নির্দিষ্টগোত্রসম্ভূত নয়, ইহা সত্যবংশজাত। এই নাটকশিশু কোন ধাত্রীবিদ্যাতাত্ত্বিকের লালনবিধি ছাড়াই অকৃত্রিম ভাবপ্রেরণার সূতিকাগারে স্বতোপ্রসূত।

৩

এইবার 'ফাল্গুনী'র বস্তুবিন্যাস ও ঘটনাপরিণতির অনুসরণে ও রচনাটির ফলনিষ্পত্তিতে, গান, তত্ত্ব, সংলাপ ও চরিত্রদ্যোতনায় কিরূপ বিচিত্র প্রভাব-পরম্পরার নিদর্শন মিলে তাহা সূক্ষ্মভাবে অনুধাবন করা যাইতে পারে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে এই রচনাটির কোন শ্রেণীনির্দেশ লেখকের

অভিপ্রায় নয়। ইহার আবেদন বসন্ত-প্রকৃতির একটি দৃশ্যের ন্যায় বিচিত্রবর্ণ নানা ভাব-তন্তুজালের বয়নে এক অনির্বচনীয় মুগ্ধতার মায়া মনে ঘনাইয়া তোলে। বসন্তের নবীন প্রভাতে যেমন আলো, বাতাস, গন্ধ ও সর্বব্যাপী এক পুলকচাঞ্চল্য—আমাদিগকে এক অপার্থিব কল্পলোকের কুহকে অভিভূত করে, এখানেও তেমনি এক নূতন অনুভূতির রহস্যমায়া আমাদিগকে বিহ্বল করিয়া তোলে। এখানে যে দর্শনতত্ত্বটি লেখকের মুখ্য উপজীব্য তাহা নাট্যরীতির প্রথাবদ্ধ প্রয়োগে নয়, তাহা গানের সুরে, সংলাপের সাংকেতিকতায়, আবহাওয়ার সৌরভে, প্রকৃতির ইন্দ্রজালে, মানবাত্মার সত্যসন্ধানে ও পথসঙ্কটউত্তরণে অনুভূতির গভীরে সঞ্চারিত হইয়াছে। ইহা প্রতিপাদন নয়, প্রত্যয়রূপে অন্তরে সংক্রামিত। ইহাকে কোন এক বিশিষ্ট শিল্পাদর্শের মানদণ্ডে বিচার করা, চলিবে না। ঋতুর অন্তরাত্মা হইতে কুহরিত নিঃশ্বাস যেমন উহার স্বরূপপরিচয়টি আমাদের নিকট প্রমাণ-বিশ্লেষণ-নিরপেক্ষরূপে ব্যক্ত করে। তেমনি 'ফাল্গুনী'র মর্মবাণী উহার সমস্ত রোমকূপ হইতে বিকীর্ণ হইয়া, উহার সমস্ত জটিল, বহুমুখীআবেদন-বৈচিত্র্যের সমাহারপ্রসূত এক অনন্য, অমোঘ প্রত্যয়রূপে আমাদের অনুভূতিতে অনুবিদ্ধ হয়। ইহা সমস্ত সাহিত্যিক শ্রেণীবিভাগের সীমা অতিক্রম করিয়া এক সার্বভৌম রসচেতনার অতীন্দ্রিয়তায় আমাদের মানস-লোককে পরিব্যাপ্ত করিয়া তোলে—কবির আবেদনের সহিত আমাদের একটি প্রত্যক্ষ-নিবিড় সংযোগ স্থাপিত হয়। আমরা বিচার-বিতর্ক-বিশ্লেষণ স্থগিত রাখিয়া কবির উপলব্ধির নিকট মুগ্ধভাবে আত্মসমর্পণ করি।

লেখক প্রস্তাবনাতেই তাঁহার অনুসৃত রীতিস্বাতন্ত্র্যের পূর্বাভাস দিয়া পাঠককে তাঁহার সৃষ্টিরহস্যের মূল সূত্রটি ধরাইয়া দিয়াছেন। নাট্যবস্তুর ভাবভূমিকা, রচনার উদ্দেশ্য ও উহার অনুসৃত প্রয়োগবিধি সম্বন্ধে লেখক আমাদিগকে গ্রন্থারম্ভেই পরিচিত করিয়াছেন। বার্ধক্যের প্রথম আবির্ভাব-লক্ষণে উৎকণ্ঠিত রাজা আতঙ্কের প্রথম ঝোঁকে বৈরাগ্য ও জীবনে অনীহার দিকে তাঁহার সমস্ত চিত্তবৃত্তিকে ফিরাইয়াছেন। তিনি জরুরি রাজকার্য সমস্ত তুচ্ছ করিয়া, কর্তব্যে উপেক্ষা দেখাইয়া বৈরাগ্যের অতল সমুদ্রে আত্মনিমজ্জনের সঙ্কল্প ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ত্যাগদীক্ষার গুরু শ্রুতিভূষণ বৈরাগ্যবারিধির তলে তলে রত্নসঞ্চয়ের প্রতি প্রবল আসক্তির প্রমাণ দিয়াছেন। তাঁহার উপদেশ ও আচরণের মধ্যে বিশেষ কোন সামঞ্জস্য-

আবিষ্কার করা দুরূহ। এই নাটকীয় মুহূর্তে কবিশেখর তাহার যৌবনের চিরস্থায়িত্ব ও জরার ছদ্মবেশ হইতে তাহার পৌনঃপুনিক নবজন্মপরিগ্রহের জীবনদর্শনের বার্তা লইয়া উপস্থিত হইয়াছে। সংসারের নিরাসক্ত ভোগের সঙ্গে অনায়াসত্যাগের সহজ মিলনে, জীবনে চিরপথিকের অংশ-অভিনয়েই যে মানবের পরমকল্যাণ নিহিত এই আদর্শ-অবলম্বনে রাজাকে সে নূতন পথের সন্ধান দিয়াছে। এমনকি জগতের দুঃখকষ্ট নিবারণের পক্ষে কবি-নির্দিষ্ট অনাসক্তি ও প্রাণের অদম্য প্রেরণার অবিরাম গতিশীলতাই যে শ্রেষ্ঠ পন্থা সে বাণীও ঘোষিত হইয়াছে। শীত হইতে বসন্তের বর্ষে বর্ষে পুনরুজ্জীবনই পরমতম জীবনসত্যের ইঙ্গিতবাহী। অবশ্য যুক্তির দিক্ দিয়া ইহা অকাট্য না হইতে পারে, কেননা বার্ধক্য ও তারুণ্যের পর্যায়ক্রমিক আবির্ভাব মৃত্যু ও অমরতার উভয়বিধ বিপরীত সত্যেরই সমর্থনে প্রযুক্ত হইতে পারে। কিন্তু প্রতি বসন্তে পৃথিবীর অম্লান যৌবনশ্রী, উহার অফুরন্ত প্রাণশক্তি জরার উপর যৌবনের বিজয়-নিদর্শনের অধিকতর যুক্তিসিদ্ধতারই সাক্ষ্য দেয়। জরার আক্রমণের কোন স্থায়ী চিহ্ন পৃথিবীর রূপে বা প্রাণবেগে জড়তা সঞ্চার করে না বলিয়াই যৌবনের চিরন্তনত্ব ধ্রুব জীবনসত্যের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। রাজা শেষ পর্যন্ত বৈরাগ্যতত্ত্ব বর্জন করিয়া যৌবনের দুর্দম অভিযানের মানস সঙ্গী হইবার অনুকূলেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন।

রাজার এই সিদ্ধান্তকে আশ্রয় করিয়াই 'ফাল্গুনী'র বিষয় ও রচনাশিল্প নির্ধারিত হইয়াছে। যেমন কুম্ভকারের চক্রঘূর্ণনেই মৃন্ময় পাত্রের আকৃতি-প্রকৃতি নিরূপিত হয়, তেমনি রাজমানসের বিশেষ জিজ্ঞাসার বৃন্তেই 'ফাল্গুনী'র রূপকল্পের গতিচ্ছন্দ ও অন্তঃপ্রেরণা আকার-সুষমায় উদ্বর্তিত হইয়াছে। রাজা যখন যৌবনের গতিমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন, তখন তিনি কবিকে এই দীক্ষার উপযোগী সংহিতারচনার দ্বারা তাঁহার চিত্তস্থৈর্যবিধানের জন্য অনুরোধ জানাইলেন। কবি নিবেদন করিল যে এইরূপ শাস্ত্র প্রস্তুত আছে, তবে তাহা দৃশ্যকাব্যের কোন পরিচিত সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হইবে কি না সন্দেহ। রাজা পুনরায় প্রশ্ন করিলেন যে উহার মধ্যে কোন নির্দিষ্ট অর্থ বা তত্ত্বকথা আছে কি না। কবি তদুত্তরে তাঁহার রচনার অন্তঃপ্রকৃতির একটু পরিচয় দিবার চেষ্টা করিল। সে উহাকে বাঁশীর ব্যাকুল-করা সুরের ও সদ্যোজাত শিশুর কান্নার সঙ্গে তুলনা করিয়া, উহাকে অর্থহীন, তত্ত্বপ্রতিষ্ঠার প্রয়াসরহিত এক বিশুদ্ধ অস্তিত্বের আনন্দ-ঘোষণার, সমগোত্রীয়রূপে নির্দেশ

করিয়াছে। উহার বিষয় হইল জরাকে অনুধাবন ও বন্দী করার জন্য, উহার ছদ্মবেশের বঞ্চনাকে উদ্‌ঘাটিত করার জন্য যৌবনের আত্মপ্রত্যয়দৃঢ় বিজয়াভিযান, বিশ্বরহস্যের গহনগুহায় উহার নির্ভীক অনুপ্রবেশ ও গূঢ় সত্যের আবিষ্কার।

নূতন নাটকের আরও বিস্তৃত বিবরণ প্রশ্নোত্তরপ্রসঙ্গে ক্রমোন্মোচিত হইয়াছে। উহার বিষয় পৌরাণিক স্মৃতি-উদ্দীপিত, 'শীতের বস্ত্রহরণ', বিশ্বপুরাণের একটি লীলা এখানে গানের পালায় অভিব্যক্ত। গানই ইহার মুখ্য অবলম্বন, গানের চাবিতেই নাটকের এক একটি অঙ্ক অর্গলমুক্ত। কুশীলব-পরিচয়ে সর্দার ও চন্দ্রহাসের প্রকৃতি-রহস্য ঈষৎ ব্যঞ্জিত—সর্দারই জীবনের অগ্রগতির সঞ্চালক ও প্রেরণাদায়ক। চন্দ্রহাস প্রাণচেতনার আনন্দময় অনুরাগের গোপন উৎস। নাটকের আদর্শ শ্রোতা ও রসভোক্তা অপগত-মোহ, আনন্দ-আস্বাদনকামী প্রৌঢ় প্রাজ্ঞজন। রাজা উহার পাত্র-পাত্রীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত না হইয়াও উহার সমস্যার সহিত অচ্ছেদ্যসূত্রে জড়িত—তাঁহারই মানস দ্বন্দ্বের চক্রাবর্তন হইতে নাটকের প্রাণসঞ্চার,—তাঁহার নাভি হইতে যে মৃণালবৃন্ত উদ্ভূত তাহাতেই এই গীতিনাট্যপদ্মের উৎফুল্ল বিকাশ। সমস্ত প্রস্তাবনাটি তীক্ষ্ম, গূঢ়ার্থবাহী বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের অমোঘ অস্ত্রে প্রস্তাবিত সমস্যাটির জটিল মর্মস্থলকে বিদীর্ণ করিয়াছে, ইহা নিঃসংশয় প্রতীতির প্রবল ঝড়ে লেখকের সিদ্ধ কল্পনার প্রতিকূল যুক্তিবিচারসমূহকে তূলারাশির মত উড়াইয়া, অবিরল রসবর্ষণে পাঠকচিত্তের অনুভূতিকেন্দ্রে নিজ জীবনদর্শনের পরিণামটি চিরতরে দৃঢ়রোপিত করিয়াছে। লেখকের পরিকল্পনার মূলসূত্রগুলিও এই প্রসঙ্গে অতি চমৎকারভাবে আভাসিত হইয়াছে।

প্রস্তাবনায় যাহার পূর্বাভাস, নাটকের চারিটি দৃশ্য ব্যাপিয়া তাহারই বাস্তব প্রয়োগ ও রূপগত সম্প্রসারণ। প্রথম দৃশ্যে নবীনের আবির্ভাব, দ্বিতীয়ে প্রবীণের দ্বিধা, শীতের উদ্‌ভ্রান্তি ও বিদায়গানের মধ্যে নবযৌবনের সঙ্কল্পবাণী; তৃতীয়ে প্রবীণের পরাভব ও নবীনের অনুসন্ধানের উদ্দীপনা এবং চতুর্থে নবীনের বিজয়-উল্লাস এই চারিটি অধ্যায় নাটকের অগ্রগতির স্তরগুলি নির্দেশ করে। প্রত্যেক দৃশ্যের পূর্বে উহার অন্তর্নিহিত ভাবের সুরে বাঁধা এক-একটি গীতিভূমিকা গীতের সাঙ্কেতিক তাৎপর্য তথা নাট্যভাব-উদ্বোধনে উহার বিশিষ্ট প্রস্তাবের পরিচয়বাহী। পূর্বোক্ত নামসূত্রগুলি প্রত্যেক গীতিভূমিকার অন্তর্লীন প্রেরণাটির তত্ত্বরূপপ্রকাশক। দৃশ্যগুলির নামকরণে

ঘটনাপরিণতির ক্রমপর্যায়গুলি বিশেষিত। ইহারা যথাক্রমে সূত্রপাত (স্থান—পথ), সন্ধান (স্থান—ঘাট), সন্দেহ (স্থান—মাঠ) ও প্রকাশ (স্থান—গুহাদ্বার) আখ্যায় সংজ্ঞিত হইয়াছে। রচনার বাহিরের কাঠামোটি ও ভিতরকার আবেগপ্রেরণাটি এইরূপে বস্তুবদ্ধ ও ভাবসঙ্কেতিত হইয়াছে।

লেখক যে বলিয়াছিলেন যে প্রতি দৃশ্যের উন্মোচন হইবে গানের চাবির দ্বারা তাহা আক্ষরিক ও আন্তরিক উভয় অর্থেই সম্পাদিত হইয়াছে। এই গানগুলি অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে যে ইহাদের মধ্যে লেখকের তত্ত্বকথা কিরূপ আশ্চর্যভাবে সূক্ষ্ম রসনির্যাসে রূপান্তরিত হইয়াছে ও উহার আত্মিক সৌরভটুকু আমাদের প্রত্যয়মর্মকোষে অনুবিদ্ধ হইয়াছে। মোহময় সৌন্দর্য অথবা প্রেমের যাদুমন্ত্র যেরূপ প্রত্যক্ষভাবে আমাদের চেতনাকে অভিভূত করে, তত্ত্বও তেমনি অনিবার্য আকর্ষণে আমাদিগকে মায়াজালে বন্দী করিয়াছে। উহার ভাল-মন্দ, উহার সম্ভব-অসম্ভব সব ভুলিয়া আমরা স্বরসম্মোহের নিকট আত্মসমর্পণ করি। নাট্যবস্তুতে প্রবেশের পূর্বেই, তত্ত্বপ্রতিষ্ঠার পদ্ধতিকে বিচার-বিশ্লেষণ না করিয়াই আমাদের মন তত্ত্ববিগলিত গীতিরসে আপ্লুত হইয়া যায়। বেণু-বন, পাখীর নীড় ও নদীতীরের ফুলন্ত গাছ মানুষের যুক্তিনিষ্ঠ মনকে এমনভাবে প্রভাবিত করে যে প্রাণি- ও উদ্ভিদ-জগতের আনন্দহিল্লোল আমাদের সচেতন অন্তর্লোকে স্বতঃসংক্রামিত হয়। ঋতুচক্রের মধ্যে আগন্তুক ও অবসিতপ্রায় দুইটি ঋতুর বাণীহীন ভাববিনিময় আমাদের মুখরতাকে ধিক্কৃত করিয়া প্রাণে মর্মরিত হইয়া উঠে। তৃতীয় দৃশ্যের গীতিভূমিকায় প্রকৃতির গানে মানুষের মনোভাব একটু বেশী পরিমাণে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে; এখানে প্রকৃতি যেন নিজস্ব অন্তরঙ্গ আবেদন ছাড়িয়া মানবসুলভ লঘু পরিহাস ও মিলনৌৎসুক্যের স্থূলতর প্রকাশকে আশ্রয় করিয়াছে। এখানে গীতিমোহ যেন অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে। হয়ত 'সন্দেহ'-স্তরের ভূমিকা বলিয়া ইহাতে গানের স্বচ্ছতার মধ্যে কিছুটা সংশয়-কুহেলিকা মিশিয়াছে। প্রকৃতিও মানবিক চলচ্চিত্ততার প্রতিফলনে নিজ স্বভাবনিহিত মর্মপ্রত্যয়টিকে কুণ্ঠিত করিয়াছে। চতুর্থ দৃশ্যের গীতিভূমিকাটি আবার হারানো সুরটি ফিরিয়া পাইয়াছে। যৌবনের চির-অস্তিত্ব, বসন্ত-প্রকৃতির নবোন্মেষিতরূপে নিজ মৃত্যুহীনতার সমর্থন, নবসত্যউপলব্ধির নিঃসংশয় স্বীকৃতি ও সর্বজয়ী যৌবনের মুগ্ধ অভিনন্দন—এই কয়েকটি ভাবস্তর অতিক্রম করিয়া গীতি-প্লাবনের জোয়ার নিজ চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে ও

পাঠকের চিত্ততটকে কানায় কানায় পূর্ণ করিয়া সমাপ্তিরেখা টানিয়াছে। নাট্যঘটনার রুদ্ধদ্বার যাদুমন্ত্রে খুলিয়াই এই দ্বার-উন্মোচনের যাদুকর গীত ক্ষান্ত হয় নাই—ইহা নাটকের মূল তত্ত্বটিকেও অনিবার্য ছন্দ ও ব্যঞ্জনার মিলিত প্রবাহে ভাসাইয়া লইয়া গিয়া পাঠকের অন্তরের নিভৃততম মণিকোঠায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। মানব অভিনেতৃগোষ্ঠীর সহযোগিতা ছাড়াই, ঘটনা সংলাপ ও শুধু গানের, অভীষ্ট রসসঞ্চারে এরূপ অনায়াসসিদ্ধির দৃষ্টান্ত সাহিত্য-জগতে খুব সুলভ নয়।

ইহার পর নাট্যপ্রকৃতির স্বরূপ-বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে। সূচনার কথা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। উহা শুধু বস্তুনির্দেশ করিয়াই থামে নাই, তীক্ষ্ণাগ্র অন্তরীপের ন্যায় ঘটনা-মহাদেশের অভ্যন্তরভাবে গভীর অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। প্রথমতঃ প্রত্যেক দৃশ্যসাহায্যে অগ্রগতির স্তরনির্দেশ সূচিত। প্রথম দৃশ্যে ঘটনার মুখবন্ধ, যুবকদলের পরিচয়দান ও উহাদের উদ্দেশ্য-বিবৃতি। দ্বিতীয় দৃশ্যে পথ হইতে ঘাটে পট-পরিবর্তন, যাত্রাপথে সন্ধানের আরম্ভ ও মাঝি ও কোটালের নিকট দিক্‌জিজ্ঞাসা। পথের সরল, দ্বিধাহীন সম্মুখগতি হইতে ঘাটে অভিজ্ঞতার এক স্তর হইতে স্তরান্তরে উত্তরণ, যৌবন-চাঞ্চল্যের স্বতঃস্ফূর্ত গতিপ্রেরণা হইতে প্রৌঢ় পরিণত জীবনবোধের নির্দেশ-প্রতীক্ষা। মাঝি ও কোটাল এই সংসার-অভিজ্ঞতার বহুদর্শী দিশারী রূপে আসিয়াছে। কিন্তু তাহাদের নির্দেশ কেবল সতর্ক করিয়াছে, কোন অগ্রগতির প্রেরণা দেয় নাই। কোটাল সাংসারিক নিরাপত্তার প্রহরী ও পার্থিব সম্পদের রক্ষক—তাহার নিকট কোন নূতন সন্ধান সম্পূর্ণ অনপেক্ষিত। মাঝি শুধু পণ্যবাহী নৌকার চালক; সে বৈষয়িক জীবনযাত্রার খেয়াঘাটের কাণ্ডারী। সে কোন সোনার তরী বাহিয়া কোন অজানা রহস্যের কূলে পৌছাইয়া দেয় না। সুতরাং এই সংসারজ্ঞানের ভাণ্ডারীদের নিকট যৌবন-অভিযাত্রী দলের কোন সার্থক ইঙ্গিত, গুহাপথের কোন স্বরূপসঙ্কেত মিলিবার আশা নাই।

তৃতীয় দৃশ্যে অভিযাত্রীদের নিজেদেরই মনোলোকে আলো-আঁধারি ধাঁধা-সংশয়ের হিমবাষ্প ঘনাইয়া আসিয়াছে। এক চন্দ্রহাস ও সর্দার ছাড়া দলের অন্য সকলে নিশ্চিত পথের দিশা হারাইয়া কল্পনাপ্রসূত নানা অনুমানচক্রে ও নৈরাশ্য-বিভীষিকার নানা সর্পিল পথে ঘুরিয়া মরিতেছে। তাহাদের সর্দারের প্রতি বিশ্বাস দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে ও চন্দ্রহাসের প্রেমের স্থিরদীপ্তি

স্নিগ্ধ আশ্বাসের রশ্মি লইয়া তাহাদের আলেয়ার মায়ানিরসনের প্রেরণা দেয় নাই। এমন কি তাহারা এতটা অবসাদগ্রস্ত হইয়াছে যে পথ চলা ছাড়িয়া স্থবিরত্বের খোটায় বাঁধা পড়িতে মন স্থির করিয়াছে। এই বিভ্রান্তি-সঙ্কট হইতে চন্দ্রহাস কর্তৃক আবিষ্কৃত অন্ধ বাউল তাহাদের ক্ষীয়মান আশাকে আবার জ্বালাইয়াছে। এই অন্ধ বাউল ইন্দ্রিয়নির্দেশবঞ্চিত হইয়া এক অতীন্দ্রিয় অপরোক্ষ অনুভূতির বলে অনাগত সত্যকে অভ্রান্ত প্রত্যয়রূপে আত্মস্থ করিয়াছে ও জীবনমর্মরহস্যের প্রচ্ছন্ন উৎসমুখ-উন্মোচনের সঙ্কেত-সন্ধান দিয়াছে।

চতুর্থ দৃশ্যে গুহাদ্বারে প্রকাশের জন্য উৎসুকভাবে প্রতীক্ষমান যুবসংঘের মুহূর্ত-গোনা অস্থিরতা, মুহুর্মুহু আশা-নৈরাশ্য, কল্পনা-বাস্তবের দ্বন্দ্ব-বিভ্রান্তি এক দুঃসহ পরিবেশের সৃষ্টি করিয়াছে। উষাগমের অব্যবহিত পূর্বে তমিস্রার চরম নিবিড়তা একদিকে যেমন অশেষ প্রকারের কাল্পনিক আতঙ্কের প্রেতচ্ছায়াকে উদ্বোধন করিয়াছে, অপর দিকে পরিচিত পার্থিব প্রতিবেশের মধ্যে এক অনভ্যস্ত, করুণ রস, এক বিদায়-বিধুর অশ্রুসজলতার শিশিরসিঞ্চনে হিম-শিহরণ জাগাইয়াছে। যৌবনের দুর্মদ আকর্ষণে যাহারা জীবন-সৌন্দর্যের সমস্ত মমতা-বন্ধনকে ছিন্ন করিয়াছে তাহাদের অন্তঃকরণে শুধু তেজোবহ্নি নয়, শুধু পথচলার নেশা নয়, স্বজনবিরহের কান্নার জলও সঞ্চিত আছে। যৌবন শুধু অগ্নিগর্ভ হইলে তাহা জ্বলিয়া নিঃশেষ হইত, উহার অন্তর্নিহিত, কিন্তু অস্বীকৃত বিচ্ছেদ-বেদনাই উহার চিরনবীনত্বের মূলে রসসিঞ্চন করে। তাই পাওয়া ও ছাড়া, ঔদাসীন্যের বন্ধনহীনতা ও অনুরাগের পিছুটান একই ছন্দে যৌবনচেতনায় নিগূঢ়ভাবে গ্রথিত। অন্ধ বাউলের অদৃশ্য প্রভাব যৌবনের অমরত্বসন্ধানী, চির-অগ্রসর চিত্তে এই উন্মনাভাবের সঞ্চার করিয়াছে। তাহাদের বে-পরোয়া দস্যুপনা, চঞ্চল পথিকবৃত্তি এই জীবনপ্রজ্ঞায় উদ্‌বুদ্ধ হইয়াও পরম সত্যগ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। বাউল তাহাদিগকে যে অজানা দেশের আভাস দিয়াছে তাহারই স্পর্শরোমাঞ্চ তাহাদের মনে এক ষষ্ঠ অনুভূতির উন্মেষ ঘটাইয়াছে। ঠিক এই পটপরিবর্তনের প্রাক্-মুহূর্তে নানা অলীকদুঃস্বপ্ন তাহাদের কল্পনায় অশুভশংসী ইঙ্গিতে অস্বস্তির কণ্টকশয্যা বিছাইয়াছে। চন্দ্রহাস-সম্বন্ধে অনিশ্চয়তার উৎকণ্ঠা তাহাদিগকে সম্ভব-অসম্ভব, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক নানা অমঙ্গল-মরীচিকায় ত্রস্ত ও উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে।

অবসাদ ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের এই চরম ক্ষণে অন্ধ বাউলের প্রশান্ত প্রত্যয় ও অধ্যাত্ম দৃষ্টি আবহাওয়াকে বাষ্পকলুষমুক্ত রাখিয়াছে। তার ললাটে আসন্ন প্রভাতের অনাগত দীপ্তি এক জ্যোতিস্তিলক পরাইয়া দিয়াছে। তাহারই দৃপ্ত জয়গান পরাজয়ী মনোভাবের সমস্ত কুয়াশা-আবরণকে ছিন্ন করিয়া নব সূর্যোদয়ের পথটিকে বাধামুক্ত করিয়াছে। তাহার অন্তর হইতে সাহস সমস্ত অবসন্ন হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়া তাহাদের মনোবলকে জীয়াইয়া রাখিয়াছে। বাউলের ললাট-প্রজ্বলিত আশাদীপই শেষ পর্যন্ত চন্দ্রহাসের বিলম্বিত আবির্ভাবকে অনুমানের পর্যায় হইতে প্রত্যক্ষদর্শনের নিশ্চিত আলোকবৃত্তের মধ্যে পথ দেখাইয়া আনিয়াছে। চন্দ্রহাস সেই আদিমকালের জরাদৈত্যকে বন্দী করিয়া যৌবনের বিজয়বার্তা ঘোষণা করিয়াছে, কিন্তু এই জয়ের রণকৌশলতত্ত্ব সম্বন্ধে তাহার কোন স্পষ্ট ধারণা নাই। সে অভিযান-সাফল্যের প্রমাণ বাউলের ধ্যানদৃষ্টিসমর্থিত দীপ্ত আত্মপ্রত্যয়ের মধ্যেই সংশয়াতীতভাবে অনুভব করিয়াছে। আরও আশ্চর্যের কথা যে গুহার যে যৌবনবিরোধী শক্তিটা প্রচ্ছন্ন ছিল তাহার মুখোস খুলিয়া গিয়া তাহার মধ্য হইতে সর্দারের সত্তা বাহির হইয়া আসিল। অর্থাৎ যৌবনানন্দের চিরশত্রু, তরুণ প্রাণের চিরবিভীষিকা মৃত্যুদূত আসলে জীবনরথের সারথি, জীবন-প্রেরণার মূলশক্তি, অস্তিত্বমহোৎসবের সূত্রধাররূপে আবির্ভূত হইল। যৌবন-অভিযানের নেতা ও সঞ্চালক ও জীবনবিধ্বংসী জরা ও অস্তিত্বগ্রাসের অতল গহ্বরে আত্মগোপনকারী বৈরী অভিন্নরূপে প্রতিভাত হইল। জরা ও যৌবন, আত্মবিলোপ ও আত্মপ্রসারণ একই অভিন্ন সৃষ্টিবিলয়তত্ত্বের বাহন, একই নিগূঢ় বিধানের আপাত-বিরোধী, কিন্তু বস্তুতঃ সহযোগী ও পরিপূরক প্রক্রিয়ার দ্বিমুখী প্রকাশ। এই বৈপরীত্যের সমতা-বিধানে যৌবনের অপরাজিত শক্তি ও অবাধ আত্মবিস্তার তত্ত্বমীমাংসা ও জীবনমর্মশায়ী আনন্দপ্রত্যয়ের যুগ্ম মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হইয়া ধ্রুবসত্যমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইল।

এইখানে নাটকের দৃশ্যসন্নিবিষ্ট গানগুলির প্রাসঙ্গিকতা ও ভাবসঙ্গতি বিচার করার সময় হইয়াছে। প্রথম দৃশ্যে যুবকদলের প্রারম্ভিক গানটি অতিরিক্ত তত্ত্বাশ্রিত ও গীতিকবিতার সচেতন নির্মাণশিল্প ও মননক্রিয়ার লক্ষণান্বিত মনে হয়। গানের লঘু তরল গতি ও স্বতঃপ্রবাহ যেন এখানে কিছুটা তত্ত্বভারপীড়িত হইয়াছে। দাদার চৌপদীর ওজনভারী, হিসাবী ছন্দের অসংজ্ঞান প্রভাব যেন যৌবনের খেয়ালী জীবনদর্শনব্যাখ্যায়

সংক্রামিত। দ্বিতীয় গানে খেলা ও কাজের অভিন্নত্বের ইঙ্গিত অনেকটা তত্ত্বশৃঙ্খলিত লাগে। তৃতীয় গানে সর্দারের নীতিতত্ত্বও যেন রাজনীতি-ঘোষণার মত অনুশাসনের গাম্ভীর্যস্পৃষ্ট—অশোকের শিলালেখে উৎকীর্ণ হইবার যোগ্য, উতলা তরুণ চিত্তের অনিবার্য ভাবোচ্ছ্বাসের মত শোনায় না। চতুর্থ ও পঞ্চম গানও অনুরূপভাবে তত্ত্বপ্রয়াসবিড়ম্বিত বলিয়া মনে হয়। ষষ্ঠ ও শেষ গানেও (আমাদের ভয় কাহারে) বে-পরোয়া ভাবের অতি-আস্ফালন যেন কানে কৃত্রিম ঠেকে। মোট কথা, এই গানগুলি যেন সংলাপের সহিত তত্ত্বপ্রতিপাদনের গুরুদায়িত্ব বাঁটিয়া লইয়াছে—সংলাপের পরিপূরক শক্তিরূপেই তাহাদের নাটকে প্রবর্তন। উহারা যেন তত্ত্বভারমুক্ত মনের সহজ আবেগমোক্ষণরূপে প্রতিভাত হয় না, তত্ত্বপ্রতিষ্ঠার বিকল্প উপায় মাত্র।

দ্বিতীয় দৃশ্যের গানগুলি যুবমনের অজ্ঞাত পথসন্ধানের আবেশমুগ্ধতার, উহার রোমাঞ্চে আত্মহারা মনোভাবের যথার্থ প্রতিফলন। কোটাল ও মাঝির সংসারী জীবননীতির সঙ্গে সংঘর্ষে উহাদের অন্তরের অসম্ভব-স্পৃহা আরও প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়া অসমসাহসিকতার স্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করিয়াছে। সংসার-রীতির পিছুটান পথের মোহকে আরও দুর্বার করিয়া তুলিয়াছে। শেষের দুইটি গানে পাগলামির অভিযোগ তাহাদের রক্তে আরও নেশা ধরাইয়াছে, তাহাদের বিদ্রোহঘোষণাকে আরও উদ্দাম বেগ দিয়াছে। এগুলি যেন সংসারী লোকের সদা-সতর্ক নিরাপত্তাবাদের বিরুদ্ধে আরও উচ্চকণ্ঠ ও আপোষহীন প্রতিবাদদৃঢ়তার উদ্‌ঘোষণ।

তৃতীয় দৃশ্যে যুবকদলের মধ্যে সংশয়-সঞ্চার, তাহাদের অবাধ অগ্রগতির আদর্শে সাময়িক অনিশ্চয়তাবোধ, তাহাদের প্রৌঢ়মনের স্থবিরতার নিকট ক্ষণিক আত্মসমর্পণ গানের সুরে ও সংখ্যাল্পতায় অনুরণন রাখিয়া গিয়াছে। প্রথম গানে নেতিবাচক জীবনদর্শন, ও দ্বিতীয় বাউলের গানে অতিকাব্যিক অলঙ্কারসংযোজনা এই চিত্তবিভ্রান্তির চিহ্নাঙ্কিত। বাউলের গানটি বাউলের সহজ সাধনার সুরে মেলে নাই। নৈরাশ্যের অন্ধকারে সে কৃত্রিম রোশনাইএ আশার আলোকোৎসবরচনায় অতি-ঔৎসুক্য দেখাইয়াছে। চতুর্থ দৃশ্যের প্রথম গানে বসন্ত-উৎসবের প্রত্যাশিত আনন্দ-উচ্ছলতায় উদ্‌ভ্রান্তির করুণ সুর লাগিয়াছে। এই বাউলের সুরের গানটি যেন অন্তররুদ্ধ দুঃসহ উৎকণ্ঠার অদম্য উৎসারণ-মুক্তি, পরমপ্রাপ্তির প্রাক্-মুহূর্তে চরম বঞ্চনার

হাহাকার-মূর্ছনা। দ্বিতীয় গানেও ('আমি যাব না গো অমনি চলে') সেই বিদায়-বেদনার অশ্রুসজল, অনুযোগক্ষুব্ধ আনন্দ-অভিষেক। এখানে অজানা রহস্যপুরে প্রবেশের আগে পিছনে-ফেলা জীবনের প্রতি বাষ্পোচ্ছ্বাসরুদ্ধ আকুতি মর্মরিত। ইহাতে 'গান এসেছে, সুর আসে নাই'—আবেগের সহিত উহার প্রকাশছন্দ সমতা রক্ষা করে নাই এবং এই অসামঞ্জস্যের পীড়া নয়নজলে বিগলিত।

এই উৎকণ্ঠা-দুঃসহ প্রতিবেশে বাউল তাহার অকুণ্ঠ বৈরাগ্য ও সুনিশ্চিত প্রত্যয় লইয়া নূতন আরম্ভের উদ্বোধনসঙ্গীত গাহিয়াছে। তাহার মুখে চন্দ্রহাসের বিজয়ী মনোভাবদ্যোতক একটি সঙ্কল্পগীত পুনরুচ্চারিত হইয়াছে। উহাতে অভিযানের শুভ পরিণাম ও অভিযানোত্তর নবজীবনদর্শন উদ্‌ঘোষিত। বসন্তের পুষ্পসম্ভার জয়পতাকা উড়াইয়াছে। উহার প্রাণবহ্নি অন্তরে অনির্বাণ তেজোশক্তিরূপে উদ্ভাসিত হইয়াছে। পশ্চাদ্‌দৃষ্টি নিজ ব্যর্থতাকে অশ্রুজলে ধুইয়া অগ্রগতিতে আত্মবিলোপ করিয়াছে। যৌবনের ঝড় সমস্ত জীবনযাত্রাকে উদ্দাম গতি দিয়াছে, সঞ্চয়ের দীনতা আত্মক্ষয়ের অমিত-ব্যয়িতায় নিঃশেষ হইয়াছে ও মৃত্যু যৌবন-যৌবরাজ্যের অর্ঘ্যথালি সাজাইয়া বিনীতভাবে প্রতীক্ষা করিতেছে। ইহাই হইল নূতন জীবনাদর্শের সূত্র-প্রণয়ন।

পরের গানটি (চোখের আলোয় দেখেছিলেম) চন্দ্রহাসের অন্তর্দীপনের নিগূঢ়তাটি আভাসিত করে। মৃত্যুরহস্য ব্যাখ্যা-প্রতিপাদনের অতীত, সমস্ত বহিঃপ্রমাণ-নিরপেক্ষ, অন্তরের অনুভূতিই উহার সত্যতাবিচারের একমাত্র মানদণ্ড। বাউলের গানে (হবে জয়, হবে জয়) অনিশ্চয়ের অবসান ও জয়ের আসন্ন আবির্ভাব চূড়ান্ত সত্যের দৃঢ়তার সহিতই পূর্বঘোষিত হইয়াছে। ইহার পরেই চন্দ্রহাসের উপস্থিতি ও তাহার বিজয়ের তথ্যমূলক বার্তা-পরিবেশন। ইহার সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ উপাদান হইতেছে মৃত্যুবেশী জরার অস্তিত্বলোপ ও জীবনসর্দারের সঙ্গে উহার একাত্মতার আবিষ্কার। এই আপাতবিপরীতধর্মী জীবন-মৃত্যু বা যৌবনজরার নিগূঢ় ঐক্যই হইল অস্তিত্বের কেন্দ্রীয় প্রহেলিকা। এই স্ববিরোধের মধ্যেই জীবনের মূল রহস্য নিহিত। এই বিরোধ-সমাধানই জীবনের পরমতত্ত্বে পৌঁছিবার একমাত্র পথ। অস্তিত্বের এই চিরন্তন দুর্জ্ঞেয়তাই রবীন্দ্রনাথের সীমা-অসীমতত্ত্বের সন্ধানে, হারানো ও পাওয়ার পরস্পর-নির্ভরতায়, ক্ষণিক ও চিরকালের

অভেদত্বে, পূর্ণতা ও শূন্যতার সহজ সঙ্গতিতে নানারূপে ইঙ্গিতদ্যুতিময়। বাউলের শেষগানে (তোমায় নতুন করেই পাব বলে) এই বোধাতীত, যুক্তিক্রমের অনধিগম্য, কেবলমাত্র অধ্যাত্ম-অনুভূতি-সংবেদ্য পরম সত্যটি চমৎকার স্বচ্ছ ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত হইয়াছে। সমাপ্তিসূচক সমবেত উৎসব-সঙ্গীতটি ক্রান্তিলগ্নের উপযুক্ত হয় নাই—সমস্ত কাহিনীর অন্তঃসঞ্চিত উৎকণ্ঠা ও দ্বন্দ্ব ইহার মধ্যে অনিবার্য গীত-পরিণতি ও রসনিবিড়তায় উৎক্রান্ত হয় নাই। 'ফাল্গুনী'-নাটকের তত্ত্বসমাধানের মত উহার গীত-উৎক্রমণও রসবোধের স্বাদে কিছু অতৃপ্তির রেশ রাখিয়া যায়। যে তত্ত্ব অনুসরণপর্বে মায়ামৃগীর মত আমাদিগকে প্রতি মুহূর্তে নব নব বিস্ময়চমকে, অনায়ত্ত সৌন্দর্যের নব নব রূপচ্ছটায় উৎসুক রাখিয়াছিল, প্রাপ্তিপর্বে তাহা যেন একটা কূট হেঁয়ালির সমাধানের মত কেবল বুদ্ধিকে পরিতৃপ্ত করিয়া উহার বিচিত্রসঞ্চারিণী বিদ্যুৎপ্রভার অস্থির রূপচমককে নির্দিষ্ট অর্থের সীমাবদ্ধতায় হারাইয়া ফেলিয়াছে।

এইবার 'ফাল্গুনী'র নাট্যকলা সম্বন্ধে দুই-চারিটি-কথা বলিলেই আলোচনা সমাপ্ত হইবে। এই রচনায় নাট্যপ্রকৃতিটি রবীন্দ্রনাথ ইচ্ছা করিয়াই অনিশ্চিত ও অপরিস্ফুট রাখিয়াছেন। কোথায়ও তিনি ইহার সংজ্ঞাগত অনুশাসনটি নিষ্ঠার সহিত মানিয়া ইহার পূর্ণ রূপটি বিকশিত করেন নাই। নাটকের সংলাপ, ঘটনাবিবর্তন ও চরিত্রদ্যোতনা সমস্ত উপাদানই তিনি অবিমিশ্র নাট্যরসস্ফুরণের অবিভক্ত প্রয়োজনে প্রয়োগ না করিয়া তিনি উহাদিগকে এক জটিলতর সঙ্গতির গূঢ়তর উদ্দেশ্যসাধনে নিয়োজিত করিয়াছেন। সংলাপরচনায় তিনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অপেক্ষা এক নির্বিশেষ ভাবচেতনাকেই বেশী করিয়া পরিস্ফুট করিতে চাহিয়াছেন। উহাদের মধ্যে ব্যক্তিপরিচয় অপেক্ষা যৌথ মনোভাবই স্পষ্টতর হইয়াছে। অভিযাত্রী যুবগোষ্ঠীর মধ্যে কাহারও নিজস্ব সুরটি স্বাতন্ত্র্য লাভ করে নাই, এক নৈর্ব্যক্তিক ভাবহিল্লোলই ফাল্গুনের সুরভি নিঃশ্বাসের মত তাহাদের সমবেত সত্তার রন্ধ্রপথে স্বনিত হইয়াছে। এমন কি চন্দ্রহাস, সর্দার প্রভৃতি মুখ্য পাত্রগণও তাহাদের মানস প্রেরণার পরোক্ষ দীপ্তিতে পরিচায়িত। অন্যান্য তত্ত্বনাটকে প্রাকৃত

জনসাধারণ পর্যন্ত তাহাদের ভাবে ও ভঙ্গীতে, ভাষায় ও প্রতিবেশদ্যোতনায় কতকটা ব্যক্তিস্বারূপ্যের লক্ষণযুক্ত। কিন্তু এই রচনায় প্রধান চরিত্রগণও নির্দিষ্টপরিচয়হীন, ভাবপ্রতিচ্ছায়ার মত অশরীরী মানস প্রক্ষেপমাত্র।

এই তথাকথিত নাটকের তত্ত্বাশ্রয়ও অত্যন্ত অস্পষ্ট ও অনির্দেশ্য; ইহাকে কোন সুনির্দিষ্ট রূপকব্যাখ্যা বা মননগ্রাহ্য অন্তঃসঙ্গতি দিবারও বিশেষ প্রয়াস লেখকের নাই। 'ফাল্গুনী'-র অন্তর্নিহিত জীবনতত্ত্ব কোন যুক্তিক্রমসাহায্যে প্রতিপাদ্য নয়; ইহা সূক্ষ্ম স্বতঅনুভবের পথ বাহিয়া অন্তরাত্মার গভীরে সঞ্চারিত। সুতরাং তত্ত্বনিরূপণ অপেক্ষা অনুকূল ভাবপ্রতিবেশসৃষ্টিই ইহার স্বভাবধর্মসঙ্গত। যৌবনের অমরত্ব কোন আপ্তপ্রমাণনির্ভর বা সার্বভৌম সত্যের স্বতঃস্বীকৃতিপ্রতিষ্ঠিত নয়। ইহা প্রত্যয়ের ঐকান্তিকতা বা আকৃতি-আবেগের অমোঘ আত্মপূরণেচ্ছা হইতে উদ্ভূত। যে প্রাকৃতিক দাক্ষিণ্যে শরতের স্বচ্ছ আকাশে শিশিরবিন্দু সঞ্চিত হয়, বা বসন্তের যাদুমন্ত্রে নব কিশলয় ও পুষ্প বনে কান্তারে অজস্র প্রাচুর্যে রঙের ও নবীন জীবনরসের প্লাবন বহাইয়া দেয়, তাহার অনুরূপ একটি আত্মিক আবহ রচনা করিতে পারিলেই সেখানে যৌবনের শাশ্বত অস্তিত্ব কল্পকাননে পারিজাতফুলের ন্যায় অমোঘ জীবনসত্যরূপে স্বতঃবিকশিত হইয়া উঠিবে। ইহার জন্য যুক্তিতর্কের জলসেচন বা তত্ত্বপ্রতিষ্ঠার কাঁটার বেড়ার প্রয়োজন হইবে না। সুতরাং কবি তাঁহার প্রকৃতিসিদ্ধ অন্তর্দৃষ্টির প্রেরণাতেই পাঠকবর্গের মনে এই নন্দন-কল্পনা উদ্বুদ্ধ করিতেই তাঁহার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াছেন। আভাসে-ইঙ্গিতে, গানে, নবীন মনের স্বপ্নময়তায়, প্রকৃতি-ইন্দ্রজালের মোহাবেশে, বাস্তবতার তীক্ষ্ণতাকে যথাসম্ভব আড়াল করিয়া, ব্যক্তিত্বের নিদর্শনগুলিকে অপ্রত্যক্ষ রাখিয়া লেখক এক নির্মল, ভাবসর্বস্ব, অনুভবময় জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন ও এই পরোক্ষ উপায়েই তাঁহার তত্ত্বরূপককে অন্তর্লোকে স্বতঃসিদ্ধ সত্যের প্রতিষ্ঠা দিয়াছেন।

বরং বিরুদ্ধ ভাবাদর্শের সংঘাতেই 'ফাল্গুনী' তত্ত্বের অন্তঃপ্রকৃতিটি যথাসম্ভব অনুভববেদ্য হইয়াছে। সূচনাতে কবিশেখর ও শ্রুতিভূষণের পরস্পরবিরুদ্ধ জীবননীতি ও রাজার আচরণের উপর উহাদের সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া আমাদিগকে নাটকের তত্ত্বপ্রেরণা সম্বন্ধে অনেকটা স্পষ্টভাবে অবহিত করে। মূল নাট্যঘটনায় চন্দ্রহাস ও সর্দারের অধিনায়কত্ব, অন্ধ বাউলের দিব্যদৃষ্টি ও গতিবেগপ্রমত্ত যুবকগোষ্ঠীর উদ্‌ভ্রান্ত মরীচিকা-সন্ধান অপেক্ষা দাদার চৌপদী

এবং সাধারণ মানুষের প্রতীক্ মাঝি ও কোটালের যুবকদের আদর্শের প্রতি অনাস্থা ও চৌপদীর আধারে বিধৃত সংসারঅভিজ্ঞতাসারের সোৎসাহ অভিনন্দনই আমাদিগকে 'ফাল্গুনী'র মর্মবাণী উপলব্ধি করিতে বেশী সহায়তা করে। প্রবক্তাদের তত্ত্বব্যাখ্যা হইতে বিরুদ্ধবাদীদের প্রতিকূল মনোভাবই যেন উহার প্রতিপাদনে অধিকতর কার্যকরী হইয়াছে। জীবনসর্দারের সহিত জরারাক্ষসের অভিন্নতা-প্রতিপাদন যতটা চমক জাগায় ততটা সমস্যার গ্রন্থিচ্ছেদন করে না। আকস্মিকতার বজ্রধ্বনি বোধকে বিদ্যুৎ-দীপ্ত করে না, তত্ত্বপ্রত্যয়ে পরিণত হয় না। পথখোঁজার, রহস্যানুসন্ধানের রোমাঞ্চ নিঃসংশয় উপলব্ধির নিবিড় আনন্দে, অস্থিমজ্জাগত সংস্কারের প্রগাঢ় শান্তিতে বিলীন হয় না। ফলশ্রুতির মানদণ্ডে আমাদের অন্তরাত্মা লেখকের সমাধানে পরিপূর্ণ সায় দেয় না। নাটকে চলার উত্তেজনা, বাঁকে বাঁকে নব নব দিগন্তের উন্মোচন, প্রকৃতি-পরিবেশের সদা-প্রসারিত সৌন্দর্যকুহকের আমন্ত্রণ এবং তরুণ প্রাণের অদম্য উৎসাহ ও চির-অম্লান আশাবাদ আমাদিগকে মুখ্যভাবে আকর্ষণ করে। আমাদের প্রত্যাশা কিন্তু কোন অনিবার্য উপসংহারের আনন্দতীর্থে পৌছিয়া পরমপ্রসাদধন্য হয় না।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

তত্ত্বরূপকের যুগে অ-তাত্ত্বিক নাটক

প্রায়শ্চিত্ত (৩১শে বৈশাখ ১৩১৬, ইংরাজি ১৯০৯), উহার রূপান্তর পরিত্রাণ (জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬, ইংরাজি ১৯২৯), ও 'মুকুট' (৩১শে ডিসেম্বর, ১৯০৮)।

১

এই তত্ত্বভাবনার যুগে রবীন্দ্রনাথ মুখ্যতঃ রূপকের ছায়ালোক ও সঙ্কেতধর্মী, অমূর্ত ভাবের প্রতীক নর-নারীর সমস্যাজীবনের মধ্যে নিমজ্জিত থাকিলেও, কখনও কখনও পারিবারিক বৃত্তে বিচরণশীল রক্তমাংসের মানুষের প্রবৃত্তি-সংঘাতকে নাট্যরূপ দিবার আগ্রহ অনুভব করিয়াছেন। তিনি সব সময়ই তত্ত্বের সূক্ষ্ম বায়ুস্তরে ও অর্ধ-অবাস্তব মনোলোকে আবদ্ধ থাকেন নাই বা পার্থিবদ্বন্দ্বক্ষুব্ধ মানবজীবন হইতে তাঁহার দৃষ্টি সম্পূর্ণ নিবর্তিত করেন নাই। তাঁহার কাঁচাহাতের লেখা 'বৌঠাকুরানীর হাট' নামে প্রথম উপন্যাসের নাটকীয় সম্ভাবনার প্রতি এই তত্ত্বাবিষ্টতার মধ্যেও তাঁহার নাট্যচেতনা হঠাৎ সচেতন হইয়া উঠে। বোধহয় প্রতাপাদিত্যের ব্যক্তিত্বের বলিষ্ঠতা ও দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিই তাঁহার প্রধান আকর্ষণ ছিল। সে যাহাই হউক, প্রথম তত্ত্বনাটক 'শারদোৎসব'-রচনার একবৎসরের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ প্রতাপাদিত্যের জীবনকাহিনী লইয়া নাটক লিখিবার প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার সৃষ্টিপ্রতিভায় যে তত্ত্বচেতনা গোড়া হইতেই অন্তর্লীন ছিল, তাহা উপন্যাসেই বসন্তরায়ের চরিত্রকল্পনায় আভাসিত হইয়াছে। নাট্যরূপে তাহা আরও উজ্জ্বল ও পরিণত শিখায় প্রাণের উত্তাপ ও লাবণ্যদীপ্তি বিস্তার করিয়াছে। যাহা কাঁচা উপন্যাস ছিল তাহা সুবিন্যস্ত ও সুপরিকল্পিত, শিল্পসুষম ও জীবনরসোচ্ছল নাট্যসংঘাত-কাহিনীতে নিজ অপূর্ণ সম্ভাবনাকে পূর্ণবিকশিত করিয়া তুলিয়াছে। আর সমকালীন তত্ত্বচিন্তাপ্রভাব শুধু বসন্তরায়ের সহজ আনন্দময়তায় তৃপ্ত না হইয়া ধনঞ্জয় বৈরাগীর আদর্শলালিত ও সমাজদর্শনের ইতিহাসবিবর্তনজাত একটি সংঘবদ্ধ গণ-বিপ্লবের বাস্তব কর্মনীতিকে উহার সহিত যুক্ত করিয়াছে। বসন্তরায়ে যে অনাসক্তি স্বভাবসিদ্ধ ধনঞ্জয়ে তাহা একটি সচেতনভাবে লালিত ও সুপরীক্ষিত সমরাস্ত্ররূপে প্রযুক্ত।

এই সংযোজনায় যে নাটকের গোত্রসাঙ্কর্য ঘটিল, পারিবারিক নাটকের মধ্যে তত্ত্বনাটকের ভিন্নজাতীয় রস প্রক্ষিপ্ত হইল, একযুগের জীবন-পরিবেশে আধুনিক যুগের ভাবচেতনা অনধিকারপ্রবেশ করিল, এই প্রকার অনৌচিত্য ও অসঙ্গতির প্রতি লেখকের অত্যুৎসাহ তাঁহাকে দৃষ্টিহীন করিল। তথাপি, মোটের উপর এই নাটকে জীবনের প্রত্যক্ষ চিত্রণের সহিত তত্ত্বারোপের একটা সন্তোষজনক ভারসাম্য রক্ষিত হইয়াছে। ইহার দৃশ্যবিন্যাস, বিভিন্নধারার সম্বন্ধ ও উহাদের ফলশ্রুতির ঐক্যসাধনে নাট্যকার প্রশংসনীয় শিল্পবোধের পরিচয় দিয়াছেন। নাটকটির অঙ্গসৌষ্ঠব ও গঠন-নৈপুণ্য রবীন্দ্রনাথের সমগ্র নাট্যসাহিত্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ আসনের অধিকারী—এ-মন্তব্য অনায়াসেই করা যায়।

পরিবারবৃত্তে ব্যক্তিসংঘর্ষকেন্দ্রিক এই নাটকে তিনটি কাহিনী পরস্পরকে প্রভাবিত করিয়া পাশাপাশি চলিয়াছে। উহাদের মধ্যে মুখ্য স্থান প্রতাপাদিত্যের সহিত তাঁহার আত্মীয়পরিজনবর্গের একটানা দ্বন্দ্ব। অবশ্য এখানে বিরোধী-শক্তিগুলির মধ্যে মোটেই সমতা নাই—প্রতাপের বজ্রকঠোর শাসনের নিকট অপর সকলের সশঙ্ক নতিস্বীকার। উদয়াদিত্য, সুরমা, বিভা, মহিষী বা মন্ত্রী—ইহাদের কোন নিজস্ব দৃঢ়ব্যক্তিত্ব নাই, সকলেই যথেচ্ছাচারী রাজশক্তির নিকট প্রতিরোধহীন বেতসবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। এক বসন্তরায়ের স্বতন্ত্র নীতি-আদর্শ আছে; ইহা মৃদু কণ্ঠে প্রতাপের চণ্ডনীতির ক্ষীণ প্রতিবাদ জানায়। কিন্তু নাটকীয় দ্বন্দ্বকে ঘনীভূত করিবার জন্য যে দুইটি সমশক্তিসম্পন্ন সঙ্কল্পের দ্বৈরথ সংঘর্ষের প্রয়োজন তাহার এখানে একান্ত অভাব। এই নাটকে প্রতাপের অনমনীয় আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তিত্বের কোন প্রতিস্পর্ধী শক্তি নাই। ইহাই নাটকের কেন্দ্রীয় দুর্বলতা। এই একেশ্বরবাদ সম্পূর্ণভাবে অ-নৈতিক ও অ-মানবিক। ইহার পিছনে কোন মানবীয়-হৃৎস্পন্দন, কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্বের আভাস পাওয়া যায় না। ইহা যন্ত্রসুলভ অমোঘ ক্রূরতার সহিত সর্বক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল। কাজেই ইহা যেন পাঠককে এক ডাকিনী-কুহকস্তম্ভিত, অনৈসর্গিক রাক্ষসপুরীতে লইয়া যায়। পরিবারের স্নেহমমতামাখানো প্রতিবেশের সহিত ইহার একটা সর্বাঙ্গীণ অসামঞ্জস্য আমাদের সঙ্গতিবোধকে নিরন্তর পীড়িত করে।

প্রতাপাদিত্যের রাজসভার আবহাওয়ার সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী রাজজামাতা রামচন্দ্রের ইতর ভাঁড়ামো ও মূঢ় আত্মপ্রসাদ দ্বারা আচ্ছন্ন জীবনযাত্রা। এ

যেন পরিহাসরসিক বিধাতার খেয়ালে লৌহদুর্গের সঙ্গে কাচের খেলাঘরের উদ্ভট আত্মীয়তাবন্ধন। একই অদৃষ্টস্রোতে ভাসমান কাংস্যপাত্র ও মৃৎপাত্রের ঠোকাঠুকিতে যে পরিণতি অবশ্যম্ভাবী তাহারই এখানে পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছে। প্রতাপাদিত্যের কাছে যেমন কোন দুর্বলতারই মার্জনা নাই, কাণ্ডজ্ঞানহীন জামাতার একটা স্থূল লোকাচারসমর্থিত তামাসাও তেমনি কোন প্রশ্রয় পায় নাই। তাহার হাত তুচ্ছ অপরাধে চরমদণ্ডবিধানে সর্বদা উদ্যত। পত্নীপ্রেম ও অপত্যস্নেহের আবেদনের ন্যায় কন্যার বৈধব্যও প্রতাপের মনে বিন্দুমাত্র রেখাপাত করে নাই। এই অস্বাভাবিক নৃশংসতাই নাটকের ফলশ্রুতিতে মর্মান্তিক করুণরসসঞ্চারের উপলক্ষ্য হইয়াছে। উপন্যাসের ন্যায় নাটকের নামকরণও এই ভাবকেন্দ্র-প্রভাবিত। প্রায়শ্চিত্ত কাহার হইয়াছে তাহা জানি না, তবে উহা বিভার অভাবনীয় অদৃষ্টনিগ্রহ সম্বন্ধেই সর্বাধিক প্রযোজ্য মনে হয়। সেই নির্দোষ তরুণীই তাহার পিতার নির্মম শাস্তি ও স্বামীর অশালীন চাপল্যের যূপকাষ্ঠে আত্মবলি দিয়াছে। এক দৃষ্টিভঙ্গীতে যাহা বিনা পাপে প্রায়শ্চিত্তের শ্লেষকটাক্ষবিদ্ধ, পরিবর্তিত দৃষ্টিতে তাহাই 'পরিত্রাণ'-রূপে প্রতিভাত হইয়াছে। লৌকিক মানদণ্ডে যাহা ভাগ্যের পরিহাস, ধনঞ্জয়কেন্দ্রিক ভাবাদর্শের মানদণ্ডে তাহাই মুক্তি। যাহার গার্হস্থ্য আশ্রয় চূর্ণ হইল, সেই পথচলার অধিকার অর্জন করিল।

তৃতীয় ধারা সংযুক্ত হইয়াছে ধনঞ্জয়-বৈরাগী-পরিচালিত, গান্ধী-অহিংসা-বাদ-প্রভাবিত প্রজা-আন্দোলনের কাহিনী-মাধ্যমে। ইহার সহিত পারিবারিক নাটকের কোন নাড়ীর সম্পর্ক খুঁজিয়া পাওয়া দুরূহ। ইহার সংযোজনা নাট্যকাহিনীর কেন্দ্রবিন্দুকে অনেকটা বিচলিত করিয়াছে ও প্রতাপাদিত্যের ইস্পাতদৃঢ় চরিত্রেও কিছুটা কল্পনা জাগাইয়া উহার মধ্যে একটা অপ্রত্যাশিত চলচ্চিত্ততার ধারণা জন্মাইয়াছে। মনে হয় যে প্রতাপ নিজ-পুত্র-কন্যা সম্বন্ধে এরূপ নির্বিকার, স্নেহময় খুল্লতাত বসন্তরায়ের বধদণ্ডাজ্ঞায় স্বাক্ষর করিতে যাহার হাত কিছুমাত্র কাঁপে নাই, তাহার ধনঞ্জয় সম্বন্ধে এরূপ দুর্বলতা দেখান যেন চরিত্রসঙ্গতিহীন। প্রতাপাদিত্য যে যুগের লোক, রাজশক্তির সীমাহীন যথেচ্ছাচারের যে সংস্কারে সে লালিত, তাহাতে আধুনিক গণতান্ত্রিকতায় বিশ্বাসী ইংরাজ সরকারের মত সে যে নীতি-আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইবে ও উহার দমনে কোন বিবেকের সঙ্কোচ অনুভব করিবে ইহা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। জীবনে যে আনন্দের আমন্ত্রণে

অসাড়, সে যে উচ্চতর জীবননীতির আহ্বানে বেশী অবহিত হইবে ইহা অস্বাভাবিক ঠেকে। হয়ত রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসের কালৌচিত্যকে বিশেষ কোন গুরুত্ব দেন নাই—তিনি প্রতাপাদিত্যের ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব ও যুগপরিচয়কে সরাসরি অস্বীকার করিয়াছেন। তাহা হইলেও নাটকীয় আবহের সঙ্গতিরক্ষা তাঁহার কলাবিৎ মনের পক্ষে একটি অবশ্যপালনীয় নির্দেশরূপে স্বীকৃত হওয়া উচিত ছিল। তিনি ধনঞ্জয়ের প্রবর্তনে সামন্ততন্ত্রের অতিশাসিত পরিমণ্ডলে এক অদম্য আবেগমত্ততার ঘূর্ণীবায়ু উড়াইয়া দিয়া উহার আভিজাত্যমর্যাদাকে একেবারে বিপর্যস্ত করিয়াছেন। ধনঞ্জয় রাজ-দরবারের নিয়মিত কক্ষপথে এক অভাবনীয় তাণ্ডবনৃত্যের প্রবর্তক। তথাপি ইহা সর্বথা স্বীকার্য যে ধনঞ্জয়-প্রবর্তিত প্রজাবিক্ষোভকে তিনি মাত্রাতিরিক্ত প্রাধান্য দেন নাই; কাহিনীর অন্য দুই ধারার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করিয়াই উহাকে যথাযোগ্য পরিমিতিতে আবদ্ধ রাখিয়াছেন।

২

'ছিন্নপত্র'-এর এক স্থানে রবীন্দ্রনাথ নাটকরচনাকে চৌঘুড়ির গাড়ীচালনার সহিত উপমিত করিয়াছেন। চারি ঘোড়ার গাড়ীতে যেমন রাশ ঢিল করা ও টানিয়া রাখার যথাযথ প্রয়োগে সমস্ত বাহনগুলির গতিবেগের সামঞ্জস্য রক্ষা করা হয়, নাটকেও তেমনি বিভিন্ন কাহিনীগুলির রশ্মিনিয়ন্ত্রণ ও যাত্রা-স্বাধীনতার আনুপাতিক সমতার মাধ্যমে নাট্যঘটনার জটিল বিবর্তন-ধারাগুলিকে সুশৃঙ্খলভাবে ঈপ্সিত রসপরিণামের দিকে চালিত করা যায়। এক-একটি ভাবসূত্রকে সুকল্পিত অভিপ্রায় অনুযায়ী কখনও দৌড় করাইয়া ও কখনও থামাইয়া সব কয়টিকে অগ্রগতির সামঞ্জস্যের দ্বারা একটি ঐক্যবদ্ধ অন্ত্যগ্রন্থিতে মিলাইতে না পারিলে নাট্যরস প্রগাঢ়তা লাভ করে না। 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে রবীন্দ্রনাথ যে এই কৌশলটি পূর্ণভাবে অধিগত করিয়াছেন তাহা তাঁহার দৃশ্যবিন্যাসের পারম্পর্য লক্ষ্য করিলেই বোঝা যাইবে। প্রথম অঙ্কের ১ হইতে ৫ পর্যন্ত দৃশ্যে প্রতাপাদিত্যের পরিবার-জীবনের সমস্যাসমূহকেই বীজ হইতে অঙ্কুরিত হইবার অখণ্ড অবসর দেওয়া হইয়াছে। আমরা এই কয়েকটি দৃশ্যে উদয়াদিত্য ও সুরমার অসহায় ক্ষোভ, বসন্তরায়ের প্রতি প্রতাপের বিজাতীয় ক্রোধ, বসন্তরায়ের প্রাণরক্ষার জন্য

উদয়াদিত্যের পিতৃরোষবরণ, মৃত্যুমুখ হইতে সদ্যউদ্ধারপ্রাপ্ত বসন্তরায়ের প্রতাপাদিত্যের সম্মুখে আগমনে চমকসৃষ্টি ও বসন্তরায়ের আনন্দময় ব্যক্তিত্ব-প্রভাবে সুরমা ও বিভার স্নেহবঞ্চিত চিত্তে অদম্য হর্ষোচ্ছ্বাস—এই সবই প্রতাপাদিত্যের পরিবারবৃত্তের নিরানন্দ, নির্মমশাসনপিষ্ট, বিপদাশঙ্কায় সদা-সন্ত্রস্ত, দুঃসহ রূপটি আমাদের মনে দৃঢ়মুদ্রিত করে। ষষ্ঠ দৃশ্যে ধনঞ্জয় ও মাধবপুরের প্রজাবৃন্দের উপস্থিতি প্রতাপাদিত্যের চণ্ডরূপের আর একটি নূতন দিক, তাহার অত্যাচারী শোষক চরিত্রটি উদ্‌ঘাটিত করে। উহার বিরুদ্ধে প্রজাবিক্ষোভনেতা ধনঞ্জয়ের নির্ভীক, নীতি-আদর্শে অবিচল, আত্মপ্রত্যয়ে দৃঢ় ও ফলাফল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ প্রতিরোধ তাহার পরিবারবর্গের আতঙ্কবিমূঢ় নিশ্চেষ্টতার সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী ও পূর্বতন দৃশ্যগুলির দুঃস্বপ্নাভিভূত বদ্ধ আবহাওয়ার মধ্যে কিছুটা মুক্ত বাতাস প্রবাহিত করে।

দ্বিতীয় অঙ্কে রাজজামাতা রামচন্দ্রের সভাবর্ণনার মাধ্যমে আমরা এক সম্পূর্ণ বিভিন্ন পরিবেশে স্থানান্তরিত হই। প্রতাপাদিত্যের নিঃশব্দ, ষড়যন্ত্রকুটিল, সমস্ত সহজ আনন্দ ও কোমল হৃদয়বৃত্তির স্পর্শহীন, রাক্ষসপুরীর ন্যায় বিভীষিকাময় রাজসভার সম্পূর্ণ বিপরীত এই ইতর-হাস্যপরিহাসমুখর, লঘু আমোদপ্রমোদে তরলায়িত, জীবনের সর্বগুরুদায়িত্বমুক্ত এই রামচন্দ্র-পরিষদ্। এ যেন এক মেরু হইতে ঠিক তাহার উল্টা মেরুতে জীবনের কক্ষপরিবর্তন। যদি বিভার অদৃষ্টবিড়ম্বিত জীবনের করুণ পরিণতি নাটকের মূল সুর হয়, তবে রামচন্দ্রের অব্যবস্থিত চরিত্রই উহার প্রধান ভাবাশ্রয়। সুতরাং এই কাহিনীকে যথোচিত প্রাধান্য না দিলে, উহার মানবিক পরিবেশটির নাট্যসম্ভাবনার পূর্ণ সদ্ব্যবহার না করিলে নাটকের রসনিষ্পত্তিই ব্যাহত হইবে। রূপান্তরিত 'পরিত্রাণ'-এ নাট্যকার ঠিক এই ভুলই করিয়াছেন, আখ্যানের এই অংশটিকে সংক্ষিপ্ত ও গৌণ ভূমিকায় স্থাপন করিয়া নাটকের সুসমঞ্জস বিকাশকেই বিঘ্নিত করিয়াছেন।

সমগ্র দ্বিতীয় অঙ্কটি এক দ্বিতীয় দৃশ্য বাদে রামচন্দ্র-কাহিনী লইয়াই ব্যাপৃত। ইহার মধ্যে রামচন্দ্রের সভাবর্ণনা ও রামাইএর অশালীন কৌতুক-অভিনয়ের প্রথম সূত্র-উত্থাপন, রামমোহনের সহিত বিভা ও প্রতাপমহিষীর অন্তরঙ্গ স্নেহসম্পর্ক, রামচন্দ্রের শ্বশুরালয়ে প্রমোদ-উৎসব ও উহার মধ্যে

অতর্কিত বিপদ্‌-সংকেত, নটনটীবৃন্দের বিপদসঙ্কুল আবহাওয়ার ছায়াপাতে অস্বস্তি, প্রতাপাদিত্যের জামাইবধের নৃশংস আদেশ ও ঘনায়মান উৎকণ্ঠার মধ্যে তাহার উদ্ধারসাধন, প্রতাপের ক্রোধ ও প্রতিহিংসা এ সবই নাটকে এক রুদ্ধশ্বাস পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে মাত্র দুইটি দৃশ্য বিষয়ান্তরসংশ্লিষ্ট। দ্বিতীয় দৃশ্যে ধনঞ্জয়-পরিচালিত প্রজা-আন্দোলন পরিণতির এক নূতন স্তরে পৌঁছিয়াছে। ধনঞ্জয় এখন মুখোমুখি প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সংকল্প গ্রহণ করিয়াছে। সে তাহার আত্মার বলকে চরম পরীক্ষার সম্মুখীন করিতে প্রস্তুত। দূর হইতে স্পর্ধাবিনিময়ের কাল এখন অতীত, এখন অত্যাচারী রাজার সঙ্গে প্রত্যক্ষ শক্তিপরীক্ষার ও আত্মিক প্রভাবে তাহার চিত্ত-পরিবর্তন ঘটাইবার শুভ লগ্ন উপস্থিত হইয়াছে। আর অষ্টম দৃশ্যে রামচন্দ্রের আকস্মিক বিপৎপাতে ও উহা হইতে অভাবিত মুক্তিতে মহিষীর যে হতবুদ্ধি ভাব, তাহারই সূত্রানুসরণে রাজরোষের বজ্রপাত সুরমার মস্তকে নিক্ষিপ্ত হইবার হুকুম জারি হইয়াছে। রাজার প্রতিহিংসার সহিত রাণীর মেয়েলি কুসংস্কার ও বৌ-এর উপর শাশুড়ীর সহজ ঈর্ষ্যা যুক্ত হইয়া রাজসংসারের কাঁটা সুরমাকে সরাইবার ষড়যন্ত্র ঠিক হইয়াছে। রাজপ্রাসাদ হইতে নির্বাসনের প্রথম ধাপ হিসাবে পুত্র-পুত্রবধূর মধ্যে মনোবিচ্ছেদ ঘটাইবার চক্রান্ত মহিষীর মনে দানা বাঁধিয়াছে। ঔষধ-প্রয়োগের সম্ভাবিত ফল যে অপঘাত মৃত্যু পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে তাহা অবশ্য রাণীর মনে উদয় হয় নাই।

তৃতীয় অঙ্কে আখ্যানের তিনটি ধারাই একসঙ্গে পরিণতির পথে আনুপাতিকভাবে অগ্রসর হইয়াছে। প্রথম দৃশ্যে প্রতাপাদিত্য ও ধনঞ্জয় বৈরাগীর প্রত্যাশিত সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছে ও ধনঞ্জয়ের আত্মিক প্রভাব বিশেষ কার্যকরী হয় নাই। রাজা জননেতার আদর্শবাদের বিশেষ কোন মর্যাদা না দিয়া তাহার প্রতিও দণ্ডনীতি প্রয়োগ করিয়াছে। উদয়াদিত্যের সঙ্গে বিক্ষুব্ধ প্রজাদের সংলাপে উভয় পক্ষের মনোভাব আরও সুস্পষ্ট হইয়াছে।

দ্বিতীয় দৃশ্যে রামচন্দ্রের নির্লজ্জ আচরণে বিভার লজ্জা ও আত্মগ্লানি তাহাকে আরও নিঃসঙ্গ ও প্রকাশকুণ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে। সে সুরমা-উদয়াদিত্যের নিকটও নিজ অন্তরকপাটকে রুদ্ধ করিয়াছে। ইতিমধ্যে রাজরোষও সুরমার উপর আরও উদ্যত হইয়া উঠিয়াছে। সে-ই সমস্ত অনর্থের মূলরূপে রাজা-রাণীর চক্ষুঃশূল হইয়াছে।

তৃতীয় দৃশ্যে সুরমার প্রতি ঔষধ-প্রয়োগের ফলে তাহার আকস্মিক মৃত্যু ঘটিয়াছে। যে বজ্র তাহার উপর কিছুদিন ধরিয়া পতনোন্মুখ ছিল তাহা শেষ পর্যন্ত মৃত্যু উদ্‌গীরণ করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছে। তাহার এই করুণ পরিণাম বিভার ক্ষণিক রোষোচ্ছ্বাস ও উদয়াদিত্যের নির্বেদদীর্ণ বিষণ্ন স্বীকৃতি ছাড়া আর কোন গুরুতর আলোড়ন সৃষ্টি করে নাই। তাহার অপসারণে নাটকের ভারকেন্দ্র বিশেষ বিচলিত হয় নাই, এমন কি ইহা উদয়ের মনেও কোন প্রবল প্রতিক্রিয়া জাগায় নাই। নাটক মধ্যে তাহার ভূমিকা যে কত গৌণ ছিল তাহাই ইহাতে প্রমাণিত হইয়াছে।

চতুর্থ দৃশ্যে মাধবপুরের প্রজাবৃন্দ আধুনিক যুগোপযোগী সত্যাগ্রহ অবলম্বন করিলেও সহজেই উদয়ের উপদেশে উহা ভঙ্গ করিয়া দেশে ফিরিয়াছে। আত্মিক প্রতিরোধের সংকল্প তাহাদের মনের মাটিতে দৃঢ়মূল হয় নাই, একটা ক্ষণিক ভাবোচ্ছ্বাসের বেশী কোন শক্তিসঞ্চয় করে নাই, তাহাই ইহাতে প্রতিপন্ন।

পঞ্চম দৃশ্যে শ্বশুরগৃহে লাঞ্ছনা ও বিপন্মুক্তি রামচন্দ্রের লঘু ও আত্মতৃপ্ত চিত্তে প্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়া উদ্দীপন করিয়াছে। সে এই অপমান ভুলিবার জন্য ও তাহার স্বভাবসিদ্ধ আস্ফালনবৃত্তি চরিতার্থ করিতে দ্বিতীয় বিবাহের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে ও ক্ষুদ্রচেতা ব্যক্তি যেমন নিরীহ অসহায় পোষ্যের উপর রাগ দেখাইয়া নিজ আহত মর্যাদার ক্ষতিপূরণ করে, তেমনি সে বিভাকে মর্মান্তিক আঘাত হানিবার কাপুরুষোচিত প্রস্তাবে উল্লাস অনুভব করিয়াছে। কিন্তু তাহার অন্তঃকরণেও যে ভালবাসা ও কর্তব্যবোধের কিছু লুপ্তাবশেষ প্রচ্ছন্ন ছিল রামমোহনের বিভাকে আনিবার প্রস্তাবে তাহার গোপন, কুণ্ঠিত অনুমোদন তাহারই ক্ষীণ নিদর্শন।

চতুর্থ অঙ্কে বিভিন্ন ঘটনাগুলি আরও একটু শ্লথপদে ও বিশেষ কোন নাটকীয় উৎকণ্ঠা উদ্দীপন না করিয়াই পরিণামমুখী হইয়াছে। ইহাতে নাট্য-সমস্যার শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছিবার পূর্ব-প্রস্তুতির বিচ্ছিন্ন ইঙ্গিত পাওয়া যায়। প্রথম দৃশ্যে রাজা উদয়াদিত্যের প্রতি সিংহাসন-অধিকারের ষড়-যন্ত্রের অভিযোগ করিয়াছে ও মন্ত্রীর দোষক্ষালন-প্রয়াস সত্ত্বেও এই সন্দেহ তাহার মনে দানা বাঁধিয়াছে। দ্বিতীয় দৃশ্যে বসন্তরায়ের সদা-প্রফুল্ল চিত্ত কিঞ্চিৎ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া উহার সহজ জীবনরসউপভোগের স্পৃহা হারাইয়াছে তাহা জানা যায়। ইতিমধ্যে তাঁহার নিকট উদয়াদিত্যের

বন্দিত্বের দুঃসংবাদ পৌঁছিয়া তাঁহার অজ্ঞাত বিষাদকে আরও ঘনীভূত করিয়াছে। আর একটি আখ্যানধারায়ও দুঃখের ছায়া গাঢ়তর হইয়াছে—বিভাকে স্বামীগৃহে লইয়া যাইবার জন্ত রামমোহনের যাচিয়া-লওয়া দৌত্য নিষ্ফল হইয়াছে ও বিভার ভাগ্যাকাশে আবার নূতন মেঘসঞ্চার ঘোরতর বিপদের পূর্বাভাস দিয়াছে। ইহার পর রামচন্দ্রের দ্বিতীয় বিবাহ-প্রস্তাব সোৎসাহে ও সদম্ভে অগ্রসর হইয়াছে ও জন্মদুঃখিনী বিভার একমাত্র উদ্ধারপথের চিররুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা দেখা গিয়াছে। উদয়ের জীবনেও আসন্ন দুর্যোগের লক্ষণ স্পষ্টতর হইয়াছে ও বসন্তরায়ের হিতৈষণা উহাকে দ্রুততর পরিণতির দিকে আগাইয়া দিয়াছে। পঞ্চম দৃশ্যে যুবরাজের অনুরক্ত অনুচরগণ কারাগারে আগুন লাগাইয়া তাহার সাময়িক মুক্তির উপায় করিয়াছে ও ষষ্ঠ দৃশ্যে বসন্তরায় এই উদ্ধারমুহূর্তে আসিয়া তাহাকে রায়গড়ে পলায়নে রাজী করিয়াছে। ইহাতেও কিন্তু বিপদ কাটিল না, একটু পিছাইল মাত্র। এই অগ্নিসংযোগের একমাত্র স্থায়ী ফল হইল ধনঞ্জয়ের বহ্নিপ্রশস্তি। আগুন লাগানোর ব্যাপারটি সম্পূর্ণ প্রয়োজনমূলক ও ধনঞ্জয়ের জীবনাদর্শশিখার কণামাত্র ইহার মধ্যে অনুপস্থিত। তথাপি ধনঞ্জয় এই সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক বহ্নিদাহে কেন যে উৎসবের রক্তবর্ণচ্ছটা আবিষ্কার করিয়া উল্লাসনৃত্যে মাতিয়া উঠিল ও আগুনের অধ্যাত্মগুণ-কীর্তনে বিভোর হইল তাহার কোন সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। নাট্যঘটনার সহিত নিঃসম্পর্ক ভাবোচ্ছ্বাস কেমন করিয়া যে নাট্য-কারের সহজাত ও শিল্পসম্মত ঔচিত্যবোধকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে এই দৃষ্টান্তে তাহারই সতর্কবাণী নিহিত। সপ্তম দৃশ্যে প্রতাপের পরিবারভুক্ত তৃতীয় ব্যক্তির—বসন্তরায়ের—নিয়তিনির্দিষ্ট যাত্রাসমাপ্তির সঙ্কেত ধ্বনিত হইল তাহা আমরা অনুভব করি। বহুধা-আবৃত্ত, বহুঘোষিত মৃত্যুদূত বারবার প্রতিহত হইবার পর এবারে একেবারে শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইল। ঠিক এই ক্রূরতম মুহূর্তে ধনঞ্জয়ের কারাগারপ্রশস্তি ও আত্মিক আদর্শ প্রতাপাদিত্যের লৌহহৃদয়ে ক্ষণবৈরাগ্য-সঞ্চারে তাহার চিত্তশুদ্ধির ক্ষীণ আশা জাগাইয়া উহাকে সঙ্গে সঙ্গে নির্মূল করিল। এই আশাভঙ্গের কাহিনী অদৃষ্টের মর্মান্তিক পরিহাসরূপে আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়। এই সঙ্গে উদয়াদিত্য, বিভা ও বসন্তরায়ের জীবন-ট্রাজেডি একেবারে অন্তিম পর্যায়ে আসিয়া স্তব্ধ হইয়াছে।

পঞ্চম অঙ্কের প্রথম দুইটি দৃশ্যে বসন্তরায়ের জীবননাট্যের উপর শেষ যবনিকাপাত হইয়াছে। তাঁহাকে বাঁচাইবার ব্যর্থ চেষ্টা ও মৃত্যুর প্রাক্কালে তাঁহার জীবনপ্রসাদের শেষ অঞ্জলিগ্রহণের জন্য উৎসব-আয়োজন এই পরিণামকে আরও করুণ করিয়াছে। তৃতীয় দৃশ্যে উদয়াদিত্য সিংহাসনের দাবী প্রত্যাহার ক'রিয়া কাশীযাত্রার অনুমতি চাহিয়াছে। চতুর্থ দৃশ্যে উদয়াদিত্য ও ধনঞ্জয় পারস্পরিক আদর্শবিনিময়সূত্রে একই জীবনযাত্রার পথিকরূপে চিরমিলনের আত্মীয়তাবন্ধন স্বীকার করিয়াছে। তবে বিভা তাহাদের সঙ্গী হইবে কি না তাহা এখনও চূড়ান্তভাবে ঠিক হয় নাই। শ্বশুরবাড়ীর বিকল্প আশ্রয় না মিলিলে পথের গাঁটছড়ায় সেও বাঁধা পড়িবে। মনে হয় যে রাঙা মাটির পথের মোহ তাহাদের আদর্শসাম্যের ঠিক যোগ্য প্রতীক্ হয় নাই। ইহার আকর্ষণ ধনঞ্জয়ের জীবনসাধনার যতটা স্বভাব-অনুকূল, উদয় বা বিভার ভিন্নধর্মী জীবনাকাঙ্ক্ষার ততটা অনিবার্য পরিণতি নয়। ধনঞ্জয়ের পক্ষে যে পথচারিতা পরম-সিদ্ধির পূর্ণাহুতি, জীবনপরিক্রমার বাঞ্ছিত পরিণামতীর্থ, ভাগ্যহত দুই ভাই-বোনের পক্ষে তাহা কেবল ক্ষতশান্তির প্রলেপ, নীড়-চ্যুতির বিষণ্ন আশ্রয়। রাঙামাটির রাখীবন্ধন সকলের নিকট সমভাবে গ্রহণীয় নয়। পঞ্চম দৃশ্যে রামচন্দ্রের বিবাহ-উৎসব মহাপ্রস্থানের বিপুল বিরতির সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। সংসারত্যাগের চরম নৈঃশব্দ্যের মধ্যে নূতন করিয়া সংসার পাতিবার মূঢ় আগ্রহ ও ইতর প্রমোদকোলাহল বেসুরো ঠেকে। উপসংহারদৃশ্যের মর্মান্তিক নৈরাশ্য ও নির্মম ঔদাসীন্যের পরি-প্রেক্ষিতেই এই বিবাহ-উৎসবের সমস্ত গ্লানি, স্থূল জীবনাসক্তির সমস্ত দুঃসহ লজ্জা ও রূঢ়তা আমাদের সমগ্র চেতনাকে শ্লেষবিদ্ধ করে। এই দৃশ্যের আরও একটি উপযোগিতা আছে। বিভার তরুণ জীবনের অতৃপ্ত দাম্পত্য প্রেমের বঞ্চনা তাহার মনকে যে সান্ত্বনাহীন হাহাকারে পূর্ণ করে তাহাই তাহার কাশীবাসের সঙ্কল্পকে নিদারুণ পরিহাস জানায়। যাহার প্রকৃত স্বভাব অন্তঃপুরমুখী ও নীড়াশ্রয়ী, তাহাকে পথে বাহির করা কৃচ্ছ্রসাধ্য আদর্শের জয়ঘোষণা করিতে পারে, কিন্তু এই শূন্য-গর্ভ জয়ধ্বনি অন্তঃরুদ্ধ অশ্রুকল্লোলের বিষাদরাগিণীকে চাপিয়া রাখিতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের আদর্শনিষ্ঠা তাঁহাকে রাঙামাটির পথে নিরুদ্দেশ-যাত্রার প্রশস্তিরচনায় প্রণোদিত করিয়াছে, কিন্তু তাঁহার লোকচরিত্রাভিজ্ঞ

কবিসত্তা এই অব্যক্ত বেদনার অশ্রুবিলাপগুঞ্জনকে অস্বীকার করিতে পারে নাই। তাই নাটকের কপোলতলে এই অ-বর্ষিত অশ্রুবিন্দু অমর হইয়া রহিল।

৩

'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকটি সুষম গঠনরীতিতে ও সুশৃঙ্খল কাহিনী-গ্রন্থনে যে প্রশংসনীয় শিল্পকৃতিত্বের অধিকারী হইয়াছে তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। 'বৌঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাসটি সব দিক্ দিয়াই অপরিণত রচনার লক্ষণযুক্ত। উহার ঘটনাবিন্যাস অত্যন্ত শিথিল, উহার জীবনবোধ ভাবালুতায় অস্পষ্ট ও লক্ষ্যহীন, উহার চরিত্রায়ন অবাস্তব ও কল্পনাতরল। উপন্যাসের ভাবসত্য বা রূপসুষমা কোনটাই উহার মধ্যে স্ফূর্ত হয় নাই—উহাকে উপন্যাসের ভ্রূণাবস্থা বলিলেও উহার প্রতি অবিচার করা হয় না। কিন্তু নাটক হিসাবে উহা যথেষ্ট সুপরিণত ও সব দিক দিয়াই শিল্পোন্নত। উহা গঠনে সুসংবদ্ধ, জটিল কাহিনীবিন্যাসে নৈপুণ্যস্বাক্ষরিত, চরিত্রাঙ্কনে দৃঢ় ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যদ্যোতক। হয়ত উহার মধ্যে কোন একটি দৃশ্য চরম নাটকীয় সংঘাতে অগ্নিময় হইয়া উঠে নাই ও বিশেষভাবে স্মরণীয় হয় নাই। কিন্তু সমস্ত ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতের বেগ ও উত্তেজনা সমপরিমাণে ব্যাপ্ত থাকিয়া পাঠকের কৌতূহলকে সদা-জাগ্রত রাখে। এক ধনঞ্জয়-সংক্রান্ত দৃশ্যগুলি ছাড়া কোথাও আরোপিত জীবনাদর্শ ও পূর্বনির্ধারিত ভাবকল্পনা মানবিক দ্বন্দ্বের সহজ প্রবাহ ও গতিচ্ছন্দকে তত্ত্বভারাক্রান্ত করে নাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার তত্ত্বসাধনার যুগের আর কোন নাটকে এরূপ স্বচ্ছ, প্রত্যক্ষ জীবনদৃষ্টির, বিশুদ্ধ মানবিক রসের এরূপ অকুণ্ঠিত নাট্যপ্রকাশের পরিচয় দেন নাই। তিনি নাট্যাদর্শের আত্মবিলোপী নৈর্ব্যক্তিকতার এত অনবদ্য দৃষ্টান্ত আর কোথায়ও স্থাপন করেন নাই। এখানে তিনি নিজস্ব মতবাদকে সম্পূর্ণ ভুলিয়া নাটকের পাত্রপাত্রীদের আত্ম-উদ্‌ঘাটনের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা দিয়াছেন। নাট্যকারের আত্মপ্রক্ষেপ কোথাও নাটকের চরিত্রাবলী ও পাঠকের রসোপভোগের মধ্যে অন্তরাল রচনা করে নাই। নাট্যকারের যে প্রধান গুণ—সৃষ্ট চরিত্রাবলীর সঙ্গে সম্পূর্ণ একাত্মতা-সাধন—তাহা এখানে পরিপূর্ণভাবে

উদাহৃত। প্রতাপাদিত্য, বসন্তরায়, উদয়াদিত্য, সুরমা, বিভা, মহিষী, রামচন্দ্র, রমাই প্রতিটি চরিত্রই তাহাদের অন্তর্লোককে আমাদের নিকট অবারিত ও নিজ নিজ সুস্পষ্ট ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পরিচয় মুদ্রিত করিয়াছে। বাস্তব জীবনসত্যের প্রতি এত অখণ্ড অভিনিবেশ রবীন্দ্রনাটকের অন্যত্র সুদুর্লভ।

এমন কি যে প্রতাপাদিত্য উপন্যাসে যান্ত্রিক নির্মমতার প্রতিমূর্তি ও রূপকথার আসুরী মায়ার মূর্ত বিগ্রহরূপে আমাদের বাস্তববোধকে দুঃস্বপ্ন-পীড়িত করিয়াছিল, সেও যেন নাটকের সচল আব-হাওয়ায়, বিচিত্র কর্মসংঘর্ষ ও জনসম্পর্কের অভিঘাতে উহার অন্তঃপ্রকৃতিকে উন্মুক্ত করিয়াছে। তাহাকে নাটকে যেন উপন্যাসের ন্যায় এতটা অ-মানবিক বোধ হয় না। তাহার প্রস্তরকঠিন নির্বিকার শক্তিমূঢ়তার মুখোস অবশ্য সম্পূর্ণ খুলে নাই। তথাপি তাহার পরিবার-পরিজন ও রাজকার্যসংশ্লিষ্ট সেবকগোষ্ঠীর মধ্যে তাহার অনুজ্ঞাপ্রচার ও আত্মকার্যসমর্থনের ভিতর দিয়া তাহার মনোগহনের যেটুকু আভাস মিলে তাহাই তাহার মানবিকতাকে স্পষ্টতর করিয়া তোলে।

সুরমা ও বিভার সন্ত্রাসসঙ্কুচিত, স্বচ্ছন্দবিকাশবঞ্চিত চরিত্র দুইটিও আলো-হাওয়া হইতে অবরুদ্ধ, দল-না-মেলা, ম্লান দুইটি ফুলের মত একপ্রকার ক্ষীণ, করুণ সৌরভ বিকীর্ণ করিয়াছে। উহাদের প্রকৃতি ও জীবনপরিবেশের অভিন্নতার মধ্যেও একটু সূক্ষ্মতর পার্থক্য পরিস্ফুট হইয়াছে। সুরমা প্রতাপাদিত্যের ভ্রূকুটিতলে, প্রতি মুহূর্তে অতর্কিত বিপদাশঙ্কার অস্বস্তি-কণ্টকিত আবহাওয়ায় বাস করিয়াও স্বামিপ্রেমের অমৃতরসে জীবনকে অভিষিক্ত করিয়াছে ও নিজ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও মনোবলে স্থির আছে। সে প্রতাপের রুদ্ররোষকে উপেক্ষা করিয়া বিপদের ঝুঁকি লইতে ও সৎসাহসের পরিচয় দিতে সর্বদা প্রস্তুত। সে তাহার উদ্বৃত্ত শক্তির সঞ্চয় হইতে একদিকে দ্বিধাদুর্বল উদয়কে, অপরদিকে আরও অসহায় ও কোমলপ্রকৃতি বিভাকে সর্বদা ভরসা ও উৎসাহ যোগাইয়াছে ও সংসারসংগ্রামে অটল থাকিবার প্রেরণা দিয়াছে। মৃত্যুর সম্মুখে পর্যন্ত সে তাহার দৃপ্ত তেজস্বিতা অক্ষুন্ন রাখিয়াছে। দুঃখের বিষয় নাট্যকার তাহার নৈতিক প্রভাবকে ও ব্যক্তিত্ব-মহিমাকে নাটকমধ্যে যথাযোগ্য মর্যাদা দেন নাই। তাহার আকস্মিক অন্তর্ধানের নিদারুণ প্রতিক্রিয়া তিনি মোটেই পরিস্ফুট করেন নাই। তাহার স্নেহাঞ্চলে রক্ষিত উদয় ও বিভা এই মর্মান্তিক আঘাতে যে আরও নৈরাশ্যগ্রস্ত

ও বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছে তাহার কোন নিদর্শন নাটকে মিলে না। আসল কথা নিয়তির নির্মম চক্রাবর্তন তখন এত সাংঘাতিক গতিবেগ সঞ্চয় করিয়াছে, আসন্ন পরিণামের দিকে এত অনিবার্যভাবে অগ্রসর হইয়াছে যে কোনও ব্যক্তিবিশেষের নিয়ন্ত্রণপ্রভাব সেখানে নগণ্য হইয়া পড়িয়াছে। উদয় ও বিভা যে দুর্বার ঘূর্ণীচক্রের টানে অতলে তলাইয়া গিয়াছে তাহা হইতে কোন মানবিক শক্তি তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে অসমর্থ। রাঙামাটির ধূসর পথ ও ধনঞ্জয়ের নির্লিপ্ত বৈরাগ্যের আদর্শরজ্জু একযোগে তাহাদিগকে জীবনরঙ্গমঞ্চ হইতে নেপথ্যলোকের অন্তরালে আত্মবিলোপের শূন্যতায় সংহরণ করিয়া লইয়াছে। সীতার পাতালপ্রবেশের মত এই অস্তিত্বের শূন্যতাবিলয়কে আমরা একটা আধ্যাত্মিক গৌরবের ছদ্মবেশ পরাইয়া আত্মবঞ্চনার অভিনয় করিয়াছি।

বিভার সমস্যা সুরমা হইতে করুণতর ও জটিলতর। সে সুরমার সহিত তুলনায় সংসারজ্ঞানহীনা, অপরিণতবুদ্ধি ও স্বভাবভীরু একটা বালিকা মাত্র। সুরমার যে প্রধান সহায় সেই স্বামিগৌরববোধ ও স্বামিপ্রেমনির্ভরতা তাহাকে কোন আশ্রয় দেয় নাই। একমাত্র দাদা ও বসন্তরায়ের স্নেহধারা এই নিদাঘক্লিষ্ট, ম্লান লতাটিকে কোনমতে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। অমানুষ স্বামীর ইতর ব্যসনাসক্তি ও ঔদাসীন্য তাহার তরুণ মনে যে জীবনরসের কুঁড়িটি আতপক্লিষ্ট করিয়াছে দাদা ও দাদামহাশয়ের বিরলবর্ষিত স্নেহরসসিঞ্চন সেই শুষ্কতার প্রতিষেধ করিতে পারে নাই। সুতরাং অপরিতৃপ্ত জীবনকামনার দাহ লইয়া সে যখন নেপথ্যান্তরালে চলিয়া গিয়াছে তখন একটি ভাগ্যবঞ্চিত জীবনের করুণ সুরটিই তাহার শেষ স্মৃতিচিহ্নরূপে আমাদের অন্তরে অনুরণিত হইয়াছে।

রামচন্দ্র, রামাই ভাঁড়, মহিষী, উভয় রাজার মন্ত্রীদ্বয়, রাজসভাসদ ও পরিকরবৃন্দ সকলেই স্ব স্ব গৌণ ভূমিকার স্বল্প পরিসরে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। ইহারা মোটামুটি সংসারের স্থূল বৈষয়িকতার প্রতীক ও রবীন্দ্রনাথের অভ্যস্ত জীবনপরিচয়ের কক্ষবহির্ভূত। আর রামচন্দ্র ও রমাই ত সম্পূর্ণরূপে রবীন্দ্রমানসরুচির বিরোধী, জীবনের ইতর আমোদপ্রমোদ ও স্থূলরসের কারবারী। অথচ নাট্যকার যেরূপ সূক্ষ্ম সহানুভূতির সহিত তাহাদের সঙ্কীর্ণ অন্তরলোকে প্রবেশ করিয়া তাহাদের অমার্জিত জীবন-প্রেরণার সূত্রটি উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন, তাহাদের মানস চিত্রাঙ্কনে যেরূপ

সমদর্শী বাস্তববোধের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা তাঁহার সাহিত্যসৃষ্টিতে বিরল ব্যতিক্রম। ইহাদের মধ্যে বিশুদ্ধ জীবনরসিকতার প্রকাশ, কোথায়ও লেখকের নিজস্ব বিচারবোধ, নিজের ব্যক্তিগত রুচি ও আদর্শ ছায়াপ্রক্ষেপ করে নাই। মাধবপুরের প্রজাবৃন্দ সম্বন্ধেও এই মন্তব্য প্রযোজ্য হইত, যদি উহাদের উপর ধনঞ্জয়ের প্রভাব উহাদের সহজ প্রেরণাকে এক আরোপিত আদর্শচক্রে আবর্তিত না করিত। নাটকে উহাদের পরিচয় ততটা প্রাকৃত পল্লীবাসী হিসাবে নয়, যতটা একটা বিশেষ সাধনায় অর্ধদীক্ষিত, গুরুনির্দেশ-চালিত শিষ্যগোষ্ঠীর অঙ্গরূপে।

সর্বশেষে নাট্যকারের সংযম ও মাত্রাবোধ বিশেষভাবে উদাহৃত হইয়াছে বসন্তরায়ের সহজ আনন্দময়তা ও ধনঞ্জয়ের অধ্যাত্ম উল্লাসের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্যরক্ষায়। লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে এই দুই ভাবোন্মত্ত ব্যক্তিকে তিনি কোথায়ও একত্র মিশিবার উপলক্ষ্য দেন নাই। উভয়ের জীবনধারা স্বতন্ত্রখাতে প্রবাহিত হইয়াছে, গঙ্গা-যমুনার ন্যায় কোন সঙ্গমতীর্থ রচনা করে নাই। এই দুই প্রকার আনন্দের উৎস ও প্রকাশছন্দ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বসন্তরায়ের আনন্দপ্রবণতা প্রকৃতিগত ও উহার ক্ষেত্র হইল স্নেহমমতা-রসিকতাময় শ্যামস্নিগ্ধ পরিবারজীবন ও সামাজিক প্রীতিবিনিময়ের উপভোগ্য মজলিশ। তাঁহার আনন্দোচ্ছ্বাস হয় পারিবারিক অন্তরঙ্গতার অন্দরমহলে না হয় সদর বৈঠকখানার রসিকগোষ্ঠীর সমাবেশে, কখনও কখনও পথিকের স্বচ্ছন্দগতির মুক্ত রাজপথে নিষ্ক্রমণ-প্রেরণা পাইয়াছে। ধনঞ্জয়ের আনন্দের পিছনে কিন্তু আদর্শসাধনার একটি আয়াসলব্ধ মানসপ্রস্তুতি ক্রিয়াশীল ও উহার উপলক্ষ্য সমাজসেবামূলক। তাহার নৃত্যগীত-বিভোরতা ধ্যানপ্রশান্তি ও ব্রহ্মচেতনার উন্মত্ত উচ্ছ্বাস—স্থির নদীর নিশ্চল তলদেশ হইতে উৎক্ষিপ্ত তরঙ্গভঙ্গ, যোগমগ্ন ধূর্জটির জটাকম্পন ও তাণ্ডবনর্তন। তাহার আনন্দনদীতে বেগসঞ্চার করে হিমালয়শৃঙ্গে সঞ্চিত তুষারস্তূপের গলিত ধারা, কোন স্থির সরোবর বা কূপের জল নয়। সুতরাং যদিও উভয়ের বহির্লক্ষণ এক মনে হইতে পারে, উহাদের অন্তঃপ্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। 'পরিত্রাণ'-এ রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বমুগ্ধ নাট্যপ্রেরণা প্রথম দৃষ্টেই এই দুই প্রকারের উচ্ছ্বাসকে মিশাইয়া এক ভাবোন্মত্ততার জলাভূমি রচনা করিয়াছে। 'প্রায়শ্চিত্ত'-এ নাট্যকারের অপ্রমত্ত জীবনবোধ ও বাস্তবনিষ্ঠা তত্ত্বচেতনার এই অভিভবকে প্রতিরোধ করিয়া যথার্থ নাট্যদৃষ্টির অকৃত্রিমতা রক্ষা করিয়াছে।

৪

ঠিক বিশ বৎসর পরে পুনর্লিখিত 'পরিত্রাণ' নাটকে রবীন্দ্রনাথ তত্ত্বভাবনার এক নূতন স্তরে প্রবিষ্ট হইয়া ও এক বলিষ্ঠতর তত্ত্বদৃষ্টিপ্রভাবিত হইয়া তাঁহার পূর্বতন নাটকের রূপান্তর সাধন করিয়াছেন। যে তত্ত্বরূপকের আকর্ষণ এতদিন পর্যন্ত অন্তর্গূঢ় অধ্যাত্ম চেতনার প্রদোষলোকে সীমাবদ্ধ ছিল, তাহা এখন সুদূর অতীতের অমূর্ত ধ্যানকল্পনার অন্তর্জগৎকে অতিক্রম করিয়া আধুনিক কর্মসাধনার অতিবাস্তব শক্তিকেন্দ্র পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে। বর্তমান জীবনসংবেগের দুই প্রধান উৎস—রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতি—এখন দর্শনতত্ত্বের সূক্ষ্মরূপে, জড় উপকরণ হইতে জীবনবিধানের চিন্ময় সত্তায় নবজন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে। রাষ্ট্রের অধিকারবিস্তার ও যন্ত্রশক্তি-প্রয়োগে জাতীয় ঐশ্বর্যবৃদ্ধি আধুনিক যুগের দুইটি প্রবলতম অভীপ্সা। ইহারা কিন্তু শুধু বৈষয়িক স্তরে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া মানুষের মানসলোকে ও ভাবরাজ্যে দুর্বার শক্তিরূপে অনুপ্রবেশ করিয়াছে ও সমগ্র জীবনসাধনার এক অভাবনীয় রূপান্তর ঘটাইয়া তত্ত্বরূপকের আশ্রয়ে নিজ নিজ গূঢ় প্রভাবের অন্তর্মুখিতার পরিচয় দিয়াছে। পাশ্চাত্ত্য দেশের রাষ্ট্রপ্রতিযোগিতার তীব্রতা ও যন্ত্রশিল্পের সর্বগ্রাসী শোষণক্রিয়া যেমন রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা' ও 'রক্তকরবী' নাটকে, মহাত্মা গান্ধী-প্রবর্তিত সত্যাগ্রহ ও অহিংসাকেন্দ্রিক ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রামও তেমনি 'পরিত্রাণ' নাটকে তত্ত্বরূপকের সঙ্কেতমর্মিতায় নাট্যভঙ্গীতে ও জীবনস্বারূপ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই নূতন প্রেরণায় প্রতাপাদিত্যের পুরাতন ইতিহাসে ধনঞ্জয়ের গণআন্দোলন ও চরিত্রাদর্শকে অনেক বেশী প্রাধান্যে, এমন কি মূল দ্বন্দ্বের সহিত প্রায় সমমর্যাদায় স্থাপন করা হইয়াছে। নূতন নাটকটির ভাবকেন্দ্র প্রতাপাদিত্যের পারিবারিক জীবন ও প্রজাবিক্ষোভের আদর্শপ্রশস্তি এই উভয় প্রতিযোগী শক্তির মধ্যে প্রায় দ্বিধাবিভক্ত ও সেই পরিমাণে ভারসাম্যচ্যুত। তত্ত্ববিলাসের এই জীবনঘনিষ্ঠতা, সমকালীন উদ্যমের নব নব ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ তত্ত্বকে সজীব ও তাৎপর্যময় করিয়াছে। যেমন ক্ষুদ্রতম পরমাণুর বস্তুকণার মধ্যে অপরিমেয়, সৃষ্টিধ্বংসী তেজোবীজের প্রচ্ছন্ন অস্তিত্ব বৈজ্ঞানিক পরিমাপযন্ত্রে ধরা পড়িয়াছে, যেমন পৌরাণিক কল্পনায় স্ফটিক-স্তম্ভের অভ্যন্তরে নৃসিংহ-মূর্তির দৈব আবির্ভাব অধ্যাত্ম বিভূতির সর্বাত্মকতার প্রত্যক্ষ পরিচয়রূপে

নবতাৎপর্যমণ্ডিত হইয়াছে, তেমনি জড় পদার্থের সহিত তেজোময়তার অভিন্নতার প্রতিপাদন সমস্ত জগদ্ব্যাপারকেই তত্ত্বদৃষ্টির বিষয়রূপে দেখাইয়া তত্ত্বের প্রভাবকে জীবনের কেন্দ্র শক্তিরূপে সর্বাতিশায়ী মহিমা দিয়াছে।

এই তত্ত্বমোহে আবিষ্ট হইয়াই রবীন্দ্রনাথ নূতন নাটকে যে পরিবর্তন করিয়াছেন তাহা নাট্যরূপস্ফুরণের সর্বতোভাবে প্রতিকূল হইয়াছে। পূর্ব নাটকের আঙ্গিকবিন্যাস ও বিবর্তনরীতি এখানে তিনি সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করিয়াছেন। নাটক তত্ত্বাশ্রিত বা বাস্তবজীবননিষ্ঠ যাহাই হউক, উহাকে স্বভাবধর্মের অনুগত হইতে হইবে, ইহা একটি অপরিহার্য সর্ত। যে কয়েকটি ঘটনা ইহার মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইবে তাহাদের সুষম অগ্রগতি ও সুষ্ঠু সহযোগিতা ও নাটকীয় ফলশ্রুতির সুস্পষ্ট প্রতীতি—এইগুলি নাট্যকারের নিকট দর্শকের ন্যূনতম প্রত্যাশা। হয়ত গাঢ়তর তত্ত্বপ্রলেপ দিবার জন্য ও সূক্ষ্মতর ভাব-উদ্বোধনের উদ্দেশ্যে তিনি ব্যঞ্জনার নাট্যপ্রয়োগরীতির আবশ্যকীয় পরিবর্তন করিতে পারেন। কিন্তু নাটকের রসপ্রত্যয়ে কোন অনিশ্চয়তা বা নাট্য-ঘটনার অনিয়ন্ত্রিত সংযোজনা নাট্যকারের অমার্জনীয় ত্রুটি। বিশেষতঃ 'পরিত্রাণ'-এ যদিও ধনঞ্জয়ের গুরুত্ব বাড়ান হইয়াছে তথাপি ইহাতে রাজনীতির অতিপ্রক্ষেপ বা সূক্ষ্মতর আবহসৃষ্টি উহার বাহিরের দৃশ্যসন্নিবেশ বা অন্তঃপ্রকৃতির কোন মৌলিক রূপান্তর ঘটায় নাই। সুতরাং বস্তুধর্মী নাটকের সাধারণ ধর্ম এখানে অপরিবর্তিতই আছে। হয়ত ধনঞ্জয় ও মাধবপুরের প্রজাবৃন্দ নাটকের মধ্যে বেশীবার আবির্ভূত হইয়াছে ও বেশী স্থান দখল করিয়াছে। কিন্তু তাহাতে উহার ভাবজগতের বিশেষ কোন তারতম্য ঘটে নাই। ঘটনার ত্রিধারা পূর্ববর্তী নাটকেও যেমন, এখানেও তেমনি পাশাপাশি প্রবাহিত হইয়াছে, কিন্তু উহাদের সংমিশ্রণে নাট্যকলার কোন শিল্পসম্মত পরিকল্পনা দৃষ্টিগোচর হয় না।

দৃশ্যসংস্থাপনসূত্রটি অনুধাবন করিলেই এই মন্তব্যের যৌক্তিকতা বোঝা যাইবে। পূব নাটকের পাঁচটি অঙ্কের স্থলে বর্তমান নাটক চারি অঙ্কে বিভক্ত। প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে কোন পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়াই ধনঞ্জয়ের আবির্ভাব, উহার দার্শনিকতার উচ্ছ্বাস, নাট্যঘটনার সহিত অসংশ্লিষ্ট তত্ত্বপ্রচার ও তত্ত্বমূলক গান আমাদিগকে উহার নাট্যসঙ্গতিবিষয়ে সংশয়াপন্ন করে। এই প্রথম দৃশ্যেই বসন্তরায় ও ধনঞ্জয়ের মিলন, মনের আনন্দের সহিত

তত্ত্ব-নির্বিকারতার অতর্কিত ভাবসম্ভ্রম এই উচ্ছ্বাস-ভাবুকতাকে উদ্দাম করিয়া তোলে। মূল নাটকে কিন্তু ধনঞ্জয়-বসন্তের কোন সাক্ষাৎকার নাই। তাহার উপর এই দৃশ্যেই বসন্তরায়ের বধের জন্য প্রতাপপ্রেরিত ছদ্মবন্ধুর বেশে পাঠান আততায়ীর প্রবেশ, প্রজাদের সন্দেহ সত্ত্বেও উহার প্রতি ধনঞ্জয়ের উদার আস্থাস্থাপন ও প্রতিটি মানুষের সাধুতায় স্বতোপ্রত্যয় হঠাৎ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। অথচ পরমুহূর্তেই প্রমাণিত হইল যে প্রজাদের সন্দেহই ঠিক ও ধনঞ্জয়ের মানবচরিত্রের প্রতি অতিবিশ্বাস ভ্রান্ত। বসন্তের জীবন ধনঞ্জয়ের ভাবালুতার জন্য সত্যই বিপন্ন হইয়াছিল। কিন্তু এই সত্যপ্রকাশের পরেও ধনঞ্জয় নির্বিকারভাবে বসন্ত-রায়ের সহিত ভাবোচ্ছ্বাসবিনিময়ে বিভোর। মনে রাখিতে হইবে যে এপর্যন্ত ঘটনাবলীর পশ্চাৎপট আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। প্রতাপের সহিত পরিচয়ের পূর্বেই খুল্লতাতের প্রতি তাহার অস্বাভাবিক জিঘাংসা আমাদিগকে গলাধঃকরণ করিতে হইতেছে। মাথা দেখার পূর্বেই আমাদিগকে শিরঃপীড়া অনুমান করিতে হইল। এই প্রারম্ভদৃশ্যে প্রতাপকে অন্তরায়িত রাখিয়া পার্শ্বচরিত্রের মাত্রাধিক সক্রিয়তা নাট্যক্রিয়ার ক্রমোন্মোচনরীতির উৎকট লঙ্ঘনরূপে আমাদের বোধ হয়।

দ্বিতীয় দৃশ্যে মূলের প্রথম অঙ্কের ২য় ও ৪র্থ দৃশ্যের এলোমেলো সংযোজনা দেখা যায়। এইখানে প্রথম প্রতাপাদিত্যের সহিত মন্ত্রীর বসন্তরায়ের বধাদেশ সম্বন্ধে আলোচনা; দ্বিতীয় পাঠানের প্রবেশ ও বসন্তরায়ের বধ সম্বন্ধে নিশ্চিত আশ্বাসদান; পরমুহূর্তেই বসন্তরায়ের সশরীর প্রবেশে এই আশ্বাসের অলীকতা-প্রমাণ। বসন্তরায়ের উপর আক্রমণের অব্যবহিত পরেই এই দৃশ্যটির প্রবর্তন অতিরিক্ত দ্রুত বলিয়া মনে হয়—উহা আমাদিগকে ব্যাপারটির অকারণ নৃশংসতা সম্বন্ধে ভাবিবারই সময় দেয় না।

তৃতীয় দৃশ্যে মূলের প্রথম দৃশ্যের বাকী অংশের অনুবৃত্তি হইয়াছে। দ্বিতীয় অঙ্কের মুখ্য ঘটনাবলী রাজজামাতা রামচন্দ্রের অশালীন আচরণের জন্য প্রতাপের রোষোদ্রেক ও রামচন্দ্রের মৃত্যুদণ্ড-প্রচারে নাটকে ট্রাজিক উৎকণ্ঠার সঞ্চার এখানে প্রবর্তিত। ইহাও যেন পূর্বপ্রস্তুতিহীন ও নিতান্ত আকস্মিক ঠেকে। রামচন্দ্রের পূর্ব ইতিহাস, শ্বশুরালয়ে তাহার আগমন, রমাইএর ইতর ভাঁড়ামোপ্রবণতা প্রভৃতি কোন পরিচয়ই আমাদের দেওয়া হইল না। বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত আমরা সকলেই এই অপ্রত্যাশিত বিপৎপাতে বিমূঢ় হইয়া পড়ি। এই অতর্কিত ঘটনাপ্রক্ষেপ সম্পূর্ণ নাট্যকলাবিরোধী।

এই দৃশ্যে বিভার একটি নূতন ও উহার আনুপূর্বিক আচরণের সহিত সঙ্গতিহীন পরিচয় পাই। প্রতাপাদিত্য তাহার সহিত জামাতার মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞার ঔচিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছে ও বিভাও পরিবারের মানরক্ষার জন্য এই নৃশংস শাস্তিতে সম্মতি দিয়াছে। ইহাতে প্রতাপ ও বিভা উভয়ের সম্বন্ধেই আমাদের পূর্বধারণা রূঢ় আঘাত পায়। প্রতাপ যদি এই ব্যাপারে মেয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়া থাকে, তবে তাহার সুবিবেচনা ও স্নেহশীলতার আত্যন্তিক অভাব সম্বন্ধে পুনর্বিচার করিতে হয়। আর বিভাকে যতটা অসহায় ও ইচ্ছাশক্তিহীন মনে হইয়াছিল তাহাও যথার্থ নয়। যে স্বামীর মৃত্যুর আদেশে অকম্পিত মনোবলে সায় দিতে পারে, তাহাকে একান্তভাবে পরনির্ভরপ্রত্যাশিনীরূপে দেখান তাহার স্বভাবসঙ্গত নয়। আরও একটি কারণে ইহাতে নাটকের গঠনশিল্প ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। অনেকগুলি ধারার যদৃচ্ছ সংমিশ্রণ আমাদের বিচারবিভ্রম ঘটাইয়া রসোপভোগে বাধা দিয়াছে। মূল নাটকে প্রথম দুইটি অঙ্কে ঘটনাবিন্যাসের যে সুশৃঙ্খল ও নাট্যধর্মানুগত আয়োজন হইয়াছে তাহা পরিবর্তিত নাটকের একটি অঙ্কে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলভাবে ও নাট্যরসস্ফুরণের সমস্ত প্রত্যাশাকে বিপর্যস্ত করিয়া ঠাসিয়া দেওয়া হইয়াছে।

দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে মূলের প্রথম অঙ্কের ধনঞ্জয় ও বিক্ষুব্ধ প্রজাবৃন্দ-ঘটিত আখ্যানভাগের প্রথম প্রবর্তনসূচক ষষ্ঠ দৃশ্যটি ও তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের একই ঘটনার পরবর্তী স্তর দুইটিই একসঙ্গে ও পারম্পর্যানুবন্ধ উপেক্ষা করিয়া সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অর্থাৎ দুইটি স্তরকে একত্রিত করিয়া দেখান হইয়াছে। ইহাতে একটি গান 'বল ভাই ধন্য হরি' ও ধনঞ্জয়ের কারারোধ-প্রস্তাবে মন্ত্রীর দ্বিধা এই আখ্যানাংশটুকু বাদ পড়িয়াছে। দুইটি দৃশ্যের বস্তু একই দৃশ্যে পুঞ্জীভূত হওয়ায় ঘটনার অত্যধিক ভিড়ে নাট্যকৌতূহল রসোত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। দ্বিতীয় দৃশ্যেও তথ্যের অত্যধিক বাহুল্য নাটকের সহজ প্রবাহকে প্রতিরুদ্ধ করিয়াছে। ইহাতে মূলের তৃতীয় অঙ্কের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ দৃশ্য নাটকের উপর অতিরিক্ত চাপ দিয়াছে ও একাধিক বিষয়বস্তুকে উদ্দেশ্যহীনভাবে জড় করিয়া অসংলগ্নতার বিভ্রান্তি ঘটাইয়াছে। এই দৃশ্যে ধনঞ্জয় ও প্রজাবর্গের কাহিনী, সুরমার মৃত্যু ও উদয়াদিত্যের আদেশে প্রজাদের মাধবপুরে প্রত্যাবর্তন প্রভৃতি ঘটনাপরিণতির বিভিন্ন পর্যায় একত্র পুঞ্জীভূত হইয়াছে।

তৃতীয় অঙ্কে একটি মাত্র দৃশ্যে মূলের চতুর্থ অঙ্কের ১, ৪, ৬ ও ৭ এই চারিটি দৃশ্যের ও পঞ্চম অঙ্কের ৩য় দৃশ্যের বিষয়বস্তু তালগোল পাকাইয়াছে। নাটকের পরিপাকশক্তি এরূপ অপরিমিত ভোজ্যবস্তুকে নিজ জারক রসে জীর্ণ করিতে অক্ষম হইয়াছে ও অজীর্ণরোগের সমস্ত লক্ষণ প্রকটিত করিয়াছে। এই একমেবাদ্বিতীয়ং দৃশ্যে উদয়াদিত্যের প্রতি রাজদ্রোহের অভিযোগ, উহার কারাবরোধ, ও মুক্তির জন্য বসন্তরায়ের ব্যর্থ আবেদন, বসন্তরায়ের ষড়যন্ত্রে কারাগারে অগ্নিসংযোগ ও উদয়ের পলায়ন, ধনঞ্জয়ের বহিস্তুতি, ধনঞ্জয় ও প্রতাপাদিত্যের সংলাপের ফলে প্রতাপের মনে ক্ষণবৈরাগ্যসঞ্চার ও উদয়াদিত্যের প্রত্যাবর্তন, সিংহাসন প্রত্যাহার ও কাশীযাত্রার অনুমতি-প্রার্থনা প্রভৃতি হরেক রকম বিষয় ও ঘটনাপরিণতির বিভিন্ন পর্ব এক জোয়ালে বাঁধা পড়িয়া শিল্পনিয়ন্ত্রণকে ব্যঙ্গ করিয়াছে। মেলাতে লোকের ভিড়ের মত এখানে অসংবদ্ধ ঘটনারাশি ঠেলাঠেলি করিয়া ভিড় জমাইয়াছে। নাট্যশিল্পের অধিদেবতা এই ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান উন্মত্ত ঘটনাসংঘের কোন সুমিত ছন্দশৃঙ্খলাপ্রবর্তনে হতাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন মনে হয়। পরবর্তী নাটকে দুইটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটিয়াছে। প্রথম হইল বসন্তরায়ের হত্যাবিষয়ের বর্জন। এই নৃশংস ও ন্যক্কারজনক ঘটনাটি বাদ পড়ায় প্রতাপাদিত্যচরিত্রের প্রধান কলঙ্কের মোচন হইয়াছে ও তাহার আচরণের যান্ত্রিক নির্মমতা বহু পরিমাণে ক্ষালিত হইয়াছে। প্রতাপের পারিবারিক জীবনের সর্বাপেক্ষা কালিমালিপ্ত অধ্যায়ের অপসারণে নাটকের ভারসাম্য নূতন কেন্দ্রাশ্রিত হইবার অবসর পাইয়াছে ও ধনঞ্জয় ও তাহার ভাবাদর্শ প্রতিনায়কের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সুতরাং নূতন নাটকে ধনঞ্জয়ের বর্ধিত গুরুত্ব এই দিক দিয়া সমর্থনীয় হইয়াছে। আর হয়ত, যদি বসন্তরায়ের প্রতি উপেক্ষা নিছক বিস্মৃতিপ্রসূত না হয়, তবে ইহা প্রতাপের উপর ধনঞ্জয়ের আদর্শপ্রভাবের কার্যকারিতার একটা পরোক্ষ প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে। রামচন্দ্র-ব্যাপারের আপেক্ষিক গৌণতাও ধনঞ্জয়ের মর্যাদাবৃদ্ধির সহায়ক।

আর একটি অপেক্ষাকৃত সামান্য পরিবর্তনের উল্লেখ করা যায়। মূল নাটকে উদয়কে বসন্তরায়ের আশ্রয় হইতে জোর করিয়া ছিনাইয়া আনা হয় কিন্তু পরবর্তী নাটকে তাহার প্রত্যাবর্তন স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ও হয়ত অপ্রতিরোধনীতিপ্রভাবিত।

নব নাটকের চতুর্থ ও শেষ অঙ্কের প্রথম দৃশ্য মূলের পঞ্চম অঙ্কের ৪র্থ দৃশ্যের শেষাংশ ও ৫ম দৃশ্যের সহিত এক ; কেবল বাইজীদের একটি গান (চাঁদের হাসির) নূতন সংযোজনা। দ্বিতীয় দৃশ্যে মূলের পঞ্চম অঙ্কের ৪র্থ দৃশ্যের প্রথমাংশ ও উপসংহারে বর্ণিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। উপসংহারকে মূল নাটকের অঙ্গীভূত করিতে কোনও বাধা ছিল বলিয়া বোধ হয় না, বোধ হয় করুণতম পরিণতিকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দিবার জন্যেই উহার নাট্যবহির্ভূত সন্নিবেশ হইয়াছে। যাহাই হউক পরিণতির ফলশ্রুতি নাটকের পূর্বাপর সঙ্গতির উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল, উহা পাঠকের মানস-প্রস্তুতির অনিবার্য রসপ্রত্যয়সঞ্জাত। একই উপসংহার নাটকের ঘটনাপরিচালনার আপেক্ষিক গ্রন্থনশিল্পের উৎকর্ষ অনুযায়ী কমবেশী ফলপ্রদ হইবে। সুতরাং 'পরিত্রাণ'-এর উপসংহার 'প্রায়শ্চিত্ত'-এর সহিত অভিন্ন হইলেও উহার রসনিষ্পত্তি গঠনশিথিলতার জন্য অপেক্ষাকৃত কম তৃপ্তিজনক হইয়াছে।

৫

'মুকুট' উপন্যাস হইতে রূপান্তরিত তিন অঙ্কে সম্পূর্ণ একটি ক্ষুদ্র নাটক। ইহা বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের বালকদের অভিনয়ের জন্য কবি-কর্তৃক নাট্যরূপে পরিবর্তিত। ইহার ক্ষুদ্র পরিসরে একটিমাত্র নাট্যঘটনা সামান্য কয়েকটি দৃশ্যের মধ্য দিয়া পরিণতিতে পৌছিয়াছে। ত্রিপুরা রাজপরিবারের তিনজন রাজকুমারের মনস্তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক সংঘাতই ইহার একমাত্র উপজীব্য বিষয়। তিন রাজকুমার ছাড়া সেনাপতি ও কুমারদের অস্ত্রগুরু ইশা খাঁ, মহারাজ অমরমাণিক্য ও কনিষ্ঠ রাজকুমারের মামাতো ভাই ধুরন্ধর—এই কয়জনই ইহার মুখ্যচরিত্র। ইহাদের ছাড়া ভাট, দূত, সৈনিক প্রভৃতি কয়েকটি আনুষঙ্গিক, ব্যক্তিপরিচয়হীন প্রাকৃত চরিত্রও নাটকের পশ্চাৎপটে স্থান পাইয়াছে।

নাট্যসংঘর্ষের মূল সূত্র হইল মধ্যমকুমার ইন্দ্রকুমার ও কনিষ্ঠ কুমার রাজধরের মধ্যে ঈর্ষামূলক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ইশা খাঁ কর্তৃক ইন্দ্রকুমারের সমর্থন ও রাজধরের নিন্দার দ্বারা উভয়ের মনোমালিন্যের উগ্রতাবিধান। ইন্দ্রকুমার রাজপুত্রদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অস্ত্রনিপুণ ও যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ হওয়ার জন্য ও

তাহার উদার শ্রদ্ধাশীল প্রকৃতির গুণে ইশার্থার সর্বাধিক প্রিয়পাত্র। রাজধর তাহার নীচ ও কুটিল স্বভাবের জন্য ও অস্ত্রবিদ্যায় সম্পূর্ণ অজ্ঞতার জন্য তাহার অস্ত্রগুরুর বিরাগভাজন। মধ্যমের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ও কনিষ্ঠের উচ্চকণ্ঠ ধিক্কার উভয়ের মধ্যে ব্যবধানকে আরও বাড়াইয়াছে ও উভয়ের পারস্পরিক মনোভাবকে আরও বিদ্বেষতিক্ত করিয়াছে। নাটকের প্রথম দৃশ্যে রাজধর আত্মাভিমানে অন্ধ হইয়া গুরুর নিকট নিজ পদমর্যাদার উপযোগী সম্মান দাবী করিয়াছে। ইশা খাঁ প্রত্যুত্তরে তাহাকে অবজ্ঞাবাণবিদ্ধ করিয়া তাহার অশ্রদ্ধা ও ক্রোধকে আরও উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছে। ইন্দ্রকুমারের সম্মুখে এই শ্লেষবর্ষণ ও ইন্দ্রকুমারের এই ব্যঙ্গপ্রয়োগে সহযোগিতা রাজধরের পক্ষে আরও মর্মান্তিক হইয়াছে—এই কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা তাহার মনে অসহনীয় জ্বালা ধরাইয়াছে। ইতিমধ্যে মহারাজ ও যুবরাজের প্রবেশে রাজধরের অভিমান মাত্রা ছাড়াইয়াছে ও সে মহারাজের নিকট ইশা খাঁর অশিষ্ট আচরণের জন্য নালিশ জানাইয়াছে। মহারাজের হস্তক্ষেপ ইশা খাঁর স্পষ্ট-বাদিতাকে তীক্ষ্ণতর করিয়া রাজধরের মর্মপীড়াকে আরও বিষদিগ্ধ করিয়াছে। অপমানের এই দারুণ কশাঘাতে যে অস্ত্রপরীক্ষার দাবী জানাইয়াছে ও এই অস্ত্রপরীক্ষার প্রস্তাবে সে ইশা খাঁর সোৎসাহ সাধুবাদ লাভ করিয়াছে। যুবরাজের স্নিগ্ধ ব্যবহারে সে আবার বাঘশিকারের প্রস্তাব তুলিয়াছে ও এখানেও ইন্দ্রকুমার ও ইশা খাঁ তাহার ক্ষত্রোচিত প্রস্তাবে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া তাহার চিরাভ্যস্ত কাপুরুষতার প্রতি খোঁচা দিয়াছে। যুবরাজ কিন্তু এই ব্যঙ্গপ্রবণতাকে মৃদু তিরস্কার করিয়া তাহার অপটু ছোট ভাইএর প্রতি সহৃদয়তা দেখাইয়াছে ও এই স্নেহপক্ষপাতে ইন্দ্রকুমারের অভিমান আরও উদ্দীপ্ত হইয়াছে। এই দৃশ্যটিতে তিন রাজকুমারের প্রকৃতিবৈশিষ্ট্য ও ইন্দ্রকুমারের প্রতি ইশা খাঁর বিশেষ টানটি সুন্দরভাবে ফুটিয়াছে। ইহা নাটকের ভবিষ্যৎ দ্বন্দ্ব-পরিণতির ভূমিকা রচনা করিয়াছে। রাজভৃত্যগণও যে ইন্দ্রকুমারের অনুরাগী ও রাজধরের চক্রান্তকুশলতার ভয়ে সন্ত্রস্ত তাহা তাহাদের সংলাপে সুস্পষ্ট হইয়াছে। ধুরন্ধরের সহিত রাজধরের গোপন পরামর্শ রাজধরের ছলনাকুটিল মনটিকে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে।

অস্ত্রপরীক্ষার দিন রাজধরের অপকৌশল ইন্দ্রকুমারের সরল লক্ষ্য-বেধনৈপুণ্যের উপর জয়ী হইয়া প্রতারককেই জয়মাল্যভূষিত করিল। রাজধরের নামাঙ্কিত তীরই লক্ষ্যভেদ করিয়াছে ইহা দর্শকবৃন্দের চোখে

দেখার বিরুদ্ধে তীরের মালিকের নামের সাক্ষ্যে প্রমাণিত হইল। রাজধরের তীর যে ইন্দ্রকুমারনিক্ষিপ্ত হইয়া লক্ষ্যে পৌছিয়াছে ইহা ইশা খাঁর স্থির বিশ্বাস হইলেও ইহা দলিলী-প্রমাণকে উল্‌টাইতে পারিল না। ইশা খাঁ পরীক্ষাকে আরও পাকা করিবার জন্য আক্রমণোদ্যত আরাকানরাজের বিরুদ্ধে তিন ভাইএর যুদ্ধযাত্রার পরামর্শ দিল। এই মেকী পরীক্ষার একমাত্র ফল হইল যে ভ্রাতৃবিরোধ উদ্দাম হইয়া উঠিল।

দ্বিতীয় অঙ্কে যুদ্ধযাত্রায় রাজধরের ছলনাময় সুবিধাবাদ ও চক্রান্ত-কুশলতার রূপটি স্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট হইয়াছে। সে যুদ্ধে যোগ না দিয়া তাহার পাঁচহাজার সৈন্যকে তফাতে রাখার অনুমতি চাহিল ও ইশা খাঁর সংশয় সত্ত্বেও যুবরাজের উদার ও সরল বিশ্বাসপ্রবণতার সমর্থনে ইহা অনুমোদিত হইল। রাজধরের রণনীতি হইল রাত্রির অন্ধকারে ও অসতর্কতায় নদী পার হইয়া আরাকানরাজের শিবির-আক্রমণ ও তাঁহাকে বন্দী করিয়া বিজয়লক্ষ্মীর প্রসাদগ্রহণ। ক্ষত্রযুগের আদর্শে ইহা যতই নিন্দনীয় হউক না কেন, আধুনিক যুগে এরূপ রণকৌশল বিশেষ প্রশংসিত ও সম্মুখ-সংগ্রাম অপেক্ষা আশুফলপ্রদ বিবেচিত। সুতরাং রাজধর ইহা অবলম্বন করিয়া তাহার ক্ষুরধার বুদ্ধি ও সমরপাণ্ডিত্যেরই পরিচয় দিয়াছে। যুবরাজ কিন্তু অসমসাহসিকতা প্রদর্শন করিয়া নিজেকে বিপন্ন ও সমস্ত সৈন্যসন্নিবেশকে বিপর্যস্ত করিয়া পরাজয়বরণের মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। বীরত্বের হঠকারিতা যে রণবিমুখের চাতুরীপ্রয়োগ অপেক্ষা যুদ্ধজয়ের অধিক বাধা তাহা কৌতূহলজনকভাবে প্রমাণিত হইয়াছে।

রাজধরের কৌশল আশাতীত ফল লাভ করিয়াছে। হঠাৎ আক্রমণে বন্দী আরাকানরাজ বিজয়ী রাজধরের নিকট মুকুট সমর্পণ করিয়া সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর ও আক্রমণ প্রত্যাহার করিয়াছেন। এই মুকুটই নাট্যদ্বন্দ্বের প্রতীকরূপে নাটকে এক অসাধারণ তাৎপর্যে মণ্ডিত হইয়াছে।

অকস্মাৎ এই যুদ্ধবিরতিতে যুবরাজ ও ইন্দ্রকুমার উভয়েই দিশাহারা হইয়াছে। ইশা খাঁই ইহার গুহ্যতত্ত্ব অবগত হইয়া এই আপাত-অসম্ভব পটপরিবর্তনের কারণটি উপলব্ধি করিয়াছেন। রাজধরের সঙ্গে সাক্ষাতে ইশাখাঁ উহাকে সেনাপতির আদেশলঙ্ঘনের অপরাধে অভিযুক্ত করিয়াছেন, ইন্দ্রকুমার উহার কাপুরুষতা ও ছলনাপ্রয়োগের বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার জানাইয়াছে ও যুবরাজ প্রসন্নচিত্তে রাজধরের বুদ্ধিকে প্রশংসা করিয়া উহাকে

জয়গৌরবের সমস্ত কৃতিত্বস্বীকারের চিহ্নস্বরূপ তাহাকেই মুকুট পরাইতে উদ্যত হইয়াছেন। এই পক্ষপাতে ইন্দ্রকুমার অত্যন্ত বিচলিত হইয়া দাদার প্রতি অভিমানে সৈন্যবাহিনী ত্যাগ করিয়াছে। এই চরম উত্তেজনার মুহূর্তে ইশা খাঁ সেনাপতিরূপে সেই যে যুদ্ধক্ষেত্রে একমাত্র দণ্ড-পুরস্কার-বিতরণের অধিকারী তাহা ঘোষণা করিয়াছে ও ভ্রাতৃবিরোধের কণ্টকমুকুট রাজধরের মস্তক হইতে খুলিয়া যুবরাজের শিরে পরাইতে গিয়াছে। যুবরাজের অসম্মতিতে ইশা খাঁ সেই বিবাদের মুকুটটিকে কর্ণফুলির জলে নিক্ষেপ করিয়াছে। এই দৃশ্যে ইশা খাঁ ও ইন্দ্রকুমারের হঠকারিতার ফলে সমস্ত নাটকটি ট্রাজিক পরিণামমুখী হইয়াছে ও রাজধর এই মর্মান্তিক অপমানের জ্বালায় হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হইয়া দেশদ্রোহিতার পথে পা বাড়াইয়াছে। রাজধরের আচরণকে স্থির বুদ্ধি দিয়া বিচার না করার জন্য ও ঈর্ষ্যা ও অভিমানের বাষ্পোচ্ছ্বাসে স্বচ্ছদৃষ্টি হারানোর ফলে করায়ত্ত বিজয়লক্ষ্মী অন্তর্হিত হইয়াছেন ও সংশ্লিষ্ট সমস্ত মুখ্য ব্যক্তির উপর সর্বনাশের কালছায়া ঘনীভূত হইয়াছে।

রাজধরের প্ররোচনায় আরাকানরাজ সন্ধিভঙ্গ করিয়া যুদ্ধঘোষণা করিয়াছেন ও ইন্দ্রকুমারের রণাঙ্গনত্যাগে তাহার নেতৃত্ববঞ্চিত ত্রিপুরাসৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়াছে। ইশা খাঁ পূর্বেই প্রাণ দিয়াছে ও তৃতীয় অঙ্কে নিষ্ফল বীরত্ব প্রদর্শনের পর যুবরাজও সাংঘাতিক আহত হইয়া মৃত্যুপ্রতীক্ষামুহূর্ত গণনা করিতেছেন। দ্বিতীয় দৃশ্যে অনুতপ্ত ইন্দ্রকুমার ব্যাকুলভাবে দাদাকে খুঁজিয়া ফিরিয়াছে ও শেষ দৃশ্যে কর্ণফুলিতীরে অন্তিম শয্যায় শায়িত মৃত্যুপথযাত্রী যুবরাজের নিকট ইন্দ্রকুমার ও রাজধর ভ্রাতৃপ্রেমের শেষ অঞ্জলি নিবেদন করিতে উপস্থিত হইয়াছে। রাজধর তাহার মার্জনাভিক্ষার নিদর্শনস্বরূপ নদীজলে নিক্ষিপ্ত মুকুটটিকে পুনরুদ্ধার করিয়া জ্যেষ্ঠের এই মুকুটে ন্যায়সঙ্গত অধিকার স্বীকার করিয়াছে। যুবরাজ ইন্দ্রকুমারের তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও রাজধরকে আসিবার আমন্ত্রণ জানাইয়া ও অভিমানক্ষতের সান্ত্বনাপ্রলেপস্বরূপ মুকুটটি ইন্দ্রকুমারের মাথায় পরাইবার নির্দেশ দিয়া নিজ অপক্ষপাত ন্যায়-বিচারের শেষ পার্থিব অভিজ্ঞানটি রাখিয়াছেন। কিন্তু পরাজয়ক্ষুব্ধ ইন্দ্রকুমার এই অগ্নিবলয়বেষ্টিত মুকুট প্রত্যাখ্যান করিয়া দিব্যলোকের জ্যোতির্মণ্ডিত জ্যেষ্ঠের শিরেই উহার হিরণ্ময় প্রভাকে বিলীন করিয়া দেওয়া যে উহার যোগ্যতম আশ্রয়স্থল তাহাই ঘোষণা করিয়াছে। এই অনুতাপ ও পুনর্মিলনের অশ্রুধৌত স্নিগ্ধতায় নাটকের ভ্রাতৃবিরোধের জ্বরতপ্ত বিকার শান্ত হইল।

এই নাটকটি আয়তনে অতিক্ষুদ্র, ইহার চরিত্র স্বল্পসংখ্যক ও অভিজাত-সমাজের সঙ্কীর্ণ পরিবেশ ও সীমিত জীবনচর্যার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ এবং ইহার আখ্যানভাগ ও নাট্যসংঘাতের পরিধিও এককেন্দ্রিক, বৈচিত্র্যহীন। কিন্তু এই সমস্ত উপাদানরিক্ততা ও পটভূমিকার সঙ্কোচন সত্ত্বেও ইহার মধ্যে প্রকৃত নাট্যোৎকর্ষের স্ফূরণ সম্ভব হইয়াছে। নাটকে শুধু রণক্ষেত্রের বহিরঙ্গ উত্তেজনা নয়, অন্তরপ্রবৃত্তির আগ্নেয় উদ্ভাসনও আশ্চর্যভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। সমস্ত চরিত্র সংক্ষিপ্ত সংলাপ ও অনিবার্য আত্ম-উন্মোচনের মাধ্যমে নিজ নিজ ব্যক্তিসত্তাকে সুস্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত করিয়াছে। সেনাপতি ইশা খাঁ ও তিন রাজকুমার দুইতিনটি দৃশ্যের পরিসরেই আপন অন্তঃস্বরূপের উজ্জ্বল পরিচয় দিয়াছে। ইশা খাঁর আত্মসম্মানবোধ ও নিঃসঙ্কোচ স্পষ্টভাষণের পিছনে তাহার অকুণ্ঠ ন্যায়নিষ্ঠতা ও একদিকে যোগ্যতম শিষ্যের প্রতি স্নেহোচ্ছ্বাস অপরদিকে কপটাচারের প্রতি তীব্র অবজ্ঞা ক্ষুরধার উক্তি ও তেজোদৃপ্ত আচরণের মধ্যে ঝলসিয়া উঠিয়াছে। জ্যেষ্ঠ যুবরাজ একদিকে মধ্যম ভ্রাতার গুণমুগ্ধ, অন্য দিকে বহু-নিন্দিত কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি স্নেহপ্রশ্রয়-প্রসারণে অকৃপণ। সে রাজপরিবারের দুই বিস্ফোরণপ্রবণ আগ্নেয়গিরির মধ্যবর্তী শান্তিদূতের ভূমিকা পূর্ণ করিয়াছে ও উভয়ের বিদ্বেষবহ্নি প্রশমিত করিয়া পারিবারিক সম্প্রীতি-রক্ষায় নিজ ন্যায্য অধিকারের প্রতি বারবার উপেক্ষা দেখাইয়াছে। ইন্দ্রকুমার ক্ষত্রিয় বীরের আদর্শস্থানীয় হইলেও অতিমাত্রায় অভিমানপ্রবণ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার কূটনীতির প্রতি উৎকটভাবে অসহিষ্ণু। তাহার ঔদ্ধত্য সময় সময় অশোভনভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়া ধূমায়মান বিরোধকে ধ্বংসকারী বহ্নিশিখায় প্রজ্জলিত করিয়াছে। রণক্ষেত্রে রাজধরের কূটনীতির প্রতি অতি রূঢ় অবজ্ঞা ও কটুভাষণ তাহার অদূরদর্শিতা ও অব্যবস্থিতচিত্ততারই শোচনীয় নিদর্শন। হয়ত রাজধরের কোন অসৎ উদ্দেশ্য ছিল না, কিন্তু ইন্দ্রকুমারের অহেতুক নিন্দাবাদ ও ঘৃণাপ্রকাশই তাহাকে দেশদ্রোহিতার পিচ্ছিলপথে ঠেলিয়া দিয়াছে। নাটকের সর্বাপেক্ষা আদর্শ চরিত্রই সর্বনাশের মশাল জ্বালাইয়া নিয়তির ক্রুর পরিহাসের বাহনরূপে প্রতিভাত হইয়াছেন। নাট্যঘটনা নিজ সঙ্কীর্ণ সঞ্চরণক্ষেত্রের কক্ষপরিক্রমা হইতে যে গতিবেগ সঞ্চয় করিয়াছে তাহারই অমোঘ শক্তি উহাকে ঈপ্সিত পরিণতির শিখরে অনায়াস-উত্তীর্ণ করিয়াছে। এই উত্তরণেই উহার নাট্য-কৃতিত্বের পরিচয়।

চতুর্দশ অধ্যায়

নষ্টনীড় (বৈশাখ-অগ্রহায়ণ ১৩০৮, ইং ১৯০১)

১

'রবীন্দ্র-সৃষ্টি-সমীক্ষা'র প্রথম খণ্ডে রবীন্দ্রনাথের যে তিনটি উপন্যাস আলোচিত হইয়াছে সেগুলিতে অন্যান্য অপরিণতির লক্ষণের সহিত তরুণ লেখক যে এপর্যন্ত উপন্যাসের রীতি ও ঔপন্যাসিক মেজাজ ও জীবনসমীক্ষার বিশেষত্বটি আয়ত্ত করেন নাই তাহার নিদর্শনও সুপরিস্ফুট। ঐ উপন্যাস-গুলি পড়িলেই মনে হয় যে ইহারা হয় কবিকল্পনার বাষ্পমূর্তির প্রক্ষেপ, না হয় পূর্বনির্ধারিত, অর্ধবাস্তব ভাবাদর্শের প্রতিচ্ছবিকে জীবনের সত্য পরিচয়রূপে চালাইবার প্রয়াস। ইহাদের মধ্যে প্রসন্ন জীবনস্বীকৃতি ও উহার গভীরে অনুপ্রবেশের নিদর্শন খুবই ক্ষীণ। লেখক এখনও কবিদৃষ্টি, তত্ত্বদৃষ্টি ও ঔপন্যাসিক দৃষ্টির মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য অনুভব করেন নাই। জীবনের যে সমস্ত উপাদান কবি ও তাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে প্রধানরূপে প্রতিফলিত হয়, ইহারা যে উদ্দেশ্যে ও যে প্রকার ফলশ্রুতি-প্রত্যাশায় জীবনকে পর্যবেক্ষণ করেন, ঔপন্যাসিকের পর্যবেক্ষণ যে তাহা হইতে একটি স্বতন্ত্র ভূমিকা, এ বোধে এখনও তিনি প্রতিষ্ঠিত হন নাই। উপন্যাসে জীবনের যে পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয়, তাঁহার মধ্যে কাব্যের ও তত্ত্বের কিছু প্রভাব থাকিতে পারে, কিন্তু এই পরিচয়দানের পদ্ধতি ও ইহার স্বরূপ যে মূলতঃ স্বতন্ত্র এই প্রত্যয়ই ঔপন্যাসিকের জাতিনির্ণয়ের একটি প্রধান মানদণ্ড। মানবজীবন অভিন্ন, উহার সাধারণ পরিবেশও এক, উহার প্রবৃত্তিগুলিও সমজাতীয়; কিন্তু উপকরণের সাম্য সত্ত্বেও প্রত্যেক শিল্পে উহার প্রকাশ সূক্ষ্মভাবে ভিন্নধর্মী। কাব্যের প্রেমিক আর উপন্যাসের প্রেমিক বিভিন্ন রীতিতে তাহাদের অন্তর্গূঢ় ভাবপ্রেরণার পরিচয় দেয় ও ভিন্ন পথ দিয়া পাঠকের প্রত্যয়লোকে অনুপ্রবিষ্ট হয়। দার্শনিকের প্রেমতত্ত্ব, কবির প্রেমের আবেগমূর্ছনা আর ঔপন্যাসিকের অন্তর্দ্বন্দ্বক্লিষ্ট, প্রাত্যহিক জীবনের তথ্যনিষ্ঠার মধ্যে পরিব্যাপ্ত, আচরণ ও সংলাপের সাধারণ ছন্দে মৃদুস্পন্দিত প্রেমচেতনা স্বরূপতঃ এক হইলেও নব নব রূপে আমাদের অন্তরের নিকট আবেদনবহ।

প্রত্যেকটি রূপপ্রকরণের অনন্যতা-স্বীকৃতিই সেই শিল্পশাখায় প্রাবীণ্য অর্জনের প্রথম সর্ত।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম তিনখানি উপন্যাসে উপন্যাসশিল্পের এই গোত্রনির্ণয় অনিশ্চিতই রহিয়াছে। সৃষ্টিসূচনায় যেমন জল, স্থল ও দিগন্তগ্রাসী বাষ্পাবরণ অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশিয়া থাকে, কোন উপাদানেরই অস্তিত্ব স্বতন্ত্রভাবে স্ফুরিত হয় না, রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের উপন্যাসত্রয়ীতেও তেমনি কবিকল্পনা, বস্তুঘনতা ও তত্ত্বকুহেলিকা এক উদ্ভট সংমিশ্রণে অবয়ব-সুষমাহীন পিণ্ডদেহের ন্যায় প্রকটিত হইয়াছে। 'করুণা' উপন্যাসটি এক ষোল-সতের বৎসরের অনতিক্রান্তকৈশোর লেখকের রচনা। ইহাতে কিশোরস্বপ্নাবিষ্ট লেখকের নিকট জীবন এক অসঙ্গতিময়, খেয়ালী কল্পনার বাষ্পোচ্ছ্বাসরূপে প্রতিভাত। এখানে বাস্তবতার বিচ্ছিন্ন কণাগুলি কোন স্থির ভাববন্ধনে সংহত না হইয়া আকস্মিকতার সাগরতরঙ্গে ভাসমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের মত দেখায়। শাখাকাহিনী ও পার্শ্বচরিত্রের মধ্যে যেখানে লেখক মনস্তত্ত্ব ও বাস্তব জীবনচিত্রণের প্রতি কিছুটা মনোযোগ দেখাইয়াছেন, সেখানেও তিনি ইহাদিগকে একটি সুসঙ্গত আবহের মধ্যে গাঁথিয়া তুলিতে পারেন নাই। হাস্যরসপ্রধান ও বিষাদচ্ছায়াচ্ছন্ন পরিস্থিতি-গুলিও আতিশয্যবিড়ম্বিত হইয়া জীবনবৈচিত্র্যের সমীকরণপ্রক্রিয়ার অঙ্গীভূত হয় নাই। মানবপ্রকৃতি ও মানবজীবন এই তরুণ সমীক্ষকের নিকট কোন কার্যকারণসূত্রগ্রথিত, নিগূঢ়নিয়মাধীন রূপসৃষ্টিরূপে প্রতিভাত না হইয়া স্বপ্নরাজ্যের অসংলগ্নতায় এক অসংবদ্ধ প্রলাপের মত নানাজাতীয় উপাদানকণিকার শিথিল সংমিশ্রণরূপে অনুভূত হইয়াছে।

'বউঠাকুরানীর হাট'-লেখার সময় রবীন্দ্রনাথের বয়স কুড়ি বৎসর। ইহা যেন 'সন্ধ্যাসংগীত' ও 'প্রভাতসংগীত-'এর কবি-কল্পনার বাস্তব জীবনের ফ্রেমে আঁটা গদ্য-সংস্করণ। যাহা মূলতঃ কাব্য ছিল তাহাকে এখানে উপন্যাসোচিত প্রাত্যহিক জীবনের ঘটনাবদ্ধতার ও চরিত্রসঙ্গতির মাধ্যমে রূপান্তরের প্রয়াস। মনে হয় যেন কাব্যপ্রেরণাসম্ভূত জীবনকল্পনা উপন্যাসের অনভ্যস্ত, বস্তুঘন পরিবেশে কায়াগ্রহণ করিয়া স্বচ্ছন্দগতি হারাইয়াছে। কাব্যের অপরিণত কুঁড়িগুলি, কল্পনাজগৎসঞ্চারী মানব-সন্তানগুলি হঠাৎ যেন উপন্যাসের নিয়মশৃঙ্খলিত, দায়িত্বশীল পরিবেশে স্থানান্তরিত হইয়া অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিয়াছে ও স্বাধীন বিকাশ হইতে

বঞ্চিত হইয়াছে। উপন্যাসের সমস্ত চরিত্রই অসহায়, বিষণ্ণ ভাবসর্বস্বতার অতিরঞ্জিত, মাত্রাহীন অভিব্যক্তি। বসন্ত রায় অবশ্য 'প্রভাতসংগীত'-এর আনন্দোচ্ছ্বাসের মূর্ত প্রকাশ, কিন্তু কাব্যের ন্যায় তাঁহারও আনন্দময় সত্তা সম্পূর্ণরূপে নিষ্ক্রিয় ও প্রতিরোধশক্তিহীন। আনন্দ ও বিষাদের সহাবস্থানও উভয়েরই তুল্যরূপ করুণ ব্যর্থতা সমস্ত উপন্যাসটিই যে কাব্যপ্রেরণার উৎস-সম্ভূত তাহাই সপ্রমাণ করে। বিশেষতঃ উপন্যাসের নামকরণে ও উহার অন্তিম ফলশ্রুতিনিরূপণে কাব্যপ্রভাবের অনুমানটি আরও নিঃসংশয়িতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে ঔপন্যাসিক দৃষ্টিভঙ্গী যে সম্পূর্ণভাবে কাব্যপ্রভাবের উপজাত ফলমাত্র ও স্বতন্ত্রঅস্তিত্বহীন তাহা সহজেই প্রতীয়মান হইয়াছে। কবিসত্তার অভিভব কাটাইয়া ঔপন্যাসিক সত্তার স্বাধীন উন্মেষ এখনও দানা বাঁধিয়া উঠে নাই।

'রাজর্ষি' উপন্যাসটি রবীন্দ্রনাথের পঁচিশ বৎসর বয়সের রচনা (১৮৮৬)। ইহার মধ্যে উপন্যাসের বহিঃরূপ ও অন্তঃপ্রকৃতি সম্বন্ধে লেখকের অভিজ্ঞতার পরিণতি পরিস্ফুট। পূর্ব দুইখানি উপন্যাসের জলস্থলবাষ্পবিমিশ্র অনির্দিষ্টতার স্তর অতিক্রান্ত হইয়া বাস্তবতার সুস্পষ্ট স্থলরেখা দেখা দিয়াছে; সৃষ্টিপূর্ব অরাজকতা ও উপাদানবিশৃঙ্খলার পরিবর্তে কিছুটা অবয়বসঙ্গতি ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সুনির্দিষ্ট লক্ষণ সূচিত হইয়াছে। কাব্যকুয়াশাঘেরা জলাভূমি হইতে বাস্তব জীবনের দৃঢ় মৃত্তিকাস্তর মাথা তুলিয়াছে ও মানবচরিত্রবিকাশের ভিত্তি রচনা করিয়াছে। কবিকল্পনার উত্তপ্ত নিঃশ্বাস জমিয়া ও বাষ্পীয় আবিলতামুক্ত হইয়া স্বচ্ছতর বায়ুমণ্ডলকে মুক্তি দিয়াছে। মানুষগুলি আর যান্ত্রিক ও নৈর্ব্যক্তিক নাই, তাহারা রক্তমাংসসম্পন্ন, পরিচিত জীবনাদর্শের দ্বন্দ্বসংঘাতচঞ্চল সজীবতার বাহন হইয়া উঠিয়াছে। প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে তাহার পরিজনবর্গের ও প্রজাসাধারণের বিরোধ আমাদের নিকট অহেতুক ও অবাস্তব মনে হয়—এ যেন পাথরের সঙ্গে তুলার অসম সংঘর্ষ। রঘুপতি-গোবিন্দমাণিক্যের বিরোধ, বা জয়সিংহের অন্তর্দ্বন্দ্বের মর্মান্তিকতা মানব-জীবনের একটি সত্যিকার সমস্যা; ইহারা আদর্শপ্রভাবিত হইলেও বস্তুমূল-সম্ভূত ও মানুষের প্রকৃতিগত প্রবৃত্তিরসে পুষ্ট। ইহাদের প্রতি আমাদের স্বতঃ-সহানুভূতি প্রসারিত। এই বহির্দ্বন্দ্ব ও অন্তর্দ্বন্দ্বের উপস্থাপনারীতি কাব্যসৌকুমার্য-মণ্ডিত হইলেও বিশিষ্টভাবে উপন্যাসধর্মী। কবিকল্পনার নদীপ্রবাহ

হইতে সদ্যোত্থিত এই সিক্ত সিকতাভূমি ইতিহাসের ইটপাথর-সংযোগে উপন্যাসরথের স্বচ্ছন্দ বিচরণভূমি রচনা করিয়াছে। রঘুপতির সঙ্গে জয়সিংহের সম্পর্ক, গোবিন্দমাণিক্য ও নক্ষত্ররায়ের পারস্পরিক আকর্ষণ-বিরোধ আমাদের পরিবারজীবনের অভ্যস্ত কক্ষপথেই আবর্তিত। স্থানে স্থানে যে তত্ত্বাদর্শের আধিক্য দেখা যায়—যথা বিশ্ববিধানে হিংসানীতির সর্বাত্মকতা সম্বন্ধে জয়সিংহের নিকট রঘুপতির দার্শনিক ব্যাখ্যা, অথবা ভ্রাতৃপ্রেমের পবিত্রতা বিষয়ে গোবিন্দমাণিক্যের মর্মস্পর্শী আবেদন বা প্রকৃতিসৌন্দর্যের মুগ্ধ উপলব্ধির ক্ষণ-উচ্ছ্বাস—তাহা বাস্তব জীবনের সীমা-বন্ধনকে ছাড়াইয়া যায় নাই। ইহারা উপন্যাসপ্রকৃতির সম্পূর্ণ অঙ্গীভূত না হইলেও উহাকে উৎকটভাবে উল্লঙ্ঘন করে নাই। বিন্যাসকৌশল ও ফলশ্রুতিনির্ধারণ প্রভৃতি গঠনশিল্পবিষয়ক ব্যাপারে নবীন ঔপন্যাসিক এখনও প্রায়োগিক সিদ্ধির অধিকারী হন নাই। কাঁচা শিল্পীর উপাদান-সমাবেশে অব্যবস্থিতচিত্ততা ও উহাকে ঈপ্সিত পরিণামের দিকে দক্ষ পরিচালনে অক্ষমতা নানা দিকে প্রকট হইয়াছে। তিনি ইতিহাসকে উপন্যাসে প্রবেশ করাইয়াছেন, কিন্তু উহাকে ঔপন্যাসিক সীমার মধ্যে সংযত করিতে পারেন নাই। ইহা অতিথির মত আহূত হইয়া গৃহস্বামীর অধিকারে অনুচিত হস্তক্ষেপ করিয়াছে, সহায়কের গৌণ অংশে সন্তুষ্ট না হইয়া প্রধান বিষয়ের সহিত সমমূল্য দাবী করিয়া উপন্যাসের সুষ্ঠু বিবর্তনের পথে বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গোবিন্দমাণিক্যের স্বেচ্ছাবৃত পল্লীপ্রবাস ও রঘুপতির স্থলাভিষিক্ত পুরোহিত বিল্বনঠাকুরের কার্যকলাপ উপন্যাসকে বাস্তব জীবন হইতে এক তত্ত্বাশ্রিত আদর্শস্বর্গে উধাও করিয়াছে। রাজা অধ্যাত্ম সাধনার দুরারোহ সোপান-পরম্পরা বাহিয়া রাজর্ষির ধ্যানাসনে আরূঢ় হইয়াছেন। কিন্তু এই রূপান্তর-প্রক্রিয়ায় উপন্যাস তাঁহার সহযাত্রী হইতে পারে নাই। উপন্যাসের সমস্ত বাস্তব গৌরবকে ধূলিসাৎ করিয়াই এই স্বর্গারোহণ-পর্ব সম্পন্ন হইয়াছে। উপন্যাসের অন্তিম ফলশ্রুতি উহার পূর্বতন ঘটনাসংঘাতের পরিণতিসূত্রে নহে, কিন্তু কতকটা দৈব আশীর্বাদেই যেন এই রস উদ্বর্তিত হইয়াছে। জীবনরস যেন হঠাৎ উচ্ছ্বসিত ফোয়ারায় নিজ পার্থিব অস্তিত্বকে আকাশমুখী করিয়াছে। মাটির ভাগীরথী যেন স্বর্গের অলকানন্দারূপে যাত্রার অবসান ঘটাইয়াছে।

২

দীর্ঘ পনের বৎসরের ব্যবধানে রবীন্দ্রনাথ আবার উপন্যাসরচনার ছিন্নসূত্র কুড়াইয়া লইয়া ঔপন্যাসিকরূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন। এই দ্বিতীয় পর্যায়ের উপন্যাসে প্রৌঢ় লেখক প্রথম বয়সের শিক্ষানবিশি অনিশ্চয়তা অতিক্রম করিয়া উপন্যাসের অন্তঃপ্রকৃতি ও শিল্পরূপের উপর সম্পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রমাণ দিলেন। যৌবনসীমান্ত পার হইয়া যখন তিনি প্রৌঢ় বয়সের পরিণত জীবনপ্রজ্ঞায় অধিষ্ঠিত হইলেন, সেই সময়ই ঔপন্যাসিক সমীক্ষা দ্বারা জীবনকাহিনীকে কিরূপে স্বতন্ত্র সাহিত্যমর্যাদা দেওয়া যায় তাহারও মর্মরহস্যটি তাঁহার আয়ত্ত হইল। নিষিদ্ধ প্রেমের কুটিল, সংঘাতসঙ্কুল সুড়ঙ্গপথ-অবলম্বনেই তাঁহার এই নববিজিত উপন্যাসক্ষেত্রে প্রবেশ ঘটিল। সুদীর্ঘ বিরতির পর যখন তিনি ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া মানবজীবনকে আবার পর্যবেক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন জীবনের এই নেপথ্যান্তরালশায়ী, প্রচ্ছন্ন-বেদনাবিদ্ধ, দ্বন্দ্বজটিল রূপটিই তাঁহার অনুভূতিতে প্রধানরূপে দেখা দিল। তাঁহার পূর্বতন স্তরের উপন্যাস দুইখানিতে—'বউঠাকুরাণীর হাট' ও 'রাজর্ষি'-তে প্রেমের উপস্থিতি সম্পূর্ণ গৌণ। প্রথমটিতে দাম্পত্য প্রেমের নিরুপায় বেদনা-বিহ্বলতা ও দাম্পত্যমিলনের দৈবাহত ভাগ্যবিপর্যয়ই লেখকের সমস্ত জীবনাকুতিকে অধিকার করিয়াছে। দ্বিতীয়টিতে, আদর্শসংঘাতের মর্মান্তিক তীব্রতা, ভ্রাতৃবিরোধের অভিমানক্ষুব্ধ, বিশ্ববিধানের বিপর্যয়কারী প্রচণ্ড আঘাত ও বাৎসল্য ও ভক্তিরসের ঐকান্তিক নিষ্ঠার মধ্যে সংশয়সঞ্চারের অন্তর্দাহ, হাসি ও ধ্রুবের প্রতি রাজার আকস্মিক সন্তানস্নেহের সর্বগ্রাসী অনুভব—এই সমস্ত ভাবের প্রখর দীপ্তির নিকট প্রেমরহস্যের অস্তিত্বই যেন ছায়াবৎ মুছিয়া গিয়াছে। প্রেম যেন মানবজীবনে দূরস্থিত গ্রহ হইতে প্রক্ষিপ্ত ক্ষীণ আলোকস্পন্দনের ন্যায় উহাকে অত্যন্ত লঘুভাবে স্পর্শ করে, উহার আর বিশেষ গুরুত্ব নাই। বাল্যরচনা 'করুণা'-য় বরং প্রেমের অব্যবস্থিতচিত্ততা ও জীবনে বিপর্যয় ঘটাইবার শক্তির কিছু স্বীকৃতি আছে। কিন্তু লেখকের অসংবদ্ধ, ছেলেমানুষী জীবনকল্পনার জন্য এই প্রেম এক অকারণ, আকস্মিক চিত্তচাঞ্চল্যের হেতুর অতিরিক্ত কোন তাৎপর্য পায় নাই। পনের বৎসরের জীবনপর্যবেক্ষণের ফলস্বরূপ এই অন্তর্গূঢ়, সমাজনিন্দিত প্রেমচেতনা এক সর্বনাশী, বিপর্যয়কারী, অজ্ঞাত হৃদয়রহস্যের পরিচয়বাহী

দুর্বার শক্তিরূপে রবীন্দ্র-কথাসাহিত্যে জীবনের কেন্দ্রীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইল।

প্রেমের নিগূঢ় সর্বাতিশায়ী প্রভাবের প্রথম প্রশস্তিরচনা সুরু হইয়াছে 'নষ্টনীড়'এ ও উহা পূর্ণরূপে সম্প্রসারিত হইয়াছে 'চোখের বালি'-তে। 'নষ্টনীড়'-এর প্রকাশকাল বৈশাখ-অগ্রহায়ণ ১৩০৮, ১৯০১। সুতরাং প্রকাশকালের দিক দিয়া উহা 'চোখের বালি-'র (১৩০৯, ১৯০৩) প্রায় দুই বৎসরের অগ্রগামী। 'নষ্টনীড়' প্রথমতঃ উপন্যাসরূপে উল্লিখিত হইয়াছিল, পরবর্তী বিচারে ইহা 'গল্পগুচ্ছ'-এর অন্তর্ভুক্ত হইয়া ছোট গল্পরূপে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। মনে হয় যে রচনাটির পরবর্তী শ্রেণীনির্ণয় উহার প্রকৃতি অপেক্ষা আকৃতির মানদণ্ডেই স্থিরীকৃত হইয়াছে। লেখকের মনে উহার স্বরূপ সম্বন্ধে যে সংশয় ছিল তাহা এই জাতি-পরিবর্তনে প্রতিফলিত। ছোটগল্পের সহিত উহার অবয়ব-সাদৃশ্য থাকিতে পারে, কিন্তু অন্তঃপ্রকৃতি ও ফলশ্রুতি-বিচারে উহার উপন্যাসধর্মিত্ব নিঃসন্দেহ। এমন কি উহার বিংশ পরিচ্ছেদব্যাপী আয়তনের দিক দিয়াও 'নষ্টনীড়' ছোটগল্পের সীমাপরিমিতি লঙ্ঘন করিয়াছে। যে কাহিনীর সব কয়েকটি জটিল সূত্রকে গ্রন্থিবদ্ধ ঐক্যে সংহত করিতে, উহার সমস্ত ভাবসংঘাতকে পরিণতির স্থিরতায় সমাধান করিতে বিশটি বিকাশস্তর উত্তীর্ণ হইতে হয়, তাহার কম্পনের বিস্তৃতি ও ব্যাপকতা ছোটগল্পের এককেন্দ্রিক বৃত্তের মধ্যে সংকুলান হইবার নহে। সুতরাং শুধু পরিমাণের দিক দিয়াও উহাকে বিশুদ্ধ ছোটগল্পের পর্যায়ভুক্ত করা অসমীচীন।

কিন্তু অন্তঃপ্রকৃতির বিচারেও 'নষ্টনীড়' ছোটগল্প অপেক্ষা উপন্যাসের সহিতই যে নিকটতর তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। ছোটগল্পের সঙ্কেতধর্মিতা, উহার তথ্যভারহীন ত্বরিত গতি, উহার দ্রুত উপস্থাপনা ও আপাত-আকস্মিকতার অন্তরালে অনিবার্য সমাপ্তিদ্যোতনা—সবশুদ্ধ মিলিয়া, সমীক্ষা-শেষে উহার আবেদনে একটা অনবদ্য ভাবদ্যোতনার তৃপ্তি-অনুভব—এই সমস্ত বিশিষ্ট লক্ষণ ইহাতে আংশিকভাবে থাকিলেও পূর্ণ রাসায়নিক সংশ্লেষে অনুপস্থিত। ছোটগল্পের সঙ্গে উহার একমাত্র সাদৃশ্য পটভূমিকার সংকীর্ণতা ও চরিত্রসংখ্যার বিরলতা। লেখক উহার মধ্যে উপকরণের ও দৃশ্যপটের একটা কঠোরভাবে সংযত মিতব্যয়িতা অবলম্বন করিয়াছেন। কোন আনুষঙ্গিক উপসর্গের প্রবেশের প্রশ্রয় দেন নাই। ভূপতির অন্তঃপুর ও বাহির

হইতে সহজ উপলক্ষ্যে আগন্তুক দুই একটি আকর্ষণ বা প্রভাবই উপন্যাসটির ঘটনাবৃত্ত রচনা করিয়াছে। চরিত্রের মধ্যে চারু, অমল, ভূপতি, মন্দা ও গৌণভাবে ভূপতির শ্যালক উমাপতি এই পাঁচটি মানুষই সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয়ভাবে অথবা অতি সহজ ও সাধারণ হৃদয়বৃত্তির সূত্র-আবর্তনে এক অমোঘ নিয়তির দুশ্ছেদ্য নাগপাশ বয়ন করিয়াছে। তুচ্ছ খেয়ালের মাকড়সার জাল সুদীর্ঘ অভ্যাস বা অবহেলার সুযোগে লৌহশৃঙ্খলের ন্যায় বজ্রকঠিন বন্ধনে একটি হৃদয়কে চিরবন্দী করিয়াছে, আর একজনকে চিরবঞ্চনার অসহ্য শূন্যতাবোধের অঙ্কুশাঘাতে কক্ষচ্যুত গ্রহের ন্যায় ছুটাইয়াছে। একটি শান্ত, নিস্তরঙ্গ গার্হস্থ্যজীবনে অকস্মাৎ নরক-বিভীষিকার বহ্নিবলয় আলোড়িত হইয়াছে। শৈবলিনীর নরকদর্শনের মত এখানে কোন উৎকট প্রায়শ্চিত্তবিধি, কোন অলৌকিক বিভূতির নেপথ্যব্যঞ্জনা নাই, কোন যুগান্তরের ঝটিকাতাড়িত ইতিহাসস্রোতের তুমুল সংঘাত গার্হস্থ্যজীবনের স্তিমিত রক্তধারায় দুর্দম বেগসঞ্চার করে নাই। তথাপি এখানেও, শৈবলিনীর ন্যায় চারুলতারও, নরকভোগ ঘটিয়াছে। 'চন্দ্রশেখর'-এ দম্পতির মধ্যে একজনের চিত্তপ্রসাদ অক্ষুণ্ণই রহিয়াছে—সে কেবল পত্নীর যন্ত্রণায় সহানুভূতিসঞ্জাত মনোবেদনা ভোগ করিয়াছে। এখানে কিন্তু বেচারা ভূপতিও নরকের নিঃসঙ্গতার অভিশাপে তিলে তিলে দগ্ধ হইয়াছে। আর এই দ্বিগুণিত নরকযন্ত্রণা অনুভবগম্য করা হইয়াছে কোন পুরাণস্মৃতিবাসিত কাব্যাতিরঞ্জনের সহায়তায় নয়, অনির্বাণ অন্তর্বেদনার নিঃশব্দ দহনে, জ্বালাময় বাক্যে নয়, প্রাণপণ চেষ্টায় অবদমিত ও আচরণের রন্ধ্রপথে ক্বচিৎ উদ্‌গীরিত উত্তপ্ত নিশ্বাসের মাধ্যমে। শৈবলিনীর অনুতাপ তাহার চিত্তবিশুদ্ধির প্রমাণ ও পূর্বসূচনারূপে দুঃখ-নিরসনের সহায়ক; চারুলতার মর্মপীড়া কোন অনুশোচনাস্নিগ্ধ নয়—তাহার অন্তরের হাহাকার কোন সান্ত্বনার প্রবোধপ্রলেপে মুহূর্তের জন্যও শান্ত হয় নাই। যে পাপকে পাপ বলিয়া চিনিয়াছে তাহার দহনমুক্তি খুব দূরে নাই। দুর্ভাগিনী চারুলতা আত্মসমীক্ষার শুশ্রূষা হইতেও বঞ্চিতা। সে কোনদিনই প্রবৃত্তির স্বপ্নরমণীয়তা হইতে জাগিয়া সুস্থ জীবনবোধে প্রতিষ্ঠিত ও নব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইবে না।

'নষ্টনীড়-এর পরিবেশরচনাবিষয়ে লেখকের সযত্ন প্রস্তুতি উহার উপন্যাসের সহিত আত্মিক সংযোগের প্রথম নিদর্শন। ছোটগল্পের ভূমিকাংশ নেপথ্যের আড়ালেই থাকে—ঘটনার অগ্রগতির অমোঘ টানেই উহার

পূর্ববৃত্তান্তের জ্ঞাতব্য অংশ স্বতঃই উদ্‌ঘাটিত বা উন্মোচিত হয়। কিন্তু বর্তমান কাহিনীটিতে ভূপতির সঙ্গে চারুলতার সম্পর্ক-বৈশিষ্ট্য ও ভূপতির পরিবারজীবনের রূপরেখাটি কিঞ্চিৎ সবিস্তারেই পরিস্ফুট করা হইয়াছে। ছোটগল্পের ফুলের গাছ অল্প আয়াসেই, নিজ স্বভাবসিদ্ধ আত্মপ্রকাশের উর্ধ্ব-প্রেরণাতেই, মাটির তলা হইতে অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। স্বল্পতম ঋতুদাক্ষিণ্যে ও মালির লালন-স্নেহের মৃদু শুশ্রূষাতেই উহা পুষ্পিত হইয়া অন্তরসৌরভ বিকীর্ণ করে। উহার জন্য গভীর গর্ত-খনন বা পরিচর্যার আয়োজনবাহুল্যের দরকার হয় না। কিন্তু উপন্যাসের পরিণাম ও সূচনার মধ্যে দীর্ঘকাল ব্যবধান ও দীর্ঘতর মানস পরিক্রমা দূরত্ব সাধন করে। বনস্পতিতে ফল আস্বাদন করিতে হইলে দীর্ঘ প্রতীক্ষা ও তদুপযোগী প্রস্তুতির প্রয়োজন। উপন্যাসের সমস্যা নানা শাখা-প্রশাখাপ্রসারিত, উহার জটিলতা বিবিধতত্ত্ব-নির্মিত, উহার পরিণতি বিচিত্র আকর্ষণ-বিকর্ষণপ্রক্রিয়া ও নানাপথে সঞ্চরমান রসধারার সংশ্লেষের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং উহার ক্ষেত্রপ্রস্তুতি ও কর্ষণপদ্ধতি ছোটগল্প হইতে বিশেষভাবে স্বতন্ত্র। উহার শিকড়জালের বেধ-গভীরতা ও বিস্তৃতি অনুসারে ইহার বীজরোপণের আয়োজন নিরূপিত হওয়া চাই। সেই অনিবার্য প্রয়োজনেই ভূপতি ও চারুর পারস্পরিক সম্পর্ক কিরূপে স্বাভাবিক পুষ্টি ও রসমাধুর্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল, অথচ কেহই এ বিষয়ে কেন কোন অভাব বা ক্ষোভ অনুভব করে নাই তাহার বিস্তারিত উপস্থাপনা অপরিহার্য হইয়াছে। ভূপতি সম্পাদকীয় নেশায় প্রণয়ের মধুরতা সম্বন্ধে অনবহিত রহিয়াছে। কিশোরী চারুলতা প্রচুর অবসর হাতে পাইয়া সমবয়স্ক দেবর অমলের সহিত নানাবিধ স্নেহমধুর সম্পর্কের উপলক্ষ্য সৃষ্টি করিয়া তাহার হৃদয়ের শূন্যতাকে পূর্ণ করিতে চাহিয়াছে।

রতিদেবীর উপেক্ষার ক্ষতিপূরণস্বরূপ প্রথম বাণীর আবাহন হইল ও অমল এই দেবীর বাহনরূপে চারুলতার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসিল। এই উপলক্ষ্যেই সে নানাপ্রকার উপহারের আবদার জানাইয়া চারুর স্নেহরসকে উদ্রিক্ত করিয়া তুলিল। এই উপদ্রব সহ্য ও পূরণ করিয়াই চারু তাহার বঞ্চিত দাম্পত্য ক্ষুধা মিটাইল ও ইহা তাহার নারী-প্রকৃতির অঙ্গীভূত হইয়া উঠিল। উপহার দাবী ও দান উপলক্ষ্যে হাস্যপরিহাসের অবিরল সিঞ্চনে অমল ও চারুর সম্পর্ক আরও মনোজ্ঞ হইল।

ইহার পরবর্তী স্তরে উহাদের সহযোগিতাস্পৃহা আরও উঁচুপর্দায়

চড়িল। এখন শুধু সাময়িক দাবী ও দাবী-মেটানোয় তাহারা হৃদয়বৃত্তি-চর্চার পর্যাপ্ত খোরাক পাইল না। এখন এমন একটা পরিকল্পনার প্রয়োজন হইল যাহাকে রূপ দিতে তাহাদের যৌথ সৃষ্টিশক্তির অনুশীলন হইবে। সুতরাং এই তরুণ-তরুণী অন্দরে বাগান করার খেয়ালে মাতিয়া উঠিল। এই খেয়ালকে পূর্ণ করা যতই তাহাদের সাধ্যাতীত হইল, ততই তাহারা কল্পনাকামধেনুর দুগ্ধদোহনের উত্তেজনা অনুভব করিল। অনায়াসলভ্য বস্তুলোক হইতে অনায়ত্ত কল্পনালোকে উত্তীর্ণ হইয়া তাহাদের সমপ্রাণতা কল্পমাধুরীর রঙে রঞ্জিত হইবার সুযোগ পাইল। এই কল্পমায়ার স্পর্শ চারুলতার মনে অসম্ভবের বীজ বপন করিল, তাহার স্বপ্নকল্পনার বৃন্তে কল্পকুসুমের অদৃশ্য কুঁড়িকে ফুটিবার আমন্ত্রণ করিল। কিশোর খেলার মধ্যে এই কল্পনার সংযোগ উহাকে এক অভাবনীয় পরিণতির পথে পদক্ষেপের অপরিস্ফুট সঙ্কেত দিল।

পরবর্তী স্তরে বাগানের খেয়াল সাহিত্যিক খ্যাতির উগ্রতর মাদকতাকে উদ্দীপন করিল। প্রস্তাবিত বাগানটি অচরিতার্থ কল্পনার ধূম্রলোকে মিলাইতে দেরি করিল না, কিন্তু এই ধূম্ররাশির মধ্যে যে অগ্নিকণা প্রচ্ছন্ন ছিল তাহা ক্রমশঃ দীপ্ততর হইয়া উঠিল। বাগান অপেক্ষা সাহিত্যের ইন্দ্রজাল-শক্তি অনেক প্রবলতর, মোহসৃষ্টিতে উহার কার্যকারিতাও অনেক বেশী। বাগান যদি বাস্তবরূপ না লয়, তবে মন উহাতে দীর্ঘকাল আশ্রয় পায় না। কাল্পনিক নন্দনকানন লইয়া স্বত্বাধিকারের কোন প্রশ্ন জাগে না। উহাতে দুই জনের আধিপত্যরক্ষা ও তৃতীয়ের অনধিকারপ্রবেশ-নিবারণের কোন সংকল্প দৃঢ় হইয়া উঠে না। সাহিত্যকল্পনার অনুশীলন আত্মনির্ভর ও বাহ্য-উপকরণনিরপেক্ষ। উহা ব্যাঙ্কে সঞ্চয়ের উপর একান্ত নির্ভরশীল নয়, সুতরাং বাগানের কামড় অপেক্ষা সাহিত্যের কামড় যে আরও মর্মান্তিক হইবে ইহা সহজেই অনুমেয়। এই ব্যাপারে অপ্রত্যাশিত যাহা ঘটিল, তাহা এই যে উহার দংশনজ্বালা সাহিত্যস্রষ্টা অপেক্ষা সাহিত্যরসবোদ্ধার ক্ষেত্রে আরও নিদারুণভাবে প্রকট হইল। মূল ব্যক্তিকে বাদ দিয়া সহায়কই উহার প্রচণ্ডতর আক্রমণের পাত্ররূপে দেখা দিল।

এই সাহিত্যের কড়াইএর উপরেই দীর্ঘকালীন অগ্নিতাপে ও বিবিধ আনুষঙ্গিক উপাদানের সংমিশ্রণে যে প্রেমের বিষমোদক সিদ্ধরসে জারিত হইল, তাহারই বিভ্রান্তকারী মিষ্টস্বাদে চারুলতার সমস্ত চিত্ত যেন অমোঘ

মন্ত্রে এক নিবিড় মোহাবেশে অবশ হইয়া পড়িল। চারুই অমলকে সাহিত্যচর্চায় উৎসাহিত করিল, তাহার সখিত্বের উত্তাপই উহার মধ্যে মাদকতা সঞ্চার করিল। মন্দাকে এই সাহিত্যচর্চার দ্বৈত আসর হইতে বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্র এই নির্দোষ আমোদে খানিকটা গোপনতার রস মিশাইল, সাহিত্যের আঙ্গুরভোজে তাহাকে উপবাসী রাখার জন্য তাহাকে আমড়া দিয়া ভোলান হইল। সাহিত্যে এই লুকোচুরি খেলা, এই ঈর্ষ্যার অনুপ্রবেশ, এই অধিকারস্পৃহার প্রয়োগ উহাকে প্রণয়কলার সগোত্রীয় করিয়া তুলিল।

সাহিত্যরসআস্বাদনের ঔৎসুক্য ক্রমশঃ অমলের সাধনার অগ্রগতি, অপরের লেখার ব্যঙ্গ, প্রকাশের উত্তেজনা, খ্যাতির বিস্তার প্রভৃতি স্তরের ভিতর দিয়া নেশার মত মনকে আচ্ছন্ন করিল। ভূপতির বাংলা সাহিত্য বিষয়ে অজ্ঞতা ও ঔদাসীন্য, ও তাহাকে অমলের রচনা শোনাইবার জন্য চারুর প্রচণ্ড আগ্রহ চারুর শ্রেষ্ঠত্ববোধকে উদ্দীপ্ত করিয়া এই নেশাকে আরও জমাইয়া তুলিল।

ইহার পরবর্তী স্তর হইল, প্রতিষ্ঠাসোপানে উর্ধ্বারোহী অমলের প্রতি মন্দার সম্ভ্রমবোধ ও তাহার সহিত অন্তরঙ্গতার প্রয়াস। মন্দা যাহাকে চারু ও অমলের ছেলেখেলা ভাবিয়াছিল, তাহার যে একটা বৈষয়িক সম্পদের দিক আছে তাহা সে যখনই বুঝিল, তখনই সে আর সাহিত্যের আসর হইতে দূরে থাকিতে চাহিল না। সুতরাং সেও অমলের রচনাপাঠের মুগ্ধা শ্রোত্রী-রূপে অবতীর্ণ হইয়া চারুর মনে প্রবলতর ঈর্ষ্যার উদ্রেক করিল ও সাহিত্য-উপভোগকে প্রেমের দহনজ্বালার মত তাপমাত্রায় লইয়া গেল। অমল চারুর এই অসঙ্গত আবদার মানিল না বলিয়া চারুর অভিমানের মাত্রা আরও চড়িল। সারস্বত সাধনার পীঠ ধীরে ধীরে মদনলীলারঙ্গভূমির নেপথ্যলোক হইয়া উঠিল।

ইহার পর, চারু আর শ্রোতার নিষ্ক্রিয় অংশে সন্তুষ্ট রহিল না, সেও সক্রিয় সাহিত্যরচনায় অগ্রসর হইল। সে অমলের প্রশংসালাভের জন্য কত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে এই ব্যাপারে তাহাই বোঝা গেল। অবশ্য চারুর রচনা প্রথম প্রথম অমলের রচনারই প্রতিধ্বনিমাত্র ছিল। শেষে যখন সে তাহার নিজস্ব মধুসঞ্চয়ের সন্ধান পাইল, তখন তাহার লেখার মধ্যে মৌলিক সরসতা ও প্রাণবেগ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। অমল অবশ্য এই পরিবর্তনে সম্পূর্ণ

খুসী হইল না। সে চারুকে নিজের ছায়ারূপে দেখিতেই অভ্যস্ত ছিল, তাহাকে নিজ আলোকে দীপ্তিময়ীরূপে দেখিবার প্রত্যাশা করে নাই। যাহা হউক, ইহাতে চারু অমলের সমকক্ষতা-অর্জনের আত্মপ্রসাদ লাভ করিল। কিন্তু তাহার আসল উদ্দেশ্য সাহিত্যিক ভাববিনিময়ের ব্যপদেশে অমলের উপর একাধিপত্যপ্রতিষ্ঠা। সুতরাং সে তাহার সাহিত্যখ্যাতির আশা বিসর্জন দিয়া, সমস্ত মাসিক পত্রিকার সম্পাদকগোষ্ঠীকে নিরাশ করিয়া, হস্তলিখিত পত্রিকায়, দুইজনের নির্জন মনোবিলাসের উদ্দেশ্যে, উভয়ের রচনাপ্রকাশের অঙ্গীকার আদায় করিল।

এই অভিপ্রায় পরবর্তী ঘটনাপরিণতিতে নিঃসংশয়িতভাবে প্রমাণিতও হইল। অমল তাহাদের গোপন চুক্তি ভঙ্গ করিয়া চারুর ও নিজের লেখা দুইটি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছে। সেই খবর চারু ভূপতির নিকট শুনিয়া অমলের উপর অত্যন্ত রাগ করিল। একটি মাসিক পত্রিকায় চারু ও অমলের লেখা তুলনা করিয়া চারুর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ও অমলের তীব্র শ্লেষাত্মক নিন্দা করা হইয়াছে। এই তুলনায় চারু যে সম্পূর্ণ প্রসন্ন হইতে পারিল না তাহাই ধরাইয়া দেয় যে তাহার হাতে সরস্বতীর লেখনী পুষ্পধনুর ফুলশরের বেনামদার রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। সে সাহিত্যের খড়-কুটা দিয়া প্রণয়তপ্ত হৃদয়-নীড় রচনা করিতে চাহে, প্রশংসার শিলাবৃষ্টিতে সেই নীড় বিধ্বস্ত হইলে তাহার লেখিকা-সত্তার যতটুকু লাভ তাহার অপেক্ষা তাহার প্রেমিকা-সত্তার ঢের বেশী লোকসান। যে বরমাল্যের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে, তাহার কাছে অভিনন্দনের স্রক্-চন্দনের কতটুকু মূল্য ?

অমলের প্রতিক্রিয়া ঠিক ইহার বিপরীত। সে প্রেমিক নয়, সাহিত্য-যশঃপ্রয়াসী। বিরুদ্ধ সমালোচনা তাহাকে মর্মান্তিক আঘাত হানিল। চারুর মনোভাবকে ভুল বোঝার ফলে সেই হৃদয়ক্ষত বিষদিগ্ধ হইয়া উঠিল। চারুর অন্তর্দ্বন্দ্ব তাহার নিকট স্তুতিমুগ্ধ আত্মপ্রসাদের ন্যায় প্রতিভাত হইল। এই ভ্রান্ত ধারণার বশে সে চারুর প্রতি উদ্ধত উপেক্ষা দেখাইয়া মন্দার প্রতি বেশী মনোযোগ দিল ও চারুর অভিমানবিদ্ধ হৃদয়ের সমস্ত পরোক্ষ আকুতি অগ্রাহ্য করিয়া তাহার যন্ত্রণাকে দুঃসহতর করিল। এই প্রশস্তি-মধুর দিবসারম্ভের অবসান ঘটিল সম্পূর্ণ বিপরীত সুরে। চারুর হৃদয় অশান্ত বেদনায় ছটফট করিয়া মরিল ও অভিমানের অদম্য উচ্ছ্বাসে সে তাহার সমস্ত লেখাকে কুটিকুটি করিয়া ছিঁড়িয়া তাহার লেখিকা-জীবনের প্রতিমাকে চিরবিসর্জন দিল।

ঠিক এই মুহূর্তেই চারুর জীবনসমস্যা একটি দুশ্চর জটিলতাচক্রে প্রবিষ্ট হইল। এ পর্যন্ত তাহার মনোবিপ্লব কেন্দ্রকে এড়াইয়া কতগুলি গৌণ সঙ্কটের পথ ধরিয়াই চলিতেছিল। সে অনেকটা না বুঝিয়াই সাহিত্য-সাধনার উন্মাদনা উপলক্ষ্য করিয়া এক গূঢ়তর ভাবমত্ততার দিকে অগ্রসর হইতেছিল। সাহিত্যের আকর্ষণের পিছনে যে কোন্ দুর্দমনীয় মনোবৃত্তি তাহাকে সর্বনাশের অতলে টানিতেছিল, স্বপ্নসঞ্চরণের ভিতর দিয়া সে যে কোন্ দুঃসহ জাগ্রৎ সত্যের নাগপাশে জড়াইয়া পড়িতেছিল, তাহা তাহার বোধশক্তিকে ফাঁকি দিয়া তাহার অবচেতন মনের নিগূঢ়ে আত্মঘোষণা করিল। শিখণ্ডীর আড়াল হইতে কোন্ অর্জুন যে তাহাকে বাণবিদ্ধ করিতেছে তাহা এখন পর্যন্ত তাহার অজ্ঞাতই রহিয়াছে। মন্দার প্রতি তাহার যে ঈর্ষ্যা, অমলের উপর স্বত্বস্থাপনের যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাহাও তাহাকে তাহার হৃদয়াকৃতির স্বরূপ অনুভব করিতে সাহায্য করে নাই। কিন্তু তাহার হৃদয়ের যে যথার্থ দাবিদার, সে যখন তাহার প্রণয়, প্রীতি ও কোমল সান্ত্বনাপ্রত্যাশী হইয়া তাহার নিকট যাচ্ঞার অঞ্জলি পাতিল, তখন আর আত্মপ্রবঞ্চনার কোন অবসর রহিল না। চারুর জীবনে ভূপতির আবির্ভাব তাহার অন্তরের সমস্ত কুহেলিকা অপসারিত করিয়া তাহাকে নগ্ন সত্যের প্রখর আলোকে উদ্‌ঘাটিত করিল। ভূপতি যখন অন্তরঙ্গতার ব্যাকুলতা লইয়া চারুর মন্দিরে অতিথি হইল, তখন তাহার সমস্ত যবনিকা ছিন্ন হইয়া গেল। তখনই সে চমকিত হইয়া আবিষ্কার করিল যে, তাহার হৃদয় অপরের কাছে উৎসর্গিত হইয়া গিয়াছে, ন্যায্য পাওনা মিটাইবার মত তাহার কোন উদ্বৃত্তই নাই। তখন সাহিত্যের ছলনা, মন্দার প্রতি ঈর্ষ্যা, অমলের প্রতি অভিমান, গোপনতার জন্য অধীর প্রতীক্ষা ও অপরের উপস্থিতির প্রতি প্রবল বিরাগ—সবই উহাদের পোষাকী ছদ্মবেশ, উহাদের ভদ্র আবরণ খুলিয়া ফেলিয়া এক বীভৎস সত্যরূপে নখরদংষ্ট্রা উন্মোচন করিল। বসন্তের ভাববীজিত কুঞ্জবনে হঠাৎ গ্রীষ্মের দাবদাহ অনুভূত হইল। ভূপতি তাহার কর্মব্যস্ত বহিরঙ্গন হইতে প্রতিহত হইয়া যখন শান্তির জন্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল, তখন চারু সভয়ে উপলব্ধি করিল যে সে উদ্যানে প্রেমের ফুল্লকুসুম ত নাই-ই, এমন কি সমবেদনার শুষ্ক নির্মাল্যও অপ্রাপ্য।

ভূপতি লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে সুধাবিন্দু চাহিতে গিয়া শুধু ব্যর্থই হইল না, উলটিয়া লক্ষ্মীর ঈর্ষ্যাদিগ্ধ নিঃশ্বাসে ঐশ্বর্যময়ীরই অভাবদগ্ধ অন্তরের পরিচয় পাইল। মূঢ় বৃথাই কল্পনা করিয়াছিল যে সাহিত্যালোচনার শ্যাম ভূমিখণ্ডে সে প্রেমের নূতন দেউল রচনা করিবে। সে বুঝে নাই যে সাহিত্যের সঙ্গে প্রেমের কোন নিত্যসম্বন্ধ নাই, সে কেবল প্রেমের শিখা জ্বালিবার ইন্ধন মাত্র।

ভূপতির বৈষয়িক বিপর্যয় তাহার দাম্পত্য সর্বনাশের ভূমিকা। ইহার প্রথম ফল হইল ভূপতি কর্তৃক চারুর সঙ্গলিপ্সা ও উমাপতি ও মন্দার বিদায়-গ্রহণ। দ্বিতীয় ফল হইল অমলের চারু সম্বন্ধে সংশয় ও বাস্তব দুর্দৈবের আঘাতে তাহার মনে কর্তব্যবোধ ও স্বাবলম্বন-সঙ্কল্পের সঞ্চার। ইহারই ঠিক পরবর্তী পরিণতি হইল ভূপতির মর্মান্তিক মনোবেদনায় চারুর নির্বিকারত্বের পরিচয়ে অমলের মনে বিদ্যুৎচমকের ন্যায় চারুর মনোভাবের স্বরূপ-উদ্ভাসন। ইহার পরেই সে বিবাহে আগ্রহ দেখাইয়া ও বিলাত-যাত্রার সংকল্পে স্থির থাকিয়া চারুর সঙ্গে চিরবিচ্ছেদের ব্যবস্থা দৃঢ় করিয়াছে। এমন কি বিদায়-মুহূর্তেও সে কোন পূর্বস্মৃতিরোমন্থন বা ভাববিলাসের প্রশ্রয় দেয় নাই। চারুর সহিত কৈশোরলীলা-অভিনয়ের উপর সমাপ্তি-যবনিকা ফেলিয়া দিয়া সে চারুর জীবনপথ হইতে জীবনের মত সরিয়া দাঁড়াইয়াছে। অমল-প্রত্যাখ্যাত চারুর গোপনলালিত বাসনা হঠাৎ সচেতন হইয়া অতীতস্মৃতিধ্যানে ও নিজ নির্দোষিতা-প্রতিপাদনে আপনার সঙ্গে বোঝাপড়ায় রত হইয়াছে।

ইহার পর চারু ও ভূপতি সমস্ত আড়াল ঘুচাইয়া পরস্পরের সম্মুখীন হইয়াছে। ভূপতি তখনও দাম্পত্য সুখের আশায় প্রলুব্ধ। সে এখনও একটি স্নিগ্ধ নীড়রচনার মধুর কল্পনায় সমস্ত বহির্জগতের বঞ্চনাকে ঠেকাইতে উৎসুক। সে দাম্পত্য সম্বন্ধের নিত্যতায় এখনও আস্থা রাখে। কিন্তু ভূপতির সমস্ত প্রত্যাশাই স্বল্পকালীন পরীক্ষার পর ব্যর্থ হইয়া গেল। স্বামী-স্ত্রীর শূন্যতার মধ্যে, না সান্ধ্য সাহচর্য, না সাহিত্যচর্চার কুণ্ঠিত প্রয়াস, না সাংসারিক খুঁটি-নাটির সরস আলাপ—কিছুই সেতু রচনা করিতে পারিল না। অমলের প্রতি চারুর যে ছেলেমানুষী সহৃদয়তা, যে স্বতঃস্ফূর্ত কৌতুকোচ্ছ্বাস তাহা ভূপতি নিজের প্রতি আকর্ষণের বৃথা চেষ্টা করিয়া চারুর প্রাণশক্তি ও হৃদয়বত্তা সম্বন্ধেই সংশয়িত হইল। শেষে মন্দাকে ফিরাইবার প্রস্তাবও স্বামী-স্ত্রীর উলটা চিন্তাধারার বিরুদ্ধ স্রোতে পড়িয়া বানচাল হইয়া

গেল। স্বামী স্ত্রীর নিঃসঙ্গতা সহনীয় করিতে ও স্ত্রী স্বামীর সেবাযত্নের ত্রুটি সারিতে মৌখিক সম্মতির অন্তরালে আন্তরিক অনৈক্য প্রচ্ছন্ন রাখিতে বৃথাই সচেষ্ট হইল। সহজ দাম্পত্য আলাপ যে স্থলবিশেষে এত দুরূহ তাহা উভয়েই বিস্মিতভাবে উপলব্ধি করিল। এখনও কিন্তু ভূপতি চারুর সমস্ত বিসদৃশ আচরণের একটা অনুকূল ব্যাখ্যা খাড়া করিয়া উহার প্রকৃতির সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইবার দুঃসাধ্য প্রয়াসে রত থাকিল। শেষে সরল ভূপতি নিজেরই অবহেলা ও অপটুতার উপর সমস্ত দোষ চাপাইয়া ও চারুর অপরাধ লঘু করিয়া দেখিয়া নিজ চরম সর্বনাশের বিভীষিকা হইতে আত্মরক্ষার শেষ চেষ্টা করিয়াছে।

অমলের বিদায়ের পর চারু নিজ অন্তরলোকে যে নিবিড় শূন্যতাবোধ অনুভব করিল তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ সমীক্ষা দ্বারাই সে অবশেষে নিজের অবস্থার স্বরূপ সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইল। তাহার সমস্ত জাগ্রৎ চিন্তা অমলের স্মৃতি-অনুধ্যানে তন্ময় হইয়া উঠিল। সে নিজের নিরবচ্ছিন্ন, সান্ত্বনাহীন, মর্মবিদারী দুঃখের মূল অনুসন্ধান করিতে গিয়া সভয়ে আবিষ্কার করিল যে উহা সর্ব-চেতনাব্যাপ্ত অবাঞ্ছিত প্রেমের বেদনাসঞ্জাত। -এই কণ্টকময় প্রেমের স্মৃতি প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া শেষ পর্যন্ত সে উহারই নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিল। তখন হইতে, তাহার সংসারজীবন ও অন্তরজীবনের মধ্যে এক নিদারুণ বিদারুণ-রেখা অঙ্কিত হইয়া গেল ও এক দ্বৈত সত্তার মুখোস পরিয়া সে উভয় জগতে বিচরণে অভ্যস্ত হইল।

ইহার পর চারু গৃহকর্তব্যে সাংসারিক রীতির অনুশাসন-পালনের মনোবল অর্জন করিল। অমলস্মৃতিতে নিজ মানসক্রিয়ার শ্রেষ্ঠ অংশ উৎসর্গ করিয়া উদ্‌বৃত্ত শক্তিটুকু স্বামিসেবায় নিয়োজিত করিল। অন্তর্দৃষ্টিহীন ভূপতি ধরিতে পারিল না যে অনুরাগের শাঁসটুকু বাদ দিয়া শুশ্রূষা-তত্ত্বাবধানের খোসামাত্র তাহার ভাগ্যে জুটিতেছে। দেহের আরাম তাহাকে মানস-তৃপ্তির সূক্ষ্মতর আকৃতির প্রতি উদাসীন করিল। অন্ধ ভূপতি আবার নূতন উৎসাহে চারুর সহযোগী হইবার জন্য নিজে সাহিত্যচর্চায় ব্রতী হইল। রিক্ত মালঞ্চে প্রেমের ফুল ফুটাইবার জন্য সে ঋতুদাক্ষিণ্যের প্রতি অবহিত না হইয়া সাহিত্যের ভূমিকর্ষণ আরম্ভ করিল। বর্ষণের অভাবের জন্য এই সাহিত্যকৃষি বন্ধ্যাত্বে পর্যবসিত হইয়া উপহাসবিড়ম্বিত হইল মাত্র।

অমলকে অবলম্বন করিয়া চারুর লুকোচুরি খেলা ও অহেতুক গোপনতা

ক্রমশঃ ভূপতির সন্দেহকে উদ্রিক্ত করিয়া তুলিল। অমলের প্রকাশ্য ঔদাসীন্যে চারু ধৈর্য হারাইয়া দ্বৈত ভূমিকার ছদ্মবেশ পরিহার করিল। পরপুরুষের প্রতি প্রেমবৈক্লব্য তাহার বহিরাচরণে ও হাবভাবভঙ্গীতে এমন উৎকটভাবে ফুটিয়া উঠিল যে ভূপতি পর্যন্ত বীভৎস সত্যকে অস্বীকার করিতে পারিল না।

এই মর্মান্তিক উপলব্ধির পর ভূপতিও সমস্ত আত্মসংযম হারাইয়া তাহার বহুকালরুদ্ধ নীরব সংশয়দংশন ও ব্যর্থ আত্মপ্রতারণার পুঞ্জীভূত বেদনাকে অনিবার্য অগ্নিস্রাবে উদ্‌গীর্ণ করিয়া দিল। সে তাহার প্রণয়চর্চার বিড়ম্বিত নিদর্শনস্বরূপ লেখাগুলিকে ভস্মসাৎ করিয়া তাহার অন্তঃসঞ্চিত বেদনা ও বঞ্চনার ক্ষোভকে নিঃসারিত করিল। এই প্রথম রোষোচ্ছ্বাসের প্রতিক্রিয়ারূপে চারুর প্রতিকারহীন, নিঃশব্দ বেদনার প্রতি ভূপতির করুণ সহানুভূতি উদ্রিক্ত হইল। সে অসাধ্যব্যাধিগ্রস্ত, ক্ষতবিক্ষতহৃদয় অথচ লৌকিক কর্তব্যের চাপে সুস্থ ব্যক্তির ন্যায় আচরণশীলা এই নারীকে সান্ত্বনা দিবার উপায় খুঁজিল।

এইবার একটি মর্মবিদারী মনস্তাত্ত্বিক আত্মবিরোধের মধ্য দিয়া এই করুণ অভিনয়ের উপর নাটকীয় আকস্মিকতার সহিত যবনিকাপাত হইল। অহরহ মানসদ্বন্দ্বে ক্লান্ত, নিঃসঙ্গতাক্লিষ্ট এই দম্পতি সহনশীলতার শেষ সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। বিচ্ছেদ ও বিমুখতার বিষবাষ্পপূর্ণ এই জীবনযাত্রা উভয়ের নিকটই অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। এমন সময় ভূপতির নিকট মুক্তির একটি রন্ধ্রপথ উদ্‌ঘাটিত হইল। সে মহীশূর হইতে একটি সংবাদ-পত্রের সম্পাদকতার প্রস্তাব পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাহা গ্রহণে প্রস্তুত হইল। বিদায়ক্ষণে সে চারুর একাকিত্বের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া মাঝে মধ্যে আসিবার প্রতিশ্রুতি দিল। চারু সেই মুহূর্তে তাহার জীবনের ভয়াবহ শূন্যতা উপলব্ধি করিয়া শিহরিয়া উঠিল ও আর্তস্বরে, যেভাবে জলমগ্ন ব্যক্তি নিঃশ্বাসবায়ুর জন্য প্রার্থনা জানায়, সেই ভাবে ভূপতিকে তাহাকে সঙ্গে লইবার ভিক্ষা চাহিল। সে ভাবিল যে এই জীবনব্যাপী শ্বাসরোধী শূন্যতার মধ্যে ভূপতির অবাঞ্ছিত, অনুরাগহীন সঙ্গও বাঁচিবার ন্যূনতম উপকরণ। ভূপতির অসংজ্ঞান মনের অনিবার্য প্রতিক্রিয়া হইল অন্যাসক্তা ও তাহার প্রতি বিমুখা নারীর সাহচর্যের দুঃসহতার উপলব্ধি এবং তাহার কণ্ঠ হইতে 'না" শব্দ সংস্কারবশতই বাহির হইল। সঙ্গে সঙ্গেই তাহার

চেতন মন জাগ্রত হইয়া এই অবচেতন অস্বীকৃতিকে প্রত্যাহার করিল। কিন্তু ইতিমধ্যে চারুও ভাবিবার অবসর পাইয়াছে। সেও তাহার অবচেতন মন হইতে উদ্গীরিত জৈব সংস্কারের বিরুদ্ধে তাহার ইচ্ছাশক্তি ও ঔচিত্যবোধের প্রতিরোধকে জাগ্রত করিয়াছে এবং ভূপতিরই উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়া তাহার পূর্বতন ভিক্ষাকে প্রত্যাহার করিয়াছে। একই ভাবোচ্ছ্বাস দুই বিপরীত মনোগহন হইতে নিঃশ্বসিত হইয়া উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর অতল ব্যবধানকে অভিন্ন শব্দবন্ধনে মিলাইয়া দিতে প্রয়াসী হইয়াছে। এই সমক্ষণে উচ্চারিত দুইটি "না" দুইটি চিরবিচ্ছিন্ন সত্তার সীমাহীন শূন্যতাকে প্রতিধ্বনিত করিয়াছে। সমস্ত উপন্যাসের অবদমিত হৃদয়মন্থনের বিষনির্যাস এই নেতিবাচক ধ্বনি দুইটির মধ্যে কেন্দ্রীভূত ও চিরন্তন হইয়া রহিল।

ঘটনা ও চরিত্রের, উপলক্ষ্য ও প্রবৃত্তির, দৈবের আকস্মিক উৎক্ষেপ ও মনের অমোঘ উচ্ছ্বাসের একান্ত মিলনে এই ক্ষুদ্র উপন্যাসটিতে এমন একটি কার্যকারণশৃঙ্খলের নীরন্ধ্র জাল বয়ন করা হইয়াছে, স্বল্প পরিসরের মধ্যে মানবচিত্তের নেপথ্যলোকের এমন একটি অন্তর্গূঢ় রহস্যের গ্রন্থিমোচন হইয়াছে, একটি নাটকীয় পরিস্থিতি সূচনা হইতে চরম পরিণতি পর্যন্ত এমন অভ্রান্ত অন্তর্যামিত্বের সহিত উদ্ঘাটিত হইয়াছে যাহা উপন্যাসসাহিত্যে দুর্লভ। এই ছোট রচনাটি উপন্যাসজগতে একটি নূতন দিগন্ত উন্মোচন করিয়াছে। প্রেমরহস্যের এক নব পরিচয় আমাদের বিস্মিত বোধিলোকে উন্মেষিত হইয়াছে। এযাবৎ প্রেম বস্তুটি মানব মনের একটা আকস্মিক আবির্ভাব রূপে কয়েকটি সীমিত উদ্দীপনশক্তির উপর নির্ভরশীল ছিল। ইহা অতীত বীরযুগের দীপ্তিমণ্ডিত হইয়া রাজবংশের অভিজাত মর্যাদার অনুষঙ্গী ভাবমাধুর্যরূপে নন্দিত হইত, কাব্যরমণীয়তার দিব্যলোকেই যে ইহার অস্তিত্ব সম্ভব এই স্বতঃসিদ্ধ ধারণাই উহার স্বরূপ নির্ণয় করিত। সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে যখন উহার আবির্ভাব ঘটিত, তখন উহা হয় বাল্যপ্রণয়ের মুগ্ধ স্মৃতি, না হয় বিধবার অনিবার্য প্রেমতৃষ্ণা অথবা দাম্পত্য মিলনে অরুচি ও পরনারীর প্রতি দুর্বার আকর্ষণের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব, এই ত্রিবিধ রূপেই উহার ভাবসত্তা রূপপরিগ্রহ করিত। এ সমস্ত ক্ষেত্রেই উহার আত্মপ্রকাশের মধ্যে কিছুটা চমকপ্রদ আকস্মিকতা থাকিত। উহা যেন প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার বহির্ভূত আধিদৈবিক বা আধিভৌতিক আপৎপাতের মত, গার্হস্থ্য জীবনযাত্রাবিধ্বংসী ভূমিকম্পের মত আমাদের

সমস্ত পূর্বধারণাকে বিপর্যস্ত করিয়া দিত। তখন আমাদের পার্থিব অভিজ্ঞতাকে বিদীর্ণ করিয়া হঠাৎ পৌরাণিক অতিলৌকিক চেতনা আমাদের মধ্যে সক্রিয় হইয়া উঠিত। আমরা পুরাণপ্রসিদ্ধ সতীদের আচরণ ও অলন্ত তপঃপ্রভাবের কথা স্মরণ করিয়া উহার অতিলৌকিকত্ব নিজেরা অনুভব ও পাঠকচিত্তে মুদ্রিত করিতে প্রয়াস পাইতাম। সুস্থ মস্তিষ্কে, কার্যকারণসূত্র-অন্বেষণে, বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে উহার মূলনির্ধারণ ও প্রকৃতিনির্ণয়ের যে কোন চেষ্টা সম্ভব তাহাই যেন আমাদের ধারণার অতীত ছিল। মোট কথা, বঙ্কিমের যুগ পর্যন্ত বৈধ ও অবৈধ উভয় প্রকারেরই প্রেম মৃত্তিকারসপুষ্ট হইয়াও মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবাতীত এক দিব্য বা নারকীয় শক্তিরূপে সামাজিকচিত্তে স্বীকৃতি পাইয়াছিল। এবং এক ভারতচন্দ্র ছাড়া সমস্ত বাংলা কাব্য ও উনিশ শতকের কথা-সাহিত্য ইহার স্বরূপবিশ্লেষণে হয় দিব্যভাবানুবাসিত, কাব্যরমণীয় ভাবমুগ্ধতা না হয় নীতিবোধতাড়িত অবিমিশ্র ঘৃণা ও ধিক্কার—এই দুইটির মধ্যে একতন দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করিত।

একটু ভাবিলেই বোঝা যাইবে যে যদি বৈধ বা অবৈধ প্রেমকে মানবিক প্রবৃত্তিরূপে বিচার ও বিশ্লেষণ করিতে হয়, যদি উহার জন্মপত্রিকা ও সূতিকাগৃহ-পরিবেশের পরিচয় দিতে হয়, তবে পারিবারিক অন্তরঙ্গতার মধ্যেই উহার মূল অনুসন্ধান করিতে হইবে। বড় জোর, পরিবারের গণ্ডী ছাড়াইয়া প্রতিবেশীর গৃহে শৈশব সাহচর্যের আকর্ষণ-গাঢ়তার মধ্যেই উহার সূত্র মিলিতে পারে। নগেন্দ্রের কুন্দনন্দিনীর প্রতি আসক্তি বা রোহিণী-গোবিন্দলালের পারস্পরিক রূপজ মোহ—একটি একত্রবাসের প্রেরণায়, অপরটি একদিকে অতৃপ্ত প্রেমলালসা, ও অন্যদিকে দাম্পত্যপ্রেমের প্রতি অভিমান-প্রতিক্রিয়ার রাসায়নিক সংযোগে সঞ্জাত ও পুষ্ট হইয়াছিল। তথাপি এই দুই মানস বিকারের মধ্যেই কিছুটা ফাঁক লক্ষ্য করা যায়। নগেন্দ্রের আসক্তি কখন যে কুন্দের নীরব সমর্থন লাভ করে, একের লালসা অপরের হৃদয়ে কিরূপে পরিপূরক কামনার উদ্রেক করে, তাহার ইতিহাস অলিখিতই রহিয়া গিয়াছে। রোহিণী-গোবিন্দলালের কলুষিত প্রণয়ের উদ্ভব অমোঘ কারণশৃঙ্খলাবদ্ধ ও ত্রুটিহীনভাবে বিবৃত—উহার অবসানই আকস্মিক, ও প্রত্যক্ষ না হইয়া অনুমানসিদ্ধ। উভয় ক্ষেত্রেই বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষার পূর্ণ মর্যাদা একটু খাটো পড়িয়াছে। প্রণয়ের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসে কোথাও কোথাও ছেদ দেখা দিয়াছে, ও আকস্মিকতার জোড়াতাড়া লাগিয়াছে।

এই দিক্ দিয়া রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়' ষোল-আনা বিজ্ঞানসমীক্ষার দাবী অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। অনাত্মীয় তরুণ-তরুণীর মধ্যে প্রণয়সঞ্চার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থাকে না। এইরূপ হৃদয়বিনিময়ের পক্ষে কোন দুর্লঙ্ঘ্য নীতিগত বাধার অনস্তিত্বই কল্পনাকে সক্রিয় রাখে। অবশ্য প্রতাপ-শৈবলিনীর মধ্যে যে আত্মীয়তার অন্তরাল ছিল তাহা রাষ্ট্রবিপ্লবের ঝটিকায় উড়িয়া গিয়াছে। ফস্টরের দস্যুতা সামাজিক বাধাকে নস্যাৎ করিয়া নিরুদ্ধ হৃদয়াবেগকে দুঃসাহসিক মুক্তি দিয়াছে। শৈবলিনী যেন যুগ-বিপ্লবের সর্বাত্মক অরাজকতায় নবজন্ম পরিগ্রহ করিয়া সব ঐতিহ্য-সংস্কারকে বিসর্জন দিয়া প্রলয়পয়োধিজলে নিজ জীবনতরী ভাসাইয়াছে। কিন্তু এই প্রশ্রয়দাক্ষিণ্য, এই ভূমিকম্প-বিধ্বস্ত নিরাশ্রয়তার আমন্ত্রণ বাঙালী জীবনে এক বিরল ব্যতিক্রম ও কথা-সাহিত্যের এক আশাতীত সৌভাগ্য। ইহা বারবার ঘটে না।

ইহার বিপরীতক্রমে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পরিধিকে আরও সঙ্কুচিত করিয়া, সমস্ত সমাজসংশ্রবনিরপেক্ষ, সমগ্র প্রতিবেশশূন্য, একক পরিবারের স্বল্পতম আশ্রয়-ভূমিতে, স্নেহসম্পর্কচর্চার সুনির্দিষ্ট কক্ষপথে, এমন কি আত্মীয়তা-বন্ধনের নিষিদ্ধসংস্কারবারিত বেষ্টনীরেখার মধ্যে এই হৃদয়বৃত্তির আবির্ভাব ও স্ফুরণ দেখাইয়াছেন। স্বল্পসংখ্যক নরনারীসমবায়ে যে একটি ক্ষুদ্র পরিবার-মণ্ডল গড়িয়া উঠিয়াছে, সেখানেই দৈনন্দিন জীবনচর্চার ফাঁকে ফাঁকে, সকলের অজ্ঞাতসারে কখন যে একটি বীজ নিক্ষিপ্ত হইয়া উহার অভ্যস্ত প্রীতিবিনিময়ের মধ্যে একটা বিস্ফোরণশক্তি সঞ্চার করিয়াছে, উপরের মৃদু আবেগ কখন সত্তার গভীরে ডুব দিয়া সমস্ত আস্তরের রং পাল্টাইয়া দিয়াছে, হাসিখুসী আমোদ-প্রমোদের মধ্যে কোন্ অশুভ লগ্নে সর্বগ্রাসী, শাসন-সংযমহীন ক্ষুধা জ্বলিয়া উঠিয়াছে তাহা কেহই বুঝিতে পারে নাই। প্রণয়ের উন্মেষ যদি গোড়া হইতেই সচেতনভাবে ঘটে, তবে উহা কাব্যরীতিনিরূপিত তির্যক গতিপথ ধরিয়া স্বরূপপরিচয়কে যথাসম্ভব বিলুপ্ত করিতে চেষ্টা করে। সুতরাং সে যে কেবল প্রেমাস্পদকে ফাঁকি দেয় তাহা নহে, প্রণয়ের ঐতিহাসিককেও বিভ্রান্ত করে। আত্মসচেতন প্রেম বহুক্ষেত্রেই অজ্ঞাতবাসে আত্মগোপনকারী হৃদয়বৃত্তি—সে বহুরূপীর মত বিবিধ ছদ্মবেশ ধারণ করে ও নিজেকে ধরাছোঁয়া দেয় না। সুতরাং এ প্রেমকে লক্ষ্য ও উহার প্রকৃতি-বিশ্লেষণ করিবার সুযোগ খুব কমই মেলে। রবীন্দ্রনাথ এই সংকট এড়াইবার জন্য তাঁহার প্রেমকে উভয় পক্ষেই সম্পূর্ণ অজ্ঞাত রাখিয়াছেন।

চারু বা অমল কাহারও সংশয় হয় নাই যে তাহাদের অবসরবিনোদনের প্রীতিরসোচ্ছ্বাসের মধ্যে কোন মর্মঘাতী মাদকতা প্রচ্ছন্ন ছিল। নির্দোষ সাহচর্যকামনার মধ্যে যে এরূপ ধ্বংসাত্মিকা বহ্নিজ্বালা ধীরে ধীরে শিখা বিস্তার করিতেছিল তাহা কেহই বুঝিতে পারে নাই। কাজেই সাধারণ ভাববিলাসের এই অকল্পিত রূপান্তর প্রণয়োন্মেষের অপ্রমত্ত পর্যবেক্ষণ ও বৈজ্ঞানিক স্বরূপনির্ণয়ের পক্ষে আশ্চর্যভাবে সহায়ক হইয়াছে। অবশ্য অমল কোন দিনই চারুর সহিত সম্পর্ককে খুব গুরুত্ব দেয় নাই। সে ইহার জটিলতার জালে দুর্মোচ্যরূপে জড়াইয়া পড়ে নাই। বাস্তব জগতের একটি রূঢ় আঘাতেই তাহার চক্ষু খুলিয়া গিয়াছে ও সাহিত্যচর্চা লইয়া যে মান-অভিমান ও ঈর্ষ্যা-প্রতিযোগিতার লঘু অভিনয় চলিতেছিল তাহার পিছনে যে কত বড় মর্মান্তিক ও বীভৎস সত্য লুকাইয়া ছিল সে বিষয়ে সে সচেতন হইয়াছে। ভূপতির সর্বনাশে চারুর ঔদাসীন্যই তাহাকে প্রকৃত অবস্থার সন্ধান দিয়া তাহার মোহকে নির্মূল করিয়াছে। আবীরের রং যে হৃদয়রক্তের ক্ষরণ তাহা উপলব্ধি করিয়া সে স্তম্ভিত হইয়াছে ও তাহার অতীতকে নিঃশেষে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। বেচারা চারু কিন্তু আজীবন এই ভ্রান্তির মাশুল দিয়াছে। সে স্রোতোহীন জলে প্রমোদবিহার করিতে করিতে অকস্মাৎ কোন এক গোপন টানে বহিঃসমুদ্রের অতলে নিমজ্জিত হইয়া আর কূলে ফিরিতে পারে নাই। ছেলেখেলার পূজার মিছামিছি বলিদানের ভোঁতা অস্ত্র কখন তীক্ষ্ণধার খড়্গে পরিণত হইয়া তাহাকেই বিদ্ধ ও বলিরূপে দাবী করিয়াছে। ছুঁচফোটানো সামান্য রক্তপাত হঠাৎ অসাধ্য দুষ্টক্ষতের বিরামহীন যন্ত্রণায় তাহার সমস্ত সত্তাকে বিষাইয়া দিয়াছে। পলাতক প্রেম এখানে আত্মগোপনের অবসর না পাইয়া লেখকের বিশ্লেষণশূলে বিদ্ধ হইয়াছে ও উহার অবগুণ্ঠিত প্রকৃতিরহস্য আমাদের নিকট উন্মোচন করিয়াছে। এই প্রথম সাহিত্যের পরীক্ষাগারে প্রেমের যথাযথ বৈজ্ঞানিক গোত্রনির্ণয় ও মূল্যায়ন সাধিত হইল। ইহাই 'নষ্টনীড়'-এর বিস্ময়কর মৌলিকতার যথার্থ তাৎপর্য।

এই সুনিপুণ গ্রন্থিবন্ধনে দু' একটি মাত্র আল্‌গা সূতা ধরা পড়ে। ভূপতির সঙ্গে চারুর অপরিচয়ের সর্বাত্মকতা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সংশয় থাকিয়া যায়। ভূপতির বহির্বিষয়মত্ততা কি তাহাকে চারু সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে অচেতন করিয়াছিল? তাহার সহিত চারুর দেখাশোনা ও বিশ্রম্ভালাপ একেবারে

বদ্ধ ছিল না ও চারুর যৌবনাবেগের তৃপ্তিবিধানে যে তাহার কিঞ্চিৎ কর্তব্য আছে সে বিষয়ে তাহার সম্পূর্ণ অজ্ঞতাও মানিয়া লওয়া দুরূহ। হয়ত চারুর সূক্ষ্মতর রসচেতনা মিটাইবার যোগ্যতা তাহার ছিল না; রুচি ও চিত্তবিনোদন-প্রণালীর সমতা সম্বন্ধেও তাহাদের দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান থাকাও তাহাদের প্রকৃতি-পার্থক্য হইতে অনুমিত হইতে পারে। ভূপতি যতই কাট-খোট্টা ও কাজের মানুষ হউক তাহার অন্ততঃ যে সহৃদয় আলাপের শক্তি ছিল তাহার প্রচুর প্রমাণ উপন্যাসে পাওয়া যায়। সুতরাং ভূপতির অন্ধতা যে কিছুটা অতিরঞ্জিত করা হইয়াছে ঔপন্যাসিক চমক লাগাইবার উদ্দেশ্যে এ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক মনে হয় না। তিক্ত অভিজ্ঞতার পর ভূপতির জীবনে যে সূক্ষ্ম অনুভূতি ও ভাবসংযমের নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহাতে উহার পূর্বজীবনে যে ইহাদের সম্পূর্ণ অভাব ছিল ইহা চরিত্রসঙ্গতির দিক্ দিয়াও বিশ্বাস করা কঠিন।

দ্বিতীয় সংশয়টি চারুর অন্তরগভীরতার পরিমাণবিষয়ক। অমল ও মন্দার সহিত আচরণে চারুর এমন কোন আবেগগাঢ়তা ও চরিত্রনৈষ্ঠিকতার পরিচয় পাওয়া যায় নাই, যাহাতে তাহাকে ব্যর্থ প্রেমের আজীবন সাধিকা-রূপে কল্পনা করা যাইতে পারে। অমল কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া সে যে-বাহ্যজ্ঞানবিরহিত ও অমলের ধ্যানে তন্ময় হইয়া তাহার স্মৃতিকে চিরলালিত রাখিবে ও তাহার জন্য নিঃসঙ্গ জীবনের সমুদয় কৃচ্ছ্রসাধন বরণ করিয়া লইবে, তাহার জীবনে এরূপ একনিষ্ঠ তপশ্চর্যার পূর্বসূচনা কোথায় আভাসিত আছে? ফুলের মত কোমল, প্রজাপতির মত পুষ্পবিলাসী, আত্মতৃপ্তির খেয়ালে মশ্‌গুল্ শিথিলচরিত্র চারুর মধ্যে এরূপ পরিণতির সম্ভাবনা একটু কষ্টকল্পনা বলিয়া মনে হয়। বরং বিনোদিনীর মধ্যে দৃঢ়সংকল্প ও মনের গতি ফেরার পর তাহার বলিষ্ঠ, আদর্শ-প্রভাবিত আত্মবিসর্জন সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু তুলারাশির মধ্যে অগ্নির ন্যায় চারুর মত খেয়ালের ক্ষণতন্তু-নির্মিত ব্যক্তিসত্তার মধ্যে অনির্বাণ হোমধূম-প্রজ্বালন প্রকৃতিবিরুদ্ধ বলিয়াই মনে হয়। ভূপতি, অমল ও চারু এই তিনটি প্রধান চরিত্রের মধ্যেই কিছুটা অতর্কিত রূপান্তরের সংশয় লেখকের অতিসতর্ক সূত্রসংযোজনাদক্ষতায় সামান্য আত্মবিস্মৃতির মত প্রতিভাত হয়।

পঞ্চদশ অধ্যায়

চোখের বালি (১৯০৩, ১৩০৯)

১

'চোখের বালি' উপন্যাসের নিখুঁত আদর্শে লেখা ও তাহারই অন্তঃপ্রকৃতির পরিচয়বাহী রবীন্দ্রনাথের প্রথম সম্পূর্ণাঙ্গ, মানবহৃদয়জটিলতার আখ্যানধর্মী ইতিহাস। কবি ও ভাবুক রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসসাধনার খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ প্রয়াস হইতে এখানেই তাঁহার ঔপন্যাসিক সত্তার সুস্পষ্ট ও পূর্ণবিকশিত অভিব্যক্তি। এই উপন্যাসেই তাঁহার অনুকরণাত্মক শিক্ষানবিশি যুগের অবসান ও তাঁহার জীবনসমীক্ষার স্বকীয়তার ও শিল্পরীতির আত্মঘোষণা। তাঁহার শিল্পস্বভাবের প্রদীপ্ত প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা উপন্যাসেরও সামগ্রিক দিকপরিবর্তন, ঘটনা ও মন্তব্যের মাধ্যমে মানব-অন্তরলোকের বৈপ্লবিক উদ্‌ঘাটনও ঘোষিত হইয়াছে। শক্তিসম্পন্ন যন্ত্র দিয়া পরীক্ষা করিলে মানব শরীরের যেমন অজ্ঞাত কল-কব্‌জা, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সন্ধিগ্রন্থিগুলি দৃষ্টিগোচর হয়, এই উপন্যাসে তেমনি অন্তর্জীবনের একটি নূতন মানচিত্র, মানব প্রবৃত্তি-সমূহের জটিল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া পাঠকের বিস্মিত উপলব্ধির নিকট প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে। রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসের যে গোত্রান্তর ঘটাইয়াছেন 'চোখের বালি'ই তাহার প্রথম সার্থক দৃষ্টান্ত।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে যে জীবনসত্য কিছুটা সংবৃতরূপে, প্রমাণনিরপেক্ষ-ভাবে আভাস-ইঙ্গিত, ও কল্পনা-অনুমানের দিব্যবোধের আলোকে উদ্‌ভাসিত হইয়াছিল, রবীন্দ্রনাথ তাহাকেই পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্যবিবৃতির ও সূক্ষ্মতম উদ্দেশ্য-বিশ্লেষণের সমর্থনে উপস্থাপিত করিয়াছেন। ইহাতে উপন্যাস কাব্যের পুষ্পকরথ, স্বতোপ্রত্যয়ের বিমানবিহার ত্যাগ করিয়া যন্ত্রবাহনের লৌহজাল-বদ্ধ, বিধিনির্দিষ্ট সতর্কতার সঙ্কেতনিয়ন্ত্রিত, নিরূপিতবেগ পথের অভিযাত্রী হইয়াছে। ইহার অগ্রগতির ক্রমপর্যায়ে কাব্যরমণীয়তার আবেগ ও যাত্রাপথের নিসর্গশোভা মানবজীবনদ্বন্দ্বের সহিত অচ্ছেদ্য ঐক্যে ছন্দোগ্রথিত হইয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত উপাদানের সংযোগ মানবের অন্তর্বিক্ষোভের মর্যাদা ও তাৎপর্য-নিগূঢ়তা বাড়াইলেও উহার বিষয়গত প্রাধান্য ও শিল্পগত প্রকাশরীতিকে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ করে নাই। উপন্যাসের মধ্যে আবেগঘন

মুহূর্তে কাব্যানুভূতি ও প্রকৃতিসৌন্দর্য সঞ্চারের অবসর নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু উহার মূল সুরকে আচ্ছন্ন করিবার অধিকার নাই। ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কবিসত্তা ও ভাবমুগ্ধ প্রকৃতিচেতনাকে বিসর্জন করেন নাই, কিন্তু উহাদিগকে ঔপন্যাসিক উদ্দেশ্যসাধনের সহায়করূপে নিয়োজিত করিয়া একটি নূতন প্রকারের সমন্বিত শিল্পসৌন্দর্য সৃষ্টি করিয়াছেন।

'চোখের বালি' উপন্যাসের রচনাকাল হয়ত 'নষ্টনীড়'-এর সমকালীন, কিন্তু উহার প্রকাশকাল প্রায় তিন বৎসর পরে। সুতরাং পরবর্তী গ্রন্থকে রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত নবরীতির আরও পরিণত প্রয়োগরূপে গ্রহণ করা অবিধেয় হইবে না। 'নষ্টনীড়'-এ যাহার প্রথম পরীক্ষা, 'চোখের বালি'-তে তাহারই জটিলতর, দুরূহতর, অধিকতর অন্তঃসন্ধানী ও বিস্তৃততর পটভূমিকায় পরিব্যাপ্ত সম্প্রসারণ। বৈজ্ঞানিক ছোট বীক্ষণাগারে যে নূতন জীবনসত্যের সন্ধান পাইলেন, তাহাকেই বৃহত্তর পরিমণ্ডলে, জটিলতর পরীক্ষার মাধ্যমে, নানাপ্রকার প্রবৃত্তিদ্বন্দ্ব ও ঘটনাচক্রে আবর্তিত করিয়া, সংশয়াতীতভাবে সার্বভৌম তাৎপর্যে প্রতিষ্ঠিত করাই তাঁহার পরবর্তী উদ্যম। চারু, অমল ও ভূপতির যে সমস্যা তাহা অতি ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে সঙ্কুচিত, ইহা খিড়কীর ডোবার মত সমস্ত উত্তাল জীবনতরঙ্গ হইতে সুরক্ষিত।, আর এই সমস্যা জাল পাকাইয়াছে প্রধানত মনের অসংজ্ঞান স্তরে। ইহারা যেন কয়েকজন সংসারজ্ঞানহীন শিশু, না বুঝিয়া সুঝিয়া আমোদের জন্য বারুদ পুড়াইতে গিয়া সমস্ত গৃহে অগ্নিকাণ্ড বাধাইয়াছে। ইহারা প্রমোদস্বপ্ন হইতে অকস্মাৎ অসংবরণীয় প্রবৃত্তি-বিস্ফোরণের মর্মঘাতী সত্যের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছে। ইহাতে প্রৌঢ় মানবপ্রকৃতির যতটা পরিচয় না পাই, তাহার অপেক্ষা তীব্রভাবে অনুভব করি কয়েকটি কৈশোরোত্তীর্ণ স্বভাবশিশুর জীবনগভীরে নিমজ্জনের করুণ অসহায়তা। উপন্যাসটি পড়ার পর আমরা এই সর্বনাশের অপ্রতিবিধেয়তা, অসংযত প্রবৃত্তির অমোঘ মর্মবেদনা বৈজ্ঞানিক সত্যরূপে ঠিক উপলব্ধি করি না। আমরা উপন্যাসের পাত্রপাত্রীদের অজ্ঞতার উপর সমস্ত দায়িত্ব চাপাইয়া নির্মম জীবনবিধানকে রেহাই দিই ও জীবনযাত্রার দুঃসহতাকে লঘু করিয়া দেখিয়া ও অলীক আশার বঞ্চনাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আরামের স্বপ্ন দেখি।

'চোখের বালি'-তে পরিস্থিতি ও সমস্যার প্রকৃতি সম্পূর্ণ পৃথক। এখানে জীবননাটকের অভিনয়ে যে কয়জন কুশীলব অংশ গ্রহণ করিয়াছে তাহারা

প্রায় সকলেই জীবনমর্মজ্ঞ, সংসারের জটিলতা সম্বন্ধে সচেতন। হয়ত আশা ও অংশতঃ বিহারী কিছুটা সংসারবোধহীন ও আত্মপ্রকৃতির ছায়ায় আচ্ছন্ন-দৃষ্টি। তাহারা সংসারযুদ্ধে অসহায় ও তাহাদের উদারতা ও সরল বিশ্বাসের রন্ধ্রপথে বিরূপ অদৃষ্টের অস্ত্রক্ষেপের সহজ লক্ষ্য। ইহাদের মধ্যে আশা নিদারুণ বেদনা ও উদ্‌ভ্রান্তির আঘাতে চেতনা পাইয়াছে ও পরিবারে নিজ যোগ্য আসনটি অধিকার করিয়াছে। বিহারী পুনঃপুনঃ আঘাতেও তাহার আত্মভোলা নিরাসক্ত স্বভাবটি হারায় নাই, বরং তাহার আদর্শনিষ্ঠাই তাহার ভবিষ্যৎ জীবনচর্যার চিরন্তন আশ্রয়রূপে কর্মসাধনায় পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। জীবনকে চিনিবার পূর্বে যে ত্যাগ-বৈরাগ্যের নির্দেশ সে মানিয়া লইয়াছিল, পরবর্তী অভিজ্ঞতা তাহার সেই সহজ প্রবণতাকেই সমর্থিত ও দৃঢ়ীভূত করিয়াছে।

অন্নপূর্ণা সংসারে থাকিয়াও সংসারাতীত। তাহার কাশীবাসের নির্জন সাধনা ও কলিকাতা-গৃহস্থালীর সঙ্কটকণ্টকিত অস্বস্তি তাহার জীবনবোধে সমন্বিত হইয়াছে। আশার মাসী ও মহেন্দ্রের খুড়ী রূপে দুইদিক হইতে আগত আঘাত তাহাকে সহ্য করিতে হইয়াছে, সংসারের যত ঝড়-ঝাপটা, যত অভিযোগ-অনুযোগ তাহারই মাথায় ভাঙিয়া পড়িয়াছে। আশা ও মহেন্দ্রের দাম্পত্যজীবনের সমস্ত নীরব বেদনা, অন্তর্গূঢ় ক্ষোভ তাহারই প্রকাশকুণ্ঠিত হৃদয়ে নিঃশব্দে আবর্তিত হইয়া গাঢ়তা লাভ করিয়াছে। জীবন-মন্থনজাত সমস্ত হলাহল পান করিয়াও কিন্তু তাহার প্রসন্ন আত্মনিবেদনের শান্তিসঞ্চয় শুধু নিজের জন্য নয়, সকল ভাগ্যহত নর-নারীর সান্ত্বনার জন্য উন্মুক্ত আছে। হিন্দু বিধবার জীবনাদর্শ তাহার মধ্যে মূর্ত হইয়া তাহার চারিদিকে একটি স্নিগ্ধ জোতির্বলয় রচনা করিয়াছে, কিন্তু তথাপি তাহাকে অবাস্তব বলিয়া মনে হয় না।

বাকী তিনটি চরিত্র—মহেন্দ্র, রাজলক্ষ্মী ও বিনোদিনী—জীবন-জটিলতার মর্মমূলে অধিষ্ঠিত। ইহাদের মধ্যে মহেন্দ্রই সরলতম ও সর্বাপেক্ষা জটিলতাহীন। তাহার সমস্যা সর্বতোভাবে স্বেচ্ছাকৃত ও তাহার জীবন-ধর্মের অনুগামী। সে বাল্যকাল হইতেই স্নেহপ্রশ্রয়পুষ্ট, আত্মাভিমানস্ফীত ও নিজের বিশেষ অধিকার সম্বন্ধে উগ্রভাবে সচেতন। মুহূর্তে মুহূর্তে নবোত্থিত প্রবৃত্তির তাড়নায় সে আচরণের এক প্রান্ত হইতে বিপরীত প্রান্ত পর্যন্ত উৎক্ষিপ্ত। সংসার যেন তাহাকে অবিসংবাদিতভাবে রাজপদে

অভিষিক্ত করিয়াছে ও তাহার ক্ষণিক খেয়ালতৃপ্তির রাজকর যোগানই উহার একমাত্র কর্তব্য। তাহার জীবনদেবতা তাহাকে লইয়া সারাজীবন ক্রূর পরিহাস করিয়াছেন। যে পুতুল সে ভাঙিয়াছে, তাহাকে ফিরিয়া পাইতেই পরমুহূর্তে তাহার একান্ত আকিঞ্চন। মাতৃভক্তির উদ্ভট আতিশয্যে বিবাহ-বন্ধনে অস্বীকৃতি, আবার প্রথম প্রণয়োন্মেষের অদম্য উচ্ছ্বাসে সমস্ত পারিবারিক কর্তব্যবোধবিসর্জন, আশাকে লইয়া বিহারীর সহিত অশালীন প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বিনোদিনীর প্রতি প্রবল উপেক্ষা, আবার তাহাকে লইয়া গ্লানিকর নির্লজ্জ মাতামাতি, বিহারীর বন্ধুত্বের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও চরম অমর্যাদা—এ সবই তাহার চরিত্রের অস্থিরমতিত্বের অভিব্যক্তি। এই—জাতীয় প্রবৃত্তিসর্বস্ব চরিত্র হয় স্বয়ংপ্রকাশ, কেননা এই চাবিতেই তাহাদের হৃদয়ের সব কয়েকটি মহলই খোলা যায়। কোন অন্তর্দ্বন্দ্বের সঙ্কট অতিক্রম করিয়া তাহাদের অবগুণ্ঠিত প্রকৃতিকে উন্মোচন করার প্রয়োজন হয় না। সুতরাং মহেন্দ্র-চরিত্র খুবই স্বাভাবিক ও উহার প্রতিটি কর্মের মধ্যেই উহার প্রতিফলন সুচিহ্নিত। তবে একটিমাত্র ব্যাপারে উহার মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের ক্ষীণ আভাস লক্ষ্য করা যায়। আশার প্রতি দাম্পত্য কর্তব্যবোধ ও তাহার সঙ্গে কোন ছল-চাতুরীর আশ্রয়গ্রহণে দৃঢ় অনিচ্ছা ও অক্ষমতা এবং বিনোদিনীর প্রতি দুর্বার মোহাকর্ষণে নিজচরিত্রদৃঢ়তা সম্বন্ধে প্রত্যয়ের উন্মূলন—এই দুইটি অনুভবের অক্ষপথে তাহার প্রকৃতির দুই বিপরীতমুখী গতি আবর্তন করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রথমটি নীতিমূলক, আর দ্বিতীয়টি আত্মাভিমানমূলক। মহেন্দ্রের মোহমুক্তি ঘটিয়াছে তাহার অবসাদ ও শ্রান্তির আকস্মিক প্রতিক্রিয়ারূপে, তাহার পর্যুদস্ত আত্মমর্যাদার অতর্কিত পুনরুদ্ধারে। এই শ্রেষ্ঠত্ববোধের বিসর্জন ও পুনঃপ্রতিষ্ঠাই মহেন্দ্রের অন্তর্জীবনের মূল ঘটনা।

বাকী দুইজন—রাজলক্ষ্মী ও বিনোদিনী—অনেক বেশী জটিল প্রকৃতির চরিত্র। তাহাদের মনে একাধিক পরস্পরবিরোধী ভাবসূত্র ও প্রবৃত্তি-প্রেরণা দুশ্ছেদ্য গ্রন্থিবন্ধনে জড়াইয়া আছে। তাহাদের সত্তারহস্য প্রথম দর্শনেই পরিস্ফুট হয় না, তাহাদের বিভিন্ন আচরণ মিলাইয়া উহার মূলসূত্র খুঁজিতে হয়। রাজলক্ষ্মী সম্পন্ন পরিবারের গৃহকর্ত্রী, সুতরাং তাহার ইচ্ছাশক্তি অনেকটা প্রখর ও নিরঙ্কুশ। মহেন্দ্রের সমস্ত চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের মূল তাহার মধ্যেই নিহিত, অবশ্য হিন্দুনারীর অস্থিমজ্জাগত আত্মদমন ও সংসারের দায়িত্ববোধের

দ্বারা তাহার সহজ দুর্দমতা কতকাংশে নিয়ন্ত্রিত। মহেন্দ্রের যেসব মনোবৃত্তি উদ্দাম, তাহাদের বীজ রাজলক্ষ্মীর প্রকৃতির মধ্যে অপেক্ষাকৃত সংযতভাবে বর্তমান। মহেন্দ্রের আত্মাভিমান, অধিকারস্পৃহা ও প্রবৃত্তিবশ্যতা মাতার নিকট হইতেই লব্ধ। রাজলক্ষ্মীর স্বকীয় স্বভাবের উপাদান হইল স্ত্রীজাতিসুলভ ঈর্ষ্যা ও সূক্ষ্ম ও ছদ্মবেশী আঘাতপটুতা। মহেন্দ্রের উপর অধিকার লইয়া পুত্রবধূর প্রতি তাঁহার অবচেতন মনে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল, তাহা আর একজন নারী—বিনোদিনীর অন্তর্দৃষ্টির নিকট ধরা পড়িয়াছে। ছোট জা অন্নপূর্ণার প্রতি একটা অন্ধ, অকারণ আক্রোশ তাহার আচরণ ও সংলাপের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়াছে। বিহারীর প্রতি তাহার স্নেহ আন্তরিক হইলেও স্বার্থবুদ্ধিও পুত্রগৌরবের দ্বারা আচ্ছন্ন—বিহারীর স্বাধীন ব্যক্তিসত্তাকে সে কোনদিনই সুনজরে দেখে নাই। এই অন্তর্গূঢ় দাহ মর্মান্তিক তীব্রতা লাভ করিয়াছে মাতাপুত্রের প্রকাশ্য ইচ্ছাসংঘাতের মধ্যে। এখানে কোন পক্ষই নিজ অধিকারভূমির সূচ্যগ্রও ছাড়িতে রাজি হইবার মত উদার স্নেহশীলতা দেখায় নাই। মহেন্দ্রের উপেক্ষা ও স্পর্ধিত বিদ্রোহ রাজলক্ষ্মীর মাতৃহৃদয়ে যতটা আঘাত না হানিয়াছে, তাহার সর্বগ্রাসী কর্তৃত্বাভিমানের উপর তাহার অপেক্ষা অনেক তীব্রতর বজ্র নিক্ষেপ করিয়াছে। যে মাতা বধূর হাতে পুত্রকে ছাড়িয়াও স্বস্তি পায় নাই, সে যে পুত্রের সম্পর্কচ্ছেদে শুধু মাতৃস্নেহের অপমান অনুভব করিবে তাহা নয়, সে স্বত্বলোপের বৈষয়িক বিপর্যয়ে আরও বেশী মুহ্যমান হইয়া পড়িবে ইহাই স্বাভাবিক। জীবনের সীমান্তে পৌঁছিয়া রোগযন্ত্রণা ও মানসিক বেদনার যুগ্ম প্রভাবে রাজলক্ষ্মীর অন্তর অনেকটা নির্মল হইয়া উঠিয়াছে। তাহার প্রকৃতি হইতে আত্মাদরের খাদ মুছিয়া গিয়া সে হিন্দু রমণীর বিশুদ্ধ ভাবাদর্শে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও মানবিক স্নেহসম্পর্কের মূল্যবোধ সম্বন্ধে সে নূতন শিক্ষা পাইয়াছে। চাপা উত্তাপে দুঃসহ-প্রখর মধ্যাহ্নের অবসানরমণীয়তার মত রাজলক্ষ্মীর বিদায়ক্ষণ স্নিগ্ধ ও প্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছে।

বিনোদিনী চরিত্রটি অতি গহন ও দুরবগাহ। শুধু রবীন্দ্র-উপন্যাসে নয়, সমগ্র বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যে ইহা বঞ্চিতা নারীর মর্মজ্বালার ও সংসারের প্রতি গূঢ় অভিমানপ্রসূত স্ববিরোধী অস্থিরতার এক অপূর্ব মনস্তাত্ত্বিক পরিস্ফুটন। বিনোদিনীর মানসকেন্দ্র দুরন্ত প্রবৃত্তির ঝড়ে এমন আমূল বিচলিত হইয়াছে যে তাহার সমস্ত চিন্তা ও কর্ম, তাহার সমস্ত মানসিক

সম্পর্ক দুই বিরুদ্ধ শক্তির স্রোতোবেগতাড়িত হইয়া ঋজুপথে চলিবার শক্তি হারাইয়াছে। মহেন্দ্র ও বিহারীর সহিত তাহার সম্পর্ক এই দোটানায় পড়িয়া মুহুর্মুহু অনুরাগ হইতে বিরাগ, শ্রদ্ধা-প্রীতি হইতে উপেক্ষা-ঘৃণার বিপরীততীরসংলগ্ন হইয়াছে। তাহার এই ধাঁধালাগান, পূর্বাপর সঙ্গতিহীন ভাবপরিবর্তনগুলির মূল প্রেরণাসূত্রটি লেখক অপূর্ব কৌশলে ও অমোঘ বিশ্লেষণশক্তির দ্বারা আমাদের ধরাইয়া না দিলে, আমরা এগুলিকে পাগলের কাণ্ডজ্ঞানহীনতার নিদর্শন মনে করিতে পারিতাম। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিনোদিনীর মধ্যে অন্ততঃ দুইটি স্বতন্ত্র সত্তার সহ-অস্তিত্ব ছিল এবং লেখক তাঁহার অন্তদৃষ্টির দ্বারা একই নারীর জীবনে এই দ্বৈত সত্তার প্রেরণা ও প্রয়োগ অনুভব ও অভিব্যক্ত করিয়াছেন। বিনোদিনীর মধ্যে দুইটি নারী দুইটি বিরুদ্ধ জীবনদর্শনের প্রতীকরূপে পাশাপাশি অবস্থিত ছিল এবং আত্মার গভীর হইতে মেজাজ ও মনোভাবের তারতম্য অনুসারে দুই প্রকারের দাবী সমান উচ্চকণ্ঠে ধ্বনিত করিত। বিনোদিনীর প্রথম পরিচয়—কল্যাণী গৃহলক্ষ্মীরূপে; আর দ্বিতীয় পরিচয়, চির-অতৃপ্ত, বুভুক্ষু নারীর ঈর্ষ্যানলশ্বসিনী, সর্বনাশের মশালবাহিনী প্রলয়ঙ্করীরূপে। কখনও সে স্নিগ্ধ সান্ত্বনা পরিবেশন করিতেছে; কখনও বা বিষ উদ্গীরণ করিতেছে। শাশ্বত নারীর দ্বৈত প্রকৃতির কাব্যপ্রতীক উর্বশীর ন্যায় তাহার এক হাতে সুধাপাত্র, অপর হাতে বিষকুম্ভ। কবি-কল্পনা যে সত্যকে ব্যঞ্জনাময় চিত্ররূপ দিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছে, ঔপন্যাসিক মানব সমীক্ষা তাহাকেই নারী-জীবনের তথ্যসমৃদ্ধ কাহিনীরূপে বাস্তব পরিমণ্ডলে স্থাপন করিয়াছে ও উহার দ্বিমুখী প্রবাহ যে একই উৎস হইতে প্রসূত, একই অঙ্কুরজাত যুগ্ম পত্রোদ্গম তাহা বৈজ্ঞানিক রীতিতে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। বিনোদিনীর চরিত্রের উপস্থাপনায় এই স্ববিরোধের সমন্বয়সাধন, এক অনন্য গূঢ়সঞ্চারী অনুভব-শক্তির, জীবন-কল্পনার মধ্যে জীবনঘনত্বসঞ্চারের এক অভিনব প্রয়োগসার্থকতার ঔপন্যাসিক উদাহরণ।

পরিবেশরচনাতেও উভয় উপন্যাসের মধ্যে পরেরটিতে পরিণত শিল্পবোধ সুপরিস্ফুট। অবশ্য উভয়ত্রই রবীন্দ্রনাথ পরিধির যথাসম্ভব সঙ্কোচবিধান করিয়াছেন, উহাকে স্বল্পতম আয়তনের মধ্যে সীমিত রাখিয়াছেন। ভূপতি ও মহেন্দ্রের পারিবারিক সমস্যার উদ্ভব ও সমাধানের জন্য যে ন্যূনতম প্রতিষ্ঠানভূমির প্রয়োজন তাহাই তিনি কাজে লাগাইয়াছেন। এই আঁটসাঁট ঘরে অনাবশ্যক আগন্তুকসমাবেশের কোন স্থান নাই। বাহিরের জনতার

জীবনকল্লোল ত একেবারেই প্রতিরুদ্ধ। বঙ্কিমচন্দ্র বা ডিকেন্স যেমন নিজ নিজ কল্পনার ঐশ্বর্য হইতেই নানা ছোটখাট চরিত্র সৃষ্টি করিয়া ও কোন না কোন অজুহাতে তাহাদিগকে উপন্যাসের জীবনোৎসবে কোলাহল জমাইবার ফরমায়েস দিয়া একটা উদ্বেল প্রাচুর্যের ধারণা উৎপাদন করেন, রবীন্দ্রনাথ সেরূপ উদ্বৃত্ত শক্তির অজস্রতার আড়ম্বরে তাঁহার সম্পদগৌরব ঘোষণা করেন না। তিনি অতি সতর্ক শিল্পীর ন্যায় কারুকার্যের সূক্ষ্মতায়, জীবনবোধের গভীরতার স্নমিত পরিচয় দেন, সৃষ্টির ব্যাপকতায় ও বৈচিত্র্যে তাঁহার অধিকারের বিস্তার সম্বন্ধে আমাদের চমৎকৃত করিবার তাঁহার কোন স্পৃহা নাই। তাঁহার আভিজাত্য তাঁহার রুচিপ্রকর্ষে ও শিল্পস্বাধীনতায় ব্যঞ্জিত, কোনপ্রকার আতিশয্যেই উহার স্বভাবশুচিতা প্রমাদগ্রস্ত হয় নাই। তাঁহার উপন্যাসে মানবপ্রকৃতির এক নূতন পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। ইহাতে বাহিরের ঘটনার সহিত মানস-প্রেরণার সুষ্ঠু সহযোগিতায় অন্তররহস্য যেন রঞ্জনরশ্মিসংযোগে প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছে—মনের সূক্ষ্মতম কম্পনগুলিও আমাদের চোখের সামনে ধরা দিয়াছে। ঘটনাকে কোথাও অনুচিত প্রাধান্য দিয়া অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যকে কোথাও অস্পষ্ট বা সংশয়াচ্ছন্ন করা হয় নাই। মন মহারাজ স্ব-মহিমায় অটুট থাকিয়া বহির্ঘটনাকে বা জীবনের অনুষঙ্গী দৈবকে নিজ গূঢ় উদ্দেশ্যসাধনের সহায়ক রূপে নিয়োজিত করিয়াছে, ইহারা মনেরই ঐশ্বর্যপ্রকাশের বাহন হইয়াছে।

'নষ্টনীড়'-এর মত 'চোখের বালি'-তেও একটিমাত্র পরিবারের সংঘাত-ক্ষুব্ধ অন্তর্জীবনের ইতিহাস। তবে ইহার পরিধি কলিকাতার উপকণ্ঠস্থিত জীর্ণ পল্লীগ্রাম ও দমদমের বাগান হইতে কাশী, এলাহাবাদ প্রভৃতি ধর্ম-স্মৃতিভাবিত, প্রকৃতির দাক্ষিণ্যঋদ্ধ বহির্বঙ্গ পর্যন্ত। যে অন্তর্দাহ কলিকাতার একটি নিভৃত পরিবারের হৃদয়সংঘর্ষজাত, তাহাই বিপুল শিখাবিস্তার করিয়া অগ্নিদগ্ধ জীবগুলিকে জ্বালাপ্রশমনের জন্য কক্ষচ্যুত উল্কার ন্যায় দিক্-বিদিকে উদ্‌ভ্রান্তভাবে ছুটাইয়াছে। 'নষ্টনীড়'-এ যে অন্তর্দ্বন্দ্ব, অদম্য প্রবৃত্তির সহিত যে নীরব সংগ্রাম অস্বস্তির তুষানলে চিত্তকে অহরহ পোড়াইয়াছে তাহারই চরম পরিণতি ঘটিয়াছে মৈত্তরের নিঃসঙ্গ স্বেচ্ছানির্বাসনে। এই দূরাভিযান শ্বাসরোধী গলরজ্জুর বহু-পাকে-জড়ান অসহনীয়তারই পরিমাপক। কিন্তু ফাঁস লাগাইবার ব্যাপারে এই দূরপ্রয়াণের কোন অংশ নাই, বন্ধনটি সম্পূর্ণভাবেই ঘরের তাঁতে বোনা। কিন্তু 'চোখের বালি'-তে ঘর ও বাহির

উভয়েই ফাঁস যোজনায় সহযোগিতা করিয়াছে। ঘরের কোণে সমস্ত লোকচক্ষুর অন্তরালে যে মর্মঘাতী মোহসম্পর্কের সূচনা তাহাই ক্রমশঃ দুর্দম শক্তিতে স্ফীত হইয়া পারিবারিক নিভৃতির শোভনতা ছাড়াইয়া সমস্ত বহির্জগতে স্পর্ধিত—কুৎসিত আত্মঘোষণায় উচ্চকণ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। এই বহিরভিযান কখনও আত্মসন্ধান, কখনও বা আত্মদমন, কখনও বা প্রতিরোধ-শক্তি-আহরণ, কখনও বা মরীচিকামোহ প্রভৃতি নানাবিধ উদ্দেশ্য-অনুপ্রেরিত। সুতরাং পূর্ব উপন্যাসের সহিত তুলনায় বর্তমান উপন্যাসে প্রবৃত্তির দহনজ্বালায় বাহিরের প্রভাব সক্রিয়তর ভূমিকায় অধিষ্ঠিত। ইহা ছাড়া 'চোখের বালি'-তে প্রবৃত্তির আকর্ষণ অনেক বেশী মর্মভেদী ও জটিলতর কারণে উদ্ভূত। 'নষ্টনীড়'-এ প্রেমের পরিচয় বরাবরই অব্যক্ত থাকিয়া শেষ মুহূর্তে অকস্মাৎ নিজ মূর্তিতে দেখা দিয়াছে—মারাত্মক অতর্কিত আক্রমণের মত ইহা তলে তলে সুড়ঙ্গ খনন করিয়া মনোবলকে একেবারেই জীর্ণ করিয়াছে। সুতরাং ইহার ছদ্মবেশী আত্মপ্রসার অলক্ষিতই রহিয়াছে। চারু ও ভূপতি উভয়েই যেন এক আভ্যন্তরীণ ভূমিকম্পে অসহায়ভাবে সমাধিস্থ হইয়াছে—মাটি খুঁড়িয়া উহাদের কাহাকেও জীবন্ত কবর হইতে উদ্ধার করা গেল না। অমল সর্বনাশের নদীকূলে হঠাৎ ফাটল দেখিয়া সভয়ে হটিয়া আসিয়া নিরাপদ আশ্রয়ে প্রাণ বাঁচাইয়াছে। এই ঘটনার মধ্যে—নাটকীয় চমক যতটা আছে, দুরন্ত আবেগের স্বরূপপরিচয়, উহার ক্ষুদ্রবীজ হইতে বনস্পতিতে রূপান্তর-প্রক্রিয়ার তথ্যনিষ্ঠ ইতিহাস ততটা নাই। অজগর-গ্রাসের বলির প্রাণরক্ষার মর্মান্তিক নিষ্ফল আকূতি আমরা অনুভব করি। কিন্তু সর্পবেষ্টনীর পাকগুলি কেমন করিয়া জড়াইয়া ধরিল তাহা আমাদের অজ্ঞাত থাকে। এ যেন ছোট ছেলের জলের ধারে খেলা করিতে করিতে হঠাৎ গভীর জলে তলাইয়া যাওয়ার মত করুণ ব্যাপার—ইহা স্তম্ভিত করে, কিন্তু চিনাইয়া দেয় না।

'চোখের বালি'-তে প্রেমের জন্ম ইতিহাস আরও স্পষ্টতর রূপে ব্যাখ্যাত ও লিপিবদ্ধ, উহার ক্রমবৃদ্ধির লক্ষণ, মনোরাজ্যে বিপ্লববিস্তারে উহার অমোঘ শক্তির রেখাচিত্র যান্ত্রিক নির্ভুলতার সহিত প্রদর্শিত হইয়াছে। এই বলবান প্রবৃত্তির স্বরূপ সূচনা হইতেই জানা; ইহাকে দমিত করিবার কোন আয়োজনই বাধা মানে নাই। প্রথম স্রোতের মুখে সমস্ত বাধা-চেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া ইহা মানবাত্মাকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। বিধ্বস্ত জীবনের

উপর ইহার ক্ষতচিহ্ন চিরাঙ্কিত করিয়া শেষ পর্যন্ত পুনঃপ্রবুদ্ধ শুভবুদ্ধির নিকট ইহার নিঃশেষিত শক্তি পরাজয় স্বীকার করিয়াছে।

২

এইবার উপন্যাসের ঘটনাসংস্থান ও চরিত্রপ্রতিক্রিয়া অনুসরণ করিয়া মহেন্দ্র-বিনোদিনীর এই দুর্বার হৃদয়সম্পর্কের গ্রন্থিগুলি কেমন করিয়া দুশ্ছেদ্য বন্ধনে জট পাকাইয়াছে তাহার স্বরূপ নিরূপণ করা যাইতে পারে। বিনোদিনীর সঙ্গে মহেন্দ্রের প্রথম যৌবনে যে বিবাহ-প্রস্তাব দরিদ্র বিধবার কন্যাদায়মোচন-উদ্দেশ্যে দয়ার্দ্রচিত্ত রাজলক্ষ্মীর দ্বারা উত্থাপিত হইয়াছিল তাহা মহেন্দ্রের মাতৃবৎসলতার খেয়ালী আতিশয্যে সরাসরি প্রত্যাখ্যাত হইল। এই বিবাহবিমুখতায় মনে মনে মাতা পুত্রের মাতৃভক্তির নিদর্শনে আত্মপ্রসাদই অনুভব করিলেন ও মহেন্দ্রের সৃষ্টিছাড়া খেয়ালকে সংযত করার কোন প্রয়োজনই বোধ করিলেন না। বিনোদিনীর মনে মহেন্দ্রের এই অকারণ ঔদাসীন্য একটা গূঢ় অভিমানের বীজ বপন করিয়া ভবিষ্যৎ সমস্যার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছে। মহেন্দ্রের মনেও নিজ চরিত্রদৃঢ়তা ও রূপে অনাসক্তির একটা ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্ট হইয়াছে। এই তুচ্ছ ভূমিকার মধ্যে নিয়তি এক মর্মান্তিক নাটক অভিনয়ের পূর্বসূচনা করিয়া রাখিলেন।

ইতিমধ্যে মহেন্দ্রের বিবাহে অনিচ্ছা এক হাস্যকর, কিন্তু গূঢ়বেদনা-স্পৃষ্ট অসঙ্গতির মধ্যে নিজ অসারতা প্রতিপন্ন করিল। সে বন্ধু বিহারীর পাত্রী দেখিতে গিয়া নিজের পূর্ব-প্রত্যাখ্যাত ও মাতারও অনভিপ্রেত আশার প্রতি অকস্মাৎ প্রবল আকর্ষণ অনুভব করিল ও মায়ের অসম্মতি ও বন্ধুর আশাভঙ্গ সমস্ত উপেক্ষা করিয়া তাহাকেই বিবাহ করিয়া বসিল। এই বিবাহই মহেন্দ্রের ভবিষ্যৎ জীবনে অনেক গ্রন্থিসংযোজনার হেতু হইয়াছে। প্রথমতঃ ইহাতে মহেন্দ্রের একান্ত স্বার্থপরতা ও প্রবৃত্তিবশ্যতা উৎকটভাবে অভিব্যক্ত ও তাহার আত্মচরিত্রজ্ঞানের অভাব নাটকীয়-ভাবে প্রকটিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ রাজলক্ষ্মীর বধূর প্রতি বিরাগ প্রাত্যহিক সংসারজীবনে একটা বিরোধ-তিক্ততা সৃষ্টি করিয়া পারিবারিক সংহতিকে শিথিল ও ভবিষ্যৎ বিচ্ছেদের সম্ভাবনাকে সুগম করিয়াছে। তৃতীয়তঃ বিহারীর মনে আশা সম্বন্ধে একটা গোপন দুর্বলতার রন্ধ্রপথ উন্মুক্ত রাখিয়া

তাহার হিতকর মধ্যবর্তিতাকে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। চতুর্থতঃ, আশার নিজের সঙ্কুচিত মনোভাব ও অতিকোমল পরনির্ভরতা তাহার বধূমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইবার অন্তরায় হইয়াছে ও মহেন্দ্রের উচ্ছৃঙ্খলতা-সংযমনে তাহার শোচনীয় অক্ষমতার প্রমাণ দিয়াছে। মহেন্দ্র-আশার দাম্পত্য জীবনে উহাদের পারস্পরিক অনুরক্তির অকৃত্রিমতা, মহেন্দ্রের আদর-সোহাগের অত্যুচ্ছ্বাস ও আশার মুগ্ধ প্রণয়াবেশ সত্ত্বেও যে নিদারুণ বিপর্যয় ঘটিয়াছে তাহার সক্রিয় কারণ যদি মহেন্দ্র হয়, তবে তাহার নিষ্ক্রিয় কারণ যে আশা তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। তৃতীয় পক্ষ বিনোদিনী এখানে সূক্ষ্ম বিচারে উপলক্ষ্যমাত্র প্রতীয়মান হয়। তাহার অপূর্ব ছলাকলাবিস্তার, অসাধারণ বুদ্ধিকৌশল ও অনন্য উপায়দক্ষতা সবই তাহার অভ্রান্ত কূটনীতির বিস্ময়কর নিদর্শন, কিন্তু তথাপি ইহা সর্বথা স্বীকার্য যে মহেন্দ্র-আশার আপাত-সমৃদ্ধ দাম্পত্য জীবনের মধ্যে গূঢ় অবক্ষয়ের কীটক্ষত প্রচ্ছন্ন না থাকিলে বিনোদিনীর সমস্ত মোহিনী-শক্তি উহার অলৌকিক কুহক দেখাইবার অবসর পাইত না। (দাম্পত্যপ্রাসাদ বানের জলের অলক্ষিত অনুপ্রবেশ ও সমপ্রাণতার কালজয়ী আশ্রয়স্তম্ভের অভাবের জন্য ক্ষয়িতমূল না হইলে বিনোদিনীর যাদুমন্ত্র এত সহজে উহার পতন ঘটাইতে পারিত না। নির্মাণে খুঁত না থাকিলে আরব্যরজনীর আধুনিক প্রতিরূপ এই রংমশালজ্বালা প্রেমমঞ্জিল মায়াবিনীর ফুৎকারবায়ুতে ধূলিসাৎ হইত না। হঠাৎ-মুগ্ধতায় যে সম্পর্কের সূচনা, অসংবরণীয় আবেশমত্ততায় তাহার বিরতি ও ছেদ।

বিবাহের পরই মহেন্দ্রের রুদ্ধ প্রণয়াবেগ বাঁধ-ভাঙা বন্যার মত সমস্ত সীমাবন্ধনকে দীর্ণ করিয়া তাহার প্রকৃতির সবটুকু গ্রাস করিয়াছে। যে মাতৃভক্তির আতিশয্য তাহাকে দাম্পত্যজীবনপ্রবেশ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছিল তাহা মহেন্দ্রের প্রকৃতি-প্রয়োজনেই নবপরিণীতা বধূর প্রতি উদ্দাম আকর্ষণে বিপরীত পথ ধরিল। মাতা ও বধূর প্রতি কর্তব্য-সামঞ্জস্যের কথা প্রাক্‌বিবাহ বা বিবাহোত্তর জীবনে কখনই মহেন্দ্রের মনে স্থান পাইল না। আশাও অতিরিক্ত লজ্জাসংকোচ ও জীবনানভিজ্ঞতার জন্য এসম্বন্ধে মহেন্দ্রের প্রবৃত্তিকে সংযত রাখার কোন চেষ্টাই করিতে পারিল না। সংসারে সঙ্কট ঘনাইয়া আসিতেছে বুঝিয়াও ও মহেন্দ্রের প্রণয়নিবেদনের উগ্রতায় বিব্রত বোধ করিলেও সে অসহায় মূঢ় বালিকার ন্যায় এক স্বপ্নজগতে বিচরণ করিতে লাগিল। বিবাহ তাহার নিকট একটি

উন্নততর পুতুলখেলার ন্যায় বোধ হইল। এই প্রণয়মত্ততার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি যে মোহভঙ্গের বিমুখতায় তাহা তাহার স্বপ্নাচ্ছন্ন দৃষ্টির নিকট ধরা পড়িল না। আশার মূঢ়তার মাশুল কিন্তু অন্নপূর্ণাকে দিতে হইল—বধূর প্রতি কর্তৃত্বহীনতার অভিমান রাজলক্ষ্মী সুদে আসলে সংসারপোষ্যা মেজ যায়ের উপর তুলিল। ইহাতে মাতা-পুত্রে মনোমালিন্য আরও উগ্রতর হইল, ও গৃহ হইতে চলিয়া-যাওয়া অন্নপূর্ণার নিকট নতিস্বীকার পূর্বক রাজলক্ষ্মীকে তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে হইল। ইহার পরবর্তী স্তর হইল রাজলক্ষ্মীর অভিমানে পিতৃগৃহগমন ও প্রত্যাবর্তনের কালে গৃহকর্ত্রীর মনোবিকারের রন্ধ্রপথে সংসারের অশুভগ্রহরূপে বিনোদিনীর প্রথম প্রবেশ।

বিনোদিনীর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে পারিবারিক মন-কষাকষির মৃদু জ্বালে সংসারকটাহে যে তিক্তস্বাদ বেদনা-নির্যাসের পাক চলিতেছিল, তাহাতে অন্যান্য উপাদানের সহিত এক তীব্র বিস্ফোরক হৃদয়গভীরজাত অন্তর্দ্বন্দ্বের সংমিশ্রণ ঘটিল। এই মিশ্র পানীয়টি এক উগ্র সংজ্ঞালোপী সুরাসারের প্রলয়শক্তি অর্জন করিল। মহেন্দ্রের সহিত বিনোদিনীর সম্পর্কের রূপান্তর ও আশা, রাজলক্ষ্মী ও বিহারীর এই রূপান্তরসাধনে সহায়তা প্রণয়াকর্ষণের এক আশ্চর্য মনস্তাত্ত্বিক ইতিহাস। ইহাতে রবীন্দ্রনাথের কবিমনের সহজ অনুভবসংস্কার ও ঔপন্যাসিকের তীক্ষ্ণতম জীবনসমীক্ষা ও প্রবৃত্তি-বিশ্লেষণের অপূর্ব সমন্বয় হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কোনটি যে হৃদয়রহস্য-উন্মোচনে অধিক কার্যকরী হইয়াছে তাহার মীমাংসা দুরূহ। মানুষের মনে যখন জট পাকাইতে আরম্ভ হইয়া এক দুর্মোচ্য, শ্বাসরোধী ফাঁসের রূপ লয়, তখন কতদিক হইতে যে কত অদৃশ্য সূত্র আসিয়া এই গ্রন্থিলতায় সহযোগিতা করে, নিজের মন-গহন ছাড়াও প্রতিবেশ হইতে বিকীর্ণ কত অজানা প্রেরণা এক বজ্র আঁটুনির বৃত্তে সংহত হয়, এমন কি দৈবের পরিহাসও কেমন করিয়া যথাসময়ে উপস্থিত হইয়া মানব-ট্রাজেডিকে কৌতুকবিড়ম্বিত করে তাহা ভাবিলে অদৃষ্টের দুর্জ্ঞেয়তা ও শিল্পীর গ্রন্থন-নৈপুণ্য উভয়েই আমাদিগকে অভিভূত করিয়া তোলে। এই সম্পর্কজটিলতার সূত্রানুসরণই উপন্যাসের মর্মকথা।

মহেন্দ্রের সহিত বিনোদিনীর আলাপ প্রথমতঃ মহেন্দ্রের ঔদাসীন্যের দ্বারাই বিলম্বিত হইল। বিনোদিনী আশার সহিত সখিত্ব পাতাইয়া তাহার প্রণয়মুগ্ধতার কাহিনী যেন তরল মদিরার ন্যায়ই পান করিল।

তাহাতে একদিকে তাহার অতৃপ্ত প্রণয়বুভুক্ষা যেমন পরোক্ষ তৃপ্তি পাইল, তেমনি তাহার অন্তর জ্বালায় বাষ্পোত্তাপপূর্ণ হইয়া উঠিল ও অযোগ্য আশার অভাবিত সৌভাগ্য তাহার মনে ঈর্ষ্যার স্ফুলিঙ্গ সঞ্চার করিল।

ইতিমধ্যে মহেন্দ্রের ঔদাসীন্য অসহিষ্ণুতায় উঠিয়াছে ও সে বিনোদিনীর সঙ্গে আশার ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠতার জন্য আশার সঙ্গবিচ্যুত হইয়া তাহাকে বিদায় দিবার প্রস্তাব করিয়াছে। দ্বিতীয় স্তরে আশার অনুরোধে মহেন্দ্র অনিচ্ছাতে বিনোদিনীর সঙ্গে আলাপ করিতে রাজি হইয়াছে। আশার বিনোদিনীর প্রতি অনুরোধ কিন্তু বিনোদিনী সরাসরি প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। মহেন্দ্রের সম্মতি ও বিনোদিনীর অসম্মতি উভয়েরমধ্যে চরিত্রের পার্থক্য ও কূটকৌশলের তারতম্যের ইঙ্গিত দিয়াছে। অবশেষে একটা অত্যন্ত স্বচ্ছ ছলনার অন্তরালে উভয়ের প্রথম সাক্ষাৎ ঘটিল এবং বিনোদিনী যেন না জানিয়া ফাঁদে ধরা পড়ার অভিনয় করিল। বিনোদিনীর ছদ্মঘুমন্ত অবস্থায় তাহার ফটো তুলিয়া মহেন্দ্র তাহার আগ্রহের ও বিনোদিনী তাহার চতুর আত্মসংবৃত্তির পরিচয় দিল।

ইহার পর বিনোদিনী-মহেন্দ্রের পরিচয়, আশার উৎসাহে ও বিনোদিনীর প্রখর তত্ত্বাবধানে, ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠ হইতে লাগিল। আশার মূক নিশ্চল প্রেমে বিনোদিনী ভাষাসংযোগ ও গতিসঞ্চার করিল। মূঢ় আশা মনে করিল যে বিনোদিনীর ব-কলমে তাহারই প্রেমনিবেদন সন্তোষজনকভাবে অগ্রসর হইতেছে—সে মহেন্দ্রের উপর উহার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া-বিষয়ে সম্পূর্ণ অচেতন রহিল। মহেন্দ্রের আরাম-স্বাচ্ছন্দ্য ও কর্তব্যনিষ্ঠার দিকে অতন্দ্র দৃষ্টি রাখিয়া বিনোদিনী ক্রমশঃ মহেন্দ্রের নিকট নিজেকে অপরিহার্য করিয়া তুলিল ও তাহার রূপগুণসমৃদ্ধ ব্যক্তিত্বের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধার সঞ্চার করিল।

বিনোদিনীর সহিত মহেন্দ্রের ঘনিষ্ঠতাবৃদ্ধি ও উহার ফলস্বরূপ মহেন্দ্রের মোহগ্রস্ত হইবার পূর্বলক্ষণ বিহারীর স্বচ্ছদৃষ্টির নিকট ক্রমশঃ প্রকট হইল ও সে আশার কল্যাণচিন্তায় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। কিন্তু বিহারীর সন্দিগ্ধ হস্তক্ষেপ মহেন্দ্রের ক্রোধ ও ঈর্ষ্যা উদ্রিক্ত করিয়া তাহাকে বিনোদিনী সম্বন্ধে আরও সচেতন করিল। তাহার মনের গোধূলি-অস্পষ্টতা, শ্রদ্ধা ও সঙ্গ-কামনা হইতে প্রেমের উত্তরের সংশয়িত চেতনা বিহারীর স্পষ্টভাষণের দমকা হাওয়ায় উড়িয়া গিয়া স্পষ্টতর উপলব্ধিতে অঙ্কুরিত হইল। অবচেতন

মনের মাটির তলে আকর্ষণের যে বীজ প্রচ্ছন্ন ছিল, সেই বহিরাবরণ যেন অকালখনিত হইয়া সুপ্ত প্রবৃত্তিকে চেতনলোকে উন্মোচিত হইবার অবসর দিল। মহেন্দ্রের আত্মশ্রেষ্ঠতাবোধ ও বিহারীর প্রতি প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাহার সহজ সত্যদৃষ্টির সহিত মিলিত হইয়া বিনোদিনীর প্রতি মনোভাবের স্বরূপকে অনেকটা অনবগুণ্ঠিত করিল। মানস উত্তেজনা সুখস্বপ্নের মধ্যে কতকটা রূঢ় আঘাত হানিয়া স্বপ্নকে বস্তুজগতের নির্দিষ্টতার সম্মুখীন করিল। বিহারীর প্রতি বিরাগ আরও কিছুটা অগ্রসর হইল। বিহারী-মহেন্দ্রের বন্ধুবিচ্ছেদ বিনোদিনীকে নিজ অবাঞ্ছিত উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তাহাকে বাড়ী ফিরিবার প্রস্তাবে প্রণোদিত করিল। আশা ও মহেন্দ্র উভয়েই বিনোদিনীর উপর অভিমান করিয়া তাহার ছদ্মসঙ্কোচ দূর করিল ও বিনোদিনী যেন তাহাদের আন্তরিকতায় অভিভূত হইয়া সম্মানিত অতিথির আমন্ত্রণে নিজ অনাহূত আগমনের অমর্যাদা সারিয়া লইল। এখন সে স্নেহের অধিকারে, স্বীকৃত আত্মীয়তার দাবীতে মহেন্দ্রের সংসারে শুধু রাজলক্ষ্মীর অনুগ্রহকুণ্ঠিতা পরিচর্যাকারিণীরূপে নয়, মহেন্দ্র-আশার নর্মসহচরীরূপে অন্তরঙ্গতার আসনে অধিষ্ঠিত হইল।

তাহার পরে বিনোদিনী-চিত্তের একটা অপ্রত্যাশিত অধ্যায় দমদমে চড়ুইভাতিকে উপলক্ষ্য করিয়া উদ্‌ঘাটিত হইল। এই আনন্দ-অভিযানে বিনোদিনীর অনিচ্ছা ও শেষ পর্যন্ত তাহারই নির্বন্ধাতিশয্যে বিহারীর অন্তর্ভুক্তি আবার নূতন ত্রিভুজ জটিলতার সূত্রপাত করিল। বিনোদিনী যে মহেন্দ্রের আকর্ষণ বাড়াইবার উদ্দেশ্যে বিহারীর প্রতি পক্ষপাত দেখাইতেছে এই ধারণাই প্রথম পাঠকমনে জন্মে। কিন্তু বিনোদিনীর আদি অভিপ্রায় যাহাই থাকুক, ফলে কিন্তু বিহারীর সহিত তাহার সম্পর্ক শ্রদ্ধায় ও ব্যক্তি-পরিচয়ের মাধ্যমে আরও নিবিড় ও অকৃত্রিম হইয়া উঠিল। বিহারীর কর্মদক্ষতা বিনোদিনীর কর্মদক্ষতার সহিত একটি সহজ মিল খুঁজিয়া পাইল ও আদর্শসাম্যের ভিতর দিয়া পারস্পরিক আকর্ষণ উভয়কে আরও নিকটে টানিল। এই সমপ্রাণতার স্নিগ্ধ অবসরে বিনোদিনীর কামনাতপ্ত যৌবনক্ষুধা নিষ্কলুষ কৈশোর-স্মৃতিচর্যার স্বপ্নমুগ্ধতায় বিলীন হইয়া তাহাকে আসক্তি-মুক্ত করিল। তাহার বাহিরের রুক্ষ, জ্বালাময় আবরণ খুলিয়া পড়িয়া তাহার অন্তরালস্থিত অন্তরের কল্যাণশ্রী উদ্ভাসিত হইল। এই দিনটি বিনোদিনীর আত্মার নবপরিচয়-উন্মেষে তাহার ভবিষ্যৎ ধ্যানমগ্ন তপস্বিনী-মূর্তির একটা

ক্ষণিক পূর্বাভাস বহন করিয়া আনিল। বাগানের আলোছায়াখচিত, জ্যোৎস্নামায়ামণ্ডিত, নিশ্চিন্ত-নিবিড় অবসরের দাক্ষিণ্যবীজিত প্রকৃতি-পরিবেশ এই নির্মল আত্মোপলব্ধির সহায়ক হইয়া বিনোদিনীর দুরন্ত-প্রবৃত্তি-মথিত, অশান্ত চিত্তকে এক নবজন্মের উপকূলে আনিয়া অগাধ শান্তিরসে নিমজ্জিত করিল। কবির স্বতঅনুভব এখানে ঔপন্যাসিকের নিগূঢ় জীবনসমীক্ষার সহিত হাত মিলাইয়া এই ঐন্দ্রজালিক রূপান্তর ঘটাইয়াছে।

চড়ুইভাতের দিনের প্রতিক্রিয়ায় মহেন্দ্রের মনে যে ঝড় উঠিয়াছিল তাহারই সংবেগে তাহার প্রকৃতিতে এক গুরুতর পরিবর্তন দেখা দিল। সে এখন সমস্ত আত্মমর্যাদা ভুলিয়া বিনোদিনীকে জয় করিবার জন্য কোমর বাঁধিল। মাতার রোগকক্ষে সে লুব্ধভাবে বিনোদিনীর অনুসরণ করিয়া তাহার গৌরববোধ ও অবজ্ঞা সমপরিমাণেই উদ্রিক্ত করিল। বিনোদিনীর নিপুণসেবাবঞ্চিত হইয়া সে এখন আশার পরিচর্যার ত্রুটি লইয়া অনুযোগ ও ভৎ‍র্সনা করিয়া সেই অসহায়া বালিকাকে আত্মানুশোচনার কণ্টকবিদ্ধ করিল। ইহারই মধ্যে বিনোদিনীর প্রতি তাহার আসল মনোভাবটি স্পষ্টতর হইয়াছে ও শেষ পর্যন্ত আত্মরক্ষার জন্য সে বাড়ী ছাড়িয়া বাসায় আশ্রয় লইবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছে। মা ও স্ত্রী এই প্রস্তাবকে কিভাবে গ্রহণ করিবে তাহা ভাবার সে প্রয়োজন বোধ করে নাই। সর্বাপেক্ষা তাহার আত্মবিনাশী মূঢ়তা প্রকাশ পাইয়াছে, বিদায়ক্ষণে বিনোদিনীর প্রতি সম্পূর্ণ উপেক্ষাপ্রদর্শনে। ইহাতেই সে তাহার নিজের সর্বনাশকে আরও ত্বরান্বিত করিয়াছে। মা ও স্ত্রীর প্রতিক্রিয়া কিছু অসাধারণ হইবে না ইহা সে জানিত। কিন্তু বিনোদিনীর যে প্রতিক্রিয়া ঘটিল তাহা সেই আত্মাভিমান-অন্ধ যুবকের কল্পনাতেও আসে নাই। মহেন্দ্রের এই চাল ব্যর্থ করিবার জন্য বিনোদিনী যে প্রতিরোধ-অস্ত্র প্রয়োগ করিল তাহা তাহার জটিল, কূটকৌশলী, চরম আঘাতে অকুণ্ঠিত রণনীতির চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত।

চড়ুইভাতের দৃশ্যে তাহার যে স্নিগ্ধ, আত্মবিস্মৃত নারী-প্রকৃতি দেখা গিয়াছিল, মহেন্দ্র-বিদায়ের পর তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত দিকটি হিংস্রমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিল। এই অতর্কিত আঘাতে তাহার আত্মপরিচয়ের যেটুকু অস্পষ্ট ছিল, তাহা তাহার নিজের কাছেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। মহেন্দ্র তাহার বিষবাষ্প-উদ্‌গীরণের একমাত্র আধার, সুতরাং সে তাহার অস্তিত্বের নিকট অত্যাবশ্যক। আশার সঙ্গে ছদ্মসখিত্বের আবরণে তাহার যে অনির্বাণ

ঈর্ষ্যানল জ্বলিতেছিল তাহার দাহজ্বালা তাহার নিকট অনাবৃত হইল। মহেন্দ্রের ও আশার সঙ্গে তাহার সত্য সম্বন্ধ যেন বিদ্যুৎশিখার চোখ-ধাঁধানো আলোয় সংশয়াতীতভাবে নিরূপিত হইয়া গেল। এই মুহূর্তে বিহারীর আশা সম্বন্ধে উদ্বেগপ্রকাশ ও বিনোদিনীকেই তাহার শুভাশুভের ভারসমর্পণ তাহার অন্তরবহ্নিতে শেষ ইন্ধন যোগাইয়া প্রবলতম বিস্ফোরণে উদ্দীপ্ত করিল। বিহারীর দুই ফোঁটা চোখের জলে তাহার জ্বলন্ত দ্বেষ-কটাহ ছাপাইয়া গিয়া তরল আগুন দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িল।

ইতিমধ্যে ছাত্রাবাসপ্রবাসী ও আশার অনুধ্যানে আর্দ্রহৃদয় মহেন্দ্র দুইখানা আশার বে-নামীতে লেখা আপাতনির্দোষ প্রেমপত্রে তীক্ষ্ণ অস্ত্রে বক্ষোভেদের বেদনাবিস্ময় অনুভব করিল। এই পত্রদ্বয় বিনোদিনীর হৃদয়-প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে উত্তপ্ত দুইটি লৌহশলাকার মত মহেন্দ্রের বুকে আমূল বিদ্ধ হইল। অন্তরের উত্তাপ বাহিরে যতটা বিকিরণ করা সম্ভব, ভাষার মাধ্যমে মানসজ্বালা যতদূর সংক্রামণ করা যায়, এই চিঠিগুলি তাহার চরম সীমায় পৌছিয়াছে। বিনোদিনীর মনস্তত্ত্বে কত গভীরভাবে প্রবেশ করিলে, তাহার নাড়ী-নক্ষত্রের কত অন্তরঙ্গ পরিচয় থাকিলে একটা কাল্পনিক মনোভাবকে এরূপ আশ্চর্যভাবে সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত করা যায় এই দুখানি চিঠি তাহারই অপূর্ব দৃষ্টান্ত। চোরের মা-এর অন্তঃরুদ্ধ কান্না হয়ত সাহিত্যে ভাষা পায় নাই, কিন্তু ডাকাতের মা-এর বিনীত প্রার্থনার ছদ্মবেশে যে লুণ্ঠনের নোটিশ অর্ধপ্রচ্ছন্ন থাকে বিনোদিনীর এই চিঠি দুইখানি তাহারই প্রমাণ। স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ না করিলে জোর করিয়া দখল করিব এই ভয়াবহ ইঙ্গিত ইহাদের ছত্রে ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

এই তীক্ষ্ণব্যঞ্জনাময়, গূঢ়ার্থ পত্র দুইখানির আঘাত মহেন্দ্রকে কতকটা বিহ্বল ও কতকটা প্রত্যাশা-উৎফুল্ল করিয়া তাহার পলায়নে আত্মরক্ষার সঙ্কল্প ঘুচাইয়া তাহাকে আবার প্রলোভনকেন্দ্রে আকর্ষণ করিয়া আনিল। সে আশার অন্যায় সন্দেহকে স্নেহ-ভর্ৎসনা জানাইলেও তাহার সহিত প্রণয়-সন্ধি স্থাপন করিয়া তাহার বিবেককে ঘুম পাড়াইল। কিন্তু তাহার গোপন অন্তরে এই বিষামৃতমাখা চিঠি দুইখানির প্রকৃত উৎসের সন্ধান ও আস্বাদগ্রহণের লোলুপতা উদগ্র হইয়া উঠিল। বিনোদিনী কিন্তু আপনাকে ছদ্মবিমুখতার দুর্ভেদ্যবর্মাবৃত করিয়া রাখিল। বরং সে দেশে ফিরিবার জেদ ধরিল। শেষ পর্যন্ত মহেন্দ্রের নিকট প্রণয়ের স্বীকারোক্তি আদায় করিয়াই

সে থাকিবার সম্মতি দিল। মহেন্দ্র কিন্তু সেই অদম্য-আবেগপ্রসূত অনুনয়ের প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করিয়া অনুশোচনায় স্তম্ভিত-নির্বাক হইয়া গেল। তাহার পরমুহূর্তেই সে পূর্ব-অনুরোধ প্রত্যাহার করিয়া বিনোদিনীকে চলিয়া যাইবার স্বাধীনতা দিল। বিজয়োৎফুল্ল বিনোদিনী কিন্তু মহেন্দ্রের আমন্ত্রণকেই আশ্রয় করিয়া তাহার সঙ্কল্প প্রত্যাহার করিল।

এই ২২শ অধ্যায়ে উপন্যাসের কেন্দ্র-জটিলতার কতকগুলি তাৎপর্যপূর্ণ ঘাত-প্রতিঘাতের ফাঁস সংযোজিত হইয়াছে। আশা, বিহারী ও বিনোদিনী সকলেই এই ফাঁস-পাকানোয় অংশ গ্রহণ করিয়াছে। মহেন্দ্র হঠাৎ বিহারীর নিকট অতর্কিতভাবে তাহার হৃদয়োচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়া বিনোদিনীর প্রতি তাহার কলুষিত আকর্ষণের প্রচ্ছন্ন স্বীকারোক্তি করিল। ইহার সঙ্গে সঙ্গেই বিনোদিনীও অকস্মাৎ বিবেক-তাড়িত হইয়া আশার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিহারীর নিকট আশঙ্কা প্রকাশ করিল। বিহারী আশার বিপদসম্ভাবনায় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উচ্ছ্বসিত বিশ্বাসে বিনোদিনীর উপরই আশার শুভানুধ্যানের দায়িত্ব চাপাইল। বিনোদিনী বিহারীর এই উদারতায় গভীরভাবে অভিভূত হইয়া তাহার ছলনার অন্তরালে অকৃত্রিম হৃদয়সত্যের ক্ষণিক পরিচয় পাইল ও উহারই সাময়িক মোহে আশাকে অশ্রুসিক্ত আলিঙ্গনে জড়াইয়া ধরিয়া নিজের অশুভ প্রভাবের ইঙ্গিত দিয়া নিজ হৃদয়ভার লঘু করিল। মুগ্ধা আশা এই নিগূঢ় অন্তর্দ্বন্দ্বের কিছুমাত্র আভাস না পাইয়া বিশ্রব্ধ সখিত্বের স্বচ্ছ সরোবরে গা ডুবাইয়া তৃপ্ত রহিল। বিহারীও বিনোদিনীর দেবীত্বে নিঃসন্দেহ হইয়া নিশ্চিতমনে চলিয়া গেল। অথচ এই আপাত-শান্তির যবনিকার অন্তরালে সর্বনাশের বীজ রোপিত হইল ও রক্তস্রাবী অন্তঃসংঘাতের আয়োজন চলিতে লাগিল। একমাত্র মহেন্দ্রই এই শান্তিবৃত্ত-বহির্ভূত রহিল ও কাকীমাকে দেখিবার অজুহাতে একাকী কাশীযাত্রার প্রস্তাব করিয়া অনিবার্য বিপদের সঙ্কেত ঘোষণা করিল ও তাহার দুশ্চিকিৎস্য মনোবিকারের প্রমাণ দিল। এই নিরাপত্তার জন্য দূরপ্রয়াণ দৈবের পরিহাসে ভবিষ্যৎ বিপদ্‌কে আরও ঘনাইয়া তুলিল। ঔপন্যাসিক ঘটনা-পরিস্থিতি এই অধ্যায়ে জটিলতার ক্রান্তিশীর্ষ আরোহণ করিয়াছে।

৩

ইহার পর মহেন্দ্রের কাশী-যাত্রা ও সেখানে অন্নপূর্ণার স্নেহাশ্রয়ে মনের জ্বালা জুড়াইয়া কলিকাতা-ফেরা। সেখানে অন্নপূর্ণার কল্যাণময় প্রভাবে বিনোদিনী-চিন্তা মহেন্দ্রের মনে সাময়িকভাবে অবদমিত রহিল—তাহার ব্যাধির কথা সে ভুলিয়া গেল। মহেন্দ্র ফিরিবার পর স্বাভাবিক কারণেই আশার মনে তাহার মাসির স্মৃতি প্রবল হইয়া উঠিল ও সে মাসিকে দেখিতে যাইবার ইচ্ছা জানাইল। অনুরূপ সঙ্গত কারণেই মহেন্দ্রের পক্ষে আশার সঙ্গে দ্বিতীয়বার কাশী যাওয়া সম্ভব হইল না। ইতিমধ্যে বিহারীর সন্দেহ উদ্রিক্ত হইয়া সে আশার সঙ্গে বিনোদিনীরও যাওয়ার প্রস্তাব উত্থাপিত করিল। এই সন্দেহে মহেন্দ্রের আত্মাভিমান প্রচণ্ডভাবে ক্ষুব্ধ হইল ও সে বিহারীর বিরুদ্ধে বন্ধুপত্নীর প্রতি অবৈধ ভালবাসা-পোষণের প্রকাশ্য অভিযোগ আনিল। এই গ্লানিকর সন্দেহ-অভিযোগের ফলে বিহারী ও মহেন্দ্রের সম্পর্ক বিষাইয়া উঠিল ও বিহারী প্রবল ধিক্কারে মহেন্দ্রের সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। এদিকে বিনোদিনীর মানস প্রতিক্রিয়া এই ব্যাপারে নূতন জটিলতায় জড়াইয়া পড়িল। মহেন্দ্রের প্রতি তীব্র ঘৃণা ও আশার প্রতি নির্মম ঈর্ষ্যা তাহার অন্তরে দুঃসহ প্রবৃত্তি-তাণ্ডব জাগাইয়া তুলিল। আর লঘুচিত্ত মহেন্দ্র বিনোদিনীর প্রতি উপেক্ষা-ঘোষণার সম্ভাবিত ফলে অস্বস্তির কণ্টকবোধ অনুভব করিতে লাগিল।

এই ঘোষণার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ও বিনোদিনীর প্রেমাস্পদরূপে বিহারীর প্রতি জ্বালাময় ঈর্ষ্যাবশতঃ মহেন্দ্র বিনোদিনীর প্রতি আরও প্রবলভাবে আকৃষ্ট হইল। কিন্তু ইহারই প্রতিষেধকরূপে সে আশাকে প্রেমোচ্ছ্বাসের আতিশয্য ও প্রেমোদ্দীপনের সমস্ত কৌশল দিয়া অবলম্বন করিতে উৎসুক হইয়া উঠিল। বিনোদিনীও আশার প্রতি বিজাতীয় জিঘাংসা ও বিহারীর প্রতি অন্তরনিরুদ্ধ শ্রদ্ধা ও প্রেমের দ্বন্দ্বে কিয়ৎপরিমাণে বিচলিত হইয়া পড়িল। শেষে সে বিহারীকে একখানি সান্ত্বনাদায়ক পত্র দিয়া এই স্নিগ্ধতার আড়ালে অচির-উন্মেষিত প্রণয়াকুলতাকে প্রচ্ছন্ন রাখিবার প্রয়াস পাইল। এই চিঠি উপন্যাসের সংশ্লিষ্ট চরিত্রগুলির ভাগ্যাকাশে নূতন মেঘের সঞ্চার করিল।

প্রথম তীব্র অস্বীকৃতির পর মহেন্দ্রের অভিযোগে যেটুকু সত্য ছিল

বিহারীর ন্যায়নিষ্ঠ মন তাহা মানিয়া না লইয়া পারিল না। সেও মহেন্দ্রের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবার সঙ্কল্প লইয়া মহেন্দ্রের বাড়ী আসিয়াই হঠাৎ একটা অদম্য উচ্ছ্বাসে বিপরীত গতিতে উৎক্ষিপ্ত হইল। সে কলিকাতা ছাড়িয়া একেবারে দূর পশ্চিমে যাত্রা করিল। একমাত্র এই অতর্কিত পরিবর্তনেরই কোন মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয় নাই।

এদিকে বিনোদিনীর চিঠি বিহারীর অনুপস্থিতিতে মহেন্দ্রের হাতে পড়িল ও তাহার প্রকৃতিগত অসংযমের উপলক্ষ্য যোগাইল। সে চিঠিখানি খুলিয়া পড়িল ও বিহারীর প্রতি বিনোদিনীর প্রেম সম্বন্ধে তাহার সংশয় দৃঢ়তর হইল। সে ঈর্ষ্যার জ্বালা রোধ করিতে না পারিয়া বিনোদিনীর প্রতি শ্লেষোক্তি করিয়া আত্মঘাতী মূঢ়তার পরিচয় দিল। বিনোদিনী ফেরত চিঠিখানা বিহারীর অবজ্ঞাসূচক প্রত্যাখ্যানের নিদর্শনরূপে লইয়া আশা ও মহেন্দ্রের প্রতি বিজাতীয় জিঘাংসায় উন্মত্ত হইয়া উঠিল। উভয়ের সর্বনাশ-সাধন সে তাহার জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করিল। তাহার মধ্যে ক্ষুব্ধা পিশাচী উদ্দাম হইয়া উঠিয়া তাহার কল্যাণী-মূর্তিকে সাময়িকভাবে উৎসাদিত করিল। দুর্বলচিত্ত আশা কাশী যাইবে কি না যাইবে তাহা স্থির করিতে না পারায় মহেন্দ্র তাহাকে স্বামীর বিশ্বস্ততায় সন্দেহ পোষণ করিবার কঠিন অভিযোগ করিয়া বসিল এবং এই অভিযোগ-খণ্ডনের জন্যই আশা মহেন্দ্রকে অনুরোধ করিয়া কয়েকদিনের জন্য কাশী গেল ও যাইবার সময় ডাইনীর হাতে পো-সমর্পণের মত মহেন্দ্রের ভার বিনোদিনীর উপর দিয়া গেল। চরিত্রের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটনাকে যে পথে লইয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে নিয়তির পরিহাসকুটিল চক্রান্ত এক অপ্রত্যাশিত কর্মফলের গহ্বর খনন করিল।

আশার কাশীপ্রবাসের কালে আশার দিক হইতে বিশেষ কিছু ঘটে নাই, বিহারীর অকস্মাৎ আবির্ভাব ছাড়া। কিন্তু এই নির্দোষ ও স্নেহকামনা-প্রণোদিত অতিথি-সমাগম আশার সংস্কারাচ্ছন্ন মনে বিহারীর প্রতি এক দারুণ বিতৃষ্ণা উদ্রেক করিয়া অন্নপূর্ণাকে পর্যন্ত বিহারীর দিকে বিমুখ করিয়াছে। এই ভুল বোঝাবুঝিতে বিহারী একটি প্রধান স্নেহাশ্রয় হইতে চ্যুত হইয়াছে। ইহারই প্রবল প্রেরণায় সে মহেন্দ্রের নিকট দোষস্বীকারে প্রণোদিত হইয়া বন্ধুর বাড়ী গিয়া মহেন্দ্র-বিনোদিনীকে এক নিভৃত প্রেম-নিবেদনের লজ্জাকর পরিস্থিতিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছে। এই কুৎসিত দৃশ্যাভিনয়ের দ্রষ্টা রূপে সে এতই অভিভূত হইয়াছে যে বিনোদিনীর কথা

না শুনিয়াই তাহাকে রূঢ়ভাবে ঠেলিয়া দিয়া তাহার রক্তপাত ঘটাইয়াছে। এই কয়দিন মহেন্দ্র বিনোদিনীর নিপুণ পরিচর্যা ও সরস সাহচর্যে মুগ্ধ হইয়া ও তাহার সংযমে ধৈর্যচ্যুত হইয়া আশা-বঞ্চনার দ্বন্দ্বে আন্দোলিত হইতেছিল, এই অসংবরণীয় মোহাকর্ষণের মধ্যে তাহার কর্তব্যবুদ্ধি ও ধর্মনীতিকে প্রাণপণ চেষ্টায় জাগ্রত করিতেছিল। বিহারীর এই রূঢ় আঘাতে বিনোদিনীর আত্মদমনের বাঁধ টুটিয়া গিয়াছে ও সে প্রকাশুভাবে মহেন্দ্রের প্রণয়কে স্বীকৃতি দিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে মহেন্দ্রেরও ক্ষীণ আত্মসংবরণপ্রয়াস ধূলিসাৎ হইয়া সে মনের লাগাম ছাড়িয়াছে। যেখানেই মানস-সংঘাত একটা চরম সিদ্ধান্তকে সম্ভাবিত করিয়াছে, সেইখানেই দৈব আসিয়া ঘটনার মধ্যে দ্রুততর গতি ও পরিণতির অনিবার্যতা সঞ্চার করিয়াছে। বিনোদিনীর ছলনাময় প্রতীক্ষা ও মহেন্দ্রের অসংযমপ্রবণতার দ্বারা ক্ষণ-বিলম্বিত পরাজয় দৈব সহযোগিতায় স্বভাবমন্থরতার ছন্দ হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়া ক্ষিপ্র বেগে সর্বনাশা পরিণামমুখী হইয়াছে।

বিনোদিনীর অকুণ্ঠ প্রেমস্বীকৃতির পর মহেন্দ্রের মনে হইল যে চিত্তজয় সম্পূর্ণ হইয়াছে, এখন কেবল অনুকূল অবসরের প্রতীক্ষা ও মিলনের উপলক্ষ্যসৃষ্টি তাহার মনোবাঞ্ছাপূরণের ঈপ্সিত ফল যোগাইবে। রাজলক্ষ্মীও অন্ধভাবে বিনোদিনী-মহেন্দ্রের এই ঘনিষ্ঠ সাহচর্যের পোষকতা করিয়াছে। কিন্তু বিনোদিনীর দিক্ দিয়া এই আত্মসমর্পণ যে সূক্ষ্মপ্রতিরোধবিঘ্নিত, তাহা আবেশোন্মত্ত মহেন্দ্রের বোধগম্য হয় নাই। তাহার মনের গতি যে অত্যন্ত জটিল, তাহা মহেন্দ্রের মত একমুখী আবেগচালিত নয়, সে যে মহেন্দ্রকে শিখণ্ডী করিয়া বিহারীকেই শরবিদ্ধ করিতে চাহে, ছলনাময়ী নারীপ্রকৃতির এই কূটনীতি বেচারা মহেন্দ্রের স্থূল দৃষ্টিতে ধরা পড়ে নাই। মুখের 'হাঁ'র সঙ্গে যে মনের 'না' সহাবস্থান করিতে পারে, মনস্তত্ত্বের এই সূক্ষ্ম সমস্যা তাহার অজানা ছিল। কাজেই ইহার পরবর্তী স্তরে মহেন্দ্রের অনুসরণলোলুপতা ও বিনোদিনীর এড়াইবার কৌশল মহেন্দ্র-বিনোদিনী-সম্পর্কের নূতন ছন্দ রচনা করিল। ইতিমধ্যে আশা মাসির আশীর্বাদ ও জীবনদর্শন হইতে নূতন শান্তি ও চিত্তপ্রসাদের সঞ্চয় লইয়া কাশী হইতে ফিরিল।

আশার প্রত্যাবর্তনের পর মহেন্দ্র তাহার সহিত সহজ মিলনের পথে একটা অপরাধবোধজাত কুণ্ঠা অনুভব করিল। তাহার সততা তাহাকে

কৃত্রিম প্রণয়োচ্ছ্বাসের ছলনাশ্রয়ে বাধা দিল। বেচারী আশা চিরাভ্যস্ত দাম্পত্য প্রেমের পরাজয়-লজ্জায় মূঢ় বিহ্বলের মত অজ্ঞাত আশঙ্কায় ও আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হইতে লাগিল। বিনোদিনী-স্মৃতি-বিভোর মহেন্দ্র আত্মদোষক্ষালনের জন্য কুযুক্তির জাল বুনিয়া অবশেষে আশার প্রতি কর্তব্য ও বিনোদিনীর প্রতি প্রণয়াবেগের মধ্যে একটি আপসসন্ধি খাড়া করিল ও নিজেকে দুইচন্দ্রসেবিত গ্রহের মত প্রখরজ্যোতিঃঝলসিত কল্পনা করিয়া অনুতাপের পরিবর্তে গৌরববোধে উৎফুল্ল হইল। এই সিদ্ধান্তের পর তাহার দুর্নিবার বাসনা সমস্ত শিষ্টাচারের বাঁধ ভাঙ্গিয়া বিনোদিনীর শয্যাপার্শ্বে তাহাকে অভিসারী করিল ও রাজলক্ষ্মীর নিকটও তাহার লুব্ধ অসংযম গোপন রহিল না। এইখান হইতে মহেন্দ্রের বহিরাচরণ সমস্ত গোপনতা ছাড়িয়া, মনোলোকের সমস্ত অদৃশ্য গোপন সঞ্চরণকে প্রত্যাখ্যান করিয়া উদ্দাম গতিতে স্পর্ধিত বিদ্রোহে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এখন সমস্ত মনস্তত্ত্ব আশা ও বিনোদিনীর সত্তাকে আশ্রয় করিয়াছে—মহেন্দ্র এখন খোলাখুলি প্রবৃত্তির দাসরূপে আত্মপরিচয় দিয়াছে। মহেন্দ্রের উন্মত্ত নৈশ অভিসারে বিনোদিনীর প্রতিক্রিয়া তাহার ধিক্কারপত্রে জানা গিয়াছে ও সেই চিঠিখানা পাঠের ফলে আশার যে প্রবল ভাববিপর্যয়, ভূমিকম্পের মত তাহার মানসসংস্কার যে সামগ্রিক বিদারণ-বেদনা তাহাও পরিস্ফুট হইয়াছে। ইহারই আঘাতে বিনোদিনী-সম্পর্কে আশার অভাবনীয় মোহভঙ্গ ঘটিয়াছে ও তজ্জনিত বিনোদিনীর আশার উপর প্রতিহিংসা-সঙ্কল্পের দৃঢ়তা অব্যবহিত ফলরূপে দেখা দিয়াছে।

ইহার পরে মানস ভূকম্পনের কেন্দ্রবিন্দু মহেন্দ্র-বিনোদিনী হইতে আশা-রাজলক্ষ্মীর ও অংশতঃ বিহারীর উপর অপসারিত হইয়াছে। এই ধূমকেতুর পুচ্ছপ্রহারে রাজলক্ষ্মী ও বিনোদিনীর মধ্যে মহেন্দ্রের উপর ছলনাজালবিস্তারে যে ষড়যন্ত্রমূলক সহযোগিতা ছিল তাহার মুখোস খসিয়া গিয়া বীভৎস সত্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে। বধূর প্রতি দীর্ঘসঞ্চিত ঈর্ষ্যা যে মাতৃস্নেহের মূলে বিষসঞ্চার করিয়া বধূর প্রতি অতি-আসক্ত পুত্রের অধঃপতনে প্রশ্রয় দিতে পারে মানবমনের এই কুৎসিত বিকারটি সমস্ত শোভনতার আবরণ ভেদ করিয়া নিজ অস্তিত্ব ঘোষণা করিয়াছে। বিনোদিনী ও রাজলক্ষ্মী পরস্পরের মনের এই গোপন দুর্বলতার সন্ধান পাইয়াছে। উপন্যাসে এইটিই সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক উপলব্ধি—অবচেতনের

গুহা হইতে চেতনার সমতলভূমিতে উদ্ভাসন। সকলের নিঃশব্দ অবজ্ঞায় দগ্ধ হইয়া বিনোদিনী মহেন্দ্রের ভীরুতার উপর অসহনীয় রোষের বিদ্যুৎ হানিয়াছে ও স্পর্ধিত বিদ্রোহে মহেন্দ্রের গৃহত্যাগের প্রস্তাব রাজলক্ষীর সামনেই প্রণয়ীর প্রসারিত বাহু-অবলম্বনে স্বীকার করিয়া লইয়াছে। এইখানেই মানসম্ভ্রমের প্রতি লোকদেখানো আনুগত্যের পালা শেষ হইল—অবৈধ আকর্ষণ প্রলয়ঙ্কর মূর্তিতে দেখা দিল।)

বিহারীর প্রতিক্রিয়া আরও নিগূঢ়তর, অন্তর্মুখীন রূপ লইয়াছে। বিনোদিনী মহেন্দ্রের সঙ্গে নিজ ভাগ্যকে চিরতরে জড়িত করার প্রাক্-মুহূর্তে বিহারীর বিশ্রব্ধ আশ্রয়ের জন্য শেষ প্রাণান্তিক চেষ্টায় ব্রতী হইয়াছে। মহেন্দ্রের ক্লেদাক্ত কামনা-পাশ হইতে মুক্তিলাভের আশায় সে মজ্জমান ব্যক্তির তৃণ-অবলম্বনের ন্যায় বাঁচিবার করুণ মিনতি বিহারীকে জানাইয়াছে। বিহারীর মনে এই প্রথম অন্তর্দ্বন্দ্ব অনুভূত হইয়াছে। সে প্রচণ্ড আত্মসংযমে বিনোদিনীর দুর্বার আত্মনিবেদনের আবেগ ঠেকাইয়াছে ও কঠোর বিচারে তাহার প্রণয়তৃষ্ণার ন্যায্যতা ও তাহার সহানুভূতির দাবী খণ্ডন করিয়াছে। তাহার অপরাধ তাহার কাছে বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় পায় নাই, বরং উহা আবেগলেশহীন ধিক্কারে নিন্দিত হইয়াছে। সে বিনোদিনীর নির্লজ্জ আচরণকে, অনিবার্য হৃদয়াবেগের অজুহাতকে একেবারে আমল না দিয়া অন্তরের স্বার্থপরতা ও স্থূল কামনার পর্যায়ে ফেলিয়াছে ও তাহার সহানুভূতি-যাচ্ঞা ও তাহার প্রেমখিন্না নায়িকারূপে আত্মপরিচয় অতি-নাটকীয় অভিনয় বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। শেষ পর্যন্ত সে গৃহীত অর্ঘ্যের স্বীকৃতিরূপ বিনোদিনীর উদ্যত চুম্বন-নিবেদন অগ্রাহ্য করিয়া তাহাকে পল্লীবাসের নির্বাসনে পাঠাইয়া ক্ষান্ত হইয়াছে।

কিন্তু ব্যাপারটির এত সরাসরি নিষ্পত্তি হইল না। দেহ যাহা প্রত্যাখ্যান করিল, মন তাহাকেই গ্রহণ করিয়া তাহার চারিদিকে মুগ্ধ কল্পনার জাল বয়ন করিল। বহির্জীবনে যাহা পরিত্যক্ত, অন্তর্জীবনে তাহাই স্মৃতিরোমন্থন-রূপে অক্ষয় পরমায়ু লাভ করিল, তাহাই নির্জন আত্মবিচারণায় অবিরল পুলকরোমাঞ্চ জাগাইয়া তুলিল। বিহারীর মনোলোকে এক অভিনব চেতনা উদ্বুদ্ধ হইল, সে প্রথম প্রেমের অনির্বচনীয় আস্বাদ-অনুভবে বিহ্বল হইয়া উঠিল। তাহার বহির্মুখী, সংসারনিষ্ঠ, বন্ধুবৎসল, আত্মচেতনাহীন জীবন সহসা এক নূতন অনুভূতি-কেন্দ্র খুঁজিয়া পাইল। বিহারী পরনির্ভর জীবনের

গ্লানি কাটাইয়া এক নব অস্তিত্বের অরুণালোকে জ্যোতির্ময় ও মর্যাদাপূর্ণ অস্তিত্বে স্বপ্রতিষ্ঠিত হইল। বিহারীর এই উপগ্রহত্ব হইতে স্বতন্ত্র গ্রহে উন্নয়ন উপন্যাসের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ও তাৎপর্যময় উন্মেষ। ইহার পর তাহার অবশিষ্ট জীবনযাত্রা কেবল তাহার এই নবচেতনার অনুসিদ্ধান্ত (corollary)-রূপে আরব্ধ ব্রতের উদ্‌যাপন। ইহাই তাহার ভাবজীবনের চরম পরিণতি ও মনস্তত্ত্ববিদের নিকট এই তাহার শেষ পরিচয়।

ইহার পর মহেন্দ্র-বিনোদিনীর মধ্যে উন্মুখতা-বিমুখতার লীলা পূর্ব-নির্ধারিত পথ অনুসরণ করিয়াই চলিয়াছে। নূতন প্রতিক্রিয়ার মধ্যে বিনোদিনীর বিহারীধ্যানতন্ময়তার জন্য একরূপ তপঃকৃশ, দিব্যআভা-বিভাসিত মূর্তি ফুটিয়া উঠিয়া তাহার ত্যাগবৈরাগ্যদীপ্ত তপস্বিনী-পরিণতির পূর্বাভাস দিয়াছে। আর তাহার খামখেয়ালী তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যতাসূচক আচরণে মহেন্দ্রের মনে বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ মাঝে মাঝে প্রজ্বলিত ও তাহার আত্মমর্যাদাবোধ ক্ষণে ক্ষণে উদ্দীপ্ত হইয়াছে। তাহার শেষ মুক্তি যে এই আত্মধিক্কারের উপলব্ধি ও মর্যাদাবোধের পুনরুজ্জীবনের পথ ধরিয়াই আসিবে তাহারও সূচনাসঙ্কেত মিলিয়াছে। কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা ও পরিবর্তনের স্ফুটতর লক্ষণ আশা ও রাজলক্ষ্মীর চরিত্র-অবলম্বনেই অভিব্যক্তি পাইয়াছে। মহেন্দ্রকে বিনোদিনী তাহার সমস্ত লজ্জার বোঝা ও কলঙ্কের কালি লইয়া তাহার শতস্মৃতিজড়িত পারিবারিক পরিমণ্ডলেই নির্বাসনে পাঠাইয়াছে। এই সাতদিনের স্বগৃহপ্রবাসে কতকগুলি কৌতূহলজনক মানসক্রিয়া ঘটিয়াছে। প্রথমতঃ আশা ও মহেন্দ্রের দাম্পত্য সম্পর্কটি উহার সহজ ছন্দটি হারাইয়া একটা অস্বাভাবিক বাধা-সঙ্কোচের জালে জড়াইয়া পড়িয়াছে—সোজা রাস্তা কতকগুলি দুর্ভেদ্য গোলকধাঁধার প্যাঁচে দিশা হারাইয়াছে। রাজলক্ষ্মী বধূর প্রতি সমস্ত বিদ্বেষ ভুলিয়া ছেলেকে বাঁধিয়া রাখিবার একমাত্র উপায়রূপে সেই বধূর আকর্ষণশক্তির উপর ব্যাকুল নির্ভরশীলতা দেখাইয়াছে। আত্মপ্রীতি ও সন্তানবাৎসল্যের আতিশয্যে অন্ধ জননী নিজের বিরাট ভ্রম বুঝিয়া প্রতিকারের আশায় অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। হতভাগিনী ভাবে নাই যে আশা-মহেন্দ্রের দাম্পত্যকূজননিবিড় স্বপ্নবিলাসনীড়কে বিধ্বস্ত করিবার জন্য সে যে উৎকট বিস্ফোরকের প্রয়োগ করিয়াছিল তাহা সমস্ত পরিবারের ভিত্তিকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া সমগ্র গোষ্ঠীজীবনেই বিপর্যয় আনিবে। সে মনে করিয়াছিল যে বধূর একচ্ছত্র-অধিকার মুক্ত হইলেই পুত্র আবার পূর্বের মত

মাতার প্রশ্রয়াঞ্চলেই ফিরিয়া আসিবে। যে পাখী একবার পারিবারিক স্নেহশিকল কাটিয়াছে যে সে মাতৃকর্তৃত্বের দাঁড়ে ফিরিবার জন্য ব্যস্ত নয়, সে যে উচ্ছৃঙ্খলতার মুক্ত আকাশে উধাও হইয়া যাইবে এই স্বাভাবিক সম্ভাবনা সেই অদূরদর্শিনীর মনে উদিত হয় নাই। সুতরাং এই নূতন অভিজ্ঞতার চাপে আশার সঙ্গে তাহার সম্বন্ধের একটি সম্পূর্ণ বিপরীত পরিবর্তন ঘটিয়াছে।

(কিন্তু সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ রূপান্তর ঘটিয়াছে আশার চরিত্রে। দুঃখের আগুনে পুড়িয়া ও মনোবেদনার হাতুড়িতে ঘা খাইয়া নরম লৌহকণা দৃঢ় ইস্পাতে পরিণত হইয়াছে। মুগ্ধা, পরনির্ভরা বালিকা বধূ এই বেদনাময় অনুভূতির উত্তাপে সহসা গৃহিণীর আত্মপ্রত্যয় ও দায়িত্বজ্ঞানে পরিপক্বতা লাভ করিয়াছে। রাজলক্ষ্মীর অসুখ উপলক্ষ্যে সেবাশুশ্রূষা ও তত্ত্বাবধানের বিষয়ে সে মহেন্দ্রের প্রতি অসঙ্কোচ নির্দেশদানের সাহস অর্জন করিয়াছে ও স্পষ্টভাষায় তাহার আচরণের সমালোচনা করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। মহেন্দ্রের খেলার পুতুল ও আদরের কাঙাল আশা এখন তাহার সহিত সমকক্ষতার আসনে স্থান গ্রহণ করিয়াছে। সমাজজীবনের সমস্ত সম্পর্ককে সে নূতন দৃষ্টি দিয়া দেখিতে ও বিচার করিতে শিখিয়াছে। উপন্যাসের শেষে যখন মহেন্দ্রের সহিত তাহার পুনর্মিলন ঘটিল, তখন স্বপ্নময় ভাবোচ্ছ্বাসের উপর নয়, পরন্তু পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সত্যদৃষ্টির ভিত্তির উপর এই মিলনসৌধ রচিত হইয়াছে। চোখের বালির সহিত খেলাঘরের সখিত্ব পরিপূর্ণ সংসার-জ্ঞান, উদারতা ও অধিকারবোধের দ্বারা সংশোধিত হইয়া এক নূতন সম্পর্ক-দৃঢ়তার বৃন্তে ফুটিয়াছে।

পরবর্তীকালে আখ্যান-অংশে ঘটনার আর কোন নূতন বীজ রোপিত হয় নাই, যাহা ঘটিয়াছে তাহার পরিণত ফল-আস্বাদনের পালা আসিয়াছে। আশার পত্রে অন্নপূর্ণা কাশী হইতে ফিরিয়া মরণাপন্ন রাজলক্ষ্মী ও শ্রীহীন, দাম্পত্যস্বর্গচ্যুত সংসারে শান্তি ও কল্যাণের আশ্বাসসহ পুনঃপ্রবেশ করিয়াছে। এই মৃত্যুকালীন পারিবারিক মিলনে অনিবার্যভাবে বিহারীরও ডাক পড়িল ও সেও বিপথগামী মহেন্দ্রকে ফিরাইয়া আনিবার ব্রত লইয়া অপরাধীযুগলের খোঁজে পশ্চিম যাত্রা করিল। অন্নপূর্ণার সহিত সাক্ষাতের পূর্বে বালির বাগানবাড়িতে আশ্রয়প্রাপ্ত বিহারীর অন্তর্জগতের মায়াময় রূপান্তরের ইতিহাসটি লেখক অপূর্ব ব্যঞ্জনাময় ভাষায় ও প্রকৃতিসৌন্দর্যের

নিবিড় ইন্দ্রজালসঞ্চারে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এই সমস্ত মুহূর্তে কবি রবীন্দ্রনাথ ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের আনুগত্য স্বীকার করিয়া তাহারই মুখ্য উদ্দেশ্যসাধনে নিজ সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ও কল্পনাকুহক অতি সার্থকভাবে নিয়োজিত করিয়াছেন। কবি ঔপন্যাসিকের প্রতিদ্বন্দ্বী হইলে উপন্যাসরস পূর্ণবিকশিত হইতে পারে না, কিন্তু তিনি যদি ঔপন্যাসিকের নিয়ন্ত্রণে নিজ যাদুশক্তির প্রয়োগ করিতে রাজি হন, তবে মণিকাঞ্চনযোগের মত এক দুর্লভ সমন্বয় আমাদের অপরূপ রসতৃপ্তির আস্বাদ দিতে পারে। রাজলক্ষ্মীর রোগশয্যার পার্শ্বে আশা ও বিহারীর সহজ প্রীতিসম্পর্কটি অনায়াসে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রোগের আশ্চর্য সমীকরণশক্তি মহেন্দ্রের সংসারের স্বাভাবিক ছন্দটি পুনরুদ্ধার করিয়া উহার গভীর ক্ষতটি নিরাময় করিবার আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়াছে।

ইহার পূর্বে মহেন্দ্র-বিনোদিনীর প্রেমহীন, আকর্ষণ-বিকর্ষণের অশ্রান্ত ঘাত-প্রতিঘাতে নিষ্ঠুর ও গ্লানিকর প্রবাস-কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। এই নিরানন্দ, প্রতিদিনের সঞ্চিত বিরাগে তিক্ত, হৃদয়-মন্থনের প্রচণ্ডতায় বিষময় যাত্রার শেষ হইয়াছে বিহারীর স্মৃতিচিহ্নাঙ্কিত, প্রিয়মিলনের আশাকল্পনা-রোমাঞ্চিত যমুনাতটের উদ্যানবাড়ীতে। একপক্ষের গূঢ় ইচ্ছার অমোঘ প্রেরণায় ও অপরের অসহায় অনুসরণে যে মানস অভিসারের গতিপথ নিরূপিত হইতেছিল, তাহা এই সঙ্কেতকুঞ্জে আসিয়াই শেষ হইল। এখানে বিনোদিনী বিহারীর একটা কিছু সত্তা-সৌরভের আভাস পাইয়া প্রাণপণ শক্তিতে উহাকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়া অতল শূন্যতার মধ্যে আশ্রয় পাইল ও ধ্যানতন্ময়তার যোগে তাহার চির-অতৃপ্ত প্রেমাকৃতিকে রূপ দিবার তপস্যায় মগ্ন হইল। ঠিক এই ক্রান্তিলগ্নে মহেন্দ্রেরও ধৈর্য নিঃশেষিত হইয়া তাহার চৈতন্য-সঞ্চার ও আত্মগৌরবের স্ফুরণ ঘটিল। আশ্চর্য যে একই দৃশ্যে ও একই দিনে নায়ক-নায়িকার যুগপৎ আত্মিক রূপান্তর সাধিত হইল। মহেন্দ্র তাহার দুর্নিবার লালসার ক্লেদাক্ত বন্ধন হইতে মুক্তি পাইল। বিনোদিনী তাহার অকৃতার্থ প্রেমের মর্মজ্বালাকে দিব্যচেতনার রসলোকে উত্তীর্ণ করিয়া পরম শান্তি-লাভে ধন্য হইল। অন্য চরিত্রগুলির শান্তি ও সান্ত্বনা স্বভাবধর্মেই আসিয়াছে ও সকলের পুনর্মিলনের আনন্দময় পরিণতিতে. বিধ্বস্ত সংসারের ভারসাম্যের পুনরুদ্ধারে উপন্যাস-ঘটনার উপর যবনিকাপাত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ অতি সহজ নৈপুণ্যের সহিত দৈবাহত পরিবারের

উপর প্রসন্ন কল্যাণশ্রীর আশীষধারা বর্ষণ করিয়াছেন। দ্বন্দ্বজটিল কাহিনীকে রূপকথাসুলভ, মনখুশীকরা সমাপ্তিতে সংহরণ করিয়াও তিনি কোথাও কল্পনাবিলাসের প্রশ্রয়দান বা মনস্তত্ত্বের নিয়মনিয়ন্ত্রিত সীমালঙ্ঘন করেন নাই।

৪

এই সাধারণ ঘটনাসমীক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে মহেন্দ্র-বিনোদিনীর চিত্ত-পরিবর্তনের ছন্দোসমতা ও সঙ্গতি বিশেষভাবে অনুধাবনের যোগ্য। কাহিনীর অগ্রগতি যত্নপূর্বক অনুসরণ করিলে হয়ত ইহার অপরিহার্যতায় একটু সংশয় জাগা অযৌক্তিক নয়। মনে হইতে পারে যে লেখক জট-পাকাইতে, দুশ্ছেদ্য-সূত্রজালবয়নে যেরূপ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন, হৃদয়াকর্ষণের ক্রমপর্যায়গুলি যেরূপ সূক্ষ্ম ও অভ্রান্তভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন, জট ছাড়াইবার সময় সেইরূপ মনোবিজ্ঞানসম্মত অকাট্য উপায় অবলম্বন করেন নাই। দীর্ঘদিন ধরিয়া মনের নানা খুঁটি-নাটি প্রবৃত্তির আশ্রয়ে, আত্মবঞ্চনা ও অন্তর্দ্বন্দ্বের নানা তির্যক উদ্ভাসনের গূঢ় সংকেত-অনুসরণে তিনি যে জটিলতত্ত্বনির্মিত জাল গড়িয়া তুলিয়াছেন, মোচনের সময় মন্ত্রপূত অস্ত্রের এক আঘাতে তাহাকে ছিন্ন করিয়াছেন। মানবাত্মার বন্দিত্ব মন্থরগতি, কালে ও স্থানে সুদূর-ব্যাপ্ত ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার সমবায়িক প্রভাবের ফল, উহা হইতে মুক্তি দৈবানুগ্রহে নিমেষ-লব্ধ। এ যেন লৌকিক রোগের অলৌকিক চিকিৎসা। হয়ত এরূপ সংশয় সম্পূর্ণ অমূলক নয়, কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই রোগ ও রোগমুক্তি এক মানদণ্ডে বিচার্য হয় না। ব্যাধির লক্ষণ যত উৎকট-ভাবে আত্মপ্রকাশ করে, আরোগ্যের সঞ্চার তাহার তুলনায় অনেকটা অন্তর্গূঢ়, এতটা স্পষ্টভাবে বহির্লক্ষণচিহ্নিত নয়। ক্ষতের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা চলে, ক্ষত-নিরাময়ের প্রক্রিয়া দেহের প্রাণকোষের অন্তরালশায়ী ও জীবনীশক্তির প্রবাহ-তলে অর্ধপ্রচ্ছন্ন। তাই মহেন্দ্রের পতন যত সূক্ষ্মভাবে পরিকল্পিত ও উপস্থাপিত, তাহার উদ্ধার তাহার তুলনায় কিছুটা আকস্মিক বোধ হয়। মহেন্দ্র ও বিনোদিনী পরস্পরকে চাহিয়াছিল দুর্বার প্রেমের প্রেরণায় নয়, অধিকার-প্রতিষ্ঠার অহমিকার তাড়নায়। বিশেষতঃ মহেন্দ্রের ক্ষেত্রে এই আত্মাভিমান, আত্মশ্রেষ্ঠত্বের তৃপ্তি তাহার উদাসীন চিত্তকে বিনোদিনীর প্রতি আকর্ষণ

করিয়াছিল ও বিহারীর সঙ্গে প্রতিযোগিতার আক্রোশই তাহার এই কামনাকে আত্মঘাতী উদ্বন্ধন-ফাঁসের দুচ্ছেদ্যতা দিয়াছিল। বিহারী মাঝখানে না থাকিলে মহেন্দ্রের মোহ হয়ত ঈষত্তপ্ত ভাববিলাস পর্যন্ত পৌঁছিয়াই ক্ষান্ত হইত, সমস্ত সংসারকে আঘাত করিবার স্পর্ধিত দুঃসাহস অর্জন করিত না। আত্মাভিমানে যাহার সূচনা, আত্মাভিমানের প্রতি প্রচণ্ড ও পৌনঃপুনিক আঘাতেই সেই মোহস্বপ্নের অবসান। রোগ ও উহার ঔষধ একই ধাতুতে নির্মিত। বিনোদিনীর উপেক্ষায় ও অপমানে মহেন্দ্রের ধৈর্যচ্যুতির প্রকাশ আগেই ঘটিয়াছিল। এলাহাবাদে শাশ্বত প্রেমের ভাবাসঙ্গমধুর, জ্যোৎস্নাবিহ্বল, পুষ্পগন্ধে মদির উদ্যানবাটিকায় পুষ্পাভরণা, ভাবতন্ময়া বিনোদিনীর উদ্দেশ্যে নিবেদিত বিহারীর প্রেমার্ঘ্যসম্ভার সেই স্বপ্নমরীচিকাকে নিদারুণ পরিহাসের আঘাতে নির্মূল করিয়া মহেন্দ্রের মোহমুক্তিকে পরদিন প্রভাতে জাগরণের সহিত অনিবার্যভাবে সংযুক্ত করিল। এইভাবে মহেন্দ্রের গ্রন্থিমোচনের স্বাভাবিকতা বিশ্লেষণের দিক দিয়া নয়, হঠাৎ-স্ফুরিত, গূঢ়সঞ্চারী ভাবানুভূতির কল্পনালোকে উদ্ভাসিত হইয়াছে। এখানে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের বহুনিন্দিত তথ্যভারমুক্ত সাঙ্কেতিক রীতিরই শরণাপন্ন হইয়াছেন।

বিনোদিনীর পরিবর্তন নিগূঢ়তর হইলেও পূর্ব-আভাসিত। তাহার ঈর্ষ্যাতাপক্লিষ্ট মনোমরুভূমিতে, সেবাতৎপর, আত্মদানোন্মুখ নারীপ্রকৃতির একটি স্নিগ্ধ নির্ঝর প্রবাহিত ছিল। তাহার বঞ্চিত যৌবন নিঃসঙ্গ পল্লীজীবনে যে দুঃসহ ক্ষোভ সঞ্চয় করিয়াছিল, তাহাই মহেন্দ্রের সংসারের অতিথিরূপে প্রবেশ করার পর প্রথম প্রথম নিঃস্বার্থ সেবা ও সংসারপরিচালনার দায়িত্বভারের শান্ত প্রণালী বাহিয়া সান্ত্বনা খুঁজিতেছিল। এই কষ্টনিরুদ্ধ ভোগলিপ্সার মধ্যে আশা-মহেন্দ্রের প্রণয়োচ্ছ্বাসের অশোভন মত্ততা, আশার একান্ত ছেলেমানুষী ও মহেন্দ্রের লুব্ধ, স্বার্থসর্বস্ব ভোগাসক্তি বিনোদিনীকে ক্ষোভ ও ঈর্ষ্যার নূতন ইন্ধন জোগাইয়া তাহার মনকে ক্রূর সঙ্কল্পে উদ্দীপ্ত করিল। ইহার উপর রাজলক্ষ্মীর প্রশ্রয়ে যখন মহেন্দ্রের পরিচর্যাভার অপটু আশার হাত হইতে স্খলিত হইয়া তাহার উপরই সমর্পিত হইল, তখন তাহার ঈর্ষ্যা প্রতিদিনের খাদ্য পাইয়া আরও উদ্দাম হইয়া উঠিল। ইহার উপর মহেন্দ্রের নির্লিপ্ত ঔদাসীন্য যুক্ত হইয়া ঈর্ষ্যানলে ঘৃতাহুতি দিল, ভাগ্যবঞ্চিতা, অন্তর্দাহনক্লিষ্টা নারী-ছলনাময়ী-

মোহিনীরূপে প্রতিঘাতের জন্য উদ্যতাস্ত্র হইয়া উঠিল। ভাববুদ্‌বুদস্ফীত প্রেমের এই তাসের ঘর ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য, বিধাতার এই পক্ষপাতমূলক সৌভাগ্যবিধানের ক্ষণভঙ্গুরতা প্রমাণ করিবার জন্য, তাহার সমস্ত অন্তরাত্মা বিদ্রোহে উত্তেজিত হইল। মহেন্দ্রের বিমুখতাজয় ও আশার অযোগ্যতা উদ্‌ঘাটন করিবার জন্য এই চতুরা, দৃঢ়সংকল্পা মায়াবিনী এক অতি কৌশলময় রণনীতি উদ্ভাবন করিল। এই শক্রব্যূহে বিহারীর অনুপ্রবেশ তাহার মনে আরও জটিল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়া তাহার প্রতিহিংসাসঙ্কল্পকে অনমনীয় করিয়া তুলিল। বিহারী তাহাকে দূর হইতে শ্রদ্ধা ও সৌজন্য দেখায়, অথচ আশার প্রতি সে প্রকৃত শুভেচ্ছা ও অনুরাগ পোষণ করে— বিহারীর এই আচরণ-বৈষম্য তাহার ক্ষোভকে আরও দুঃসহ করিল। বিহারীর কাছেই সে অন্তর-কপাট ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়াছে, তাহার অতৃপ্ত যৌবনজ্বালার পিছনে যে বাল্যস্মৃতিমুগ্ধ, প্রীতিস্নিগ্ধ কিশোরীচিত্ত আত্মগোপন করিয়াছিল তাহার অস্তিত্ব ক্ষণিকের জন্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। বিনোদিনীর সম্পূর্ণ পরিচয় এক বিহারীই জানিয়াছে ও এই পরিচয়েই উভয়ের মধ্যে এক অদৃশ্য যোগসূত্র রচিত হইয়াছে। এক বিশেষ অধিকারবোধ জাগিয়াছে বিহারীর আচরণে অন্তরঙ্গতার অভাব বিনোদিনীর শূন্যতার জ্বালাকে আরও দুর্বিষহ করিয়াছে। এই সমস্ত ছোট-বড়, প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষ কারণ মিলিয়া বিনোদিনীর চক্রান্তে নূতন নূতন গ্রন্থি পাকাইয়াছে, নূতন নূতন কূটকৌশল ও ক্রূর সঙ্কল্পের ফাঁস জুড়িয়াছে।

বিনোদিনী অতি সামান্য প্রয়াসে মহেন্দ্রের ঔদাসীন্য প্রতিহত করিয়া তাহাকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছে। এই আকর্ষণ ঘনিষ্ঠতার স্বল্প প্রয়াসেই, মেলা-মেশার সামান্য উত্তাপেই, উষ্ণতর তাপমাত্রায় পৌঁছিয়াছে। এখনও যদি মহেন্দ্র বিনোদিনীর শ্রেষ্ঠত্ব মানিয়া লইয়া তাহার নিকট নির্বিচারে আত্মসমর্পণ করিত, তাহা হইলে বিনোদিনীর প্রতিক্রিয়া খুব সম্ভবতঃ নিরুত্তাপ ও নির্দোষ আত্মীয়তার গণ্ডীতেই সীমাবদ্ধ থাকিত, দেওর-ভাজের সরস সম্পর্কের রেখা অতিক্রম করিত না। কিন্তু দুর্বুদ্ধি মহেন্দ্র প্রতিরোধ করিতে গিয়াই আক্রমণের তীব্রতাকে আরও উচ্চগ্রামে চড়াইল, পলায়নের দ্বারাই আকর্ষণের শক্তিকে ও ইচ্ছাকে দুর্বার করিল। আশার বেনামীতে লেখা তাহার চিঠি দুইখানি তাহার তূণে যে কত তীক্ষ্ণ অস্ত্র আছে ও তাহাদের প্রয়োগকৌশলের সহিত প্রয়োগসঙ্কল্পের সংযোগ

যে কত মর্মান্তিকভাবে নিবিড় তাহাই প্রমাণ করিয়াছে। অসহায় মহেন্দ্র দূরপাল্লায় নিক্ষিপ্ত বাণে বিদ্ধ হইয়া শরাহত পাখীর ন্যায় নীড়ে ফিরিয়াছে, কিন্তু তখনও তাহার আত্মরক্ষার সাধু সংকল্প উন্মূলিত হয় নাই। এবার সে বিনোদিনীর কবলমুক্ত হইবার আশায়, মেস হইতে দূরতর প্রবাস কাশীতে, বিনোদিনীর প্রত্যক্ষ উষ্ণনিঃশ্বাসে জ্বালাময় গৃহপ্রতিবেশ হইতে অন্নপূর্ণার পুণ্যপ্রভাবপূত, কল্যাণময় শক্তিতে সুরক্ষিত সাধনাদুর্গে আশ্রয় লইয়াছে। এখানে কিছুদিন অবস্থানের পর সে আপনাকে নির্মল ও নিরাপদ কল্পনা করিয়াছে ও সেই ভ্রান্ত বিশ্বাসে আবার প্রলোভনবীজানুদুষ্ট গৃহে ফিরিয়াছে।

কিন্তু বিনোদিনীর মায়াজাল যে কত নিবিড় ও দুশ্ছেদ্য তাহা মহেন্দ্র নূতন করিয়া বুঝিয়াছে। এই সময় দৈব যে দৃঢ়চরিত্রের সহায়ক হইয়া তাহার নিকট নূতন সুযোগ-সুবিধা জুটাইয়া দেয় তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। মহেন্দ্র ফিরিবার পর আশা কাশী যাইবার ইচ্ছা জানাইয়াছে ও মহেন্দ্র উদারতা ও আত্মবিশ্বাসের ঝোঁকে তাহাতে সম্মতি দিয়াছে। ইতিমধ্যে বিহারী আসিয়া আশার সহিত বিনোদিনীর যাওয়ার প্রস্তাব করিতেই মহেন্দ্রের চরিত্রাভিমান প্রচণ্ড ঘা খাইয়াছে ও এই প্রস্তাব বিনোদিনীর সহিত তাহার অনুচিত সম্পর্কঘনিষ্ঠতার সংশয়প্রসূত এই ধারণায় তাহার ক্রোধ উগ্রভাবে বিস্ফোরিত হইয়াছে। সে বিনোদিনীর প্রতি ভালবাসা উচ্চকণ্ঠে অস্বীকার করিয়া উল্টা বিহারীকেই আশার প্রতি অনুরাগপোষণের অপরাধে অভিযুক্ত করিয়াছে। বিনোদিনী ব্যাকুলভাবে বিহারীকে সব কথা শুনিয়া যাইতে অনুরোধ করিয়াছে ও তাহাকে সমবেদনাপূর্ণ চিঠিও দিয়াছে। দৈবের ক্রূর পরিহাসে সেই চিঠি খোলা অবস্থায় মহেন্দ্রের হাত দিয়া ও তাহার শ্লেষোক্তি-সহ বিনোদিনীর নিকট ফিরিয়া আসিয়াছে। এই অবাঞ্ছিত ঘটনায় বিনোদিনীর প্রতিশোধস্পৃহা চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে।

আশার অনুপস্থিতি ও মহেন্দ্রের উদ্‌ভ্রান্তি পরিচর্যারত বিনোদিনীর মায়াজালবিস্তারের প্রচুর অবসর দিয়া মহেন্দ্রের মোহকে ঘনতর করিল। সে মহেন্দ্রের প্রেমনিবেদনকে প্রায় স্বীকার করিয়াই লইল। বিনোদিনী তাহাকে আশা-নৈরাশ্যের দ্বন্দ্বে উদ্‌ভ্রান্তির শেষ সীমায় ঠেলিয়া দিয়া তাহাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিল। প্রণয়লীলার এই সুখাবেশের মধ্যে ঈর্ষাদগ্ধ মহেন্দ্রের বিহারী সম্বন্ধে একটি অসাময়িক শ্লেষোক্তি বিনোদিনীর প্রেমাভিনয়ের পরিবর্তে তীব্র ঘৃণার উদ্রেক করিল। মূঢ় মহেন্দ্র যখন বিনোদিনীর পায়ে

ধরিয়া আত্মাবমাননার শেষ ধাপে নামিয়াছে, ঠিক সেই নাটকীয় ক্ষণে বিহারীর আকস্মিক প্রবেশের বজ্রপাত সকলকে চমকিত করিয়াছে। বিহারী এই আচরণের যাহা সহজ ব্যাখ্যা তাহাই বুঝিয়াছে ও মহেন্দ্র-বিনোদিনীর প্রতি অপরিসীম ঘৃণা লইয়া বিনোদিনীর সমস্ত অনুরোধ সত্ত্বেও তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া ছুটিয়া পলাইয়াছে। বিহারীর অনিচ্ছাকৃত আঘাতে মহেন্দ্রের উদ্বিগ্ন সেবা বিনোদিনীর মনে আবার একটা বিপরীত তরঙ্গ বহাইয়াছে। সে বিহারীর উপর রাগ করিয়া মহেন্দ্রের প্রেম শিরোধার্য করিয়াছে। মহেন্দ্র যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইয়াছে।

ইহার ঠিক পরেই মহেন্দ্রের উন্মত্ত নিশীথঅভিসার বিনোদিনীর মনে এক তীব্রতর ঘৃণার প্রতিক্রিয়া জাগাইয়াছে। তাহার পত্রে মহেন্দ্রের প্রতি নিদারুণ অবজ্ঞা ছত্রে ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে ও মহেন্দ্র-চরিত্র সম্বন্ধে তাহার অভ্রান্ত অন্তর্দৃষ্টি ব্যক্ত হইয়াছে। এই পত্রেই মহেন্দ্রের সঙ্গে তাহার প্রেমাভিনয়ের চিরসমাপ্তির দৃঢ়প্রতিজ্ঞা বাজিয়াছে। ভবিষ্যতে সে বাধ্য হইয়া মহেন্দ্রের সহিত যে সম্পর্কই রাখুক, প্রণয়তৃপ্তি তাহার সহিত সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্ক। ইহার পর সে মহেন্দ্রকে সম্পূর্ণ প্রয়োজনের বাহনরূপে ব্যবহার করিয়াছে, তাহাকে প্রেমিকরূপে কল্পনা করাও তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়াছে।

রাজলক্ষ্মীর বিরাগ ও তির্যক নিন্দা বিনোদিনীকে আরও মর্মান্তিক সত্যভাষণে উদ্দীপ্ত করিয়াছে ও তাহার বিদ্রোহঘোষণাকে স্পষ্টতর প্রকাশ দিয়াছে। সে রাজলক্ষ্মীর চোখের উপরেই মহেন্দ্রের প্রসারিত হস্ত গ্রহণ করিয়া সমাজনীতির সহিত আপোষহীন সংগ্রাম বরণ করিয়াছে। ইহার পর মহেন্দ্রের সঙ্গে তাহার দৈহিক সহাবস্থান যতই ঘনিষ্ঠ হউক, তাহার মানস সম্পর্ক চিরতরে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে।

বিনোদিনীর পরবর্তী জীবন বিহারীর অনুসরণ ও তাহার সহিত প্রথম বোঝাপড়া, পরে আত্মিক যোগসাধনের ইতিহাস। মহেন্দ্র-প্রদত্ত এক রাত্রির বিরতির সুযোগ সে বিহারীর আশ্রয়ভিক্ষায় ও তাহার নিকট নির্দোষিতাপ্রমাণের আকুল প্রয়াসে কাটাইয়াছে। তাহার রুদ্ধ আবেগ বিহারীর পদচুম্বনে ও তাহার নিকট প্রণয়ের শেষচিহ্নরূপে কোন নিদর্শন-প্রার্থনার আকৃতিতে উৎসারিত হইয়াছে। এইখান হইতে তাহার প্রেমসাধনার দুশ্চর ব্রত আরম্ভ হইল। নির্মম বিহারীর নিকট হইতে সে একবিন্দু প্রতিদান আদায় করিতে না পারিয়া তৎ-প্রদত্ত নির্বাসনদণ্ডাজ্ঞা মাথা পাতিয়া লইয়াছে।

পল্লীগৃহে ফিরিয়া বিনোদিনী ঈপ্সিত শান্তির পরিবর্তে এক দাহকারী শূন্যতাবোধ অনুভব করিতে লাগিল। পল্লীর ইতর সন্দেহ ও পরনিন্দায় আবিল আবহাওয়া কয়েক দিনের মধ্যেই তাহার নিকট অসহ্য হইয়া উঠিল। বিহারীর নিকট পত্রে সে নিজেকে সর্বতোভাবে বিহারীর আদেশপালনের প্রতিশ্রুতি দিয়া কেবল তাহার নিকট মাঝে মধ্যে সমবেদনার অভিজ্ঞানস্বরূপ দুই একখানি পত্রের জন্য মিনতি নিবেদন করিল। কিন্তু অকস্মাৎ তাহার এই পল্লীনির্বাসন কাণ্ডজ্ঞানহীন মহেন্দ্রের নির্লজ্জ অনুসরণে রূঢ় আঘাত-প্রাপ্ত হইল ও তৎক্ষণাৎ সে পল্লীসমাজে একটা অত্যন্ত গ্লানিকর প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কায় মহেন্দ্রের সহিত গ্রামত্যাগ ও কলিকাতায় বাসাবাড়ীর নির্জনতায় আত্মরক্ষায় সম্মত হইল। বিহারীর নিকট হইতে পত্রোত্তর-অপ্রাপ্তিই তাহাকে এই আত্মঘাতী পথে পদক্ষেপের দুরন্ত সঙ্কল্পবেগ দিয়াছে। সেখানে সে যে কয়েকদিন কাটাইল, তাহার মধ্যে একদিকে মহেন্দ্রের লালসাক্লিন্ন সঙ্গ প্রতিরোধ করিতে, অন্যদিকে মুক্তির উপায় উদ্ভাবন করিতে রত থাকিল। তাহার মন কিন্তু এই দেহসক্রিয়তার সম্পূর্ণ ঊর্ধ্বে এক উচ্চতর প্রেমধ্যানমগ্ন ভাবস্তরে তন্ময় হইয়া রহিল। এই আত্মবিস্মৃত, মুগ্ধ কল্পনারোমন্থনের স্নিগ্ধপ্রভাবে তাহার খরতপ্ত প্রণয়জ্বালা আদর্শ ভাবমাধুর্যে উত্তরণের পথে অগ্রসর হইল। রবীন্দ্রনাথ এখান হইতেই বিহারী-বিনোদিনীর প্রেমসাধনার দিব্য নির্মল পরিণতির জন্য পাঠকের চিত্তকে প্রস্তুত করিয়াছেন।

সর্বশেষ পর্যায়ে বিহারীর সহিত বিনোদিনীর একটি লৌকিকবন্ধনহীন আত্মিক মিলনের সম্বন্ধ উভয় পক্ষের সম্মতিতে ও পারস্পরিক শ্রদ্ধা-প্রীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই মহিমাময় পরিণাম উপন্যাসের সমস্ত মত্ত বিক্ষোভ ঝটিকার ঊর্ধ্বে ধ্রুবনক্ষত্রের স্থির দীপ্তিতে জ্যোতির্ময়—প্রবৃত্তির তিক্ত মন্থন হইতে উদ্ভূত এই বিষজারিত অমৃতবিন্দুটি মানবগৃহে আরতি-প্রদীপের মত চিরকল্যাণের আশ্বাসবহ। বিনোদিনীর এই আত্মিক রূপান্তর তাহার রাজলক্ষ্মীর রোগশয্যায় শেষ শুশ্রূষার আবেদনে, আশা ও মহেন্দ্রের সহিত সহজ প্রীতির পুনরুদ্ধারে ও বিহারীর সহিত তাহার ক্ষোভহীন বিচ্ছেদে উহার আন্তরিকতার প্রমাণ দিয়াছে। ঔপন্যাসিক যে জটিল দ্বন্দ্বটি বাস্তব-জীবনসম্ভূত অতিসূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক উপাদানে নির্মাণ করিয়াছিলেন, কবি তাঁহার আদর্শ জীবনকল্পনার যাদুমন্ত্রপ্রয়োগে তাহার অনায়াস-সমাধান করিয়া দিলেন। সংঘাত-

আবিল সংসারজীবনের ঊর্ধ্বে যে চিরপ্রসন্ন নভোনীলিমা প্রসারিত আছে তাহাও যে জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, তাহাও যে মানব চিত্তবিক্ষোভের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া উহাকে অবিচল শান্তিতে নিমজ্জিত করে, হৃদয়রহস্যউদ্‌ঘাটনে মনোবিজ্ঞানের ন্যায় কবিদৃষ্টিরও যে সমান অন্তঃপ্রবেশের অধিকার আছে, তাহা কবি-ঔপন্যাসিক উভয় শিল্পের মর্যাদা রক্ষা করিয়াই সগৌরবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। 'চন্দ্রশেখর'-এ বঙ্কিমচন্দ্র হয়ত মানবের স্বাধীন আত্মনিয়ন্ত্রণ ও অতিলৌকিক প্রভাবের মধ্যে ঠিক ভারসাম্য বজায় রাখিতে পারেন নাই; হয়ত শৈবলিনীর অনুতাপ-ধূমের মধ্যে তিনি একটু আকস্মিকভাবেই নরকবিভীষিকার অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া এই মানবিক নাটকে দৈবকেই প্রধান অভিনেতার অংশ দিয়াছেন। বিনোদিনীর চিত্তশুদ্ধির অনিবার্যতা সম্বন্ধে হয়ত সংশয় একেবারে স্তব্ধ হইবে না, তথাপি দিব্যচেতনার উন্মেষকে সম্ভব করিবার জন্য যে পূর্বায়োজন অবশ্য-কর্তব্য, তাহা রবীন্দ্রনাথ যথাসম্ভব নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন করিয়াছেন। যাঁহারা আদর্শতত্ত্বে একেবারে অবিশ্বাসী, যাঁহারা মানুষের উচ্চতর প্রেরণার অস্তিত্বেই আস্থাহীন, তাঁহারা ছাড়া, অন্য সকলেই এই চিত্তশুদ্ধির পরিণামটিকে প্রসন্ন স্বীকৃতি দিবেন।

মহেন্দ্র-বিনোদিনীর মনোলোকের আলোড়নছন্দটি মূলতঃ একইরূপ রেখাচিত্রে বিন্যস্ত হইয়াছে। মহেন্দ্রের ক্ষেত্রে উন্নাসিক উপেক্ষা হইতে প্রাথমিক পরিচয়ে অনিচ্ছুক সম্মতি, তাহার পরবর্তী স্তরে নিজ চরিত্রদৃঢ়তার উপর অন্ধবিশ্বাসে অনুচিত ঘনিষ্ঠতার প্রশ্রয়, গুণগ্রাহিতা হইতে সঙ্গলিপ্সা, সঙ্গলিপ্সা হইতে ভাবসম্মোহ, তাহার পর পলায়নের দ্বারা আত্মরক্ষাপ্রয়াস ও কতক বিনোদিনীর প্ররোচনায়, কতক বিহারীর প্রতি ঈর্ষায় ও কিছুটা আশার প্রতি আকর্ষণনিবিড়তার হ্রাসে বিনোদিনীর প্রতি রূপমোহ ও অধিকারস্থাপনের সঙ্কল্প, বিনোদিনীর ছলনাময় জালবিস্তারে সামগ্রিক বুদ্ধিবিপর্যয় ও উদ্‌ভ্রান্তি, নির্লজ্জ অনুসরণ, সর্বাত্মক বিদ্রোহ ও উন্মার্গ-গামিতা, অবশেষে নিদারুণ লাঞ্ছনা ও আত্মধিক্কারের মধ্য দিয়া শুভবুদ্ধির পুনরুদ্বোধন—এইগুলি মহেন্দ্রের পতনপথের ক্রোশাঙ্ক (milestone) চিহ্নিত করে। বিনোদিনীর যাত্রাপথ আরও জটিল ও দুর্নিরীক্ষ্য, তাহার প্রকৃতি আরও গহনরহস্যাবৃত। তাহার অন্তরের দুইটি পরস্পর-বিরোধী সত্তা সহাবস্থান করে। এই প্রথম কিশোর-সত্তার পরিচয় অনেকদিন

অবচেতনে সুপ্ত ছিল, হঠাৎ কোন স্মৃতি-উদ্দীপনে জাগ্রত হইয়াছে। মহেন্দ্রের চিত্তবিমুখতা জয় করিবার জন্যই তাহার প্রণয়রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব—ইহার পর অভিনয়ে অনেক জটিল স্ববিরোধী আত্মপ্রকাশ। পরিশেষে মহেন্দ্রের প্রতি প্রেমাভিনয় করিতে করিতে বিহারীর প্রতি যথার্থ প্রণয়ের উন্মেষ। মহেন্দ্রের বিষাক্ত সাহচর্য ও বিহারীর ধ্যানসুরভিত স্মৃতি-কল্পনা তাহার অন্তরে পরস্পরকে অনুসরণ করিয়া ফিরিয়াছে। শেষ পর্যন্ত এই সংগ্রামে যথার্থ প্রেম মেকি অভিনয়ের সমস্ত ছলা-কলা পরিহার করিয়া নিজ স্বভাবদীপ্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে আশার প্রতি ঈর্ষ্যা, মহেন্দ্রের প্রতি ঘৃণা ও বিহারীর প্রতি অভিমান পরিস্থিতিকে সাময়িকভাবে ঘোরাল করিলেও পরিণামে ইহারা প্রেমের অধ্যাত্ম রূপান্তরসাধনে সহায়ক উপাদানরূপেই কার্যকরী হইয়াছে। মহেন্দ্রের তাহার প্রতি যে মোহ, সে বিহারীর প্রতি সেই মোহ পোষণ করিয়া মহেন্দ্রের হৃদয়াবেগের পরোক্ষ প্রতিদান দিয়াছে।



এইবার আর কয়েকটি শিল্পরীতি ও ভাবোদ্দীপনের সহিত সম্পর্কিত প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াই এই দীর্ঘ আলোচনার উপসংহার করিব। প্রথম হইতেছে বহিঃপ্রকৃতির প্রভাব। মানবমনের সূক্ষ্ম অনুভূতিজালের ফাঁকে ফাঁকে নিসর্গচেতনার মায়াসঞ্চার বৃক্ষরাজির শ্যামপল্লবের উপর চন্দ্ররশ্মি-কুহকের ন্যায় মানবের বিচিত্র আনন্দ-বেদনার দোলার মধ্যে একটি অপূর্ব ছন্দ-সঙ্গতি ফুটাইয়া উহাকে গভীরার্থদ্যোতক ও সুকুমার ব্যঞ্জনাময়রূপে আভাসিত করে। রবীন্দ্রনাথের কবিকল্পনা অন্তর-বাহিরের মধ্যে যে নিগূঢ় একাত্মতা-উদ্বোধনে সিদ্ধহস্ত, উপন্যাসে তাহাই কয়েকটি আবেগঘন মুহূর্তের তাৎপর্য-দ্যোতনায় বিরল সংযম ও অন্তর্দৃষ্টির সহিত নিয়োজিত হইয়াছে। এখানে আতিশয্য ও অতিপ্রয়োগ যে অনুভবনিবিড়তার প্রকাশের বিঘ্নস্বরূপ তাহারই সুমিত, ঔচিত্যবোধনিয়ন্ত্রিত প্রবর্তন পরিস্ফুটতর অভিব্যক্তির সহায়ক হয়। রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি উপলক্ষ্যে মানবদ্বন্দ্বের জটিলতার মধ্যে

প্রকৃতির সূক্ষ্ম-সহযোগিতা আবাহন করিয়াছেন। প্রথম হইল ১৭ অধ্যায়ে দমদমের বাগানবাড়ীর প্রতিবেশে। এখানে বিনোদিনীর কৈশোরস্মৃতি-উদ্বোধন ও আত্ম-উন্মোচন প্রকৃতির ইন্দ্রজালের নিগূঢ় প্রভাব ছাড়া শুধু মনের স্বয়ংনির্ভর শক্তিতে, কেবল মানস অভিজ্ঞতান্তরের স্বাভাবিক আবর্তনে সম্পন্ন হইত না। বিনোদিনীর দীর্ঘদিনের মুখোস খুলিবার জন্য, তাহার বিস্মৃত আত্মপরিচয়কে চেতনালোকে উন্মেষিত করিবার জন্য শুধু বিহারীর সমপ্রাণতার উত্তাপ যথেষ্ট নয়; প্রকৃতির শান্তি ও সৌন্দর্য হইতে বিচ্ছুরিত অনির্বচনীয় ভাবোচ্ছ্বাস এই মৃত অতীতকে সমাধিশয়ন হইতে ক্ষণচেতনায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। প্রকৃতি-প্রতিবেশ ও কাব্যব্যঞ্জনার সার্থক প্রয়োগ যুগ্মভাবে এই পুনর্জীবিত সত্তাকে একদিকে রূপ দিয়াছে, অন্যদিকে উহার মর্মপরিচয় ব্যক্ত করিয়াছে।

বিনোদিনীর প্রেম-নিবেদনের অভিঘাতে রোমাঞ্চিত বিহারীর অতীত জীবন-সমীক্ষাও একদিকে প্রকৃতির গূঢ় প্রাণস্পন্দন, অন্যদিকে অপূর্ব কাব্য-ব্যঞ্জনার ইন্দ্রজাল—এই উভয়ের দিব্য প্রভাবে নিজ অনির্বচনীয় হৃদয়াকৃতির স্বরূপ আবিষ্কার করিয়াছে। সেইরূপ ৪১ অধ্যায়ে বিনোদিনীর, ৪২ অধ্যায়ে আশা ও মহেন্দ্রের, ৪৮ অধ্যায়ে বিহারীর আত্মবিশ্লেষণ প্রকৃতি ও কাব্যানুরঞ্জনের সহায়তায় নিজ নিজ অন্তঃপ্রকৃতির রূপান্তরের যথার্থ পরিচয় লাভ করিয়াছে—আত্মানুসন্ধান হইতে আত্মসংবিদের নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছে। আশা ও রাজলক্ষ্মীর শোকাচ্ছন্ন, রোগক্লিষ্ট, অবসাদের গুরুভারে অভিভূত মনোবেদনা কলিকাতা মহানগরীর ধূম্রাকুল, ধূসর-বিবর্ণ, কর্মোদ্যম-হীন গোধূলিচ্ছায়ার মধ্যে আপন প্রতিবিম্ব দেখিয়াছে ও ফেলিয়াছে। এই দিনান্তের মুকুরে মানস শ্রান্তি ও নৈরাশ্য ঘনীভূত আত্মচেতনায় নিজ স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছে। বিনোদিনীর প্রেমের স্পর্শে বিহারীর আত্মা তাহার একটি দীর্ঘবিস্মৃত পরিচয়কে পুনরুদ্ধার করিয়াছে। তাহার প্রকৃতির যথার্থ আকৃতি তাহার নিকট অকস্মাৎ ধরা পড়িয়াছে ও সে কর্মবিক্ষোভ ও গৌণ সম্পর্কের বিভ্রান্তি হইতে মুক্ত হইয়া আপনার সত্তাকেন্দ্রের সন্ধান পাইয়াছে। অন্নপূর্ণার মুখে মহেন্দ্র-বিনোদিনীর কলুষিত প্রেমের স্পর্ধিত দুঃসাহসের সংবাদে বিহারীর বিস্বাদ অনুভূতির নিকট প্রকৃতির মায়াসৌন্দর্য একমুহূর্তে মিলাইয়া গিয়াছে। তাহার পূর্বে বালির বাগানবাড়ীর সম্মুখে প্রবহমান গঙ্গাস্রোত ও উহার দিগন্তে নবমেঘসমারোহের ঘননীলিমা তাহার কল্পনায়

একটি মধুর প্রণয়াভিসারের পটভূমিকা রচনা করিয়াছিল ও বিনোদিনীর প্রতি মুগ্ধ মনোভাবের বিভ্রম তাহার মনে মায়াসঞ্চার ঘনাইয়া তুলিয়াছিল। অথচ বিনোদিনীর সহিত তাহার এই সম্বন্ধমাধুর্য কোন লৌকিক বন্ধনের মধ্যে স্থায়ী করার অসম্ভাব্যতাই তাহাকে সমস্ত আনন্দরসের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম বেদনা অনুভব করাইয়াছে। তাহার সমস্ত জটিল হৃদয়বেদনা এই প্রকৃতির আবেদনের মধ্যে আত্মপরিচয় ও ভাষা পাইয়াছে।

প্রকৃতির অন্তর্নিগূঢ় মায়াপ্রভাব সর্বাধিক প্রকাশ পাইয়াছে বিনোদিনী-মহেন্দ্রের সম্পর্কচ্ছেদের দৃশ্যে। মহেন্দ্র ও বিনোদিনী উভয়েই যমুনানদীর ঐতিহ্যগত ভাবানুষঙ্গে প্রণয়াবেশের চরম বিভোরতায় আবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। মহেন্দ্র এই ভাবানুষঙ্গভাবিত হইয়া বিনোদিনীকে শাশ্বত অভিসারিকারূপে কল্পনা করিয়াছে। কৃষ্ণপক্ষের জ্যোৎস্না ও নদীতটের অস্ফুট সৌন্দর্যাভাস তাহাকে সময়ের ধারাবাহিকতা হইতে মুক্ত করিয়া বর্তমান মুহূর্তের ভাবমত্ততাকে চিরন্তন সত্যরূপে প্রতিভাত করিয়াছে। গৃহে ফিরিয়া সে বিনোদিনীকে অনুরূপ চিত্তবিভ্রমের বশীভূতারূপে বাসকসজ্জিতা, প্রিয়প্রত্যাশিনী প্রণয়িনীর মূর্তিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছে। কিন্তু সেই মুহূর্তে উভয়েরই মোহজাল ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। মহেন্দ্র বিনোদিনীর রূঢ় প্রত্যাখ্যানে স্বপ্ন হইতে বাস্তব-সচেতনতায় ফিরিয়াছে ও এই মোহভঙ্গ অল্পক্ষণেই শুভবুদ্ধির উন্মেষের পূর্বভূমিকা রচনা করিয়াছে। বিনোদিনীরও মোহভঙ্গ সঙ্গে সঙ্গেই ঘটিয়াছে—প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির মর্মান্তিক ব্যবধান তাহাকে আদর্শকল্পনার অনুধাবন হইতে রূঢ়ভাবে জাগাইয়াছে ও সে বিহারীর অপ্রাপণীয়তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়া বেদনায় বিহ্বল হইয়াছে। বিহারীর সঙ্গে তাহার সম্পর্কের আদর্শ সুষমা সম্পূর্ণভাবে নষ্ট না হইয়া শেষ পর্যন্ত একটা রমণীয় ভাব-সামঞ্জস্যের মাধুরী বিস্তার করিয়াছে। কিন্তু মহেন্দ্রের বিনোদিনী-মোহ সম্পূর্ণভাবে উন্মূলিত হইয়াছে। যে প্রেমের মধ্যে কোন নিত্যবস্তু নাই তাহা মরীচিকার মত মিলাইয়াছে। আর যাহার মধ্যে কিছুটা যথার্থ দিব্য উপাদান ছিল তাহা বহু অংশে ক্ষুণ্ণ হইয়া ভাবসত্তায় অমরতা লাভ করিয়াছে।

উপন্যাসে মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণ খুব সূক্ষ্ম নিপুণতার সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। কিন্তু উহার তীক্ষ্ণ স্বাতন্ত্র্য ভাবরসসিক্ত হইয়া মনের উপাদানগত সামঞ্জস্য ও অখণ্ডতাকে কোন অংশেই ক্ষুণ্ণ করে নাই। ভাবদৃষ্টি সমগ্র মানুষটিকেই উপলব্ধি করে, উহার কোন উৎকট আংশিক অভিব্যক্তির খণ্ডিতরূপে সমতা

হারায় না। আশা যখন দারুণ দুঃখের অভিঘাতে সকল মানুষকে সত্য মূল্যে দেখিতে শিখিয়াছে, তখন সে সমস্ত অনাবশ্যক লজ্জাসঙ্কোচ অতিক্রম করিয়া বিহারীর সহিত সুস্থ, কুণ্ঠাহীন সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু তাহার সপ্রতিভ আচরণে মুগ্ধ বিহারীর মনে যুগপৎ করুণ সমবেদনা ও সপ্রশংস শ্রদ্ধার সঞ্চার হইয়াছে। সে আশ্রয়ের অন্তরালচ্যুতা, পরনির্ভরা কিশোরীর কঠিন প্রয়োজনজাত অসঙ্কোচ আত্মকর্তৃত্বস্ফুরণে যেমন একদিকে আঘাতের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছে, অপরদিকে তেমনি এই বালস্বভাবা তরুণীকে পৌরাণিক সতীর চিরন্তন মহিমার জ্যোতির্ময়ী মূর্তিরূপে দেখিয়াছে। এখানে যেমন একদিকে সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব আছে, তেমনি উহার কাব্যরমণীয়তাও সমানভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মহেন্দ্রের আত্মমর্যাদাবোধের পুনরুজ্জীবন যেমন দীর্ঘকালীন মানস গ্লানিভোগের অমোঘ প্রতিক্রিয়াসঞ্জাত, তেমনি মানবাত্মার পারিপার্শ্বিকের অভিভব হইতে মুক্ত হইবার স্বভাবসিদ্ধ শক্তির আত্মপ্রত্যয়প্রসূত। মন যেমন মানসিক বিপর্যয়ের বিপরীতমুখী আন্দোলনে উহার সুস্থ ভারসাম্য ফিরিয়া পাইয়াছে তেমনি আত্মা উহার দিব্যস্বরূপের স্বত-উন্মোচনে সেই একই কাঙ্ক্ষিত পরিণতিতে পৌঁছিয়াছে। এখানে কবি ও ঔপন্যাসিকের মানবপ্রকৃতিপর্যবেক্ষণের বিভিন্ন রীতি একই ফলপ্রাপ্তিতে সহযোগিতা করিয়াছে।

উপন্যাসের ভাবদেহগঠনে দৈব ও স্বাধীন কর্মফলের সেই একই প্রকার নিবিড় সহযোগিতা ঘটনাপ্রবাহকে অভিন্নলক্ষ্যাভিমুখী করিয়াছে। বিহারী বিশেষ করিয়া অদৃষ্টের এই কুটিল চক্রান্তের বাহনরূপে বারবার রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছে। যেখানে আশা, মহেন্দ্র ও বিনোদিনী তাহাদের মানস-প্রেরণার সূত্রজালে নিজেদের জীবনকে জটিল করিয়া তুলিতেছে, সেখানে বিহারীর হিতৈষিতা ও সরল অন্তঃকরণের প্রতিকারচেষ্টা এই জালে আরও দুশ্ছেদ্য ফাঁস যোজনা করিয়া উহার পেষণ-যন্ত্রণা দুঃসহতর করিয়াছে। সর্বপ্রথম বিনোদিনীর সঙ্গে আশার প্রথম পরিচয়ের ভাবোচ্ছ্বাসে যে আদরসূচক 'চোখের বালি'র সখিসম্পর্ক পাতান হইল, তাহাই দৈবের ক্রূর পরিহাসে অচিরে মর্মান্তিক অস্বস্তির কারণ হইয়াছে। সেই অদৃষ্টের চক্রান্তে মহেন্দ্রের বিনোদিনীর প্রতি প্রথম অনীহা দেখিতে দেখিতে সর্বগ্রাসী লালসায় জ্বলিয়া উঠিয়াছে। মহেন্দ্রের আত্মচরিত্রদৃঢ়তায় অতিপ্রত্যয় জীবনের অগ্নিপরীক্ষায় ও ভাগ্যের নেপথ্য-পরিহাসে সম্পূর্ণ অসার প্রতিপন্ন হইয়াছে।

ঘটনাবিন্যাসের মধ্যেও এই আকস্মিক আশাবৈপরীত্য বারে বারে চমক জাগাইয়াছে। বিহারী বিনোদিনীকে মহেন্দ্র সম্বন্ধে সতর্ক করিতে আসিয়া নিজেই তাহাকে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছে। আশা ও মহেন্দ্র বিনোদিনীর কূটবুদ্ধির নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া তাহাদের দাম্পত্য মিলনের পরম হন্তারককে এই মিলনের উত্তরসাধিকারূপে দেখিয়াছে। বিনোদিনীর বিমুখতাজয়ের জন্য মহেন্দ্রের চড়ুইভাতির আয়োজন ঠিক উল্‌টা ফল প্রসব করিয়াছে—মহেন্দ্রের মূঢ় অপটুতা উহাতেই প্রতিপন্ন হইয়া বিনোদিনীর চোখে বিহারীর মূল্য বাড়িয়াছে। এই দমদমের বাগানবাড়ীতেই মহেন্দ্র, বিহারী ও বিনোদিনী এই তিনটি প্রধান চরিত্রের জীবনপরিণতির বীজ উপ্ত হইয়াছে। মহেন্দ্র বিনোদিনীর মোহ এড়াইবার জন্য বাসা বদল করিয়া অমোঘতর আকর্ষণে ফিরিয়া আসিয়াছে। আশার বেনামীতে বিনোদিনীর আবাহনপত্র তিনখানি এই হৃদয়ের খেলায় প্রথম বিস্ফোরক অগ্নিশলাকা জ্বালাইয়াছে। বিনোদিনীর বাড়ী যাওয়ার দৃঢ় সংকল্পে মৌখিক উপরোধ জানাইতে আসিয়া মহেন্দ্র তাহার নিকট পরোক্ষ প্রেমস্বীকৃতিই জানাইয়াছে। বিহারী বিনোদিনীর দেবীত্বের প্রশস্তি করিবার মুহূর্তেই তাহার মধ্যে ঈর্ষ্যাদিগ্ধা পিশাচীই হঠাৎ মুখোশ খুলিয়াছে। মহেন্দ্র আশার প্রতি বিশ্বস্ততা অটুট রাখিবার উদ্দেশ্যে শক্তিসঞ্চয়ের জন্য কাশীযাত্রা করিয়া উহাদের ভবিষ্যৎ সর্বনাশের পথ প্রশস্ততরই করিয়াছে। এইভাবে উপন্যাসের সমস্ত ঘটনাগ্রন্থন দৈবপ্রতিকূলতায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই অনভিপ্রেত প্রতিক্রিয়া ঘটাইয়াছে।

কয়েকটি বিশেষ উপলক্ষ্যে ঘটনার এই তির্যক গতি চমকপ্রদ অভিঘাত-সৃষ্টিতে যেন অদৃষ্টের অট্টহাস্যে বিঘোষিত হইয়াছে। আশা কাশীযাত্রার পূর্বে বিনোদিনীর হাতেই মহেন্দ্রের দেখাশোনার ভার দিয়া গিয়াছে ও বিদ্বেষান্ধা প্রবীণা রাজলক্ষ্মীও জিদ্‌ করিয়া মহেন্দ্রের সহিত বিনোদিনীর ঘনিষ্ঠতাবৃদ্ধির সুযোগ দিয়াছে। আশা কাশী আসিবে না এই কথায় আশ্বস্ত বিহারী কাশীতে অন্নপূর্ণার নিকট প্রণামনিবেদন করিতে আসিয়া আরও তীব্রভাবে আশার বিরাগভাজন, এমনকি সাময়িকভাবে অন্নপূর্ণারও স্নেহচ্যুত হইয়াছে। দুঃসহ মনস্তাপে ক্লিষ্ট বিহারী মহেন্দ্রের নিকট আশাসম্বন্ধীয় দোষস্বীকার করিতে আসিয়া মহেন্দ্র-বিনোদিনীর উৎকট প্রেমাভিনয়ের প্রত্যক্ষ দর্শক হইয়াছে ও বিনোদিনী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভুল ধারণা করিয়া তাহার কথা না শুনিয়াই ও তাহাকে ঘৃণার সহিত ঠেলিয়া দিয়া চলিয়া আসিয়াছে।

বিহারীর এই নির্মম আচরণ বিনোদিনীর সাধু ইচ্ছাকে সম্পূর্ণ উন্মূলিত করিয়া তাহাকে আশার সর্বনাশসাধনে আরও দৃঢ়সংকল্প করিয়াছে। তাহার চিরজীবনের ভূমিকা ইহাতে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হইয়াছে ও সে তাহার নিজের হাতে মহেন্দ্রকে অধঃপতনের শেষ সোপানে ঠেলিয়া দিয়াছে। বিনোদিনীর ঈর্ষ্যা ও মহেন্দ্রের মোহ যে সর্বধ্বংসী বিস্ফোরণ প্রস্তুত করিয়াছিল, বিহারীর হিতৈষণাজাত নৈতিক ক্রোধ তাহাতে দেশালাইএর কাঠি ধরাইয়া দিল।

চিঠিবিভ্রাট লইয়াও অদৃষ্টের অনেক জটিল সূত্র পাকাইয়া গিয়াছে। বিনোদিনীর চিঠিগুলি কোন সময়েই বিহারীর নিকট না পৌছিয়া মহেন্দ্রের হাত দিয়া শ্লেষতীক্ষ্ণ মন্তব্যসহ ফিরিয়া আসিয়াছে। বিনোদিনী বিহারীর প্রকৃত মনোভাব সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকিয়া আরও মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। এই পত্রগুলি মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার বশে লেখা হইলেও তাহাদের গন্তব্যস্থল অদৃষ্টের ইঙ্গিতেই নির্ণীত হইয়াছে। তাহাদের ভিতরটা মানুষ-রচিত, কিন্তু শিরোনামাটি দৈবমুদ্রাঙ্কিত। মহেন্দ্রের প্রতি ধিক্কারজ্ঞাপক বিনোদিনীর চিঠিখানিও উদ্দিষ্ট ব্যক্তির কাছে পৌছিলেও তাহার স্খলিত মুষ্টি হইতে যে এই পত্রে মর্মান্তিক আঘাত পাইবে সেই আশার হাতে আসিয়া যাত্রা শেষ করিয়াছে। মহেন্দ্রের প্রতি নিক্ষিপ্ত তীর আশার বক্ষোভেদ করিয়া অদৃষ্ট-কবির ব্যঙ্গ্যার্থ সিদ্ধ করিল। নির্জন পল্লীবাসে বিহারীর ধ্যানতন্ময় বিনোদিনীর কক্ষদ্বারে যখন করাঘাত হইয়াছে, তখন বাঞ্ছিত দয়িত বিহারীর পরিবর্তে তীব্র ঘৃণার পাত্র মহেন্দ্রের আবির্ভাব ঘটিয়াছে—তাহার ওষ্ঠপ্রান্তে আগত আবাহনমন্ত্র স্তব্ধ হইয়া তৎপরিবর্তে ধিক্কারবাণী নিঃসৃত হইয়াছে। এই মর্মান্তিক প্রত্যাশাভঙ্গের পুনরভিনয় ঘটিয়াছে এলাহাবাদের উদ্যান-বাড়ীর দ্বিকোটিক অভিসারবিধুরতার দিব্যবিভ্রমমুগ্ধ দৃশ্যটিতে। সেখানে মহেন্দ্র প্রত্যাশা করিয়াছে অনুকূল কোমল নায়িকার, আর বিনোদিনী প্রত্যাশা করিয়াছে আদর্শকল্পনাসিদ্ধির। এখানে হয়ত ঘটনার অপ্রত্যাশিতত্ব নাই, কিন্তু মানস অপ্রস্তুতির দুস্তর ব্যবধানই স্বাভাবিককে অসম্ভবের পর্যায়ে ঠেলিয়া দিয়া চমকের চরম বিস্ময় জাগাইয়াছে। এইরূপে সমস্ত উপন্যাসটিকে পরিব্যাপ্ত করিয়া মানববোধাতীত এক নিগূঢ় দৈবশক্তির ঈর্ষ্যাক্রূর তির্যক দীপ্তি বিকীর্ণ হইয়াছে ও ঔপন্যাসিক ভাবাবহে যেন এক শনিগ্রহের বক্র কটাক্ষ সঞ্চারিত হইয়া উহার ফলশ্রুতিতে শুধু আধিভৌতিক প্রত্যাশাপূরণ নয়, আধিদৈবিক স্বাদবিমিশ্রতাও আরোপ করিয়াছে।

ষোড়শ অধ্যায়

নৌকাডুবি (১৯০৬, ১৩১৩)

নৌকাডুবি উপন্যাসটি চোখের বালি-রচনার প্রায় আড়াই বৎসর পর বঙ্গদর্শন-এ ১৩১০ বৈশাখ হইতে ১৩১২ আষাঢ় পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। গোরার সহিত উহার কালব্যবধান প্রায় দুই বৎসরের। এই তিনটি উপন্যাস একই ভাবপর্যায়ভুক্ত ও উহাদের বিষয় ও আলোচনারীতির মধ্যেও একটা যোগসূত্র লক্ষিত হয়। বিষয়বস্তু ও চরিত্রকল্পনার দিক্‌ দিয়াও তাৎপর্যপূর্ণ বৈষম্যের মধ্যে একটা অনুস্যূতিপ্রবণতার ধারাও মোটামুটি দেখা যায়। ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে এই যুগে রবীন্দ্রনাথের ঔপন্যাসিক সত্তা একটা নিকটসম্পর্কিত ভাববৃত্তকে প্রদক্ষিণ করিতেছিল।

এই বিষয়গত সাম্য সত্ত্বেও উপন্যাসত্রয়ীর জীবনসমীক্ষার ব্যাপ্তি ও গভীরতাসম্বন্ধে যথেষ্ট তারতম্য অনুভব করা যায়। 'নৌকাডুবির' ঔপন্যাসিক উৎকর্ষ আর দুইটির তুলনায় সর্বনিম্ন। স্পষ্টই বোঝা যায় যে লেখক এখানে তাঁহার ভাবকল্পনাকে অমোঘ কার্যকারণবন্ধন ও জীবনরহস্যের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সন্ধান-দায়িত্ব হইতে মুক্তি দিয়া স্বেচ্ছাসঞ্চরণের শিথিল প্রশ্রয় দিয়াছেন। এই উপন্যাসে আকস্মিক ঘটনাপ্রবাহ মুখ্য হইয়া চরিত্রস্ফুরণকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে—নদীর বাঁক যেমন তটরেখার মানচিত্র নির্ণয় করে, তেমনি ঘটনার অনুসরণে চরিত্রগুলি নিজ নিজ জীবনসমস্যার ছোট-খাট গ্রন্থি যোজনা করিয়াছে। আপাত-অসম্ভব কাহিনীই নর-নারীর জীবনে গতিবেগ সঞ্চার করিয়া উহাদের পারস্পরিক সম্পর্কনির্ণয়ে মুখ্য প্রেরণা যোগাইয়াছে। লেখকের হৃদয়বিশ্লেষণে ও জীবনরহস্যনিরূপণে যে অভিনিবেশ তাহা ঘটনাপ্রাধান্যনির্ভরমাত্র। সংঘাত যেটুকু হইয়াছে তাহা অতি মৃদু, শান্ত সরোবরে মন্দ-আন্দোলিত নৃত্যশীল তরঙ্গগতির সহিত তুলনীয়। 'চোখের বালি'র মত এই উপন্যাসে মনের গভীরে অবতরণ-প্রয়াস নাই। রক্তস্রাবী মর্মবেদনার দুঃসহ জালা নাই, জীবনের মূল ধরিয়া টান-দেওয়া, সমগ্র প্রবৃত্তি-দিয়া চাওয়া, ও সমস্ত কর্তব্যবোধ-দিয়া প্রতিরোধ-করা অন্তর্দ্বন্দ্বের দারুণ ভূমিকম্প-বিপর্যয়ের কোন আভাস নাই। পারিপার্শ্বিকের প্রতিকূলতায়, কাঙ্ক্ষিত জনের হেঁয়ালিছোঁয়া আচরণে, কোন অজ্ঞাত বাধার টানে জীবনের স্বচ্ছন্দগতির ছন্দোভঙ্গে মাঝে মাঝে মনে মৃদু অস্বস্তি সঞ্চারিত

হয়, নানা বিষণ্ণ প্রশ্ন জাগে। কিন্তু এই ছোটখাট সংশয়ের কণ্টকবেধ মারাত্মক যন্ত্রণাতে পরিণতি লাভ করে না, প্রসন্ন শারদাকাশে সঞ্চরমান ছায়া-ফেলা মেঘগুলি ঘনীভূত হইয়া বজ্রবিদ্যুৎবর্ষণে মাথার উপর ভাঙিয়া পড়ে না। ইহার নায়ক-নায়িকারা, ও পার্শ্বচরিত্রবৃন্দ কেহই ট্রাজেডির ছাঁচে ঢালাই নয়, কেহই প্রবল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন নয়, কেহই অদৃষ্টের সঙ্গে জীবনপণ সংগ্রামসঙ্কল্পে অনমনীয় নয়। ইহাদের মধ্যে কেহই বীরোচিত উপাদানে গঠিত নয়।

দৈবের প্রভাবও এখানে 'চোখের বালি' হইতে স্বতন্ত্র প্রকারের। এখানে যে অদৃষ্ট প্রধান চরিত্রগুলির ভাগ্য নির্ণয় করিয়াছেন, তাঁহার কোন ক্রূর-কুটিল উদ্দেশ্য নাই, তিনি বারবার সঙ্কটমুহূর্তে মানবজীবনে হস্তক্ষেপ করিয়া উহার গ্রন্থিকে জটিলতর করিবার অশুভবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। তিনি প্রথমেই হঠাৎ ঝড়ের বেশে আবির্ভূত হইয়া একটি কৌতুককর, অথচ বিষাদময়, বিভ্রান্তিসঙ্কুল দুর্ঘটনা ঘটাইয়া তাহার পর যবনিকান্তরালে আত্মগোপন করিয়াছেন। তিনি সূচনাতেই নায়ক-নায়িকার পৃষ্ঠে অট্টহাস্যের সহিত একটা প্রচণ্ড চপেটাঘাত করিয়া তাহার পর তাহার টাল সামলাইবার জন্য তাহাদিগকে একটা জীবনব্যাপী ভ্রান্তি-চক্রে ঘুরাইয়া মারিয়াছেন। তাঁহার রসিকতা অনেকটা প্রকৃতির রসিকতার মত। উভয়ের মধ্যেই একটা দুরন্তপনার আকস্মিক বিস্ফোরণ আছে, কিন্তু কোন বদ্ধমূল বৈরিতা নাই। উভয়ত্রই মানুষের সুখ-দুঃখে উদাসীন, নিজ খেয়ালখুশিপ্রণোদিত, একটা নৈর্ব্যক্তিক ক্রিয়াশীলতা আছে, কিন্তু কোন সুপরিকল্পিত নির্যাতন প্রেরণা অলক্ষিত। রমেশ-কমলা দীর্ঘদিন এই ভুল বোঝাবুঝির পাকে পাকে আপনাদিগকে জড়াইয়াছে ও বহুদিনব্যাপী দুর্ভোগের পর তাহাদের বন্ধনমুক্তি ঘটিয়াছে। কিন্তু এই বিভ্রান্তির স্থায়িত্বের জন্য দায়ী রমেশের দ্বিধাদুর্বলতা ও কমলার সংসারানভিজ্ঞতা, দৈবের শ্লেষ-অভিপ্রায়ের পুনরাবৃত্তি নয়। তৃতীয় ব্যক্তি নলিনাক্ষ এই ভ্রান্তিচক্রের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই—সে সম্পূর্ণভাবে অন্তর্বেদনামুক্ত জীবন কাটাইয়াছে। মাঝে একবার হেমনলিনী-নলিনাক্ষের সম্ভাব্য বিবাহের কথাবার্তায় দৈবের বিপরীতবিলাসের একটু সামান্য পরিচয় রমেশ অনুভব করিয়াছিল, কিন্তু এই সংঘটনটি দৈব অপেক্ষা অক্ষয়ের দৌত্যদক্ষতার উপর অধিক নির্ভরশীল এবং ইহা মানবজীবনক্রমের কৌতুককর অসঙ্গতির পর্যায়ভুক্ত

বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। আরও একস্থানে দৈবের পরিহাসপ্রসন্নতা অনুমিত হওয়া সম্ভব—হেমনলিনীর উদ্দেশ্তে লেখা রমেশের কবুল-করা চিঠিখানি কমলার হাতে পড়িয়া প্রকাশভীরু, স্বভাবদুর্বল রমেশের অবস্থা-সঙ্কটের সহজ সমাধান সম্পন্ন করিয়াছে—ইহা বোধ হয় দৈবের বিলম্বিত ক্রটিসংশোধন।

পরিবেশের বিস্তৃতির দিক দিয়া 'চোখের বালি'র সঙ্গে 'নৌকাডুবির উল্লেখযোগ্য পার্থক্য আছে। 'চোখের বালি'র অতি সঙ্কীর্ণ পারিবারিক পরিবেশে অত্যাবশ্তকীয় চারি-পাঁচটি চরিত্রের মধ্যে ঘটনার আবর্তন ও হৃদয়সংঘাতের বিবরণ সীমাবদ্ধ আছে। এই কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত অন্তরঙ্গ-মণ্ডলীর মধ্যে কোন অনাবশ্যকের প্রবেশাধিকার নাই। 'নৌকাডুবি'তে নিয়ন্ত্রণ যে পরিমাণে শিথিল হইয়াছে, আগন্তুকের ভিড় সেই পরিমাণে বাড়িয়াছে। পূর্ববর্তী উপন্যাসে কাহিনীর পরিধি যদিও কলিকাতার বাসগৃহ ছাড়িয়া সময় সময় সুদূর পল্লীগ্রাম ও পশ্চিমভ্রমণের অনির্দেশ্য সীমান্ত পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে, তথাপি সমস্ত সুদূর অভিযানের উপর একই দুশ্চিকিৎস্য সমস্যাব্যাধির ছায়াপাত হইয়াছে। মানস জটিলতার একটি দুশ্ছেদ্য সূত্র সমস্ত স্বেচ্ছাবিহারকে কেন্দ্রশাসনে সংহত করিয়া পাত্রপাত্রীর ইচ্ছাস্বাধীনতাকে বাহিরে প্রশ্রয় দিয়া ভিতরে নিরুদ্ধ করিয়াছে। রজ্জুবদ্ধ পশু যেমন একই খুঁটির চারিদিকে ঘুরিয়া মরে, উপন্যাসের নরনারী তেমনি এক অলঙ্ঘ্য প্রবৃত্তির দুর্বার আকর্ষণে উহাকেই প্রদক্ষিণ করিয়া তাহাদের অসহায় অধীনতারই পরিচয় দিয়াছে। 'নৌকাডুবি'-তে হৃদয়াবেগ চরিত্রাবলীর গতিবিধি ও ক্রিয়াকলাপের সর্বাত্মক নিয়ামক শক্তিরূপে আবির্ভূত হয় নাই। সুতরাং ইহাদের যথেষ্ট আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার রহিয়া গিয়াছে। ইহাদের মনের আতিথেয়তা নানা অসংশ্লিষ্ট অতিথি-অভ্যাগতের জন্য উন্মুক্তই আছে—তাহাদের দুর্ভাগ্য এই স্বাধীনতাটুকু সঙ্কুচিত করে নাই। পার্শ্বচরিত্রগুলি ইহাতে প্রধান চরিত্রদের সহিত প্রায় সমতুল্য মর্যাদাভোগী, ইহাদের কাহিনীর, এমন কি অন্তরসঙ্কটের মধ্যেও অবাধপ্রবেশের অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। রমেশ, কমলা ও হেমনলিনীর মত অন্নদা, অক্ষয়, যোগেন্দ্র, এমনকি পথ হইতে কুড়াইয়া-পাওয়া উমেশ, চক্রবর্তী খুড়ো, ক্ষেমঙ্করী, চক্রবর্তী-পরিবারের মেয়ে-জামাই সবাই এক গণতান্ত্রিক অধিকারসাম্যে উপন্যাসে তাৎপর্য-পূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে নলিনাক্ষ দৃশ্যতঃ দৈবযোগে

এবং অকারণে আসিয়া পড়িলেও এবং নায়কোচিত অন্তর্বেদনার মূল্য না দিয়াই, লেখকের বিশেষ অনুগ্রহে নাট্যশালার একেবারে প্রথম সারিতে স্থান লাভ করিয়াছে ও প্রতিনায়ক রূপে উপন্যাসের মূল সমস্যার সমাধানে একটি কৃত্রিম মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নলিনাক্ষ শেষ পর্যন্ত কমলার নিরুদ্দিষ্ট স্বামীরূপে তাহার সংস্কারক্লিষ্ট মনকে একটি স্থির আশ্রয় দিয়াছে ও উপন্যাসের জটিল গ্রন্থিচ্ছেদে মূল্যবান সহায়তা করিয়াছে। পাঠক যে এই সমস্ত জবরদখলকারীদের বিধিবহির্ভূত আচরণ শুধু উপেক্ষা করে না বরং সোৎসাহে উপভোগ করে, তাহাতেই প্রমাণ হয় যে উপন্যাসটি ষোল আনা মনোবিজ্ঞানের সূত্রানুসারী নয় বা উহার অন্তর্নিহিত সমস্যাটি খুব গভীর ও তাৎপর্যময় জীবনসমীক্ষার পরিচয়বাহীরূপে কল্পিত হয় নাই। ইহার ঔপন্যাসিক সত্তা কিছুটা ভ্রমণকাহিনী, কিছুটা জীবনধর্মী রূপকথার লক্ষণের দ্বারা রূপান্তরিত। লেখক এখানে জীবনের উচ্ছল কৌতুকরসের মেলা বসাইয়াছেন, জীবনতত্ত্বনিরূপণের পরীক্ষাগার স্থাপন করেন নাই। উপন্যাসের গোড়াতে নৌকাডুবি হইয়া জীবনে জট পাকাইয়াছে। কিন্তু পরবর্তী অংশে এই নৌকা রমেশ-কমলার ঈষৎ ভারাক্রান্ত চিত্তের সহিত উমেশ, চক্রবর্তী-খুড়ো প্রভৃতি জীবনভারহীন, কিন্তু জীবনানন্দে মস্‌গুল সহযাত্রীকে স্থান দিয়াছে। উপরন্তু রান্নার উপকরণসংগ্রহে ও স্বাদু ভোজ্যের আয়োজনে এই নৌকারোহীরা সমস্ত উৎসাহ ঢালিয়া দিয়া, শরতের আকাশ-পৃথিবীর সমস্ত স্নিগ্ধ সৌন্দর্যপান উপভোগ করিয়া যেন এক প্রমোদভ্রমণের অভিযাত্রী হইয়াছে।

এই যাত্রাশেষের শুভ পরিণামে না লেখক না যাত্রীদল কাহারও কোন সংশয় নাই। মর্মান্তিক সমস্যা এড়াইবার জন্য যে যাত্রার আরম্ভ, তাহা শেষ পর্যন্ত জীবন-মহোৎসবের প্রেরণা যোগাইয়া যাত্রার মূল উদ্দেশ্যটিকেই নূতন অর্থ দিয়াছে।

চারি বৎসর পরে প্রকাশিত (১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯১০) পরবর্তী উপন্যাস 'গোরার' সঙ্গে 'নৌকাডুবি'র কয়েকটি বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। এই দিক দিয়া 'নৌকাডুবি'-কে বিষয়বস্তু, চরিত্রকল্পনা ও মানসচিন্তার বিষয়ে 'গোরা'র পূর্বসূচনা মনে করা যাইতে পারে। পারিবারিক জীবনের উপর ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব এখানে ক্ষীণভাবে সুদূর প্রতিধ্বনির মত শোনা যায়। 'গোরা'তে যে ধর্মনিয়ন্ত্রণ উদ্দাম হইয়া উঠিয়া পরিবারব্যবস্থার স্বচ্ছন্দ বিকাশ ও শোভন

ছন্দের নিরোধ করিয়াছে, 'নৌকাডুবি'র আকাশ-বাতাসে সেই অভিভবশীল নির্ঘাতনসম্ভাবনা জনশ্রুতিরূপে নেপথ্যলোক হইতে ভাসিয়া আসিয়াছে। এই পীড়নের আশঙ্কা হেমনলিনীর বিবাহসমস্যাকে জটিলতর করে নাই, কেবল অন্তর্বর্তীকালের অনিশ্চয়তার অস্বস্তি বাড়াইয়াছে মাত্র। হেমনলিনীর সমস্যা সম্প্রদায়প্রভাবমুক্ত, নিছক ব্যক্তি ও পরিবারগত আয়তনে সীমাবদ্ধ। তাহার মনে ধর্মচিন্তা ও প্রেমভাবনার মধ্যে, শ্রেয় ও প্রেয়ের মধ্যে কোন অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রবল হইয়া তাহার পথনির্বাচনের সঙ্কটকে ঘনীভূত করে নাই। তাহার যাহা কিছু চলচ্চিত্ততা, তাহা বাহিরের ঘটনা-প্রভাবিত ও অভিভাবকদের পরস্পরবিরোধী উপদেশ-নির্দেশের মধ্যে সামঞ্জস্য-বিধানের দুরূহতাজাত। ব্রাহ্মসমাজ সশরীরে উপন্যাসে উপস্থিত নাই, উহার ছায়ামাত্র মাঝেমধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়া লেখকের জীবনচিন্তার পরোক্ষ ইঙ্গিত দিয়াছে। লেখক এমন একটি যুগে বাস করিতেছিলেন যেখানে ধর্মাদর্শ ও উহার সামাজিক প্রয়োগ শাস্ত্রের পাতা হইতে জীবনের কর্ম ও ভাবজগতে গভীরভাবে অনুপ্রবেশ করিতে প্রস্তুত হইতেছে। এই যুগে উহা নানারূপে নিজ অবাঞ্ছিত প্রভাবের চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। উহা কখনও সত্যান্বেষী অন্তঃসমীক্ষা বা চিন্তাদীপ্ত জীবনদর্শন-প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজমনে ধর্মোদ্দীপনের হেতু হইয়াছে। কোথায়ও বা সামাজিক উৎপীড়ন ও দলাদলিকে উত্তেজিত করিয়া, ব্যক্তিস্বাধীনতার কণ্ঠরোধে ও অন্য ধর্মের প্রতি উৎকট হিংসা দ্বেষপ্রচারে উহার উৎপীড়নেরও নিদর্শন দিয়াছে। 'গোরা'তে এই উদ্দীপ্ত ও বিকৃত ধর্মবোধের সমাজ-পরিপন্থী ও ব্যক্তিমনের উপর সূক্ষ্মতরভাবে ক্রিয়াশীল প্রভাব উপন্যাসে রূপ পাইয়াছে। 'নৌকাডুবি'তে এই পটভূমিকার একটি নিঃশব্দ নেপথ্য-আয়োজন আভাসিত হইয়া উভয় উপন্যাসের ভাবসাধর্ম্যের লক্ষণ সূচিত করিয়াছে।

পিতা ও কন্যার যে বিশুদ্ধ মধুর সম্পর্কে পরেশবাবুর সহিত সুচরিতা-ললিতার অকপট ভাববিনিময় ও সমস্যাক্লিষ্ট মনের শান্তি-অন্বেষণের মাধ্যমে প্রকাশিত হইয়া 'গোরা'র পারিবারিক জীবনচিত্রণকে এত আকর্ষণীয় করিয়াছে ও বৃহত্তর পরিবেশের সমস্ত অশান্তির মধ্যে একটি রমণীয় আশ্রয় অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে, নৌকাডুবি'-তে তাহারই পূর্বানুবৃত্তি বর্তমান। বলিতে গেলে, 'নৌকাডুবি'তে অন্নদা-হেমনলিনীর পারস্পরিক স্নেহব্যাকুল, শঙ্কিত

নির্ভরশীলতা আরও করুণ ও মর্মস্পর্শী। অন্নদা পরেশবাবুর ন্যায় স্থিতধী, আদর্শে অটল, ভগবৎশক্তিনির্ভর পুরুষ নহেন। তিনি একজন সাধারণ দ্বিধাদুর্বল সংসারী মানুষ—তাঁহার স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় কতকগুলি ধারণা তাঁহাকে স্নিগ্ধ পরিহাসের লক্ষ্যস্থল করিয়া তাঁহার চরিত্রকে আরও হৃদ্য করিয়াছে। তিনি ও তাঁহার মাতৃহারা কন্যা সংসারের সমস্ত ঝড়-ঝাপ্‌টা হইতে বাঁচিবার জন্য পরস্পরের পক্ষপুটে আশ্রয় লইতে সর্বদা ব্যস্ত। বৃদ্ধ পিতার শক্তির একমাত্র উৎস তাঁহার পরলোকগতা পত্নীর স্মৃতি-প্রভাবিত মমতাবোধ। তিনি সংসারের নামমাত্র কর্তা হইয়াও কাহারও উপর কর্তৃত্ব করেন না—তিনি একান্ত অসহায়, সরলবিশ্বাসী, শিশুচরিত্র মানুষ। হেমনলিনী কোন জটিল সমস্যা পিতাকে জানাইয়া তাঁহাকে বিব্রত করিতে চাহে না, পরন্তু পিতার অনুচ্চারিত ইচ্ছা অনুমান করিয়া উহারই অনুবর্তনে উৎসুক। তাহার প্রেমসংকট পিতার মনোবেদনা হইতেই দুরূহতর রূপ পরিগ্রহ করে। অন্নদা স্নেহদুর্বল পিতা মাত্র, আর কিছু নয়। সে পরেশবাবুর মত ধৈর্যশীল অভিভাবক ও অন্তর্যামী কর্তব্যবিধাতার যুগ্ম ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় নাই। পরেশবাবুর সবটুকু আমরা বুঝি না, হয়ত বোঝাও যায় না। বরদাসুন্দরীকে বিবাহ করার মত ভুল তিনি কোন্ মোহের বশবর্তী হইয়া করিয়াছিলেন তাহা আমাদের অনুমানেরও অতীত থাকে।

রবীন্দ্রনাথের সমস্ত উপন্যাসের মধ্যে 'নৌকাডুবি'র একদিক দিয়া অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব। এরূপ বিশুদ্ধ ও মনোজ্ঞ গার্হস্থ্যরসের পরিবেশন তাঁহার অন্য কোন উপন্যাসে নাই। শুধু অন্নদাবাবুর গার্হস্থ্য জীবন-বর্ণনা নয়, চক্রবর্তী-খুড়োর সংসারজীবন ও স্টীমারে ক্ষণিক গৃহস্থালীপাতার যে আংশিক খণ্ডচিত্র আমরা পাই,—সবই এক মধুর স্নেহরসে, এক প্রীতি-সমপ্রাণতার নিবিড়তায় পরিপ্লুত। এমন কি কাশীতে ক্ষেমঙ্করী—নলিনাক্ষের মর্মান্তিক বিচ্ছেদের বেদনাস্মৃতিশমিত, মতবাদবিভিন্নতার আশঙ্কায় কণ্টকিত জীবনযাত্রার মধ্যেও মাতা-পুত্রের আদর-আবদার, হুকুম-করা, ও মানিয়া-চলার যে স্বতঃস্ফূর্ত ছন্দ মানস স্নিগ্ধতার পরিচয় চিহ্নিত করিয়াছে তাহা রবীন্দ্রনাথের অন্য উপন্যাসে দুর্লভ। এই গার্হস্থ্য পরিবেশে আদর্শ-সংঘাতের তত্ত্বরূপ ছায়া ফেলিয়াছে, কিন্তু কোথাও উহার প্রসন্ন নির্মলতাকে অভিভূত করে নাই। উমেশ ও চক্রবর্তী-খুড়ো উপন্যাসে আগন্তুক, কিন্তু উহাদের মাধ্যমে গার্হস্থ্য জীবনব্যবস্থার চিরকালীন তুচ্ছতার মধ্যে—উহার

নিত্য মাধুর্যটি কোন মনস্তত্ত্বের আশ্রয়ে নয়, কোন গূঢ় তাৎপর্যের মধ্যবর্তিতার নয়, কিন্তু নিজের স্বরূপ-অধিকারে উপচিত হইয়াছে। কাব্যে সজনে ডাঁটার কোন সম্মানিত স্থান রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেন নাই, কিন্তু রান্নাঘরে উহার কৌলীন্য-মর্যাদাকে চক্রবর্তীর উচ্ছ্বসিত প্রশস্তির মধ্য দিয়া তিনি আবাহন জানাইয়াছেন। সমস্ত কবিসত্তার দিব্য ছদ্মবেশের আড়ালে ভোজনরসিক রবীন্দ্রনাথ নিজ ভৌম রুচির পরিচয় গোপন রাখিতে পারেন নাই। নবীন-কালীর স্বার্থপর, স্নেহহীন, কর্কশ সংসারযাত্রাতেও সাংসারিকতার ঠিক সুরটি বাজিয়া উঠিয়াছে।

'গোরা'-র বিকল্প সংজ্ঞা অবশ্য 'ঘরে-বাইরে' নয়, কিন্তু তাহার পরিবর্তে 'বাইরের ঘর' এই নাম রাখা চলিত। উহার অন্তঃপুরের কোন নিভৃত অন্তরঙ্গতা নাই, আছে বহির্জগতের হাজার সমস্যা, বিভিন্ন মতবাদের দুষ্কর সমাধানপ্রয়াস, বিতর্কজাত উত্তপ্ত চড়া সুরের মারমুখী প্রবেশ। এই ঘরে মনের কোন স্নিগ্ধ কলগুঞ্জন শোনা যায় না, শোনা যায় বাইরের উদ্দাম উত্তেজনার উচ্চকণ্ঠ বাগ্মিতা। আনন্দময়ীর কোন সত্যিকার ঘর ছিল না, ছিল একটা আত্মগোপনের লজ্জাকক্ষ মাত্র। তিনি সমস্ত সংসারবিবিক্ত হইয়া নিজ মনের নীরব বেদনা লইয়া কোন প্রকারে মাথা গুঁজিয়া ছিলেন। তাঁহার দাম্পত্য জীবনের ব্যর্থতা তিনি স্বীকার করিয়াই লইয়াছিলেন। তাঁহার মাতৃস্নেহ অলীকভাবকল্পনামুগ্ধ গোরার নিকট হইতে প্রতিহত হইয়া তাঁহার বিষণ্ণ অন্তরে ফিরিয়া আসিত, কিংবা হয়ত গোরা-প্রভাবিত বিনয়ের প্রতিদানোৎসুক চিত্তের নিকট আংশিক তৃপ্তি খুঁজিত। পরেশ-বাবুর গৃহ অনেকটা উপাসনামন্দিরের মত, পারিবারিক কোমল বৃত্তিগুলির স্ফুরণ ও বিকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র নয়। সেখানে নির্জন ধ্যানসাধনা ও আত্মসমীক্ষা স্তব্ধভাবে বিরাজিত, তরুণ চিত্তের হৃদয়-সমস্যা ভারমুক্ত হইবার আবেদন লইয়া এই ধ্যানমগ্নতার ক্ষণিক বিঘ্ন করে অতি সন্তর্পণে। ইহা অন্তঃপুরের স্নেহনিবিড়তা হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। সতীশের কলকাকলী উপভোগ করিতে হইলে আমাদিগকে বিনয়ের আতিথেয় আবাসে যাইতে হইবে। হরিমোহিনীর যখন নিজস্ব সংসার হইল, তখন ইহা নিরন্তর শুচিসংস্কারে পীড়িত ও সদা-সতর্ক সন্দিগ্ধতায় দুঃসহ। বলিতে গেলে এখানে কোন চরিত্রেরই বিশুদ্ধ ঘরোয়া জীবন নাই। বিনয়-ললিতার দাম্পত্য জীবন বিশ্রব্ধ প্রণয়ালাপের লীলা নয়, ইহা প্রতিকূলশক্তির বিরুদ্ধে

সংগ্রামজয়ী মানবাত্মার ক্লেশার্জিত নিরাপত্তাদুর্গ—ইহার প্রতি দেওয়াল অস্ত্রক্ষতচিহ্নিত, ইহার প্রতিটি বায়ুপ্রবাহ সত্যোসমাপ্ত যুদ্ধের বারুদগন্ধে জ্বালাময়। গোরা-সুচরিতার মিলন ত এক ভূকম্পনে অকস্মাৎ-বিধ্বস্ত ভিত্তির উপর মায়াপুরীনির্মাণ—আরব্য উপন্যাসের কোন জিন যেন হঠাৎ বাস্তববুদ্ধি-শাসিত কলিকাতা শহরে বাগদাদের যাদুশক্তি প্রয়োগ করিয়া ইহা ঘটাইয়াছে। 'ঘরে-বাইরে'-তে ঘর ও বাহিরের শক্তিপরীক্ষার জন্য এক দ্বন্দ্বক্ষেত্র ঘোষিত হইয়াছে। 'গোরা'-তে কোন যুদ্ধঘোষণা ছাড়াই বাহির ঘরকে নিঃশব্দে গ্রাস করিয়াছে।

চরিত্র-পরিকল্পনার দিক দিয়া সাম্য ও বৈষম্য উভয়েই তুল্যভাবে প্রকট হইয়াছে। পরেশবাবু অন্নদাবাবুর ব্যাকুল স্নেহদুর্বলতার সহিত অধ্যাত্ম প্রত্যয়ের দীপ্তি ও অচল ব্যক্তিত্বগৌরব যুক্ত করিয়াছেন। রমেশ বিনয়ের সৌজন্য-শ্লথতার পূর্বদৃষ্টান্ত ও হেমনলিনীকে সুচরিতার বুদ্ধিদীপ্ত সৌকুমার্যের সহিত তুলনায়, দুর্ভর হৃদয়বেদনার, এক মূক নিরুপায় ক্লেশসহিষ্ণুতার পাত্রীরূপে উহারই একটি অপরিণত সংস্করণ বলিয়া মনে হয়। কমলার কোন প্রতিরূপ গোরাতে নাই, তবে অক্ষয় হয়ত হারাণের দূর আত্মীয়রূপে বিবেচিত হইতে পারে। কিন্তু নিঃশব্দে উপেক্ষা ও পরিপাকে অভ্যস্ত, অশেষধৈর্যশীল ও সত্যই পরিবারের হিতাকাঙ্ক্ষী অক্ষয়ের মধ্যে হারাণের উদ্ধত আত্মশ্রেষ্ঠত্ববোধ নাই। ব্যর্থ প্রেমিকের ঈর্ষ্যা অপেক্ষা প্রত্যাখ্যাত প্রেমিকের অটুট আনুগত্যের আধিক্যই তাহার চরিত্রের শ্রদ্ধার্হ উপাদান। ক্ষেমঙ্করীর মধ্যে হরিমোহিনীর দূর সাদৃশ্য দেখা যায়, তবে ইহার স্নেহের দাবী স্নেহাস্পদের উপর নিজ ইচ্ছার উগ্র স্বেচ্ছাচারী প্রয়োগের পর্যায়ে পৌঁছে নাই। 'নৌকাডুবি'র সহিত তুলনায় 'গোরা'র মহাকাব্যোচিত বিরাট আয়তন ও ঘটনাপুঞ্জের বহুমুখী কর্মবিস্তৃতি ও সংঘাতনিবিড়তা উপন্যাসদ্বয়ের চরিত্রাবলীর সংখ্যা ও প্রকৃতি-বৈচিত্র্যের বিপুল পার্থক্যের কারণরূপে সহজেই প্রতিভাত হয়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে নৌকাডুবিতে ঘটনারই একাধিপত্য ও চরিত্রের মৃদু প্রতিক্রিয়া ঘটনাপ্রবাহের প্রবল প্রভাবের গৌণ অনুষঙ্গী। হেমনলিনীর সহিত অন্নদাবাবুর বাড়ীতে চায়ের আসরে চায়ের রসের সহিত যে

একটি মধুরতর রস রমেশের অন্তর-পেয়ালায় ক্রমসঞ্চিত হইতেছিল, বিবাহের জরুরী পরোয়ানাসমেত তাহার পিতার হঠাৎ আবির্ভাবে সেই যৌবনাবেশের পালায় ছেদ পড়িয়া গেল। অবশ্য এ পর্যন্ত কোন পক্ষেরই মনোভাব মৃদু আকর্ষণের পর্যায় অতিক্রম করে নাই। পুত্রের রুচি-অরুচির জন্য অপেক্ষা না করিয়া রমেশের পিতার রমেশের পাত্রী ও বিবাহসম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তঘোষণা দুর্বলচিত্ত রমেশের ক্ষীণ আপত্তিকে সোচ্চার হইয়া উঠিবার অবসর দিল না। তাহার পরে নৌকাডুবির দারুণ দুর্বিপাকে রমেশের পারিবারিক ব্যবহার একটা আমূল ওলট-পালট ঘটিয়া গেল ও তাহার সমস্ত জীবনে একটা অত্যন্ত জটিল সঙ্কট উপস্থিত হইল। ইহাই উপন্যাসের বিবর্তনে তথা রমেশের অদৃষ্টে, নিয়তির পরিহাসরূপে এক অমোঘ শক্তির অনুপ্রবেশ ঘটাইল।

অবশ্য এই কেন্দ্রীয় সংঘটনটি অপ্রতিবিধেয়রূপে আমাদের প্রত্যয়ে দৃঢ়মূল হয় না। রবীন্দ্রনাথ এই বস্তুসম্ভাব্যতার প্রশ্নটি এড়াইয়া গিয়াছেন। তিনি একটা পরীক্ষাকার্য চালাইবার জন্য বীক্ষণাগারে যে বিশেষ ধরনের যোগাযোগকে প্রমাণনিরপেক্ষভাবে মানিয়া লইতে হয়, নৌকাডুবির ঘটনা-সংস্থান ও পরিণতিকে সেই পর্যায়ে ফেলিয়াছেন। তিনি বাস্তব বিচার-বুদ্ধি দিয়া এই সম্ভাবনার মূল্যায়ন না করিয়া, working hypothesis-এর মত ইহাকে দেখিয়াছেন। তাঁহার উপন্যাসের মুখ্য প্রতিপাদ্য হইল কমলার সহিত রমেশের এইরূপ অস্বাভাবিক সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিতে পারিত কিনা তাহা নয়। কিন্তু এইরূপ জট যদি পাকাইয়াই থাকে, তবে হিন্দু তরুণীর পক্ষে স্বামী বলিয়া গৃহীত ভদ্র ও রুচিসম্পন্ন যুবকের প্রতি অনুরাগ পোষণ করিবার পর, ভুল ভাঙিলে এই আকর্ষণের সম্পূর্ণ বিস্মরণ এবং সমস্ত অনুতপ্ত হৃদয়াবেগ লইয়া অজ্ঞাত বৈধ স্বামীর নিকট আত্ম-নিবেদনের অদম্য আকূতি কতদূর সম্ভব এই কাল্পনিক প্রশ্নের মীমাংসাই তাঁহার মুখ্য অভিপ্রায়। কিন্তু এই পরিবর্তনের সম্ভাব্যতা শেষ পর্যন্ত জীবনের প্রামাণ্য সাক্ষ্যের উপরই নির্ভর করে। ঔপন্যাসিক যদি জীবনের দলিল হইতে এই দাবীর সমর্থন পান, বা তাঁহার উপন্যাসের রূপায়ণের মধ্যে এই জীবনসত্যের স্বরূপ ফুটাইয়া তুলিতে সক্ষম হন, যদি সত্যই পাঠকের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করিতে পারেন যে তিনি তাঁহার জীবনভাষ্যে জীবনের মূল পুঁথিরই মর্মবাণী প্রতিফলিত করিয়াছেন, তবেই এই কল্পনা-প্রস্তাবিত

জিজ্ঞাসার চূড়ান্ত উত্তর মিলিতে পারে। এক হিসাবে, সমস্ত উপন্যাসই কল্পনাসম্ভব, তবে এই কল্পনা বাস্তবরসপুষ্ট। মানবপ্রকৃতির চিরন্তন হৃৎস্পন্দনটি ও উহার গতি-পরিণতির যথার্থ স্বরূপটি লেখক তাঁহার সৃষ্ট নর-নারীর ও তাহাদের ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে অভিব্যক্ত করেন। সব সমস্যাই কাল্পনিক ; জীবনের মূল সূত্র উহাদের মধ্যে অনুস্যূত থাকে বলিয়াই উহারা বিশ্বাসযোগ্যতা ও জীবনের প্রতিনিধিত্ব-গৌরব অর্জন করে। সমগ্র শৃঙ্খলের মধ্যে কোন দুর্বল গ্রন্থি থাকিলে গ্রন্থনপ্রক্রিয়া সামগ্রিকভাবে শিথিল হইয়া পড়ে। কমলার পক্ষে রমেশকে ভোলা ও নলিনাক্ষকে সমস্ত নিষ্ঠা দিয়া ভালবাসা বিশ্বাসযোগ্য হইবে উপন্যাসের জীবনচিত্রণের ভিত্তিতে। কমলার মনে কতটা গভীর দাগ পড়িয়াছিল ও সেই দাগ কত দ্রুত মুছিয়া গেল তাহার সম্ভাব্যতা বিচার করিতে গেলে কমলার মনই একমাত্র প্রমাণ। উপন্যাসের কাহিনীতে হয়ত দৈব সংঘটনের স্থান থাকিতে পারে, কেননা বহিঃপ্রকৃতি এখনও মানব শৃঙ্খলার শাসনাতীত। কিন্তু অন্তর্জগতের পরিবর্তনে অলৌকিকের কোন ন্যায্য অধিকার স্বীকার করা যায় না। অলৌকিককেও মনস্তত্ত্বের ছাড়পত্র লইয়া উপন্যাসে প্রবেশ করিতে হইবে। হিন্দুনারীর পতি-সংস্কার রক্তধারা-বাহিত, অবচেতন মনের সমস্ত সুপ্ত ঐতিহ্যশক্তিলালিত, দুর্মর মনোবৃত্তি। কিন্তু ঔপন্যাসিক ঘটনা ও চরিত্রসংঘাতের মধ্যেই উহার শক্তি পরীক্ষা করিতে হইবে। রমেশকে হটাইতে হইলে নলিনাক্ষকে মানুষ হিসাবে তাহার যোগ্যতা দেখাইতে হইবে। দৈবমন্ত্রের অক্ষয়কবচ পরিয়া সে ঔপন্যাসিক উপায়ে জয়ী হইতে পারে না। কমলার উত্তেজিত মনোবৃত্তিতে, তাহার মানস বিপর্যয়ের মধ্যে তাহার অভ্যর্থনার যোগ্য ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে কিনা তাহাই শেষ পর্যন্ত সমাধানের যৌক্তিকতা ও গ্রহণীতার মানদণ্ড হইবে। নলিনাক্ষের আদর্শ-কল্পনাই যদি রমেশের প্রাত্যহিক স্নেহসাহচর্যলালিত আকর্ষণকে উন্মূলিত করিবার পক্ষে যথেষ্ট শক্তিশালী হয়, তবে উপন্যাসের মনোবিজ্ঞানসমর্থিত জীবনপরিচয়কে এক অন্ধ আবেগসংস্কারের নিকট পরাজয় বরণ করিতে হয়।

যাহা হউক এ প্রশ্নের মীমাংসা আপাততঃ স্থগিত রাখিয়া ঘটনাবৃত্তের অনুসরণে উহার মানস প্রভাবের সূত্রটিই লক্ষ্য করা যাইতে পারে। নৌকা-ডুবির পর রমেশ মৃত্যুদ্বারপ্রত্যাবৃত্ত, দৈবলব্ধ নববধূটিকে নিজ-পরিণীতা স্ত্রীরূপে নিঃসংশয়ে গ্রহণ করিল। কিন্তু সাংসারিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিবার জন্য

তাহাকে পল্লীগৃহে তিন মাস কাটাইতে হইয়াছিল। এই সুদীর্ঘ সময় কৌতূহলী অন্তঃপুরিকাদের উদ্যত জিজ্ঞাসার ঝটিকাবর্তে যে কমলার ছদ্ম অবগুণ্ঠন যে উড়িয়া যায় নাই ইহা কিছুতেই বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। বিশেষতঃ রমেশের পরিবারের সহিত সুশীলার পরিবারের যে ঘনিষ্ঠ পূর্ব-পরিচয়ের কথা লেখক উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার সম্পূর্ণ যোগসূত্রটি যে কয়েকজন পুরুষ অভিভাবকের মৃত্যুতে একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে তাহাও সম্ভাব্যতার সীমা অতিক্রম করে। নববধূর নাম-পরিবর্তনে কমলার যে সংশয় উদ্রিক্ত হইয়াছিল তাহারও সম্পূর্ণ নিরসন অস্বাভাবিক ঠেকে। নববধূ যতই সরল ও সংসারানভিজ্ঞা হউক, তাহার সহজ নারীসংস্কার পরিবেশের মধ্যে একটা উল্টা হাওয়ার অস্তিত্ব অনুভব না করিয়া পারে না। কিছু একটা গোলযোগ ঘটিয়াছে এ সংশয় একবার উদ্দীপ্ত হইলে সম্পূর্ণভাবে মিলায় না। অনন্তবিহারে অভ্যস্ত লেখকের পক্ষে তিন মাস খুবই ক্ষুদ্র কালখণ্ড, কিন্তু হাঁড়ির খবর জানিতে পটীয়সী পল্লীরমণীর পক্ষে তাহা এক নূতন মহাদেশ আবিষ্কারের পক্ষে পর্যাপ্ত। লেখক এই অস্বস্তিকর পরিবেশ হইতে যথাসম্ভব দ্রুত অপসরণে শুধু যে রমেশ-কমলাকে অকাল গ্রন্থিমোচনের নিশ্চিত পরিণাম হইতে বাঁচাইয়াছেন তাহা নয়, নিজ উপন্যাস-শিল্পকেও অপঘাতমৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছেন। রমেশের সত্যোপলব্ধির দারুণ অভিঘাত যে কমলার সংশয়ভীরু চিত্তে কোন প্রবলতর কম্পন সঞ্চারিত করিল না, তাহাই আশ্চর্য মনে হয়। কমলা যে কিছু লেখাপড়া জানিয়াও নিজ মাতুলালয়ের সঠিক ঠিকানা বা ভাবী বরের নাম সম্বন্ধেও সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল ইহা আমাদের বিশ্বাসপ্রবণতাকে গুরুতর পীড়িত করে। মনে হয় এগুলি সবই রবীন্দ্রনাথের উপপত্তির ভিত্তিরচনার উপাদানমাত্র, খেয়ালের রাজ্য হইতে আমদানী বাস্তববন্ধনমুক্ত আগন্তুক।

ইহার পর কলিকাতার বাসায় নূতন জীবনারম্ভের পালা ও সান্নিধ্য-নিবিড়তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এড়াইবার উদ্দেশ্যে কমলাকে বোর্ডিং-এ রাখার ব্যবস্থা। ইতিমধ্যে অন্নদাবাবুর পত্রে আমন্ত্রণ ও হেমনলিনীর সঙ্গে অতর্কিত সাক্ষাৎ রমেশের অদৃষ্টে অতীত সম্পর্ক-সূত্রের পুনর্যোজনা ঘটাইয়া উহাকে দুশ্ছেদ্য জটিলতাজালে বন্দী করিল। এই অবস্থা-সঙ্কটে রমেশের আচরণ নিছক পলায়নীবৃত্তির অসহায় অনুবর্তনের পরিচয় দিয়াছে। সাধারণ রুচিসম্পন্ন শিক্ষিত ভদ্রলোকের চরিত্রে যে ন্যূনতম নীতিজ্ঞান ও

দায়িত্ববোধ প্রত্যাশিত রমেশ-চরিত্র তাহারও একটি শোচনীয় ব্যতিক্রম। রবীন্দ্রনাথ এইরূপ একটি দুর্বলচিত্ত, ভাববিলাসী, কর্তব্যভ্রষ্ট ব্যক্তিকে আকর্ষণীয় চরিত্ররূপে দেখাইয়া, তাহাকে শাশ্বত প্রেমিকের লাবণ্যচর্চিত ও তাহার প্রেমিকসুলভ উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তকে প্রশ্রয়মধুর দাক্ষিণ্যে অভিষিক্ত করিয়া আমাদের স্নেহাধিকারে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কমলার সহিত একত্রবাসে তাহার অবিচলিত সংযমে যে চরিত্রদৃঢ়তা ও আদর্শনিষ্ঠা প্রকাশ পাইয়াছে তাহার একটি ক্ষীণতম আভাসও যদি তাহার কর্তব্যনির্ধারণে উদাহৃত হইত, তবে এই সমস্যার গোড়া হইতে মূলচ্ছেদ ঘটিত। কৃত্রিম পরমায়ুবৃদ্ধির ব্যবস্থায় জীয়াইয়া-রাখা সঙ্কটের বিরুদ্ধে আপ্রাণ সংগ্রামের প্রয়োজনই হইত না। যে রমেশ এই দুর্নিবার প্রলোভনকে হেলায় জয় করিল, সে কেন স্পষ্ট স্বীকারোক্তির সৎসাহস অর্জন করিতে পারিল না তাহা তাহার প্রকৃতিতে একটি প্রহেলিকা বলিয়াই ঠেকে। রমেশচরিত্র এই অজেয় শক্তির ও অবজ্ঞেয় ভীরুতার এক বিসদৃশ সমন্বয়। আমাদের সন্দেহ হয় যে, রমেশের স্বভাবকোমলতার রমণীয়তা দেখাইবার জন্যই তাহার সঙ্গে অক্ষয় ও যোগেনের চরিত্রের অনুদার সন্দেহপ্রবণতা ও স্থূল জীবনবোধের বৈপরীত্য এত ফলাইয়া তোলা হইয়াছে ও তাহার মনে প্রকৃতিচেতনাবাসিত অনুভূতি-সৌকুমার্যের কবিত্বময় ভাবচিন্তা প্রচুর পরিমাণে আরোপিত হইয়াছে।

কয়েকটি অধ্যায় ধরিয়া এই আত্মবিস্মৃত, ফলাফলজ্ঞানরহিত প্রণয়চর্চা চলিতে লাগিল। এই পর্যায়ে প্রেমের সনাতন ভাববিভোরতা, প্রণয়কলার রীতি-নির্দিষ্ট অনুশীলন, উহার বে-হিসাবী ভুল-ভ্রান্তি ও হাস্যকর আচরণ-অসঙ্গতি উভয় প্রেমিকের ক্ষেত্রেই অবাধ স্ফূর্তি লাভ করিয়াছে। রমেশের সঙ্গীতসাধনা ও হেমনলিনীর সঙ্গীতশিক্ষণ এই প্রণয়াবেশের মধ্যে আনুষঙ্গিক উপাদানরূপে বিশুদ্ধ হাস্যরসের উপলক্ষ্য যোগাইয়াছে। এই নিবিড়, বাস্তববিলোপী প্রেমস্বপ্নের মধ্যে কোন সংশয় ছায়াপাত করে নাই। কোন সমস্যা উহার একটানা প্রবাহে আবর্ত রচনা করে নাই, এই স্বপ্নাচ্ছন্ন পরিস্থিতির মধ্যে, অন্নদাবাবুদের পূজাপূর্ব প্রবাসযাত্রার আয়োজনের প্রাক্‌কালে হঠাৎ অক্ষয়ের কণ্ঠে উচ্চারিত বস্তুজগতের রূঢ় সতর্কবাণী প্রেমিক-যুগলের ধ্যানতন্ময়তায় ছেদ ঘটাইল।

পূজার ছুটিতে কমলার স্কুলবোর্ডিং হইতে প্রত্যাবর্তন প্রণয়ের এই

কল্পলোকে দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যসঙ্কটের অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রবেশপথ উন্মুক্ত করিয়া উহার আদর্শ ভাবসুষমাকে বিপর্যস্ত করিল। হেমনলিনীর প্রণয়মাদকতা—উপভোগের মধ্যে কমলার অতি-প্রত্যক্ষ দাবী এক অস্বস্তিকর কণ্টকবেধের অনুভব জাগাইল। হেমনলিনীর সহিত বিবাহের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত ও দিন পর্যন্ত নির্ধারিত হইবার পর কমলার সহিত রমেশের সম্পর্ক-সমস্যা এক দুর্লঙ্ঘ্য বাধার ন্যায় প্রতিভাত হইল। প্রেমের বিস্মরণী মন্ত্রে এই অতি-স্বাভাবিক সম্ভাবনার কথা রমেশ যে ভুলিয়াছিল তাহা তাহার চরিত্রের একটি দুর্বোধ্য অংশ। হঠাৎ এই দারুণ অবস্থার সম্মুখীন হইয়া রমেশ একেবারে দিশাহারা হইয়া পড়িল। এখনও তাহার প্রকৃত অবস্থা খুলিয়া বলিবার সাহস হইল না। সে এখনও লুকোচুরি করার হীনতাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিল। তাহার আচরণ সন্দেহজনক হইয়া উঠিতেছে ও তাহার অব্যবস্থিতচিত্ততার কোন সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিবার নাই ইহা উপলব্ধি করিয়াও সে খোলাখুলি স্বীকারোক্তি করার পথ অবলম্বন করিল না। অবশ্য এখন কমলার সুনামরক্ষা তাহার ভীরুতার একটা নীতিগত সমর্থন যোগাইয়াছে। এই পৌরুষহীন, যে-কোন উপায়ে বিপদকে ঠেকাইয়া রাখিবার বিড়ম্বনাময় পরিস্থিতির মধ্যে একমাত্র উজ্জ্বল ব্যতিক্রম হইল রমেশের প্রতি হেমনলিনীর আত্মরক্ষার জন্য তাহার আবেগময় আবেদন ও হেমনলিনীর এই আবেদনের অকুণ্ঠ, নির্বিচার স্বীকৃতি। এই জোড়াতালি-দেওয়া, মেরুদণ্ডহীন আচরণের মধ্যে ইহাই একমাত্র আদর্শনিষ্ঠার জ্বলন্ত স্বাক্ষর, শিথিলবিস্তার জলাভূমির মধ্যে ঋজু পর্বতশৃঙ্গের উন্নত মহিমা।

ইতিমধ্যে কমলা বোর্ডিং হইতে বাড়ীতে ফিরিয়াছে ও অক্ষয়-পরিচালিত যোগেন্দ্র রমেশের বাসায় আসিয়া তাহার ও কমলার একত্রবাসের সমস্ত প্রমাণ চাক্ষুষ করিয়াছে। সুতরাং রমেশের বিরুদ্ধে সন্দেহ এখন প্রমাণ-সমর্থিত অভিযোগের পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে। এই চরম অবস্থাতেও রমেশ কিন্তু কমলার সঙ্গে তাহার সম্পর্ক-রহস্যের সূত্রটি প্রকাশ করে নাই—কমলাকে কুৎসা হইতে বাঁচাইবার একটা অসম্ভব প্রয়াস তাহাকে এখনও সত্য ঘোষণায় বাধা দিয়াছে। সেই মূঢ় অবিবেচক তাহার নীরবতার অবশ্যম্ভাবী ফল সম্বন্ধে এখনও অজ্ঞ রহিয়াছে—কোন কথা না বলা যে সত্যভাষণের অপেক্ষা আরও হাজার গুণে মারাত্মক হইবে, তাহা তাহার সংসারানভিজ্ঞ মন বুঝিতে পারে নাই। একটা কল্পিত মহানুভবতার মিথ্যা আশ্রয়ে সে

আপনার উদ্দেশ্যের সততা সম্বন্ধে নিশ্চিত হইয়াছে। আবার সে গোপনতা ও ছলনার বাঁকা পথ অবলম্বন করিয়া পলায়নে আত্মরক্ষা করিতে চাহিয়াছে। সে কোন নির্দিষ্ট উপায় ঠিক না করিয়াই কমলাকে সঙ্গে করিয়া দেশে চলিয়াছে—ভাবেও নাই যে কলিকাতার জনারণ্যের তুলনায় পল্লীসমাজের নীরন্ধ্র কৌতূহল ও অতিঘনিষ্ঠ সমাজদৃষ্টি তাহাদের পক্ষে আরও দুঃসহ পরিস্থিতি সৃষ্টি করিবে। অগ্নিবলয়ে বন্দী মানুষ যেমন দিগ্বিদিক জ্ঞান-শূন্য হইয়া নিরাপত্তা খুঁজিতে গিয়া অগ্নিকুণ্ডের কেন্দ্রের দিকেই আগাইয়া যায়, রমেশও তেমনি আত্মরক্ষার সহজ-প্রবৃত্তি-চালিত হইয়া উত্তপ্ত কটাহ হইতে জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপাইয়া পড়িতে উদ্যত হইয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে অক্ষয়ের নিপুণ গোয়েন্দাগিরি তাহাকে এই আসন্নতর সর্বনাশ হইতে অংশতঃ রক্ষা করিয়াছে। সে স্বগ্রামের বিষাক্ত পরিবেশ হইতে আপাতত উদ্ধার পাইয়া স্টীমারযাত্রার নির্জনতার মধ্যে সাময়িক আশ্রয় লইয়াছে ও বহির্জগতের কুৎসিত পরিবাদ ও জনরবের উন্মুখর, বহু ধারায় প্রবাহিত বিদ্বেষস্রোত এড়াইয়া আত্মসমীক্ষার নীরব, মর্মদাহী অস্বস্তি রোমন্থন ও পরিপাকের অবসর পাইয়াছে। বাহিরের আক্রমণ হইতে রেহাই পাইয়া সে অন্তর্দ্বন্দ্বের নিঃশব্দ উদ্‌ভ্রান্তি, কর্তব্যসঙ্কটের মানস অস্বস্তি পূর্ণমাত্রায় অনুভব করিয়াছে।

৩

গঙ্গাবক্ষে স্টীমার-যাত্রা শুধু যে উপন্যাসের বাহিরের পরিবেশকে বদলাইয়া লেখকের প্রকৃতিসৌন্দর্যানুভূতি ও জীবনসমীক্ষাকে এক উদারতর বিস্তার ও নিগূঢ়তর ভাবতাৎপর্যের অবসর দিয়াছে তাহা নয়। ইহা উপন্যাসের অন্তর-সমস্যাটিকেও নূতন বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত করিয়া উহার ছন্দ ও উত্তাপের রূপান্তর সাধন করিয়াছে ও উহাদের মধ্যে একটা গভীরতর প্রশান্তি ও বিশ্বব্যাপারের সহিত একটা বৃহত্তর সামঞ্জস্যের সঞ্চার করিয়াছে। রমেশ-কমলার যে হৃদয়-সম্পর্কটি কলিকাতার জনাকীর্ণ, সংঘাতময় পরিবেশে একটা প্রধূমিত বিক্ষোভের ন্যায় অতৃপ্তি ও দাহ বিকীর্ণ করিতেছিল, তাহা গঙ্গার মুক্ত হাওয়া, চলমান প্রাণযাত্রার সংস্পর্শে ও উদার দিগন্তব্যাপী পটভূমিকায়

এক নির্মলতর ভাবলোকে উত্তীর্ণ হইয়াছে। সমস্যার তীব্রতা কমে নাই, কিন্তু উহার জ্বালা প্রশমিত হইয়াছে। রমেশের জীবন-সঙ্কটের নিরবচ্ছিন্ন অস্বস্তি, কমলার মনের গূঢ় অতৃপ্তি ও দুর্বোধ্য বিষণ্ণতা প্রতিবেশের স্নিগ্ধ স্পর্শে নিরাময় না হইলেও শান্ত হইয়াছে, প্রকাশ্য বিদ্রোহের বিস্ফোরক শক্তি সঞ্চয় করিতে পারে নাই। তাহাদের বেদনাকে যেন কোন অদৃশ্য শুশ্রূষা মৃদু ও সহনীয় করিয়া দিয়াছে। তাহা ছাড়া, নূতন চরিত্রের অভ্যাগম, নূতন জীবনরসের উদ্বোধন এই দ্বন্দ্বকে নূতন কক্ষপথে ফিরাইয়া দিয়াছে—আত্ম-কেন্দ্রিক বেদনা সমষ্টিগত প্রাণচাঞ্চল্যে অনেকটা মন্দীভূত হইয়াছে। গৃহিণী-পণার নূতন ক্ষেত্র, সংসারযাত্রার আয়োজন, একটি ক্ষুদ্র পরিবারের বহুমুখী স্নেহ ও কর্তব্যের আকর্ষণ কমলার ব্যক্তিগত সমস্যাকে ভারমুক্ত করিয়া দিয়াছে। উমেশ, চক্রবর্তী খুড়ো এই তরুণ-তরুণীর অব্যবহিত নৈকট্যে ব্যবধান রচনা করিয়া একমুখী প্রবাহকে নানা শাখা-পথে নিবর্তিত করিয়াছে। রমেশ ও কমলা নিরন্তর সমস্যা-পীড়িত অবস্থা হইতে মুক্তি পাইয়া কেবল বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্যে তাহাদের জটিল বন্ধনের বিষয়ে সচেতন হইয়াছে। দ্বৈত সত্তার অবিভক্ত দায়, সমস্ত পরিবার-মণ্ডলের নানা লৌকিক কর্তব্যের বিস্তৃততর পরিধিতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

এই জলযাত্রায় রমেশের বিশেষ কোন নূতন মনস্তাত্ত্বিক পরিণতি ঘটে নাই, কিন্তু কমলার নারীধর্ম নানা নূতন অঙ্কুর ও ডালপালা মেলিয়া নব প্রাণশক্তির পরিচয় দিয়াছে। রমেশ নানা পরোক্ষ ইঙ্গিতে, নানা কাল্পনিক কাহিনীর গূঢ় তাৎপর্যে তাহার পীড়িত বিবেককে মুক্তি দিতে খুঁজিয়াছে ও কমলার মনে তাহাদের সম্পর্কজটিলতার একটা অস্পষ্ট সংশয়ের উদ্রেক করিবার চেষ্টা করিয়াছে। তাহার নূতন শিক্ষা বা অগ্রগতির কোন লক্ষণই দেখা যায় না। সমস্ত নূতন বৃত্তির উন্মেষ ও অনাস্বাদিত আকাঙ্ক্ষার উৎকণ্ঠা কমলার মধ্যেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে তাহার প্রশান্ত জীবনযাত্রার মধ্যে একটা নিগূঢ় অভাববোধে পীড়িত হইয়াছে। রমেশের সমস্ত যত্ন ও শুভেচ্ছা তাহার মনে প্রীতি না জাগাইয়া এক অহেতুক অভিমান ও সঙ্গিহীনতার অতৃপ্তিই ঘনাইয়া তুলিয়াছে। সে অস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিয়াছে যে রমেশের প্রতি তাহার প্রকৃত অধিকার-বোধ একটা মৌলিক শূন্যগর্ভতার জন্যই গড়িয়া উঠিতে পারিতেছে না। তাহার গৃহিণীত্বের মর্যাদা, সংসারের আধিপত্য সবই অমূল তরুর ন্যায় ভিত্তিহীন। তথাপি তাহার বঞ্চিত সত্তাকে সান্ত্বনা

দিবার জন্যই সে ঘটা করিয়া সাংসারিক ব্যবস্থাপনার আশ্রয় লইয়াছে। শয্যার ব্যবধান যেন মারাত্মক দূরত্বের ন্যায় তাহাকে নিঃসঙ্গতা ও নিরাশ্রয়তার বেদনায় অভিভূত করিয়াছে। জ্যোৎস্না-প্লাবিত শরৎরজনী যেন রমেশের সত্তাকে এক অনায়ত্ত নেপথ্যলোকে আড়াল করিয়া অন্তরঙ্গ পরিচয়ের পথে অলঙ্ঘ্য বাধার কুহেলিকা-বিভ্রান্তি ঘনীভূত করিয়াছে। শেষ পর্যন্ত রমেশও কমলার হেঁয়ালি-দুর্ভেদ্যতার বিষয়ে সচেতন হইয়া উঠিয়াছে ও তাহার সহিত সরল মীমাংসা আর বেশী দিন ঠেকাইয়া রাখা যাইবে না তাহা বুঝিয়াছে। এখন পর্যন্ত এই প্রত্যক্ষ ও প্রাত্যহিকতার সমিধপুষ্ট লেলিহান বহ্নিশিখার প্রতি মনোযোগী হওয়া অপেক্ষা হেমনলিনীর সহিত নীতিগত সম্পর্ক পরিষ্কার করাকেই সে অগ্রাধিকার দিয়াছে। তাহার মনের একপাশে যে আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে তাহাকে সাম্‌লানোর চেয়ে অঙ্গীকারের এক সুদূর-শীতল আত্মিক বন্ধনকে অধিক গুরুত্ব দিয়া সে যে প্রকৃতির নিয়মের বিরোধিতা করিতেছে এই সত্য সে উপলব্ধি করে নাই।

ঠিক এই সঙ্কটক্ষণে, চরমসিদ্ধান্তগ্রহণের প্রাক্-মুহূর্তে চক্রবর্তী খুড়োর প্রবেশ রণভূমির সমস্ত প্রকৃতিকেই বদলাইয়া দিয়াছে। দ্বৈরথ যুদ্ধে যখন একটা সাংঘাতিক পরিণতি অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে, তখন হঠাৎ নিরপেক্ষ রঙ্গপ্রিয় দর্শকের আবির্ভাব যেমন সংগ্রামের তীব্রতাকে হ্রাস করিয়া উহার স্রোতকে মন্থরগামী করে, খুড়ার উপস্থিতি এই নিঃশব্দ ঘাত-প্রতিঘাতের উত্তাপ ও উত্তেজনাকে সেইরূপ কমাইয়া দিয়াছে। খুড়া আসার ফলে যুধ্যমান একপক্ষ রন্ধনশালার নিরুত্তাপ, যৌথ প্রয়োজনের অসংখ্য ছোট-খাট ফরমায়েসে বিক্ষিপ্ত, ব্যথাবিদ্ধ আত্মানুসন্ধানের অস্বস্তিমুক্ত, ঘরোয়া আলাপের মৃদু বাতাসে উপভোগ্য, আবহাওয়ায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়াছে ও নিজের অভাব ও বেদনার কথা সাময়িকভাবে ভুলিয়াছে। রমেশও তাহার নিঃসঙ্গতার আড়ালে আত্মগোপন করিয়া কমলার সঙ্গে বোঝাপড়া করিবার আশু দায়িত্বকে অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতে মুলতুবি রাখিবার সুযোগ পাইয়া আরাম বোধ করিয়াছে। যুদ্ধের মাঝখানে ক্ষণবিরতির শ্বেত-পতাকা উড্ডীন হইয়া উভয় পক্ষকেই আপাতশান্তি দিয়াছে।

চক্রবর্তী খুড়ো রমেশ-কমলার সম্পর্কের মধ্যে একটা পীড়াদায়ক অসঙ্গতির ফল্গুপ্রবাহ শীঘ্রই ধরিয়া ফেলিয়াছে ও সাংসারিক অভিজ্ঞতার মানদণ্ডে উহার স্বরূপ নির্ণয় করিতে উদ্যোগী হইয়াছে। সে ভদ্রতার সীমা রক্ষা

করিয়া রমেশের এই দুর্বোধ্য আচরণের কারণ জানিতে চাহিয়াছে। রমেশ কিন্তু কথার মারপেঁচ, বাগ্‌বৈদগ্ধ্য ও দার্শনিকতার অন্তরালে তাহার শুভেচ্ছা-প্রণোদিত কৌতূহলকে নিবারিত করিয়াছে। রমেশের গন্তব্যস্থল বিষয়ে অনিশ্চয়তা তাহার সংশয়কে আরও ঘনীভূত রূপ দিয়াছে। শেষ পর্যন্ত কমলাই খুড়ো ও রমেশের পারস্পরিক আকর্ষণের মধ্যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া গাজিপুরে খুড়োর অনুগামী হইবার পক্ষেই নিজ প্রবল ও অপরিবর্তনীয় অভিমত ঘোষণা করিয়াছে। ইহাতে রমেশের প্রভাব-পরিধি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সে খুড়ার স্নেহশীল অভিভাবকত্বের নিকটই নিজ সমস্যাক্লিষ্ট জীবন-নিয়ন্ত্রণের ভার তুলিয়া দিয়াছে। রমেশ মুখ রাখিবার জন্য এই ঘোষণাতে ঢেড়াসই করিতে বাধ্য হইয়াছে। কমলার জীবনযাত্রা রমেশ-রাশিচক্র অতিক্রম করিয়া চক্রবর্তী-রাশিচক্রে প্রবেশ করিয়াছে। এই ঘটনাটি কমলার জীবনগতিপথে একটি তাৎপর্যময় দিক্-পরিবর্তন সূচিত করে। কমলার স্থিরসঙ্কল্পের সহিত রমেশের দ্বিধা-দুর্বল চলচ্চিত্ততা উভয়ের বন্ধনমুক্তির পূর্বাভাসবাহী ও তাহার প্রতি কমলার ক্রমিক স্বামিসংস্কার-লোপের প্রথম স্তর।

গাজিপুরে পৌঁছানোর পর চক্রবর্তীদুহিতা শৈলজার সর্বচেতনাব্যাপ্ত, অথচ নিতান্ত ঘরোয়া স্বামিপ্রেম কমলাকে আসল বস্তুর পরিচয় দিয়া তাহাকে প্রেমের স্বরূপ-উপলব্ধিতে বিশেষ ভাবে সহায়তা করিয়াছে। আসলের সহিত তুলনায় রমেশের মেকী-প্রেম তাহার নিকট ধরা পড়িয়া গিয়াছে। যে অনির্দেশ্য অভাববোধের জন্য তাহার অন্তর অহরহ পীড়িত হইতেছিল সে এবার তাহার মূল তত্ত্বটি বুঝিল। রমেশের সমস্ত আদর-যত্ন, সমস্ত শুভানুধ্যায়িতার যে কপট অধিকারপ্রয়োগ তাহাকে নিগূঢ় অপমানে বিদ্ধ করিতেছিল তাহা তাহার নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল ও রমেশের সহিত সম্পর্কের মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন লজ্জা তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। প্রথম যৌবনের যে সহজসংস্কারলব্ধ অনুভবস্বচ্ছতা প্রতি নারীকেই প্রেমরহস্যের সন্ধান দেয়, তাহার অভাব সম্বন্ধে সে সচেতন হইয়া উঠিল। তাহার যৌনচেতনাবিকাশের মধ্যে যেটুকু অসম্পূর্ণতা ছিল তাহা শৈলজার সখিত্বের উত্তাপে ও দাম্পত্যলীলার নিবিড় মুগ্ধতার পরিচয়ে সম্পূর্ণ অপসারিত হইয়া গেল ও প্রণয়ের সত্তারূপান্তরকারী ইন্দ্রজালে সে অনায়াসসিদ্ধি লাভ করিল। এই মোহভঙ্গের স্নিগ্ধ আলোকে সে প্রেমদেবতার মূর্তি প্রত্যক্ষ

করিল ও রমেশ যে তাহার মনোমন্দিরে এই দেবতার আসনে বসিবার অধিকারী নয় সে সম্বন্ধে তাহার কোন বিভ্রান্তি রহিল না। রমেশের সহিত তাহার সম্পর্কচ্ছেদের আকস্মিকতার পটভূমিকায় নারীপ্রকৃতির এই নিঃশব্দ পরিবর্তন-প্রস্তুতির, উহার অলক্ষিত, কিন্তু অনিবার্য উন্মেষের ভূমিকা বিশেষভাবে বিচার্য। ইহা শুধু হিন্দু নারীর নয়, সর্বজনীন নারীধর্মের সাধারণ লক্ষণ। তবে হিন্দু ভাবপরিমণ্ডলে ও পরিবারবৃত্তে এই প্রভাবের সঞ্চার ও বিকাশ হইয়াছে ও উহার ভবিষ্যৎ গতি-পরিণতি হিন্দুসমাজ-চিন্তাধারাকেই অনুসরণ করিতে পারে। এই দুইট পোষক প্রমাণই উপন্যাসের উপসংহারের দিকে এক সম্ভাবনাময় অঙ্গুলিনির্দেশ করে।

রমেশের পক্ষে মনস্থির করা যতটা সম্ভব তাহা এই পর্যায়ে অনেকটা চূড়ান্তভাবেই গৃহীত হইয়াছে। ইহাও তাহার সচেতন বিচারবুদ্ধি ও মানস সঙ্কল্পের দ্বারা প্রভাবিত হয় নাই, পরন্তু অনিবার্য ঘটনাপ্রবাহের নিকট অসহায় আত্মসমর্পণ হইতে সঞ্জাত। হেমনলিনী অপ্রাপ্যা, কমলা অপ্রতিরোধ্যা—সুতরাং এই অবস্থাসঙ্কটে যে সিদ্ধান্ত অনিবার্য সে তাহাই মানিয়া লইয়াছে। গাজীপুরে কমলাকে গৃহলক্ষ্মীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সংসার পাতার আয়োজন তাহার স্বাধীন ইচ্ছা ব্যতিরেকেই অগ্রসর হইতেছে —সে এই আয়োজনের সহিত যান্ত্রিকভাবে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে এই মাত্র। অবশ্য কমলার সহিত জীবনকে অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত করিবার মধুর কল্পনা-রোমন্থনে যতটা দ্বৈত আকর্ষণের অস্বস্তিকে ঘুম পাড়াইয়া চিত্তের একটা অনুকূল আবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব, সে সেই ন্যূনতম সহযোগিতার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিয়াছে। তাহার দ্বিধাজীর্ণ যৌবন এই সম্ভাবনাকে পূর্ণ অভিনন্দন জানায় নাই, প্রবল চেষ্টায় একটা সোৎসাহ প্রত্যাশার কাল্পনিক উৎসাহে নিজ অন্তরাত্মাকে ভুলাইয়াছে মাত্র। এই শুভ সম্ভাবনাকে উপলক্ষ্য করিয়া সে কলিকাতায় ও এলাহাবাদে তাহার বৈষয়িক জীবনযাত্রার প্রস্তুতির জন্য কিছু সময় কমলা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কাটাইয়াছে। যে সত্যের মুখোমুখি হইতে সে বরাবর ভয় পাইয়াছে, পত্রের ভাবোচ্ছ্বাসের পরোক্ষ মাধ্যমে সেই সত্যের প্রতি সে স্বীকৃতি জানাইয়াছে। কমলার নিকট লেখা পত্রে সে তাহাকে দীর্ঘকালরুদ্ধ প্রেম নিবেদন করিয়াছে ও উচ্ছ্বাসের মাত্রাধিক্যে তাহার মধ্যে কৃত্রিম ভাবাতিশয্যের স্ফীতি আসিয়া গিয়াছে। চিঠিখানি পড়িয়া শৈল যে মন্তব্য করিয়াছে তাহাই এই অলঙ্কার-

বহুল পত্রখানির স্বরূপদ্যোতক। কিন্তু এ চিঠির মধ্যেও কমলার সহিত তাহার সত্যসম্বন্ধের ও এতদিনকার দুর্বোধ্য আচরণের উপর বিন্দুমাত্র আলোকপাত হয় নাই। যে প্রেম সত্যগোপনের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহার শুভ পরিণতি প্রতিটি স্তরেই সংশয়াচ্ছন্ন।

রমেশের দুর্ভাগ্যক্রমে এই পত্রপ্রাপ্তির পূর্বেই হেমনলিনীকে লেখা স্বীকারোক্তিমূলক পত্রখানি নিয়তির চক্রান্তে কমলার হস্তগত হইয়া তাহার সমস্ত জীবনকে এক অভাবনীয় শূন্যতার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছে। তাহার সমস্ত জীবনাশ্রয় যেন এক ভূমিকম্পের সার্বিক বিপর্যয়ে ধূলিসাৎ হইয়াছে। যে আলোকের জন্য কমলা এতদিন অধীরভাবে প্রতীক্ষা করিতেছিল, যে সংশয়ের বাষ্প দীর্ঘ অভ্যাসের ফলে মনের চেতনলোক হইতে অবচেতন-লোকে গোধূলি-ছায়ায় আত্মগোপন করিয়াছিল, সেই আলোক আজ বিদ্যুৎশিখার ন্যায় তাহার সমস্ত বোধিকে আচ্ছন্ন, অসাড় করিয়া দিল, সেই গুহাহিত, অস্ফুট আশঙ্কা আজ নগ্ন বীভৎসতায় উদ্‌ঘাটিত হইল। সুতরাং রমেশের এই প্রথম প্রেমপত্র নিদারুণ পরিহাসের মত, অশুচি স্পর্শের মত, কমলার সমস্ত অন্তরকে এক প্রচণ্ড ধিক্কারের অসহ্য আঘাতে মুহ্যমান করিয়া দিল। এই চেতনাগ্রাসী সর্বরিক্ততার প্রতিক্রিয়ায় সে দিগ্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া রমেশের পাপসান্নিধ্য পরিহারের জন্য দ্বিতীয়বার নিরুদ্দেশযাত্রায় বাহির হইয়া পড়িল। পদ্মার উন্মত্ত তাণ্ডবে তাহার যে যাযাবর জীবন আরম্ভ হইয়াছিল, পশ্চিমের গঙ্গাতীরে এই সর্বাশ্রয়চূর্ণকারী ঘরছাড়ার দুরন্ত আহ্বান তাহার মত কোমল, সংসারসুরক্ষিতা তরুণীকে আবার পথ-অভিযানের নূতন প্রেরণা দিল। নলিনাক্ষের প্রতি তাহার দুর্বার আকর্ষণের সঙ্গতি-বিচারে এই আঘাতের গুরুত্ব ও সর্বাত্মকতা বিশেষভাবে অনুধাবনীয়। রমেশ ফিরিয়া আসিয়া নিয়তির শ্লেষজর্জরিত জীবনের বিড়ম্বনা মর্মান্তিকভাবে অনুভব করিল ও তাহার আচরণের দ্বিধাদোদুল অদৃষ্টনির্ভরতা তাহাকে আত্মপ্রসাদের ক্ষীণতম সান্ত্বনা হইতেও বঞ্চিত করিল। তাহার জীবনে প্রথম সত্যভাষণের পৌরুষ অপাত্রন্যস্ত হইয়া আবার অনভিপ্রেত জটিলতা ঘটাইয়াছে, যাহাকে বিদায়-সম্ভাষণ জানাইয়াছিল তাহার নিকট না পৌঁছিয়া যাহাকে বিভ্রান্তিতে রাখিয়া চিরতরে বাঁধিতে চাহিয়াছিল তাহাকেই বিপরীত মেরুতে ঠেলিয়া দিয়াছে। নিষ্ঠুর ভাগ্য শেষ পর্যন্ত তাহার জীবন লইয়া এইরূপ মর্মান্তিক ব্যঙ্গ-রসিকতা করিয়াছে।

অতঃপর কাহিনী মোড় ফিরিয়া দীর্ঘকাল অনুপস্থিত হেমনলিনীর মানস ইতিহাস, নলিনাক্ষর সঙ্গে অন্নদাবাবুদের পরিচয়ের কাহিনী ও অক্ষয়ের অক্লান্ত শুভানুধ্যায়িতায় তাহার প্রতি হেমের অনুরাগ-উদ্দীপনের আখ্যান-বৃত্ত অবলম্বনে অগ্রসর হইয়াছে। হেমনলিনীর প্রেমকে পাত্রান্তরন্যস্ত করিবার বহু চেষ্টা সক্রিয়ভাবে অক্ষয়-যোগেন্দ্রের দ্বারা ও অন্নদাবাবুর সস্নেহ উৎকণ্ঠার মাধ্যমে চলিতেছে ও ইহার ফলে হেমনলিনীর মনে যে বিষণ্ণ নির্বেদের সৃষ্টি হইয়াছে উহার প্রধান উপাদান পিতার মনোবেদনাপ্রশমন। কিন্তু তাহার মন ভাঙ্গাইবার এত অধ্যবসায় সত্ত্বেও তাহার রমেশের প্রতি পরিপূর্ণ নির্ভর এতটুকু বিচলিত হয় নাই। রমেশের নিকট সে যে সত্যে আবদ্ধ আছে তাহাই তাহার সঙ্কল্পকে অটুট রাখিল। নলিনাক্ষর সহিত তাহার সম্পর্ক কোনদিনই হৃদয়ঘটিত হইয়া উঠে নাই—বিবাহ প্রস্তাব পাকা হইবার পরেও গুরু-শিষ্যার ভক্তি-সম্ভ্রমের তাপমাত্রা ছাড়াইয়া অনুরাগপর্যায়ে উন্নীত হয় নাই। এ বিবাহ যদি শেষ পর্যন্ত ঘটিতও, তাহা হইলেও আত্মিক মিলনের নিষ্প্রাণ আদর্শসর্বস্বতা ছাড়াইয়া ইহা কোন দিনই প্রেমের অরুণ রাগে রঞ্জিত ও উহার বৈদ্যুতী শক্তিতে উদ্ভাসিত হইত না। নলিনাক্ষের ব্যক্তিত্বে কর্তব্যনিষ্ঠা ও ধর্মোপদেশনার ধূসরতার মধ্যে কোন প্রেমিক সত্তার রক্তিমা অবশিষ্ট ছিল না। সুতরাং কমলার সঙ্গে তাহার মিলনও ঔপন্যাসিকের ঔচিত্যবোধ ও কমলার ভক্তি-সংস্কারের প্রবলতার দ্বারাই নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার মধ্যে নলিনাক্ষের কোন রক্তচাঞ্চল্যের সহযোগিতা কল্পনা করাই দুরূহ। এ বিবাহে মঙ্গলদীপ ছাড়া আর কোন রোশনাই জ্বলে নাই, শঙ্খধ্বনি-ব্যতিরিক্ত কোন বিহ্বল রসুনচৌকি বাজে নাই তাহা হলপ করিয়া বলা যায়।

উপন্যাসের উপসংহার-অংশের দ্বিতীয় লক্ষ্য হইল নলিনাক্ষের ব্যক্তিসত্তার পুনর্বাসন। সে বরাবরই ঘটনাচক্রের নেপথ্যান্তরালে থাকিয়া হঠাৎ ঔপন্যাসিক প্রয়োজনে প্রতিনায়কের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছে ও রমেশের মত একজন দোষেগুণে মেশানো, দ্বিধা-দ্বন্দ্বে সজীব, কর্তব্য-সঙ্কটের গোলোকধাঁধায় ঘূর্ণিত ও সর্বাঙ্গীণরূপে আত্মপ্রকাশিত মানুষের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভার তাহার উপর চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং ঔপন্যাসিক স্বাধীন প্রেরণায় নয়, নিছক আরোপিত দায়িত্ব-পালনের জন্যই তাহাকে রক্তমাংসের মানুষ রূপে দেখাইবার কর্তব্যে

ব্রতী হইয়াছেন। শিল্পবোধ দ্বারা অসমর্থিত এই কৃচ্ছ্র প্রয়াসের ফল যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে। লেখকের বিশিষ্ট প্রয়াস সত্ত্বেও নলিনাক্ষ পূর্ণ প্রাণচেতনায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। অন্নদাবাবুর বাড়ীতে তাহার ধর্মদীক্ষামূলক ভাষণগুলিও যথারীতি নিষ্প্রাণ হইয়া উঠিয়াছে এবং অন্নদাবাবু ও হেমনলিনীর আন্তরিক নিষ্ঠা সত্ত্বেও সে কখনই ধর্মগুরুর উচ্চ মঞ্চ হইতে সহজ মানবিকতার সমতলভূমিতে অবতরণ করে নাই। সাধারণ পাঠক যোগেন্দ্রের মতই তাহার গুরুগম্ভীর বক্তৃতাতে অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। ক্ষেমঙ্করীর সঙ্গে তাহার সম্পর্কও প্রাণরসে বিশেষ উদ্বেল হইয়া উঠে নাই —আত্মত্যাগের পরস্পরস্পর্ধী প্রতিযোগিতায় ভাবাদর্শের তুরীয় লোকে বাষ্পায়িত হইয়াছে। হয়ত কমলাও নলিনাক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত হইবার পূর্বে প্রথম কৈশোরের প্রণয়াবেশমুগ্ধতার স্তর অতিক্রম করিয়া স্বপ্ন-মাধুর্যহীন নিষ্কাম সেবা ও আত্মনিবেদনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিয়া লইয়াছিল। এমনকি নলিনাক্ষগৃহিণী হেমনলিনীর সংসারে দাসীবৃত্তিকেও সে একান্ত কাম্য রূপে বরণ করিয়াছিল। রমেশের স্মৃতির সহিত তাহার পূর্বজীবনের সমস্ত প্রণয়মদির, বিচিত্র প্রবৃত্তি-তরঙ্গে চঞ্চল, মুকুলিত যৌবনের সমস্ত অস্ফুট সুখকল্পনাগুলি সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া ফেলিয়াই সে এই মৃত্যুশীতল কর্তব্য-মন্দিরের পূজারিণীরূপে প্রবেশোদ্যত হইয়াছিল। নলিনাক্ষের প্রতি প্রাভাতিক প্রণাম—নিবেদন ও তাহার পরে স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের ভগবৎ-চরণে মিলিত ভক্তি-উপচার-সমর্পণ এবং বাকী সময় ক্ষেমঙ্করীর সেবা ও তাহার ইষ্ট-আরাধনায় পরিচর্যা—ইহাই তাহার সমস্ত ভবিষ্যৎ দাম্পত্য জীবনের ঘটনাগত ইতিহাস ও অন্তর্লীন ছন্দের একঘেয়ে পয়ার-প্রসার। এই ঘটনাশাসিত জীবনচর্যার ফলে হেমনলিনীরও যতটুকু প্রাণস্পন্দন ছিল তাহাও স্তিমিত হইয়াছে। যে সম্পূর্ণ নিষ্প্রাণভাবে তাহার প্রত্যাশিত অংশ অভিনয় করিয়া চলিয়াছে, ও তাহার যে বিষণ্ণ স্বীকারোক্তি 'আমার মন যে বোবা হইয়া গেছে', সেই আত্মবিশ্লেষণের যাথার্থ্য আমরা স্বতঃই অনুভব করি। ক্ষেমঙ্করী এক জায়গায় একটু জীবন্ত হইয়াছে, যখন সে মাতৃত্বের অভিমানে নলিনাক্ষর প্রতি হেমনলিনীর আপাত-ঔদাসীন্যে ক্ষুব্ধ হইয়া তাহার আগ্রহাতিশয্যে গড়িয়া তোলা বিবাহ-সম্পর্কটি নিজ হাতেই ছেদন করিয়াছে। ঔপন্যাসিক তাহার এইটুকু সহজ মানবিকতার সুযোগ লইয়া নলিনাক্ষ-কমলার মিলনপথ নিষ্কণ্টক করিয়াছেন।

এখন নলিনাক্ষর সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন অবলুপ্তি, যাহা রমেশ-কমলার ভ্রান্ত ধারণাকে বদ্ধমূল হওয়ার অবসর দিয়াছে, তাহা কতদূর স্বাভাবিক ও বিশ্বাসযোগ্য তাহা বিচার করা প্রয়োজন। রমেশ যে নানাবিধ খোঁজ-খবর করিয়াও নলিনাক্ষের কোন সন্ধান করিতে পারিল না ও অনন্যোপায় হইয়া সে যে কমলার সঙ্গে তাহার অন্তরঙ্গতার প্রশ্রয় দিতে বাধ্য হইল, তাহা কি যথার্থই অপ্রতিবিধেয় ছিল? নলিনাক্ষর যে পরিচয় লেখক আমাদিগকে পরে দিয়াছেন তাহাতে নিঃসন্দেহে প্রমাণ হয় যে, সে ধর্ম ও সমাজ-জীবনে একজন প্রতিষ্ঠাপন্ন ব্যক্তি ছিল ও অনামিকতার শূন্যতাসমুদ্রে তাহার বিলীন হইবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। তাহার পিতার ব্রাহ্মধর্মগ্রহণ ও পারিবারিক বিচ্ছেদের কাহিনী সমকালীন সমাজে একটা বিশেষ সোরগোল তুলিয়াছিল ও ইহাতেও নলিনাক্ষর পরিচয়ের পরিধি নিশ্চয়ই বিস্তৃত হইয়াছিল। তখনকার দিনে কোন উচ্চবর্ণের হিন্দুসন্তানের ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হওয়া তাহাকে একটি চিহ্নিত ব্যক্তি করিয়া তুলিত—ইহা প্রায় গেজেটে-ঘোষণার মত সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। তাহার উপর নলিনাক্ষর ব্যক্তিগত গুণাবলীও তাহার খ্যাতিপ্রচারের অনুকূল ছিল। ব্রাহ্মসমাজের আচার্যরূপে ও মননশীল বক্তারূপে সে বিদগ্ধ সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত। ডাক্তার হিসাবেও তাহার দেশজোড়া সুনাম। এরূপ অবস্থায় তাহার বিবাহ-সম্বন্ধীয় দুর্ঘটনা নিশ্চয়ই বহুজনের গোচরীভূত হইয়া থাকিবে ও রমেশের মত, বা অক্ষয়-যোগেন্দ্রের মত কলিকাতার স্থায়ী অধিবাসীদের পক্ষে তাহার পরিচয় নিশ্চয়ই অজ্ঞাত ছিল না। সুতরাং এরূপ একজন বহুখ্যাত ব্যক্তি যে শুধু স্থানপরিবর্তনের জন্য তাহার সমস্ত গতিবিধি বিলুপ্ত করিতে পারিবে, এইরূপ অনুমান কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। অতএব রমেশের সন্ধান-চেষ্টার ব্যর্থতা বা তাহার নলিনাক্ষ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। লেখক প্লট জমাইবার জন্য এই অসম্ভব কল্পনার অপপ্রয়োগ করিয়াছেন ও সমস্ত ঔপন্যাসিক সমস্যার স্বাভাবিকতা ক্ষুণ্ন করিয়াছেন এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য হইয়া পড়ে। নলিনাক্ষর পক্ষে তাহার সদ্যোবিবাহিতা স্ত্রীর অনুসন্ধানবিষয়ে উদ্যমহীনতা, এমন কি বিবাহ সম্বন্ধে তাহার মাতার নিকটও গোপনতা-অবলম্বন, তাহার চরিত্রের উপর বিশেষ অনুকূল আলোকক্ষেপ করে না।

এই পর্বে ঘটনার অগ্রগতি চরিত্রবিকাশনিরপেক্ষভাবে পূর্ব-নির্ধারিত প্রয়োজনে বিশেষ-উদ্দেশ্য-নিয়ন্ত্রিত লক্ষ্যাভিমুখী হইয়াছে। একটি কেন্দ্র-শাসিত বৃত্ত যেমন পূর্বানুমিত রেখাসম্প্রসারণে নিজেকে সম্পূর্ণ করিতে উদ্যত, এই ঘটনাবৃত্তও তেমনি এক অনিবার্য সমাপ্তিবিন্দুতে যাত্রা শেষ করিবার পূর্বসঙ্কেতের অনুবর্তন করিয়াছে। চরিত্রবিকাশ যেখানে শেষ হইয়া কাহিনীর অগ্রসরণের প্রেরণা সংহরণ করিয়াছে, সেখানে ঘটনা স্বয়ংক্রিয় হইয়া নিজের গতিপথ নিজেই আঁকিয়াছে। কোন স্থলেই আমরা চরিত্রের সহযোগিতার লক্ষণ দেখিতে পাই না। কমলার নবীনকালীর সংসারে আশ্রয়গ্রহণ ও নানা উৎপীড়নে তাহার অটুট ধৈর্য ও সেই শত্রুদুর্গ হইতে নলিনাক্ষর সংবাদসংগ্রহ ও তাহার সহিত মিলনের শুভলগ্নের প্রতীক্ষা—সবই ঘটনাচক্রের যান্ত্রিক আবর্তনের দ্বারা নিয়মিত। তাহার চরিত্র এখানে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়ভাবে ভাগ্যের প্রসাদভিক্ষু। হেমনলিনীর সঙ্গে নলিনাক্ষের পরিচয় ও ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠতার ব্যাপারে স্বাধীন ইচ্ছা সম্পূর্ণ নেপথ্যবর্তী। ক্ষেমঙ্করীর গৃহে কমলার সেবিকারূপে অনুপ্রবেশও দৈবাধীন, তবে ইহার মধ্যে চক্রবর্তী-খুড়োর কিছুটা দৌত্যকৌশল ক্রিয়াশীল হইয়াছে। এমন কি এই আকাঙ্ক্ষিত পরিণতি ঘটাইতে লেখক চক্রবর্তীর ভোজনবিলাস ও ক্ষেমঙ্করীর ব্রাহ্মণভক্তি-প্রসূত আতিথেয়তা সমভাবে কাজে লাগাইয়াছেন। কমলাকে ছদ্মপরিচয়ে ক্ষেমঙ্করীর আশ্রিতারূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে চক্রবর্তীর সুরসিক আলাপপটুতা, অপরিচিতের চিত্তাকর্ষণে তাহার পরীক্ষিত শক্তিও অনেকাংশে কার্যকরী হইয়াছে। বহু লোকের সহযোগিতায়, বহু চিত্তের শুভ কামনায় এই মিলনের পথ প্রস্তুত হইয়াছে। কমলার নিকট—রমেশের বিদায়-সাক্ষাতের প্রস্তাব চক্রবর্তীর স্নেহাশঙ্কী দূরদর্শিতায় নিবারিত হওয়ায় কোন সম্ভাব্য প্রতিবন্ধক মাথা তুলিতে পারে নাই। এমন কি শৈলজার মেয়ের অসুখও নলিনাক্ষের সঙ্গে ডাক্তাররূপে প্রথম পরিচয়ের পথটি উন্মুক্ত করিয়াছে। কমলার শুভান্ত জীবন-পরিণতি ঘটাইতে লেখক এত উৎসুক হইয়াছেন যে হেমনলিনীর সমস্যার গ্রন্থিমোচনের কাজটিও তিনি অর্ধসমাপ্ত রাখিয়াছেন। রমেশ বেচারিকেও নিজ অন্তর্নিহিত দ্বিধাদ্বন্দ্বের উপরে তাহার স্রষ্টারও অনুরূপ চলচ্চিত্ততার অতিরিক্ত বোঝা বহিতে হইল। লেখক তাহাকে সংসারের গোধূলিছায়ায় সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবন ধরিয়া অপরিস্ফুট রাখিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহারই উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়া আমরা

তাঁহাকে রমেশ-হেমনলিনীর চরিত্রচিত্রণে 'উপন্যাসে উপেক্ষিত'-শ্রেণীর স্রষ্টা হিসাবে অনুযোগ জানাইতে পারি। অথচ আদি কবির যতটা সঙ্গত কৈফিয়ৎ ছিল, রবীন্দ্রনাথের বোধ হয় সে পরিমাণ নাই। যাহাই হউক, চরিত্রসহাবস্থান-বর্জিত উপন্যাসের এই অন্ত্যপর্ব নামতঃ উপন্যাসের পর্যায়-ভুক্ত হইলেও, উপন্যাসের পাত্রপাত্রীর জীবনকাহিনীসংসক্ত হইলেও, বস্তুতঃ এক দায়িত্বহীন রূপকথারাজ্যের অংশবিশেষ। যেখানে ব্যক্তিসত্তা কাহিনী-বিবর্তনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পৃক্ত নয়, যেখানে ঘটনার গতিবেগ ব্যক্তির অন্তর্জগৎ হইতে কোন শক্তি আহরণ করে না, সেখানে উপন্যাস বাস্তবরীতিপ্রধান হইলেও দৈব সংঘটনের আকস্মিকতাগ্রস্ত গল্প মাত্র। সেইজন্য অবিশ্বাস্য দুর্দৈবের কৌতুক-পরিহাসে যাহার কেন্দ্র-সমস্যার সূচনা ও চরিত্রানুষঙ্গহীন ঘটনাচক্রের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আবর্তনে যে সমস্যার শেষ সমাধান, সেইরূপ আদি-অন্তে খেয়ালী কাহিনী অনেক গুণ সত্ত্বেও কিছুটা উপন্যাসধর্মবিচ্যুত—ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

৪

অতঃপর উপন্যাসটির মধ্যে মনস্তত্ত্বনিপুণতা ও মানবমনের উপর প্রকৃতির সূক্ষ্ম প্রভাবের কিরূপ পরিচয় পাওয়া যায় তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনার পর এই অধ্যায়ের উপসংহার টানা যাইতে পারে। এখানে চিত্তজটিলতার খুব বেশী নিদর্শন নাই, কেন না ইহা ঘটনা-প্রাধান্যের জন্য কম-বেশী রোমান্স-লক্ষণান্বিত। ইহার পাত্রাপাত্রগুলিও সরলস্বভাব ও খুব মর্মান্তিক অন্তর্দ্বন্দ্ব বা প্রবৃত্তিসংঘাত ইহাদের চিত্তকে আলোড়িত করে নাই। ইহাদের দুর্ভাগ্য ইহাদের সম্মুখে যে সমস্যা উপস্থিত করিয়াছে তাহারই ইহারা যথাসাধ্য সমাধান করিতে নিজেদের সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছে। রঙ্গপ্রিয় দৈব ইহাদের জীবনে যে জট পাকাইয়াছে তাহা উহারা নিজেদের মানসগহনোৎক্ষিপ্ত স্ববিরোধজালে আর জটিলতর করে নাই। বলিতে গেলে, রমেশ, হেমনলিনী, কমলা—ইহারা কেহই দুর্বোধ্য বা অন্তর্গূঢ়জাতীয় চরিত্র নয়। ইহারা বাহিরের চক্রে ঘূর্ণিত হইয়া যে জীবন-প্রহেলিকার গভীর জলে হাবুডুবু খাইয়াছে, ইহাদের মন তাহাতে আর কোন তির্যক বেগ আরোপ করিয়া তাহাকে আরও আবর্তসঙ্কুল ও দুরবগাহ করে নাই। ইহারা নিষ্ক্রিয় দর্শকের

মত কেবল সহ্য করিয়াছে, আকুল হইয়া প্রতিষেধের উপায় খুঁজিয়াছে ও শেষ পর্যন্ত অদৃষ্টের নিকট হাল ছাড়িয়া দিয়া স্রোতে গা ভাসাইয়াছে। কেহ বা উটপাখীর ন্যায় চোখ বুজিয়া সঙ্কটের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছে। কেহ বা চরম মীমাংসাকে যতদিন সম্ভব এড়াইয়াছে ও জীবন-তরণীকে অনিশ্চিত লক্ষ্যের দিকে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ভাসিয়া যাইবার আত্মঘাতী স্বাধীনতা দিয়াছে, কেহ বা উচ্চতর আদর্শনিষ্ঠার সান্ত্বনাহীন আশ্রয়ে ও পারিবারিক কর্তব্যের মুখ চাহিয়া নিজ স্বাধীন রুচি ও আবেগের কঠোর অবদমনে শ্মশানের কপট শান্তি অনুভব করিয়াছে। কাহারও ব্যক্তিসত্তা এই পরিস্থিতি-সঙ্কটে দৃপ্ত আত্মঘোষণায় জ্বলিয়া উঠে নাই। এই শীর্ণরক্তলালিত, স্বভাবদুর্বল নরনারী অদৃষ্টের ক্রীড়নক হইবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছিল ও তাহাদের স্রষ্টা নিজ নিজ নির্দিষ্ট জীবনগণ্ডীর মধ্যে তাহাদিগকে সম্পূর্ণ আবদ্ধ রাখিয়া তাহাদের কাহাকেও এক পাও এই সীমালঙ্ঘনের অনুমতি দেন নাই। রমেশ কোন নীতি বা সংস্কারের দৃঢ় আশ্রয় পায় নাই, সুতরাং সে শেষ পর্যন্ত শ্যাওলার মত কোন তীরলগ্ন না হইয়াই ভাসিয়া বেড়াইয়াছে। হেমনলিনী ও কমলা নিজ নিজ প্রকৃতিগত দুর্বলতাকে কেহ বা আদর্শ, কেহ বা নীতিসংস্কারের সহায়তায় দৃঢ় প্রতিরোধশক্তিসম্পন্ন করিয়া সংকল্পস্থিরতার অভাব কৃত্রিমভাবে পূরণ করিয়াছে। এই দুই নায়িকার ক্ষেত্রে আমরা অনুভব করি যে বহিরাগত কোন শক্তি তাহাদের সত্তার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহাদের কর্মধারা প্রভাবিত করিতেছে।

নায়ক-নায়িকার সহিত তুলনায় গৌণ চরিত্রগুলি অনেক বেশী প্রাণস্পন্দিত ও বাস্তবচ্ছন্দী। উমেশ ও চক্রবর্তী খুড়ো এই প্রাণোচ্ছলতার দিক দিয়া শীর্ষস্থান অধিকার করে। তাহাদের একমুখী জীবনাবেগ কোন তত্ত্বজটিলতার দ্বারা তির্যক-প্রবাহিত না হইয়া সরল রেখায় উৎসারিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য উপন্যাসে ও বিশেষ করিয়া তত্ত্বনাটকে প্রাকৃত জনসাধারণের প্রতিনিধিস্থানীয় চরিত্রসংঘের দেখা মিলে, কিন্তু তাহারা যেন লেখকের বিশেষ উদ্দেশ্য দ্বারা কিছুটা রূপান্তরিত। তাহাদের ভিতর দিয়া লেখক তাঁহার কোন একটি ধারণাকেই ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছেন। অধ্যাত্ম সত্যের ইঙ্গিত-ভাস্বরতায় এই বস্তুধর্মী চরিত্রগুলিও যেন খানিকটা ছায়াময় হইয়া গিয়াছে। উমেশ ও চক্রবর্তী কিন্তু সম্পূর্ণ রূপে এই আবছা ভাবমণ্ডল হইতে মুক্ত ও জীবনরসের স্বয়ংসম্পূর্ণ অধিকারে

আমাদের মনেও সাহিত্যের মর্যাদায় সমাসীন। ঠাকুরদাদা যাহার চিন্ময় উদ্ভাস, চক্রবর্তী খুড়ো তাহারই মৃন্ময় প্রকাশ। তাহার সহজ আনন্দময়তা ও অকৃত্রিম জীবনোল্লাস কোন তত্ত্বের বাহন না হইয়াও, কোন সূক্ষ্মতর ভাবসত্যের দ্যোতনা বহন না করিয়াও নিজ অস্তিত্বঘোষণায় মুখর। সে বেদান্তের ব্রহ্মতত্ত্ব না বুঝিয়াও নিজ সহৃদয় সামাজিকতার গুণেই পরের অন্তরে প্রবেশ করে, পরের বোঝা ঘাড়ে তুলিয়া লয় ও পরের সমস্যা-সমাধানে নিজ মনপ্রাণ অকুণ্ঠভাবে নিয়োজিত করে। মাটির এত কাছাকাছি-থাকা, মৃত্তিকার স্নিগ্ধরসে ভরপুর এরূপ চরিত্র রবীন্দ্র-কথাসাহিত্যের বহু বিচিত্র সৃষ্টির মধ্যেও বিরলদৃষ্ট।

ক্ষোভের বিষয় যে রবীন্দ্রনাথ সাধারণ মানুষেব হৃৎস্পন্দন এত প্রত্যক্ষ-ভাবে শুনিয়াও আবার কম-বেশী দূর ব্যবধানে সরিয়া গিয়াছেন ও তাহাদের সত্তাস্বরূপকে তাঁহার বিশেষ ভাবদৃষ্টির মাধ্যমে তত্ত্বচেতনারঞ্জিত করিয়াছেন। অক্ষয়, যোগেন্দ্র, অন্নদাবাবু, নবীনকালী, শৈলজা, বিপিন প্রভৃতি সমস্ত অপ্রধান চরিত্রগুলি রবীন্দ্রনাথের বস্তুতন্ময় জীবনচিত্রণের আশ্চর্য সার্থক উদাহরণ। তিনি তাঁহার বিরাট, বিশ্বব্যাপী, বিচিত্র-অনুভবশীল চেতনাকে প্রকৃত নাট্যকারের ন্যায় সঙ্কুচিত করিয়া এই সমস্ত ক্ষুদ্র, জীবনের রসকণাপুষ্ট প্রাণিদের ছোট অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছেন ও তাহাদের মধ্যে যে বিন্দু-পরিমাণ জীবনসত্য নিহিত ছিল সেইটুকুকেই উহার নিজস্ব স্নিগ্ধতায় ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

এইবার পাত্রপাত্রীদের মানসলোকে প্রকৃতির সূক্ষ্ম, বিচিত্র প্রভাব কিরূপ সার্থকভাবে প্রতিফলিত হইয়া তাহাদের ক্ষুদ্র জীবন-সমস্যার উপর মহিমাময় বিস্তার ও নিগূঢ় ব্যঞ্জনা আরোপ করিয়াছে তাহার কতকগুলি দৃষ্টান্ত উদ্ধার ও আলোচনা করা যাইতে পারে। যেহেতু এই উপন্যাসে অন্তর্দ্বন্দ্বের তীব্র আলোড়ন ও বেগবান ছন্দের আপেক্ষিক অভাব আছে, সেইজন্য ইহার ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে অদৃষ্টলীলার মহৎ ব্যঞ্জনা পরিস্ফুট করা আরও বেশী প্রয়োজন ও প্রকৃতির দৃশ্যবৈচিত্র্য ও ভাবদ্যোতনা প্রধানতঃ এই উদ্দেশ্যেই নিয়োজিত হইয়াছে। পদ্মাবক্ষে যে আকস্মিক ঘূর্ণীঝটিকা রমেশ ও কমলার সমস্ত জীবনব্যবস্থাকে এক মুহূর্তে বিপর্যস্ত করিল, তাহা আপাত-দৃষ্টিতে আততায়ী দৈবশক্তির প্রমত্ত ক্রূরতার খেয়ালী উচ্ছ্বাস মাত্র। এই দুর্ঘটনার মধ্যে কোন বিশ্ববিধানগত তাৎপর্য কিছুতেই খুঁজিয়া পাওয়া

যায় না। দৈবনির্যাতিত মানুষের নষ্ট সম্মান কেবলমাত্র প্রকৃতির উদার মধ্যবর্তিতায় পুনরুদ্ধার হইতে পারে। তাহার লাঞ্ছনামলিন মনোদর্পণে নিসর্গের মহত্তর ভাবচেতনার প্রতিফলনই তাহার হীনতাবোধকে মর্যাদা দিতে সক্ষম। বহিঃপ্রকৃতির মানবমনোলোকে এই অনুপ্রবেশ-প্রবণতা মানবের তুচ্ছ জীবন-কাহিনীকে মহিমান্বিত ও তাৎপর্যময় করিয়া ইহাকে উন্নত আর্টের বিষয়ীভূত করে। 'নৌকাডুবি'তে এরূপ কতকগুলি দৃষ্টান্ত এখানে আলোচিত হইবে।

প্রলয়ঙ্কর ঘূর্ণীবাত্যার পর পদ্মার বিস্তৃত বালুচর নির্মল চন্দ্রালোকে যেন একটি বৈরাগ্যময় শান্তির, মৃত্যুর নির্বিকার নিশ্চলতার ভাব বিকীর্ণ করিয়াছে—লেখক এই পাণ্ডুর জ্যোৎস্নাবরণকে বিধবার শুভ্রবসনের আচ্ছাদনের সহিত তুলনা করিয়া ইহাকে নবদ্যোতনামণ্ডিত করিয়াছেন। রমেশ যখন কমলার অচেতন দেহে চেতনা সঞ্চার করিল, যখন শ্রান্তি আসিয়া তাহার উচ্ছ্বসিত রোদনধারাকে বন্ধ করিল, তখন এই দুইটি প্রাণি-অধ্যুষিত দিগন্তবিস্তৃত নির্জন পৃথিবী যেন প্রেতলোকের স্বপ্নময় অবাস্তবতার মত কমলার নিকট প্রতিভাত হইয়া তাহার মনুষ্যসঙ্গের আকূতিকে নিবিড়তর করিল। রমেশ-কমলার প্রথম পরিচয়ের প্রণয়চর্চার মধ্যে বাস্তব সত্য ও কাব্যকল্পনার এক অনুভবসংমিশ্রণ ঘটিয়া উহাদের যথার্থ সম্পর্ককে এক বিচিত্র রূপবিমিশ্রতা দিয়াছে—তথ্যের অভাব সম্ভাবনার অফুরন্ত ঐশ্বর্য হইতে পূর্ণ হইয়াছে। কেহ কাহাকেও না চিনিয়াও পরস্পরের মধ্যে প্রেমকল্পনাতৃপ্তির প্রচুর উপাদান আবিষ্কার করিয়াছে, প্রণয়ের সাধারণ তত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছে। রমেশ যে ক্ষণে প্রথম জানিয়াছে যে কমলার সহিত তাহার বিবাহ হয় নাই, সেই ক্ষণে তাহার মানস অভিঘাতের প্রচণ্ড আলোড়ন প্রকৃতির খোলা পাতাতে লেখা হইয়া গিয়াছে। কমলাকে স্কুল বোর্ডিং-এ বিদায় করিয়া দিয়া রমেশ যখন হেমনলিনীর প্রণয়চর্চার প্রতি অখণ্ড মনোযোগ দিয়াছে তখন রমেশের পরিবর্তনটি প্রকৃতিরাজ্য হইতে সংগৃহীত একটি চমৎকার উপমায় ব্যক্ত হইয়াছে। চলমান সৌরজগতের মধ্যে রমেশ ছিল মানমন্দিরের মত নিজ মানসসঞ্চয়ের বিপুলতায় স্তব্ধ, রুদ্ধগতি। তাহার ভূমিকা ছিল পর্যবেক্ষকের, প্রত্যক্ষ অংশগ্রাহীর নয়। কিন্তু হেমনলিনীর প্রতি প্রণয়োন্মেষে সেও তাহার স্থাবরতা পরিহার করিয়া গতিশীল বিশ্বজগতের ছন্দে যোগ দিল।

রমেশ যখন প্রয়োজনের তাগিদে হেমের সহিত বিশ্রম্ভালাপ বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল, তখন সহসা হেমের বোধ হইল যে শরতের সোনালি দিনের স্বর্ণভাণ্ডার যেন নিঃশেষিত হইয়া গেল, ও প্রয়োজনের নিকট প্রেমের পরাভবে সে মর্মান্তিক বেদনা অনুভব করিল। ইহার পরবর্তী অধ্যায়ে হেমনলিনী রমেশ কর্তৃক কোন কারণ না দেখাইয়া বিবাহের দিন পিছাইয়া দেওয়ার ব্যাপারে যে বেদনাবিদ্ধ বিমূঢ়তা বোধ করিয়াছে তাহাকে লেখক ঝড়ের মেঘের মুখে সূর্যাস্তের ম্লান আভার দ্রুত বিলয়ের সহিত অতি সার্থকভাবে তুলনা করিয়াছেন, ইহাতে হেমের কোমল, ফুলের ন্যায় স্পর্শকাতর হৃদয়টি চমৎকারভাবে ফুটিয়াছে। রমেশ হেমের নিকট তাহার উপর বিশ্বাস রাখিবার আবেদন জানাইবার ঠিক পূর্বক্ষণে অপরাহ্ণ-আলোয় উদ্ভাসিত তাহার যে একাগ্র-নিষ্ঠায় স্থির, শুদ্ধ মূর্তিটি প্রত্যক্ষ করিল তাহা ছবির মত তাহার মনে দৃঢ় মুদ্রিত হইয়া গেল, ও এই অন্তরের আলোকে তাহার যে নূতন রূপটি ফুটিয়া উঠিল তাহা দেহসৌন্দর্য অপেক্ষা আরও অনেক অন্তর্মুখী-রূপে প্রতিভাত হইল। ইহারই আশ্বাসে বলীয়ান হইয়া সে হেমনলিনীর অকুণ্ঠ প্রত্যয়ের দাবী পেশ করিয়া উহার মঞ্জুর হইবার নিবিড় আনন্দে সমস্ত মানস উৎকণ্ঠা ও অশান্তির পূর্ণ অবসান উপলব্ধি করিল। যখন হেমনলিনীর সঙ্গে রমেশের বিবাহের নিমন্ত্রণপত্রের তারিখ কমলা-সমস্যার জন্য হঠাৎ পিছাইয়া দিতে হইল, সেই অবসাদ-প্রহরে কর্তব্যসঙ্কট-ক্লিষ্ট বিনিদ্র রমেশের নিকট নিস্তব্ধ জ্যোৎস্নারজনীর এক অপূর্ব নিখিল-মর্মসত্যবাহী পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। দ্বিধাদ্বন্দ্বহীন বিশ্বের অন্তর্লীন নিত্যসত্যটি তাহার ক্ষুব্ধ চেতনায় যেন এক চিরন্তন জ্যোতির্লেখার অক্ষরে উদ্ভাসিত হইয়া তাহার অন্তঃপ্রকৃতিকে নিজের মধ্যে লীন করিয়া দিয়াছে। অবশ্য এই নিগূঢ় প্রকৃতি-অনুভূতি রমেশের মত লঘুচিত্ত, গভীর অন্তর-সমীক্ষায় অক্ষম ব্যক্তির পক্ষে কতটা স্বভাবানুযায়ী হইয়াছে তাহা সন্দেহস্থল। হেমনলিনীর মত স্থিরবুদ্ধি, আদর্শনিষ্ঠ নারীর অন্তরে এইরূপ প্রকৃতিচেতনার অনুপ্রবেশ যতটা চরিত্রসঙ্গত, রমেশের ক্ষেত্রে ততটা বোধ হয় না। কিছুক্ষণ পরেই সংসারের সংগ্রামশীল রূপের অনিবার্যতা সম্বন্ধে সে সচেতন হইয়া অনন্ত প্রকৃতিতে নিত্য শান্তির সহিত সংসারের নিত্য সংগ্রামের সহাবস্থান কল্পনা করিল ও এই বিপরীত দ্বৈতনীতির উপলব্ধিতে আবার পীড়িত হইয়া উঠিল। প্রকৃতির সান্ত্বনাপ্রলেপ তাহার দোলায়িত, চঞ্চল চিত্তে

স্থায়ী শান্তিবিধানে অক্ষম হইল। ইহাই তাহার চরিত্রবৈশিষ্ট্যকে স্বাভাবিক ভাবে প্রতিফলিত করিয়াছে।

গঙ্গায় ষ্টীমারযাত্রা আরম্ভ হইবার পর হইতেই প্রকৃতি তাহার পরিবর্তনশীল দৃশ্যাবলী, তাহার ক্ষণে ক্ষণে নবরূপে উদ্ভাসিত কৌতূহলময় ভাবব্যঞ্জনা, তাহার উদার দিগন্তপ্রসারিত বিস্তার ও জীবন-ইঙ্গিত লইয়া রমেশের ক্ষুব্ধ, সংশয়জর্জর চিত্তে গভীরভাবে নিজ মায়া সংক্রামিত করিয়াছে। এই গঙ্গাবক্ষে শুক্লপক্ষের জোৎস্নাযাদুবিগলিত সন্ধ্যা-গোধূলিতে প্রেমের রহস্য হঠাৎ রমেশের অনুভূতিতে স্বচ্ছ হইয়া উঠিল ও হেমের আবেগার্দ্র স্মৃতি তাহার অন্তরকে আবিষ্ট, মদির করিয়া তুলিল। ইহারই প্রেরণায় সে তাহার সমস্ত প্রণয়-ইতিহাসটি আগাগোড়া পর্যালোচনা করিয়া কাব্যনন্দিত প্রেম ও জীবনে অনুভূত প্রেমের পার্থক্যটি উপলব্ধি করিল। মনে হয় বহিরাকাশে জ্যোৎস্নার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে রমেশের অন্তরাকাশেও প্রেমচেতনা পরিস্ফুট ও ব্যাপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। কমলার সহিত সম্পর্ক-জটিলতার বাধার জন্যই হেমের যে ভালবাসা এতদিন সে স্বতঃসিদ্ধ অধিকার-রূপে অচেতনভাবে গ্রহণ করিয়াছিল তাহাই মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যারূপে সচেতনভাবে উপলব্ধ হইল। ইহাতে প্রেমানুভূতির অন্যোন্যনির্ভরতাবিষয়ক একটি মনস্তাত্ত্বিক সত্য আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। যাহা বাষ্পাকারে অবচেতনকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল তাহা এখন নির্দিষ্ট রূপ ও আকার ধারণ করিল। ষ্টীমারযাত্রার নিরবচ্ছিন্ন সান্নিধ্য ও অকৃপণ অবসরই রমেশকে প্রথম আত্ম-উদ্‌ঘাটনের প্রেরণা দিয়াছে। অবশ্য এখনও অকপট সত্যভাষণের সাহস সে অর্জন করে নাই, কাল্পনিক আখ্যায়িকার অন্তরালে সত্যের পরোক্ষ ইঙ্গিত দিয়াছে মাত্র।

হেমনলিনীর প্রতি নবজাগ্রত প্রেমে সে তাহার বর্জনবেদনা আরও তীব্রভাবে অনুভব করিয়াছে। তবে নিশীথিনীর অন্ধকারে অগণ্যনক্ষত্রদীপ্ত মহাকাশের অনন্ত যাত্রাপথে, গঙ্গাতীরবর্তী লোকালয়গুলির চিরপ্রবহমাণ জীবনধারার নাট্যে তাহার ব্যক্তিগত বেদনা নিতান্ত ক্ষণিক ও তুচ্ছরূপেই প্রতিভাত হইল ও এই অসীম প্রাণরঙ্গভূমির পটভূমিকায় এইরূপ উপলব্ধি তাহার চিত্তের শান্তিবিধানে সহায়তা করিল। অবশ্য এইরূপ দার্শনিক ও সৃষ্টিতত্ত্বমূলক মননের বীজ রমেশের নিজ ব্যক্তিস্বভাবে কতদূর নিহিত ছিল সে বিষয়ে সংশয়বোধ সহজে নিরস্ত হইবে না। এ যেন রবীন্দ্রনাথের

নিজস্ব বিশ্বচেতনা রমেশের উপর আরোপিত হইয়াছে মাত্র। গঙ্গার উপর ঝড়বৃষ্টিদুর্যোগের উন্মত্ত বিক্ষোভ কমলার অন্তরলোকে এক অনুরূপ অন্ধ আলোড়ন জাগাইয়াছে। এ ঝড় যেন বিশেষ করিয়া তাহারই জীবনবোধে এক মূঢ় বিপর্যয় ঘটাইয়াছে। প্রথমতঃ উহার দুর্বোধ্য সঙ্কেত এক অজ্ঞাত বিভীষিকার অস্পষ্ট আস্ফালনরূপে তাহার মনে দুরন্ত কম্পনের আবেগকে মুক্ত করিয়াছে। কিন্তু ভয়ের পিছনে আর একটা নিগূঢ়তর আমন্ত্রণ তাহার চেতনায় সংক্রামিত হইয়াছে। ঝড়ের বাণী যেন একটা বিদ্রোহের, একটা সংহারের, একটা সার্বিক অস্বীকৃতির নির্দেশরূপে তাহার মনের গভীরে তুমুল প্রতিধ্বনি তুলিয়াছে। অবস্থাসঙ্কটের বিরুদ্ধে কমলার অবদমিত অস্বস্তি ও সুপ্ত প্রতিরোধস্পৃহা এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ হইতে কতটা বিস্ফোরণশক্তি আহরণ করিয়াছিল তাহা কে বলিতে পারে? তবে কমলা যখন দারুণ দুঃসাহসে রমেশের আশ্রয় হইতে অজানা অন্ধকারের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল তখন তাহার রক্তধারায় ও মানস সংস্কারে সে যে এই দুর্যোগময়ী রজনীর উন্মত্ত প্রেরণা বহন করিয়াছিল তাহা নিশ্চিত মনে হয়।

ষ্টীমারভ্রমণসমাপ্তির পর প্রকৃতির প্রভাব অপেক্ষাকৃত বিরল অবসরে মানবজীবনে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। গাজিপুরে কমলাদের নূতন বাসা পরিষ্কার করিবার সময় এক শীতমধ্যাহ্নে রমেশের সহিত মিলনোৎসুক কমলার মনে শীতের রৌদ্র, নিমগাছের ছায়া ও সখির বিশ্রম্ভালাপ এক অপরূপ মায়া বিস্তার করিল ও সুদূর নীলাকাশে উড্ডীন বিন্দুবৎ প্রতীয়মান চিলটি এক উধাও স্বপ্নকল্পনার মত তাহার হৃদয়ের এক নভোচারী আকাঙ্ক্ষাকে যেন মুক্তি দিল।

রমেশ একদিন অন্নদাবাবুদের প্রবাসগিয়া যাত্রার কালে তাঁহাদের বাড়ী তাহার ও হেমনলিনীর প্রণয়-অঙ্গীকারের সাক্ষী সেই বাতায়ন-তীর্থটিকে আবার নিজ অন্তরের অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া উহার পবিত্র ভাবানুষঙ্গ নূতন করিয়া অনুভব করিয়াছে। হেমনলিনীও তাহার কাশীর বাসায় শীতের রৌদ্রোজ্জ্বল মধ্যাহ্নে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে শক্তি ও শান্তি, উত্তম ও বৈরাগ্যের সহজ সমন্বয়ের দ্বারা উদ্‌বুদ্ধ হইয়া গুরুকে দয়িতরূপে গ্রহণ করিতে, কর্তব্যনিষ্ঠার সহিত হৃদয়বৃত্তির অনুকূল সংযোগ ঘটাইতে মন স্থির করিয়াছে ও প্রণয়ে বিদ্যুৎশক্তির মদিরতার অভাবকে

অক্ষুণ্ণচিত্তে মানিয়া লইয়াছে। একবার সূর্যাস্তকালের রক্তিম আভা আবেগহীন নলিনাক্ষর অন্তরকে পর্যন্ত অনুরাগের ক্ষণিক আবেশে রাঙাইয়াছে ও রাত্রির অন্ধকারে গোলাপফুলের গন্ধ তাহার রক্তে মিশিয়া উহাকে উদ্দাম নৃত্যছন্দে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। একেবারে শেষ দৃশ্যে নলিনাক্ষের সহিত কমলার বহুতপস্যাসাধিত মিলনটি প্রভাতের নির্মল আলোকধারার আশীর্বাদে কল্যাণময় হইয়া উঠিয়াছে। এইরূপে প্রধান পাত্র-পাত্রীদের সকলেরই অন্তর-বিক্ষোভে প্রকৃতির নিগূঢ় শুশ্রূষা ও সূক্ষ্ম প্রভাবটি নানা বিচিত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে এই উপন্যাসে সৃষ্ট চরিত্রাবলীর মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা ও গহন আত্মদ্বন্দ্ব সেরূপ প্রকাশ পায় নাই। সব চরিত্রগুলিই মোটামুটি সরল, একরেখ ও পরস্পরবিরোধী মনোবৃত্তির সহউপস্থিতির দুর্বোধ্যতাবর্জিত। উপন্যাসের প্রারম্ভে মুখ্য চরিত্রগুলি যে মূল প্রকৃতি লইয়া আবির্ভূত হইয়াছিল, উহার পরিসমাপ্তিতেও তাহা অপরিবর্তিতই রহিয়াছে। হয়ত ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাস বা অভিজ্ঞতার বেদনাময় অভিঘাত তাহাদের সরল বিশ্বাসকে কিছুটা ক্ষুণ্ণ, ও আদর্শবাদ ও জীবনবোধকে একরূপ বিষণ্ণ মহিমায় মণ্ডিত করিয়াছে। রমেশের অস্থিরচিত্ততা যে নূতন দায়িত্বজ্ঞান ও কর্তব্যের অমোঘতাবোধে রূপান্তরিত হইয়াছে তাহা বোধ হয় বলা যায় না। প্রথম যৌবনের প্রজাপতি-ধর্মী আশাবাদ হয়ত প্রৌঢ় চিত্তের জীবনভার-স্বীকৃতির মূল্য স্বীকার করিয়াছে। কিন্তু তাহার জীবনদর্শনের কোন মৌলিক পরিবর্তন ঘটে নাই। সে কমলা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া হেমনলিনীর উপর তাহার সুখের আশা কেন্দ্রীভূত করিয়াছে, সেখানেও সে কোন অলঙ্ঘ্য বাধার কল্পনা করিতে পারে নাই। হেমনলিনী আরও গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, সে জীবনকে কখনই গোলাপী রঙে রঞ্জিত করিয়া দেখে নাই। জীবন তাহার নিকট কর্তব্য ও অধিকার, ভোগ ও ত্যাগের নানা বিপরীত সমস্যাজালে আকীর্ণ, রেখাকুটিল চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছে ও তাহাকে সব সময়ই দুরূহ আত্মদানের জন্য প্রস্তুত থাকিতে নির্দেশ দিয়াছে। একটি অবদমন-ক্লিষ্ট সঙ্কল্প তাহার মুখের সহজ প্রসন্নতাকে সর্বদা চিন্তাকুঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু ইহাও তাহার মৌন স্বভাবের অপরিহার্য পরিণতি, কোন নূতন জীবন সত্যের উপলব্ধিজাত নয়। রমেশ ও হেমনলিনীর অনুরূপ

অভিজ্ঞতার প্রভাবে বিভিন্নরূপ মানস প্রতিক্রিয়া উভয়ের প্রকৃতি-পার্থক্যের দ্যোতক।

এই সাধারণ মন্তব্য হইতে কমলা-চরিত্রই একমাত্র ব্যতিক্রম। তাহারই দেহে ও মনে, সমগ্র ধাতু-প্রকৃতিতে এক তাৎপর্যময় পরিণতি সাধিত হইয়াছে। কিশোরীসুলভ আকুলতা হইতে তাহার নারীপ্রকৃতির ক্রমিক উন্মোচন উপন্যাসের একটি অনন্য মনোরহস্যের সন্ধান ও উদ্ভাসন। তাহার কিশোরকল্পনার অবিকশিত দলগুলি জীবনঅভিজ্ঞতার আলোক ও উত্তাপে কেমন করিয়া পূর্ণবিকশিত হইয়া উঠিল, দাম্পত্য সম্পর্কের অজানা সত্যটি কেমন করিয়া তাহার অনুভূতিতে অনুমান হইতে নিশ্চয়ের পর্যায়ে উন্নীত হইল লেখক তাঁহার সমস্ত কবিদৃষ্টি ও জীবনবোধ দিয়া তাহার ইতিহাসটি অতি মনোজ্ঞভাবে উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। স্কুলবোর্ডিংএ থাকার সময় রমেশের সহিত তাহার দীর্ঘ বিচ্ছেদে তাহার অভিমানের স্ফুরণ। ষ্টীমারবাসে রমেশের নিবিড় সান্নিধ্যের মধ্যে সূক্ষ্ম ব্যবধানরচনার সুচিন্তিত প্রয়াস তাহার সহিত একটি অনির্দেশ্য বেদনাবোধ যুক্ত করিল। তাহাদের মধ্যে সম্পর্কটি ঠিক সহজ পথে চলিতেছে না, কোন অজ্ঞাত বাধায় লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতেছে এই সংশয় তাহার মনে দৃঢ়ীভূত হইয়া তাহাকে এক আপাত-সমাধানহীন সমস্যার জালে জড়াইয়া ফেলিল। সে যেন একটা দুঃস্বপ্নের অতলে তলাইয়া গিয়া সহজ নিঃশ্বাসবায়ু হইতে বঞ্চিত হইল। এই সঙ্কটে উমেশ ও চক্রবর্তীর আগমন তাহাকে মুক্ত জীবনানন্দের নব আস্বাদন দিয়া তাহাকে সূক্ষ্মতর হৃদয়সমস্যার নামহীন যন্ত্রণা হইতে স্বাভাবিকতার রাজ্যে ফিরাইয়া আনিল। সে রমেশের হেঁয়ালি বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া জীবনের সর্বজনবোধ্য প্রীতিবিনিময়ের উপভোগে নিজ অহেতুক মর্মবেদনার কথা সাময়িকভাবে ভুলিল। সে যে কতদূর দাম্পত্যরহস্যবিষয়ে অনভিজ্ঞ, তাহা তাহার রমেশ ও চক্রবর্তী খুড়োর আপেক্ষিক নির্ভরযোগ্যতার ধারণার মধ্যেই আত্মঘোষণা করিল। সমস্ত কিছু না বুঝিয়াই রমেশের অপরিহার্যতা সম্বন্ধে তাহার প্রত্যয়ের মূল শিথিল হইয়া গেল। একটা কিছু অন্তরঙ্গতম বন্ধনের অভাবই রমেশের সহিত তাহার সম্পর্ককে আবশ্যিক হইতে ঐচ্ছিক পর্যায়ে, অন্তরের অলঙ্ঘ্য অনুশাসন হইতে রুচি ও সুবিধার স্বেচ্ছানির্ধারিত সাময়িকতার স্তরে নামাইয়া আনিল।

গাজিপুরে চক্রবর্তী-পরিবারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসার পর ও সখী শৈলজার

অনুপ্রেরণা ও দৃষ্টান্তে ও সংসারকর্তব্যের সঙ্কীর্ণ, অতিনিয়ন্ত্রিত পরিসরেই দাম্পত্যপ্রেমের ফল্গুপ্রবাহটি কমলার বিস্মিত দৃষ্টির নিকট প্রথম ধরা পড়িল। প্রেমের মদির আবেশ সংসারের বাঁধা-ধরা কর্মবন্ধনের শত বাধা উত্তীর্ণ হইয়া কি গোপন পথে, পরিবার-পরিজনের অতন্দ্র চক্ষুকে ফাঁকি দিয়া কিরূপ সূক্ষ্ম, অলক্ষ্য সঞ্চরণশীলতায় নিজ উদ্দাম স্রোতকে প্রিয়মিলনের দিকে উন্মুখ করে তাহার সাধনাকৌশলটি কমলার নিকট সুস্পষ্ট হইল। সে এই মন্ত্রে প্রথম দীক্ষায় অভিষিক্ত হইল ও নূতন বাড়ীতে উহার ব্যবহারিক প্রয়োগের জন্য চিত্তকে উৎসুক করিয়া শুভ লগ্নটির প্রতীক্ষায় রহিল। এই অভিশপ্ত মিলনমন্দিরকে সাজাইবার কয়েক দিনের অক্লান্ত আনন্দময় প্রয়াসের মধ্য দিয়াই তাহার ক্ষণস্থায়ী প্রেয়সী-জীবনের ঐশ্বর্যমাধুর্যনন্দিত উদ্বোধন ঘটিয়াছে—অনুপস্থিত দয়িতের উদ্দেশ্যে সে অর্ঘ্যপাত্র পূর্ণ করিয়াছে। তাহার পরই নিয়তির নিদারুণ আঘাতে তাহার সমস্ত প্রেমস্বপ্ন সম্পূর্ণ টুটিয়া তাহার প্রথম যৌবনের সমস্ত সরসতা যেন বজ্রের আগুনে ঝলসাইয়া গিয়াছে ও এই তরুণ কল্পনার ভস্মাবশেষ হইতে উদ্ভূত এক সহজপ্রত্যয়জাত আত্মনিবেদন-সঙ্কল্প তাহার সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবনকে আহুতির উপকরণে পরিণত করিয়াছে। এইখানেই তাহার প্রেমিকাজীবনের অবসান ও তাহার সাধিকাজীবনের সর্বগ্রাসী একাধিপত্যের সূচনা। মনে হয় যে সে শৈলজার কাছে যেমন স্বামীপ্রেমের স্বরূপ শিক্ষা পাইয়াছিল, তেমনি যুগযুগান্তরপুষ্ট পতিসংস্কারেও দীক্ষিত হইয়াছিল। ফলের রস ও মূলের গভীরশায়ী দৃঢ়তা একই প্রণালী বাহিয়া তাহার চেতনার গহনে যুগপৎ সঞ্চারিত হইয়াছিল। হিন্দুরমণীর পতিপ্রেম ও উহার অত্যাজ্য জন্ম-জন্মান্তরব্যাপী চিরন্তনতার প্রতি প্রত্যয় একই সঙ্গে তাহার মনে অচ্ছেদ্য সম্পর্কে গ্রথিত হইয়া স্ফুরিত হয়। যেন এক যাদুমন্ত্রে রমেশের প্রতি সমস্ত আকর্ষণ নলিনাক্ষের মধ্যে যে পতিত্বের সদ্যোবিকশিত আদর্শ মূর্ত হইল, সেই প্রতীকসত্তার নূতন আধারে তৎক্ষণাৎ পাত্রান্তরবিন্যস্ত হইল। ইহার কোন মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা নাই; ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অতীত বলিয়াই সংস্কারের প্রভাব এত অমোঘ। যে বিধাতা মাতৃবক্ষে সদ্যোজাত শিশুর প্রতি স্নেহ ও মাতৃস্তন্যে সেই স্নেহধারার বাস্তব প্রকাশরূপ ক্ষীরসঞ্চয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তিনিই অনুশীলনকর্ষিত হিন্দু নারীর অন্তরে স্বামীর প্রেম ও তাহার প্রতি জীবনমরণে অবিচল আনুগত্য বৃন্ত ও ফুলের মত অচ্ছেদ্য সূত্রে

গাঁথিয়া অখণ্ড সত্তায় বিকশিত করিয়াছেন। এই জীবনসত্য ঔপন্যাসিক প্রণালীতে প্রতিপাদ্য নয়, অমোঘ প্রত্যয়রূপে অন্তরে স্বতঃসিদ্ধভাবে সঞ্চারিত। ইহা উপন্যাসের সার্থক ফলশ্রুতিরূপে গৃহীত হইবে কি না সন্দেহ কিন্তু বোধাতীত সংস্কারের শক্তিপ্রকটন যদি ভারতীয় জীবনধারার একটা যথার্থ প্রকাশ হয় তবে ইহা নিশ্চয়ই জীবনপরিচিতিরূপে উপন্যাসের সীমাবহির্ভূত নয়। যাহাই হউক এই মিশ্র আস্বাদনই 'নৌকাডুবি'র পরিণততম রসনির্যাস ও ইহার মানদণ্ডেই আমাদিগকে উপন্যাসটির চরম মূল্য বিচার করিতে হইবে।

সপ্তদশ অধ্যায়

'গোরা' (১৯১০, মাঘ ১৩১৬)

১

'গোরা'-উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসশিল্পের পূর্ণতা সম্বন্ধে তাঁহার যে আদর্শ ছিল তাহাকে সর্বাঙ্গীণ রূপ দিয়াছেন। এই একটি উপন্যাসে তাঁহার আদর্শকল্পনা ও উহার নিখুঁত শিল্পরূপায়ণের, তাঁহার মানস অভীপ্সা ও উহার ঘটনা-ও-চরিত্র-সংবলিত বস্তুদেহনির্মাণের মধ্যে এক বিরল সামঞ্জস্য সাধিত হইয়াছে। এই উপন্যাসে লেখকের পূর্ব পূর্ব উপন্যাসের বিশেষ গুণগুলির ও অর্জিত জীবনপ্রজ্ঞার ও শিল্পসাধনার আশ্চর্য সমাহারে এক যৌগিক মানবরসসমৃদ্ধ আবেদন ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে। এই সমুদ্রগামিনী মহানদীতে পূর্বতন উপন্যাসগুলির ক্ষুদ্রতর ধারাগুলি মিশিয়া ইহাকে যুগজীবনের বিশাল পরিসরের প্রতিবিম্বগ্রাহী বিস্তার ও প্রতিস্পর্ধী গতিবেগ দিয়াছে। ইহাতে 'চোখের বালি'র মনস্তত্ত্বসম্মত নিশ্ছিদ্র জীবননিয়ন্ত্রণের সহিত 'নৌকাডুবি'র অভাবনীয় ঘটনার বিস্ময়চমক এক সুষ্ঠু সমন্বয়ে মিশিয়াছে। অথচ প্রথমটির পরিধি-সঙ্কীর্ণতা ও দ্বিতীয়টির ভ্রান্তিবিলাস হইতে উদ্ভূত যে সূক্ষ্ম অতৃপ্তি তাহা সম্পূর্ণভাবে অতিক্রান্ত হইয়াছে। এক বিপুল, বিচিত্র কর্মচাঞ্চল্য ও ভাবসংঘাত যে অভ্রান্ত মনস্তত্ত্বের আকর্ষণে বহির্জগৎ হইতে মনোলোকের কেন্দ্রবিন্দুতে সঞ্চারিত হইতে পারে, সূক্ষ্ম মানস ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া উদাহৃত করিবার জন্য যে পারিবারিক জীবনের নিস্তরঙ্গতায় সমীক্ষাকে সঙ্কুচিত করার প্রয়োজন নাই, সমষ্টিজীবনের বিরাট পটভূমিকার সহিত ব্যক্তিজীবনের অন্তর্মুখী অদম্য আবেগ-স্পন্দনের যে সহজ সামঞ্জস্যবিধান সম্ভব তাহা 'গোরা'-উপন্যাস অনন্য কৃতিত্বের সহিত প্রমাণ করিয়াছে। অসম্ভব ঘটনা যে উপন্যাসের মহৎ ভাবপ্রেরণাকে বিচলিত না করিয়া দৃঢ়তর প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে, উহা উপন্যাসের সূচনায় এক অবিশ্বাস্য পরিস্থিতির সৃষ্টিতে পাঠকের বিচারবুদ্ধিকে সর্বদা সংশয়াকুল না করিয়া ঠিক চরম সঙ্কটের প্রাক্‌মুহূর্তে হঠাৎ আবির্ভূত হইয়াও উপন্যাসের পুঞ্জীভূত, জটিল সমস্যার এক মুহূর্তে সমাধান করিতেও পাঠকচিত্তকে এক অভাবনীয় ফলশ্রুতির আস্বাদে চমৎকৃত করিতে পারে, তাহা 'গোরা'তে সগৌরবে প্রতিপন্ন হইয়াছে। 'গোরা'র মধ্যে 'চোখের বালি' ও 'নৌকাডুবি'-র অন্তর্নিহিত অপূর্ণতা পূর্ণতর রূপবৃত্তে উদ্বর্তিত হইয়া

উহাদের শক্তির উৎসটি উন্মোচিত ও প্রকাশটি আরও প্রাণরসোচ্ছল ও দুর্লভতর সংশ্লেষে সমন্বিত হইয়াছে।

'গোরা'র সমাজপটভূমিকাটি উহার প্রকাশের প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্বেকার সমষ্টিগত বঙ্গ-জীবনপরিচয়টি উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে। মনে হয় যে ১৮৮০ হইতে ১৯০২-০৩ পর্যন্ত কালসীমায় শিক্ষিত বাঙালীর মনে যে ভাব-আলোড়ন উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছিল তাহাই উপন্যাসে অঙ্কিত পরিবেশে স্মরণীয়ভাবে বিধৃত হইয়াছে ও প্রগতিশীল তরুণ সম্প্রদায়ের চিন্তায় ও আচরণে একটি তরঙ্গোচ্ছ্বাসের গতিবেগস্পর্শ রাখিয়া গিয়াছে। তখন যে স্বাজাত্যাভিমান জাতির অন্তরে সচেতন হইয়া উঠিয়াছে তাহা মুখ্যতঃ ধর্মকেন্দ্রিক ও নবউদ্‌বুদ্ধ হিন্দু জাতীয়তাবাদ ও ব্রাহ্মধর্মের হিন্দুদ্বেষিতার মধ্যে উগ্র সংঘাতেই উহা বিস্ফোরণোন্মুখ, উত্তপ্ত আবেগ সঞ্চয় করিয়াছে। হিন্দু ও ব্রাহ্মধর্মের পারস্পরিক বিরোধ ও আক্রমণাত্মক মনোভাবই সমাজ-প্রতিবেশকে অন্তঃরুদ্ধ দাহ্য উপাদানে ঠাসিয়া অগ্ন্যুৎক্ষেপের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছে। এইটিই হইল সে যুগের সমাজের কেন্দ্রপ্রেরণা। রাজনৈতিক উত্তেজনা ইহার সহিত পরোক্ষভাবে যুক্ত হইয়াছে। কিন্তু ইহা এখন পর্যন্ত সমাজগঠনে গৌণ স্থানই অধিকার করিয়াছে। গোরার প্রধান আক্রোশ হইল হিন্দুধর্ম-ও-আচারদ্বেষী, হিন্দু শাস্ত্রবিধি ও সমাজপ্রথার উদ্ধত উল্লঙ্ঘনকারী, পাশ্চাত্ত্য অনুকরণের মোহে আবিলদৃষ্টি, ভুঁইফোড় ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে। ইংরেজজাতি তাহার অবজ্ঞার পাত্র হইয়াছে তাহার দেশবাসীর রীতি-নীতিবিষয়ে মূঢ় অজ্ঞতার জন্য, কিন্তু প্রধানতঃ এক শ্রেণীর চাটুকার, আত্মসম্মানহীন দেশবাসীকে প্রশ্রয়-দান ও উহাদের শাশ্বত ধর্মসংস্কৃতির প্রতি অশ্রদ্ধাপোষণে উৎসাহ ও প্ররোচনা যোগাইবার জন্য। ইংরেজের শাসন ও শোষণের নির্মমতা তাহার কাছে পরবর্তীকালে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু শাসকগোষ্ঠীর সান্নিধ্যবর্জন ও অবজ্ঞার প্রতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা প্রদর্শন ছাড়া আর কোন উগ্রতর রাজনৈতিক প্রতিকার-ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা তাহার মনে উদিত হয় নাই। সে ইংরেজদত্ত অপমান ও অবিচার তাহার হতভাগ্য দেশবাসীর সহিত সমবণ্টন করিয়া লইয়াছে। কিন্তু জেল হইতে বাহিরে আসার পর সে প্রতিরোধ-আন্দোলন অপেক্ষা প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা আত্মশুদ্ধির প্রতিই অধিকতর মনোযোগী হইয়াছে। গোরা জাতীয় জীবনের সেই সন্ধিক্ষণের প্রতিনিধি, যখন যুবশক্তি রাজনৈতিক জাগরণ অপেক্ষা

ধর্মসংস্কারের মধ্যেই দেশের মুক্তির সূত্র খুঁজিয়াছে। মনে হয়, তাহার মানসদিগন্ত বঙ্কিমচন্দ্র-বিবেকানন্দ প্রভৃতি প্রথম যুগের দেশনেতৃবৃন্দের ভাবাদর্শ-সীমিত। গোরার মধ্যে যে স্বদেশপ্রেম দেশের প্রাচীন সামাজিক প্রথা ও শাস্ত্রনির্দিষ্ট রীতিনীতির প্রতি পাশ্চাত্ত্যদীক্ষিত সংশয়বাদীদের নির্বিচার শ্রদ্ধার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় একান্তভাবে ও দুর্জয় ইচ্ছাশক্তির সহিত নিয়োজিত, পরবর্তী-উপন্যাস 'ঘরে-বাইরে'-তে তাহাই রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠামোহের দ্বারা বিকৃত হইয়া শাশ্বত ধর্মনীতিকে কলুষিত স্বাজাত্যবোধের নিকট অবহেলায় বিসর্জন দিয়াছে। গোরা-চরিত্রের সহিত সন্দীপ-চরিত্রের পার্থক্যই উভয় উপন্যাসের ভাবগত ব্যবধানের পরিমাণসূচক। গোরার মাধ্য যে দুর্দম বিজিগীষা সময় সময় তাহার ধর্মবোধের মাত্রাহানি ঘটাইয়াও উহার উদ্দেশ্যের বিশুদ্ধিকে সমর্থন করে, সন্দীপে তাহার উৎকট স্বার্থবুদ্ধিকলুষিত রূপই কূটিলনীতিপ্রয়োগের সংস্পর্শে নিজ শূন্যগর্ভতা প্রমাণ করিয়াছে।

উপন্যাসে ব্রাহ্ম ও হিন্দুধর্মের সম্প্রদায়গত বিরোধ ও ব্যক্তিজীবনে উহার প্রভাব মুখ্য অংশ অধিকার করিয়াছে। এতৎসম্বন্ধীয় বিতর্ক কেবল বুদ্ধিগত মতবাদ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নাই। উহার মধ্যে বিশেষতঃ গোরার ক্ষেত্রে একটা গভীর আত্মপ্রত্যয় ও ব্যক্তিসত্তার সবটুকু প্রাণরসনির্যাস সঞ্চারিত হইয়াছে। পরেশবাবু ও আনন্দময়ীর জীবনে ধর্মচেতনার নিগূঢ়, প্রশান্ত আত্মোপলব্ধির স্বরটি বাহ্য উত্তেজনার লক্ষণ-নিরপেক্ষভাবে অন্তর্লোকের স্থির উৎস হইতে উৎসারিত হইয়া বহির্জীবনে উহার অনুরণনটি ব্যক্ত করিয়াছে। উভয় ধর্মেরই আত্মসমাহিত, নিষ্ঠাবান সাধক হয়ত দুই একজন আছেন! কিন্তু অধিকাংশই গোঁড়া মতভেদ-অসহিষ্ণু সদম্ভ, ধর্মের আবরণে নিজ সম্প্রদায়ের হীন হিংসাদ্বেষ-আত্মাভিমান বৃত্তিগুলিকে চরিতার্থ করিবার উপায় খোঁজাতেই তাঁহাদের অভিরুচি। এই সঙ্কীর্ণ মনোভাব হিন্দু অপেক্ষা নবজাত ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের মধ্যেই অধিকতর প্রকট। হিন্দুর ব্রাহ্মধর্মদ্বেষ মূলতঃ আত্মরক্ষামূলক, আপৎকালীন নীতি। ব্রাহ্মের হিন্দুধর্ম ও আচারের প্রতি অবজ্ঞা তাহার আত্মাভিমানবোধজাত ও নিজের উপাসনাপদ্ধতি ও সামাজিক রীতিনীতির শ্রেষ্ঠত্ব-ঘোষণায় স্পর্ধিত। এই উভয় শ্রেণীর চরমপন্থীদের মাঝে আছে স্বল্পসংখ্যক প্রকৃত ধর্মজিজ্ঞাসু, মিলনোৎসুক তরুণ-তরুণী। ইহারা উভয় ধর্মের শাশ্বত সত্যটি

বুঝিতে ও গ্রহণ করিতে অভিলাষী—কেহ বা সূক্ষ্ম ধর্মসমীক্ষা, কেহ বা হৃদয়ের অকৃত্রিম আবেগ ও অন্যায়ের নিকট নতিস্বীকার না করিবার দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি, কেহ বা সহজ ভাবসৌকুমার্যের দ্বারা অনুপ্রেরিত। ব্রাহ্ম সমাজের সুচরিতা ও ললিতা ও হিন্দুসমাজের বিনয় এই কর্তব্যসঙ্কটের সমস্ত বিপরীতমুখী তরঙ্গাভিঘাতের দ্বারা বিস্রস্ত হইয়া শেষ পর্যন্ত সমন্বয়ের শান্তিময় কূলে আশ্রয় লাভ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ নিজে ব্রাহ্ম হইয়াও এই ব্যাপারে আশ্চর্য সমদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন, বরং হিন্দুসমাজের চরমপন্থী কৃষ্ণদয়াল ও হরিমোহিনী অপেক্ষা ব্রাহ্মসমাজের উগ্র ধর্মধ্বজীরা —যথা হারাণবাবু ও বরদাসুন্দরী—তাঁহার তীব্রতর শ্লেষাস্ত্রে বিদ্ধ হইয়াছে। গোরার ধর্মবিশ্বাসের আপোষহীন উগ্রতা তাহার প্রগাঢ় দেশানুরাগের উৎসসঞ্জাত ও ঐকান্তিক আকূতিপ্রসূত বলিয়া তাহার স্রষ্টার প্রসাদধন্য হইয়াছে ও সে উভয় সম্প্রদায়ের সঙ্কীর্ণ শ্রেণীবিভেদের ঊর্ধ্বে, ভারতাত্মার প্রতীকরূপে এক সার্বজনীন প্রতিষ্ঠাভূমিতে স্থান পাইয়াছে। উনবিংশ শতকের শেষ দুই দশকে বাংলার সমষ্টিজীবন যে বিপুল ভাবের জোয়ারে ও বিচিত্রমুখী প্রাণচাঞ্চল্যে আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছিল তাহার একটি সামগ্রিক বেগস্পন্দিত চিত্র এই উপন্যাসের সুবিপুল আয়তনে মহাকাব্যিক সংহতির সহিত বিধৃত হইয়াছে।

এই ব্রাহ্মহিন্দুসংঘাতের শুধু যে পটভূমিকাগত উপযোগিতা আছে, তাহা নয়। ইহা ব্যক্তিচরিত্রস্ফুরণের অপরিহার্য অবসর ও উপলক্ষ্য যোগাইয়া উপন্যাসের মানবিক জীবনকাহিনীতেও একটি আবশ্যিক স্থান গ্রহণ করিয়াছে। কোন কোন ফুল আছে যাহারা রুক্ষ, কঙ্করময় প্রতিবেশে এবং চৈত্রমধ্যাহ্নের উতলা উত্তপ্ত হাওয়ার পরুষ স্পর্শেই বর্ণবৈভবে বিকশিত হইয়া উঠে। তেমনি 'গোরা'র অনেকগুলি চরিত্র এই বিতণ্ডাবিক্ষুব্ধ আবহাওয়া ও বৃহত্তর চিন্তাজগতের বুদ্ধিসংবেদ্য আলোড়ন ছাড়া নিজ নিজ অনন্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে ফুটিয়া উঠিতে পারিত না। বাঙলাদেশের এই বৈদ্যুতীশক্তিময় যুগে মানুষে মানুষে অন্তরঙ্গ পরিচয় শুধু সাধারণ সামাজিকতার স্তিমিত দীপালোকে সম্ভব ছিল না। ইহা সম্ভব ছিল কেবল নবভাবদীক্ষার উত্তেজিত চেতনার অগ্নিস্ফুলিঙ্গবর্ষণে। গোরা ও সুচরিতার মত দুই বিপরীত মেরুর অধিবাসী পরস্পরের আকর্ষণ অনুভব করিতে পারিত মামুলী প্রেমনিবেদনের প্রথাসিদ্ধ রীতির অনুসরণে নয়, শুধু সমস্ত

চিত্তমন্থনকারী বৈপ্লবিক সত্যের বিদ্যুৎদীর্ণ উপলব্ধির রন্ধ্রপথ দিয়া। গোরার সমস্ত ব্যক্তিসত্তা আত্মপ্রত্যয়ের পরিপূর্ণ শক্তিপ্রয়োগে, সুচরিতার আশৈশব ধর্মচেতনায় ও জীবনাদর্শে যে সুগভীর প্রবেশপথ উন্মোচন করিয়াছিল, সুচরিতার সেই নবসত্তার জন্মলগ্নে, সেই ভাবমুগ্ধতার ফাঁকে কখন যে প্রেম নিঃশব্দপদসঞ্চারে তাহার অন্তর্লোকে আবির্ভূত হইল, তাহা গোরা ও সুচরিতা উভয়েরই অজ্ঞাত ছিল। গোরা হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির সত্যরূপটি তাহাকে বুঝাইতে গিয়া, এই মহিমান্বিত আদর্শের প্রতি তাহার অকুণ্ঠ নিষ্ঠা ও আত্মনিবেদন দাবী করিয়া নিজেও এই জ্যোতির্বলয়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িল ও সুচরিতার আত্মসমীক্ষা ও ধর্মানুভূতিতে উৎসর্গিত চিত্তে তাহার মূর্তি অকস্মাৎ রমণীয়রূপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। গোরা মহত্তর ভাবচেতনার সহিত একীভূত হইয়াই, তাহার ব্যক্তিগত নয় আত্মিক পরিচয়েই, সুচরিতার কুমারীহৃদয় অধিকার করিয়া বসিল। আর কোন উপায়েই সে সুচরিতার প্রেম উদ্রেক্ করিতে পারিত না। গুরুর আসন হইতে প্রেমিকের আসনে পদক্ষেপ তাহার পক্ষে শুধু সহজ নয়, অনিবার্যও হইয়া উঠিল। আর গোরার অন্তরে সুচরিতার প্রতি যে অনির্দেশ্য আকর্ষণ প্রবল হইয়া উঠুক না কেন, তাহার সমস্ত জীবনে বদ্ধমূল ও দ্বিতীয় স্বভাবে পরিণত প্রত্যয়ের বন্ধন কাটাইয়া সে স্বাভাবিক অবস্থায় সহধর্মিণীরূপে কোন ব্রাহ্মতরুণীকে কল্পনা করিতেই পারিত না। সুতরাং এই অভাবনীয় উপসংহার সম্ভব করিবার জন্য আকস্মিক বজ্রপাতের মত তাহার প্রকৃত জন্মরহস্য-উদ্‌ঘাটন অপরিহার্যই ছিল। তাই মনে হয় কাহিনীর জটিল ও বহুমুখী বিস্তার ও আকস্মিক সংঘটনের বিহ্বল-করা অভিঘাত শুধু লেখকের আশ্চর্য নির্মিতিকৌশলেরই, একটি বৃহৎ পটভূমিকার অপূর্ব বিন্যাসশক্তিরই পরিচয় দেয় না, চরিত্রের সূক্ষ্ম স্ফুরণ ও পরিণতিতেও উহার অমোঘ প্রভাব বিস্তার করে।

বিনয় ও ললিতার মিলনও, গোরা-সুচরিতার মিলনের মত এত অভাবনীয় ও দুর্লঙ্ঘ্য বাধাবিড়ম্বিত না হইলেও, পরিবেশ-প্রভাবের দ্বারা সহজসাধ্য হইয়াছে। ললিতা সুচরিতার মত অন্তঃসমীক্ষাশীল নয়, ধর্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব ও স্বরূপ লইয়া তাহার বিশেষ মাথাব্যথা নাই। সে নিজের মত ও আচরণের স্বাধীনতারক্ষার প্রতি একান্তভাবে উৎসাহী। সে ব্রাহ্ম ধর্ম ও হিন্দুধর্মের তত্ত্বগত ও আদর্শগত মিল ও বৈষম্যের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন;

সুচরিতার মত সমস্ত বিষয়টি অন্তরের আলোকে সে স্পষ্টভাবে দেখিতে চায় না। ললিতার প্রচণ্ড ক্রোধ ব্রাহ্মসমাজের ব্যক্তিস্বাধীনতার উপর অপমানকর হস্তক্ষেপে, ঘরের ব্যাপারে সমাজের অবাঞ্ছিত মুরুব্বিয়ানায়, ও সমাজনেতৃবৃন্দের কপটাচরণ ও সঙ্কীর্ণ মনোভাবের বিরুদ্ধে প্রবলভাবে উদ্দীপ্ত। বিশেষতঃ হারাণবাবুর আত্মাভিমান ও পরেশবাবুর দুর্বলতার প্রতি তাহার স্পর্ধিত কটাক্ষক্ষেপ তাহার নিকট অসহনীয়। মাতা বরদাসুন্দরীও ললিতার স্পষ্টভাষণ ও আপোষহীন ন্যায়নিষ্ঠতার ঝাঁঝ হইতে রক্ষা পান না—তাঁহাকেও ললিতার বিদ্রোহঘোষণার ভয়ে সর্বদা শঙ্কিত থাকিতে হয়। যাহাই হউক, ললিতা তাহার বলিষ্ঠ ও দুঃসাহসী প্রকৃতি লইয়া ব্রাহ্মপরিবারের আচার-আচরণের লৌহবন্ধনের সহিত কোনরূপে মানাইয়া ছিল। কিন্তু গোরা ও বিনয়ের আবির্ভাবের পর যে তুমুল গার্হস্থ্য আলোড়ন জাগিল, তাহাতে তাহার পক্ষে ধৈর্যরক্ষা করা সম্ভব হইল না। এই দুই শিষ্ট ও মনস্বী যুবকের প্রতি হারাণবাবুর নীচ ঈর্ষ্যা, তাহাদিগকে ছোট করিয়া দেখার যে হেয় প্রবৃত্তি ও তাহার ধর্মোপদেষ্টার উচ্চমঞ্চ হইতে সকলকে অভিভূত ও সতর্ক করার মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের যে উদ্ধত দাবী তাহা ললিতার সমস্ত অ্তরকে বিদ্রোহোন্মুখ করিয়া তুলিয়াছে।

চরঘোষপুরে গোরার বীরোচিত আচরণ ও নিপীড়িত প্রজার পক্ষ-সমর্থনে তাহার কারাবরণ ললিতার বিদ্রোহকে চরম রূপ দিয়াছে ও ম্যাজিস্ট্রেটের আনন্দ-অনুষ্ঠানে যোগ দিতে তাহার সমস্ত অন্তরাত্মাকে প্রবলভাবে বিমুখ করিয়াছে। তাহার উদ্দীপ্ত আত্মসম্মানবোধ তাহাকে সমস্ত লৌকিক আচরণবিধির ঊর্ধ্বে তুলিয়া, সমস্ত সমাজের কুৎসা-নিন্দাকে অগ্রাহ্য করিয়া, বিনয়ের সহিত একাকী ষ্টীমারযাত্রায় নৈতিক প্রেরণা দিয়াছে। এই জাতীয় অপমানের বিরুদ্ধে যৌথ প্রতিবাদের মধ্য দিয়া তাহাদের আত্মিক বন্ধনটি অচ্ছেদ্য হইয়া উঠিয়াছে। দেশাত্মবোধের দীপ্ত হোমানলের সম্মুখে তাহারা একাত্মতার মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে ও বিবাহ ইহারই অনিবার্য পরিণতিরূপে ঘটিয়াছে। ললিতা ও বিনয়ের ষ্টীমারযাত্রা লইয়া ব্রাহ্ম সমাজে যে সঙ্কীর্ণ সন্দেহ উদ্দাম হইয়া উঠিয়া সুরুচি ও শোভনতার সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে ও বিশেষতঃ হারাণের যে ঈর্ষ্যাদিগ্ধ ক্ষুদ্রাশয়তা এই উপলক্ষ্যে বীভৎসভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে তাহাতে ললিতার সামাজিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সঙ্কল্প দৃঢ়তর হইয়াছে

মাত্র। ললিতার এই প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি ও তেজোদৃপ্ত আত্মপ্রত্যয়ের সমর্থন না পাইলে বিনয়ের মত স্বভাবদুর্বল ও পূর্ববন্ধনভীরু. আত্মীয়বৎসল ব্যক্তি প্রকাশ্যভাবে সামাজিক বিধিনিষেধলঙ্ঘনের উপযুক্ত মনোবল অর্জন করিতে পারিত না। সুতরাং গোরার দুর্বার শক্তি যেমন সুচরিতার উপর, তেমনি ললিতার প্রচণ্ড সত্যনিষ্ঠা বিনয়ের উপর, সংক্রামিত হইয়া এই অসম মিলনকে সম্ভব ও স্বাভাবিক করিয়াছে। সমস্ত প্রতিবেশপ্রভাবের প্রবল সহযোগিতা ছাড়া ব্যক্তিস্বভাবের এইরূপ পরিবর্তন নিজ অন্তর্নিহিত প্রেরণার দ্বারা দুঃসাধ্য হইত। এইখানেই সমস্ত প্রতিবেশ উপন্যাসিক চরিত্র-বিকাশের ও ঘটনাপরিণতির অঙ্গীভূত হইয়া উপন্যাসের মর্মগত] জীবন-সত্যের সহিত নিবিড় সংশ্লেষে যুক্ত হইয়াছে।

কাহিনীসন্নিবেশের এই অনবদ্য সংহতি কোথাও কোথাও কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। হরিমোহিনীর পূর্বজীবনের এত সুবিস্তৃত বিবরণ ও সুচরিতার সহিত তাহার দেবর কৈলাসের বিবাহে ঘটকালি দ্বারা উহাকে পাকাপাকি হিন্দুসমাজভুক্ত করার ষড়যন্ত্রের অতিপল্লবিত বিস্তার গঠনের নিখুঁত ভারসাম্য কিছুটা বিচলিত করিয়াছে তাহা হয়ত স্বীকার করা যায়। ললিতা ও বিনয়ের বিবাহ ব্রাহ্মমতে হইবে না হিন্দুমতে হইবে এই সম্বন্ধে সূক্ষ্ম ও দীর্ঘায়িত বিতর্কসৃজনও হয়ত অনুরূপ অভিযোগের সম্মুখীন হইতে পারে। কিন্তু ইহার সমর্থনেও কিছু বলিবার আছে। কালব্যবধানের অপর তীরে দাঁড়াইয়া আমাদের নিকট সমস্ত ব্যাপারটি যতটা তুচ্ছ ও অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়, সেই উত্তেজনাপূর্ণ, সংঘাতময় সদ্যোসংঘটনের মুহূর্তে মর্যাদার সংগ্রামে আকণ্ঠনিমজ্জিত যুধ্যমান উভয় পক্ষের নিকট উহার গুরুত্ব অনেক বেশী ছিল। ব্রাহ্মসমাজ বিনয়ের ধর্মান্তর-দীক্ষা এই বিবাহের আবশ্যিক সর্তরূপে যে দাবী করিয়াছিল তাহা তাহাদের পক্ষ হইতে যুক্তিসঙ্গত ও প্রথাসমর্থিতই ছিল। ললিতাকে লাভের জন্য বিনয়কে ও সমস্ত হিন্দু সমাজকে যদি এই মূল্যদানে বাধ্য না করা গেল, হিন্দুর গোঁড়ামির দুর্গে যদি এই ফাটল ধরান না গেল, তাহা হইলে বিজয়গৌরব ও পরাজয়গ্লানির মধ্যে পার্থক্য কি রহিল? বিনয়ের পক্ষে এই যুক্তি দেওয়া যায় যে ব্রাহ্ম-পরিবারে বিবাহ করিয়া বিনয় নিজ হিন্দুসমাজচ্যুতি, তাহার আবাল্য-পরিবেশের সহিত চিরবিচ্ছেদ স্বীকার করিয়া লইবে কেন? অবশ্য বিনয়ের দিক হইতে এই ধর্ম ও সমাজত্যাগে কোন অনতিক্রম্য প্রতিবন্ধক ছিল

না—অন্তরের মিলনের সহিত কোন বিশেষ ধর্মের রীতি বা সমাজের আচারকে সে সমমর্যাদার আসন দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে নাই। কিন্তু ললিতার দৃপ্ত তেজস্বিতা ও নির্মল বিবেকবুদ্ধি ব্রাহ্মসমাজের মত একটি সংস্কারান্ধ ও সঙ্কীর্ণমনোভাবসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট তিলমাত্র নতি স্বীকার করিতে, তাহার অনুশাসন মানিয়া নিজ স্বাধীন আত্মার লেশমাত্র অপমান ঘটাইতে তীব্রভাবে বিমুখ হইয়া দাঁড়াইল। শেষ পর্যন্ত পরেশবাবু, ললিতার উদ্দেশ্যের সাধুতা, সঙ্কল্পের দৃঢ়তা ও দুঃখবরণের প্রস্তুতি সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় হইয়া, ললিতার অনুকূলেই এই সমস্যার মীমাংসা করিয়া দিলেন ও মধ্যস্থরূপে উভয় সমাজেরই মিলিত অস্ত্রাঘাত নিজ প্রশস্ত বক্ষে ধারণ করিলেন। সুতরাং চরিত্রবিকাশের উপলক্ষ্য ও তৎকালীন যুগমানসের সত্য পরিচয়—এই উভয় দিক দিয়াই এই আপাত-পল্লবিত তথ্যসংযোজনার প্রাসঙ্গিকতা ও উপযোগিতা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। বিনয় ও ললিতার বিবাহ-সিদ্ধান্ত চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হইবার পরেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকরণগত বাধাবিঘ্নের অবতারণা উভয় আমাদের উৎকণ্ঠা ও কৌতূহলকে সজীব রাখিয়া উপন্যাসের আকর্ষণবৃদ্ধির হেতু হইয়াছে।

গোরার পল্লীভ্রমণের তিনটি উপলক্ষ্য কাহিনীর সহিত যুক্ত হইয়া উহার কলেবরস্ফীতির সহায়তা করিয়াছে। প্রথমটি ৬ অনুচ্ছেদে তাহার সূর্যগ্রহণ-উপলক্ষ্যে ত্রিবেণীগঙ্গাস্নানসম্পর্কিত ও তাহার শাস্ত্রবিহিত ধর্মানুষ্ঠানের প্রতি একান্ত নিষ্ঠার নিদর্শন। এই প্রথম অভিযানে যে অভিজ্ঞতা গোরার মনে নিদারুণ বেদনা ও আত্মধিক্কারের আবেগে ক্ষতের ন্যায় কাটিয়া বসিল তাহা মূঢ়, অশিক্ষিত তীর্থযাত্রীর প্রতি ষ্টীমারের মাঝিমাল্লা হইতে উচ্চশ্রেণীর স্বদেশী ও বিদেশী আরোহীদের মর্মান্তিক অবজ্ঞা, দেশের জনসাধারণের দুর্দশায় সকলেরই একটা হৃদয়হীন আত্মপ্রসাদবোধ। এই ঔদাসীন্য ও বিচ্ছিন্নতাই গোরার তীব্রতম ঘৃণাকে উদ্রিক্ত করিয়া তাহার দেশাত্মবোধের মধ্যে একটা যুদ্ধের উন্মাদনা সঞ্চার করিল (১০ অনুচ্ছেদ)। গোরার দৃপ্ত ভর্ৎসনা বরং সাহেবটিকে লজ্জিত করিল, কিন্তু ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাকজাতীয় বাঙালী সাহেবের মনে কোন রেখাপাত করিল না। ইহাই গোরার অপমানবোধকে দুঃসহ জ্বালায় পরিণত করিল। ইহার ফল যতটা বিজাতিবিদ্বেষ নয়, ততোধিক বিদেশী-ভাবাপন্ন শিক্ষিত বাঙালীর প্রতি

ক্ষমাহীন ঘৃণার উদ্ভব। এই পশ্চাৎপটের প্রেরণাতেই সে আপাদমস্তক গোঁড়া হিন্দুয়ানীর বর্মপরিহিত হইয়া ব্রাহ্মপরিবারের শক্রদুর্গে যুদ্ধঘোষণার ছাপ লইয়াই প্রবিষ্টহইল।

ইহার পরে ১৭ অনুচ্ছেদে গোরা কর্তৃক বস্তিবাসী নিম্নশ্রেণীর লোকদের সহিত হৃদ্য সম্পর্কস্থাপনের চেষ্টা, ছুতারের ছেলে প্রাণশক্তিতে পূর্ণ নন্দর প্রতি তাহার বিশেষ স্নেহাকর্ষণ, ও অশিক্ষা ও কুসংস্কারের ফলে সেই নন্দের শোচনীয় অকালমৃত্যু গোরাকে এই দেশব্যাপী মূঢ়তার ভয়াবহ পরিণতি সম্বন্ধে তীক্ষ্ণভাবে সচেতন করিয়াছে। এই অনুভব কিন্তু একটা ক্ষণিক আবেগের পর্যায় ছাড়াইয়া তাহার মনের মধ্যে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হয় নাই ও ইহা হিন্দুসমাজের অবাস্তব স্বপ্নপ্রবণতার বিপদ সম্বন্ধে তাহাকে সতর্ক করে নাই। শিক্ষায় ও বাস্তবজ্ঞানে স্ত্রীজাতির উন্নতি না হইলে পরিবার হইতে এই কুসংস্কারের মূল যে উৎপাটিত হইবে না এই অনিবার্য সিদ্ধান্তও তাহার মুক্তবুদ্ধি গ্রহণ করে নাই। করিলে হয়ত পরেশবাবুর বাড়ীর মেয়েদের প্রতি তাহার বিমুখতা অনেকটা কম হইত। গাড়ী-হাঁকানো বাবু কর্তৃক দরিদ্র মুসলমান মুটের লাঞ্ছনা ও ক্ষতি তাহার ক্ষাত্র শক্তিকে উদ্দীপ্ত করিয়াছে। কিন্তু মোটের উপর ইহা উপরিভাগের ক্ষণবুদ্‌বুদ-চাঞ্চল্য মাত্র, ইহা তাহার অন্তরের গভীরে কোন স্থায়ী আলোড়ন জাগায় নাই।

দেশভ্রমণের দ্বিতীয় উপলক্ষ্য আসিয়াছে সুচরিতার অনির্দেশ্য মোহাবেশ হইতে মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে গোরার অপরিচিত পরিবেশনিহিত পল্লীজীবনের অভিজ্ঞতা-আহরণের জন্য পদযাত্রায়। ইহার ফল হইল চরঘোষপুরের প্রজা-আন্দোলনের সহিত গোরার জড়াইয়া পড়া, ও কারাবাসের অভিজ্ঞতা। উপন্যাস মধ্যে ইহার সুদূর প্রতিক্রিয়া হইল গোরার প্রতি সুচরিতার আকর্ষণের শ্রদ্ধার মধ্য দিয়া প্রেমের দিকে অগ্রগতি ও বিনয়-ললিতার ভবিষ্যৎ বিবাহ-পরিণতির দিকে প্রথম নিঃসঙ্কোচ পদক্ষেপ। চরঘোষপুর না থাকিলে উপন্যাসের ভাবগত ও ঘটনাগত পরিণাম হয়ত অনিবার্যভাবে নির্ণীত হইত না।

তৃতীয় উপলক্ষ আসিয়াছে কারাগারমুক্তির পরে স্তাবকগোষ্ঠীকে এড়াইবার অদম্য প্রেরণা হইতে (৬৭ অনুচ্ছেদ)। কলিকাতার উপকণ্ঠস্থিত এই পল্লীভ্রমণের ফলে গোরার আবেগ অপেক্ষা সত্যদৃষ্টিই বেশী উন্মোচিত

হইয়াছে। ইহার ফলে হিন্দুসমাজের সমস্ত জাতিভেদ ও খুঁটিনাটি নিয়মপালনের অন্তর্নিহিত দুর্বলতাই গোরার চোখে বেশী করিয়া ধরা পড়িয়াছে। পল্লীবাসীর জীবনদৃষ্টি সম্পূর্ণ অভাবাত্মক, ইহার মধ্যে সার্থক কর্মপ্রেরণার ও সংঘশক্তির সুস্থ প্রয়োগের একান্ত অভাব। পক্ষান্তরে মুসলমানসমাজের সমপ্রাণতা ও সমস্যা-সমাধানের জন্য ঐক্যবোধ হিন্দু-সমাজের নিষ্ক্রিয়তা ও বিচ্ছিন্নতার সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র প্রদর্শন করে। ইহাতে মনে হয় যে তাহার পরিণত জীবনবোধ হিন্দুধর্মের গোঁড়ামি হইতে তাহাকে মুক্তির পথে অগ্রসর করিয়া দিতেছিল।

২

বৃহত্তর সমাজ-পরিবেশের মধ্যে কয়েকটি ক্ষুদ্রতর পারিবারিক জীবনবৃত্ত যুগের অন্তরঙ্গ প্রেরণাটির পরিচয় দিয়া পটভূমিকাচিত্রের সম্পূর্ণতা বিধান করিয়াছে। বাহিরের ভাবোচ্ছ্বাস ও কর্ম-উত্তেজনার সহিত গৃহস্থালীর নিভৃত ও অন্তর্মুখী হৃদয়সমস্যার সূক্ষ্ম যোগাযোগসূত্রটি পরিস্ফুট না করিলে যুগজীবনের পরিচয়টি অসম্পূর্ণ থাকে। জীবনে যেমন স্থূল, মোটা তুলিতে বিন্যস্ত বর্ণপ্রাচুর্য সহজেই চোখে পড়ে, তেমনি উহারই ফাঁকে ফাঁকে অনুপ্রবিষ্ট সূক্ষ্ম রঙের আলিম্পন ও ছায়ালোকের যথাযথ বিন্যাস এক সুষম ভাবাবহসৃষ্টির নিগূঢ় প্রয়োজন সাধন করে। নদীর উত্তাল তরঙ্গ খিড়কি পুকুরের শান্ত আধারে কিরূপ মৃদুতর কম্পন জাগায় তাহা না দেখাইলে উহার স্বরূপ সুস্পষ্ট হইবে না। ব্রাহ্ম ও হিন্দুধর্মের সংঘর্ষের দুর্দম বিক্ষোভটি অন্তঃপুরের সুরক্ষিত প্রাচীরবেষ্টনীতে কতটা বেগে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে আন্দোলনের শক্তি-পরিমাপের জন্য তাহা জানা একান্ত প্রয়োজন।

'গোরা'তে মুখ্যতঃ দুইটি পরিবারের জীবনকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমতঃ, পরেশবাবুর প্রগতিশীল ব্রাহ্ম পরিবার, যাহাতে পরেশবাবুর মত নির্মল, উদার ধর্মচেতনার অধিকারী, জিজ্ঞাসা ও আচরণে ধর্মস্বরূপনির্ণয়ে

উন্মুখ, অধ্যাত্মরহস্যের মর্মভেদে উৎসুক, নিষ্ঠাপরায়ণা তরুণী সুচরিতা, সত্য-রক্ষার জ্বলন্তউৎসাহদীপ্তা ললিতা ও সঙ্কীর্ণমনা, পরধর্মদ্বেষিণী বরদাসুন্দরী প্রভৃতি ধর্মাদর্শের নানাদিকের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত। দ্বিতীয়তঃ গোরার পরিবার; উহা আনন্দময়ী-কৃষ্ণদয়ালের বিপরীত ধর্মাচরণ-সংঘাতে দ্বিধা-বিভক্ত ও কেন্দ্রচ্যুত। উহাতে মহিম তাহার স্ত্রী-কন্যা লইয়া একটি স্বতন্ত্র-গোষ্ঠীবদ্ধ ও স্থূল বৈষয়িকতা ও চতুর বাস্তববুদ্ধির একনিষ্ঠ অনুশীলনে আদর্শবিবিক্ত। ইহাদের সহিত হরিমোহিনীর সুচরিতা ও সতীশকে লইয়া একটি হিন্দু গোঁড়া পারিবারিক সংস্থাগঠনের ক্ষীণ ও বিলম্বিত প্রয়াসও যুক্ত হইতে পারে। বিনয়ের বাসা ঠিক পারিবারিক সংহতি লাভ করে নাই; তবে উহার জনশূন্যতা অতিথি-আবাহনের পথ খোলা রাখিয়া একটি বৃহত্তর ভাবসংশ্লেষের প্রতিশ্রুতি বহন করিয়াছে। বিনয়ের এই বাসাটি ব্রাহ্মহিন্দুমিলনের একটি দৈবপ্রসাদলব্ধ উপলক্ষ্য সৃষ্টি করিয়া প্রায় তীর্থ-মহিমায় অভিষিক্ত হইয়াছে। ইহা গৃহ নহে, কিন্তু ভবিষ্যতের মিলনমধুর একটি গার্হস্থ্য বীজ এখানে ফলে-ফুলে মুকুলিত হইবার প্রতীক্ষা করিতেছে ইহা আমরা দিব্যদৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করি। এখানে নবযুগের গার্হস্থ্য ধর্ম যে রূপ লইবে তাহার আভাস অস্পষ্ট নয়।

কিন্তু এই উপন্যাসে সমাজ ও পরিবারজীবন, ঘর ও বাহিরের পারস্পরিক সম্পর্কের যাহা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য তাহা হইল যে এখানে বাহিরের প্রভাব মাত্রাতিরিক্তভাবে অভিভবের পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে। গার্হস্থ্য জীবন এখানে অনেকটা স্বধর্মচ্যুত হইয়া বৃহত্তর সমাজপ্রতিবেশের অধীনতাই স্বীকার করিয়াছে। অধিকাংশ পরিবারে বাহিরের উদ্দাম কলকোলাহল ঘরের নিভৃত আত্মসমীক্ষা বা অন্তরঙ্গ ভাববিনিময়কে যথাযোগ্য মর্যাদা দেয় নাই। গৃহজীবনের মৃদু ফল্গুধারার মধ্যেও বহির্জীবন এক তীব্রতর স্রোতোবেগ সঞ্চার করিয়াছে। এমন কি অন্তরের রুদ্ধদ্বারও বাহিরের প্রচণ্ড করাঘাতেই খুলিয়াছে। পরেশবাবুর পরিবারে ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের গোষ্ঠীগত সমস্যাই পরিবারিক আলোচনাতেও প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে, বিশ্রম্ভালাপের মধ্যেও সেখানে মতবিরোধের উত্তেজনা, যুদ্ধঘোষণার চরমপত্র মুখর হইয়া উঠিয়াছে। বরদসুন্দরী ও হারাণ সর্বদাই পারিবারিক জীবনে সমাজ ও ধর্মনীতির রণক্ষেত্র সম্প্রসারিত করিতে উৎসুক। সুচরিতা ও ললিতা তাহাদের অন্তর্জীবনে বহির্জগতের ভাবমন্থন-উদ্ভূত তিক্ততা-মাধুর্য, নম্রতা-ঔদ্ধত্য

প্রভৃতি সূক্ষ্ম অনুভবসমূহকে সত্তার অঙ্গীভূত করিতে সমস্ত চিত্তবৃত্তিকে উন্মুখ রাখিয়াছে। বিনয়ের অনুপ্রবেশ তাহাদের মানসক্ষেত্রে দ্বিমুখী ভাবধারা সর্বদা প্রবাহিত রাখিয়া তাহাদের প্রত্যয়ের স্থিরতা ও আত্মপ্রতিষ্ঠ জীবনাদর্শকে প্রতি মুহূর্তে বিচলিত করিয়াছে। একমাত্র লাবণ্য-লীলা-সতীশের দল ও যুবকদের মধ্যে একমাত্র সুধীর তাহাদের ছেলে-মানুষী হাসিখুশী ও উচ্ছ্বাসের সহজ প্রাচুর্য লইয়া গৃহজীবনের স্বভাবধর্মকে পরধর্মাশ্রয়ের গ্লানি হইতে মুক্তি দিয়াছে। অবশ্য এক্ষেত্রেও বরদাসুন্দরী তাঁহার মেয়েদের গুণবত্তা জাহির করিবার জন্য ও সমাজে খাতির বাড়াইবার উপলক্ষ্য সৃষ্টির কশুর করেন নাই ও সুচরিতা সতীশকে গোরার আদর্শে গৌরবান্বিত করিবার একবার অন্ততঃ প্রয়াস পাইয়াছে।

গোরার পরিবারের কেন্দ্ররূপিণী আনন্দময়ী নিজেই সংসারের সহিত সহজসম্পর্কচ্যুতা। তাঁহার নিঃসঙ্গতা, অবরুদ্ধ স্নেহক্ষুধা ও অপ্রকাশ্য ছলনা লইয়া তিনি এক বেদনাময় পরিমণ্ডলে অসহায় বন্দিনী। সুতরাং এই প্রধান স্তম্ভের অবলম্বনহীন সংসারও যে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিকণার বিশৃঙ্খল জোড়াতাড়ামাত্র তাহা সহজেই প্রতীয়মান হয়। তাঁহার স্বামীর সহিত তিনি দুস্তর ব্যবধানের দ্বারা অন্তরায়িতা, আত্মীয়স্বজনের দ্বারা নিন্দিতা। এমন কি তাঁহার একমাত্র স্নেহভাজন পুত্র গোরাও তাঁহার তথাকথিত ম্লেচ্ছাচারের জন্য তাঁহার স্নেহপরিচর্যার প্রতি উপেক্ষাপরায়ণ। সমস্ত স্বাভাবিক প্রবাহ হইতে রুদ্ধ তাঁহার মাতৃস্নেহ পুত্রের বন্ধু বিনয়ের দিকে ধাবমান হইতে গিয়াও গোরার প্রবল নিষেধে প্রতিহত। এই গুরুভার মনোবেদনা মনে চাপিয়া তিনি তাঁহার উদার বিচারবুদ্ধি, সূক্ষ্ম অনুভবশক্তি, স্বচ্ছ সমদর্শিতা ও স্নিগ্ধ স্পর্শ অকৃপণ দাক্ষিণ্যের সহিত তাঁহার সমস্ত প্রতিবেশে পরিব্যাপ্ত করিয়াছেন। তাঁহার গোপন রহস্যের একমাত্র অংশীদার তাঁহার স্বামী জীবনব্যাপী উচ্ছৃঙ্খলতার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ পারলৌকিক ইষ্টসিদ্ধির জন্য যান্ত্রিক কৃচ্ছ্রসাধনে সর্বতোভাবে নিয়োজিত হইয়াছেন ও তাঁহার যৌবনের স্মৃতির সহিত সাংসারিক কর্তব্যবোধকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়া সহধর্মিণীর দুঃসহ সমস্যার প্রতি একেবারে পিছন ফিরিয়াছেন। তিনি তাঁহার নিজের হঠকারিতার দায়িত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া নিষ্ঠুর স্বার্থপর ঔদাসীন্যের সহিত স্ত্রীর উপর সমস্ত বোঝাটি চাপাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার পরকালের চিন্তা ইহলোকের কর্তব্যবোধকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করিয়া

দিয়াছে। পালিত পুত্র ও পালয়িত্রী জননী সম্বন্ধে তাঁহার যে কোন নীতিগত ও মানবিকপ্রেরণাজাত কর্তব্য আছে সে কথা তিনি একেবারে এড়াইয়া গিয়াছেন। আনন্দময়ীর স্বভাবমাধুর্য ও উদার জীবনসমীক্ষা এই করুণ, অসহায় নিঃসঙ্গতার পশ্চাৎপটে প্রত্যয়যোগ্যতা ও দিব্যলাবণ্য উভয় গুণই অর্জন করিয়াছে। কিন্তু এই বহিঃপ্রকাশবিমুখ, অন্তর্গূঢ় ভাব-মহিমাকে আশ্রয় করিয়া গৃহজীবনের সুকুমার বৃত্তিগুলি স্বভাবসৌন্দর্যে বিকশিত হইতে পারিবে না। তিনি বাহিরের সমস্যাসমাধানে অগ্রণী হইতে পারেন, আশ্রয়প্রার্থীদের হৃদয়জ্বালা জুড়াইতে কল্যাণময়ী মাতৃ-মূর্তিতে আবির্ভূত হইতে পারেন, মা-হারাদের মা হইয়া তাহাদের কোলে টানিয়া লইতে পারেন। কিন্তু নিজের অন্তঃপুরে তাঁহার শক্তির উৎস প্রতিরুদ্ধ ও তাঁহার আত্মিক প্রভাব কঠোরভাবে শৃঙ্খলিত। সেখানে তিনি আনন্দবিতরণ অপেক্ষা আত্মরক্ষাতেই অধিক ব্যস্ত। অন্যান্য প্রতিকূল প্রভাবের মধ্যে গোরার অবুঝ হিঁদুয়াণীর আড়ম্বর ও আচারনিষ্ঠতাই প্রবলতম রূপে প্রতিভাত হইয়াছে। এখানেই তাঁর সবচেয়ে মর্মান্তিক পরাজয়। যে গোরা তাঁহার সমস্ত সামাজিক শাস্তির মূল কারণ, সেই যে আবার সামাজিক দণ্ডদাতাদের শীর্ষস্থানীয়রূপে তাঁহার জীবনে আবির্ভূত হইয়াছে ইহা অপেক্ষা ভাগ্যের ক্রুর পরিহাস আর কি হইতে পারে ?

গোরা ও বিনয়ের আবাল্যবন্ধুত্বও এই বহিঃপ্রভাবে অতিনিয়ন্ত্রিত। ইহাদের প্রথম কৈশোর ও যৌবনের নীতিপ্রভাবমুক্ত প্রীতিবিনিময়ের কোন ছবি উপন্যাসে পাই না। ইহাদের সম্বন্ধ যেন দুই বন্ধুর নয়, গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধের অনুরূপ। যৌবনের উচ্ছল প্রাণশক্তি ইহারা আদর্শ-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে একান্তভাবে নিয়োজিত করিয়াছে। বিনয়ের ইচ্ছার স্বচ্ছন্দ স্ফূর্তিকে আদর্শের দণ্ডে সংযত ও নিয়মিত করাই গোরার বন্ধুপ্রীতির একমাত্র প্রকাশ। গোরার বন্ধুত্ব দুর্দম গঙ্গাস্রোতের মত সমস্ত বাধাসঙ্কোচকে ভাসাইয়া লইয়া যায়, কঠোর আদর্শনিষ্ঠার হরজটাজালেই কেবল ইহাকে আবদ্ধ রাখা যায়। কল্যাণকামনাপ্রণোদিত অবদমনই ইহার প্রাণবস্তু। এই তর্কঝড়ে-ওড়ানো ধূলিঘূর্ণী কেবল রুদ্ররসেরই দাহ-জ্বালা বিস্তার করে, কোন কোমল মনোবৃত্তি দক্ষিণাবায়ুর স্নিগ্ধস্পর্শে তাপ জুড়াইয়া দেয় না। বিনয়ের আগমনে গোরার মেঘমন্দ্র স্বরই ধ্বনিত হইয়া উঠে। কোন প্রীতিউচ্ছ্বাসের কোমল সুর এই বজ্রগর্জনের ফাঁকে শোনা

যায় না। ইহাদের যে সত্যসত্যই কোন আত্মমুগ্ধ, স্বপ্নভরা যৌবন ছিল তাহা যেন অনুমানই হয় না। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ভগবানকে কামারের সহিত তুলনা করিয়া মানবের সহিত তাঁহার সম্পর্ককে কামারশালায় উত্তপ্ত লৌহের উপর স্ফুলিঙ্গবর্ষী হাতুড়ির অবিচ্ছিন্ন আঘাতপরম্পরার সমধর্মীরূপে কল্পনা করিয়াছেন। গোরা-বিনয়ের বন্ধুত্ব-নিকেতনকে সেই লোহা-পেটানো কামারশালারই অনুরূপ মনে হয়।

অবশ্য পরেশবাবুর পরিবারের সহিত আলাপ জমিবার পর গোরা-বিনয়ের মধ্যে সদ্যউন্মেষিত, দুর্বোধ্য প্রেমানুভূতির স্বরূপনির্ণয়ের উদ্দেশ্যে কিছু অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতা-বিনিময়ের প্রয়াস দেখা যায়। কিন্তু এখানেও জোর পড়িয়াছে ভাবমুগ্ধ উচ্ছ্বাসের উপর নয়, একটা অজ্ঞাত সত্যের বুদ্ধিগত পরিচয় সাহায্যে উহার স্বভাবশক্তি-নিরূপণের উপর। ধর্মাদর্শের সহিত তুলনায় প্রেমের চেতনাও যে নিতান্ত তুচ্ছ নয়, তাহাকেও যে জীবনে একটা যোগ্যস্থান দিতে হইবে ও ধর্মাদর্শের চরিতার্থতার জন্যও যে প্রেমশক্তির প্রয়োগ অপরিহার্য—ইত্যাদি তত্ত্ব-ব্যাখ্যাই এই আলাপে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। ইচ্ছার প্রচণ্ড ঘাত-প্রতিঘাত, আদর্শপ্রতিষ্ঠার প্রাণপণ প্রয়াসের ঠোকাঠুকির মধ্যে সুহৃদ্‌দুর্লভ আত্ম-উদ্‌ঘাটনের অন্তরঙ্গ সুরটি যেন চাপা পড়িয়া যায়। উপন্যাসের উপসংহারে গোরার যে নূতন জীবনযাত্রার ইঙ্গিত ফুটিয়াছে সেই প্রশান্ত, অন্তর্দ্বন্দ্বমুক্ত পরিবেশে হৃদয়বিনিময়ের কিরূপ স্নিগ্ধ প্রকাশ ঘটিবে তাহা অনুমানশক্তিকে উদ্রিক্ত করে, কিন্তু বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করে না।

কৃষ্ণদয়ালের সংসারের তৃতীয় স্তর মহিমের গার্হস্থ্যজীবনাশ্রিত। ইহাতেই খাঁটি গৃহস্থালীর সুরটি ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহার মধ্যে কোন সুকুমার ভাবের প্রবেশাধিকার নাই, কোন আদর্শবাদের ক্ষীণতম স্পর্শও অনুপস্থিত, আছে কেবল লাভ-লোকসানের নিখুঁত হিসাব-রাখা, আরামস্বাচ্ছন্দ্যের পূর্ণতম সুযোগ-সন্ধানী, স্থূল বৈষয়িক মনোবৃত্তির একাধিপত্য। মহিম সমস্ত আদর্শের সোনা ভাঙ্গাইয়া উহাকে সুবিধাবাদের চলতি মুদ্রায় পরিবর্তন করিতে একান্ত আগ্রহশীল। গোরার মহনীয় চরিত্র, ধর্মজীবনে ও ভক্তমহলে তাহার অনন্য প্রতিষ্ঠা সবকেই সে নিঃসঙ্কোচে নিজ সাংসারিক সুবিধার প্রয়োজনে লাগাইতে অতিমাত্রায় উন্মুখ। আদর্শসন্ধানের নভো-বিহারের মধ্যে, সূক্ষ্ম মানস আত্মবিচারণার সঙ্কটে, সুকুমার হৃদয়বৃত্তির দুর্বোধ্য

স্বরূপনির্ণয়ের বিহ্বলতার পটভূমিতে একমাত্র মহিমই মানবের ভৌমসত্তার প্রতীকরূপে বৈষয়িকতার পাথর-বাঁধানো পথে দৃঢ়, অবিচল পদক্ষেপে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। কৃষ্ণদয়াল ও মহিম দুই বিপরীত আদর্শকে একই ফলাসক্তির স্থূল মুষ্টিতে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে।

হরিমোহিনীর ক্ষুদ্র, নবপ্রতিষ্ঠিত সংসারটিতেও ঠিক একরকমই ধর্মান্ধতার মূঢ়তা গার্হস্থ্য সহৃদয়তার শ্বাসরোধ করিয়াছে। সে চিরজীবন ভাগ্যের নিদারুণ আঘাত সহ্য করিয়া ও দয়ার মুষ্টিভিক্ষায় লালিত হইয়াও গৃহকর্ত্রীরূপে নিজ বিকৃত সঙ্কল্পের নির্দেশই নির্বিচারে মানিয়া চলিয়াছে। তাহার অতীত জীবনের নির্যাতন তাহার চিত্তকে কোমল না করিয়া সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতায় আরও নির্মম করিয়া তুলিয়াছে। বিকৃত ধর্মবোধে মানুষকে যে কত দুঃসাহসী করিয়া তোলে তাহা গোরার সহিত তাহার যুদ্ধঘোষণাতেই উদ্ধতভাবে প্রকট হইয়াছে। সে গোরাকে দিয়াই সুচরিতার উপর স্বত্বত্যাগপত্র সহি করাইয়া লইতে চায়। গোরার যে বজ্রকঠোর ইচ্ছাশক্তির নিকট সমস্ত জগৎ প্রতিহত, তাহারই বিরুদ্ধে সে অটলভাবে দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু গোঁড়ামির নেশায় অভিভাবকত্বের এই অপপ্রয়োগে গার্হস্থ্য জীবনের সুখশান্তির কোন স্থান নাই। এমন কি সতীশেরও প্রাণোচ্ছলতা এই পাষাণ দুর্গের কোন ক্ষুদ্রতম গবাক্ষের ফাঁকেও স্নিগ্ধ বায়ুপ্রবাহের পথ খুলিতে পারে নাই।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে এই উপন্যাসে গার্হস্থ্য জীবনছন্দ বহির্জগতের সংঘাতময় গতিবেগের দ্বারা বিপর্যস্ত হইয়া উহার স্বভাব-সুষমা হারাইয়াছে। অবশ্য বাহিরের মুষ্টিপীড়নে যেমন একদিকে অন্দরের অন্তরঙ্গতার সহজ নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস ব্যাহত হইয়াছে, অপর দিকে উহার সূক্ষ্মতর ভাবপ্রেরণার গূঢ় অনুপ্রবেশে মনের নিভৃত চেতনাস্তরে নূতন সুর-মূর্ছনা বাজিয়া উঠিয়াছে। সহজ প্রবাহের অবরোধের অনিবার্য ফলরূপে অন্তরের সুপ্ত ফল্গুধারা নির্ঝরের আকাশমুখী উৎসারে ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত হইয়াছে। যে জলধারা সংসারমরুভূমিতে ছায়ানিবিড় শান্তিকুঞ্জ রচনা করিয়া বাহিরের তাপ হইতে আশ্রয় দিত তাহা মনোগহনের আঁকা-বাঁকা পথ বাহিয়া ও নানারূপ অদৃশ্য বালুকাস্তর ভেদ করিয়া আন্তরতৃষ্ণানিবারণের দিব্য পানীয়-রূপে স্বাদুতা অর্জন করিয়াছে।

এইবার ঘটনাবিন্যাস ও চরিত্রায়নের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া যাইতে পারে। উপন্যাসের প্রারম্ভেই এক ঘোড়াগাড়ির দুর্ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া উপন্যাসের দুইটি প্রধান বিরুদ্ধ-আদর্শানুসারী ব্যক্তিগোষ্ঠীর মিলনক্ষেত্র রচিত হইয়াছে। এইখানেই ভবিষ্যৎ দূরপরিণতির প্রথম বীজটি রোপিত হইল। এই উপলক্ষ্যে বিনয়ের সহিত সুচরিতার পরিচয়ের সূচনা হইয়া শিক্ষিতা, সপ্রতিভ, ব্রাহ্মতরুণীর আশ্চর্য আকর্ষণের প্রতি বিনয় প্রথম সচেতন হইল। এই দৈবপ্রেরিত সাক্ষাৎকারের অপরূপতা কলিকাতায় বর্ষাপ্রভাতের রৌদ্রের দীপ্ত আভায় বিচ্ছুরিত হইয়া সহরের সমস্ত তুচ্ছতাকে একটি অসম্ভব মায়ারাজ্যে রূপান্তরিত করিল ও বাউলের গানের অতীন্দ্রিয় ব্যঞ্জনার মধ্যে উহার অন্তর্গূঢ় আবেদনটি যেন বিনয়ের চেতনার মধ্যে গুঞ্জরণ করিয়া ফিরিল। ইহার ফলে বিনয় নিজের অসামান্যতার পরিচয় দিতে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল ও উহার কল্পনা এই ক্ষুদ্র ঘটনাটিকে বেষ্টন করিয়া একটা অবিচ্ছিন্ন মোহজাল বয়ন করিতে লাগিল। ইহার কিছু পরে সতীশের মারফৎ সুচরিতার ঋণপরিশোধ বিনয়কে এই দৈবপ্রসাদলব্ধ পরিচয়টি পাকা করিবার উপলক্ষ্য যোগাইল।

ইহার পরের দৃশ্যে গোরা ও বিনয়ের আলাপ পাঠককে বিপক্ষ শিবিরের মধ্যে উঁকি দিবার অবসর দিল। গোরার একজন ভক্তকর্তৃক ব্রাহ্মদের নিন্দা উভয় বন্ধুর মধ্যে তুমুল তর্ক বাধাইল। গোরা এই ব্রাহ্ম-বিদূষণকেই হিন্দুর পক্ষে সুস্থতার লক্ষণ মনে করে, বিনয় কিন্তু এই অহেতুক দোষারোপের বিরুদ্ধবাদী। ইহা হইতেই বিনয়ের সহিত ব্রাহ্মপরিবারের আকস্মিক আলাপকে গোরা কিরূপ বিরূপ দৃষ্টিতে গ্রহণ করিয়াছে তাহা বোঝা গেল। গোরা এই সামান্য শিষ্টাচারের মধ্যে বিনয়ের চরম সর্বনাশের পূর্বসূচনা প্রত্যক্ষ করিল। ব্রাহ্মসমাজে নারীর প্রতি সম্মান বিকৃত লালসারই একটা ছদ্মবেশমাত্র এ বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ। যাহা হউক, শেষ পর্যন্ত বিনয়ের উদার মতবাদ ও তর্ককুশলতা গোরাকে কতকটা বিনয়ের মতানুবর্তী করিল।

পরের পরিচ্ছেদে আনন্দময়ীর প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার প্রচ্ছন্ন মনোবেদনাটি আমরা অবগত হই, যদিও উহার তথ্যগত কারণটি আমাদের

অজ্ঞাত থাকে। গোরার গোঁড়ামি তাঁহার মাতৃস্নেহের সহজ প্রবাহকে সব চেয়ে বেশী অবরুদ্ধ করিয়াছে। এমন কি বিনয়ের পরিচর্যা দ্বারাও তিনি যেটুকু তৃপ্তিলাভ করিতেন, তাহাও গোরার আচারনিষ্ঠার আতিশয্যে প্রকাশবঞ্চিত হইয়াছে। গোরার প্রতি তাঁহার একপ্রকার শঙ্কিত, হারানোর ভয়ে সর্বদা সন্দেহাকুল, মমতা তাঁহার আচরণে ও সংলাপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। গোরার জিদে বিনয়কে খাওয়াইবার ইচ্ছা তাঁহাকে ত্যাগ করিতে হইয়াছে। গোরার নিকট সার্বজনীন মাতা সাংসারিক মাতাকে আচ্ছন্ন করিয়া তাহার স্নেহভক্তির শ্রেষ্ঠ অংশ দাবী করিয়াছে।

কয়েকটি পরিচ্ছেদ ধরিয়া গোরার স্বধর্মনিষ্ঠার স্বরূপটি, তাহার ধ্যানের হিন্দুধর্মের আদর্শটি যুক্তি-তর্ক, উন্নত কল্পনাদৃষ্টি ও অকৃত্রিম ভাবাবেগের মাধ্যমে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই তর্ক ও প্রতিপাদন-ক্রিয়ায় গোরা, বিনয়, সুচরিতা, হারাণবাবু ও পরেশবাবু বিভিন্ন উপলক্ষ্যে, সংঘাতের বিভিন্ন স্তরে অংশগ্রহণ করিয়া উহার তাৎপর্য পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই বিশুদ্ধ হিন্দুধর্মের প্রবক্তা প্রধানতঃ গোরা ও তাহার দ্বারা প্রভাবিত ভাষ্যকার বিনয়। সুচরিতা শ্রদ্ধাশীলা শ্রোত্রীর অংশে আবির্ভূত হইয়া হিন্দুধর্মের এই দিব্য রূপটি অন্তরের মধ্যে গভীরভাবে অনুধাবন করিতে সাধনা করিয়াছে ও মাঝে মাঝে প্রশ্ন ও ঈষৎ সংশয়প্রকাশের দ্বারা নিজ বোধশক্তিকে পূর্ণভাবে উদ্দীপ্ত করিতে চাহিয়াছে। হারাণবাবুর যুক্তিগুলি এতই স্পষ্টভাবে দুর্বল, একদেশদর্শী ও সঙ্কীর্ণতাব্যঞ্জক যে উহাতে সে ব্যক্তিগতভাবে অশ্রদ্ধেয় হইয়াছে মাত্র, তাহার সমর্থিত মতবাদকে কাহারও হৃদয়গ্রাহী করিতে পারে নাই। পরেশবাবু হিন্দু ও ব্রাহ্ম উভয় সম্প্রদায়ের সঙ্কীর্ণতামুক্ত হইয়া ও মতপ্রতিষ্ঠার বিষয়ে লেশমাত্র উত্তেজনা প্রকাশ না করিয়া, নিজ অন্তরানুভূতির স্থির আলোকে ধর্মের শাশ্বত নীতিটি মাঝে মধ্যে ব্যক্ত করিয়াই এই উত্তপ্ত বিতণ্ডাকে চিরন্তন সত্যে উন্নীত করিয়াছেন। তবে তাঁহার এই ধর্মচেতনা আত্মগত ভাবসাধনার স্তরেই সীমাবদ্ধ—উহা প্রাত্যহিক জীবনের কর্তব্যসঙ্কটনিরসন বা সমস্যাসমাধানের পক্ষে নিতান্ত নিস্তেজ ও প্রভাবহীন। ধর্ম যদি জনসমাজে প্রচার করিতে হয়, যদি সাধারণ মানুষের চিন্তা ও আচরণের নিয়ন্ত্রণের জন্য উহার ডাক পড়ে, তবে পরেশবাবুর এই স্বতঅনুভব উহার বিশুদ্ধতা সত্ত্বেও সে উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ অনুপযোগী। উহার মধ্যে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বা বিরতি ছাড়া কোন সক্রিয়

প্রেরণা আবিষ্কার করা দুরূহ। আনন্দময়ীর অসহায় নেতিমূলক আচরণ আমরা বুঝি ও উহার সহিত আমাদের সহানুভূতি আছে। কিন্তু পরেশবাবু বরাবরই একটা প্রহেলিকা, একটা অনায়ত্ত আদর্শের ভাববাষ্পমণ্ডিত প্রতীকই রহিয়া গেলেন।

এই ধর্ম ও জাতীয়তাতত্ত্বনিরূপণের উত্তপ্ত আলোচনাই উপন্যাসের ভাবকেন্দ্র রচনা করিয়াছে। এই অবিরত, পৌন:পুনিক সংঘর্ষে যে গতিবেগ উদ্ভূত হইয়াছে, তাহা শুধু ঘটনা-পরিণতির দিকে নয়, চরিত্র-বিকাশের দিকেও উপন্যাসকে অগ্রসর করিয়া দিবার শক্তি যোগাইয়াছে। অন্তরে ও বাহিরে যাহা কিছু ঘটিয়াছে তাহা এই আবেগ, মনন ও কর্মোদ্যোগের মিলিত প্রেরণা হইতে জীবনস্পন্দন আহরণ করিয়াছে। উপন্যাসের জগৎটি ইহারই অক্ষরেখা প্রদক্ষিণ করিয়া নিজ কক্ষপথে স্থির হইয়াছে। প্রাণের গোপন উৎসটি বিজ্ঞানদৃষ্টিতে এখনও অনাবিষ্কৃত, কিন্তু সাহিত্যসৃষ্ট জীবন-কাহিনীর প্রাণশক্তি যে এই ঘূর্ণ্যমান চক্রাবর্তনের সংবেগপ্রসূত তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। সুতরাং এই মতবাদসংঘাতের কেবল মননগত বা আবেগসঞ্চারী তাৎপর্য আছে তাহা নয়। ইহা সমস্ত উপন্যাসটির দেহায়তনের মধ্যে সূক্ষ্মতর সঞ্জীবনী বিদ্যুৎতরঙ্গ প্রবাহিত করিয়াছে। গোরার বিপুল আত্মপ্রত্যয়, চিন্তা ও আবেগের সবটুকু উচ্ছলতা ও জীবনসাধনার সমস্ত নিষ্ঠা—এক কথায় তাহার সামগ্রিক ব্যক্তিত্বটি, এই তর্কযুদ্ধে যেরূপ পূর্ণ উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে তাহা অন্য কোন উপায়ে সম্ভব হইত না। যাহারা স্বভাববীর তাহাদের চরিত্রের সমস্ত ঐশ্বর্য, সমস্ত রাজমহিমা এমন কি সুকুমার উন্মেষসমূহও রণক্ষেত্রের উন্মাদনার মধ্যেই আত্মপ্রকাশ করে। অন্তরের যে গভীরে, প্রাণচেতনার যে মূলদেশে সঙ্কল্পদৃঢ়তা ও প্রেমের নমনীয়তার উৎস অভিন্নরূপে বর্তমান, অসাধারণ ভাবোন্মত্ততার বিরল মুহূর্তে তাহাদের মুখ যুগপৎ উন্মোচিত হয়, কঠোর ও কোমল সমস্ত বিরোধ ভুলিয়া উহাদের ধারা একই স্রোতে মিশায়। হৃদয়ের যে স্প্রিং-এ চাপ পড়িলে কৃচ্ছ্রসাধনের আগ্নেয়গিরি অগ্নি উদ্‌গীরণ করে, ঠিক তাহার পাশাপাশি যে নির্মল নির্ঝর প্রচ্ছন্ন আছে, তাহারও ফল্গুধারা হঠাৎ আবিষ্কৃত হয়। সংগ্রামমত্ত গোরা ঠিক এই বিপরীত ক্রমেই উহার প্রেমিক সত্তাকে ধীরে ধীরে চিনিয়াছে। মদনভস্মকারী মহাদেব যেন তাঁহার অসহ্য তেজঃপুঞ্জের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াবশেই ম্লানমুখী, তপঃকৃশা গৌরীর

বল্কলাবৃত মাধুর্য সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছেন। মরুভূমিচারী পথিক খরতাপক্লিষ্ট বালুকারাশি অতিক্রম করিয়াই উহার প্রান্তবাহিনী মরুনির্ঝরের সন্ধান পাইয়াছে।

সুতরাং দেশাত্মবোধের অনুকূলে গোরার যে আবেগময় বাগ্মিতা তাহার গুরুত্ব কেবল তর্কনৈপুণ্য ও বাগ্‌বিভূতির উপর নির্ভরশীল নয়, তাহা একটি পূর্ণপ্রবুদ্ধ মানবাত্মার জ্যোতির্ময় উদ্ভাসন। এই দূরব্যাপ্ত রশ্মিবিকিরণে শুধু বক্তার নয়, উপন্যাসের প্রায় সমুদয় শ্রদ্ধাশীল শ্রোতৃমণ্ডলীর অন্তরের দলগুলি বিকশিত ও সৌরভময় হইয়া উঠিয়াছে, প্রাণের গুহাহিত অভীপ্সা ও আকূতি সমূহ আত্মসচেতন হইয়াছে ও আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য ডানা মেলিয়াছে। আত্মসচেতন গোরার মেঘমন্দ্র কণ্ঠধ্বনি যে প্রতিধ্বনি জাগাইয়াছে, হৃদয়ে যে অমোঘ কম্পন তুলিয়াছে তাহাতে তাহার পরিমণ্ডলস্থ নর-নারীর ব্যক্তিসত্তা ধূসর অনামিকতা হইতে নিঃসন্দিগ্ধ আত্মপরিচয়ে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে। মুখচোরা সুচরিতা হঠাৎ তাহার চিরাভ্যস্ত বাধাসঙ্কোচ ঠেলিয়া ফেলিয়া ভাব ও কর্মজগতে নিজ সার্থকতার কেন্দ্রটি খুঁজিয়া পাইয়াছে—সাম্প্রদায়িকতার ক্ষুদ্র গণ্ডী হইতে বিশ্বমানবতার উদার পরিসরে মুক্তিলাভ করিয়াছে। বিদ্রোহবাষ্পে সর্বদা বিস্ফোরণোন্মুখ ললিতা—যে গোরা, বিনয়, সুচরিতা সকলেরই সম্বন্ধেই কিছু না কিছু অভিযোগ-অভিমানে বক্রদৃষ্টি—গোরার নিগূঢ়, হয়ত অস্বীকৃত প্রভাবে নিজ বাড়তি বাষ্পের সার্থক নিষ্ক্রমণের পথ পাইয়াছে। তাহার ছেলেমানুষী খেয়ালিপণা গভীর জীবনপ্রজ্ঞা ও স্থিরসঙ্কল্পের লক্ষ্যে অবিচল হইয়াছে—তাহার অহেতুক উত্তেজনা শেষ পর্যন্ত জীবনরথপরিচালনার সংহত শক্তিতে পরিণতি লাভ করিয়াছে। তাহার বিবাহোত্তর ও প্রাক্-বিবাহ জীবনের মধ্যে যে বিচ্ছেদ তাহা গোরার আদর্শবাদের অদৃশ্য অস্ত্রোপচারেই সম্পন্ন হইয়াছে। বিনয়ও এখন গোরার প্রতি আনুগত্যের সহিত ললিতার তেজস্বিতা ও নিজের স্বাধীন বিচারবুদ্ধি মিশাইয়া এক যৌগিক জীবনদর্শনে তাহার দ্বিধাদোদুল চিত্তকে স্থির আশ্রয় দিয়ায়ছে। আনন্দময়ী তাঁহার অবস্থাসঙ্কটের অসহায়তা ও আত্ম-অবদমনের অস্বস্তি হইতে মুক্ত হইয়া নিজ পরিবেশের সহিত সুস্থতর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করিবেন ইহা অনুমান করিতে বিশেষ কোন কল্পনাবিলাসের প্রয়োজন হয় না।

ঘটনাগ্রন্থননৈপুণ্য ও বিরাট পটভূমিকায় উহার ব্যাপ্তি লেখক অবলীলা-ক্রমে সম্পন্ন করিয়াছেন। স্থানের দিক দিয়া এই পটভূমিকা কলিকাতার

কয়েকটি স্বল্পসংখ্যক পরিবার-সংস্থা ও কলিকাতার উপকণ্ঠস্থিত কয়েকটি পল্লীঅঞ্চলের মধ্যে সীমিত। কিন্তু এই সঙ্কীর্ণ পরিসরে প্রবাহিত উত্তাল ভাবতরঙ্গ ও মানস গতিবেগ উহার মধ্যে মহাকাব্যোচিত বিশালতা সঞ্চারিত করিয়াছে। ছোট নদীতে যখন বিপুল জোয়ারের উচ্ছ্বাস আসে তখন উহার ক্ষুদ্রত্ব আমাদের চোখে দেখা গেলেও উহা মনের সমর্থন পায় না। তেমনি কলিকাতার কয়েকটি বাড়ী ও সন্নিহিত কয়েকটি ক্ষুদ্র গ্রামের মধ্য দিয়া আত্মার যে বিরাট সংবেগ দুর্দম স্রোতোধারে প্রবাহিত হইয়াছে তাহাতে মহাকাব্যের সমুদ্রকল্লোল জাগিয়াছে। ক্ষুদ্রে বৃহতের যে আভাস ভারতীয় দর্শনের স্বভাবসিদ্ধ তাহা কোন দর্শনতত্ত্বের মধ্যবর্তিতা ছাড়াই লেখকের বলিষ্ঠ কল্পনা ও জীবনবিন্যাসের দ্বারাই পরিস্ফুট হইয়াছে। বসন্তকালের ভ্রমর যেমন পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে পরাগরেণু বহন করিয়াই সমস্ত বনভূমিতে গন্ধ ও বর্ণের অফুরন্ত সমারোহ সৃষ্টি করে, তেমনি গোরা ও বিনয় কয়েকটি পরিবারের মধ্যে নূতন ভাবপ্রেরণার বাহনরূপে যন্ত্রবদ্ধ মহানগরীর চিরাভ্যস্ত জীবনবোধে একটা দুর্দম ও সর্বব্যাপী প্রাণোচ্ছলতা জাগাইয়াছে। প্রাথমিক প্রতিকূলতা এই নবজাগরণকে আরও প্রাণবন্ত করিয়াছে। কঠিন মাটি হইতে রস আহরণের কৃচ্ছ্র প্রয়াসে নবীন প্রত্যয়তরুটি আরও গভীরে শিকড় চালাইয়াছে। হিন্দু-ব্রাহ্ম-সংঘর্ষের বিদ্যুৎশক্তিপূর্ণ আবহাওয়ায় নূতন উন্মেষের অঙ্কুরগুলি প্রাণসমৃদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং ঘটনার বিরলতা সত্ত্বেও উপন্যাসটি আত্মিক শক্তির সম্প্রসারণশীলতার জন্য মহাকাব্যের অবয়ববিস্তার ও বস্তুনিবিড়তা লাভ করিয়াছে। ভূগোলবৃত্তের সঙ্কীর্ণতা মনোজগতের সর্বাত্মক চেতনাকেন্দ্রবাহী সক্রিয়তার জন্য বিরাটরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। গোরার গরুড় ক্ষুধা, সুচরিতার অন্তরগভীরশায়ী সত্যসাধনা, আনন্দময়ীর আত্মলীন অশান্তি, বিনয়ের বিরুদ্ধ প্রভাবের আকর্ষণে দ্বিধাগ্রস্ত স্বভাবসৌকুমার্য—এই সমস্ত ভাবসংঘাত সামান্য ঘটনাবেষ্টনীর মধ্যে যে অসামান্য হৃদয়মন্থন তুলিয়াছে তাহাতেই উপন্যাসটি পল্বলপরিধি ছাড়াইয়া মহাসাগরের সীমাহীনতায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে যোগস্থাপন, বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে পরিচয়ের নানা স্তর বাহিয়া সম্পর্কনিবিড়তাপ্রতিষ্ঠা লেখক অত্যন্ত অনায়াসে ও কোনরূপ কষ্টকল্পনার আশ্রয় না লইয়াই সাধন করিয়াছেন। উপন্যাসের একেবারে সুরুতে পরেশবাবুর ঘোড়ারগাড়ী

—দুর্ঘটনা উপলক্ষ্যে বিনয়ের সহিত তাঁহার প্রথম আলাপের আকস্মিকতা ছাড়িয়া দিলে উপন্যাসের পরবর্তী পরিণতি সবই অনিবার্যকারণপ্রসূত, যাহা ঘটিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক উপায়েই ঘটিয়াছে। মানুষের হৃদয়-বৃত্তি ও জীবনের কর্মসূত্রই আকস্মিকতার সূচিমুখে প্রবেশ করিয়া নিশ্ছিদ্র নিয়মাধীনতার দৃঢ়বদ্ধগ্রন্থনে ঘটনাকে অন্বিত করিয়াছে।

৪

এইবার চরিত্রসৃষ্টির সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ও অভ্রান্ত অথচ অনায়াস সঙ্গতিবোধ হইতে লেখকের মানব মনস্তত্ত্বের উপর সহজ অধিকারটি পরিস্ফুট করা প্রয়োজন। উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীদের প্রকৃতির মধ্যে অতিরিক্ত জটিলতা নাই, ও মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণের কোন আতিশয্যও তাহাদের অন্তররহস্যভেদের জন্য প্রয়োজন হয় না। হয়ত অত্যন্ত স্ববিরোধপূর্ণ, দুর্বোধ্য চরিত্রের সূত্র-নির্দেশের জন্য এইরূপ বিশ্লেষণ অপরিহার্য হয়। কিন্তু সাধারণতঃ যে সমস্ত ব্যক্তি বাঙালী পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ও সনাতন আদর্শের অনুসারী তাহাদের স্বভাবে একটা সরল একমুখীনতা, একটা শ্রেণীগত নীতির বিশ্বস্ত অনুবর্তন দেখা যায়। অবশ্য ব্রাহ্মসমাজের আবির্ভাবে ব্রাহ্ম ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মচেতনায় কিছুটা স্রোতোবেগ সঞ্চারিত হইয়া তাহাদের চিত্তে প্রবল আবেগ ও সূক্ষ্ম অন্তর্দ্বন্দ্বের চাঞ্চল্য প্রতিফলিত হইয়াছে। এই মানস উত্তেজনা কিন্তু বৈচিত্র্যসঞ্চার অপেক্ষা চিরাভ্যস্ত মনোবৃত্তিকেই আরও দুর্দমবেগ-সম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছে। গোরার হিন্দুধর্মে সনাতন নিষ্ঠা গতানুগতিকতার খাত ছাপাইয়া তাহার সমস্ত চিত্তকে পূর্ণ জোয়ারের স্রোতে প্লাবিত করিয়াছে, বহিরঙ্গমূলক আচার-আচরণ-বিশ্বাসকে সমস্ত প্রাণের আকূতি ও আদর্শের ঊর্ধ্বচারিতার বিপুল বেগের সহিত যুক্ত করিয়া এক অমোঘ দীক্ষামন্ত্রের দিব্যশক্তি অর্জন করিয়াছে। এই ধর্মান্দোলন হারাণবাবু, বরদাসুন্দরী প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ প্রতিনিধিদের স্বভাবপ্রবণতাকে উগ্রতর হিন্দুবিদ্বেষে ও আত্মাভিমানের অগ্নিদাহে আরও উৎকট করিয়াছে। ললিতা ও হরিমোহিনী উভয়ের ক্ষেত্রে ধর্মসচেতনতা তপ্ত আবহাওয়া,

একজনকে অন্যায়ের দৃপ্ত প্রতিবাদে, ও অপরকে সংরক্ষণশীলতার চরম আতিশয্যে প্রবর্তনা দিয়াছে। সহজেই মনে করা যাইতে পারে যে প্রতিবেশে আগুন না জ্বলিলে এই কিশোরী ও প্রৌঢ়া তাহাদের জীবনব্যাপী আত্মদমন ভুলিয়া হাউইএর মত ফাটিয়া উঠিতে পারিত না। আনন্দময়ীর ধর্মবোধের নির্মলতা তাঁহার অসাধারণ জীবনাভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষ ফল। তাঁহার আচার-শিথিলতার সঙ্গে সদ্যউত্তপ্ত পরিবেশের কোন সম্পর্ক নাই। সাধারণ নারী যে কপটাচারের আশ্রয়ে দুই কূলই রক্ষা করিতে প্রয়াস পাইত, আনন্দময়ীর বলিষ্ঠ প্রকৃতি সেরূপ দুমুখো নীতির সাহায্যে নিজ কৃতকর্মের ফল এড়াইতে অস্বীকার করিয়াছে। তাঁহার ক্ষেত্রে ধর্মবোধের স্বচ্ছতা ও স্বভাববলিষ্ঠতা যুগনিরপেক্ষভাবে কর্তব্য নির্ধারণ করিয়াছে। পরেশবাবু এই তপ্ত কটাহে একটি অবিচল, আত্মসমাহিত শান্তিবিন্দু। চারিদিকের অগ্নিবেষ্টনীর মধ্যে, সাময়িক উত্তেজনা, দ্বেষসমুদ্রের তরঙ্গোৎক্ষেপ, অলীক ভাবাবেগের রঙীন মোহ, নিম্নতর আদর্শের ছদ্মসমর্থন ইত্যাদি সমস্ত বিভ্রান্তিকর যুগপ্রবাহের মধ্যে তিনি যে কেমন করিয়া তাঁহার প্রসন্ন ধর্মবোধকে অকৃত্রিম ও অবিচল রাখিয়াছিলেন, সাধনার সেই রহস্য আমাদের নিকট অজানাই থাকিয়া যায়। তবে তিনি যে এককালে ব্রাহ্মসম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছিলেন ইহাতেই প্রমাণিত হয় যে, তাঁহার ধর্মচেতনা-উন্মেষের উষালগ্নে তিনি সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির সম্পূর্ণ উর্ধ্বে উঠিতে পারেন নাই। হয়ত পরবর্তী অভিজ্ঞতাই তাঁহার উদার, অসাম্প্রদায়িক, ভগবানের নিকট হইতে প্রত্যক্ষলব্ধ ধর্মসাধনার প্রেরণা দিয়াছে ও জীবনসঙ্কটে উহার সার্থক প্রয়োগের মনোবল যোগাইয়াছে। যখন মানুষের ধর্মচেতনার ঢেউ জাগে, যখন উপলব্ধির বায়ুহিল্লোল উহার নিস্তরঙ্গ বদ্ধতাকে সচল করিয়া তোলে, তখন কাহারও কাহারও ধর্মজীবন যুগপ্রভাবের তটসীমায় নির্দিষ্ট রূপ গ্রহণ করে, কোন কোন অসাধারণ স্বাতন্ত্র্যময় ব্যক্তিই যুগপ্রেরণার উর্ধ্বে নিজ সত্তার স্বচ্ছ মুকুরে সেই জ্যোতির্ময় আদি পুরুষের চরাচরব্যাপ্ত দীপ্তিটি প্রতিবিম্বিত করিতে সক্ষম হয়।

বিনয়ের সামাজিক সহৃদয়তাই সর্বপ্রথম বিরুদ্ধধর্মের ব্যবধান ঘুচাইয়া পারস্পরিক ভাব-ও-প্রীতিবিনিময়ের পথটি উন্মুক্ত করিল। মৃদু মলয় পবন পাতার আড়াল সরাইয়া যে অন্তরসৌরভের অদৃশ্য উৎসটিকে মুক্তি দিল,

গোরার প্রবল ব্যক্তিত্ব ঝোড়ো হাওয়ার ন্যায় সেই পথে দুর্দ্ধর্ষ বেগে প্রবেশ করিয়া অন্তররাজ্যে একটা তুমুল আলোড়ন জাগাইল। বিনয় যেখানে সূচ হইয়া কোন মতে একটি কুণ্ঠিত প্রশ্রয়ের ছোট রন্ধ্রের সন্ধান পাইয়াছিল, গোরা সেখানে ফালরূপে একটি সুস্পষ্ট বিদারণরেখা আঁকিয়া নিজ স্পর্ধিত অধিকারটি স্থায়ীভাবে ঘোষণা করিল। দেখিতে দেখিতে বিনয় হিন্দু-জগতেও যেমন, নবার্জিত ব্রাহ্ম উপনিবেশেও তেমনি, গোরাকে প্রধান স্থান ছাড়িয়া দিয়া নেপথ্যলোকে অপসারিত হইল। বিনয় যেখানে সন্ধির শ্বেতপতাকা কম্পিত হস্তে তুলিয়া ধরে, গোরা সেখানে বিজেতার উদ্ধত জয়কেতন ঊর্ধ্ব আকাশে ওড়ায়। সুতরাং প্রথম আবিষ্কারের কৃতিত্ব বিনয়ের প্রাপ্য হইলেও আক্রমণকারীর গৌরব গোরাই আত্মসাৎ করিয়াছে। ইহারই একটা সূক্ষ্মতর প্রমাণ হইল সুচরিতার চিত্তজয়বিষয়ে বিনয়ের অগ্রগামী পথিকৃতের নীতিগত ন্যায্যতাকে উপেক্ষা করিয়া গোরার প্রবলতর আত্মপ্রসারণের অধিকারপ্রতিষ্ঠা। যে অদৃষ্টদেবতার ষড়যন্ত্রে বিনয় ও সুচরিতার প্রথম পরিচয় হইয়াছিল, তিনি ঈষৎ হাসিয়া তাঁহার ভুল সংশোধন করিতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব করিলেন না।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে বিনয় ও সুচরিতা প্রকৃতি-সাম্যের জন্য পরস্পরের উপযোগী এবং উহাদের মিলনই হয়ত স্বভাবসঙ্গত হইত। কিন্তু প্রেমের কুটিল গতি প্রণয়াকৃষ্ট নরনারীর সমধর্মিত্বের সরল পথ ধরিয়া চলে না, উহা বরং পরস্পরের অনুপূরকরূপেই বেশী সার্থক। বিনয় ও সুচরিতা উভয়েই স্বভাবসুকুমার, ও সুচরিতা বিশেষভাবে আত্মদমনশীল ও প্রকাশকুণ্ঠ। যেখানে দুস্তর বাধা অতিক্রম করিতে হইবে, সেখানে ইহাদের আকর্ষণ অপ্রচুর হইতে বাধ্য। বিনয়ের ধার-করা যুক্তিতর্কে সুচরিতার অন্তর-কপাট কোন মতেই খুলিত না, উহার জন্য অপরিহার্য প্রয়োজন হইবে একটি সমগ্র ব্যক্তিসত্তার কেন্দ্রীভূত আকর্ষণশক্তি। সমাজ-অনুমোদিত, রীতিসমর্থিত প্রীতিবিনিময়ের কুসুমাস্তীর্ণ পথ দিয়া সুচরিতার সত্যসন্ধানে একনিষ্ঠ, মনের জট ছাড়াইতে সদানিবিষ্ট, আত্মসমীক্ষারত অন্তরের গভীরে প্রবেশ ও সেখানে প্রেমের উন্মেষসাধন তাহার সম্পূর্ণ প্রকৃতিবিরোধী হইত। সুচরিতার প্রেমের ফুলফোটান কাব্যরীতিসুলভ দক্ষিণা হাওয়ার দ্বারা হইবার নহে। একমাত্র প্রলয়ঝটিকার উন্মত্ত বিক্ষোভই এই অসম্ভবকে বসন্ত করিতে পারে। পক্ষান্তরে বিনয়ের মত দ্বিধাদুর্বল চিত্তকে ব্রাহ্ম-

পরিবারে বিবাহ-বন্ধন স্বীকার করাইতে শুধু তাহার প্রেমানুভূতিই যথেষ্ট নয়। তাহার সহিত প্রণয়িনী নারীর ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনশীল মর্জি-খেয়াল, দুর্জয় অভিমান ও অনমনীয় দৃঢ়সংকল্পও যোগ করা দরকার। কোন কোন ঘোড়া যেমন লাগাম পরিতে উৎসাহ দেখাইলেও তাহাকে গাড়ীতে জোতা কঠিন, তেমনি বিনয়ও স্বভাবতঃ প্রেমানুকূল হইয়াও অসামাজিক বিবাহ-শকট টানিয়া যাইবার মত মনোবলহীন ছিল। সুতরাং সুচরিতা উপন্যাসের প্রয়োজনেই প্রথম দৃশ্যে নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া যথাসময়ে ললিতার জন্য ঐ আসন ছাড়িয়া দিয়া অন্য মুখ্য ভূমিকার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। এই পরিবর্তনটি বিনয়ের বিস্ময়বোধের মাধ্যমে পাঠকের গোচরে আসিয়াছে। অবশ্য সুচরিতার মনোভাব যে কখনও সহৃদয় কৃতজ্ঞতা ছাড়াইয়া বিনয়ের প্রতি কোন গূঢ়তর আকর্ষণ অনুভব করিয়াছে তাহার কোন প্রমাণ নাই। বিনয় তাহার খাপ খাওয়াইবার অসাধারণ ক্ষমতার জন্য স্বচ্ছন্দে এই পরিবর্তনটি স্বীকার করিয়া লইয়াছে—যে একদিন তাহার মনের কোণে রং ধরাইয়াছিল, ললিতার প্রতি আকৃষ্ট হইবার পর তাহাকে দিদির মর্যাদা দিতে তাহার কোন সঙ্কোচ হয় নাই। লেখক এইরূপ পরিবর্তনের সাহায্যে চরিত্রসঙ্গতি ও ঔপন্যাসিক ঘটনাপরিণতির সূক্ষ্মতর প্রয়োজন মিটাইয়াছেন।

ললিতা-বিনয়ের সম্পর্কের ঘাতপ্রতিঘাতগুলিকে বিবাহান্তিক পরিণতি পর্যন্ত অনুসরণ করা যাইতে পারে। বিনয়ের প্রতি ললিতার বক্রদৃষ্টি প্রথম আকৃষ্ট হইল দুইটি কারণে। প্রথমতঃ সে গোরার মতের প্রতিধ্বনি করে বলিয়া তাহার ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে ললিতার তীব্র অবজ্ঞা। দ্বিতীয়তঃ, তাহার বক্তব্যের পরিপাটি বিন্যাস তাহার স্বাধীন মতবাদ সম্বন্ধে সংশয় জাগায়। যাহার যুক্তিক্রমের মধ্যে সাহিত্যিক প্রসাদগুণের এত আধিক্য, যাহার মধ্যে প্রকাশবিহ্বলতার কোন লক্ষণই নাই, সে মনের অকৃত্রিম অনুভূতি হইতে প্রেরণা পায় কি না তাহা সন্দেহস্থল। সে গোরার প্রতি যে স্বতোবিমুখতা অনুভব করিল, তাহাই সে মনোবিকলনের তির্যক পথে বিনয়ের উপর চালান করিয়া দিল। এই হীনতাসন্ধানের উৎসাহাধিক্যের পিছনে যে ছদ্মবেশী অবচেতন প্রেম নিজ ভীরু অস্তিত্বের সঙ্কেত জানাইতেছে, তাহা সে নিজেও জানিত না। বিনয়ের উপর সে একটা অধিকারবোধ পোষণ না করিলে, তাহাকে গোরার প্রভাব ও

সাম্প্রদায়িক ধর্মবিতণ্ডা হইতে ছিনাইয়া নিজের গার্হস্থ্য জীবনপরিক্রমার অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য এত প্রচণ্ড ইচ্ছা জাগিত না। এই বিরোধের ঘাটিতেই প্রেমের প্রথম বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে। সুচরিতার প্রতি একটা অস্বীকৃত ঈর্ষ্যাও ইহারই আর একটি অনুষঙ্গী প্রমাণ। যখন সে নিশ্চয় বুঝিয়াছে যে সুচরিতা তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, তখনই তাহার সহিত সহজ সখিত্বের সম্বন্ধ সে ফিরিয়া পাইয়াছে।

ইতিমধ্যে ব্রাহ্মপরিবারের সহিত ঘনিষ্ঠতার ব্যাপারে বিনয়ের সহিত গোরার প্রচণ্ড মতবিরোধ ও কিছুটা মান-অভিমান চলিয়াছে। শেষ পর্যন্ত বিনয়ের আগ্রহাতিশয্যে গোরাও পরেশবাবুর বাড়ীতে যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছে। বিনয়ের সহিত পরেশ-পরিবারের একদিকে সৌজন্য-শিষ্টাচার-সহৃদয়তার পথ ধরিয়া ক্রমবর্ধমান অন্তরঙ্গতা, অন্য দিকে গোরার সহিত ব্রাহ্মসমাজের প্রচণ্ড সংঘর্ষ একসঙ্গে অগ্রসর হইয়াছে। এই বিতর্কের উত্তেজনার মধ্যেই গোরা সুচরিতার প্রতি একট বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করিয়াছে। বিশেষতঃ হারাণের তুচ্ছতার বৈপরীত্যে গোরার উত্তুঙ্গ ব্যক্তিত্ব ও প্রগাঢ় আত্মপ্রত্যয় সুচরিতার মনে একটা দাগ কাটিয়াছে। যেখানে বিনয়ের সর্বাত্মক আতিথেয়তা কোন বিশেষ ব্যক্তির প্রতি পক্ষপাত না দেখাইয়া পরিবারের সকলের সহিত একটি স্নিগ্ধ আত্মীয়তাবোধ প্রসারিত করিয়াছে, সেখানে গোরার সমস্ত একাগ্রতা পরিপার্শ্বনিরপেক্ষভাবে একমাত্র সুচরিতার প্রতি কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। সে তাহার সমস্ত শক্তি দিয়া, তাহার সমস্ত জীবনসাধনার সঞ্চিত ইচ্ছাপ্রয়োগে সুচরিতাকে নিজ প্রভাববৃত্তের অন্তর্ভুক্ত করিতে বদ্ধপরিকর। সে বিনয়ের মত সুচরিতাকেও পূর্ণ অধিকার ও গ্রাস করিতে চাহে।

বিনয় যখন সহজ হৃদয়বৃত্তির শিকড় মেলিয়া ব্রাহ্মপরিবার হইতে প্রীতিরস আহরণ করিতে ব্যস্ত ছিল, তখন অকস্মাৎ ললিতার তীব্র শ্লেষাক্রমণ তাহার মসৃণ অগ্রগতির পথে একটা অভাবিত বিঘ্ন ঘটাইল। যে শান্ত নদীজলে সে তাহার নূতন প্রীতিরস-আস্বাদনে উৎসুক জীবনতরীকে ভাসাইয়াছিল, তাহা হঠাৎ আবর্তের মধ্যে পড়িয়া ঘুরপাক খাইতে লাগিল। মেয়েদের লইয়া সার্কাস দেখার প্রমোদবিহার ললিতার তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসায় হঠাৎ একটা জটিল সমস্যার আকার ধারণ করিল। কিন্তু বিনয়ের সঙ্গে ললিতার ঘাত-প্রতিঘাতমূলক, দ্বন্দ্ব-দুর্বোধ সম্পর্কের মধ্যে অনুরাগের

অরুণাভা ফুটিবার পূর্বেই গোরার ও সুচরিতার পারস্পরিক মনোভাব একটা ক্রান্তিলগ্নের অভিমুখীন হইল। ২০ ও ২১ অধ্যায়ে উভয়ের মনে একটা নিগূঢ় অনুভবের উন্মেষ ও তজ্জনিত উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তবিপ্লব অপরূপ ব্যঞ্জনায় সঙ্কেতিত হইয়াছে। বিনয় ও ললিতার মত যৌবনতরল চিত্ত তটভূমিতে মৃদু আঘাত করিতে করিতে যত সহজে বেগ সঞ্চয় করে, গোরা ও সুচরিতার মত অন্তর্গূঢ়, আত্মসমাহিত প্রকৃতি অন্য লক্ষণের দ্বারা, অপরবিধ প্রেরণার অদৃশ্য চাপে তাহাদের মনের সূক্ষ্ম পরিবর্তন সম্বন্ধে সচেতন হয়। ভূগর্ভে সমাধিস্থ নির্ঝরের বাধামুক্তি ও বহিঃনিষ্ক্রমণ নদীপ্রবাহের সহিত তুলনায় অন্য ছন্দের অনুবর্তন করে। এই দুইটি প্রেমকাহিনী পাশাপাশি চলায় ইহাদের প্রকৃতিপার্থক্য স্ফুটতর হইয়াছে।

ললিতার সহিত বিনয়ের সম্পর্ক এইরূপ বিঘ্নবহুল পথে, বিচ্ছিন্ন উচ্ছ্বাসের অসম ধারায়, অনেক চড়া কাটাইয়া অনিয়মিতভাবে অগ্রসর হইয়াছে। এইবার সংঘর্ষ বাধিল ম্যাজিস্ট্রেটের আমন্ত্রণে অনুষ্ঠিত আবৃত্তি-অভিনয়ে বরদাসুন্দরীর মেয়েদের সঙ্গে যোগদানের ব্যাপারে। বিনয়ের এই প্রস্তাবে অসম্মতি-জ্ঞাপনে ললিতার জিদ চড়ে তাহাকে দলে টানিবার জন্য। বিনয় প্রশ্নটিকে নীতির পর্যায় হইতে ললিতার মনস্তুষ্টিবিধানের পর্যায়ে নামাইয়া রাজী হইলেও তাহার প্রসন্নতা অর্জন করিতে পারিল না। বিদ্রোহ সে বরদাস্ত করে না, অতিবশ্যতাও তাহার কাম্য নয়। তাহার সমস্ত আচরণ এই অদ্ভুত স্ববিরোধ ও অস্থিরমতিত্বের দ্বন্দ্বে দোলায়িত। প্রেমের স্বভাব-বৈপরীত্যই তাহার অস্বীকৃত মনোভাবের স্বরূপদ্যোতক। এই উপলক্ষ্যে সে বিনয়কে গোরার উপগ্রহত্বের খোঁটা দিয়া একটা হিংস্র তৃপ্তি অনুভব করিয়াছে ও বিনয়ের আত্মমর্যাদায় মর্মান্তিক আঘাত হানিয়াছে। গোলাপ ফুলের উপহার-স্বীকৃতির পরেও ললিতার খামখেয়ালী আচরণ বিনয়কে আরও পীড়িত করিয়াছে। বিনয়ের অভিনয়ের সাবলীল নৈপুণ্য আবার ললিতার হীনতা-বোধকে উদ্রিক্ত করিয়া তাহাকে অনুষ্ঠানের প্রতি বিমুখ করিয়াছে। আবৃত্তিতে তাহার আশ্চর্য কৃতিত্বে তাহার উৎসাহ আবার পূর্ণবেগে ফিরিয়াছে ও তখন হইতে তাহার প্রসন্ন সহযোগিতা সকলের উদ্বেগের অবসান ঘটাইয়াছে। এই সংঘাতের জটিল টানা-পোড়েনের মধ্যে বিনয় ও ললিতা পরস্পরের হৃদয়ের সন্ধান পাইয়াছে ও ঠিক এই মুহূর্তেই সুচরিতা বিনয়ের মনোলোকের নেপথ্যে অন্তর্হিত হইয়া ললিতাকে রঙ্গমঞ্চের একাধিপত্য ছাড়িয়া দিয়াছে।

গোরার বলিষ্ঠ, আবেশমুক্ত ও কর্মতৎপর ব্যক্তিত্ব সুচরিতার প্রতি এই মোহসঞ্চারকে সর্বশক্তি দিয়া প্রতিরোধ করিতে স্থিরসংকল্প হইয়া পায়ে হাঁটিয়া দেশভ্রমণের সিদ্ধান্ত করিয়াছে। এই পল্লীজীবননৈকট্যের ফলে সে চরঘোষপুরে দরিদ্র প্রজার সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মম শোষণব্যবস্থার অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে। এই অভিজ্ঞতার অমোঘ প্রতিক্রিয়ারূপে সে বিদেশী রাজশক্তির সহিত সংঘর্ষ বাধাইয়া জেলে অবরুদ্ধ হইয়াছে। ইহারই সূত্র ধরিয়া বিনয় ও ললিতার সম্পর্কে নিয়তি এক অচ্ছেদ্য গ্রন্থি পাকাইয়া তুলিয়াছে ও ইহাই শেষ পর্যন্ত তাহাদের দাম্পত্য মিলনে পরিণতি লাভ করিয়াছে। গোরার অন্যায় কারাদণ্ডের প্রতিবাদস্বরূপ বিনয় তৎক্ষণাৎ দণ্ডদাতা ম্যাজিস্ট্রেটের আয়োজিত উৎসব বর্জন করিয়াছে ও ললিতার আত্মসম্মানবোধ ও অন্যায়ের প্রতি প্রবল ঘৃণা সমস্ত শিষ্টাচার ও সামাজিকতার অনুশাসন ছিন্ন করিয়া প্রকাশ্য বিদ্রোহে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। ললিতার অন্তরে যে অনুরাগের স্ফুলিঙ্গ অভ্যস্ত জীবনযাত্রার শান্ত আবরণে স্তিমিত ছিল তাহা বিদ্রোহের এই ঝটিকায় সর্বধ্বংসী শিখায় আত্মঘোষণা করিল। সে ভবিষ্যৎজ্ঞানশূন্য হইয়া উন্মত্ত আবেগে উৎসবের অপমানজ্বালা এড়াইতে স্টীমারযাত্রায় বিনয়ের অভিভাবকহীন সান্নিধ্যে আপনাকে নিক্ষেপ করিল। তাহার এই সমাজবিগর্হিত আচরণের কিরূপ অপব্যাখ্যা হইতে পারে তাহা সে ভাবিবারও অবসর পায় নাই। প্রেমের যে অন্ধ আবেগ মানুষের অবচেতন মন হইতে অলক্ষিতভাবে ক্রিয়াশীল হইয়া তাহার গতিবিধিকে অভাবনীয় পথে পরিচালিত করে, ললিতার এই কাজটি সেই অন্ধ প্রেরণা-সঞ্জাত। বিনয়ের উপর নির্ভরশীলতা অন্যায়ের প্রতি প্রবল বিরাগের বিপরীত শক্তিরূপে ললিতার নিকট প্রতিভাত হইয়াছে। ক্রোধের বিকৃত মুকুরে প্রেমের অন্তর্গূঢ় অস্তিত্ব প্রতিচ্ছায়া ফেলিয়াছে। ললিতা যাহা সোজা পথে আবিষ্কার করিতে পারিত না, তির্যক দৃষ্টিতে তাহারই স্বরূপ তাহার নিকট মুখোস খুলিয়াছে। পা পা করিয়া আগাইলে প্রেমের যে দ্বার বন্ধই থাকিত, বিপরীত মনোবৃত্তি হইতে সবেগে উৎক্ষিপ্ত হইয়া সেই দ্বার অকস্মাৎ তাহার নিকট উন্মুক্ত হইল। স্টীমারমধ্যে বিনয়ের ভদ্র ও সংযত আচরণ ললিতার স্বভাবনির্মল অন্তরে তাহার প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতাবোধ জাগাইল। অনিশ্চিত আবহাওয়ার ঝড়-ঝাপটা কাটাইয়া যদি শেষ পর্যন্ত প্রেমের দেউল নির্মিতই হইয়া উঠে, তবে এই স্টীমারযাত্রার অভিজ্ঞতা

শ্রদ্ধার উপাদানে তাহার পাকা ভিত্তি রচনা করিয়াছে। ললিতার প্রতি দায়িত্ববোধ ও তাহার মর্যাদারক্ষার একান্ত আগ্রহ তাহাকে নূতন সম্ভ্রম-মণ্ডিত করিয়া বিনয়ের দৃষ্টিকে উদ্‌ঘাটিত করিল। সে সারা রাত্রি জাগিয়া ললিতার শয়নকক্ষে অতন্দ্র প্রহরা দিল ও এই কৃচ্ছ্র সাধনের দ্বারা প্রেমলাভের যোগ্যতা অর্জন করিল। রাত্রির নিঃশব্দ নক্ষত্রমণ্ডলী ও নিশ্ছিদ্র অন্ধকার তাহার এই গোপন পরিচর্যার সাক্ষীরূপে ইহার মধ্যে প্রকৃতির বিশালতা ও মহিমা সঞ্চারিত করিল ও প্রভাতে তরুণ সূর্যের প্রথম আবির্ভাব যেন দেবপ্রসাদের মত বিনয়ের দ্বিধাদুর্বল চিত্তে বলিষ্ঠ সঙ্কল্পের দৃঢ়তা আনিয়া দিল। ললিতা-বিনয়ের ব্যক্তিগত সমস্যার এইখানেই সমাধান হইল। ইহার পরে সমাজের বাধা ও বিবাহের ধর্মীয় অনুষ্ঠানবিষয়ক কতগুলি বহিরঙ্গমূলক অন্তরায় অতিক্রমণের প্রতীক্ষায় রহিল।

অবশ্য ষ্টীমারে একত্র ভ্রমণের পরেও ললিতার মনোভাব সম্পূর্ণরূপে স্ববিরোধমুক্ত হইল না। তাহার স্বভাবতঃ খামখেয়ালী আচরণ প্রেম-স্বীকৃতির চারিদিকে একটি অনিশ্চয়ের কুহেলিবৃত্ত রচনা করিয়াছে। তাহার প্রেম কখনই অবিমিশ্র মধুরূপে দেখা দেয় নাই- ঝাঁঝ ও ঝালের পরিমাণ ইহার মধ্যে কিঞ্চিৎ অস্বস্তির স্বাদ জাগাইয়াছে। পরেশবাবুর সম্মুখীন হইবার মুহূর্তে বিনয়ের উপস্থিতি প্রয়োজন হইবে কিনা তাহা বিনয় ঠিক করিতে ইতস্ততঃ করিতেছিল। ইতিমধ্যে ললিতাই খুব রূঢ়ভাবে তাহাকে অপেক্ষা না করিয়া গোরার মা-এর আশু সান্ত্বনাবিধানের নির্দেশ দিয়াছে। ললিতার এই আকস্মিক মেজাজ-পরিবর্তন বিনয়ের মনে মর্মান্তিক আঘাত হানিয়াছে। আনন্দময়ী অবশ্য তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সংযমের বলে গোরার কারাদণ্ডের দুঃসংবাদ সহজভাবেই গ্রহণ করিয়াছেন ও বিনয়ের কোন সান্ত্বনাপ্রয়াসকে আমল না দিয়াই বরং বিনয়কে মাতৃসুলভ স্নেহের অভিষেকে তাহার মনোবেদনার উপর স্নিগ্ধ প্রলেপ বুলাইয়াছেন। বিনয় আনন্দময়ীর নিকট তাহার ললিতার প্রতি প্রণয়োন্মেষের কাহিনী বিবৃত করিয়া তাহার অন্তরের ভার লঘু করিয়াছে ও তাঁহার নীরব সমর্থনের প্রসাদে ধন্য হইয়াছে।

ললিতার বিনয় সম্বন্ধে যেটুকু সঙ্কোচ ছিল, তাহা ব্রাহ্মসমাজের হীন আক্রমণ ও কুৎসাপ্রচারে তাহার বিদ্রোহের প্রজ্বলন্ত অগ্নিশিখায় পুড়িয়া ছাই হইয়াছে। বিনয়ের প্রতি তাহার অপ্রকাশিত অনুরাগ এই দুঃসাহসের

আভায় দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের এই গর্হিত গুপ্তঘাতকবৃত্তির প্রতিবাদে সে প্রকাশ্যভাবে বিনয়ের সহিত বিবাহসঙ্কল্প ঘোষণা করিয়াছে। তাহাদের দুইজনকে জড়াইয়া ব্রাহ্মগোষ্ঠীর মধ্যে যে নিন্দার আবিল পঙ্কস্রোত ঘুলাইয়া উঠিয়াছে তাহাতে বরং বিনয়ই নিজ অপরাধবোধে মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছে ও ললিতার সহিত প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকারের সাহস হারাইয়াছে। ললিতার দৃপ্ত সত্যনিষ্ঠ প্রকৃতি কিন্তু ইহাতে আরও উদ্ধত অস্বীকৃতিতে উত্তেজিত হইয়াছে। আনন্দময়ীর ঘরে সুচরিতা ও ললিতাকে দেখিয়া ও মেয়েস্কুল খুলিবার ব্যাপারে ললিতার দ্বারা তাহার সহযোগিতার সোৎসাহ আহ্বানে বিনয়ের বিপন্নতা কাটিয়া গিয়া তাহার অন্তরে হঠাৎ পুলকের উদ্দীপনা দেখা দিয়াছে। অবশ্য ললিতার বিদ্রোহের সমস্ত শাস্তি পরেশবাবুকে সহ্য করিতে হইল। বেনামী চিঠি, প্রকাশ্য কৈফিয়ৎতলব, সর্বোপরি পারিবারিক অসহযোগ ও বিমুখতার সমস্ত নীরব বেদনা তাঁহার ধৈর্যের ও ঈশ্বরবিশ্বাসের অগ্নিপরীক্ষার অবসর সৃষ্টি করিল। আনন্দময়ী সমস্ত প্রতিকূল প্রভাবের বিরুদ্ধে বিনয়ের সহিত ললিতার বিবাহে অকুণ্ঠ সমর্থন জানাইয়া ও বিবাহই যে ললিতাকে এই কাপুরুষোচিত পঙ্কপ্রক্ষেপ হইতে বাঁচাইবার একমাত্র পথ ইহাই কর্তব্যরূপে নির্দেশ করিয়া বিনয়ের মনোবলকে স্থির রাখিয়াছেন।

গোরা জেল হইতে মুক্ত হইয়া বিনয়ের এই ব্রাহ্মবিবাহের দুঃসংবাদ শুনিয়াছে ও তাহার সমস্ত যুক্তিতর্ক, আবাল্য সৌহার্দ্যের অধিকার ইত্যাদির প্রয়োগে বিনয়কে এই সমাজদ্রোহিতা হইতে বাঁচাইবার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছে। এই দ্বন্দ্বের মধ্যে লেখকের সূক্ষ্মদর্শিতা সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। বিনয় এখন গোরার ব্যক্তিত্বপ্রভাবের নিকট সহজে নতিস্বীকার করিল না। কেননা তাহার সমস্ত সত্তা দিয়া অনুভূত একটি বাস্তব সত্য গোরার আন্তরিক নিষ্ঠাপোষিত প্রত্যয়ের বিরুদ্ধে সমকক্ষতার স্পর্ধায় দাঁড়াইয়াছে—"গোরা আজ বায়ুবাণের দ্বারা বায়ুবাণকে ঠেকাইতেছিল না, আজ বাণ যেখানে আসিয়া বাজিতেছিল সেখানে বেদনাপূর্ণ মানুষের হৃদয়" (৫৩ অধ্যায়)। বিনয় আজ এই নববলে বলীয়ান হইয়া গোরার সহিত দ্বৈরথ সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সুতরাং গোরার প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তিও আজ বিনয়কে পরাজিত করিতে পারিল না। স্বাজাত্যাভিমান ও প্রেম যদি সমান সত্য হয়, তবে কেহই আত্মসমর্পণের কথা ভাবিবে না।

ব্রাহ্মসমাজের নূতন নূতন পীড়নের উদ্ভাবন-কৌশল, উহার একটা নিন্দামুখর কুৎসিত আবহাওয়া সৃষ্টির উপায়দক্ষতা, হারাণবাবু ও বরদাসুন্দরীর নব নব নৈতিক প্রভাব-বিস্তার, বিনয়ের অন্তর্দ্বন্দ্বময় অনুতাপ, সুচরিতার শঙ্কিত দ্বিধা ও পরেশবাবুর ও আনন্দময়ীর অটল নিত্যধর্মনির্ভরতা সমস্ত মিলিয়া যে অগ্নিগর্ভ পরিবেশ রচনা করিয়াছে তাহার ধূম্রাবরণের মধ্যে ললিতার দৃপ্ত তেজস্বিতা সুস্পষ্টতর দীপ্তিতে ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে। শেষ বাধা আসিয়াছে কোন্ ধর্মমত অনুসারে বিবাহ অনুষ্ঠিত হইবে সে সম্পর্কে মতভেদে। অবশ্য আনন্দময়ী বিনয়ের ধর্মান্তরগ্রহণের প্রস্তাবকে অনুমোদন করেন নাই। ব্রাহ্মপরিবারে বিবাহের জন্য যে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা অপরিহার্য মূল্য তাহা তাঁহার উদার, অ-সাম্প্রদায়িক ধর্মচেতনা স্বীকার করে নাই। সমাজ এই সমাজবিধিউল্লঙ্ঘনের জন্য বিনয়কে বর্জন করে, তবে তাহাকে এই শাস্তিগ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। কিন্তু সে যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সমাজত্যাগী হইবে ইহা সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য। বিনয়ের নিজের ধর্মের আচার সম্বন্ধে এমন কোন প্রবল প্রত্যয় ছিল না, যাহা মিলনের পথে অলঙ্ঘ্য ব্যবধান। গোরার বন্ধুত্ব হারানই তাহার সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক আত্মত্যাগ—গোরার প্রসন্ন স্বীকৃতির অতিরিক্ত হিন্দুধর্মের প্রতি তাহার আর কোন দুশ্ছেদ্য আকর্ষণ নাই। সুতরাং সে ব্রাহ্ম বা হিন্দু মতে যে কোন উপায়ে বিবাহ সারিতে উৎসুক। কিন্তু এখানে ললিতার ধর্মনিষ্ঠা নয়, তাহার দুর্দম আত্মমর্যাদাবোধ ও সত্যানুরাগই তাহাকে কোন অপমানকর সর্তে রাজি হইবার প্রক্ষে প্রবল বাধা দিয়াছে। সে ব্রাহ্মসমাজের মত একটা হীন মনোভাবশাসিত প্রতিষ্ঠানের এই অভিভাবকত্বের দাবী সবলে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। পরেশবাবু তাহাকে কোন নির্দেশ না দিয়া তাহার স্বাধীন বিচারবুদ্ধির উপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ভার দিয়াছেন। ললিতা ও বিনয়ের যদি তাহাদের কৃতকর্মের ফলভোগ করিবার মত অটুট নীতিবল থাকে, তবে অন্তর্যামীর নির্দেশ ছাড়া অপর কোন বহিঃশক্তির অনুশাসন তাহারা স্বচ্ছন্দে উপেক্ষা করিতে পারে।

ললিতা ও বিনয়ের বিবাহ সমস্যাটি চারিটি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে বিচারিত হইয়াছে—(১) প্রণয়ীযুগলের, (২) আনন্দময়ীর (৩) গোরার ও (৪) পরেশবাবুর। ইঁহারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ অন্তরের আলোকে এই একই ব্যাপারে নূতন নূতন দিক প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। প্রথম, ললিতা-

বিনয় সংক্ষিপ্ত বিশ্রম্ভালাপের পর যে সিদ্ধান্তে স্থির হইয়াছে তাহা লেখকের ভাষাতেই ব্যক্ত করা যাইতে পারে—"তাহারা হিন্দু কি ব্রাহ্ম একথা তাহারা ভুলিল, তাহারা যে দুই মানবাত্মা এই কথাই তাহাদের মধ্যে নিষ্কম্প প্রদীপশিখার মতো জ্ব'লতে লাগিল।" (৫৮ পরিচ্ছেদ, শেষ) আনন্দময়ী বিনয় ও ললিতার নিকট তাঁহার মনোভাব প্রকাশ উপলক্ষ্যে এ বিষয়ে তাঁহার দ্বিধাহীন অভিমত জানাইয়া দিয়াছেন—তাঁহার সমদর্শী মন মানুষে-মানুষে অকৃত্রিম মিলনস্পৃহার মধ্যে সমাজের কৃত্রিম বাধা ও সমাজবিদ্রোহে শক্তির অপচয় কোনটাই পছন্দ করে না। বন্ধুত্বের মত বিবাহও সহজ, সরল, ও সর্ববাধামুক্ত হওয়াই তাঁহার একান্ত কাম্য। পরেশবাবু সুচরিতার সহিত আলোচনায় ও ললিতা-বিনয়ের নিকট লিখিত আশীর্বাদ-লিপিতে তাঁহার নির্মল বিবেকবুদ্ধিপ্রসূত প্রত্যয়টি ধীরভাবে উপস্থিত করিয়াছেন। ইহার মধ্যে তাঁহার মানস বিচারের শান্ত স্পন্দনটি অতি সূক্ষ্ম, অথচ নিখুঁত রেখায় বিধৃত হইয়াছে। তরুণ-তরুণীর এই দুঃসাহসিক সমাজ-বিদ্রোহে তাঁহার উদ্বেগের কথা তিনি গোপন করেন নাই, তবে ইহার সঙ্গে সঙ্গে ইনি উহাদিগকে সতর্ক করিয়াছেন যে আজীবন তাহাদিগকে এই আদর্শবাদের উদাত্ত সুরে সমস্ত জীবন-সঙ্গীতকে অনুরণিত করিতে হইবে। অভিভাবক হিসাবে তাঁহার একমাত্র কর্তব্য হইল যে তাহাদের আচরণ ধর্মসঙ্গত হইল কি না যে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া, ফলাফলের দিক্ দিয়া সতর্ক করা নয়। এখানে এই সঙ্গে তিনি তাঁহার ব্রাহ্মসমাজে যোগদানের আদিম প্রেরণাটির উপরও আলোকপাত করিয়াছেন। যখন তিনি সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে প্রণোদিত হইয়াছিলেন, তখন ব্রাহ্মসমাজই তাঁহার ধর্মসাধনার শ্রেষ্ঠ আদর্শরূপে প্রতিভাত হইয়াছিল। তিনি হিন্দুসমাজের বন্ধন কাটিয়া ব্রাহ্মসমাজের বন্ধন গলায় পরেন নাই—ইহাই তাঁহার অন্তর্যামীর নিকট একমাত্র আত্মপক্ষসমর্থন। পরেশবাবুর বিচার হইল সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, জীবন্মুক্ত পুরুষের নিরাসক্ত দৃষ্টির প্রতিফলন। ইহা নীতিতত্ত্ববিদের কাজে লাগিবে, সংসারসংগ্রামলিপ্ত নর-নারীর জটিল সমস্যাসমাধানে কতটা সহায়তা করিবে তাহা বলা শক্ত। গোরা কিন্তু তাহার চিরন্তন প্রতিষ্ঠাভূমিতে অবিচল রহিয়াছে। পরেশবাবু ও আনন্দময়ীর প্রসন্ন অনুমোদনও তাহার চিত্তে লেশমাত্র রেখাপাত করে নাই। পরেশবাবুর উদারতাকে সে তীক্ষ্ণ যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করিয়াছে। ভাঙন-ধরা

নদীতটের তুলনা তাহাকে কিছুমাত্র সান্ত্বনা দেয় নাই—সে কৃত্রিম পাষাণ-বন্ধনে সুরক্ষিত, আবহমানকাল হইতে অপরিবর্তিত, সমস্ত স্রোতোবেগ-প্রতিরোধী সমাজের প্রশস্তিগানে মুখর। বিনয়কে ত্যাগ করা সম্বন্ধেও তাহার কর্তব্য দ্বিধাহীন ও সুস্পষ্ট। সমাজ নিজ অন্তর্নিহিত শক্তিতে আত্ম-রক্ষার ব্যবস্থা করিবে, তাহার নিশ্চেষ্টতাকে বিদ্রোহের খোঁচায় বিচলিত করিবার কোন প্রয়োজনই নাই এই বিশ্বাসে সে অটল। কিন্তু তাহার মর্মান্তিক পরাজয় ঘটিয়াছে তাহার নিজের মাতার স্নেহের নিকট সমাজ-নিষ্ঠার অবমাননায়। সে সমস্ত সমাজকে বিনয়ের প্রত্যাখ্যানে একীভূত করিয়াছে, কেবল নিজের মাকেই তাহার মতাবলম্বী করিতে পারে নাই। ইহার পিছনে যে আরও গূঢ় পরাভব-গ্লানি প্রচ্ছন্ন আছে তাহা অবশ্য তাহার পূর্বানুমানেও ধরা পড়ে নাই। এইরূপে এই অসাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠানের সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য ও বহুমুখী বিচারবুদ্ধির উদ্দীপন উপন্যাসের পাত্রপাত্রীর বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে পাঠকের চেতনায় অনুবিদ্ধ হইয়াছে।

শেষ পর্যন্ত হিন্দুমতেই বিবাহ সম্পন্ন হইয়া এই কূটপ্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়াছে। লেখক বিবাহ বাসরেই বিনয়-ললিতার দাম্পত্য জীবনের উপর যবনিকা ফেলিয়া বিবাহোত্তর সমস্যার কোন ছায়াপাত ঘটিতে দেন নাই। ঔপন্যাসিকও উপসংহারলগ্নে রূপকথাকারের নিশ্চিন্ত, আনন্দময় সমাপ্তি-ঘোষণার প্রতিধ্বনি করিতে বাধ্য হন। জীবন এই ক্রান্তিমুহূর্তে প্রত্যক্ষ গতি হারাইয়া এক কল্পনারমণীয়, অথচ পূর্ব-ইতিহাস-প্রভাবিত পরিণতিতে স্থির হইয়া নেপথ্যলোকে আত্মগোপন করে।

৫

বিনয় ও ললিতা উপন্যাসের পার্শ্বচরিত্র, গোরা ও সুচরিতার সম্পর্ক-নির্ধারণই উহার কেন্দ্রীয় ঘটনা, সমস্ত উপন্যাস-বর্ণিত হৃদয়-আলোড়নের নিগূঢ়তম রসনির্যাস। অন্যান্য চরিত্র ও ঘটনাপরম্পরা এই পরম পরিণতির প্রস্তুতি ও আয়োজন। যে ঝড় উপন্যাসের পাতায় পাতায় বহিয়াছে, যে আবেগ-সংঘাত উহার মধ্যে দুর্দম গতিবেগ সঞ্চার করিয়াছে, যে বৃহৎ পটভূমিকা কাহিনীর বস্তু-আশ্রয় ও ভাব-পরিধি যোগাইয়াছে, তাহাদের চরম তাৎপর্য এই বিপরীত মেরুর অধিবাসী তরুণ-তরুণীর একাত্ম

মিলনে নিয়োজিত। দুইটি ভিন্ন-আদর্শ-প্রভাবিত অথচ আত্মানুসন্ধান ও সত্যৈষণায় একনিষ্ঠ চরিত্র যেখানে আসিয়া মিলিয়াছে তাহা সাধারণ ভাববিনিময়ের মানদণ্ডে অসম্ভব ও অভাবনীয়। মহাপ্লাবনে যেমন দূরবিচ্ছিন্ন বিসদৃশ প্রাণীসংঘ পরস্পরের অতি কাছাকাছি ভাসিয়া আসে, তেমনি এখানে পারিপার্শ্বিকের তুমুল আলোড়নে, আবেগের কূলপ্লাবী মন্থনে, ঘটনার বিচিত্র গতিতে, ও সর্বোপরি অভাবনীয়ের প্রলয়-কম্পনে এই দুই আত্মা অন্যোন্য-সংলগ্ন হইয়াছে। কবি যেখানে সৃষ্টিতত্ত্বভেদী দিব্যদৃষ্টিবলে বর্তমান যুগের প্রেমিক-প্রেমিকাকে যুগ-যুগান্তরের অনাদি প্রেমের উৎস হইতে ভাসিয়া-আসা শাশ্বতযুগলরূপে কল্পনা করিয়াছেন, ঔপন্যাসিক তাহার জন্য বাস্তব ও মনস্তত্ত্বসম্মত পরিবেশ যোগাইয়া কবিকল্পনাকে জীবনসত্যের প্রত্যক্ষতা দিয়াছেন। সূক্ষ্মভাবে অনুধাবন করিলে এই উভয় প্রেমেরই স্বরূপ অভিন্ন। উপন্যাসের এই প্রেমকাহিনী তথ্যবহুল ও অন্তর্দ্বন্দ্বপুষ্ট হইয়াও কাব্যসুষমার অতি নিকটাত্মীয়। কাব্যের সুকুমার হৃদয়বৃত্তিকে যতটা বস্তুঘনতা ও মনোজগতের সহিত সূক্ষ্ম সঙ্গতি দেওয়া সম্ভব, রবীন্দ্রনাথ তাহার সীমারেখায় পৌঁছিয়াছেন।

গোরার সমস্ত হৃদয়বৃত্তিমূলক সম্পর্কই আচারনিষ্ঠার অনমনীয় প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। এমন কি মাতা-পুত্রের যে মধুরতম সম্বন্ধ তাহাও স্নেহপ্রশ্রয়ের সমস্ত স্পর্শ হইতে বিবিক্ত। মাতার প্রীতিবিধানের খাতিরেও সে নিজ ধর্মনির্দিষ্ট আচরণপথ হইতে এক চুলও ভ্রষ্ট হইতে প্রস্তুত নয়। কাজেই আনন্দময়ী যখন বিনয়কে খাওয়াইবার জন্য আকিঞ্চন করিয়াছেন তখন গোরার কর্তব্যবোধ এই ইচ্ছাতে বাধা দিয়া মাতার মনে ব্যথা দিতে তিলমাত্র সঙ্কুচিত হয় নাই। অবশ্য আনন্দময়ী তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ উদারতার বশে এই অযৌক্তিক অত্যাচারকে ক্ষমাস্নিগ্ধ প্রসন্নতার সহিত মানিয়া লইয়াছেন। বিনয়ের সহিত সম্পর্কেও বন্ধুপ্রীতি কঠোর কর্তব্যনিষ্ঠার দ্বারা পদে পদে প্রতিহত হইয়াছে—বন্ধুর স্বাধীন ইচ্ছা তাহার অবশ্যপালনীয় আচরণবিধিকে লঙ্ঘন করিলে গোরার নিকট কিছুমাত্র প্রশ্রয় পায় নাই। ব্রাহ্মসমাজে মেলামেশা, পরেশবাবুর পরিবারের সহিত সাধারণ সৌজন্যবিনিময়ও তাহার নিষেধবারিত হইয়া অতি সসঙ্কোচে অগ্রসর হইয়াছে। তাহার প্রত্যেকটি ব্যক্তিগত সম্পর্ক এইরূপে এক অতন্দ্র বিবেকবুদ্ধি-তাড়িত হইয়া স্বচ্ছন্দ বিকাশবঞ্চিত হইয়া পড়িয়াছে।

গোরার মনের এই দিকটা যেন অবিকশিতই রহিয়া গিয়াছে। সে সব সময়ে নেতা, শাসক ও সংঘগুরুর কৃত্রিম অংশে অবতীর্ণ হইয়া সহজ প্রীতিবিনিময় ও পরিবার-জীবনের সৌকুমার্য হইতে আপনাকে স্বেচ্ছানির্বাসিত করিয়াছে। তাহার রণবেশেই তাহার একমাত্র পরিচয়—সে কোন দিনই বর্ম খুলিয়া কোমল অনুভূতিময় হৃদয়টি অবারিত করে নাই।

কৃষ্ণদয়াল, দাদা মহিম ও পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তির সঙ্গেও তাহার একই রকমের কর্তব্যনিয়ন্ত্রিত, অন্তরঙ্গতাহীন সম্পর্ক। বিনয়ের সহিত বিতর্কে তাহার হাস্যরসিকতার কিছুটা নিদর্শন মিলে, কিন্তু সেখানেও হাসির পিছনে একটা শ্লেষতীক্ষ্ণ, অনমনীয় কঠোর আঘাতশীলতা গোপন থাকে না। গোরার পরিহাসের মধ্যে স্নিগ্ধতার একান্ত অভাব, শাণিত অস্ত্রের ইস্পাত-আভা উহার মধ্য হইতে ছিট্‌কাইয়া পড়ে। কৃষ্ণদয়ালকে সে শাস্ত্রবিধি অনুসারে ভক্তি করে। নিজ অন্তরের আনুগত্য সেখানে একেবারেই অনুপস্থিত। মহিমের প্রতি সে অগ্রজের প্রাপ্য সম্মান দেখায়, কিন্তু তাহার সহিত প্রাণের কোনই যোগ নাই। মহিমের গার্হস্থ্য সমস্যা ও চাকরীজীবনের ভাল-মন্দ শুধু তাহার সহানুভূতি নয়, চেতনা হইতেও বর্জিত। এমন কি বৌদিদি লক্ষ্মীমণি ও ভাইঝি শশিমুখীর প্রতিও সে একান্ত উদাসীন, কোন বিরল মুহূর্তেও তাহাদের সম্পর্কে কোন ঔৎসুক্য সে অনুভব করে না। শশিমুখী তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে কেবল বিনয়ের সহিত তাহার বিবাহপ্রস্তাবউপলক্ষ্যে, কিন্তু অন্যথা তাহার প্রতি কোন স্নেহক্ষরণের প্রমাণ আমরা উপন্যাসে পাই না। গোরা নিঃসংশয়ে এমন একজন ব্যক্তি, যাহার বহির্জীবন অন্তর্জীবনকে পূর্ণগ্রাস করিয়াছে। কেবল সুচরিতার ক্ষেত্রে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা ডিঙ্গাইয়া বহির্জীবন ও অন্তর্জীবন এক হইয়া মিশিয়াছে। সুতরাং ইহাই গোরার জীবনে প্রধান ধারা ও ইহারই অনুসরণে তাহার ব্যক্তিত্বের উৎসমূলে পৌছান যাইবে।

গোরার ব্যক্তিসত্তাটি নানাবিধ আলোচনা ও মতবাদের মাধ্যমে আমাদের নিকট পরিস্ফুট হইয়াছে। তর্কের জোরের মধ্য দিয়াই তাহার ব্যক্তিত্বের জোর আমাদের নিকট প্রকাশ হয়। সর্বপ্রথম বিনয়ের সহিত তাহার যে মতবাদসংঘর্ষ ঘটিয়াছে তাহাতেই তাহার সংকল্পদৃঢ়তা ও দুর্বলতার প্রতি প্রবল অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পাইয়াছে। বিনয়ের ব্রাহ্ম-

পরিবারের সহিত আকস্মিক আলাপ গোরার মনে তীব্র বিরূপতা জাগাইয়াছে। সে এই তুচ্ছ ব্যাপারের মধ্যেই বিনয়ের স্বধর্মচ্যুতির সম্ভাবনা দেখিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজে প্রচলিত স্ত্রী-স্বাধীনতাই এই বিতর্কের উপলক্ষ্য। গোরা পাশ্চাত্ত্যভাববিলাসপ্রসূত স্ত্রীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা দেখানোর মধ্যে কামনার অপমানকর অস্তিত্ব অনুমান করিয়া সে সম্বন্ধে বিনয়কে সতর্ক করিয়াছে। পরদিন সন্ধ্যায় বিনয়ের সহিত তর্কে গোরা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাহার আদর্শটি উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিবার অবসর পাইয়াছে। তাহার পরদিন গোরা কৃষ্ণদয়ালের অনুজ্ঞায় পরেশবাবুর বাড়ী গিয়াছে ও তাহার পরিবার-বর্গের সহিত প্রথম পরিচিত হইয়াছে। তাহার পূর্বেই বিনয় আনন্দময়ীর পাতের প্রসাদে বলীয়ান হইয়া পরেশবাবুর বাড়ীতে শিষ্টাচারের তাগিদে উপস্থিত হইয়াছে ও নিঃসঙ্কোচে মেয়েদের সহিত আলাপ-আলোচনা চালাইয়াছে। বিনয় নকীবরূপে সুচরিতার নিকট গোরার প্রশস্তিকীর্তন করিয়া তাহার মনে ঔৎসুক্য জাগাইয়াছে,—তাহার প্রমুখাৎ সুচরিতা গোরার অসাধারণ চরিত্রগৌরবের সন্ধান পাইয়াছে। এই দৌত্যটুকু না থাকিলে গোরার প্রতি সুচরিতার পূর্বরাগসঞ্চারের কোন অবসর ঘটিত না।

সেই দিনই অপরাহ্ণে গোরা পিতৃআজ্ঞাপালনের জন্য পরেশবাবুর সহিত পরিচয় করিতে আসিয়াছে—তাহার আকৃতিতে ও পোষাক-পরিচ্ছদে একটা বে-পরোয়া যুদ্ধং দেহি মনোভাব উগ্রভাবে প্রকট হইয়াছে। বরদাসুন্দরীর সঙ্গে একটু মৃদু কথাকাটাকাটির পর ও ব্রাহ্মবাড়ীতে জলগ্রহণে রূঢ় অসম্মতি জানানর পর হারাণের সহিত তাহার তুমুল তর্কযুদ্ধ বাধিয়াছে। সুচরিতা গোরার উদ্ধত ভাব-ভঙ্গীতে উত্তেজিত হইয়া হারাণকে তাহাদের পক্ষে সেনাপতিপদে মনে মনে বরণ করিয়াছে। কিন্তু এই শক্তিপরীক্ষায় গোরার শ্রেষ্ঠত্ব ও হারাণের তুচ্ছতা এত নিঃসংশয়িতভাবে প্রমাণিত হইল, যে যুদ্ধশেষে হারাণের প্রতি সুচরিতার মনোভাব শ্রদ্ধা হইতে লজ্জা ও অবজ্ঞায় নামিয়া আসিল। সে গোরার প্রতি বিরূপতার পরিবর্তে গূঢ় আকর্ষণবোধ করিল এবং সমস্ত চিন্তা ও কাজের মধ্যে একটা অনির্দেশ্য বেদনা অনুভব করিল। হয়ত তাহার উপস্থিতি সম্বন্ধে গোরার সম্পূর্ণ উপেক্ষা শুধু তাহার আত্মসম্মানে আঘাত হানিল না, আরও কোন কোমল অনুভূতিকেন্দ্রে বেদনা জাগাইল। এই আপাত-অহেতুক, মাত্রাতিরিক্ত মনঃপীড়াই উন্মেষোন্মুখ প্রেমের প্রথম অলক্ষ্য পদসঞ্চার।

বিনয় আবার যখন পরেশবাবুর ঘরে আসিয়াছে, তখন সুচরিতা বিনয়ের সহিত আলোচনার দ্বারাই গোরা সম্বন্ধে তাহার কৌতূহলকে পরিতৃপ্ত করিতে চাহিয়াছে। বিনয় স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা সম্বন্ধে গোরার যে তীব্র আপত্তি তাহার একটা আদর্শগত ব্যাখ্যা দিয়া তাহার অনন্যতাকে রুচিকর রূপে ফুটাইয়াছে। বিনয়ের ভক্তি-ভাষ্যের মধ্য দিয়া গোরাচরিত্র আরও দীপ্ত মহিমায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে।

১৫ পরিচ্ছেদে বিনয় ও গোরা অন্তরঙ্গতার নিবিড়তম পর্যায়ে পরস্পরের অতি-সন্নিহিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ে গোরার অভিভবশীলতার পরিবর্তে তাহার গ্রহণশীলতাই আশ্চর্য ব্যতিক্রমের মত ফুটিয়াছে। বিনয়ের প্রতি মনে মনে বিরূপ ভাবপোষণের জন্য গোরা স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায় তাহার প্রতি একটা বিশেষ টান অনুভব করিয়াছে। এই অধ্যায়ে বিনয় নিজ অন্তরে প্রেম-উন্মেষের অপরূপ মাধুর্য গোরার নিকট মেলিয়া ধরিয়াছে এবং গোরাও এই নূতন আবির্ভাবকে যোগ্য মর্যাদা দিয়া উহার সত্যতা স্বীকার করিয়াছে। বিনয়ের চোখে এই প্রেমাঞ্জন সমস্ত পরিচিত সংসারে এক অলৌকিক সৌন্দর্য ও অর্থগৌরব মাখাইয়া দিয়াছে—কাব্যবর্ণিত প্রেম-চেতনা তাহার জীবনে প্রত্যক্ষ সত্য হইয়া সমস্ত বিশ্বজগৎকে মায়াময় করিয়া তুলিয়াছে। গোরা এই নারীপ্রেমের মহিমাকে লঘু না করিয়া স্বদেশপ্রেমকে উহার যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে খাড়া করিয়াছে, কিন্তু তাহার সাধনাকেই কল্পনাচক্ষে দেখিয়া উহাকে এক জ্যোতির্ময় ভবিষ্যতের পূর্বসূচনা-রূপে শ্রেষ্ঠত্বের অভিনন্দন জানাইয়াছে। বিনয়ের সত্য ও গোরার সত্য এক অনাগতকালে যে বৃহত্তর যৌগিক সত্যে এক হইয়া উঠিবে ভবিষ্যতের এই ছবি তাহার মানসনেত্রে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। গোরা ও বিনয়ের মধ্যে আর কোথাও পারস্পরিক বোঝা-পড়া এমন একান্ত হইয়া দেখা দেয় নাই। বিনয়ের অনুভবের গভীরতা গোরার মনে সংক্রামিত হইয়া উহার দেশপ্রেমের আদর্শকে প্রভাবিত করিয়াছে ও উভয় প্রকার প্রত্যয়ের মধ্যে সমন্বয়ের সম্ভাবনার ঈষৎ আভাস দিয়াছে। গোরার শেষ অভাবনীয় পরিণতির যদি কোন বীজ থাকে, তবে এখানেই উহার অস্ফুট সূচনা অনুভবগম্য।

গোরার ভাবমূর্তি ত্রিবিধ উপায়ে সুচরিতার অন্তরে ভাস্বর হইয়াছে —প্রথমতঃ বিনয়ের পরোক্ষ-প্রশস্তি, দ্বিতীয়তঃ গোরার দুর্দম ব্যক্তিসত্তার

অভিঘাত, আর তৃতীয়তঃ সুচরিতার নিভৃত স্মৃতিরোমন্থন ও ধ্যানমুগ্ধ কল্পনার বর্ণবিন্যাস। এই তিন রকম উপাদানে সুচরিতার মনের গভীরে গোরার প্রভাব ক্রমশঃ দুর্নিরোধ্য শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে। ইহাদের সহিত বাহিরের প্রতিকূলতা যুক্ত হইয়া তরুণীর ভাবাবেগের মধ্যে নীতিগত নিষ্ঠার ও সংকল্প-দৃঢ়তার অনুপ্রবেশ ঘটাইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজ ও উহার প্রতিনিধি হারাণ ও বরদাসুন্দরীর এবং হিন্দুসমাজের প্রতিনিধি হরিমোহিনীর প্রতি বিমুখতায় গোরার আকর্ষণ অজ্ঞাতসারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। হয়ত বা হারাণ ও বরদাসুন্দরীর স্নেহহীন অভিভাবকত্ব সে উপেক্ষা করিতে পারিত। কিন্তু হরিমোহিনীর স্নেহ ও মূঢ় সংস্কারের অত্যাচার তাহার অসহ্য হইল। হরিমোহিনীর নির্বন্ধাতিশয্য ও কূটকৌশল স্বয়ং গোরার নিকট ভবিষ্যৎ প্রত্যাহারপত্র আদায় করিয়া সুচরিতার নিঃসঙ্গতাকে আরও ঘনীভূত করিয়াছে। এই সঙ্কটলগ্নে যখন গোরা তাহার জন্মরহস্যের অভাবনীয় উদ্‌ঘাটনে সমস্ত ঐতিহ্যাশ্রয় হইতে ছিন্নমূল হইয়া মানবাত্মার একক অধিকারে তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন সুচরিতার সমস্ত অন্তরের সংগ্রাম শেষ হইয়া গিয়াছে। দৈবের এই দাক্ষিণ্য সে সব সংশয়মুক্ত হইয়া অঞ্জলি পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছে। তাহার এই নীরব, প্রশ্নহীন আত্মনিবেদন তাহার চিত্তপ্রস্তুতির পূর্ণতার উপরই আলোকপাত করে। কিন্তু এই পরম প্রশান্ত নির্বাণের পূর্বে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের স্তরগুলি অনুধাবন ও অতিক্রম করিতে হইবে।

২০ অধ্যায়ে গোরার সঙ্গে সুচরিতার দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার। এখানে হারাণবাবুর উপস্থিতিতে সুচরিতার বিরূপতার প্রতিক্রিয়ায় গোরার বৈদ্যুতী আকর্ষণ প্রবলতর হইয়াছে। এবার তর্কের উপলক্ষ্য হইল ম্যাজিস্ট্রেটের নিমন্ত্রণ ও পরেশবাবুর পরিবারের এই নিমন্ত্রণে যোগদানসম্পর্কিত। এই অবমাননা-সূচক আহ্বানের বিরুদ্ধে গোরার সমস্ত সত্তা আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছে। সে তাহার সর্ববিধ বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তি, তাহার সমস্ত সত্তার নিগূঢ় প্রাণশক্তি নিয়োজিত করিয়া উহার প্রতিবাদ জানাইয়াছে। এই দ্বিতীয় সাক্ষাতে গোরা তাহার স্বভাবসিদ্ধ নারীবিমুখতা অতিক্রম করিয়া সুচরিতার দিকে ভাল করিয়া চাহিয়াছে ও তাহার সুকুমার বুদ্ধিদীপ্ত মুখশ্রীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়াছে। এই তাহার ভিন্নসমাজের শিক্ষিতা নারীর প্রতি প্রথম আকর্ষণবোধ। সুচরিতার দিকে চিত্ত-আলোড়ন আরও

সর্বাত্মক ও সত্তাবিলোপী তরঙ্গে উচ্ছ্বসিত হইয়াছে। চন্দ্রোদয়ে সমুদ্র-স্ফীতির ন্যায় সে এক অহেতুক আবেগের অদম্য উচ্ছ্বাসে আত্মহারা ও বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে। মানুষের বাণীর মধ্য দিয়া তাহার জ্যোতির্ময় আত্মার দীপ্ত প্রকাশ সুচরিতাকে দিশাহারা করিয়াছে। সুচরিতার প্রতি গোরার ব্যক্তিগত আবেদন, তাহার সম্বন্ধে তাহার উদারতম প্রত্যাশা সমস্ত যুক্তিতর্কের সীমা ছাড়াইয়া তাহার সত্তার গভীরে এক অজানা ভাবমুগ্ধতার সঞ্চার করিয়াছে ও গোরার অনুরোধ যেন মন্ত্রশক্তির মত তাহার সমস্ত চেতনায় পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। তাহার সমস্ত ভাবকেন্দ্র যেন এক সাংঘাতিক ভূকম্পনে নড়িয়া উঠিয়াছে। বৃহত্তর অজ্ঞাত জগতের আকস্মিক যবনিকা-উন্মোচন তাহাকে অকল্পিত ভাবের প্লাবনে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে।

ইহার ঠিক পরের অধ্যায়ে (২১) গোরা এক আত্মবিস্মৃত ভাবতন্ময়তায় জালে বন্দী হইয়া তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ স্বগতচিন্তার অলক্ষ্য তন্তুতে জড়াইয়া পড়িয়াছে। এই ভাবাবিষ্টতার ফাঁকে ফাঁকে প্রকৃতির মোহময় কোমল আকর্ষণ সুচরিতার স্মৃতিকে আশ্রয় করিয়া তাহার অন্তরের গভীরে কুহকমন্ত্র সঞ্চারিত করিয়াছে। এক মায়াবিনী ছায়ামূর্তি যেন তাহার সমস্ত সচেতন মন ও কর্মশক্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া তাহার চিত্তলোকে কুহেলি-আবরণ বিছাইয়াছে। গোরা এই মুহূর্তে এক অস্বীকৃত স্বপ্নময়তার নিকট নিজ বুদ্ধি ও কর্মসাধনার প্রখর প্রত্যয়কে বিসর্জন দিয়াছে। সারারাত্রি আচ্ছন্নভাবে থাকিয়া প্রভাতে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সে নিজ নির্মোহ কর্মসংকল্পকে আবার নব জীবনযুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। মদির চিত্তবিভ্রমের প্রবল প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সে পরিচিত আবেষ্টন হইতে নিজেকে সবলে ছিনাইয়া লইয়াছে ও নিরুদ্দেশযাত্রার দুঃসাধ্য ব্রতসাধনে তাহার সমস্ত ভাবাবেশকে ছিন্নভিন্ন করিয়াছে। তাহার পল্লীভ্রমণের গূঢ় প্রেরণা হইল সুচরিতার সান্নিধ্য হইতে নিজের যথাসম্ভব, স্থানে ও কালে, অপসারণ। তাহার বলিষ্ঠ প্রকৃতি এই ভাবেই সমস্ত অবাঞ্ছিত মোহপাশ হইতে মুক্তি খুঁজিয়াছে। ইহার শেষ ফল হইল সোজাপথ ছাড়িয়া ঘুরপথে অভাবিত উপায়ে সুচরিতার হৃদয়ের আরও কাছাকাছি পৌছান।

গোরার কারাবাসের অবসরে সুচরিতার জীবনে নানা বিচিত্র সংঘাত

পুঞ্জীভূত হইয়াছে ও এই সমস্ত অপ্রত্যাশিত ভাবপ্রবাহকে স্বীকার করিতে ও তাহার জীবনধর্মের সহিত মিলাইয়া লইতে তাহার মনে অন্তঃসমীক্ষার জটিল আবর্ত জাগিয়াছে। প্রথম, হরিমোহিনীর আবির্ভাব ও বরদাসুন্দরীর সুরক্ষিত ব্রাহ্মদুর্গে কুণ্ঠিত, আত্ম-অপরাধী হিন্দু-আদর্শের আশ্রয়ভিক্ষা। মরুভূমিতে এক বিন্দু জলের ন্যায় হরিমোহিনী তাহার হিন্দু পূজাবিধি ও আচারনিষ্ঠা লইয়া বরদাসুন্দরীর সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ পরিবেশে সূচ্যগ্রপরিমিত স্থানের জন্য করুণ আবেদন লইয়া দাঁড়াইয়াছে। হরিমোহিনীর এই অনধিকারপ্রবেশ একদিকে যেমন গোঁড়া ব্রাহ্মপরিবারে একটা বিরক্তির ঝড় তুলিয়াছে, অন্যদিকে তেমনি সুচরিতার মনে হিন্দুধর্মের প্রতি একটা অনুকূল মনোভাব অঙ্কুরিত করিয়া সেখানে একটা সূক্ষ্ম বিদারণরেখার সঞ্চার করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, হারাণবাবুর চড়াসুরের অধিকারদাবী ও ললিতা-বিনয়ের ব্যাপার লইয়া ব্রাহ্মসমাজের বিবেকরক্ষকরূপে তাহার দণ্ডদাতা ও বিচারকের উদ্ধত ভূমিকা সুচরিতার নীরব সহিষ্ণুতাকে নিঃশেষিত করিয়া তাহার বিদ্রোহকে জাগাইয়াছে। হারাণবাবুর দ্বারা পরেশবাবুর প্রশ্রয়ের সমালোচনা ললিতার রোষ ও সুচরিতার স্পষ্ট প্রতিবাদ উদ্দীপ্ত করিয়াছে। এইভাবে ধীরে ধীরে সুচরিতার ভাবকেন্দ্র যে নূতন অক্ষরেখার চারিদিকে আবর্তিত হইতে চলিয়াছে তাহা ক্রমশঃ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ললিতার বিরুদ্ধে ব্রাহ্মসমাজের হীন আক্রমণ ললিতার মনে আগুন ধরাইয়া দিয়াছে, সুচরিতার মনেও চাপা বিক্ষোভের ধোঁয়া ছড়াইয়াছে। হরিমোহিনীর প্রতি বরদাসুন্দরীর আক্রোশ ও তাহার নিরুপায় অসহায়তা, ও ললিতার বিবাহব্যাপারে পরেশবাবুর সহিত তাঁহার সমস্ত পরিবারের সম্পর্কচ্ছেদ সুচরিতার বিক্ষোভকে আরও মর্মভেদী করিয়া তাহাকে অতীতের উত্তরাধিকারমুক্ত এক নবজীবনারম্ভের জন্য প্রস্তুত করিয়াছে। আনন্দময়ীর সঙ্গে তাহাদের পরিচয়ও তাহাদের মানসদিগন্তের প্রসার ঘটাইয়াছে, যদিও আনন্দময়ীর মনোবেদনা ও জীবনাদর্শের মূলসূত্রটি তাহাদের অনধিগম্যই রহিয়া গিয়াছে। পরেশের আশ্রয়চ্ছেদ ও স্বাধীন সংসার-প্রবেশও সুচরিতার জীবনে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছে। এইসব সংঘাতসংবেগের বিচিত্র প্রভাবের ফলে সুচরিতার চিত্ত জীবন-বোধের এক স্তর হইতে অন্য এক উচ্চতর, নিগূঢ়তর স্তরে উদ্বর্তিত হইয়াছে

ও এই ছোটখাট পরিবর্তন-তরঙ্গগুলি এক বৃহত্তর, বৈপ্লবিক রূপান্তরের সমুদ্রোচ্ছ্বাসে সংহত হইবার জন্য প্রতীক্ষা করিয়াছে। এই ক্ষুদ্র, বিচ্ছিন্ন রং এর ছোপ ও তুলিকার রেখাজাল এক শিল্পীর আঁকা নূতন জীবনছবির ভূমিকারূপে উপন্যাসে পরিকল্পিত হইয়াছে। এই সমস্ত তথ্যসন্নিবেশে, ঘটনাবিন্যাসে ও ইহাদের সঙ্গে জড়িত মানসচেতনার জটিল বয়নশিল্পে লেখকের অপূর্ব গ্রন্থনশক্তি ও জীবনাভিজ্ঞতার পরিচয় নিহিত।

কারামুক্তির পরেই গোরার সঙ্গে বিনয়ের হৃদয়সমস্যাঘটিত প্রশ্নটি উঠিয়া পড়িল। তাহাতে দেখা গেল যে সুচরিতার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ঔৎসুক্য সত্ত্বেও ব্রাহ্মসমাজের প্রতি বিরূপতা তাহার অক্ষুণ্ণ আছে। সে বিনয়ের অবশ্য-কর্তব্যরূপে ললিতাকে বিবাহ করার প্রস্তাবে পূর্বের ন্যায়ই অনমনীয় বিরুদ্ধতা দেখাইয়াছে। প্রভেদের মধ্যে বিনয় তাহার সত্যানুভূতির জোরে আর গোরার ইচ্ছাশক্তির নিকট পরাজয় বরণ না করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই বাদানুবাদের ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, গোরা বিনয়কে বর্জন করিবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছে। ইহার পরে গোরার অভিনন্দন ও প্রায়শ্চিত্তবিধান উপলক্ষ্যে যে তুমুল আয়োজন চলিল তাহার কোলাহলে সে মনের গভীরে প্রেমের যে উৎকণ্ঠা মৃদু বেদনার মত চাপা আছে, তাহার প্রতি মনোনিবেশের অবসর পাইল না। ঔপন্যাসিক অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শিতার সহিত লক্ষ্য করিয়াছেন যে গোরা যখন বিনয়ের সঙ্গে ব্রাহ্মবিবাহের বিরুদ্ধে তর্কযুদ্ধে ব্যাপৃত ছিল, তখন তাহার আবেগের প্রবলতা কিছুটা নির্জ্ঞান আত্মদ্বন্দ্বপ্রভাবিত। জেলের অবরোধের মধ্যেও সুচরিতার ধ্যানস্মৃতি যে গোরার মনকে অহরহ আবিষ্ট করিত, তাহা তাহার মুক্ত জীবনে বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিয়া যে সুচরিতার মূর্তিতে আবির্ভূত হইবে ইহা গোরা কোনদিনই ভাবে নাই। এই উচ্ছ্বাসের প্লাবনমুহূর্তে সুচরিতা ভারতীয় গৃহলক্ষ্মীর প্রতীকরূপে তাহার দেশ-প্রেমের সহিত অভিন্ন ভাবগৌরবে উদ্ভাসিত হইল। তাহার প্রথাসিদ্ধ সম্বোধনের মধ্যে একটা সদ্যোঅনুভূত স্তবের সুর বাজিয়া উঠিল। সুচরিতার ক্ষেত্রেও গোরার কারাবাসশীর্ণ, ক্লিষ্ট-মলিন মূর্তিটি একটি আবেগকম্পিত ভক্তির শিখা জ্বালাইয়া তাহার নূতন মনোভাবের সন্ধান দিয়াছে। বিদায়ের সময় সুচরিতা বিনয়কে যাইবার আমন্ত্রণ জানাইল, কিন্তু গোরাকে এই আমন্ত্রণের অন্তর্ভুক্ত করিতে সঙ্কোচ বোধ করিল। গোরা এই প্রথম তাহার প্রখর ব্যক্তিত্বের জন্য ও সকলের সহিত সহজভাবে মিশিবার অক্ষমতায় ক্ষুব্ধ হইয়াছে।

কারামুক্তির পর সুচরিতার সমবেদনা-জ্ঞাপনে গোরার মনে একটি রুদ্ধ দ্বার যেন এক অদম্য আবেগের প্রবল ঝাপটায় উন্মুক্ত হইয়া গেল। তাহার সমস্ত অন্তর লৌহশলাকা দ্বারা আকৃষ্ট চুম্বককণাবৎ সুচরিতার দিকে অনিবার্য বেগে ধাবিত হইল। পরের দিনই অপরাহ্ণে গোরা সুচরিতার নূতন বাড়ীতে হাজির হইয়াছে। প্রথমতঃ হরিমোহিনী কর্তৃক ব্রাহ্মণ্যতেজের হোমশিখা-রূপে চর্চিত হইবার পর গোরা সুচরিতার সহিত নিভৃত আলাপে মুখোমুখি বসিয়াছে। আলোচনার আরম্ভ স্বভাবতঃই বিনয়-ললিতার বিবাহসম্ভাবনার উপলক্ষ্যে। গোরা এ বিষয়ে সুচরিতাকে একটু অনুযোগ করিলে সুচরিতা জবাব দিয়াছে যে ঐরূপ আচরণই তাহার পক্ষে স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত। তাহার উত্তরে গোরা সমস্ত আলোচনাকে এক আবেগঘন ভাবলোকের উর্ধ্বস্তরে তুলিয়া দিয়াছে। সে সুচরিতার অনন্যতায় তার অকুণ্ঠ আস্থা নিবেদন করিয়াছে। তর্কের মধ্যে সে হিন্দু আচারনিষ্ঠতা ও সংরক্ষণ-শীলতার এক অপূর্ব রমণীয় চিত্র আঁকিয়াছে। হিন্দু কোন সম্প্রদায় নয়, সমস্ত পরস্পরবিরোধী ধর্মমতের উদার মিলনভূমি, তাহার সঙ্কীর্ণতা আত্মরক্ষার নিগূঢ় প্রয়োজনে ও ব্রাহ্মধর্ম উহার ক্ষুদ্রদৃষ্টি লইয়া সর্বসমন্বয়কারী বিরাট হিন্দুধর্মের আশ্রয়শক্তিকে ক্ষুন্ন করিতেছে, যে ধর্ম সমস্ত মানুষের বৈচিত্র্য স্বীকার করিয়া প্রত্যেকেরই ক্ষুধা মিটাইতেছে, তাহার সেই লোকপালিনী মূর্তিকে বিকলাঙ্গ করিতেছে—এই জাতীয় প্রত্যয় ও মননের সমাহারপুষ্ট আবেদনে সে তাহাকে অভিভূত করিয়াছে। তর্ক ও বিষয়ের গণ্ডীকে অতিক্রম করিয়া এক অজেয় সমগ্র মানবাত্মা যেন সুচরিতার গভীর মর্মমূলে নিজ আসন প্রতিষ্ঠিত করিল। সম্মোহিতচিত্ত সুচরিতার নিকট গোরা হিন্দুধর্মের সার্বভৌমতা উপলব্ধির জন্য মর্মস্পর্শী আবেদন জানাইয়া এই সাক্ষাৎকার শেষ করিয়াছে। বিদায়ের ঠিক প্রাক্-মুহূর্তে গোরা অসাধারণ ভাবমত্ততা ও বাগ্মিতার দ্বারা সুচরিতার সহিত সমস্ত ক্ষুদ্র ব্যবধান দূর করিয়া তাহার প্রতি অন্তরঙ্গ সম্বোধন করিয়াছে ও যুক্তিতর্ক ছাড়িয়া এই অন্তরঙ্গতার দাবীতে হিন্দুধর্মের সহিত সত্য-সম্পর্কস্বীকারের পবিত্র দায়িত্ব অমোঘ প্রত্যাদেশের মত তাহার উপর ন্যস্ত করিয়াছে। ঔপন্যাসিক সুচরিতার উপর ইহার ঐন্দ্রজালিক প্রভাবটি চমৎকারভাবে ফুটাইয়াছেন। এই অপসরণকালীন তীরক্ষেপে (Parthian shot) তাহার লক্ষ্যভেদের বিজয় সম্পূর্ণ হইয়াছে।

আবার ৬০ পরিচ্ছেদে বিজয়োন্মত্ত গোরা সুচরিতার অন্তরদুর্গে হানা দিয়াছে। হরিমোহিনী আবার সুচরিতাকে প্রতিমা-পূজার দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য সুচরিতার সহিত তাহাকে ঠাকুরঘরে আমন্ত্রণ করিয়াছে। গোরা যখন ঠাকুরকে প্রণাম করিয়াছে, তখন সুচরিতা সসঙ্কোচে তাহার একটুকু ক্ষীণ সংশয় জানাইয়াছে। গোরার উত্তর প্রস্তুতই ছিল। সে তাহার চিরাভ্যস্ত জোরের সহিত মূর্তিপূজার সমর্থন করিয়াছে। গোরা বলিয়াছে যে এই ভক্তিনিবেদন ঠিক বিশ্বাসের ব্যাপার নয়, ইহা দেশের অগণিত ভক্তের সহিত একাত্মতাবোধ। পাথরের দেবতা যখন হৃদয়ের দেবতারূপে অভিষিক্ত হন, অসীম যখন ভাবের অসীমতার প্রতীকরূপে সীমাবন্ধন স্বীকার করিয়াও নিজ অসীমত্ব নূতন করিয়া প্রতিষ্ঠা করেন, তখন তিনি ভগবানের সার্থক প্রতিরূপ। পাথরের প্রতিমার মধ্যে ভগবানের স্পর্শ না থাকিলে, সুচরিতার সর্বহারা মাসী কেমন করিয়া তাঁহার মধ্যে চিরজীবনের সান্ত্বনা ও আশ্রয় পাইলেন?

সুচরিতার প্রশ্নের উত্তরে গোরা স্বীকার করিয়াছে যে ঈশ্বরলাভের কোন সত্য আকূতি তাহার মধ্যে জাগে নাই, এবং তাহার এই ধর্মবিষয়ক তর্ক কোন অন্তরঙ্গ-অনুভূতিপ্রসূত নয়, কেবল ধর্মতত্ত্বে একটা বুদ্ধিগ্রাহ্য রমণীয়তা-আরোপের শিল্পবোধপ্রণোদিত। দেশের মানুষের সহিত একাত্মতা-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই তাহার এই দেশপ্রচলিত ভক্তিপ্রকাশের ধারাটির প্রতি শ্রদ্ধা ও সমর্থন। মূঢ় পৌত্তলিকতার মধ্যে যে জ্ঞান ও ভক্তিসাধনা প্রচ্ছন্ন আছে তাহাকে প্রচার ও প্রকটিত করিতেই তাহার সর্বশক্তি নিয়োজিত। সুচরিতাকেও এই দেশবাসীর আত্ম-উপলব্ধির পবিত্র ব্রতে তাহার সঙ্গিনী হইবার জন্য সে দৃঢ় প্রত্যয়ের সহিত মিনতির সুর মিশাইয়াছে। পুরুষ এই নবপ্রতিমানির্মাণের মালমসলা যোগাইতে পারে, কিন্তু নারী না থাকিলে ধর্মরূপিণী দেশমাতৃকার অর্ঘ্যসম্ভার ও দীপবরণ অসম্পূর্ণ থাকিতে বাধ্য।

এই দৈব প্রত্যাদেশের মত নিঃসঙ্কোচ আহ্বানে সুচরিতার সমস্ত নারী-প্রকৃতি, যেন ভূমিকম্পের প্রমত্ত শক্তিতে পৃথিবীর স্থিরতার মত, আগাগোড়া কাঁপিয়া উঠিয়াছে। গোরারও আত্মসংযম সুচরিতার এই বিহ্বল তন্ময়তার ছোঁয়াচে কোন্ সুদূরের ধ্যানে পরিবেশকে ভুলিয়াছে ও নিজহৃদয়ের অতল গভীরতা ও সুচরিতার অশ্রুপূর্ণ চোখের সমস্ত আত্মবিস্মৃত ঔৎসুক্য নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত রূপে অনুভব করিয়াছে। এই আবেগস্তম্ভিত মুহূর্তের পর গোরা যেন তড়িতাহত হইয়া নিমেষে অন্তর্হিত হইয়াছে।

উপর্যুপরি তৃতীয় দিনেও এই অতৃপ্ত হোমশিখা যজ্ঞসমিধের আত্মসাৎ-প্রয়াসকে সম্পূর্ণ করিবার জন্য উহার সমীপবর্তী হইয়াছে। আবার বিনয়-প্রসঙ্গে হৃদয়মন্থনক্রিয়ার সুরু। সুচরিতা গোরার সমাজচিন্তার সর্বগ্রাসী একাধিপত্যপ্রচারে সংশয় প্রকাশ করিয়াছে। গোরা সমাজের প্রতি শ্রদ্ধারক্ষার অগ্রাধিকারের নীতিতে তাহার আপোষবিরোধী মনোভাবের যৌক্তিকতা দেখাইয়াছে। সুচরিতা তদুত্তরে শ্রদ্ধা যে সত্যলাভের অভ্রান্ত পন্থা নয় ও তাহার পক্ষে পৌত্তলিকতাকে শ্রদ্ধা করা অসম্ভব এই যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছে। গোরা একটু অন্তঃসমীক্ষার পর সমস্ত হিন্দু আচার-সংস্কারে তাহার অকুণ্ঠ-বিশ্বাস যে অকৃত্রিমপ্রত্যয়সঞ্জাত নয়, পরন্তু অপরের অশ্রদ্ধার পালটা জবাব, ইহা ভূমিকা হিসাবে উল্লেখ করিয়া ধর্মে কল্পনাবৃত্তির যে একটা মুখ্য স্থান আছে, প্রতিমাপূজায় জ্ঞান ও ভক্তির সহিত কল্পনার যে একটা অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছে এই অভিমতই সুচরিতাকে জানাইয়াছে। গ্রীস-রোমের সঙ্গে ভারতে মূতিপূজার পার্থক্য-প্রসঙ্গে তাহার মন্তব্য যেমন সূক্ষ্ম তেমনি যুক্তিনিষ্ঠ। পাশ্চাত্ত্য দেশে যাহা শিল্পসৌন্দর্যবোধমূলক, ভারতে তাহা ভক্তি ও অধ্যাত্মসত্যের রূপময় প্রকাশ। যুগে যুগে পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াও যে ভারতের শাশ্বত ঐতিহ্যের অনুবর্তনেই এই পরিবর্তন আনিতে হইবে, এই ঐতিহাসিক সত্যের উপরই সে জোর দিয়াছে। সুচরিতার ক্ষীণ সংশয় মেঘমন্দ্রকণ্ঠে উদ্‌গীরিত এই একনিষ্ঠ প্রত্যয়ের নিকট স্তব্ধ হইয়াছে, জোয়ারস্রোতে ক্ষুদ্র বাধার বাঁধ কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। শেষ পর্যন্ত সুচরিতার নিজ ব্যক্তিগত অযোগ্যতামূলক দ্বিধাজ্ঞাপন গোরার প্রবল আশ্বাসের সংবেগে ঝড়ের নিকট খড়কুটার মত ছিন্নভিন্ন হইয়া নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। দীর্ঘ ভাববিনিময়ের অবসানে সমাপ্তপ্রায় অন্তরমিলনের উপর এক ভাবঘন নীরবতার যবনিকা নামিয়া আসিয়াছে। বোঝান ও বোঝার পালা শেষ হইয়া নিঃশব্দতার আড়ালে এই নব আহরণের সত্তাপরিণতিতে রূপান্তর আরম্ভ হইয়াছে।

এই ক্রান্তিলগ্নে হঠাৎ হরিমোহিনীর প্রবেশে ও তাহার পরুষ শাসনবাক্যে ধ্যানমগ্ন তপস্বিযুগলের তপোভঙ্গ হইয়াছে। গভীরতম আত্ম-বিনিময়ের যজ্ঞভূমিতে অভিভাবিকার ছদ্মবেশে যজ্ঞবিঘ্নকারী অসুরের আবির্ভাব ঘটিল। হিন্দু আদর্শের সার্বভৌম উদার আদর্শকে ব্যঙ্গ করিয়াই যেন হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার তীক্ষ্ণ ভর্ৎসনা মিলন-সুষমার রাগিণীকে ছিন্ন ভিন্ন

করিয়া দিল। হরিমোহিনী প্রবেশ করিয়াই পালটা আক্রমণ চালাইলেন। তিনি হিন্দুধর্মের লৌকিক দিকটার কথাই গোরাকে তিরস্কারের সুরে স্মরণ করাইয়া দিলেন। সুচরিতা শুধু যে একটা ভাবসর্বস্ব, আদর্শমুগ্ধ আত্মা নয়, তাহার যে সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধন আছে ও তাহাকে হিন্দুসমাজে স্থানলাভের জন্য বিশেষ আচরণবিধির অনুসরণ করিতে হইবে এ সম্বন্ধে তিনি গোরার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। এবং গোরার গোঁড়া হিন্দুয়ানীর দোহাই দিয়া তাহার প্রতিবাদের পথ বন্ধ করিয়া দিলেন। সুচরিতার বিবাহ-সম্বন্ধেও যে তাঁহার একটা সুচিন্তিত পরিকল্পনা আছে তাহা জানাইতেও তিনি ভুলিলেন না। গোরা এই অতর্কিত আক্রমণে একেবারে বিমূঢ় হইয়া পড়িল। সে বরাবরই আক্রমণ করিয়া আসিয়াছে, এইবার প্রথম সে আক্রমণের বিষয় হইল। একচক্ষু হরিণের মত সে কেবল ব্রাহ্মসমাজের আক্রমণ প্রতিহত করিতে ব্যস্ত ছিল, হিন্দুসমাজের দিক্ হইতেও সে যে শরবিদ্ধ হইতে পারে এ সম্ভাবনাও তাহার মনে উদয় হয় নাই। গোরার এই নাটকীয় ভূমিকা-পরিবর্তন উপন্যাসের মধ্যে বিস্ময়রসকে ঘনীভূত করিয়াছে।

গোরার আদর্শদীক্ষার এই দৃপ্ত বিজয়াভিযান অপ্রত্যাশিত প্রতি-আক্রমণে দিক্‌পরিবর্তনে বাধ্য হইল। অঙ্কুশবিদ্ধ গজরাজের মত সে ক্ষণিকের হতবুদ্ধিভাব কাটাইয়া নূতন দিগন্ত অভিমুখে ধাবিত হইল। সে অগ্রগতিতে বাধা পাইয়া প্রথম আনন্দময়ীকে বিনয়ের বিবাহে যোগদান হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য প্রাণপণে সচেষ্ট হইয়াছে। কিন্তু আনন্দময়ীর উদার গ্রহণশীলতার আদর্শবাদ গোরার বর্জননীতি অপেক্ষা কম শক্তিশালী নয়, কাজেই এখানেও তাহার দুর্জয় ইচ্ছাশক্তি জয়ী হইতে পারে নাই। পরেশবাবু যখন বিনয়ের বিবাহে তাহার সহৃদয় সহযোগিতার জন্য গোরাকে অনুরোধ জানাইয়াছেন তখন গোরা অবিচল চিত্তে তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। এই উপলক্ষ্যে উঁহাদের মধ্যে যে যুক্তিবিনিময় হইয়াছে তাহার ভিতর উভয়ের সত্যবিচারের পার্থক্যটি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। গোরার দাবী যে সমাজের সমস্ত অনুশাসন নির্বিচার শ্রদ্ধার সহিত মানিয়া লইলেই তবে উহার অন্তর্নিহিত গূঢ় অভিপ্রায়টি অনুভবগম্য হইবে। পরেশবাবু মনে করেন যে ব্যক্তিস্বাধীনতার বিদ্রোহের আঘাতেই সমাজের বিকার স্পষ্ট হইয়া উঠিবে ও বিকারের দ্বারা আচ্ছন্ন নিত্য সত্যের মূর্তি সমস্ত মালিন্যমুক্ত হইয়া অকৃত্রিম বিশুদ্ধিতে উদ্‌ভাসিত হইবে। শেষ

পর্যন্ত গোরার অসম্মতিতে পরেশবাবু সমস্ত সমাজের বিরুদ্ধে বিবাহের দায়িত্বগ্রহণের সঙ্কল্প প্রকাশ করিলেন। অবশ্য তিনি জানিলেন না যে আর একজন বিদ্রোহী নিঃশব্দে তাঁহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া এই অপ্রীতিকর, কিন্তু অপরিহার্য কর্তব্যের অংশ গ্রহণ করিবে। দুইটি বৃহৎ সমাজের সমবেত প্রতিকূলতার স্রোতের মধ্যে দুইটি নিঃসঙ্গ আত্মা মিলিয়া একটি শান্তি ও আশ্বাসের দ্বীপ রচনা করিবে ও সব কয়েকটি ঝড়-খাওয়া, নীড়-হারা যুগ্ম জীবনকণিকা এখানে তাহাদের নূতন শিকড় মেলিবার ও রসাকর্ষণভূমির সন্ধান পাইবে। গোরা পরেশবাবুর দ্বারা প্রভাবিত না হইলেও তাঁহার সহজ বীরত্বের মর্যাদা বুঝিয়াছে ও অনুচরদের হীন ব্যঙ্গের প্রতি তাহার প্রবল ধিক্কার জানাইয়াছে।

গোরা আবার তাহার অভ্যস্ত জীবনসূত্রটি অনুসরণ করিয়াছে। কিন্তু অন্তরের মধ্যে এক নূতন শূন্যতাবোধ তাহার সমস্ত উৎসাহকে ম্লান করিয়া দিয়াছে। প্রায়শ্চিত্তসভার আয়োজনে সে আপনাকে ব্যাপৃত রাখিয়াছে। কিন্তু এই নিষ্প্রাণ কর্মাড়ম্বরে তাহার অন্তরের কোন সমর্থন মিলিতেছে না। সুচরিতা একদিকে নিজ নবলব্ধ সত্যবোধকে পরেশবাবুর কাছে যাচাই করিতে উৎসুক হইয়াছে, পরেশবাবুর নিত্য ধর্মের আদর্শে তাহার এই অচিরপ্রবুদ্ধ হিন্দুধর্মের প্রতি অনুরাগ কতটা অকৃত্রিম সে বিষয়ে তাঁহার নির্দেশের প্রতীক্ষা করিয়াছে। পরেশবাবু কিছু কিছু নূতন পথের সন্ধান দিলেও উপাসনার দ্বারা উপলব্ধ ভগবৎ-অভিপ্রায়ের আলোকে তাহার মন স্থির করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। সুচরিতা সমস্ত মনপ্রাণ দিয়া গোরাকে কামনা করিয়াছে ও সতীশকে ভবিষ্যৎ জীবনাদর্শ নিরূপণের ব্যপদেশে গোরার প্রতি তাহার অটুট বন্ধনকেই যেন উচ্ছ্বসিত মুক্তি দিয়াছে। সুচরিতার অবস্থাসঙ্কট দেখিয়া যদিও আনন্দময়ী তাহার বিবাহে যোগদানের আমন্ত্রণ প্রত্যাহার করিলেন, তথাপি শেষ পর্যন্ত সে হরিমোহিনীর সমস্ত শাসন উপেক্ষা করিয়া বিবাহ-উৎসবে যোগ না দিয়া থাকিতে পারিল না। অনুকূল মনের শুভ সমাবেশে বিবাহের মিলনানন্দ নিশ্ছিদ্র হইল।

গোরা এই অভাবিত ধাক্কা সামলাইয়া আবার পল্লীভ্রমণে বাহির হইল। এবার সুদূরপ্রয়াণ নয়, নিকট-সঞ্চরণ। পল্লীর জীবনবৃত্ত লক্ষ্য করিয়া গোরা উহার শিথিলতা ও প্রাণশক্তির রিক্ততা সম্বন্ধে নূতন করিয়া সচেতন

হইয়াছে। হিন্দুর বাস্তব জীবন তাহার আদর্শকল্পনা হইতে কত বিভিন্ন তাহা সে মর্মে মর্মে বুঝিয়াছে। বিরুদ্ধমতখণ্ডনের উত্তেজনায়, নিজ মত-প্রতিষ্ঠার একান্ত আগ্রহে সে সমাজকে যে আদর্শবর্ণরঞ্জিত করিয়া চিত্রিত করিয়াছে, সমাজের বাস্তব চিত্র তাহার সহিত সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্ক। হিন্দুর সংহতি অতি ক্ষীণ, কর্মোৎসাহ অত্যন্ত অসাড়, জীবনবোধ অতিমাত্রায় অস্পষ্ট ও প্রেরণাহীন। উহার সহিত তুলনায় মুসলমানসমাজ অনেক অধিক সজীব ও সক্রিয়। এই বাস্তব-উপলব্ধি গোরার সত্যদৃষ্টিকে মোহমুক্ত করিয়াছে ও তাহার আদর্শস্বপ্নাবিষ্টতাকে টুটাইয়াছে। ইহা তাহার আসন্ন চরম মোহভঙ্গের জন্য তাহার ভাবাচ্ছন্ন চিত্তকে কতকটা প্রস্তুত করিয়াছে। প্রতি-বেশের যথার্থ মূল্যায়ন অন্তঃপ্রকৃতির সংস্কারমুক্ত উন্মীলনের পূর্বসঙ্কেত দিয়াছে।

বিবাহের দিন প্রভাতে বিনয় গোরাকে শেষ আমন্ত্রণ জানাইতে আসিয়া তাহার মুগ্ধ মনের নিকট প্রেমানুভূতির নিগূঢ় বিস্ময়, উহার অনির্বচনীয় মাধুর্য ও সমস্ত জীবনকে সুরে ও রসে পূর্ণ করিয়া দিবার অপরূপ ইন্দ্রজাল সম্বন্ধে তাহার হৃদয়-কপাট উন্মুক্ত করিয়াছে। গোরা বাক্যে সাড়া না দিলেও তাহার অবচেতনে প্রেমের যাদুস্পর্শ সংক্রামিত হইয়া তাহাকে যে এই দুরন্ত, মোহময় শক্তির নিকট আত্মনিবেদনের পরম সিদ্ধান্তে প্রণোদিত করিয়াছে তাহা সুনিশ্চিত। আজকের নীরব, ভাবমুগ্ধ শ্রোতা অদূর-ভবিষ্যতে প্রণয়লীলার মুখ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছে। বিনয়ের সার্থকতা গোরার মনে একটা অনির্দেশ্য আকাঙ্ক্ষার বেদনা জাগাইয়া তাহাকে উন্মনা করিয়াছে। আবেগ-তাড়িত হইয়া গোরা শেষবারের মত সুচরিতার রুদ্ধদ্বারে করাঘাত দ্বারা তাহার অধীরতা ও উদ্‌ভ্রান্তি প্রকাশ করিল ও সুচরিতা ললিতার বিবাহ-বাসরে গিয়াছে শুনিয়া আজীবন ব্রতভঙ্গ করিয়াও সেই বিবাহ-সভায় উপস্থিত হইবার অদম্য বাসনা তাহার শুভবুদ্ধিকে ক্ষণিকের জন্য আচ্ছন্ন করিল।

গোরা ও সুচরিতার সম্পর্ক-জটিলতার উন্মোচনের পূর্বে আর একটি নূতন গ্রন্থিতে জড়াইয়া পড়িয়াছে। হরিমোহিনীর প্রখর ব্যক্তিত্ব ও অতন্দ্র অধ্যবসায় শুধু গোরার আক্রমণ প্রতিহত করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। সে অপরিসীম দুঃসাহসের সহিত গোরাকেই নিজ উদ্দেশ্যসাধনের অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিবার কূট সংকল্প অবলম্বন করিয়াছে। সে গোরার আত্ম-কেন্দ্রিকতার দুর্ভেদ্য দুর্গে হানা দিয়া সেখানে চিরবন্দিনী সুচরিতার উদ্ধারের

মন্ত্রজিজ্ঞাসু হইয়াছে। সে গোরাকে দিয়াই প্রত্যাহার-পত্র ও বিবাহের অনুশাসন লিখাইয়া লইতে চাহিয়াছে। অর্থাৎ গোরার নিজের নির্বাসন-দণ্ডে স্বাক্ষর আদায় করিয়া তাহারই প্রভাব তাহার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করিয়াছে। এই প্রস্তাবের স্পর্ধা ও কূটকৌশল হরিমোহিনীর চরিত্রের একটা অভাবনীয় দিক উদ্‌ঘাটন করিয়া আমাদিগকে বিস্ময়চমকিত করে। বরদাসুন্দরীর প্রসাদভিখারিনী আজ স্বাধিকাররক্ষায় অকুতোভয় ইচ্ছাশক্তিতে ও উপায়দক্ষতায় দুর্বার, শক্তিময়ী স্বভাবসম্রাজ্ঞীরূপে আবির্ভূত হইয়াছে। ধর্মোন্মাদ যেমন গোরাকে তেমনি এই অশিক্ষিতা পল্লীনারীকেও এক অমিত তেজঃপুঞ্জের আধাররূপে প্রতিভাত করিয়াছে। তাহার এই দুর্জয় সাহস ও দুরবগাহ কূটনীতিই আমাদের নিকট তাহার শেষ পরিচয়।

এই আঘাতের ফলে গোরা প্রায়শ্চিত্তের দিকে বেশী করিয়া ঝুঁকিয়াছে। প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন তাহার নিকট শুধু কারাবাসের অশুচিবোধখণ্ডনের জন্য নয়, নারীপ্রেমের মোহমুক্তির জন্যও একান্ত হইয়া উঠিয়াছে। ইহা শুধু আচারের ত্রুটি-সংশোধন নয়, গূঢ়তর আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্যপ্রসূত। ব্রাহ্মণোচিত নির্লিপ্ততা হইতে সে স্খলিত হইয়াছিল, বলিয়াই তাহার আত্মা মোহগ্রস্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মণের মত সে সব লৌকিক বন্ধনবিমুক্ত হইয়া নিঃসঙ্গ ভাবসাধনার বেদীমূলে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত ক'রবার দুশ্চর ব্রত গ্রহণ করিয়াছে। দেবার্চনায় ব্রাহ্মণের মূলধন ভক্তিবিহ্বলতা নয়, জ্ঞানগরিমা। সুতরাং নিজ ভক্তিহীনতা তাহার দেবপূজার পক্ষে কোন বাধা বলিয়া সে মনে করিল না।

অবশেষে গোরার প্রায়শ্চিত্তের দিন তাহার বিরক্তিসত্ত্বেও সাড়ম্বরে ঘোষিত হইয়া আসিয়া পড়িল। প্রায়শ্চিত্ত ও দেবপূজার ব্যাপারে পিতা কৃষ্ণদয়ালের তীব্র অসম্মতি ও সুস্পষ্ট বিরোধিতা গোরার মনে এক অজ্ঞাত সন্দেহ ঘনাইয়া তুলিয়াছে। প্রায়শ্চিত্তের সমস্ত আয়োজনের মধ্যে সুচরিতার প্রতি অন্যায়বোধ তাহার অন্তরাত্মাকে মুহুর্মুহু পীড়িত করিতে লাগিল। এই বাহির ও ভিতরের অন্তর্দ্বন্দ্বমুহূর্তে হঠাৎ গুরুতর-পীড়িত কৃষ্ণদয়ালের রোগশয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইবার জন্য গোরার জরুরি আহ্বান আসিল।

কৃষ্ণদয়ালের মৃত্যুসম্ভাবনাকালীন স্বীকারোক্তিতেই গোরার জীবনে একটা যুগান্তর ঘটিয়া গেল। তাহার জন্মরহস্য, তাহার সম্বন্ধে কৃষ্ণদয়ালের দুর্বোধ্য সঙ্কোচ ও আনন্দময়ীর প্রহেলিকাময় নীরবতা সবকিছু হইতেই

যবনিকা উত্তোলিত হইল। গোরা যে তাহার বাপ-মার রক্তসম্পর্কিত পুত্র নয়, মিউটনির কুড়াইয়া-পাওয়া পালিত সন্তান, তাহার যে হিন্দুসমাজের সহিত কোন সংস্পর্শ নাই এই নিদারুণ সত্য তাহার নিকট উদ্‌ঘাটিত হইয়া তাহার সমস্ত অতীত ও ভবিষ্যৎকে এক স্বপ্নমরীচিকায় বিলীন করিয়া দিল। তাহার হিন্দু-আদর্শপ্রতিষ্ঠার জন্য সমস্ত জীবনসাধনা, তাহার প্রতি মুহূর্তের সংগ্রাম, তাহার হৃদয়-সম্পর্কের অবিরত ছন্দ-পরিবর্তন, তাহার অনুরাগ-বিরাগের প্রতিটি স্পন্দন—সবই চক্ষের নিমেষে নিরর্থক হইয়া পড়িল। অভাবনীয় বিস্ময়ের প্রথম ঘোর কাটিয়া গেলে সে এই বজ্রপাতের তাৎপর্য সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিল। তাহার মত স্থিরপ্রতিজ্ঞ, বলিষ্ঠপ্রকৃতি মানুষের পক্ষে এই বিহ্বলকারী নূতন পরিস্থিতির মধ্যে কর্তব্যনির্ণয় করিতে বেশী বিলম্ব হইল না। সে তাহার আজীবন-অনুশীলিত স্বচ্ছ বুদ্ধি ও আদর্শ-সাধনার উজ্জ্বল আলোকে পথ খুঁজিয়া পাইল। তাহার দূরদৃষ্টি সহজেই দিগন্তসীমা পর্যন্ত প্রসারিত হইয়া এই অপরিচিত ভূখণ্ডের মানচিত্রকে এই বিশ্বপরিবেশে যথাযথ বিন্যস্ত করিল।

তাহার প্রথম কাজ হইল পরেশবাবুর নিকট এই চমকপ্রদ সংবাদের পরিবেশন। যেরূপ তীক্ষ্ণ মনীষা ও স্থির প্রজ্ঞার সহায়তায় সে পরিবর্তনের প্রকৃতি ও ফলাফল ব্যাখ্যা করিল, তাহাতেই তাহার দ্রুত সিদ্ধান্তগ্রহণের আশ্চর্য শক্তি প্রকাশিত। সে তাহার অতীত ভ্রম-প্রমাদ সম্বন্ধে পূর্ণসচেতন ও তাহার নূতন সাধনাক্রমনির্ধারণেও সমভাবে দ্বিধাহীন। সে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা স্থির করিয়া ফেলিয়াই পরেশের আদর্শে দীক্ষাগ্রহণে প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে। অসাম্প্রদায়িক ভারতবর্ষের সেবা ও কল্যাণব্রত, জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সমস্ত ভারতবাসীর ভেদবর্জিত ঐক্য-উপলব্ধি, জীবনের বর্জন-বেদনাহীন, স্ববিরোধমুক্ত পরিপূর্ণ বিকাশের আগ্রহ, নির্মোহ সত্যানুসন্ধিৎসা—ইহারাই তাহার নবজীবনের ধ্রুবতারা হইবে। পরেশও এই মাতৃসেবার অধিকার পাইবার আবেদন জানাইয়াছেন। সর্বশেষে সুচরিতার পার্শ্ববর্তী হইয়া গোরা তাহার গুরু-অভিমান সম্পূর্ণ পরিহার করিয়া তাহাকে এই নূতন যাত্রাপথের সহযাত্রিণীরূপে আহ্বান করিল। সুচরিতা তৎক্ষণাৎ এই আবেদনে সাড়া দিয়া গোরার হাতে হাত রাখিয়া পরেশের আশীর্বাদ তাহাদের মিলিত জীবনের পাথেয়রূপে মাথায় তুলিয়া লইল। এই ক্রান্তিলগ্নের পর ছোটখাট ভ্রমসংশোধন স্বাভাবিকভাবেই ঘটিয়াছে।

গোরা উৎকণ্ঠিত আনন্দময়ীকে মা বলিয়া ডাকিয়া তাহার সহিত অচ্ছেদ্য স্নেহবন্ধনের আশ্বাস দিয়াছে, এমন কি এতদিনকার উপেক্ষিতা লছমিয়ার হাতে জলও চাহিয়াছে। আনন্দময়ী নিজে নিঃসংশয় হইয়া বিনয়ের সহিত গোরার চিরসৌহার্দ্য পুনরুদ্ধারের জন্য গোরার সম্মতি লইয়া বিনয়কে আমন্ত্রণ পাঠাইয়াছে। সর্ব সমস্যার সমাধান ও সর্বসংশয়নিরসন উপন্যাসের উপসংহারকে রমণীয় করিয়া তুলিয়াছে।

৬

অন্যান্য চরিত্রগুলি সম্বন্ধে এখন সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতে পারে। উপন্যাসের সব কয়েকটি চরিত্রই পরিবেশসম্মত ও জীবন্ত। ঔপন্যাসিক স্বল্প পরিসরের মধ্যে সামান্য কয়েকটি ঘটনার সাহায্যে অবলীলায় তাহাদের ব্যক্তিত্বের নিজস্বতা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এইসব চরিত্র এককেন্দ্রিক ও জটিলতাবর্জিত—লেখক ইহাদের অন্তর্লোকটি নিজে অনুভব করিয়া পাঠককেও অনুভব করাইয়াছেন। এমন কি বরদাসুন্দরী ও হারাণবাবুর মত যে সমস্ত চরিত্র তাঁহার সহানুভূতিবঞ্চিত, তাহাদের বহির্মুখী, কিন্তু আত্মরতিপরায়ণ স্বভাবটি আশ্চর্য স্বচ্ছতার সহিত আচরণে ও সংলাপে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। তাহাদের সবকিছু আত্মপ্রকাশ নির্ধারিত আদর্শের নিখুঁত অনুবর্তন করিয়াছে। হারাণবাবু যখনই আবির্ভূত হইয়াছেন, তখনই তাঁহার আত্মসন্তুষ্ট শ্রেষ্ঠতাবোধ, তাঁহার নীতিশিক্ষকের অভিমান তাঁহার প্রভুত্বব্যঞ্জক কণ্ঠে, তাঁহার যুক্তিপ্রয়োগের প্রকাশভঙ্গীতে নিখুঁতভাবে ধ্বনিত হইয়াছে। বরদাসুন্দরীর সঙ্কীর্ণ মন ও পরমতাসহিষ্ণু অহংবোধ, তাহার ঝাঁঝালো ও আড়ম্বরস্ফীত প্রকৃতিটি কথাবার্তায় উৎকট অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে।

হরিমোহিনীর চরিত্রের বিস্ময়কর রূপান্তরটি আশ্চর্য মনস্তত্ত্বজ্ঞানের সহিত উপলব্ধ ও বিবৃত হইয়াছে। প্রথম দৃষ্টিতে তাহাকে অত্যন্ত নিরীহ ও নির্বিরোধ ব্যক্তি মনে হয়—কেবল বাঁচিবার ন্যূনতম অধিকার ও আশ্রয়ের জন্য তাহার কাতর আবেদন। সে সংসারের দীনতম প্রাণীর সমপর্যায়ভুক্ত। শোকে, সমাজের অত্যাচারে ও অদৃষ্টের নির্যাতনে সে সমস্ত মনোবল হারাইয়া শুধু কুণ্ঠিত অস্তিত্ব বহন করিতে চাহে। কিন্তু তাহার অবদমিত প্রকৃতির দুর্দম আত্মপ্রতিষ্ঠাস্পৃহা যে কোন্ অব্যক্তের গভীরে

লুকান ছিল তাহা পাঠক সন্দেহমাত্র করে নাই। ঔপন্যাসিক নিগূঢ় অন্তর্দৃষ্টিবলে তাহার হীনম্মন্যতার আবরণে একটা বজ্রকঠিন সংকল্প ও কূটনীতিনৈপুণ্যের সন্ধান পাইয়াছেন। এই ভাগ্যবঞ্চিতা, করুণাকণা-ভিখারিণী, সর্বরিক্তা নারী যে মুহূর্তে একটা স্বাধীন সংসারের কর্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত হইল, সেই মুহূর্ত হইতেই তাহার প্রকৃতিতে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিল। সেই মুহূর্তে ভিজা কাঠে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সে যে কেবল সুচরিতার উপর তাহার ইচ্ছাশক্তির একাধিপত্য খাটাইয়াছে তাহা নয়, তাহার আজীবনের সাধনাভূমি হইতে জোর করিয়া সরাইয়া তাহাকে সম্পূর্ণ বিপরীত আদর্শে ও সমাজ-প্রতিবেশে স্থানান্তরিত করিবার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়াছে। তাহার আত্মপ্রত্যয় এত সীমাহীন, যে সে গোরার সহিত দ্বৈরথ-যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ করে নাই। সে-ই ইচ্ছাশক্তিতে গোরার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে ও চতুর রণনীতি-প্রয়োগে তাহার সঙ্কল্প টলাইয়া তাহাকে পরাজয়ের দ্বিধাদুর্বল গ্লানি অনুভব করাইয়াছে। সুচরিতার উপর গোরার নৈতিক প্রভাবের সুযোগ লইয়া সে গোরার অস্ত্রশালা হইতে সংগৃহীত অস্ত্র তাহারই বক্ষে নিক্ষেপ করিয়াছে। অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত গোরা-সুচরিতার সম্পর্ক-অনিশ্চয়তা দীর্ঘতর করার জন্য ইহা লেখক-পরিকল্পিত শেষ আয়োজন। কিন্তু সমস্ত উদ্দেশ্যকে ছাড়াইয়া হরিমোহিনী-চরিত্রের দুর্জ্ঞেয়তার প্রত্যক্ষ নিদর্শনরূপেই ইহার গুরুত্ব। হরিমোহিনী পাঠকের মনে এই তীব্র বিস্ময়-ঝলকের বিদ্যুৎ-রেখা অঙ্কিত করিয়া ইহারই প্রখরছটাদীপ্তরূপে নেপথ্যের অন্তরালে অস্তমিত হইয়াছে। অঘটনঘটনপটীয়সী সৃষ্টি-প্রতিভার ইহা একটি আশ্চর্য উদ্ভাসন।

সতীশ রবীন্দ্রনাথের আর একটি অনন্য সৃষ্টি। সাধারণতঃ রবীন্দ্রনাথ শিশুমনের দিশারীরূপে পরিচিত। শিশু যখন শৈশব অতিক্রম করিয়া স্কুলের ছাত্রপদবীতে আরোহণ করে, তখন সে রবীন্দ্রকল্পনার সীমাতিসারীরূপে প্রতিভাত হয়। জ্ঞানবৃক্ষের ফল-আস্বাদনকারী, স্কুলের রুটিন-বাঁধা পাঠ্যতালিকার শুষ্কতৃণভোজী বালক যে তাহার শৈশবমাধুর্য অনেকখানি হারাইয়া ফেলিয়াছে তাহা সহজেই বোঝা যায়। কাজেই এই কাজের জোয়ালে আবদ্ধ বয়স্ক শিশু কবি-চিত্তের প্রসাদ-অভিষেক হইতে বঞ্চিত। কিন্তু সতীশ এই সাধারণ নিয়মের একটি অপূর্ব ব্যতিক্রম। সে

স্কুলের পড়ুয়া হইয়াও শৈশবসারল্যের উত্তরাধিকার নিঃশেষ করে নাই। সে কল্পনারশ্মি-বিচ্ছুরণের দ্বারা জ্ঞানজগতের তথ্যকবলিত, নিয়মশৃঙ্খলিত সঙ্কীর্ণস্তূপকে কৌতুকপ্রসন্ন করিয়া তোলে। নানা উদ্ভট, আজগুবি সম্ভাবনা তাহার জ্ঞানচর্চার পাথুরে পথের ফাঁকে ফাঁকে বনবীথির চমক জাগায়। সে শিক্ষার নিয়ন্ত্রিত বায়ুমণ্ডলে শিশুকল্পনার ফানুষ উড়াইয়াছে। তাহার সমস্ত সত্তাটি আনন্দময়, উদ্বৃত্ত প্রাণশক্তির তরঙ্গে সদা-চঞ্চল। সে উপন্যাসে একটি সক্রিয় ও অপরিহার্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। সে কতকটা জানিয়া, কতকটা না জানিয়া ললিতা-বিনয়ের প্রণয়সঞ্চারে মধ্যস্থরূপে অবতীর্ণ হইয়াছে। যখনই আবহাওয়ায় গুমট উঠিয়াছে, যখনই সমস্যা সঙ্কটের দিকে ঝুঁকিয়াছে, তখনই তাহার হাল্কা হাসির হাওয়ায়, তাহার লঘু প্রগল্ভতায়, তাহার হাস্যকর দুর্গতিতে পরিস্থিতি ভারমুক্ত হইয়াছে ও উহার সহজ প্রসন্নতা ফিরিয়া আসিয়াছে। সে অবশ্য গোরা-সুচরিতার গম্ভীরতর হৃদয়-সংঘাত হইতে দূরে রহিয়াছে, কিন্তু ললিতা-বিনয়ের প্রণয়-সমস্যা, উহার মান-অভিমান, অনুরাগ-বিরাগে সমন্বিত প্রাকৃত জীবন সমগোত্রীয় রূপে তাহাকে অধিক আকর্ষণ করিয়াছে। সে না থাকিলে বরদাসুন্দরীর গৃহস্থালী, উহার উৎকট মতসংঘাত, উগ্র আত্মপ্রতিষ্ঠা ও স্থূল বৈষয়িকতা লইয়া, পাঠকের পক্ষে শ্বাসরোধী হইয়া উঠিত। সতীশ এই রুদ্ধ, উত্তপ্ত পরিবেশে যেন এক ঝলক নির্মল বাতাস। সে তাহার খুদে কুকুর, অর্গানযন্ত্র, ও সরল, আনন্দোদ্বেল কৌতুকসরস হৃদয়টি লইয়া সপরিজন বিনয়ের বিবাহের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া উপন্যাসে তাহার আবশ্যিকতার চাক্ষুষ প্রমাণ দিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ যেন বালক হইয়া এই শৈশবোত্তীর্ণ বালকের অন্তর্লোকে প্রবেশ করিয়া তাহার কৌতুকে ভরা, কল্পনায় ফাঁপা, আনন্দরসে উচ্ছল প্রকৃতিটির সমস্ত অন্ধি-সন্ধি, সমস্ত প্রাণলীলার উৎসটি আশ্চর্যভাবে উদ্ঘাটন করিয়াছেন। অথচ ইহার মধ্যে ভাবানুরঞ্জনের লেশমাত্র নাই।

৭

কয়েকটি আনুষঙ্গিক প্রসঙ্গের উল্লেখসহ এই আলোচনায় পূর্ণচ্ছেদ টানা যাইবে। প্রথম, উপন্যাসে ঘটনাবিন্যাসের স্বাভাবিকতা ও শিল্পকৌশল। সমস্ত ঘটনাই এক সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত পরিণতিশৃঙ্খলে গ্রথিত হইয়া অখণ্ড

ঐক্যরূপ লাভ করিয়াছে। একটি বিশাল ও বহু শাখায় প্রসারিত জীবন-কাহিনীর এইরূপ সুশৃঙ্খল, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যাভিমুখী উপস্থাপনা বিরল গঠন-সুষমার পরিচয় বহন করে। এই তথ্যসমাবেশে কোথাও কোন দুর্বল গ্রন্থি নাই, অনাবশ্যকের প্রক্ষেপ নাই, কোন কৃত্রিমভাবে প্রবর্তিত কষ্টকল্পনার অভিভব নাই, কোন জোড়াতালি দিবার বা অতিনাটকীয় চমকসৃষ্টির সচেষ্টতা নাই। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় এই যে, উপন্যাসে মনোবিশ্লেষণের আতিশয্য বা আড়ম্বরে ঘটনার স্বভাবছন্দ অযথা ভারাক্রান্ত ও উহার অগ্রগতি প্রতিরুদ্ধ হয় নাই 'চোখের বালি'তে মাঝে মধ্যে যেন বিশ্লেষণ মাত্রা ছাড়াইতে উদ্যত এরূপ সংশয় ছায়াপাত করে; সংঘটনের চমকপ্রদ সমকালীনতা মানুষের জীবনে দৈবশক্তির শ্লেষাত্মক হস্তক্ষেপরূপে প্রতিভাত হইয়া উহার বিশুদ্ধ মানবিকতা সম্বন্ধে পাঠককে কিঞ্চিৎ দ্বিধাগ্রস্ত করিয়া তোলে। পরিবারজীবনের সঙ্কীর্ণ পরিবেশে সমুদ্রমন্থনের উত্তাল তরঙ্গ-সঞ্চার হয়ত কাহারও কাহারও ঔচিত্যবোধে কিছু ফাঁক রাখিয়া যায়। কিন্তু 'গোরা' সম্বন্ধে এই জাতীয় সূচ্যগ্রপরিমিত ক্ষোভবিন্দুও দানা বাঁধিবার অবসর পায় না। আমাদের পরিপূর্ণ তৃপ্তির নির্মল নীলাকাশে লেশমাত্র অতৃপ্তির বাষ্পও মলিন ছায়া প্রক্ষেপ করে না। উহার বিপুল অবয়ব ব্যায়ামপুষ্ট দেহের ন্যায় দৃঢ়বদ্ধ ও সুডৌল, গ্রীক্ ভাস্কর্যমূর্তির ন্যায় অনবদ্য সুষমায় লাবণ্যময়। উহার জটিল ও নানামুখী ঘটনাবিস্তার আশ্চর্যভাবে কেন্দ্রসংহত। আঙ্গিকরচনা, মনোভাবের সহিত মনোবিশ্লেষণের সমতা, বাহিরের গতির সঙ্গে অন্তরের সংবেগের মিল, বিস্তৃতির সহিত গভীরতার, কর্মবৃত্তের সহিত ভাবকেন্দ্রের সংযোগ—সবই এক অভ্রান্ত সুমিতি ও শিল্প-বোধের নিদর্শন। এই সমস্ত গুণে 'গোরা' কথাসাহিত্যজগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী।

রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য-উপন্যাসের সঙ্গে তুলনায় 'গোরা'র বহিঃপ্রকৃতির প্রাধান্য খুব বিরল উপলক্ষ্যে সীমাবদ্ধ। এখানে কাহিনীর নিশ্ছিদ্র নিবিড়তা ও মননের সর্বাত্মক নিবিষ্টতার জন্য প্রকৃতি মানবজীবনে তাহার ইন্দ্রজাল সঞ্চারিত করার বিশেষ অবসর পায় নাই। পাত্রপাত্রীর নিভৃত চিন্তা তাহাদের অন্তর্জীবনসমস্যায় এত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, নূতন ভাবধারা অঙ্গীকরণে এত একান্তভাবে কেন্দ্রীভূত যে, যে কল্পনামুগ্ধতা প্রকৃতির মানবচিত্তে অলক্ষ্য সঞ্চরণের পথ উন্মুক্ত রাখে তাহা এখানে আত্মকেন্দ্রিকতার

বহির্বিমুখতার জন্য রুদ্ধ। অবিরাম মতবাদসংঘর্ষের উত্তেজনাপূর্ণ ও উত্তপ্ত আবহাওয়ায় মন কোন ক্ষণিক আত্মবিস্মৃতির বাতায়নপথে প্রকৃতিকে আমন্ত্রণ জানাইতে পারে না। আর কলিকাতার কর্মব্যস্ত পটভূমিকা প্রকৃতি-আবাহনের উপযোগী ভূমিকা রচনা করে না। নাটক নিজ গতিবেগে এতই অনন্যবৃত্তি যে পার্শ্বচরিত্ররূপে প্রকৃতির সহযোগিতার উদ্দেশ্যে মুহূর্তের জন্যও সে উহার চাকা থামাইবার কথা চিন্তা করিতে পারে না। উপন্যাসের প্রথম অধ্যায়েই একটি বাউলগান বিনয়ের সেই সকালের অভিজ্ঞতা তাহার মনে যে একটি বিস্ময়-বিহ্বলতার উন্মেষ করিয়াছে তাহাকেই ব্যঞ্জিত করিয়াছে। বর্ষার নিরানন্দ, বর্ণহীন সন্ধ্যা, বর্ষাপ্রভাতে আকাশের নির্মল প্রসন্নতা, বর্ষাজলধৌত শিরীষ ও কৃষ্ণচূড়ার অপরাহ্ণের ম্লানরৌদ্রস্নাত পল্লবিত চিক্কণতা, তর্কোন্মত্ত গোরা ও হারাণের অন্যমনস্কতার উপর অন্ধকারলিপ্ত শ্রাবণমেঘের অলক্ষিত ঘনাইয়া-ওঠা ও পল্লবপুঞ্জের মধ্যে জোনাকি-দীপ্তি, রাত্রির অবিরাম বর্ষণের মধ্যে সুচরিতার অনির্দেশ্য বেদনাবোধ ও অস্থির স্মৃতিরোমন্থন, নবচেতনাচমকিত সুচরিতার নিশীথনক্ষত্রদীপ্ত, সুদূররহস্যঘেরা দেশ-মরীচিকার মত এক অজ্ঞাত অনুভূতির অস্পষ্ট উপলব্ধি, কঠিন আঘাতপ্রাপ্ত বিনয়ের মুখের পঙ্গপালবিধ্বস্ত শ্যামল শস্যক্ষেত্রের সহিত সাদৃশ্য—এই কয়েকটি মাত্র উপলক্ষ্যে টুকরা টুকরা চিত্রে পরিবেশের আভাস ও উপমার উপকরণ যোগাইয়াই প্রকৃতির ভূমিকা নিঃশেষ হইয়াছে। নাটকের মূল ঘটনাই এত চিত্তাকর্ষক যে শুধু আমাদের নয়, লেখকেরও সমস্ত মানস চেতনা এই প্রত্যক্ষ অভিনয়েই অখণ্ডভাবে নিয়োজিত হইয়াছে, দৃশ্যপট বা অন্যান্য আনুষঙ্গিক সহায়কের প্রতি লক্ষ্য দিবার অবসর ঘটে নাই। রবীন্দ্রনাথের মত একজন একনিষ্ঠ প্রকৃতিপ্রেমিকের পক্ষে এই আপেক্ষিক ঔদাসীন্য তাঁহার মানবিক সমস্যার প্রতি এক অসাধারণ অনন্যচিত্ততার নিদর্শন।

কেবল তিনটি অধ্যায়ে (২০, ২১ ও ৩০) প্রকৃতির অন্তর্মুখী, মানস-গহনচারী ইন্দ্রজাল-প্রভাবের উপস্থিতি ও কার্যকারিতা লক্ষ্য করা যায়। গোরার সহিত প্রথম আলাপে ও তাহার বুদ্ধিদীপ্ত ও সত্তাসৌরভে অনুবাসিত ধর্মতত্ত্বপ্রতিষ্ঠা সুচরিতার মনে যে উদ্দাম আলোড়ন জাগাইল, তাহা চন্দ্রোদয়ে উদ্বেল সমুদ্রোচ্ছ্বাসের মত সুচরিতার সমস্ত জীবনচেতনার তটভূমিকে প্লাবিত করিয়া তরঙ্গিত হইল। এই উপমার দ্বারা সুচরিতার বুদ্ধিশাসনাতীত, সামগ্রিক বিপর্যয়কে পরিমাপ করা হইয়াছে। গোরার

দিকে প্রতিক্রিয়া আরও গভীরশায়ী ও মর্মানুবিদ্ধ। সে সুচরিতার মূর্তিটি উহার সমস্ত রুচিশালীনতা ও ভাবসৌকুমার্যের সহিত স্মৃতিতে প্রত্যক্ষ ওধ্যানে মোহময় করিয়া তুলিয়াছে। সুচরিতা গোরার বাগ্মিতার বিদ্যুৎচ্ছটায় তাহার সত্তার দীপ্তি অনুভব করিয়াছে—তাহার বহিরাকৃতি এই জ্যোতির্মণ্ডলে ঝাপ্‌সা হইয়া গিয়াছে। পরবর্তী অধ্যায়ে গোরার সমস্ত চিত্তবিভ্রম ও প্রকৃতি-মুগ্ধতার মধ্যে আত্মনিমজ্জন অপূর্ব সূক্ষ্ম অনুভূতির সহিত পাঠকচিত্তে সঞ্চারিত হইয়াছে। প্রকৃতি যেন সুচরিতার চিন্তানুরঞ্জিত হইয়া গোরার মনে উহার মোহজাল বিস্তার করিয়াছে। সে যেন সুচরিতারই একটা নিখিলব্যাপ্ত প্রতীকরূপে গোরাকে এক যাদুকরীর মায়াপাশে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। প্রকৃতি এই সর্বপ্রথম স্বতন্ত্র অস্তিত্বের দাবী লইয়া গোরার মনোলোকে প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু গোরার কর্মতৎপর স্বভাব এই মোহাবেশকে কোন স্থায়ী আসন ছাড়িয়া দেয় নাই। সে কুরুক্ষেত্রে অর্জুনের ন্যায় সাময়িক হৃদয়দৌর্বল্যকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। ক্ষণিক উপভোগের পর সে তাহার চিরাভ্যস্ত জীবনে ফিরিয়াছে। উপন্যাসের শেষের দিকে গোরার আর একবার আত্মবিস্মৃতি ঘটিয়াছে। কিন্তু তাহার কারণ তাহার আগ্রহাতিশয্য, সুচরিতার প্রতি তাহার ইচ্ছাশক্তির প্রচণ্ডতা। কিন্তু সেবার সে প্রকৃতির মদির শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে নাই, সচেতনভাবে প্রত্যক্ষ শক্তিপ্রয়োগে সুচরিতার উপর নিজ অধিকারপ্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছে। প্রণয়সাধনাতেও যে চেতনালোপী আসবপানের প্রয়োজন আছে তাহা গোরা আর স্বীকার করে নাই—ক্ষত্রবীরের ন্যায় দ্বৈরথযুদ্ধে বল্লভাকে ছিনাইয়া লইবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছে।

বিনয়ের প্রণয়ব্যাপারে প্রকৃতির ভূমিকা আরও সংক্ষিপ্ত। গোরার ক্ষেত্রে যেমন বলিষ্ঠ কর্মতৎপরতা, বিনয়ের ক্ষেত্রেও তেমনি সামাজিকতা ও সৌজন্য-শিথিলতা আত্মতন্ময়তার প্রতিকূল। বিনয় তর্ক করে, আঘাতে বিচলিত হয়, কিন্তু অন্তরের গভীরে কোন অনুভবের রোমন্থন তাহার স্বভাববিরোধী। তাহার চেতনার মধ্যে প্রকৃতিকে আমন্ত্রণ জানাইবার মত তাহার গ্রহণশীলতার অভাব। কেবল একটি ব্যতিক্রমস্থানীয় উপলক্ষ্যে বহিঃপ্রকৃতি তাহার হৃদয়ের আলোড়নের অঙ্গীভূত হইয়াছে। সে উপলক্ষ্য হইল স্টীমারে তাহার সহযাত্রীরূপে ললিতার অভাবনীয় আবির্ভাব। এই সংঘটনের আকস্মিকতাই বিনয়ের অন্তঃপ্রকৃতিকে এক অজ্ঞাতপূর্ব সমস্যাসঙ্কটে ফেলিয়াছে ও উহাকে

এক জটিল আবর্তের পাকে পাকে ঘুরাইয়াছে। এই প্রবল অভিঘাতে তাহার মনের এক নূতন স্তর উন্মোচিত হইয়াছে ও নূতন অনুভূতির উন্মেষ ঘটিয়াছে। ললিতা কখন যে সুচরিতাকে ধীরে ধীরে সরাইয়া তাহার হৃদয়াকাশের উজ্জ্বলতম তারারূপে উদ্ভাসিত হইয়াছে, কখন যে সন্ধ্যাতারাকে আড়াল করিয়া এক দীপ্ততর নক্ষত্র আলোকোৎসবের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছে, সে বিষয়ে সে প্রথম সচেতন হইয়া উঠিয়াছে। নিঃশব্দ নৈশপ্রকৃতি কোন অকস্মাৎ-প্রবুদ্ধ ভাবানুষঙ্গে তাহার জীবনের প্রণয়-নাটকের সহিত অচ্ছেদ্য সম্পর্কে একীভূত হইয়াছে। গ্রহতারামণ্ডিত, নিঃশব্দতিমিরবেষ্টিত আকাশ-মণ্ডলের নীচে নিবিড়কালিমালিপ্ত, জলে স্থলে একাকার, দিগন্তলুপ্ত পৃথিবীর মধ্যে নিদ্রালসে এলায়িত-দেহভঙ্গী, নিয়মিত নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে ছন্দঃস্পন্দিতা, একান্তবিশ্রব্ধা ললিতা, উহার সমস্ত করুণ, সুকুমার সৌন্দর্য ও লাবণ্যব্যঞ্জনা-সহ, যেন একটি বিরাট শুক্তির আবরণতলে একটুকু নিটোল মুক্তার মত, কোন মায়ামন্ত্রে এই অনন্ত-বিস্তার পরিবেশের সঙ্গে একাত্মরূপে মিশিয়া গেল, সেই অমীমাংসিত বিস্ময়ই বিনয়ের সমস্ত চিত্তকে মথিত করিয়া তুলিল। বিশ্বব্যাপী দৃষ্টিপ্রসারের প্রসাদে সে তাহার জীবনের সমগ্রতাকে পর্যালোচনা করিয়া গোরার বন্ধুত্বছেদের শূন্যতা যে ললিতার প্রণয়ের ঐশ্বর্যে পূর্ণ হইয়াছে তাহা উপলব্ধি করিয়াছে—জীবনের সৃজন-প্রলয়ের সন্ধিক্ষণ যেন তাহার ব্যক্তি-সীমায় পুনরাবৃত্ত হইয়াছে। হেমন্ত-উষার আবির্ভাবলগ্নে ললিতা নিদ্রা হইতে জাগিয়া বিনয়ের সারা রাত্রির অতন্দ্র উৎকণ্ঠাভরা পাহারাদারির প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিয়াছে ও তাহার অন্তর গাম্ভীর্য-মাধুর্য-মিশ্র এক অনির্বচনীয় ভাবোচ্ছ্বাসে রোমাঞ্চিত হইয়াছে। সেই দিবারাত্রির মিলনক্ষণে সে তাহাদের মিলনের পূর্বাভাস অনুভব করিয়াছে ও প্রভাতের নির্মল স্পর্শে দেবতার আশীর্বাদের মত তাহার অন্তরে এক গূঢ় আত্মপ্রত্যয়ের উন্মেষ ঘটিয়াছে। উষা যখন প্রভাতের আলোকে ঝলমল করিয়া উঠিল তখন যেন সমগ্র নবপ্রবুদ্ধ জগতের অন্তর্নিহিত চৈতন্যসত্তা তাহাদের উভয়ের আত্মায় অনুরূপ ব্যাপ্তি ও গভীরচারিতার সঞ্চার করিল। ললিতা ও বিনয়ের বহির্মুখী জীবনে এই একবার মাত্র প্রকৃতির ইন্দ্রজাল উহার মায়াস্পর্শ বুলাইবার অবসর পাইয়াছে। রবীন্দ্র-উপন্যাসে প্রকৃতির চিরাভ্যস্ত তাৎপর্যময় ভূমিকা 'গোরা'তে গৌণ অংশ অভিনয়ে পর্যবসিত হইয়াছে। মানুষের নিজ সমস্যা একাধিপত্য বিস্তার করিয়া সমস্ত সহায়ক প্রভাবের গুরুত্বকে সম্পূর্ণ অস্বীকার না করিলেও উহার জন্য অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ প্রত্যন্তপ্রদেশমাত্র ছাড়িয়া দিয়াছে। ইহাই বর্তমান উপন্যাসে প্রকৃতিচেতনার বিশেষত্ব।

অষ্টাদশ অধ্যায়

চতুরঙ্গ (১৯১৬)

১

'গোরার' পরে রবীন্দ্র-উপন্যাস আর এক নূতন বাঁক ফিরিয়াছে। 'গোরা'র নিটোল গঠনসৌষ্ঠব ও সর্বাঙ্গীণ জীবনসমীক্ষা আর রবীন্দ্রনাথের ইঙ্গিতময় সৃষ্টিধর্মের নিকট রুচিকর মনে হইল না। তাঁহার কাব্যপ্রকৃতি উপন্যাসের তথ্যসমৃদ্ধ, কার্যকারণের অমোঘ শৃঙ্খলবদ্ধ ধারাবাহিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তিনি তাঁহার কবিস্বভাবের নির্দেশে জীবনকাহিনীর ব্যঞ্জনাগর্ভ, রূপকাশ্রয়ী তাৎপর্য ফুটাইয়া তুলিতে মনোনিবেশ করিলেন। সমতল আখ্যান অপেক্ষা বিচিত্র দৃষ্টিকোণ হইতে দেখা বিশেষ অর্থবহ খণ্ডাংশসমূহের সমাবেশে জীবনের যে তির্যক রূপটি ঝলসিয়া উঠে, তাহাই তাঁহার নিকট গূঢ়তর তাৎপর্যদ্যোতনার আধাররূপে প্রতিভাত হইল। এইখান হইতেই অতীত শিল্পকলা ও জীবন-বিচারের সহিত তাঁহার একটি চিরস্থায়ী সম্পর্কচ্ছেদ ঘটিল। ইহার পর আর তিনি 'গোরা'র আদর্শ-অনুসরণে কোন উপন্যাস লিখেন নাই।

'চতুরঙ্গ' রবীন্দ্রনাথের এই নবপরীক্ষাপদ্ধতির প্রথম দৃষ্টান্ত। উহার ঘটনা কোন অবিচ্ছিন্ন অগ্রগতির সূত্রে গ্রথিত নয়, কোন স্থির মনোভাবের অকম্পিত দীপশিখায় আলোকিত নয়। উহার চরিত্রগুলি ঠিক রক্তমাংসের নরনারী নয়, বরং তত্ত্বভাবনার প্রতিচ্ছবিরূপে এক একটি অনন্য ভাব-দ্যোতনার বাহন। উহার ঘটনার কোন স্বয়ংসম্পূর্ণ, বস্তুঘন আকার নাই, ইহা মেঘাচ্ছন্ন ঝড়ো আকাশের মত অস্পষ্ট ও আবিল থাকিয়া কেবল মুহুর্মুহু বিদ্যুৎদীপ্তিতে উদ্ভাসিত হইয়াছে। কোন চরিত্রেরই আগাগোড়া কার্যকারণ-সংবলিত, বর্ণনা ও মন্তব্যের দ্বারা দৃঢ়ীভূত পূর্ণাঙ্গ পরিচয় নাই। বাহিরের আবর্ত-ক্ষুব্ধ মানস উদ্‌ভ্রান্তির ক্ষণিক উদ্‌ভাসনই উহাদের চরিত্র ও আচরণের উপর অনিশ্চিত গোধূলি-আলোক প্রক্ষেপ করে। যাহা ঘটিয়াছে তাহার কোন অনিবার্য হেতু নাই, যাহাদের উপর এই বাহ্য অভিঘাত আসিয়াছে তাহাদের অন্তঃপ্রকৃতির কোন সুস্পষ্ট পরিচয় বা পূর্বানুমিত প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় না। যে চারিটি চরিত্রের সমবায়ে 'চতুরঙ্গ' গড়িয়া উঠিয়াছে—জ্যাঠামশায়, শচীশ,

দামিনী ও শ্রীবিলাস—তাহাদের মধ্যে জ্যাঠামশায় তত্ত্বাদর্শের সাহায্যে ও শ্রীবিলাস শচীশ ও দামিনীর সহিত স্বভাব-বৈপরীত্যে কতকটা সুনির্দিষ্ট ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অর্জন করিয়াছে। বাকী দুইজন রূপকের কম্পমান শিখায়, আচরণের মুহুর্মুহু পরিবর্তনশীল অস্থিরতায়, মানস প্রতিক্রিয়ার খেয়ালী অনির্দেশ্যতায়, সমস্ত ব্যক্তিসীমিত পরিচয়কে অতিক্রম, এমন কি বিলুপ্তও করিয়াছে। মানবচিত্তের আদিম প্রেরণা আধুনিক সংবেদনশীল স্পর্শকাতরতার সূক্ষ্ম তন্তুজালে জট পাকাইয়া ইহাদের মধ্যে যেন মরীচিকাবিভ্রমে মূর্ত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বনাটকপর্যায়ের সমকালীন এই উপন্যাসে নাট্যলোক হইতে যেন কিছুটা রূপকমায়া সংক্রামিত হইয়াছে—উপন্যাস ও নাটকে উভয়ত্রই একই ধরণের অন্তর্লোকনিবিষ্টতা প্রকৃতি-সাম্য নির্দেশ করিয়াছে।

এই চারিটি অধ্যায়ের বক্তা হইল শ্রীবিলাস—তাহারই মুখে ও তাহারই মনোলোকের প্রতিফলিত আলোকে সমস্ত উপন্যাসের ঘটনাক্রম ও চরিত্র-সংঘাত ব্যক্ত হইয়াছে। প্রথম অধ্যায়ের উপজীব্য হইল জ্যাঠামশায়ের জীবনদর্শন ও আচরণবিধির পূর্ণাঙ্গ বিবৃতি ও ব্যাখ্যা। বিশেষতঃ শচীশের চরিত্র জ্যাঠামশায়ের উপদেশ ও দৃষ্টান্তে কিরূপ গভীরভাবে প্রভাবিত ও তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের উপর কিরূপ দৃঢ় রেখায় মুদ্রিত হইয়াছে তাহার বিস্তারিত পরিচয় এখানে লিপিবদ্ধ আছে। শচীশের জ্যাঠামশায় ও তাহার পিতা সম্পূর্ণ বিপরীত আদর্শে দীক্ষিত ও বিপরীত প্রকৃতির মানুষ। জ্যাঠামশায়ের জীবনদর্শন মিল-বেন্থামের হিতবাদ ও যুক্তিবাদের সমবায়ে গঠিত—উহার মধ্যে উনবিংশ শতকের প্রথম দিকের পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার অবিমিশ্র ফল কঠোর নিষ্ঠায় সংহত হইয়াছে। তাঁহার মধ্যে ঈশ্বরবিশ্বাস, ভক্তি-ভাবালুতা বা যুক্তিহীন সংস্কারের লেশমাত্র ছিল না। তিনি মানবসেবাই তাঁহার একমাত্র ধর্মরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। শচীশের বাবা হরিমোহন কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য ধাতুতে গড়া। তাহার অপরিমিত ভোগবিলাস ও আত্মসুখলিপ্সার সহিত নৈষ্ঠিক কুলাচারপালন ও সনাতন ক্রিয়াকর্মানুষ্ঠানের বেশ নিরুপদ্রব সহাবস্থান ছিল। তাহার বড় ছেলে পুরন্দর নিরাশ্রয় বিধবা তরুণী ননিবালাকে ধর্মভ্রষ্ট করিয়া কুলের বাহির করিলেও পিতার স্নেহপ্রশ্রয়ের পূর্ণ সুবিধা ভোগ করিয়াছে। শচীশ তাহার দুঃখে বিগলিত হইয়া তাহাকে জ্যাঠামশায়ের গৃহে আশ্রয় দিয়াছে। এই ব্যাপারকে অবলম্বন করিয়া যে নিন্দা ও

কুৎসারটনা উদ্দাম হইয়া উঠিল তাহার প্রতিরোধপ্রয়াসে শচীশ তাহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিয়া জ্যাঠামশায়ের সোৎসাহ সমর্থন লাভ করিয়াছে। বড়ভাই পুরন্দরের রক্ষিতাকে যে শচীশ বিবাহ দ্বারা বেদখলের উদ্যোগ করিয়াছে, তাহাতে তাহার পৌরুষাভিমান ও পিতা হরিমোহনের বংশগৌরবে আঘাত লাগিয়াছে। হরিমোহন জ্যেষ্ঠের নিকট এই বংশের অমর্যাদাকর বিবাহবন্ধের দরবার করিতে আসিয়া সরাসরি প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। জ্যাঠা জগমোহনের মতে এই বিবাহ তাহাদের বংশে কলঙ্ককালিমা লেপন না করিয়া বরং উহার মুখোজ্জ্বল করিবে। তিনি ননির সমস্ত সঙ্কোচ-অনিচ্ছুকতা উপেক্ষা করিয়া তাহাকে বিবাহোপযোগী বস্ত্রালঙ্কারে সাজাইলেন। ননির ভক্তিপ্রণাম ও আশীর্বাদপ্রার্থনা এই ঝুনো ও আবেগহীন নাস্তিকেরও একবারের মত চোখে জল ও অন্তরে আস্তিক্যবুদ্ধি সঞ্চারিত করিয়াছে। শেষ পর্যন্ত হতভাগিনী ননিবালা আত্মহত্যা করিয়া এই বেদনাবিদ্ধ অবস্থা-সংকটের অবসান ঘটাইয়াছে। মানবসেবার ব্যর্থপরিণামের এই অট্টহাসির মধ্যে জগমোহনের সক্রিয় পালা শেষ হইয়াছে।

জ্যাঠামশায়ের জীবনবৃত্তান্ত ও মানস আদর্শের এই বিস্তারিত বিবরণ কেবল উপন্যাসের পটভূমিকা রচনার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত—উহার কোন নিজস্ব সার্থকতা নাই। শচীশের ব্যক্তিত্বের উপর জ্যাঠামশায়ের প্রভাব কত বদ্ধমূল ও নিগূঢ়সঞ্চারী তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্যই তাঁহার উপন্যাসে অবতারণা। শচীশ ও শ্রীবিলাস—তাঁহার দুই প্রধান শিষ্য—তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের জটিল সমস্যাবন্ধনে কতদূর তাঁহার আদর্শের মর্যাদা রাখিয়াছে, কতটাই বা অতিচাপপিষ্ট স্থিতিস্থাপক পদার্থের ন্যায় চাপের অপসারণে সবেগে বিপরীতদিকে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে সেই মাত্রানিরূপণই জ্যাঠামশায়ের প্রভাবের একমাত্র যথার্থ মানদণ্ড। পুঞ্জীভূত তথ্যসমাবেশ ও বহুগুণিত দৃষ্টান্তের সমাহার বাস্তব আচরণের একবিন্দু বিপরীত সাক্ষ্যের দ্বারা অধঃকৃত ও খণ্ডিত হইতে পারে। এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিচার করিলে ভূমিকা যে মূল কাহিনীর সহিত তুলনায় অনাবশ্যকরূপে দীর্ঘ হইয়াছে বা জ্যাঠামশায়ের দৃষ্টান্তের ছাপ যে পরবর্তী ঘটনার তরঙ্গোৎক্ষেপে প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে এই সিদ্ধান্তকে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। মহানগরীর আত্মকেন্দ্রিক সমাজজীবনে, অটল ব্যক্তিত্বমহিমার হিমালয়শৃঙ্গে বিবিক্ত থাকিয়া, নির্দ্বন্দ্ব, একত্রে সাধনার বলে সমস্ত বহিরাগত উপদ্রবকে প্রতিহত

করিয়া যে নৈতিক আদর্শের অনুশীলন সম্ভব, ধর্মসম্প্রদায়ের গুরুবাদকেন্দ্রিক ভাবমত্ততার সংক্রামক আবহাওয়ায়, দুর্বার অবাধ্য প্রবৃত্তির অন্তর্দ্রোহিতায়, ছলনাময়ী নারীপ্রকৃতির মোহিনী মায়ার আকর্ষণে, সেই যোগিসুলভ নির্লিপ্ততা, সেই তপশ্চর্যায় অবিরল নিষ্ঠার সংরক্ষণ প্রায় অসাধ্যসাধনের পর্যায়ভুক্ত। সুতরাং জ্যাঠামশায়ের শিক্ষা যে তাঁহার প্রধান দুই শিষ্য, বিশেষতঃ শচীশের উত্তর জীবনে বিশেষ কার্যকরী হয় নাই তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। গিরিগুহায় নিশ্চল সমাধি আর ক্ষুরধার কূলগ্রাসী নদীতীরে পাতার কুটিরে বাহিত দিনযাপনের মধ্যে যে পার্থক্য তাহাই গুরু ও শিষ্যের জীবনধারার মধ্যে মর্মান্তিকভাবে প্রকট। শচীশ ও শ্রীবিলাস যদি জ্যাঠামশায়ের নিকট হইতে কোন স্থায়ী উত্তরাধিকার লাভ করিয়া থাকে তাহা হইল সমস্ত আসক্তির মধ্যে একটা সরল নির্লিপ্ততা, সমস্ত প্রবৃত্তি-সংঘাতের মধ্যে একটা প্রসন্ন-নির্মল জীবনস্বীকৃতি আর শচীশের মধ্যে একটা উদার বৈরাগ্য-শান্তি। এইখানেই সমস্যার ও চারিত্রিক প্রতিক্রিয়ার মৌলিক বিভিন্নতা সত্ত্বেও গুরু-শিষ্যের আত্মিক বন্ধন অক্ষুণ্ণ আছে। আরও মনে হয় যে জ্যাঠামশায়ের প্রভাব যতটা ভাবাত্মক নয়, তাহার চেয়ে বেশী অভাবাত্মক। তাঁহার শিক্ষাদীক্ষায় যে সব কোমলরসাত্মক বৃত্তিগুলি উপবাসী বা ক্ষুধিত ছিল, তাহারাই যেন পরবর্তী জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া তাহাদের অস্বাভাবিক অবদমনের শোধ তুলিয়াছে। শ্রীবিলাস এই স্ববিরোধের প্রতি শচীশের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াও নিজেই উহার দুনিবার পাকে জড়াইয়া পড়িয়াছে। শুষ্ক খাদ্যে অভ্যস্ত মক্ষিকার পাখা উল্টাইয়া-পড়া রসের কলসীতে আটকাইয়া গিয়াছে। শচীশ কূটতর্কের সহায়তায় এই দুই বিপরীত আদর্শের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু এই মানস সমাধান কোন দিনই জীবনের সমর্থন পায় নাই। তর্কের জিত জীবনের হারে পরিণত হইয়াছে।

২

'চতুরঙ্গ'-এর দ্বিতীয় অঙ্কে শচীশের মানসলোকই বিশ্লেষণের প্রধান বিষয়। জগমোহনের মৃত্যুর পর শচীশ বৎসর দুই নোঙর-ছেঁড়া নৌকার মত পরিবর্তনের স্রোতে নিরুদ্দেশ-যাত্রায় ভাসিয়া চলিল। শ্রীবিলাস যখন তাহার সন্ধান পাইল, তখন দেখা গেল যে সে লীলাবিলাসের ঘাটে গুরুবাদের অটল আশ্রয়ে তাহার জীবনতরণীকে ভিড়াইয়াছে। জ্যাঠামশায়ের তিরোধানে

শচীশের নাস্তিক মন এমন একটা নিরালম্ব সর্বশূন্যতার মধ্যে তলাইয়া গিয়াছে যে সাময়িকভাবে জীবনের অস্তিত্বমূল্য তাহার নিকট নিঃশেষিত হইয়াছে। এই উদভ্রান্ত অবস্থায় তাহার পক্ষে প্রত্যয়ের এক প্রান্ত হইতে বিপরীত প্রান্তে উৎক্ষিপ্ত হওয়া সম্পূর্ণ মনোবিজ্ঞানসম্মত। কিন্তু এই সামগ্রিক বিপর্যয়ের কোন প্রত্যক্ষ বিবরণ না থাকার জন্য শচীশের সমস্ত চরিত্রটিই খামখেয়ালী ও প্রহেলিকাধর্মী মনে হয়। এত বড় একটা বিপরীত গতি শুধু অনুমান ও পরোক্ষ বর্ণনার সাহায্যে পাঠকের মনে কোন স্থায়ী রেখাপাত করিতে পারে না। সাঙ্কেতিকতা কোন পূর্বজ্ঞাত মানস বৈশিষ্ট্যকে আশ্রয় না করিলে প্রত্যাশিত দ্যোতনাশক্তি হইতে বঞ্চিত হয়। এখানে সাঙ্কেতিকতা অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ার মত লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছে।

যাহা হউক, যখন শ্রীবিলাস বিস্তর খোঁজাখুজির পর শচীশকে আবিষ্কার করিয়াছে, তখন শচীশ ভক্তিরসমত্ত হইয়া জ্যাঠামশায়ের জীবনাদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত পথ অবলম্বন করিয়াছে। সে গুরুদেবের নির্বিচার আজ্ঞাপালনে তাহার সমস্ত স্বাধীন চিন্তাকে বিদায় দিয়াছে। যে সন্ন্যাসী জীবন জ্যাঠামশায়ের নিকট জীবনবিমুখতার চরম নিদর্শন ছিল শচীশ তাহাকেই একান্ত আশ্রয়রূপে গ্রহণ করিয়াছে। শ্রীবিলাসের অনুযোগে সে যে উত্তর দিয়াছে তাহাতে তাহার কূট তার্কিকতার যতটা পরিচয় পাওয়া যায় ততটা জীবনসমস্যা-সমাধানের সূত্র পাওয়া যায় না। জ্যাঠামশায়ের কাজের ও বুদ্ধিচর্চার আহ্বান খেলার মাঠে শিশুমতি মানুষের মুক্তির মত। আর গুরুদেব তাহাকে মুক্তি দিয়াছেন রসসাধনার মাধ্যমে পরমতত্ত্ব-নিরূপণে। এই দুইটি প্রক্রিয়া পরস্পর-বিপরীত নয়, অন্যোন্য-পরিপূরক। একটিতে কর্ম ও মননের অবাধ অবসর, অন্যটিতে বন্ধনের কড়াকড়ির মধ্যে আত্মিক পরিপূর্ণতার সন্ধান। জ্যাঠামশায় তাহার ঐহিক জীবনের দিশারী, গুরুদেব তাহার অধ্যাত্ম-সাধনার কাণ্ডারী। সুতরাং জ্যাঠামশায়ের অনুশাসনের প্রতি তাহার আনুগত্য অবিচলই আছে। শ্রীবিলাস এই যুক্তিতে নীরব হইয়াছে, কিন্তু সংশয়মুক্ত হয় নাই। সে আনন্দসাগরের নামগোত্রহীন ঢেউ হইয়া তাহার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বিলুপ্ত করিতে অনিচ্ছুক, রসের সমুদ্রে ফেনার মত গলিয়া যাইতে সে নারাজ। অবশ্য অনুকরণ যদি স্তাবকতার যথার্থতম নিদর্শন হয়, তবে সে শচীশের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া ভক্তিমার্গেই পদক্ষেপ করিয়াছে। তাহার চিত্তস্বাধীনতা দলগত ক্লোরোফর্মের প্রভাবে সাময়িকভাবে অসাড় হইয়াছে।

ইহার ফলে দুই নামজাদা অবিশ্বাসী ও বুদ্ধিজীবী একযোগে গুরুসেবার মারফৎ অধ্যাত্মবিলাসে মত্ত হইয়া রহিল। গুরুও তাঁহার ভক্তমণ্ডলীসহ দেশপরিক্রমা করিতে করিতে কলিকাতায় আসিয়া তাঁবু ফেলিলেন। পল্লীগ্রামের দিগন্তবিস্তৃত, জনবিরল আত্মমগ্নতার পরিমণ্ডলে যে ভাববিহ্বলতা সহজেই নিবিড় হইয়া উঠিয়াছিল, কলিকাতার কর্মব্যস্ততা ও ব্যক্তিসংঘর্ষে উত্তপ্ত আবহাওয়ায় তাহার অসঙ্গতি অন্ততঃ শ্রীবিলাসের বিচারশীল মনে তীক্ষ্ণ কাঁটার ন্যায় বিঁধিল। পল্লীগ্রামের জমাট নেশা শহরে ফিকে হইয়া আসিল। কীর্তনানন্দের আত্মবিলোপী শক্তিতে কিছুটা ভাঁটা ধরিল। শ্রীবিলাসের অনুভূতির এই সচেতনতাই শচীশের সঙ্গে তাহার রসাবিষ্টতার পরিমাণ-পার্থক্যের নির্দেশক। বহিঃপ্রকৃতির উদার, কল্পনামধুর পরিবেশে নারী ও পুরুষের মধ্যে সম্বন্ধের যে সার্বভৌমতা সহজেই মোহসঞ্চার করে, মহানগরীর চিত্তবিক্ষেপের মধ্যে সেই ভাবসম্ভোগের অনুকূল প্রতিবেশ মিলে না। তাই বিচিত্রসমস্যাকীর্ণ, বিবিধ সংঘাতে সংক্ষুব্ধ নগরজীবনে বাষ্পঘন রসমুগ্ধতা পদে পদে খোঁচা খাইতে লাগিল। শচীশের ভাবাচ্ছন্নতার মধ্যে এই পরিবেশ-প্রভাব মোটেই আত্মঘোষণা করিল না। সে ভূগোল-নিরপেক্ষভাবে, হাওয়া কোন্‌দিক হইতে বহিতেছে তাহার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, নিজ ধ্যানবিলাসে তন্ময় হইয়া থাকিল।

এইখানে তপোভঙ্গের যে চিরন্তন চক্রান্ত পৌরাণিক অতীত হইতে প্রগতিশীল বর্তমান পর্যন্ত সাধনার ইতিহাসে অক্ষয় সূত্রে সন্নিবিষ্ট আছে, সেই অপ্সরীর আবির্ভাব ঘটিয়াছে। কৃচ্ছ্রসাধনযজ্ঞের এই স্তরে সনাতনী মোহিনী মায়া সাধকের চিত্তচাঞ্চল্য-সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হইয়াছে। দামিনী এক বিত্তবান শিষ্যের স্ত্রীরূপে ভক্তমণ্ডলীতে অনিবার্যভাবে স্থান গ্রহণ করিয়াছে। গুরুভক্তি ও পত্নীপ্রেমের সংঘর্ষে এই শিষ্য প্রথমটিকেই অগ্রাধিকার দিয়াছে ও মরিবার পর তাহার সমস্ত ধনদৌলতের সহিত বিধবা যুবতী দামিনীকেও অবশ্যপাল্যরূপে গুরুর নিকট নিবেদন করিয়াছে। কাজেই এই ব্যবস্থায় দামিনী তাহার তীব্র অসম্মতি সত্ত্বেও ভক্তগোষ্ঠীর অঙ্গীভূত হইয়া পড়িয়াছে। এ যেন ভিজে কাপড়ের জড়স্তূপে একটি জ্বলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, ঘুমন্ত হিমশীতল যাদুঘরে একটা উত্তপ্ত প্রাণকণিকা উহার অতৃপ্ত ক্ষুধা ও হাজার রকমের দাবী লইয়া তুমুল উৎপাত বাধাইয়াছে। শান্ত, নিয়মিত কক্ষাবর্তনের বৃত্তে একটা পাগলা ঘূর্ণী-হাওয়া

হঠাৎ প্রবেশ করিয়া সকলের গতিচ্ছন্দে একটা অস্থির, ক্ষণে ক্ষণে দিক্-বদলানো উৎকেন্দ্রিকতার সংবেগ প্রবর্তন করিয়াছে। এককেন্দ্রিক গোষ্ঠী-সংহতি নানা স্বতন্ত্র অণু-পরমাণুতে দশদিকে ছিট্‌কাইয়া পড়িয়াছে। শ্রীবিলাসের জবানীতে লেখক এককথায় দামিনীর পরিচয় দিয়াছেন—'সে যেন শ্রাবণের মেঘের ভিতরকার দামিনী'। সে চোখধাঁধানো দীপ্তি ও মনে আগুন-ধরানো দাহশক্তিতে সমভাবে পরিপূর্ণ। শচীশও তাহার প্রকৃতি-নিরূপণে সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির নিদর্শন দিয়াছে—সে ননিবালার বিপরীত মেরুতে অধিষ্ঠিত নারীপ্রকৃতির একটি রূপ। ননিবালা ও দামিনী উভয়েই নারীর বিশ্বরূপের এক-একটি দিক। ননিবালা স্বভাব-কাঙাল, দামিনী সর্বগ্রাসিনী। একজন জীবনের নিকট সব রকম দাবী প্রত্যাহার করিয়াছে, আর একজনের দাবীর অন্ত নাই। একজনের অস্তিত্ব সঙ্কুচিত হইতে হইতে জীবনধারণের ন্যূনতম বিন্দুতে ঠেকিয়াছে। আর একজনের অধিকারস্পৃহা ক্রমপ্রসারের আতিশয্যে বামনদেবের ন্যায় ত্রিভুবনগ্রাসী হইতে উদ্যত। শ্রীবিলাসের মানস প্রতিক্রিয়ার ইহার সহিত তুলনীয় কোন সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি দেখি না। অবশ্য আমরা পূর্বেই সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে শ্রীবিলাসের উক্তিটি লেখকেরই বেনামীতে মতপ্রকাশ। শ্রীবিলাসের পরবর্তী আচরণেও তাহার বিচারবুদ্ধির আপেক্ষিক অনিশ্চয়তা সমর্থিত হইবে।

দামিনীর রঙ্গমঞ্চে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই অভিনয়ের ধারা আমূল পরিবর্তিত হইয়া গেল। ভক্তিতত্ত্বযোগের স্তব্ধ জলাশয়ে বিরুদ্ধ আবেগের ওলট-পালট হাওয়া উত্তাল ভাবের তরঙ্গ তুলিল। প্রথম পরিবর্তন আসিয়াছে দামিনীর চিত্তগহনে। সে এতদিন পর্যন্ত স্বামীর প্রতি চাপা ক্রোধে গুরুর আহ্বানে গর্বিত উপেক্ষা দেখাইয়া আসিয়াছে। গুরু যতই তাহাকে ভক্তিবৃত্তে আকর্ষণ করিতে আগ্রহ দেখান, সেও প্রত্যাখ্যানে ততটাই কেন্দ্রাতিগ প্রবণতায় প্রতিহত হইয়াছে। এমন কি গুরুর ধৈর্যপূর্ণ ক্ষমা ও স্নেহপ্রশ্রয় তাহাকে উগ্রতর বিদ্রোহে উত্তেজিত করিয়াছে। তথাপি গুরু অঘটন ঘটার প্রত্যাশায় প্রতীক্ষার কাল অনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ পর্যন্ত পিছাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার ফললাভের আকাঙ্ক্ষা ভগবৎশক্তির অমোঘতার স্থির প্রত্যয়ে ধৈর্য ধরিয়াছে।

ইতিমধ্যে হঠাৎ সেই দীর্ঘ-প্রতীক্ষিত পরিবর্তনটি সত্য সত্যই ঘটিয়া গেল। দামিনীর উদ্ধত বিদ্রোহ আত্মোৎসর্গের ঐকান্তিক সেবা-সমর্পণে একেবারে জুড়াইল। গুরুদেব হয়ত তাঁহার জোর গলায় উদ্‌ঘোষিত

ভবিষ্যৎবাণীর সফলতায় আত্মপ্রসাদে পুলকিত হইয়া উঠিলেন। অন্তর্যামী কিন্তু এই গূঢ় মানস রূপান্তরের সূত্রান্তর আবিষ্কার করিয়া মনে মনে হাসিলেন। রথ, পথ ও পুরোহিতের ভগবৎশক্তির আধার হইবার প্রতিযোগিতায় স্বয়ং ভগবান এক নেপথ্যচারী মানুষের নিকট পরাজয় স্বীকার করিলেন। দামিনীর অন্তরসমুদ্রে যে অভাবনীয় জোয়ারের উচ্ছ্বাস তাহা ভগবৎকৃপা-প্রেরিত নয়, মানবিক প্রেমসঞ্জাত। আত্মবিস্মৃতির সুদূর নভোলোকচারী শচীশই দামিনীর মনে এই আলোড়ন জাগাইয়াছে। শচীশ এই চাঞ্চল্য লক্ষ্য করিয়াছে, কিন্তু ইহাতে তাহার কর্তৃত্ব সম্বন্ধে অনবহিতই রহিয়াছে। "শচীশ শুধু শোভাই দেখিল, দামিনীকে দেখিল না।" কেবলমাত্র শ্রীবিলাসই ঈর্ষ্যাতীক্ষ্ণ অনুভূতি দিয়া সমস্ত ব্যাপারটি লক্ষ্য ও বেদনাবিধুর চিত্তে উপলব্ধি করিয়াছে। গৃহস্থঘরে ভূতের উপদ্রবের মত ভক্তিসাধনার নিয়মবদ্ধ পরিবেশে হঠাৎ দুর্লক্ষণ দেখা দিতে লাগিল। গুরুদেবের ধ্যানমূর্তির চীনামাটির প্রতিকৃতির অকারণে চূর্ণীকৃত খণ্ডসমূহ ও শচীশের শয়নকক্ষের প্রবেশদ্বারে দামিনীর আক্ষিপ্ত আত্মপীড়ন এই বিপ্লবঝটিকার বিপর্যয়ের সাক্ষ্যরূপে ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইয়া রহিল। শচীশ এক অজানা বিপদের সঙ্কেতে আশঙ্কা-কণ্টকিত হইয়া উঠিল, কিন্তু এই চিত্তবিকারের আসল কারণটির কোন সন্ধান পাইল না।

এই আসন্ন ঝটিকা শীঘ্রই চরম ধ্বংসলীলায় প্রকট মূর্তি ধরিল। গুরুদেবের বাৎসরিক অজ্ঞাতবাসের তীর্থযাত্রায় দামিনী জিদ করিয়া সঙ্গ ধরিল। গুরুদেব ইহাতে গুরুকৃপার অলৌকিক বিভূতি সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া আরও পুলকিত হইয়া উঠিলেন। সমুদ্র-তীরের এক অন্তরীপের স্নিগ্ধছায়াসেবিত, মৃদুকল্লোল-স্বনিত নির্জন ভূমিখণ্ডে গুরুদেবের প্রেমে ও ভক্তিতে মেশামেশি দ্ব্যর্থদ্যোতক সাধনাসঙ্গীত দামিনীকে সম্পূর্ণভাবে দ্রবীভূত করিয়া তাহাকে নিবিড় ভাবতন্ময়তায় আবিষ্ট করিয়াছে। গুরুদেব স্বভাবতঃই এই পরিণতিকে ঐশীপ্রীতিমূলক ও পরোক্ষে গুরুদেবের নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের নিদর্শনরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু সেই রাত্রিতে গুহাভিসারের মধ্যেই এই সংশয়িত আবেগ-আকর্ষণের মুখোশ খুলিয়া গেল।

এই গুহাদৃশ্যটি রবীন্দ্রনাথের রূপকব্যঞ্জনাসৃষ্টির, অন্তর্গূঢ় ভাব উদ্বোধনের অপূর্ব শক্তির পরিচয়বাহী। ইহা শচীশ ও দামিনীর মধ্যে যে গোপন, অস্বীকৃত ঘাত-প্রতিঘাতের নীরব, ঘটনারিক্ত সঙ্কেতময় পালা চলিতেছিল

তাহার আশ্চর্য ক্রান্তিপরিণাম (climax)। অবচেতনের পিচ্ছিল মোহ এখানে যেন ধূম্ররুদ্ধ আগুনের অক্ষরে আত্মপরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছে। এখানে শ্রীবিলাস নিজের কথকতা পরিহার করিয়া শচীশের ডায়ারি হইতে উদ্ধৃত করিয়া শচীশের প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়াটিকে ভাষা দিয়াছে। কামনার ক্লেদাক্ত আসক্তি ও রোমশ স্থূলতা উভয়ের সমবায় যে সর্পিল চক্রবন্ধন সৃষ্টি করে তাহাই শচীশের স্বপ্নাচ্ছন্ন অর্ধ-অচেতন মনের পর্দায় দ্রুতসঞ্চরণশীল ছায়া-রাজি-প্রক্ষেপের মাধ্যমে তীব্র চেতনায় উৎকীর্ণ হইয়াছে। অবচেতন যেন নিজ গহন উৎস হইতে কথা কহিয়া উঠিয়াছে—ইহাতে বাক্য অপেক্ষা ইঙ্গিতই বেশী পরিস্ফুট। তাহার ঘুমের ঘোরে যে এই অবাঞ্ছিত অভিভবের প্রতি পদাঘাত তাহা তাহার মানস প্রত্যাখ্যানেরই অসংজ্ঞান প্রতীক্। এই দৃশ্যটির মধ্যে মনোলোকের অর্ধ-অভিব্যক্ত নাট্যলীলা দান্তের উপযোগী কবিকল্পনা ও আধুনিক মনস্তত্ত্বের অন্তর্ভেদিত্বের সহযোগিতায় অপূর্ব তাৎপর্যময় বাণীরূপ লাভ করিয়াছে। কাহিনীতে শচীশের যে প্রধান অংশ তাহা এইখানেই নিঃশেষিত। দামিনীর দীপ্তি শচীশের মেঘাশ্রয়েই এ পর্যন্ত অস্থির ঝলকে স্ফুরিত হইয়াছে। পরবর্তী অধ্যায়ে তাহার আশ্রয়ান্তর-সংসক্তির ইতিহাস। তাহার জীবনের কেন্দ্র হয়ত স্থিরই আছে। কিন্তু উহা নূতন অক্ষরেখাবিধৃত এক বা নানা বৃত্তকে প্রদক্ষিণ করিয়াছে।

৩

'দামিনী' অধ্যায়ে দামিনীর আচরণের দুর্বোধ্যতাই প্রধান আলোচ্য বিষয়। দামিনীর প্রত্যাখ্যাত হৃদয়াবেগ মূল লক্ষ্য হইতে প্রতিহত হইয়া নানা তির্যক পথ দিয়া নিষ্ক্রমণ খুঁজিয়াছে। গুরুর প্রতি বিমুখতা তীব্রতর হইয়াছে, কিন্তু তাহার জীবনমুখিতা নানা পরোক্ষ উপায় অবলম্বন করিয়াছে। পল্লীর মেয়েমহলের সহিত ঘনিষ্ঠতা, নানা ছোটখাট মেয়েলি কাজে যোগ, প্রাণি-জগতের প্রতি হঠাৎ মমতা প্রভৃতি তুচ্ছ সাংসারিক আসক্তির মাধ্যমে উদ্বৃত্ত হৃদয়-বৃত্তির নিয়োগ তাহার মনোজগতে যে ঝড় বহিতেছে তাহার নির্দেশ দিয়াছে। শচীশ তাহার এই উদ্‌ভ্রান্তি সম্বন্ধে সতর্ক করিতে গিয়া ও ধর্ম-সাধনায় চিত্ত স্থির করিবার হিতোপদেশ দিতে গিয়া শুধু দামিনীর বিরাগ ও বিদ্রোহকেই আরও উৎকটভাবে উদ্দীপ্ত করিয়াছে। বর্ধমান রাগ ও ব্যর্থ অনুরাগের দোটানার মধ্যে আন্দোলিত দামিনী শ্রীবিলাসের মনস্তাত্ত্বিক

সমীক্ষা ও আকুল উৎকণ্ঠার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই পর্যবেক্ষণের ফলে সে নারীপ্রকৃতি সম্বন্ধে যে নূতন অনুভূতিলাভ করিয়াছে তাহাতে তাহার জীবনতত্ত্বাভিজ্ঞতা ও মননশক্তির চমৎকার প্রকাশ ঘটিয়াছে ও ইহা দামিনীর দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধ হৃদয়ের উপরও অন্তর্ভেদী আলোকপাত করিয়াছে। তাহার এই মন্তব্যে সাধারণ নারীপ্রকৃতি ও অসাধারণ দামিনী-সমস্যা উভয়ই স্বচ্ছ হইয়া উঠিয়াছে। (নারীর অসামঞ্জস্যের প্রতি একটা স্বতঃ আকর্ষণ আছে—সে তাহার অন্তরের সমস্ত কামনা অপাত্রন্যস্ত করিয়া একটা কৃচ্ছ্রসাধনের গৌরব অনুভব করে। তাহার হৃদয়ের অর্ঘ্য হয় পশুপ্রকৃতি, না হয় অধ্যাত্মচর্চায় লিপ্ত, প্রেম সম্বন্ধে উদাসীন, পুরুষের প্রতিই নিবেদিত হয়। দেবতাও নয়, অসুরও নয়, এইরূপ মধ্যপথযাত্রী পুরুষ হয়ত নারীর শ্রদ্ধা বা নির্ভরশীলতাকে আকর্ষণ করে। কিন্তু প্রেমের মর্মকোষসঞ্চিত মধু তাহাদের চিরকাল অপ্রাপ্যই থাকে।)

এই অবস্থার মধ্যেই, হয়ত বা এই অবস্থার জন্যই, শ্রীবিলাস ক্রমশঃ ক্রমশঃ দামিনীর পক্ষে অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিল এবং দামিনীর নৈকট্যে আসার উপলক্ষ্য পাইল। গুরুর কাছে ঘেঁসে না ও শচীশকে এড়াইয়া চলে দামিনীর এই অবস্থাসঙ্কটের জন্যই শুধু সামাজিক মেলামেশার ন্যূনতম আকৃতি মিটাইতে ও সংসারের অপরিহার্য ফরমাইস খাটিতে তাহার সহযোগিতার মূল্য অনেক বাড়িয়া গেল। গুহার সেই দুঃস্বপ্নবৎ অভিজ্ঞতার পর শচীশের নির্লিপ্ততার ঘোর অনেকটা কাটিয়া গিয়া তাহার বাস্তববোধ যে প্রখরতর হইয়াছে তাহা শ্রীবিলাসের লক্ষ্য এড়ায় নাই।

দামিনীর বিপরীত আকর্ষণে শ্রীবিলাসের গুরুনিষ্ঠা হ্রাস পাইতে লাগিল ও দামিনীও তাহাকে অন্য কাজে ব্যস্ত রাখিয়া তাহার গুরুসেবার ঐকান্তিকতায় বাধা জন্মাইল। আবার শচীশকে বিশেষভাবে দেখাইয়াই যেন দামিনী শ্রীবিলাসের পরিচর্যার প্রতি দাবী চড়াইতে লাগিল। শ্রীবিলাস বুঝিয়াছে যে গুরু যে অস্ত্রে শচীশের উপর তাঁহার সম্মোহন-শক্তি দেখাইয়া শ্রীবিলাসের আনুগত্যকে জয় করিতে চাহিয়াছিলেন, দামিনী সেই অস্ত্রেরই কূট প্রয়োগে নির্লিপ্ত শচীশের অনুরাগ আকর্ষণে উন্মুখ। গুরুভক্তি ও প্রেম উভয়েই অসপত্ন অধিকার-প্রতিষ্ঠায় উৎসুক ও উভয়েরই অবিশ্বাস-জয়ের পদ্ধতি অভিন্ন। মিষ্টান্নের ভোজে নিমন্ত্রিত-তালিকা হইতে শচীশ বাদ পড়িল ও শ্রীবিলাসই অপ্রতিদ্বন্দ্বীভাবে আদর-

যন্ত্র ভোগ করিতে লাগিল। অবশ্য শ্রীবিলাস বুঝিয়াছে যে সে উপলক্ষ্য মাত্র, লক্ষ্য নয়। শিকারী যেমন বাঘশিকারের জন্ত গৃহপালিত পশুকে প্রলোভনরূপে ব্যবহার করে, দামিনী তেমনি শচীশকে ফাঁদে ধরিবার উদ্দেশ্যে শ্রীবিলাসের প্রতি প্রতিযোগীর মিথ্যা মর্যাদা আরোপ করিতেছে। কিন্তু সব বুঝিয়াও সে আশু প্রাপ্তির লালসা-দমনে অক্ষম।

হৃদয়মন্থনের এই সম্ভাবনা-ঘন পর্যায়ে ত্রিভুজ-দ্বন্দ্বের চাকা ঘুরিয়া সংঘর্ষ এক নূতন ছন্দে বিবর্তিত হইল। এইবার পরিবর্তন-তরঙ্গের সংবেগ শচীশের প্রকাশকুণ্ঠ চিত্তেই বেশী আলোড়ন তুলিল। যে সত্যকে সে প্রাণপণ শক্তিতে এতদিন অস্বীকার করিয়াছে তাহাই তাহার সমস্ত ঔদাসীন্য-বর্ম ভেদ করিয়া মর্মে প্রবেশ করিল। প্রথমতঃ সে গুরুসেবার ও কীর্তনানন্দের আতিশয্যে তাহার চেতনাকে ঘুম পাড়াইতে চাহিল। কয়েক দিনের ব্যর্থ প্রয়াসের পর সে দামিনীকে নির্বাসিত করিয়া তাহার সাধনাকে বাঁচাইবার শেষ চেষ্টা করিল। সে আত্মসংযমে বিশ্বাস হারাইয়াছে বলিয়াই এরূপ চরম সিদ্ধান্তের কথা ভাবিতে পারিল। কিন্তু শ্রীবিলাসের যুক্তি ও অনুরাগের বাধা ঠেলিয়া এই সঙ্কল্প বেশীদূর আগাইতে পারিল না। গুরুদেব ইতিমধ্যে দামিনীকে পোষ মানাইবার চেষ্টায় হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন। সুতরাং তিনি শচীশের এই উদ্‌ভ্রান্ত, আত্মরক্ষা-প্রণোদিত প্রস্তাবটিকে তাঁহার অধ্যাত্ম প্রভাবের দ্বারা সমর্থন করিলেও দামিনীর অনমনীয় ইচ্ছাশক্তি তাহাতে বিন্দুমাত্র টলিল না। সুতরাং নরকের দ্বার, নারীকে নির্বাসিত করিয়া আশ্রম-সাধনার বিশুদ্ধি-রক্ষা সম্ভব হইল না। প্রকৃতি-মায়াকে এড়াইয়া নয়, উহার বিষময় মোহ প্রতি নিঃশ্বাসে গ্রহণ করিয়াই দুরূহ তপস্যায় অবিচল থাকিতে হইবে এই দারুণ পরীক্ষা আশ্রমের সম্মুখে উদ্যত হইয়া রহিল।

শ্রীবিলাস ত প্রায় প্রকাশ্যভাবেই গুরুসেবায় ঢিল দিয়া দামিনীর আকর্ষণে ধরা দিয়াছে। এখন শচীশও তাহার কৃচ্ছ্রসাধনের ফাঁকে ফাঁকে সময়ে অসময়ে সেই মায়াবিনীর টান অনুভব করিতে লাগিল। শ্রীবিলাসের সঙ্গে দামিনীর আত্ম-উদ্‌ঘাটনের ও বিশ্রম্ভালাপের মধ্যে ভক্তিপরিবেশচ্যুত শচীশ অনিমন্ত্রিতভাবে দেখা দিল ও শেষ পর্যন্ত অন্তর্দ্বন্দ্ব সহিতে না পারিয়া দামিনীকে সরাসরি আশ্রমত্যাগের আবেদন জানাইল। দামিনীর দ্বিধাহীন ও জোরাল অসম্মতিতে শচীশের সমস্ত পূর্বধারণা বিপর্যস্ত হইয়া সে যেন

দিশাহারা হইয়া পড়িল। বজ্রের পর বারিবর্ষণের মত দামিনীর অসহ্য রোষের পর হঠাৎ-বিগলিত অশ্রুপ্লাবন এক অজ্ঞাত আবহ-বিক্ষোভের বার্তা বহন করিয়া তুমুল বিপর্যয়ের সৃষ্টি করিল। এই বিপর্যয় শচীশ ও শ্রীবিলাসের প্রকৃতি-অনুযায়ী একজনকে স্তম্ভিত নিশ্চলতায় ও দ্বিতীয় জনকে নির্জন গ্রাম্যপথে অশান্ত, উদ্‌ভ্রান্ত পরিক্রমায় আবেগমুক্তির প্রেরণা যোগাইল। সেই রাত্রিতে সমুদ্রের ঢেউ যেন হৃদয়ের কান্নার মত উচ্ছ্বসিত হইয়া পার্থিব বেদনার সংবাদ নক্ষত্রলোকে বহন করিয়া লইয়া গেল।

ইহার পর শচীশের উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি ও শ্রীবিলাসের গোপন-না-করা দামিনী-প্রীতি গুরুকে আসন্ন বিপদের সঙ্কেত জানাইল ও রূপক-রসের আবরণে বাস্তব অগ্নিশিখাকে প্রশমিত করা যায় না এই সত্য গোচর করিল। নিরুপায় গুরুদেবও শেষ পর্যন্ত দামিনীকে অনুনয়ের ছদ্মবেশে আশ্রমত্যাগের প্রত্যাদেশ জারি করিলেন, কিন্তু দামিনীর দৃঢ়সংকল্প এতটুকু বিচলিত হইল না। লৌকিক প্রেমের সাহিত্যপাঠ লইয়া গুরুর সহিত দামিনীর শেষ সংঘর্ষেও দামিনীই জয়ী হইয়াছে ও সে জিদ করিয়া নিষিদ্ধ বইগুলি গুরুদেবের হেফাজৎ হইতে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছে। এই চরম সংগ্রামের পর গুরু নিশ্চয়ই ধৃতরাষ্ট্র-বিলাপের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছিলেন—'তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়'।

শচীশ ও শ্রীবিলাসের মধ্যে দামিনীকে লইয়া একটা নীরব দ্বন্দ্বের ঘাত-প্রতিঘাত আরম্ভ হইল। শ্রীবিলাসের সঙ্গে আড়ম্বর করিয়া সাহিত্যপাঠের মধ্যে দামিনীর যে উচ্চহাস্য মাঝে মধ্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত, তাহা মূল সাহিত্যরস আস্বাদন অপেক্ষা আরও ঝাঁঝালো রসের ফেনার ইঙ্গিত দিত। ইহা শচীশের ঈর্ষ্যা উদ্রেক করিবার উদ্দেশ্যেই নিয়োজিত হইত। এই ঈর্ষ্যা দ্বিকোটিক—শচীশের প্রতি সম্ভ্রম দেখানো ও শ্রীবিলাসের সহিত ঘরোয়া সম্পর্কের অভিনয় কাহারও পক্ষে রুচিকর হইল না। প্রেমে আড়াল না থাকিলে উহার তুচ্ছতাই অতিপ্রকট হইয়া পড়ে এই সত্য অতিপ্রশ্রয়পুষ্ট শ্রীবিলাসও ক্ষোভের সঙ্গে উপলব্ধি করিল।

ইহার পর পরিস্থিতির আর একটি নাটকীয় পরিবর্তন ঘটিয়াছে। শচীশ হঠাৎ গুরুদেবের অনুমতি লইয়া অজ্ঞাতবাসে বাহির হইল। আবার সেইরূপ অতর্কিতভাবে ফিরিয়া উদ্‌ভ্রান্ত মূর্তিতে দামিনীর রুদ্ধদ্বারে ঘা দিল ও দামিনীকে আশ্রমত্যাগের অনুরোধ জানানোর জন্য ক্ষমা চাহিল ও তাহার

নিকট পুনরায় অভ্যস্ত আশ্রমকৃত্যে যোগদানের প্রার্থনা জানাইল। দামিনী শচীশকে গুরুরূপে মানিয়া তাহার আদেশ নির্বিচারে পালন করিবার প্রতিশ্রুতি দিল। সে শচীশকে দয়িতের অভিসারকুঞ্জ হইতে সরাইয়া আনিয়া গুরুর অজিনাসনে প্রতিষ্ঠিত করিল ও এই নূতন সম্পর্কের মর্যাদা রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল। দামিনীর দহনজ্বালা প্রশমিত হইয়া স্নিগ্ধ দীপ-শিখার শান্তরূপ গ্রহণ করিল ও সে বিনা বিস্ফোরণে রসচক্রে তাহার নির্দিষ্ট স্থানটিতে ফিরিয়া গেল। গুরুর প্রতি প্রবল বিরাগ শচীশের নিকট আত্মনিবেদনের ঐকান্তিকতায় সহনীয় হইল ও তাঁহার সমস্ত ইচ্ছাই সে অতি বাধ্যভাবে পূরণ করিয়া চলিল। সংঘগুরুর প্রতি এই আনুষ্ঠানিক আনুগত্যের পিছনে তাহার স্বনির্বাচিত গুরুর প্রতি একনিষ্ঠ ভক্তি যে শক্তি যোগাইল তাহা আদি বা নূতন গুরু কেহই অনুমান করিল না। শচীশের নূতন অনুভবের মধ্যে এইটুকুই লক্ষণীয় যে সে দামিনীকে কেবলমাত্র ভাবরসের রূপক মনে না করিয়া তাহার ব্যক্তিগত অস্তিত্ব-মাধুর্যের প্রতি সচেতন হইয়া উঠিল। আর শচীশের প্রতি যখন কোন গূঢ় অভিমান রহিল না, তখন দামিনীর নিকট শ্রীবিলাস বা পশুপালনপ্রীতির পরোক্ষ প্রয়োজনীয়তাও অন্তর্হিত হইল—এই মন ভুলাইবার উপকরণগুলি একেবারেই পরিত্যক্ত হইল।

আপাতশান্তি প্রতিষ্ঠার পরই এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনার অভিঘাতে রসবিলাসের বুদ্‌বুদ বিদীর্ণ হইয়াছে। এই অবিরত রসচর্চার অবশ্যম্ভাবী ফলরূপে পরকীয়া প্রেমের অভিশাপ এক সুখী পরিবারের উপর বজ্রাঘাত হানিয়াছে ও একটি শোচনীয় আত্মহত্যার উপলক্ষ্য যোগাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ অতিপ্রসন্নভাবে গুরুদেবের ভাববিলাসসম্ভোগের আতিশয্যের উপরই এই ট্রাজেডির পূর্ণ দায়িত্ব চাপাইয়াছেন ও সংঘনেতাকে তাঁহার রোষব্যঞ্জনার তড়িৎশিখায় দগ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলে শচীশ ও শ্রীবিলাসের সমস্ত অব্যবস্থিতচিত্ততার ও মুহুর্মুহু পরিবর্তনশীলতার জন্য জ্যাঠামশায়ের ও তাঁহার নিজের দীক্ষাকে দায়ী করিতে হয়। যদি তিনি তাহা না করিয়া থাকেন তবে কোন শিষ্যের মতিভ্রমের জন্য বৈষ্ণবভাবসাধনাকে নিন্দা করা নিশ্চয়ই সমদর্শিতার পরিচয় নয়। উপন্যাসে যে জীবনসত্য বার বার ফুটিয়াছে তাহা ভাবাদর্শের সঙ্গে জীবনচর্যার অসঙ্গতি হইতেই প্রসূত—জীবনের দুর্দম প্রবৃত্তিকে যে কোন শিক্ষাদীক্ষার প্রভাবে উন্মূলিত করা যায়

না, তবু যে স্বভাব নিয়ন্ত্রণে অক্ষম তাহাই প্রমাণিত হইয়াছে। এমন কি ইংরেজ ঔপন্যাসিক মেরেডিথের "Ordeal of Richard Feverel" নামক শ্রেষ্ঠ উপন্যাসেও পিতার সতর্ক অভিভাবকত্ব ও সযত্নরচিত ব্যবস্থাও তরুণ পুত্রের দুর্বার প্রবৃত্তি সংযমনে ব্যর্থ হইয়াছে। সুতরাং যেখানে শৃঙ্খল ছেঁড়াই সার্বভৌম জীবননীতি সেখানে কেবল বৈষ্ণবরসতত্ত্বকে অভিযুক্ত করা জীবনসত্যবিরোধী মনে হয়।

যাহা হউক এই বজ্রাঘাতের পর দামিনী সর্বতোভাবে শচীশের উপর তাহার জীবনরথের সারথ্যভার সমর্পণ করিয়াছে ও শচীশও সেই দায়িত্ব স্বীকার করিয়াছে। ত্রিভুজের তিনটি বাহুই আশ্রমচক্র হইতে ছিট্‌কাইয়া বাহির হইয়াছে। দুইটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা উহাদের মধ্যে নূতন সম্পর্কের ছন্দ রচনা করিয়াছে। দামিনী শ্রীবিলাসকে বিবাহ করিয়াছে—উহার মনস্তাত্ত্বিক প্রেরণা পরবর্তী অধ্যায়ে সবিস্তারে আলোচিত হইবে।

৪

দামিনী ও শ্রীবিলাসের মধ্যে বিবাহান্তিক পরিণতি ঘটিবার পূর্বে ত্রিভুজতত্ত্বের নানা অস্থির আন্দোলন ভাবাবহকে ঘোরাল ও বিচলিত করিয়াছে। লীলানন্দ স্বামীর আশ্রমত্যাগের পর এই তিনটি জটিল সম্পর্ক-জড়িত প্রাণী ভবিষ্যৎসম্বন্ধে কিছুটা উৎকণ্ঠিত হইয়াছে। শচীশের নিকট যখন উইলে-পাওয়া জ্যাঠামশায়ের কলিকাতার বাড়ীখানায় আপতিক আশ্রয়ের প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছে, তখন সে মানস অপ্রস্তুতির অজুহাত দেখাইয়া উহা অগ্রাহ্য করিয়াছে। হয়ত সে ভাবিয়াছে যে জ্যাঠামশায়ের সম্পত্তি-দখল ও তাঁহার আদর্শে পূর্ণ বিশ্বাস সমসূত্রে গ্রথিত। সে তাহার সদ্যোলীলারসসম্ভোগের পর ও জ্যাঠার আপোষহীন যুক্তিবাদে ফিরিতে মন স্থির করিতে পারে নাই। সে কিন্তু দামিনী-শ্রীবিলাসকে ঐ বাড়ীতে একত্রবাসের অনুমতি দিয়া নিজে ভবিষ্যতে যোগদানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। ইহাতে কি তাহাদের দাম্পত্য সম্পর্কে তাহার অনুমোদন সূচিত হইয়াছে? যাহা হউক, শচীশকে একলা ফেলিয়া দামিনী এই প্রস্তাবে রাজী হয় নাই ও তাহাদের উভয়ের উপর আত্মভোলা শচীশের খবরদারির দায়িত্ব চাপাইয়াছে। এই প্রস্তাবে শ্রীবিলাসের মনে যুগপৎ ঈর্ষ্যা ও আত্মপ্রসাদের ভাব উদ্দীপ্ত হইয়াছে। সুতরাং সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হইল যে সম্মুখের

পড়ো বাড়ীতে আপাততঃ তাহাদের বাসস্থান নির্দিষ্ট হইবে। দামিনীর দ্বারা গুরুসম্বন্ধস্বীকৃতির পুনর্ঘোষণায় ও শ্রীবিলাসের যথাসম্ভব নেপথ্যাবলুপ্তির প্রতিশ্রুতিতে আশ্বস্ত হইয়া শচীশ উহাতে সম্মতি দিয়াছে।

এই বোঝাবুঝির পর শচীশের অধ্যাত্ম সাধনার একটা নূতন তত্ত্ব-পরিচয় আমাদের নিকট ব্যঞ্জিত হইয়াছে। নির্বিচার গুরুবাদ ও উৎকট যুক্তিবাদের অসারতা প্রতিপন্ন হইবার পর শচীশের মনে এক নূতন সত্যের আলোক ঝলসিয়া উঠিয়াছে। ইহা আত্মানুভূতির অনন্যপথ দিয়া ভগবৎ-স্বরূপের সন্ধান। ইহা গীতার স্বধর্মনিষ্ঠা ও রবীন্দ্রনাথের কবি-চেতনার নিগূঢ় উপলব্ধির সমগোত্রীয় ও আপ্তবাক্যসমর্থিত। শচীশের এই সাধনা তাহার দেহবিষয়ে একান্ত নিঃস্পৃহতা ও দেহভারমুক্ত আত্মার অসহনীয় দ্যুতিপ্রখরতায় আভাসিত হইয়াছে। এই তপস্যা চরমে উঠিয়াছে শচীশের নির্জনতার প্রতি আকর্ষণে ও দামিনীর ব্যাকুল সেবার প্রত্যাখ্যানে। যে বর্ণহীন, ছায়াশূন্য, প্রখর রৌদ্রতপ্ত বালুমরুর বহ্নিবেষ্টনীতে সে তাহার তপের আসন বিছাইয়াছে তাহা চরম শূন্যতার প্রতীকরূপে একদিকে প্রকৃতির ভাবলেশরিক্ত ঔদাসীন্য, অপরদিকে সাধকের কোমলবৃত্তিনিঃশেষিত মনোলোকের ব্যঞ্জনাবহ। বহির্জগতের মধ্য দিয়া ভাবদ্যোতনার ইঙ্গিতময়তা এখানে অপূর্বভাবে উদ্‌ভাসিত। প্রত্যাখ্যাতা দামিনী ফিরিয়া আসিয়া অজস্র অশ্রুধারায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু শ্রীবিলাসের সমবেদনা ও শচীশেব বিরুদ্ধে অন্ধতার অনুযোগ কোনটাকেই সে আমল দেয় নাই।

এই মর্মান্তিক আঘাতের প্রতিক্রিয়ায় শচীশ আবার কিছুদিন সহজ আদান-প্রদানের প্রীতিময় জীবনে ফিরিয়াছে। দামিনী কিন্তু তাহার ঔদাসীন্য অপেক্ষা তাহার সহৃদয়তাকেই আরও সন্দেহের চক্ষে দেখিয়াছে। ইহাতে সে আর একটা আসন্ন দুর্যোগের পূর্বসূচনা অনুভব করিয়াছে। একদিন মধ্যরাত্রে সেই ভূতুড়ে বাড়িতে শচীশ হঠাৎ ভূতে-পাওয়া মানুষের মত দামিনী ও শ্রীবিলাসকে ঘুম হইতে জাগাইয়াছে। যে নবউপলব্ধির জোয়ার তাহার অন্তরকে কূলে কূলে পূর্ণ করিয়াছে তাহাকে মুক্তি দেওয়ার অদম্য উচ্ছ্বাস তাহাকে এই অদ্ভুত আচরণে প্রণোদিত করিয়াছে। ইহাকে সে একটি তত্ত্বব্যঞ্জনার রূপকে অভিব্যক্তি দিয়াছে। সে সাধনার বলে আবিষ্কার করিয়াছে যে, ভগবানের গতির বিপরীত দিকে না চলিলে তাঁহার নাগাল পাওয়া যায় না। তাঁহার গতি যেমন অরূপ হইতে রূপজগতের দিকে,

সাধনার গতি হইবে রূপলোক হইতে অরূপলোকের অভিমুখে। তিনি যেমন মুক্তি হইতে বন্ধনের দিকে আসিতেছেন, আমরা যদি সেইরূপ বন্ধন হইতে মুক্তির দিকে না চলি তবে আমাদের মিলনতীর্থ কেমন করিয়া রচিত হইবে? অন্ধকার নিশীথের রহস্যলোক হইতে এই তত্ত্ব গীতমূর্ছনার ছন্দে শচীশের নিকট সদ্য পরিবেশিত হইয়াছে। রাগিণী যেমন গায়কের আনন্দ-প্রেরণার মূর্ত রূপ, শ্রোতার নিকট তেমনি ইহা আনন্দ-উৎসে প্রত্যাবর্তন। আনন্দ হইতে রূপ ও রূপ হইতে অমূর্ত আনন্দ এই উভয় বিপরীতমুখী গতির সমন্বয়েই সঙ্গীতের রসসিদ্ধি। অবশ্য এই তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের নিজ কবিমনের অনুভূতির প্রতিধ্বনি; শচীশের সাধনা এখানে রবীন্দ্রসাধনারই পুনরভিনয়। শচীশের জীবনে ইহা কিরূপে বিকশিত হইল, বা দামিনী শ্রীবিলাসের ইহা বোধগম্য হইল কি না সে বিষয়ে লেখক সম্পূর্ণ নির্বিকার। অসীমের প্রতি আত্মবোধসঞ্চারের আকূতি লইয়াই শচীশ আবার ধ্যাননির্জনতায় ফিরিয়া গেল।

এই অন্বেষণের উদগ্র উল্লাস এক ঝঞ্ঝাবাতবর্ষণক্ষুব্ধ রাত্রে প্রলয়ের তাণ্ডবমত্ততায় চরমে উঠিল। এই দুর্যোগের বর্ণনা সাংকেতিকতার তড়িৎ-শক্তিতে ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে। প্রকৃতির বিক্ষোভ প্রচণ্ডতর আত্মিক বিক্ষোভকে সূচিত করিয়াছে। দামিনী দরজা-জানলা বন্ধ করিবার জন্য শচীশের কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র, আর এক গুহাবাসরজনীর অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতায় বিভীষিকাগ্রস্ত শচীশ এই প্লাবনের মধ্যে সমস্ত ঝড়বৃষ্টি মাথায় করিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে। দামিনী তাহাকে খুঁজিতে গিয়া তাহার অনুসরণ করিয়াছে। বিদ্যুতের চকিত আলোকে শচীশকে নদীর ধারে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া দামিনী তাহার পদে লুণ্ঠিত হইয়া তাহাকে অকারণ শাস্তি দেওয়ার জন্য অনুযোগ জানাইয়াছে ও তাহাকে ফিরিয়া যাইতে রাজি করিয়াছে। এই মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার পর দামিনী শচীশের সান্নিধ্যে থাকিতে সাহসী হয় নাই ও তাহাকে কলিকাতায় পৌঁছিয়া দিবার জন্য শ্রীবিলাসকে মিনতি জানাইয়াছে। বিদায়ক্ষণে শচীশ ও দামিনী পরস্পরের নিকট অপরাধ স্বীকারপূর্বক ক্ষমা চাহিয়াছে। এত অপমানের পরও কিন্তু দামিনী শ্রীবিলাস কর্তৃক শচীশের নিন্দা সহিতে পারে নাই। সে শচীশের অবিচারের কথা উপেক্ষা করিয়া গুরুরূপে শচীশ যে তাহাকে আত্মধ্বংস হইতে বাঁচাইয়াছে তাহাই শ্রীবিলাসকে অবগত করাইয়াছে। শচীশের সহিত

ঘাত-প্রতিঘাত-ক্ষুব্ধ, সংশয়-সন্দেহে আবিল, মনোভাবের রূপান্তরে জটিল সম্পর্কের উপর এতদিনে শেষ যবনিকাপাত হইয়াছে।

শচীশের নিকট বিদায় লইবার পর দামিনী কলিকাতায় আসিয়াছে, কিন্তু সেখানে তাহার আশ্রয়সন্ধান ব্যর্থ হইয়াছে। সকল দুয়ার হইতে ফিরিয়া দামিনী শেষ পর্যন্ত লীলানন্দ স্বামীর আশ্রমে প্রত্যাবর্তনের চরম সিদ্ধান্ত লইয়াছে। এই সঙ্কটতম মুহূর্তে শ্রীবিলাস তাহাকে উদ্ধারের একটা পথ দেখাইয়াছে—তাহা শ্রীবিলাসের সহিত আইনসিদ্ধ দাম্পত্যবন্ধনস্বীকৃতি। দামিনী প্রথম এ প্রস্তাবে চমকিয়া উঠিয়াছে, উহাকে পাগলের প্রলাপ বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছে। কিন্তু শ্রীবিলাস পাগলামির যে একটা অসম্ভব-সমস্যা সমাধানের শক্তি আছে তাহা প্রত্যুত্তরে জানাইয়াছে।

বিবাহের প্রয়োজনের দিকটায় উভয়ের মতৈক্য ঘটিলে উহার রুচি ও আবেগগত দিকটা উত্থাপিত হইয়াছে। শ্রীবিলাসের যুক্তি হইল তাহার নিজ ব্যক্তিত্বের তুচ্ছ উপেক্ষণীয়তা—দামিনী তাহাকে বিবাহ করিলে শূন্যতাকে গ্রহণ করিবে। দামিনী তাহার অনুগতচিত্ততার ইঙ্গিত করিয়াও শ্রীবিলাসের মনের উপর উহার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার কথা স্মরণ করাইয়া তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চাহিয়াছে। শ্রীবিলাস কিন্তু ইহাতেও দমে নাই—সে তাহার বর্তমান অসহনীয় অবস্থার যে কোন তারতম্য ঘটিবে না সে বিষয়ে সুনিশ্চয়। যাহা হউক, শেষ পর্যন্ত গোলেমালে, অন্ধকারে ঝাঁপ দেওয়ার মত এই গুরুতর সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। কেহ কাহারও মনের খবর পূর্ণভাবে না পাইয়াও একটা দায়ঠেকা ব্যবস্থার মত তাহাদের মিলনকে মানিয়া লইল।

কিন্তু তাহার পরেই এক অভাবনীয় রূপান্তর ঘটিয়া গেল। এই প্রয়োজনাত্মক বাধ্যতামূলক বিবাহের কণ্টকবৃক্ষে কোন যাদুমন্ত্রে প্রেমের পারিজাতকুসুম বিকশিত হইয়া উঠিল। কলিকাতার নীরস, গদ্যময় পরিবেশ রাতারাতি আদর্শ প্রণয়ের সঙ্গীতময়, সৌরভবাসিত পুষ্পমালঞ্চের ইন্দ্রজাল বিকিরণ করিল। এই অঘটন-ঘটনের কোন মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথ দেন নাই—প্রেমিকযুগলের মনের গভীরে এই মুগ্ধ বিস্ময় প্রকৃতির নিগূঢ় নিয়মে উহার পেলব দলগুলি মেলিয়া ধরিয়াছে ও স্মৃতিরোমন্থনের আনন্দগাঢ়তায় রোমাঞ্চিত হইয়াছে। দামিনীর ক্ষেত্রে বলা বলা যায় যে শচীশের প্রতি তাহার অবদমিত, ভক্তির ছদ্মবেশ-পরা আকর্ষণ যাদুদণ্ডের মায়াস্পর্শে

পাত্রান্তরন্যস্ত হইয়াছে—একটা হঠাৎ ধাক্কায় যেন তাহাদের মধ্যে অনন্ত কালের ব্যবধান ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। শচীশের উদ্দেশ্যে রোপিত ও তাহারই বিরহবেদনায় লালিত বৃক্ষের অপূর্ব মধুর ফল শ্রীবিলাস আস্বাদন করিয়াছে। শ্রীবিলাসের দিকে কোন পরিবর্তনই হয় নাই—তাহার চিরনিবেদিত অর্ঘ্য যে দেবতা গ্রহণ করিয়াছেন ইহাই তাহাকে ধন্য করিয়াছে।

বিবাহের দিন ঠিক হইলে দামিনী ও শ্রীবিলাস উভয়ে গিয়া শচীশকে তাহার নির্জনবাস হইতে ছিনাইয়া আনিল। বিবাহ-সংবাদে শচীশের অপরিমিত আনন্দ-উচ্ছ্বাস কোন গভীরবোধপ্রসূত নয়, ছেলের খেলনা-প্রাপ্তিতে অহেতুক উল্লাসের সমগোত্রীয়। শচীশ এখন যে লোকে বিচরণ করিতেছে, সেই অসীম সাধনের তপঃলোকে হয়ত বিবাহ-সানাইএর রাগিণী পৌঁছায় না—সেই বায়ুহীন ভাবস্তরে সব সঙ্গীত স্তব্ধ হইয়া যায়। এই বিবাহের নিমন্ত্রণ-সভা হইতে বিদায় লইয়া শচীশের উপন্যাস-জগৎ হইতেই অন্তর্ধান। দামিনীর বিক্ষুব্ধ আত্মাকে শান্ত করিয়া উহাকে মধুর পরিণামের জন্য প্রস্তুত করার তাহার যে বিধিনির্দিষ্ট ভূমিকা ছিল তাহা শেষ করিয়াই তপোভঙ্গকারী, বিপরীত প্রবৃত্তির সংঘাতক্ষুব্ধ সংসার-জীবন হইতে তাহার চিরপ্রয়াণ।

দামিনী-শ্রীবিলাসের দাম্পত্যজীবন ঘটনারিক্ত। কিন্তু উহার ফাঁকে ফাঁকে পূর্ণপ্রাপ্তির দক্ষিণাবায়ুর অবাধ সঞ্চরণ। এই সংসারযাত্রা কর্তব্য-নিষ্ঠায় নিরলস, আত্মত্যাগে উদার, আতিথেয়তায় প্রশস্ত, ও অন্তঃশীল মাধুর্যে কাব্যছন্দময়। প্রণয়মুগ্ধতার এই ক্ষণবসন্ত কিন্তু স্বল্পায়ুত্বের অভিশাপগ্রস্ত। ইহার ভাবরসের অপরূপত্ব দ্রুতনিঃশেষিত! এই পেলব কুসুম কাল-ভ্রমরের পদক্ষেপ সহ্য করে নাই। দুই বৎসরের মধ্যেই এই সুখস্বপ্ন ফুরাইল। দামিনীর অকালমৃত্যুর মধ্যে লেখক একটা নাটকীয় ঔচিত্যবোধ সঞ্চার করিয়াছেন। গুহা-অভিসারের উদ্‌ভ্রান্ত নিশীথে শচীশের অনভিপ্রেত পদাঘাতে দামিনীর যে বক্ষোবেদনা তাহা মানস অনুভব হইতে শরীরী ব্যাধিতে রূপ লইয়াছে। এই মর্মান্তিক স্মৃতিই মরণান্তিক রোগযন্ত্রণায়, অবচেতন হইতে দেহানুভবে সংক্রামিত হইয়াছে। এই ভৃগুপদচিহ্ন বুকে আঁকিয়াই দামিনী পরলোক-যাত্রা করিয়াছে। শচীশের সঙ্গে তাহার নিয়তি-রচিত অদৃশ্য বন্ধন শেষ যাত্রায়ও তাহার অনুগামী হইয়াছে।

সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য, দামিনীর মৃত্যুকালীন ভাষণে শ্রীবিলাসের প্রতি তাহার অতৃপ্ত প্রেমনিবেদন ও জন্মান্তরে তাহাকে পাইবার আকুতি-প্রকাশ। মনে হয় উভয়ের স্বল্পকালীন বিবাহ-জীবনে এমন একটা গভীর একাত্মতা উন্মেষিত হইয়াছে, যাহা পূর্ব ইতিহাসে অভিব্যক্ত ত হয়ই নাই, এমন কি আভাসিতও হয় নাই।

ইহার কালানুক্রমিক পরবর্তী পরিণতি অধ্যায়ের প্রারম্ভেই পূর্বসূচিত হইয়াছে। দামিনীর মৃত্যুতে শ্রীবিলাসের ভাবোচ্ছ্বাস ও জীবন-তত্ত্ব-সমীক্ষা তাহার মনোলোকের একটা সুপরিণত ভাবধারার পরিচয় দিয়াছে। শরৎচন্দ্র যেমন 'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্বে দীঘির ভাঙা ঘাটে বসিয়া জীবনের অনিত্যতা ও কালের ধ্বংসলীলা সম্বন্ধে দার্শনিক মননের জাল বুনিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ শ্রীবিলাসের জবানীতে এক সর্বরিক্ত, শোকস্তব্ধ মুহূর্তে জীবন-মর্মসত্যের সেই নিগূঢ় উপলব্ধি প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীবিলাস এই ধ্বংসপ্রাপ্ত নীলকুঠির প্রায়লুপ্ত স্মৃতিচিহ্ন দ্বারা অনুভাবিত হইয়া জীবন-প্রহেলিকার জট উন্মোচনে ব্রতী হইয়াছে। দামিনীর মৃত্যু শঙ্করাচার্যের মোহমুদ্গরের সুলভ বৈরাগ্যবিলাস বা সাধারণ গৃহস্থের ক্ষণিক, সহজ-সান্ত্বনাসিঞ্চিত বিহ্বলতার সঙ্গে একসুরে বাঁধা নয়। দামিনী কেবল লৌকিক সম্পর্কের একটা খণ্ডিত প্রতীক নয়। সে সমস্ত সঙ্কীর্ণ সম্বন্ধের অতীত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ মানবাত্মা। কাজেই তাহার অবলুপ্তি "কালের উঠান-নিকানোর" মত একটা উপরিভাগের মার্জনাক্রিয়া মাত্র নয়, তাহা জীবনের গভীর মূলদেশে একটা দুশ্চিকিৎস্য ক্ষত, সৃষ্টির শাশ্বত ছন্দে একটা পূরণহীন ছেদ। দামিনী-কে সে শুধু গার্হস্থ্য ধর্মের খণ্ডিত ভূমিকায় দেখিতে অভ্যস্ত হয় নাই—তাহাকে সে কোন দিনই গৃহিণীর আটপৌরে রূপে দেখে নাই। সে নিজেও বিবাহ-বিমুখ—আবেশহীন চোখে ভাবমুগ্ধতার অন্তরালহীন সত্যের দিবালোকে তাহার সহিত দামিনীর শুভদৃষ্টি বিনিময় হইয়াছিল। কাজেই প্রিয়জনবিয়োগে যে শোক ও উহার ক্রমিক অবশ্যম্ভাবী উপশম, তাহা দামিনীর সহিত তাহার বিচ্ছেদের বিপর্যয়-গভীরতার যথার্থ পরিমাপক নয়। এই জীবনচিন্তার মধ্যে শ্রীবিলাসের কোন নূতন পরিচয় পাই বা না পাই, দামিনী-চরিত্রের অনন্যতা নব তাৎপর্যে ফুটিয়া উঠে। এই বর্ণনায় মৃত্যুর নিশান-মারা অধিকার-ভূমিতে বন্য গাছ-গাছড়ার অস্বাভাবিক পল্লবঘনতায় জীবনচেতনার উদ্বেলতা

লেখকের মনে এক আশ্চর্য সঙ্কেতময় উপমার উদ্দীপন করিয়াছে—জীবন যেন মৃত্যুর বাসরঘরে প্রবেশ করিয়া ব্যঙ্গরসিকা শ্যালিকার মত বরবেশী মৃত্যুর কান মলিয়া দিয়াছে। দামিনীও কি উদ্ধত জীবন-বোধের অদম্য কৌতূহলে মৃত্যুর সর্বজয়ী শক্তিকে ব্যঙ্গ করিয়া অন্তঃপুরের নেপথ্যলোকে অন্তর্ধান করিয়াছে?

৫

সর্বশেষে উপন্যাসটির প্রকৃতি-নির্ণয় ও উহার রীতিবৈশিষ্ট্যের প্রয়োগ-কুশলতা সম্বন্ধে কিছু আলোচনার প্রয়োজন। এই ক্ষুদ্র উপন্যাসটির গঠনশিল্প ও ভাবপ্রেরণা রবীন্দ্রনাথের জীবন-সমীক্ষাপদ্ধতির একটি সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিভঙ্গী সূচিত করে। ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য বাস্তবচিত্রণ বা পাত্রপাত্রীর চরিত্রবিশ্লেষণ ও ঘটনাগ্রন্থনের মাধ্যমে কোন সমগ্র জীবনসত্যপ্রতিপাদন নয়। ইহা আখ্যানপ্রধান ও বস্তুনিষ্ঠ না হইয়া সমস্যামূলক ও ইঙ্গিতধর্মী হইয়াছে। লেখক তত্ত্ব-প্রভাবিত মন লইয়া একটা স্বল্পায়তন জীবনাংশকে বাছিয়া লইয়াছেন ও উহাতে কয়েকটি সীমিতসংখ্যক চরিত্রের ঘাতপ্রতিঘাতের মাধ্যমে একটি বিশেষ সমস্যার গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়াছেন। এ যেন বিজ্ঞান-বীক্ষণাগারে একটি বিশেষ পদার্থের বিশেষ অবস্থার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার পর্যবেক্ষণ ও উহার গুণাগুণসম্বন্ধে সিদ্ধান্তগ্রহণ। এই উপন্যাসেও তেমনি একটি নির্দিষ্ট তত্ত্বভূমিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ কয়েকটি জীবনের বিকাশ, বিকার ও পরিণতির একটি মনস্তত্ত্বসম্মত ও আবেগের রংএ চিত্রিত মানস মানচিত্ররচনার প্রয়াস দেখা যায়। তত্ত্বপরীক্ষার ছায়া যতদূর সম্প্রসারিত হইতে পারে, জীবনপরিধিও ঠিক ততদূর বিস্তৃত। ক্যানেলের জল যেমন উহার গভীরতা ও আয়তন দ্বারা কৃত্রিমভাবে নিয়ন্ত্রিত, তেমনি কেবল তত্ত্বপরীক্ষার জন্য যেটুকু জীবনরসধারার প্রয়োজন তাহাতে কোন সার্বভৌম জীবনসত্য প্রতিবিম্ব ফেলিবার বা বেগ সঞ্চয় করিবার পরিবেশ পায় না। এই সঙ্কীর্ণ ও পরিস্থিতিনির্ভর জীবনসত্যের জন্য কোন উদার পটভূমিকাও অপ্রয়োজনীয়। সুতরাং 'চতুরঙ্গ'-এ যেমন সীমিত পরিবেশ ও চরিত্রসংখ্যা, জীবননাটকের পরিচয়ও তেমনি আংশিক। ইহা পরিতৃপ্তির পরিবর্তে কৌতূহলই বেশী জাগায়,

উদ্ঘাটন অপেক্ষা উন্মোচনই বেশী করে, প্রতিপাদন অপেক্ষা সঙ্কেতের উপরই অধিক নির্ভরশীল। রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসে তেমনি পরিচিত সত্য অপেক্ষা অপ্রত্যাশিত দৃষ্টিভঙ্গীর উদ্বোধন, নূতন দিগন্তের অন্তরালে যে অনাবিষ্কৃত রহস্য প্রচ্ছন্ন আছে তাহারই দ্যোতনার প্রতি বেশী জোর দিয়াছেন। চারিটি পাত্র-পাত্রী, জ্যাঠামশায়ের শিক্ষালয়, লীলানন্দ স্বামীর রসচর্চার আশ্রম, প্রকৃতি ও পল্লীপরিবেশ ও কলিকাতার ঈর্ষ্যাদ্বেষে আবিল, মতবাদসংঘাতে বিক্ষুব্ধ, জনস্রোতে উত্তাল রণক্ষেত্র—ইহাদের সমবেত প্রভাবে হৃদয়সমুদ্রমন্থনজাত যে বিষ ও অমৃত উঠিয়াছে তাহাই ইহার ক্ষুদ্র পাত্রে অপূর্ব আস্বাদের সহিত পরিবেশিত হইয়াছে। ইহার পেয়ালাটি ছোট, কিন্তু ইহার অন্তরের তরঙ্গসংঘাতটি সমুদ্রকল্লোলের সহিত এক ছন্দে বাঁধা।

ঘটনাবিন্যাসের দিক দিয়া বিচার করিলে উপন্যাসটির ধারাবাহিকতার অভাব ও সঙ্কেতভাস্বরতা পরিস্ফুট হয়। প্রথম ভূমিকা-অংশে জ্যাঠামশায়ের ভাবাদর্শ ও জীবনকাহিনী সবিস্তারেই আলোচিত হইয়াছে। এইটুকু পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের লক্ষণান্বিত। ইহার কারণ বোধ হয় জ্যাঠামশায়ের উপন্যাস মধ্যে কার্যকারিতা ভূমিকাতেই নিঃশেষিত। তাঁহাকে নানাদিক হইতে দেখিবার, নানাবর্ণ আলোকে উদ্ভাসিত ও নানাভাবস্রোতে তাড়িত-ঘূর্ণিতরূপে দেখিবার কোন ভবিষ্যৎ অবকাশ নাই। মৃত্যু আসিয়া তাঁহার জীবনে পূর্ণচ্ছেদ টানিয়া দিয়াছে। যে প্রজ্বলন্ত হাউই তিনি ভাবাকাশে উৎক্ষিপ্ত করিয়াছেন তাহার বিস্ফোরণ-বিদারণ তিনি দেখিয়া যান নাই। শচীশ ও শ্রীবিলাসের ভবিষ্যৎ আবর্ত-আলোড়নের সহিত তাঁহার প্রত্যক্ষযোগ ত নাইই, এমন কি আত্মিক যোগও সুস্পষ্ট নয়। কাজেই তাঁহার নীতি ও আচরণের তথ্যবহুল বিবরণ-সাহায্যে তাঁহার ব্যক্তি-পরিচয় পূর্ণপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মূল কাহিনীটি অন্তরীপের মত সূচ্যগ্র ও এক অনাবিষ্কৃত মহাদেশের দিগন্ত উন্মোচন, কিন্তু উপক্রমণিকাটি মহাদেশের মত নিবিড় ও নিশ্ছিদ্র। মহাদেশকে অন্তরীপসঙ্কটে প্রবেশের দ্বাররূপে প্রয়োগ এক অদ্ভুত রীতি-বৈপরীত্যের নিদর্শন।

মূল উপন্যাসের কাহিনী-বিন্যাস কতকগুলি বিচ্ছিন্ন দৃশ্যপটের উন্মোচন—উহাদের মধ্যে কার্যকারণসূত্রসংযোগ অনুমানগম্য ও উহাদের নাটকীয় রসঘনতা দ্রুত ও অভাবনীয় পরিবর্তন-ঘূর্ণীর মধ্যে পাক খাওয়ার ফল। এই

দৃশ্যাবলীর মধ্যে অনুস্যূত মানবিক ঘাত-প্রতিঘাত যে সব বিরল ক্ষেত্রে ক্রান্তি-পরিণতিতে উত্তীর্ণ হইয়াছে সেইসব উপলক্ষ্যে উহাদের নাটকীয় নিবিড়তা ও সাঙ্কেতিক ভাবৈশ্বর্য পাঠকের মনে চমকিত বিস্ময় জাগায়। ঘটনার যে এত বেগ ও এত প্রচণ্ড বিস্ফোরকশক্তি তাহা উহাদের মন্থর গতি ও চাপা উত্তেজনা হইতে অনুমান করা যায় না। সুতরাং উহারা যখন বজ্রের ন্যায় আমাদের মাথার উপর ফাটিয়া পড়ে, তখনই আমরা আকাশের দিকে চাহিয়া উহার মধ্যে বিদ্যুৎগর্ভ ঘনঘটার করালছায়া সম্বন্ধে সচেতন হই। এরূপ ক্রান্তিলগ্ন 'শচীশ'-অধ্যায়ের দশম অনুচ্ছেদের গুহা-দৃশ্যে, 'দামিনী'-অধ্যায়ের ষষ্ঠ অনুচ্ছেদে নবীনের স্ত্রীর আত্মহত্যাকাহিনীতে, 'শ্রীবিলাস'-অধ্যায়ের পঞ্চম অনুচ্ছেদে অন্তরপ্রলয়ের প্রতিরূপ ঝঞ্ঝাবর্ষণক্ষুব্ধ নিশীথের বর্ণনায় ও প্রথম অনুচ্ছেদে দামিনীর মৃত্যুর পরে শ্রীবিলাসের জীবনমৃত্যুর সম্পর্করহস্যভেদের প্রয়াসে—এই চারিটি দৃশ্যে উহার আগ্নেয় স্বাক্ষর মুদ্রিত করিয়াছে। এই ক্রান্তি-মুহূর্তগুলি হইতে আমরা উপলব্ধি করি যে এই সংসারবিমুখ, তত্ত্বমুগ্ধ নর-নারীর স্তিমিত চেতনার নীচে আদিম প্রাণোচ্ছ্বাস কিরূপ দুর্বার বেগে, কিরূপ প্রচণ্ড ফেনিলতায় ক্ষুরধার নদীর মত বহিয়া চলিয়াছে। লেখকের বিশেষ রীতি হইল সমতলভূমির বিস্তৃত বর্ণনা ছাড়াই উহা হইতে উদ্‌গত ভাবশিখরচূড়াগুলির দুরবগাহ, সু-উচ্চ মহিমার অতর্কিত উদ্‌ঘাটন ও মূল্যায়ন। বরফগলার ইতিহাস অনুক্ত রাখিয়া সেই গলিত-বরফপুষ্ট, পার্বত্য স্রোতস্বিনীর ঐরাবত-ভাসান দুর্ধর্ষতা পাঠকের চেতনায় প্রতিফলিত করাই এই রীতির মর্মকথা ও উহার রসোত্তীর্ণতার পরিমাপক।

এবার চরিত্রায়নের মূলসূত্রসন্ধানের চেষ্টা করা যাইতে পারে। জ্যাঠামশায় পুরোপুরি তত্ত্ববিগ্রহ—তাঁহার শিরা-উপশিরায় মানবোচিত উষ্ণ শোণিত-স্রোতের পরিবর্তে তত্ত্বচেতনার তুষারধারা বহিয়া গিয়াছে। তিনি জীবনের বিচিত্র রস ও রূপ হইতে তাঁহার সমস্ত চিত্ত প্রত্যাহার করিয়া কেবল তত্ত্বাদর্শের পক্ষিমুণ্ডের প্রতি তাঁহার সমস্ত শরসন্ধানের উদ্যম নিবদ্ধ রাখিয়াছেন। তাঁহার লৌহবক্ষপিণ্ডের মধ্যে কোন অন্তর্দ্বন্দ্বের কম্পন নাই—তাঁহার সমস্ত জীবন-পরিকল্পনা ও জীবনপ্রয়াস একই লক্ষ্যে অবিচল। একচক্ষু হরিণের মত তিনি তাঁহার সমস্ত শক্তি একদিকের আক্রমণ-প্রতিরোধের জন্য নিয়োজিত করিয়াছেন। অন্যদিক হইতে বাণ আসিয়া যে তাঁহাকে কোন অরক্ষিত স্থানে বিদ্ধ করিতে পারে সে সম্ভাবনা সম্বন্ধে

তিনি সম্পূর্ণ অন্ধ। তাঁহার যুক্তি-আশ্রয়ী মানবহিতবাদ এত চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে যে তিনি জোর করিয়া ননিবালার বিবাহ দিয়া তাহার সমস্ত সমস্যা সমাধান করিবার স্বপ্নে মসগুল হইয়াছেন। তাহার নিজের একটা মন আছে, যাহা যুক্তির একেশ্বরবাদ মানে না, যাহা কেবল নিরাপদ আশ্রয়ের কাঙালী নয়, যাহা হৃদয় ও নীতিসংস্কারকে জীবননিয়ন্তার আসনে বসাইতে চায়, এই সত্য তাঁহার একদেশদর্শী জীবনবোধে কোন ছায়াপাত করে না। তাঁহার শত্রু সব আচারনিষ্ঠ ধর্মধ্বজীর দল, তাঁহার সমস্ত সংগ্রাম এই সত্যদ্বেষী ভণ্ডদের বিরুদ্ধে। তাঁহার নিজের যে গৃহশত্রু থাকিতে পারে, তাঁহার আশ্রিতদের মধ্যে কেহ যে তাঁহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারে, তাঁহার স্নেহপরিচর্যার যে গূঢ় প্রতিশোধ দিতে পারে, তাহা তাঁহার কল্পনাতীত। সেই অকল্পনীয় সত্যই ননিবালার মর্মান্তিক আত্মহত্যার মধ্যে তাঁহার সম্মুখে মূর্তি ধরিয়া দাঁড়াইল। অবিমিশ্র যুক্তিবাদের শোচনীয় ব্যর্থতা এই একটি ঘটনাতেই সুস্পষ্ট হইল। জ্যাঠামশায়ের উপর ইহার মানস প্রতিক্রিয়া তাঁহার প্রশ্রয়দাতা স্রষ্টা লিপিবদ্ধ করিবার দুঃসাহস দেখান নাই। জ্যাঠামশায় তত্ত্বপরিবেশে লালিত তত্ত্বাদর্শের প্রতিমূর্তি—ইহাই তাঁহার সত্য পরিচয়।

হয়ত এই নিদারুণ অভিঘাতের প্রতিক্রিয়া শচীশের মধ্যেই একটা মর্মান্তিক আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। শচীশ যে যুক্তিবাদ পরিহার করিয়া সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী গুরুবাদ ও ভক্তিচর্চায় আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছে এই উৎক্ষেপ-সংবেগের কোন ব্যাখ্যা ঔপন্যাসিক দেন নাই—আমাদের নিকট সম্পন্ন সিদ্ধান্তরূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন। এরূপ ক্ষেত্রে অনুমান করা সঙ্গত, শুধু সঙ্গত নয়, অনিবার্য হইয়া পড়ে যে শচীশের এই বিপরীত কোটিতে উৎক্রমণ ননিবালার আত্মহত্যারই প্রতিক্রিয়া। জ্যাঠামশায় তাঁহার অন্তর-রহস্যটি ইহজীবনে প্রকাশ না করিয়া পর-লোকের নীরবতায় প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার দীক্ষিত ভাবশিষ্য হয়ত জ্যাঠামশায়ের অনুচ্চারিত অভিপ্রায়ের অমোঘ ইঙ্গিতেই এই ভক্তিরস-বিলাসে সমস্ত আত্মাভিমানকে নিমজ্জিত করিয়াছে। ননিবালার করুণ কাহিনী তাহার যে স্মরণে ছিল তাহার প্রমাণ ননিবালার সহিত দামিনীর তুলনায়। শ্রীবিলাস যখন তাহার অভাবনীয় মতিপরিবর্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছে, তখন নিশ্চয়ই জ্যাঠামশায়ের স্মৃতির মর্যাদা রাখিবার

জন্যই সে তাঁহার আদর্শ-ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করে নাই। শচীশ যে দামিনীর প্রচণ্ড আকর্ষণের প্রতি এত দীর্ঘকাল উদাসীন ছিল, তাহার হেতু ননিবালার মর্মদাহী, অনুতপ্ত স্মৃতির মধ্যেই নিহিত। নারীসান্নিধ্যের সাংঘাতিক পরিণামই তাহাকে নারীসঙ্গবিমুখ রাখিয়াছে; সুতরাং দামিনী ও তাহার মধ্যে মানস দ্বন্দ্বের যে ঘাতপ্রতিঘাত চলিয়াছে তাহার তীব্রতা ও দীর্ঘস্থায়িত্ব এই অভিজ্ঞতার ফল বলা চলে। শচীশ ও দামিনী-চরিত্রের সূক্ষ্মতর সুর-পরিবর্তনেও ননিবালার পরোক্ষ প্রভাব অনুভব করা যায়। গুহাভিসারের দৃশ্যে এই কামনাপ্রবৃত্তির নির্লজ্জ লোলুপতা ও স্থূল বীভৎসতা অপূর্ব সাঙ্কেতিক নিগূঢ়তায় ব্যঞ্জিত হওয়ায় এই অশালীন আসক্তির উপর একটা শোভন আবরণ টানা গিয়াছে। শচীশ এইবার দামিনীর গুরুর পদ গ্রহণ করিয়াছে ও এই গুরুপদস্বীকৃতি জ্যাঠামশায়ের সার্বজনীন গুরু-ভূমিকারই বিলম্বিত প্রতিচ্ছায়ারূপে ব্যাখ্যা করা যায়। জ্যাঠামশায়ের শিক্ষা এইভাবেই তাহার জীবনে সার্থক হইয়াছে।

উপন্যাসের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় ও প্রাণোচ্ছল চরিত্র হইল দামিনী। উহার মধ্যে মেঘের বিদ্যুতের ন্যায় দীপ্তি ও বিলয়, বিদ্রোহ ও বশ্যতার মধ্যে ঘন ঘন মেজাজের নেবা-জ্বলা স্থির বিচারকে বিড়ম্বিত করে। উহার স্বরূপ একটা সমাধানহীন ধাঁধার মত আমাদের বোধশক্তিকে ফাঁকি দেয়। শচীশের চরিত্রটি নানা অবদমনের অন্তরাল হইতে পাঠকের অনুভবের নিকট অনিশ্চিতভাবে স্ফুরিত হইয়াছে। প্রথম, তাহার স্বভাব-সিদ্ধ প্রকাশকুণ্ঠা, প্রকৃতিগত মানস গূঢ়তা; দ্বিতীয়, তাহার ধর্মানুশীলনের গোষ্ঠীগত মন্ত্রগুপ্তি; তৃতীয়, তাহার সাধনাদর্শের বিভ্রান্তিকর স্ববিরোধ; চতুর্থ, তাহার সহজ জীবনাকর্ষণের উপর ধর্মসাধনার জটিল প্রতিক্রিয়া; আর সর্বশেষে, তাহার অসীমতত্ত্বাশ্রয়ের অনির্বচনীয় বোধাতীত উপলব্ধি। এতগুলি জালের আবরণ ভেদ করিয়া তাহার ব্যক্তিত্ব উঁকি মারে। তথাপি এই স্বভাবগহন ব্যক্তিত্বও দামিনী ও শ্রীবিলাসের ধারণা ও আচরণের প্রতিফলিত আলোকে আমাদের নিকট মোটামুটি স্বচ্ছ হইয়াছে। শচীশের দুর্ভেদ্য নীরবতাকে ঘিরিয়া দামিনী ও শ্রীবিলাসের যে উত্তেজিত মুখরতা ও মানস আলোড়ন তাহাই আমাদিগকে তাহার অন্তরলোকের পরোক্ষ সন্ধান দেয়। তীর্থযাত্রী বা পুরোহিতের দ্বারা আবর্তিত আরতি-

দীপ যেমন ভাবলেশহীন পাষাণদেবতার মুখমণ্ডলে মানবিক আবেগের সঞ্চরণশীল আভা স্ফুরিত করে, তেমনি দামিনীর আরত্তিদীপে ও শ্রীবিলাসের ঈর্ষ্যা-প্রতিযোগিতার ধূপ-ধূমের ভিতর দিয়া শচীশের মুখকান্তি ও জীবনদীপ্তি তির্যক-বিলসিত। কিন্তু দামিনী নিজের ভিতরকার দীপ্তি ও দাহে স্বপ্রকাশ। তাহার প্রাণপ্রাচুর্য নিজ অন্তরপ্রেরণাতেই চারিদিকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়াইয়াছে। শচীশ ও শ্রীবিলাস তাহার বহ্ন্যুৎসবের চারিদিকে দগ্ধপক্ষ পতঙ্গের ন্যায় অর্ধবিমূঢ় প্রদক্ষিণের দ্বারাই তাহার ব্যক্তিত্বের বেগ ও দুর্বার আকর্ষণের সন্ধান দিয়াছে।

দামিনী গোড়া হইতে একটি বিস্ফোরণোন্মুখ আগ্নেয়গিরি—পারিপার্শ্বিকের বিরুদ্ধে তাহার অনির্বাণ বিক্ষোভ সদা-ধূমায়িত। প্রথমেই তাহার স্বামী গুরুভক্তির আতিশয্যে তাহার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের অবমাননা করিয়া তাহাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে লীলানন্দ স্বামীর রসচক্রের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে। এই প্রথম ক্ষোভ তাহার মনে চিরবিদ্রোহের বীজবপনের হেতু হইয়াছে। এই বিদ্রোহের জ্বালা অকস্মাৎ গুরুসেবার একনিষ্ঠ আত্মোৎসর্গে শান্ত হইয়া আসিয়াছে। এইখানেই দামিনীর মুহুর্মুহু ভাবান্তরের প্রথম দৃষ্টান্ত মিলিয়াছে। কেহ জানিল না যে শচীশের অদৃশ্য প্রভাব এই ঐন্দ্রজালিক পরিবর্তনের গোপন প্রেরণা যোগাইয়াছে। দামিনীর সঙ্গে শচীশের জটিল বন্ধনজালে ইহাই প্রথম গ্রন্থি। দামিনীর ভাবসাধনার ইতিহাস এই গুহাহিত মানস আবেগের উত্তাপেই বেগ আহরণ করিয়াছে। এই মনের গুহায় লুকান আসক্তি সমুদ্রকূলস্থিত সেই স্মরণীয় গুহাভিসারে উহার চরম সীমা ও প্রত্যাখ্যানবিন্দুতে পৌঁছিয়া নিজ সরীসৃপ-জীবনের অবসান ঘটাইয়াছে। মনে হয় যে গুহা-দৃশ্যটির কোন বাস্তব অস্তিত্ব নাই—উহা মনোগুহার কলুষিত কামনারই রূপক-অভিব্যক্তি। অন্তরঃপোষিত বীভৎস লালসা বহির্লোকে উহার বিকৃত প্রতিচ্ছায়া প্রক্ষেপ করিয়াছে মাত্র। শাস্তির পদাঘাতটা বুকে লাগিয়াছে ঠিকই। কিন্তু সে বুক কেবল শরীর-যন্ত্র নয়, মানস চেতনার সূক্ষ্মতম আধার।

এই রূঢ় প্রতিঘাতের পর, দামিনীর চিত্তে আবার এক বিপরীতমুখী স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে। গুরুর প্রতি বিমুখতা পূর্বের ন্যায়ই থাকিল, পরিবর্তনের মধ্যে শচীশের সঙ্গ-পরিহার ও শ্রীবিলাসের প্রতি একান্ত পক্ষপাতমূলক নির্ভর। শচীশের উপর গূঢ় অভিমান প্রকাশের ইহাই

প্রকৃষ্ট পন্থারূপে দামিনীর সহজ নারীবুদ্ধি বাছিয়া লইয়াছে। "প্রেম্ণঃ অহেরিব বামাগতিঃ" এই প্রাচীন প্রবাদের সত্যতা আবার নূতন করিয়া প্রতিপন্ন হইল। এই ছলনার প্রত্যাশিত ফল শচীশের প্রতিক্রিয়ায় বুঝা গেল। তাহার ঔদাসীন্যে বিচলিত হইয়া প্রথম, দামিনীর নির্বাসনের দাবীতে, দ্বিতীয় তাহাকে আশ্রমজীবনে সহজভাবে যোগ দিবার অনুরোধে, তৃতীয়তঃ, ঈর্ষ্যার অদম্য উচ্ছ্বাসের ছদ্মবেশে অস্বীকৃত আকর্ষণের দ্যোতনায় শচীশের মানস বিপর্যয়ের ক্রোশাঙ্ক চিহ্নিত হইয়াছে। ইহার পরবর্তী স্তরে শচীশ একপ্রকার উদ্‌ভ্রান্ত অস্থিরতায় তাহার আচ্ছন্ন মনোভাবের পরিচয় দিয়াছে। দামিনীর স্বরূপ ও তাহার সহিত সম্পর্ক-সম্বন্ধীয় আত্মানুসন্ধানের আলো হঠাৎ আশ্রমে আত্মহত্যার বজ্রাঘাতে দীন-বিদীর্ণ হইয়া গেল। এই নিদারুণ আঘাতে দামিনী, শচীশ ও শ্রীবিলাস আশ্রমের ভাব-বিলাসপিচ্ছিল গোষ্ঠীপরিবেশ হইতে ছিট্‌কাইয়া বাহির হইয়া পড়িল ও এই ত্রয়ীর একত্রবাসে একটা নূতন জীবনধারার সূত্রপাত হইল। ইহার আর একটি ফল হইল যে দামিনীর শচীশকে গুরুপদে বরণ ও শচীশের সেই দায়িত্ব-স্বীকার। দামিনী জীবনের শেষ পর্যন্ত এই সম্পর্ককে ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত রক্ষা করিয়াছে। এই নিষ্কাম আশ্রয়নির্ভরতার মধ্যে শচীশ সম্বন্ধে তাহার সমস্ত হৃদয়-অশান্তির পূর্ণ নিবৃত্তি ঘটিয়াছে। ইহার পর তাহার যাহা কিছু পরিবর্তন তাহা শ্রীবিলাস-সম্পর্কিত।

'শ্রীবিলাস'-অধ্যায়ে দামিনী-চরিত্রের মধ্যে যাহা বিশেষ প্রকট তাহা হইল শচীশের সমস্ত ভুল-বোঝাবুঝি ও নির্মমতা সত্ত্বেও দামিনীর অক্ষুণ্ণ সেবা-পরিচর্যা ও অতন্দ্র কল্যাণকামনা। সে শচীশকে এমন একান্তভাবে গুরুরূপে মানিয়াছে যে তাহার বিরুদ্ধে তাহার নিজের বিন্দুমাত্র অনুযোগ নাই ও অপরের বিরূপ সমালোচনারও সে তিলমাত্র প্রশ্রয় দেয় না। আর এক বর্ষণপ্লাবিত, ঝঞ্ঝাতাড়িত রাত্রিতে শচীশের অহেতুক আত্মনিগ্রহ রোধ করিতে সে শচীশের সান্নিধ্য ত্যাগ করিবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছে। ইহাই শচীশের সঙ্গে তাহার সমস্ত আবেগজটিল সম্বন্ধের চির-অবসান, তাহাদের আত্মা-বৈদ্যুতীর শেষ সংঘর্ষ। এই ঘটনার পর দামিনী-চরিত্রের পরিণামী রূপান্তর ঘটিয়াছে শ্রীবিলাসের প্রতি তাহার নিবিড় প্রেমের স্ফুরণে। শচীশের প্রতি অচরিতার্থ প্রেম ভক্তিতে পরিবর্তিত হইলে সেই শূন্যস্থানপূরণের জন্য শ্রীবিলাসের ডাক পড়িয়াছে। দামিনীর স্বভাববলিষ্ঠ চিত্তে প্রেমের বীজ

একবার অঙ্কুরিত হইলে অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তিতেই ইহা পরিপূর্ণ রস-নিবিড়তায় পাকিয়া উঠিবেই। শচীশের বাষ্পলোকে এই বিদ্যুৎ বৃথাই স্থির আশ্রয় খুঁজিয়া শেষ পর্যন্ত শ্রীবিলাসের ভৌম আধারে অচপল শান্তি লাভ করিয়াছে। তাহার এই মৃত্তিকাশ্রয়ী প্রেম কিরূপ আশ্চর্য গন্ধ-সুরভিত হইয়া উঠিয়াছে তাহার প্রমাণ তাহার অন্তিম আদর্শকল্পনাবাসিত আকৃতি-প্রকাশে মাটির বৃন্তে স্বর্গের ফুল ফুটিয়াছে ও পরলোক পর্যন্ত উহার পরিমল বিস্তার করিয়াছে।

চতুর্থ চরিত্র শ্রীবিলাস, সর্বাপেক্ষা বাস্তবগুণান্বিত ও জীবননিষ্ঠ। এই সূক্ষ্ম ভাববিলাস ও স্থূল মননের জগতে সে একটি আটপৌরে ব্যতিক্রম। সদা-চঞ্চল, উনপঞ্চাশ পবনের খেয়ালী সঞ্চরণের লীলাকাশে সে একটি ভূমিচারী, মূলসংসক্ত, মানবিকপ্রবৃত্তিশাসিত ব্যক্তিসত্তা। ঘূর্ণগতি নীহারিকাপুঞ্জের মাঝে সে বড় জোর একটা আকাশপ্রদীপ। দামিনীর অভাবনীয় প্রেমই তাহার লৌকিকসংস্কারবদ্ধ জীবনের একমাত্র দিব্য উন্মেষ। এই একটি সুকুমার বিবাশেই তাহার মধ্যে দামিনী ও শচীশের সূক্ষ্ম অনুভূতিময় জীবনের সার্থক স্পর্শ লাগিয়াছে। সে এই বিরল সৌভাগ্যে দামিনী-শচীশের সমগোত্রীয়তায় উন্নীত হইয়াছে।

এখন এই চরিত্রগুলির স্বরূপ-নির্ণয় করিলেই তাহাদের চিত্রণে লেখকের বিশেষ উদ্দেশ্য ও রীতি পরিস্ফুট হইবে। লেখক এই উপন্যাসের মধ্যে জীবনের একটি তত্ত্বসমস্যাই মানবিক চরিত্রের সারূপ্যে ব্যঞ্জিত করিতে চাহিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার চরিত্র বা উপন্যাসের জীবনচিত্র কোনটাই পুরোপুরি মানবিকরসসমৃদ্ধ হইয়া উঠে নাই। আবহাওয়া আগাগোড়া একটি তত্ত্বরূপকের প্রতিচ্ছায়া। চরিত্রগুলি মানবিক আবেগ ও আচরণের মাধ্যমে একটি আত্মিক সমস্যার স্বরূপ-নির্দেশের উপায়রূপে পরিকল্পিত। জ্যাঠামশায় ত আগাগোড়া তত্ত্বাদর্শনিয়ন্ত্রিত এক যান্ত্রিক সত্তা। তাঁহার স্বভাব সম্পূর্ণ এককেন্দ্রিক। তাঁহার জীবনে এমন কোন সমস্যা আসে নাই যাহাতে তাঁহার তত্ত্বাবরণে কোন বিদারণরেখা অঙ্কিত বা জীবনবৈচিত্র্যের সঙ্গে তাহার কোন গুরুতর অসামঞ্জস্য অনুভূত হইতে পারে। ননিবালার আত্মহত্যা তাঁহার সম্মুখে জীবনের যে বিস্ফোরকরূপ অবারিত করিয়াছে তাহা তাঁহার সঙ্কীর্ণ প্রত্যয়কে কতটা বিচলিত করিয়াছে তাহা পাঠকের নিকট অনুক্তই রহিয়াছে। কাজেই তিনি যে মানুষের পোষাকে তত্ত্ব-বিগ্রহ এ বিষয়ে কোন সংশয় থাকে না।

তাঁহার দুই শিষ্য শচীশ ও শ্রীবিলাস এই তত্ত্বভূমি হইতে জীবনের তত্ত্ববিরোধী অভিজ্ঞতার মধ্যে সবেগে উৎক্ষিপ্ত হইয়া মানবাত্মার সঙ্কটমুহূর্তে বিহ্বল অসহায়তার পরিচয় দিয়াছে। ইহাদের পরীক্ষা জীবনের অজানা দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান লইয়া আসিয়াছে। কিন্তু মানস প্রস্তুতি সম্পূর্ণভাবে তত্ত্বসাধনার ক্ষুদ্র সঞ্চয় হইতে আহরিত। কাজেই আক্রমণ ও আত্মরক্ষার মধ্যে এক বিরাট ব্যবধান তাহাদিগকে আরও বিব্রত করিয়াছে। শ্রীবিলাস কোথায়ও অবিমিশ্র তত্ত্বনিষ্ঠতার পরিচয় দেয় নাই—তত্ত্বদীক্ষা তাহার বাহিরের বস্তু রহিয়া গিয়াছে, অন্তরের গভীরে অনুপ্রবেশ করে নাই। জ্যাঠামশায়ের শিষ্যরূপে বা লীলানন্দ স্বামীর ভক্তিসাধনার পরিকররূপে কোন অধ্যাত্ম প্রভাবই তাহার স্বভাবধর্মের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। সে তাহার প্রখরবুদ্ধিনিষ্ঠ প্রকৃতি ও যুক্তিবিচারের দৃষ্টিভঙ্গীটিই সর্বত্র অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। ধর্মসাধনা তাহার নিকট একটা বুদ্ধিগত ব্যায়ামমাত্র, তাহার সমস্ত সমস্যা এই মনের পথেই সমাধান খুঁজিয়াছে। দামিনীর আচরণে যেটুকু মানবিক, তাহা তাহার বোধশক্তির সম্পূর্ণ আয়ত্ত—যেখানে তাহা বুদ্ধির অতীত, সেখানে উহা শ্রীবিলাসের অনধিগম্য। শচীশের সহিত তাহার সূক্ষ্মতর সম্বন্ধের গোলোকধাঁধার মধ্যে সে কোন দিনই পথ খুঁজিয়া পায় নাই। যেখানে সে নারীসুলভ ঈর্ষ্যাছলনার বাহন, সেখানে তাহার সমস্ত আচরণ-দুর্বোধ্যতা শ্রীবিলাসের নিকট স্ফটিকস্বচ্ছ। বিদ্রোহিণী দামিনীর ধূম্রোৎক্ষেপের সূত্রটি সে স্বচ্ছন্দে অনুসরণ করিয়াছে, কিন্তু যেখানে ধোঁয়ার মধ্যে আগুন জ্বলিয়াছে সেখানে তাহার দৃষ্টি প্রতিহত। বন্যা দামিনী তাহার নিকট প্রহেলিকা; পোষ-মানা গার্হস্থ্য দামিনীর সঙ্গে সে সহজেই মিশিয়াছে। এই হেঁয়ালির কুহেলিকালোকে শ্রীবিলাস একটি নিরেট বস্তুবিগ্রহ—মননে তীক্ষ্ণ, কিন্তু অনুভূতিতে স্থূল ও অন্তর্ভেদে অক্ষম। তত্ত্বসাধনার রাজ্যে তাহার কোন সত্য স্থান নাই—সেখানে সে অনধিকারপ্রবেশ করিয়াছে।

শচীশ ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাহার ভাবসত্তা তপঃসাধনার তেজোসার দিয়া গড়া, তত্ত্বলাবণ্য তাহার মধ্যে উদ্ভাসিত। তাহার ব্যক্তিত্ব তত্ত্ব-তিমিরোৎক্ষিপ্ত তারকাদ্যুতিতে সুদূর ও রহস্যময়। তাহার সমস্ত বাহিরাচরণ ও মানসক্রিয়া স্বপ্নাচ্ছন্নতা হইতে হঠাৎ চেতনালোকে প্রবুদ্ধ মানুষের বিহ্বলতা-মাখান। সে তত্ত্বসাগরের মাছ, অতর্কিতে সংসারজীবনের ডাঙায় উৎক্ষিপ্ত হইয়া স্বচ্ছন্দ নিঃশ্বাসগ্রহণে অক্ষম। দামিনীর সঙ্গে তাহার এখানেই

মৌলিক পার্থক্য। শচীশ অধ্যাত্ম সাধনার নিগূঢ় অনুভূতি স্থূল জীবনবোধের ভাষায় অনুবাদ করিতে গিয়া পদে পদে হোঁচট খাইয়াছে। এই ধ্যানলোকের আবহাওয়ায় দামিনীর মত দুরন্ত জীবনসত্যকে সে কিছুতেই পরিপাক করিতে পারে নাই। দামিনীর উদ্দামতা তাহার ভাবতন্ময়তার প্রশান্তিতে মুহুর্মুহু ছন্দপতন ঘটাইয়াছে। দামিনী নিজেই তাহাকে গুরুরূপে বরণ করিয়া তাহাকে এই অসম্ভব অবস্থাসঙ্কট হইতে বাঁচাইয়াছে। শুধু সম্পর্ক-কল্পনাতেই এই মনোভাব সহজসাধ্য ও স্থায়ী হয় নাই, দামিনীর প্রখর উপস্থিতি এই ভাবসুষমার মধ্যে অস্বস্তি সঞ্চার করিয়াছে। শেষ পর্যন্ত দামিনীকে দেহের দিক হইতে দূরে পাঠাইয়াই সে তাহার মানস অন্তরঙ্গতাকে কোনমতে মানাইয়া লইয়াছে।

দামিনীর সমস্যা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। শচীশ তত্ত্বাবিষ্ট মন লইয়া দামিনীকে বুঝিতে পারে নাই। দামিনীও জীবননিষ্ঠ আকৃতির দ্বারা শচীশের অন্তরলোকে প্রবেশে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে। তাহার উদ্যত কামনা, প্রসারিত আলিঙ্গন সবই এক ছায়াময় রূপকসত্তার নিবিড় স্পর্শ হইতে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। শচীশের অধ্যাত্মভাববিভোর মনকে মানসিক মায়া-মমতা, সেবা-পরিচর্যা দ্বারা বশীভূত করার চেষ্টাও সফল হয় নাই। শচীশ তত্ত্বকে জীবনের সহিত মানাইতে পারে নাই। দামিনী জীবনকে তত্ত্বের সহিত মিশাইতে পারিল না। সুতরাং সে শচীশের সঙ্গে গুরু সম্পর্ক পাতাইয়া একটা মধ্যপন্থী আপোষ-নিষ্পত্তি করিল। মূর্তিমান তত্ত্বসাধনাকে দয়িতরূপে লাভ করিতে না পারিয়া দীক্ষাসূত্রে নভোবিহারী ও মর্তচারী যুগলের ভাবমিলন সাধিত হইল। ইহার পরেও কিন্তু গুরু-শিষ্যা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কক্ষপথে পরিভ্রমণ করিতে থাকিল, ব্যবধান বিলুপ্ত হইল না। শচীশ ধ্যানলোক হইতে মানবিক সম্পর্কের প্রবাস-জীবনে সদা উদ্‌ভ্রান্ত, আর দামিনী সংসার-সম্বন্ধের সমতলভূমি হইতে তত্ত্বের বায়ুস্তরকে কোন প্রকারে আঙুলের ডগা দিয়া ছুঁইতে ঊর্ধ্ববাহু। ইহাদের মধ্যে কোন উভয়-স্বীকৃত মিলনক্ষেত্র রচিত হয় নাই।

চরিত্রায়নে জ্যাঠামশায় নির্ভেজাল তত্ত্ব। শচীশ একাগ্রসাধনা ও পৌনঃপুনিক পরীক্ষা দ্বারা তত্ত্বে আত্মপ্রতিষ্ঠ, ক্ষণিক ডানা-ঝট্‌পটানির পর তত্ত্ব-খাঁচা হইতে নভোলোকে উধাও মুক্ত বিহঙ্গ, দামিনী তত্ত্ববহ্নি-প্রদক্ষিণকারী দগ্ধপক্ষ পতঙ্গ ও ডানা জোড়া লাগার পর সংসারশাখায়

বিশ্রাম-নীড়ে ক্ষণসুপ্ত, শ্রীবিলাস ক্ষণিকতত্ত্ববিলাসী বুদ্ধিনিষ্ঠ ভাবুক—এই চারিজনের সংযোগে উপন্যাসের চরিত্রবৃত্ত সম্পূর্ণ হইয়াছে।

উপন্যাসে প্রকৃতিচেতনা পরিমাণে সীমিত ও স্বরূপে রূপকধর্মী। নিসর্গ দৃশ্য প্রধান চারিটি—গুহাপ্রবাসের চিত্র, বালুচরের চিত্র, নদীধারের পোড়োবাড়িতে ঝড়জলদুর্যোগের চিত্র, নীলকুঠির ধ্বংসাবশেষের গাছ-গাছড়াতে সবুজের বানডাকার দৃশ্যবর্ণনা। এর প্রত্যেকটিই একটি মানস সঙ্কটের প্রতিরূপ, এক একটি বিশেষ ভাবব্যঞ্জনার প্রতীক-চিত্র। রবীন্দ্রনাথ যেমন তত্ত্বাবিষ্ট মন লইয়া জীবনের ছবি আঁকিয়াছেন, তেমনি তত্ত্বাঞ্জন-মাখা দৃষ্টিতে প্রকৃতির রূপচিত্রের মাধ্যমে উত্তেজিত ভাবচেতনাকেই বর্ণবিলসিত করিয়াছেন। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের সব উপন্যাসেই প্রকৃতি আসিয়াছে মানব আবেগের সমর্থনে ও সহায়করূপে, ভাবুকতার অনুপ্রেরণায়। তাহা হইলেও প্রায় সর্বত্রই প্রকৃতির একটা নিজস্ব রূপদ্যোতনা থাকে; ইহা উদ্দেশ্যকে ছাড়াইয়া স্বতন্ত্র সত্তা রূপে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু বর্তমান উপন্যাস এত একনিষ্ঠভাবে তত্ত্বকেন্দ্রিক যে ইহাতে যেমন মানবপ্রকৃতি, তেমনি বহিঃ-প্রকৃতিরও স্বয়ংসম্পূর্ণতা তত্ত্বপ্রয়োজনে সীমিত ও সঙ্কুচিত। তাই প্রকৃতির রূপদীপ্তি এখানে তত্ত্বধূসরতার প্রলেপে স্তিমিত, নেপথ্য-উৎসারিত তীব্র, তির্যক রশ্মিক্ষেপে গূঢ়ার্থবহ।

উপন্যাসের তত্ত্বনাট্যলীলার মধ্যে মানব-প্রকৃতির যতটুকু স্বাধীন স্ফূর্তির অবকাশ আছে, সেই উদ্দেশ্যসীমিত পরিসরে মানবচরিত্রাভিজ্ঞতার মনোজ্ঞ নিদর্শন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। যেখানে তত্ত্বপেষণ হইতে প্রাকৃত মনোবৃত্তির আপেক্ষিক মুক্তি, সেইখানে লেখকের অন্তর্দৃষ্টি পরিস্ফুট। দামিনীর শ্রীবিলাসের প্রতি ছদ্ম-পক্ষপাত, শচীশের ভাবতন্ময়তার মধ্যে বাস্তব চেতনার অবরুদ্ধ স্ফুরণ ও প্রেমের অগ্রদূত ঈর্ষ্যার উদ্ভব, ঘটনা-সংঘাত ও মানস-দ্বন্দ্বের প্রভাবে শচীশ ও দামিনীর চিত্তপরিবর্তনের গূঢ়ব্যঞ্জনা, শ্রীবিলাসের আত্মসমীক্ষা প্রভৃতি অন্তর্জীবনের জটিলতা-উন্মোচনে লেখকের সূক্ষ্মদর্শিতা বিনা আড়ম্বরে ও অত্যন্ত অবলীলাক্রমে প্রকাশিত হইয়াছে। অধ্যাত্ম সাধনার আত্মমগ্নতা ও প্রকাশগহনতার মধ্যেও মনোরহস্যের সূত্রটি লেখক অভ্রান্তভাবে অনুসরণ করিয়াছেন। রূপকাবেশের মধ্যেও তিনি ঔপন্যাসিকের স্বভাবধর্মের প্রতি যথোচিত মর্যাদা দেখাইয়াছেন।

উনবিংশ অধ্যায়

ঘরে-বাইরে (১৯১৬)

১

।'ঘরে-বাইরে' রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। ।ইহার রচনাভঙ্গী ও বিষয়বিবৃতি একটি নূতন পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছে। ঘটনার অগ্রগতি বুঝাইবার দায়িত্ব বিভিন্ন প্রধান পাত্র-পাত্রীর মধ্যে প্রত্যেকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞান ও সক্রিয় অংশের প্রাধান্য অনুসারে বণ্টন করা হইয়াছে। উহাদের স্বতন্ত্র ও যৌথ মানস প্রতিক্রিয়াকে সমন্বিত করিয়া আখ্যানের ধারাবাহিকতা ও আবেগের মাত্রা ও বৈচিত্র্য নাটকীয়ভাবে ঐক্যসূত্রগ্রথিত।' বিমলা, নিখিলেশ ও সন্দীপ এই তিনটি চরিত্রের মুখ দিয়াই তাহাদের উপর চলমান ঘটনার পেষণ ও অন্তর্দ্বন্দ্বের তীব্রতা ও পরস্পরাপেক্ষিতা জীবন্তরূপ লইয়াছে।' এমন কি মন্তব্য, বিশ্লেষণ ও জীবনসমীক্ষার ভারও লেখক নিজের উপর না রাখিয়া এই চরিত্রগুলির মধ্যেই পরিবেশন করিয়াছেন। /বিমলার আবেগময় আত্মগ্লানি, নিখিলেশের বঞ্চিত হৃদয়ের চাপাক্রন্দন-বিদ্ধ দার্শনিকতা, সন্দীপের নিঃসঙ্কোচ নৈরাজ্যবাদ ও নীতিহীন ব্যক্তিত্বের দৃপ্ত স্পর্ধা তাহাদের উক্তি ও আচরণের মধ্য দিয়া অপূর্ব নাটকীয়তায়, জীবনের প্রত্যক্ষতায় অভিব্যক্ত হইয়াছে।' তাহাদের প্রত্যেকের স্বগতভাষণ ও আত্ম-উদ্‌ঘাটনের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র স্বাদ অনুভব করা যায় ও এই সমস্ত স্বাদের সমাহারে একটি অনন্য যৌগিক রসের ফলশ্রুতি উপভোগ করা যায়। প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির দ্বন্দ্ব, মোহ ও মোহভঙ্গের পর্যায়ক্রম, মানস সংঘাতের ফলে নব নব চেতনার উন্মেষ, বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে দেখা ঘটনাচক্রের আবর্তন ও আবেগের রূপান্তর আমাদের চেতনাকে একটি গতিশীল অথচ গভীরশায়ী ছন্দসঙ্গীতে আবিষ্ট করিয়া তোলে। জীবনমন্থনকরা সুধা-হলাহল আমাদের অনুভূতির পাত্রকে কানায় কানায় রসোচ্ছল করে ও সঙ্কীর্ণ পরিবেশের মধ্যে জীবনসমুদ্রের এরূপ উত্তাল আলোড়ন আমাদের সম্মুখে একটা নূতন সম্ভাবনার পরিচয় দেয়।

।বিষয়ের দিক হইতে 'ঘরে-বাইরে' অনেকটা 'গোরা'র সমধর্মী।' এখানে অবশ্য 'গোরা'র মহাকাব্যিক প্রসার ও নিটোল সম্পূর্ণতা নাই। তাহার

পরিবর্তে আছে জীবনের একটি সুনির্বাচিত বৃত্তাংশের বিচিত্রগামী, তির্যক রশ্মিসম্পাত, নানা বঙ্কিম আলোকরেখার সমন্বয়ে একটি পূর্ণ বৃত্তের গূঢ় আভাস। 'গোরা'-তে লেখক নিজে এক বিরাট, ঘটনাবহুল কর্ম ও ভাবজগতের নিপুণ নিয়ন্ত্রণের ভার লইয়াছেন ও নিজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, টীকাভাষ্যের সাহায্যে যাহা ঘটিয়াছে তাহার আন্তর তাৎপর্যটি আমাদের রসচেতনায় সঞ্চারিত করিয়াছেন। এখানে কিন্তু লেখক নেপথ্যান্তরালে থাকিয়া, ক্রিয়াতে কোন অংশগ্রহণ না করিয়া, প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট নর-নারীর স্বগতোক্তিতে অভিনীত নাটকের দৃশ্যসংযোজনা ও পরিণতির সূত্রটি সুপরিস্ফুট করিয়াছেন। স্রষ্টা সৃষ্টির আড়ালে আত্মগোপন করিয়া সৃষ্টিকে স্বপ্রকাশ করিয়াছেন। সৃষ্ট-চরিত্রগুলিই একাধারে জীবনঘটনার নায়ক ও ব্যাখ্যাতারূপে সংঘাতের বহিঃরূপ ও মানস প্রতিক্রিয়াগুলি সমন্বিতভাবে উপস্থাপিত করিয়াছে। সুতরাং এই উপন্যাসে বিষয়সন্নিবেশ ও উহার মর্মবিশ্লেষণ উচ্চতর সৃষ্টি-শক্তির পরিচয়বাহী। রবীন্দ্রনাথ প্রত্যেক চরিত্রকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াও উহাদিগকে পরোক্ষভাবে নিজ নিগূঢ় উদ্দেশ্যের বাহনরূপে নিয়োজিত করিয়াছেন। তাহাদের ব্যক্তিত্ব কোনখানেই কুণ্ঠিত না হইয়াও তাহাদের বহুভাষিতার মাধ্যমে স্রষ্টার দৃষ্টিভঙ্গীই প্রতিফলিত করিয়াছে। একই বস্তু বিভিন্ন ব্যক্তির চরিত্র ও মেজাজের ভিতর দিয়া বিচ্ছুরিত হইয়া বিচিত্র বর্ণে অনুরঞ্জিত ও বিবিধভাব-প্রকাশক হইয়া উঠিয়াছে। স্বতন্ত্রভাবে উপলব্ধ জীবন-অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথের এক অখণ্ড জীবনবোধের সমন্বিত রূপ লইয়াছে।

বিষয়ের দিক্ দিয়া 'ঘরে-বাইরে' 'গোরা'র পরবর্তী-পরিণতি-পর্বরূপে গৃহীত হইতে পারে। গোরার অনন্যব্যক্তিত্বে যে দেশাত্মবোধ প্রথম অঙ্কুরিত হইয়াছিল, তাহাই কালক্রমে বঙ্গব্যবচ্ছেদ-আন্দোলনের বিক্ষোভে এক কেন্দ্রীভূত সার্বিক মনোবিকারে উৎকটভাবে সংহত হইয়াছে। গোরার মধ্যে যাহা বিশুদ্ধ আদর্শবাদ ও প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগের আকারে বর্তমান ছিল, তাহাই সন্দীপে আসিয়া উগ্র নীতিহীনতায় এক বিকৃত নেতৃত্বমোহে রূপান্তরিত হইল। গোরার উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় চেতনার স্বমর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও হিন্দুধর্ম ও সমাজের প্রকৃত কল্যাণরূপটির প্রতিপাদন। তাহার আক্রমণের লক্ষ্য ছিল বিদেশী শাসন নয়, আত্মসংবিৎহারা জাতির অমর্যাদাকর পরানুকরণ। সে যে আন্দোলনের পুরোভাগে স্থান লইয়াছিল তাহা মুখ্যতঃ সমাজকল্যাণমূলক, রাজনৈতিক অধিকারপ্রতিষ্ঠার

অভিপ্রায়-প্রণোদিত নয়। তাহার প্রধান শত্রু বিদেশী শাসক নয়, পরধর্মপুষ্ট ও নিজ আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাহীন ইংরাজি-শিক্ষিত সমাজ ও ব্রাহ্মসম্প্রদায়। এই স্বাধিকারভ্রষ্ট, উন্মার্গগামী সমাজগোষ্ঠীকে তীব্র শ্লেষে বিদ্ধ করিয়া উহাদের চৈতন্যবিধানই উহার পরম কাম্য ছিল। ইংরাজ শাসন যখন শোষণে পরিণত হইয়া দেশের জনসাধারণের হীনম্মন্যতাকে আরও দুঃসহ করিয়াছে, তখনই সে তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যত হইয়াছে। সন্দীপের ক্ষমতালোলুপ, আত্মাভিমানপুষ্ট, নীতিসংযমহীন ব্যক্তিত্বের নিকট দেশপ্রেমের খাঁটি সোনার সহিত জাতিবৈর, ক্ষমতালিপ্সা ও ভোগাসক্তির খাদ মিশিয়া উহাকে কলুষিত করিয়াছে ও উহার মূল্যের অপহ্নব ঘটাইয়াছে। গোরার মানস-গঠনে কিছুটা জোর-জবরদস্তি থাকিলেও, বিবেক, ধর্মবোধ ও নিঃস্বার্থ কল্যাণ-কামনাই উহার প্রধান উপাদান ছিল। সন্দীপের মত উগ্র সুরার নেশা তাহার একেবারেই ছিল না। সে যুগে দেশাত্মবোধের প্রথম উন্মেষক্ষণে আদর্শনিষ্ঠাই প্রধান ছিল, তাহার সহিত স্থূল ভোগ-কামনা ও আত্মতৃপ্তির কোন ভেজাল ছিল না। সন্দীপের যুগে প্রায় পঁচিশ বৎসরের ব্যবধানে নির্মল প্রস্রবণ আবিল বন্যাস্রোতে পরিণত হইয়াছে। তাহা দেশপ্রীতিকে সাময়িক সুবিধাবাদের পর্যায়ে নামাইয়া উহাকে শাশ্বতধর্মনীতিবিরোধী করিয়া তুলিয়াছে। গোরার একক চিত্তের সূক্ষ্ম অনুভূতি এখন দলের সংক্রামক মোহমত্ততায় আদিম বিশুদ্ধি হারাইয়াছে। দেশপ্রেমের অগ্নিশিখায় এখন জাতীয় উদ্‌ভ্রান্তি ও স্বার্থান্ধ অধিকারস্পৃহার ইন্ধন যুক্ত হইয়া উহাকে ধূম্রাকুল ও নিষ্প্রভ করিয়াছে। গোরার দেশকল্যাণমূলক প্রচেষ্টার ভিতর দিয়া তাহার নিজের স্বভাবনির্মলতার কোন ব্যত্যয় হয় নাই। সন্দীপের নিজের ও তাহার মতাবলম্বী কর্মিবৃন্দের ও প্রমত্ত জনসাধারণের আচরণে মতিবিপর্যয়ের উৎকট অসংযম বিস্ফুরিত হইয়াছে।

'গোরা' উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে স্থানে স্থানে তত্ত্বভাবনার আবর্ত সৃষ্ট হইলেও উহা মূলতঃ তত্ত্বপ্রভাবিত নয়। উহার প্রবর্তনায় আত্মসমীক্ষা ও কর্তব্যসঙ্কট মাঝে মাঝে অন্তরে গভীর আলোড়ন ও সূক্ষ্ম ভাবান্তরের উন্মেষ ঘটাইলেও উহা প্রত্যক্ষভাবে কোন পূর্বনির্ধারিত তত্ত্ব-উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নয়। অবশ্য হিন্দু ও ব্রাহ্মসমাজের ধর্মাদর্শ ও সমাজ-দৃষ্টির পার্থক্য এই উপন্যাসে গভীরভাবে ও নানা সূক্ষ্ম যুক্তিতর্ক সাহায্যে আলোচিত হইলেও লেখক মোটামুটি অপক্ষপাত বিচারধারারই অনুবর্তন

করিয়াছেন। হয়ত প্রচলিত ব্রাহ্মধর্মের দলগত সঙ্কীর্ণতার প্রতি তিনি নির্মমভাবে বিরূপ হইয়াছেন ও ইহার তুলনায় গোরার প্রতি তাঁহার একটু বিশেষ সমর্থন লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ইহার কারণ হইল যে গোরার মতবাদ অপেক্ষাকৃত অকৃত্রিম ধর্মবুদ্ধিসঞ্জাত। তিনি গোরাকে কোথাও আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন নাই। পরেশবাবু ও আনন্দময়ীর উদার মানবিকতার নিকট গোরার সঙ্কীর্ণতা, গোঁড়ামি, নিজমত-প্রতিষ্ঠার অত্যুৎসাহ ও উহারই ফলস্বরূপ কিছুটা অসংজ্ঞান (unconscious) আত্মবঞ্চনার প্রভাব তিনি উদ্‌ঘাটন করিতে মোটেই কার্পণ্য করেন নাই। ধর্মতত্ত্ব-প্রতিপাদনের আধিক্য সত্ত্বেও আমাদের যে ধারণা স্থায়ী হয় তাহা লেখকের খোলা মনের সত্যানুসন্ধিৎসা। তিনি বিশেষ মতকে জিতাইয়া দিবার জন্যই কোন পূর্বসংস্কারের বশীভূত হন নাই ইহা আমরা স্বতঃই অনুভব করি। সুচরিতা ও গোরার ন্যায় আত্মভাবনানিষ্ঠ, বহিঃপ্রভাব-নিরপেক্ষ, মন্ময় প্রকৃতি এই ধর্মপ্লাবনের প্রবল তরঙ্গে আন্দোলিত না হইলে তাহাদের জীবনসাধনালব্ধ প্রতিষ্ঠাভূমি হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়া কোন নূতন আদর্শের আশ্রয়ে স্থির হইতে পারিত না। হয়ত গোরার জীবনে আকস্মিক ঘটনার বজ্রাঘাতে এক নূতন তত্ত্বপ্রত্যয়ের বীজ উপ্ত হইয়াছে। কিন্তু ইহা কোন পূর্বসংকল্প অনুযায়ী আরোপিত হয় নাই, স্বাভাবিক পরিণতির অমোঘ ফলরূপেই ঘটিয়াছে। সুতরাং এখানেও লেখককে সচেতন তত্ত্বানুবর্তনের অভিযোগ হইতে অব্যাহতি দিতে হইবে।

ইহার সহিত তুলনায় 'ঘরে-বাইরে'র সমস্ত ঘটনাসূত্র নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে এক কৃত্রিম তত্ত্বপরীক্ষার সযত্ন-র'চত আয়োজনে। অবশ্য নিখিলেশ যে জীবনসত্য যাচাই করিতে এই পরীক্ষাগারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছে, তাহার মূল যে কত গভীরে ও তাহার প্রতিক্রিয়া যে কত মর্মান্তিক হইবে তাহা নির্ধারণ করিতে সে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হইয়াছে। যে পরীক্ষা-নাটকের প্রথম দৃশ্য সে প্রবর্তন করিয়াছে তাহার পরবর্তী অঙ্কগুলিতে যে কত নূতন নূতন অভিনেতা অবতীর্ণ হইয়া কি নূতন সূত্রজটিলতা সংযোজন করিবে ও সমস্ত নাটকের কি অভাবনীয় পরিণতি ঘটাইবে তাহার অনুমাত্র সঙ্কেতও সে পায় নাই। সে যে দার্শনিক নির্লিপ্ততার উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল ছিল, কার্যকালে তাহা সমস্তই অসার বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। জীবনের মূলোচ্ছেদী, মর্মবিদারী যে সত্য সে

অবলীলায় সহ্য করিতে পারিবে এই বিশ্বাসে দৃঢ় ছিল, তাহার বেদনার দুঃসহতা সে একেবারেই অনুমান করিতে পারে নাই। যুক্তিনিষ্ঠ, সত্যসন্ধানী দার্শনিক বলিয়া আত্মগৌরব করিলেও আসলে সে একজন আনন্দবেদনা-স্পন্দিত, আবেগময় স্মৃতিরোমন্থনে আবিষ্ট প্রেমিক ছাড়া আর কেহ নয়। তাহার আত্মরক্ষামূলক লৌহবর্ম পরীক্ষাস্থলে তুলার কোমল আস্তরণে রূপান্তরিত হইয়াছে। চাকা ঘুরাইবার প্রথম দায়িত্ব সে শিশুসুলভ সরল অবিমৃষ্যকারিতার সহিত গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু পরবর্তী চক্রাবর্তনের সংঘাতিক উত্তাপ ও গতিবেগ নিয়ন্ত্রণে সে সম্পূর্ণ অক্ষম।✓ এই পরীক্ষা পূর্বানুমিত পথ ছাড়াইয়া যে অপ্রত্যাশিত পথে দৈবচক্রান্তে চালিত হইয়াছে, তাহার ফলাফল তাহার হিসাবের সম্পূর্ণ বাহিরে চলিয়া গিয়াছে।/ সে যখন বিমলার প্রেমকে বাহিরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় যাচাই করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তখন সে কি জানিত যে বাহির কিরূপ মনোহর, বিভ্রান্তিকর রূপে সেই প্রেমকে আহ্বান জানাইবে, তাহার প্রণয়িনীর চোখে মোহাঞ্জন লিপ্ত হইয়া তাহাকে প্রবঞ্চিত করিবে, ও তাহার নিজের দৃষ্টিবিভ্রম সমস্ত প্রতিবেশব্যাপ্ত ভাব-কুহেলিকার দ্বারা ঘনীভূত হইয়া কিরূপ দুর্ভেদ্য আবরণ রচনা করিবে? সুতরাং যাহাকে সে সোজাসুজি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা বলিয়া মনে করিয়াছিল, তাহা দাঁড়াইল একটা সার্বিক দেশব্যাপী ভাবানুরঞ্জনের আবিল মোহাবেশে। এক্ষেত্রে প্রেমের কোন যথার্থ মূল্যবিচার অসম্ভব। সন্দীপ কেবল একজন প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তি-প্রেমিক নয়। সে আসিয়াছে রাজবেশে, দেশের সমুদয় আদর্শ অভীপ্সারঞ্জিত কান্তিতে, দেশবাসীর সম্মিলিত ভক্তি ও আত্মনিবেদনের মূর্ত বিগ্রহরূপে। এই দিব্যরূপান্তরিত সন্দীপের সহিত কে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে, এই অসম যুদ্ধে কে প্রতিযোদ্ধারূপে অবতীর্ণ হইবে? নিখিলেশের পরম সৌভাগ্য যে এই ছদ্মরাজা নিজের আচরণের দ্বারাই নিজের স্বরূপ প্রকাশিত করিয়াছে, নিজেই নিজ প্রতিমার বেদী চূর্ণ করিয়া ধূলামাটির সমতল ভূমিতে নামিয়া দাঁড়াইয়াছে।/ এই তত্ত্বপরীক্ষার উদ্দেশ্যমূলকতাই উপন্যাসের জীবনসমস্যার স্বাধীন আকর্ষণকে কিয়ৎপরিমাণে মন্দীভূত করিয়াছে। তত্ত্বচক্রের সহিত জীবনবৃত্তের সহজ সঙ্গতি উভয়ের অসম-কেন্দ্রিকতার জন্য ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

এই তড়িন্ময় পরিবেশে প্রতিটি মনোবৃত্তি, প্রতিটি মানস পরিবর্তনের

স্তর অস্বাভাবিক গতিবেগে ধাবমান। এই আগ্নেয় আবহাওয়ায় হৃদয়ের প্রতিটি বহ্নিকণা বিবর্তনের স্বভাবমন্থরতা হারাইয়া ক্ষণমধ্যে দিগন্তগ্রাসী দুঃসহ দহনশিখায় জ্বলিয়া উঠিয়াছে। দেশব্যাপ্ত ভাবস্ফীতির দুর্নিবার আকর্ষণে প্রতিটি আকাঙ্ক্ষা যেন জোয়ারের স্রোতে নদীর ন্যায় তটসীমা ছাড়াইতে উদ্যত। যুগযুগান্তরের সংস্কার, সংযম, অভিজাত বংশমর্যাদা, দীর্ঘলালিত দাম্পত্য প্রণয়ের স্নিগ্ধ নির্ভর যেন আত্মঘাতী মূঢ়তায় সঞ্চিত ঐশ্বর্যভাণ্ডারকে দেউলিয়া করিবার নেশায় মাতিয়াছে। দেশের সমস্ত প্রচলিত নীতিবোধ ও মূল্যমান এই সার্বিক মত্ততার বায়ুমণ্ডলে পর্যুদস্ত, উচ্ছিন্ন হইয়াছে। ভাল-মন্দ, কর্তব্য-অকর্তব্য, শ্রেষ্ঠ-গৌণ প্রভৃতির তারতম্য অচিন্তনীয়রূপে পালটাইয়া গিয়াছে। শাশ্বত নীতি ও ধর্ম, ন্যায়-নিষ্ঠা ও মনুষ্যত্বের আদর্শ যেন নূতন তুলাদণ্ডে ওজন হইবার দাবী জানাইয়াছে, সাময়িকের নিকট চিরন্তন নতি স্বীকার করিয়াছে। বহিঃ-স্বাধীনতার মোহে অন্তর-স্বারাজ্যের উচ্চতর দাবী অবজ্ঞেয় রূপে প্রতিভাত হইয়াছে। এই ওলট-পালটের যুগে স্বচ্ছদৃষ্টি আবিল ও সুস্থবুদ্ধি ঘোলাটে হইয়া উঠিয়াছে। এখানে মুহূর্তের মধ্যে সনাতনের রাজত্বের ধ্বংসস্তূপের উপর ক্ষণিকতাবাদের দু'দিনের রাজা নূতন সিংহাসন পাতিয়াছে। এই উগ্র উন্মাদনার ইন্দ্রজালে দেখিতে দেখিতে বীজ ফলে পরিণত হইতেছে, মাধ্যাকর্ষণের শক্তি অস্বীকৃত হইয়া কল্পনাবিহারের স্বেচ্ছাচার মাথা উঁচু করিতেছে। নিখিলেশের আদর্শনিষ্ঠা সন্দীপের সদ্যোফলপ্রদ সন্ত্রাস-বাদের নিকট তিরস্কৃত হইয়া লজ্জায় মুখ লুকাইতেছে। তাহার নির্লজ্জ শোষণবৃত্তি বীরত্বের অভিনন্দনধন্য হইতেছে। এই কুহকের রাজ্যে ইন্দ্রজালে আস্থাই প্রকৃতির নিয়মকে খারিজ করিয়াছে। সম্মোহন শাশ্বত জীবননীতিকে স্থানচ্যুত করিয়া রাজদণ্ড হাতে লইয়াছে, স্বপ্নসঞ্চরণই জাগ্রত সত্যকে ঘুম পাড়াইয়া নিজে জীবনের দিশারী হইয়াছে। অধিকাংশের ভাবমুগ্ধতা ব্যতিক্রমস্থানীয় দুই একজন ব্যক্তির সত্যনিষ্ঠাকে কাল্পনিকতার অভিযোগে একঘরে করিয়াছে। এই বাতাবরণের বিশেষত্বই উপন্যাসের সমস্ত জীবনকাহিনীর গতি-প্রকৃতিনির্ণয়ে মুখ্য শক্তিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছে। দ্রুতসঞ্চরণশীল পটভূমিকাই উপন্যাসের কাহিনী ও চরিত্রসমূহের বিস্ময়কর স্ফুরণ-বিকাশ-পরিণতির মূল সূত্র নির্দেশ করিয়াছে। অথচ এই যুগটি কোন রূপকথার কল্পনাবিলাস নয়, ঐতিহাসিক মানবভাগ্যবিবর্তনের

এক স্মরণীয় ও প্রামাণ্য অধ্যায়। অনতিদূর অতীতে বাঙলা দেশ এই ভাবরোমাঞ্চকে প্রতিদিনকার জীবনসত্যরূপে গ্রহণ করিবার অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতাটি উহার শিরাতে-স্নায়ুতে-হৃৎস্পন্দনে অনুভব করিয়াছিল।

২

বিমলার আত্মকথা দিয়া উপন্যাসের সূচনাপর্ব। ইহার মাধ্যমে উপন্যাসের ঘটনাবলীর পূর্ব পটভূমিকা উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। বিমলা ও নিখিলেশের উপন্যাস-পূর্ব দীর্ঘ দাম্পত্য জীবন, নিখিলেশের পারিবারিক ও বংশপরিবেশ, বিমলার সহিত তাহার বড় জা দের তির্যক্‌কটাক্ষক্ষুব্ধ, ঈর্ষ্যাবিকৃত সম্পর্ক, রাজবাড়ীর রীতি-নীতি ও আদব-কায়দা, বিশেষতঃ বিমলা ও নিখিলেশের পারস্পরিক মনোভাব ও মানবিক পরিচয়, শ্বশুরবাড়ীতে তাহার অধিকারবোধ ও দ্বিধাসঙ্কোচ—এককথায় পরীক্ষার পূর্বে যে সংসারযাত্রা তাহাদের ভবিষ্যৎ সঙ্কটের ভূমিকা রচনা করিয়াছে তাহা বিমলার প্রথম আত্মকথায় চমৎকার ভাবে বিন্যস্ত হইয়াছে। এই ভূমিকা হইতে আমরা ভবিষ্যৎ জটিলতার সূত্রটি সহজেই অনুসরণ করিতে পারি।

উপক্রমিকা হইতে যাহা বোঝা যায় তাহা হইতেছে বিশেষভাবে বিমলা-নিখিলেশের দাম্পত্যমিলনের স্বরূপ-পরিচয়। বিমলার এই প্রাক্-কথনের মধ্যে পরের ভুলভ্রান্তির জন্য গভীর অনুতাপ ও আত্মধিক্কারের সুর অনুরণিত। সে অনাগতের রক্ত-আলোকে অতীতের জীবন-স্মৃতিকে অনুরঞ্জিত করিয়া দেখিয়াছে। নিখিলেশের বংশ-মানসে পূর্ব ট্রাজেডির অশুভ ছায়া উহার সমৃদ্ধিরৌদ্রকে এক অনিশ্চিত আতঙ্কে পাণ্ডুর করিয়াছে। তাহার জ্যেষ্ঠ দুই সহোদর বিলাসব্যসনের অগ্নিশিখায় নিজেদের সাংসারিক সুখ শান্তি ও পরমায়ু পর্যন্ত আহুতি দিয়াছে। এই দৈবরোষের দাবদগ্ধ পথ দিয়াই বিমলা তাহার দারিদ্র্য ও রূপহীনতা সত্ত্বেও রাজপুরীর বধূরূপে প্রবেশাধিকার পাইয়াছে। তাহার পিত্রালয়ের পাতিব্রত্য-ঐতিহ্যের সম্পদই সে যৌতুকরূপে বহন করিয়া আনিয়াছে। তাহার স্বামীপ্রেমের মধ্যে তাহার স্বামীর অপরিমিত আদর, স্নেহপ্রশ্রয় ও অকুণ্ঠ মর্যাদাদান সত্ত্বেও ভক্তির একটা আবশ্যিক স্থান ছিল। ঠাকুরমায়ের অতীত দুর্ভাগ্যের স্মৃতিতে দুঃস্বপ্নবিড়ম্বিত মনের নিকট ছোট নাতবৌ যে তাহার স্বামীকে উন্মার্গগামিতা হইতে রক্ষা

করিয়াছে ইহাই তাহাকে সর্বময়ী গৃহলক্ষ্মীর মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। নিখিলেশের তাহাকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ও আধুনিক বেশভূষায় সজ্জিত করিবার সমস্ত সনাতন-সংসারবিরোধী রুচি ও খেয়াল ঠাকুরমার দাক্ষিণ্যে অন্তঃপুরে অবাধ ছাড়পত্র পাইয়াছিল। কেবল দুই জায়ের মধ্যে একের নির্মম ঔদাসীন্য ও অপরের গায়ে-পড়া অন্তরঙ্গতার মধ্যে ঈর্ষাদিগ্ধ উত্তাপ, হাস্যপরিহাস-প্রগলভ ভাষণের অন্তরালে তীক্ষ্ণ শ্লেষের জ্বালা মাঝে মধ্যে এই পারিবারিক সংস্কৃতির খোলসকে বিদীর্ণ করিত। বড় জা নিজের পাওনাগণ্ডা ও তাহারও অধিক কিছু পাইয়া আপনাকে সম্পূর্ণ বিবিক্ত রাখিত। মেজ জার ভাবভঙ্গী আরও জটিল উপাদানে গড়া, ও উহার স্বরূপ আরও প্রহেলিকাময়। তাহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বিমলার প্রতিটি সূক্ষ্ম ভাবভঙ্গীর প্রতি অতি সজাগ, ও উহার প্রত্যেক গোপন দুর্বলতার সন্ধানে ও আবিষ্কারে অভ্রান্তলক্ষ্য। তাহার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ অন্তরশায়ী ঈর্ষার দ্বারা উদ্রিক্ত প্রতিটি অবচেতন অভিপ্রায়ের মর্মবিদারণে অব্যর্থ। অথচ নিখিলেশের প্রতি তাহার কৈশোরজীবনলালিত একটি যথার্থ স্নেহানুভব আছে। এই ছলনাময়ী নিখিলেশের সমস্ত আজগুবি খেয়ালের সোৎসাহ সমর্থনের অভিনয় করে। বিমলা যদি এই ছলনাটুকু ধরাইয়া দেয়, তাহাতে সে বিন্দুমাত্র লজ্জিত না হইয়া দেওরের মনস্তুষ্টিকেই ইহার আসল হেতুরূপে কবুল করে। মেজবৌর আলাপ-আচরণ রঙ্গরসে উচ্ছল। উহার অন্তরে আদি ও বাৎসল্য রসের একটা সমন্বিত তরঙ্গ সতত সঞ্চরমান ও উহার আসল সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করে। একটি বিষয়ে নিখিলেশ ও বিমলার মধ্যে মতপার্থক্য সুপ্রকট—জ্যেষ্ঠ সহোদরদ্বয়ের পত্নীদের প্রতি তাহাদের মনোভাব। বিমলা নারীসুলভ অসহিষ্ণুতা ও খুঁতধারা কঠোর বিচারবুদ্ধি-প্রয়োগে তাহাদের সমস্ত কার্যের মূল্যায়ন করে। নিখিলেশ কিন্তু সহানুভূতির ক্ষমাস্নিগ্ধ দৃষ্টিতে, তাহাদের দুর্ভাগ্যের পটভূমিকায়, তাহাদের সমস্ত দোষক্রটির প্রতি উদার সমর্থনই দেখায়। বিমলা পুঞ্জীভূত প্রমাণ-প্রয়োগ ও দাম্পত্য প্রেমের সমস্ত দুর্জয় শক্তি দিয়াও স্বামীর মন ভাঙ্গাইতে পারে না। এই পারিবারিক নীতির ব্যাপারে নিখিলেশ নিজ আদর্শে অটল থাকে। নিখিলেশের আধুনিক আদর্শ আর একটি উদ্ভট পরীক্ষার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছে। সে বিমলাকে অন্তঃপুরের অবরোধ হইতে মুক্তি দিয়া ও বাহিরের লোকের সহিত অবাধ মেলামেশার সুযোগ দিয়া, সমস্ত সংসারের বাঁধন আলগা করিয়া তাহাদের দাম্পত্য

প্রেমের অকৃত্রিমতার যাচাই-এর জন্য উৎসুক। বিমলা এই আজগুবি প্রস্তাবকে হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছে। কিন্তু তাহাদের ভুল ভাঙিতে দেরী হয় নাই। এই পরীক্ষা এমন সাংঘাতিক প্রাণান্তকররূপে আবির্ভূত হইল, উভয়ের অনুভবের নাড়ীগুলিতে এমন মূল ধরিয়া টান দিল ও চিত্তকে এমন নিদারুণ বেদনায় উন্মথিত করিল, উহাদের সামগ্রিক সত্তা যেন একটা ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হইয়া পড়িল। যাহাকে একজন লঘু পরীক্ষারূপে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ছিল এবং অন্যজন সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াছিল, তাহা যে, এমন জীবনমরণসমস্যা হইয়া দাঁড়াইবে তাহা উভয়েরই অনুমানের অতীত ছিল। এই অভাবনীয় পরিণতির জন্য প্রধানত দায়ী, পাত্র-পাত্রী নয়, দায়ী যুগচেতনায় নিবিড়ব্যাপ্ত ভাবমত্ততা। বিমলা-নিখিল কেহই জানিত না যে এই পরীক্ষা আক্ষরিক ভাবে অগ্নিপরীক্ষা হইয়া উঠিবে, তাহাদের অন্তঃসঞ্চিত দহনশীলতায় নয়, দিগন্তপ্রসারিত বহ্নিবলয়-বেষ্টনীর উৎক্ষিপ্ত স্ফুলিঙ্গস্পর্শে।

এই ভূমিকাটুকুই আখ্যান ও মন্তব্যের সুনিপুণ সমাহারে ঘটনার স্থূল-বিন্যাসে ও মানসসূত্রসমূহের সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনায় বহুবৎসরের ইতিহাসটিকে পরিপূর্ণ নিটোলতায়, আমাদের নিকট প্রত্যক্ষবৎ উপস্থাপিত করিয়াছে। অতীতের সমস্ত দ্বন্দ্বসম্ভাবনা ও সূত্রজটিলতার সহিত সম্যক্ পরিচিত হইয়াই আমরা বর্তমানের রঙ্গমঞ্চে যে নাটক অভিনীত হইতে চলিয়াছে, যে মর্মান্তিক জীবন-সংঘর্ষ আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে তাহার দর্শকরূপে প্রস্তুতি অর্জন করিয়াছি। এই পূর্ব সূত্রগুলি সম্বল করিয়া নিয়তি নিজ দুশ্ছেদ্য সঙ্কটজাল বয়ন করিয়াছে।

'সন্দীপের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশের পূর্বেই বাংলাদেশে স্বদেশী আন্দোলনের ভাবোচ্ছ্বাসের প্লাবন বাঙালী নর-নারীর অন্তরকে কানায় কানায় পূর্ণ করিয়াছিল।' এই উন্মাদনা অনিবার্যভাবে দেশের চিত্তকে অধিকার করিবার দিকে অগ্রসর হইতেছিল। 'সংক্রামক ব্যাধির মত ইহা সমগ্র দেশে ছড়াইয়া পড়িয়া অন্তঃপুরিকাদের পর্যন্ত গার্হস্থ্য কর্তব্যের অন্তরাল হইতে জীবনের প্রকাশ্যতায় আকর্ষণ করিয়া আনিল। সমগ্র দেশবাসীর প্রত্যাশা যেন একটা অসম্ভবের আবির্ভাবের জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিল। নিখিলেশ কিন্তু এই দেশব্যাপী উত্তেজনায় অভিভূত না হইয়া ধীর বিচারবুদ্ধি ও অপ্রমত্ত দেশকল্যাণবোধের মানদণ্ডে নিজ কর্তব্যে স্থির আছে। সে দেশীয় শিল্পের পুনরুদ্ধার ও দেশের মানুষের সৃষ্টিচেতনা-উন্মেষের উপযোগী কর্মসাধনার প্রতি

অখণ্ড মনোনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। তাহার চিন্তা স্বদেশী হুজুগের পূর্বেই স্বদেশসেবার প্রতি উদ্বুদ্ধ হইয়াছে। সন্দীপ স্বদেশী আন্দোলনের নেতা ও নিখিলের সহপাঠীরূপে নিখিলের তহবিলের প্রতি দাবী জানাইয়াছিল ও বিমলার বিরক্তি সত্ত্বেও নিখিল এই দাবী মানিয়া লইতে দ্বিধা করে নাই। স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম উন্মাদনার মুহূর্তে বিমলা নিজ বিলাতী পোষাক-পরিচ্ছদ পোড়াইয়া ফেলিতে ও গৃহশিক্ষিকা মিস্ গিল্‌বিকে বিদায় করিয়া দিতে অত্যুৎসাহী হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই নিখিলের আদর্শনিষ্ঠা ও মানবিক সহানুভূতি তাহাকে এই উগ্র আতিশয্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছে।

ইহার পরই সন্দীপের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি, তাহার অগ্নিস্রাবী বাগ্মিতা ও সমস্ত-বাঁধ-ভাঙ্গিয়া-ফেলা ব্যক্তিত্ব, তাহার দেশের জন্য আত্মোৎসর্গের বীরত্ব ও মুক্তি-সংগ্রামের জন্য উদগ্র আহ্বান—সব মিলিয়া বিমলার মনে এক অনির্বচনীয় ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করিয়াছে। ইহার সহিত সন্দীপ যে তাহারই আত্মবিস্মৃত ভাবোদ্বেলতা হইতে পাথেয় সঞ্চয় করিয়াছে এই চাটুভাষণ তাহার আনন্দ ও আত্মগৌরবকে চরমে লইয়া গিয়াছে। ইহার অব্যবহিত ফল হইল সন্দীপের সহিত আরও অন্তরঙ্গ হইবার ইচ্ছা ও তাহাকে আহারের নিমন্ত্রণ। এই প্রথম বিমলার পরপুরুষের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ। প্রথম দিনের আলাপে-আচরণে সন্দীপের ব্যক্তিত্বমোহ বিমলার মনে ঘনীভূত হইয়াছে। তাহার অকুণ্ঠিত দাবী, ভাবোদ্দীপনের আশ্চর্য ক্ষমতা, আবেদনের তড়িৎদীপ্তি, ও মতপ্রতিষ্ঠানৈপুণ্য বিমলাকে অভিভূত করিয়াছে ও সে প্রকাশ্যভাবে ও প্রবল আন্তবিকতার সহিত সন্দীপের দুঃসাহসিক জীবনদর্শন, দেশের জন্য ন্যায়নীতিলঙ্ঘনের প্রতি অভিনন্দন জানাইয়াছে। এই প্রথম সম্মোহ আরও গুরুতর বিভ্রান্তির পূর্বসূচনা এমন কি সর্বনাশের ইঙ্গিতরূপেও তাহার মনে ঘনায়মান ছায়া ফেলিয়াছে।

ইহার অব্যবহিত পরবর্তী আখ্যান-ক্রম বিবৃত করিয়াছে নিখিলেশ। নিখিলেশের আত্মকথায় ঘটনার অগ্রগতির ততটা পরিচয় নাই, আছে নিজের, বিমলার ও সন্দীপের মানস বিশ্লেষণের আধিক্য। ঘটনার মধ্যে একটি অঙ্কুরের উল্লেখ দেখা যায়—সন্দীপের কর্মসূচী-পরিবর্তন ও এই পরিবর্তনের সমস্ত গৌরব যে বিমলারই প্রাপ্য, সন্দীপ কর্তৃক এইরূপ ধারণার পোষকতা।

সন্দীপ বিমলার সান্নিধ্যলালসায় তাহার স্বদেশী আদর্শ প্রচারের পদ্ধতিটি সম্বন্ধে নূতন পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে। বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরিয়া প্রচার অপেক্ষা একই কেন্দ্র হইতে পরিচালনা বেশী কার্যকরী হইবে ইহাই তাহার আবিষ্কার। এবং তাহার এই সদ্যোলব্ধ প্রত্যয় বিমলার অভ্রান্ত নির্দেশ ও অফুরন্ত উদ্দীপনশক্তিসঞ্জাত। এই ছলনা বিমলার চিত্তজয়েব একটি অমোঘ অস্ত্র। এই প্রথম সন্দীপ নিখিলের সম্মুখেই বিমলাকে মক্ষিরানী আখ্যা দিয়া দেশমাতার পূজায় তাহার নেত্রীত্বের সরকারী স্বীকৃতি জানাইল।

এই তথ্যটুকুর নূতন সংযোজনা বাদ দিলে, বাকী সব অংশটাই আদর্শবাদী নিখিলের তত্ত্বপ্রতিপাদন-প্রয়াসের অঙ্গীভূত। ইহাতে ঘটনার বাহিরে বিস্তার নাই, আছে উহার অন্তরগভীরে নিমজ্জন, যাহা ঘটিয়া গিয়াছে তাহারই তাৎপর্যব্যাখ্যা। প্রথম নিজের বেদনা ও নৈরাশ্যের কতকটা ভাবাতিরঞ্জনমূলক অভিব্যক্তি। বিমলার পরীক্ষা সবে আরম্ভ হইয়াছে, সন্দীপের প্রতি তাহার পক্ষপাতিত্বের ক্ষীণ আভাসমাত্র দেখা দিয়াছে। অথচ নিখিলেশ এখনই সর্বনাশের কান্না জুড়িয়াছে। যে ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যায়, তাহার জীবনসত্যপরীক্ষার আগ্রহ নিতান্তই অশোভন ঠেকে। এ পর্যন্ত বিমলার আচরণে এমন কোন গুরুতর প্রমাদ লক্ষ্য হয় নাই, যাহা এই মর্মান্তিক বেদনার উৎসরূপে গণ্য হইতে পারে। বিপদের প্রথম সূচনাতেই বিমলাকে লইয়া দার্জিলিঙ-যাত্রার প্রস্তাব পলায়নী মনোবৃত্তিরই পরিচয়—সঙ্কটের সম্মুখীন হওয়ার সাহস ইহার মধ্যে কোথাও নাই। তাহার দার্শনিকতার মর্ম যে অত্যন্ত ক্ষীণ ও ক্ষণভঙ্গুর, আদর্শবাদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার মনোবলের তাহার যে একান্ত অভাব, আসলে সে যে একজন প্রণয়াতুর, স্মৃতিবিলাসী, দুর্বল মানুষ তাহা তাহার চিন্তায় ও আচরণে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত। দাঙ্গার আবর্তসঙ্কটে ঝাঁপাইয়া পড়া সত্ত্বেও, তাহার প্রত্যয়দৃঢ়তার প্রতি যথাযোগ্য গুরুত্ব আরোপ করিয়াও, আমরা সামগ্রিক বিচারে তাহাকে বীরের তিলকভূষিত করিতে পারিলাম না। স্বভাব-নির্ভীকতার পরিবর্তে এইসব ক্ষেত্রে নীতি অভিমানই, তাহাকে বিপদ্-বরণের ক্ষণিক প্রেরণা দিয়াছে। বিমলার সঙ্গে স্বদেশসেবার আদর্শ সম্বন্ধে এই মতান্তর যে শুধু দৃষ্টিভঙ্গীর অনৈক্য নয়, মৌলিক স্বভাব-বৈপরীত্য ও সংসারের সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে ইহার আপোষ-নিষ্পত্তি সম্ভব হইলেও, বৃহত্তর কর্মজগতে ইহা যে বিপুলতর বৈষম্যসংঘাতে মর্মান্তিক আঘাত হানিবে

এই প্রচ্ছন্ন জীবনসত্যটি সে অনুভব করিয়াছে। সন্দীপের প্রকৃতিরহস্যের মর্মভেদও তাহার সূক্ষ্মদর্শিতার দ্বিতীয় নিদর্শন। সবসুদ্ধ মিলাইয়া সে দার্শনিকবুদ্ধিসম্পন্ন, কিন্তু স্বভাবদার্শনিক নয়।

(সন্দীপের প্রথম আত্মকথায় তাহার জীবনদর্শনের চরম নৈরাজ্যনীতির অপূর্ব তীক্ষ্ণ ও মনীষাদীপ্ত উদ্‌ভাসন স্মরণীয়, শাণিত উক্তিপরম্পরার শীর্ষাগ্রবিন্দুতে ঝলসিয়া উঠিয়াছে। তাহার এই আত্মকথা আত্ম-উদ্‌ঘাটনের ভূমিকা; ইহাতে সে পাঠকের হাতে তাহার অন্তর্লোক-উন্মোচনের চাবিটি তুলিয়া দিয়াছে। ঘটমান নাটকে সে যে অংশ অভিনয় করিবে, যে স্বভাবের পরিচয় দিবে, তাহার মূল প্রেরণাটি ইহারই সহায়তায় আমাদের নিকট দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হইয়া উঠে। নীতিবাদের আফিং-এ যাহারা জাগিয়া ঘুমায়, কল্পনার কুহকে যাহারা প্রত্যক্ষ জীবনসত্যকে অস্বীকার ও সার্থকতাকে বঞ্চনা করে, তাহাদের প্রতি তাহার সীমাহীন অবজ্ঞা ও আপোষহীন সংগ্রাম। দুরন্ত, অসঙ্কুচিত ইচ্ছাশক্তিই প্রাণের উৎস। সুতরাং এই ইচ্ছাশক্তির পরিপূর্ণ তৃপ্তিসাধন ব্যক্তি ও জাতির সার্থকতম বিকাশের মূলে। সুতরাং অকুণ্ঠিত শক্তিসাধনাই উচ্চতম জীবননীতি। সন্দীপ আশ্চর্য প্রত্যয়দৃঢ়তা ও অপূর্ব ব্যঞ্জনাশক্তির প্রয়োগে, তাহার ব্যক্তিত্বের প্রবলতম সমর্থনে এই তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। প্রথম তিনটি স্বগতভাষণে সমগ্র উপন্যাসটির ঘটনা-ও-চরিত্রগত পটভূমিকা প্রস্তুত হইয়াছে।

৩

ভূমিকার অব্যবহিত পরবর্তী স্তরে ঘটনার চক্রাবর্তনের প্রথম পর্যায় আরম্ভ হইয়াছে। চাকার ঘূর্ণনবেগ এখনও পরিমিত ও আয়ত্তাধীন আছে। সন্দীপের প্রতি বিমলার মোহ তাহার অজ্ঞাতসারে ক্রমশঃ রঙীন হইয়া উঠিয়াছে। মেজরানীর সদা-সক্রিয়, অতন্দ্র বাস্তবতাবোধই তীক্ষ্ণ ইঙ্গিতের চিমটি কাটিয়া বিমলার ঘনায়মান নেশাকে ক্ষণিকের জন্য রোধ করিত। প্রকৃতির নিয়মে লজ্জাবোধ মোহাচ্ছন্নতার একটা স্বভাব-প্রতিষেধক। ইহা নিজ আচরণের অসঙ্গতিকে আপনার নিকট অস্পষ্ট করিলেও পরের বিচারের দিকে মানুষকে সজাগ রাখে। বিমলার নিগূঢ়

অভিপ্রায় তাহার নিজের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিলেও, মেজরানীর ক্রূর হাসি ও বঙ্কিম কটাক্ষ তাহার আত্মমোহকে কতকটা নিবারণ করে। সন্দীপ বিমলার মোহকে আরও জমাট রূপ দিবার উদ্দেশ্যে তাহার স্তবরচনায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। সে বিমলার মধ্যে দেশলক্ষ্মীর প্রতিমা আবিষ্কার করিয়া, তাহাকে এক অসামান্য, অনন্য সত্তারূপে নূতন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছে। বিমলাও ক্রমশঃ নিজ দিব্য শক্তিতে প্রত্যয়শীল হইয়া আপনাকে সমস্ত সাংসারিক বিধিনিষেধের ঊর্ধ্বে দেবীমহিমার সমুচ্চ বেদীতে আরূঢ়-রূপে দেখিতে অভ্যস্ত হইয়াছে। সে যেন সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্থিতা লক্ষ্মীর ন্যায় নিজেকে সমস্ত লৌকিক-বন্ধনমুক্তা ভাবিয়াছে। ব্যক্তিস্বভাবের সব নিয়মাধীনতা ছেদ করিয়া সে যেন মুক্ত প্রকৃতির ভাবাকাশে ডানা মেলিবার অকুণ্ঠ অধিকার অর্জন করিয়াছে। সন্দীপের কপট পূজারতি তাহার বাস্তববোধকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করিয়া তাহাকে আত্মবিভ্রান্তির মায়ালোকে স্বেচ্ছাবিহারের স্বত্ব দিয়াছে। সে সত্যসত্যই নিজেকে দেশ-বিপ্লবের কেন্দ্রশক্তিরূপে কল্পনা করিতে কোন সঙ্কোচবোধ করে নাই। এই মোহাচ্ছন্নতার অচৈতন্যের মধ্যে নিখিলেশের সঙ্গে তাহার অন্তরতম নাড়ীর যোগটি কখন যে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে তাহা তাহার অগোচর রহিয়া গিয়াছে।

এই ভাবসম্মোহের বস্তুভিত্তিক দিকটা সন্দীপের আত্মকথায় প্রকাশ পাইয়াছে। দিগন্তব্যাপী কুহেলিকার মধ্যে ঘটনাসংঘাতের তুঙ্গ চূড়াগুলি মাঝেমধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছে। বিমলা-সন্দীপের ঘনিষ্ঠতার আতিশয্যের উৎকট অসঙ্গতিটুকু পরিবারের চোখে ধরা পড়িয়াছে ও তাহাদের প্রতিষেধ-কৌশলকে উদ্রিক্ত করিয়াছে। এই বিহ্বল ভাববিলাসের মধ্যে সমাজের রক্তচক্ষু হঠাৎ পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে। দারোয়ানের মধ্যবর্তিতায় সন্দীপের অন্দরে প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়াছে। বিমলা সন্দীপের এই অপমানে রোষে দিশাহারা হইয়াছে ও দারোয়ানের কর্মচ্যুতির দাবী জানাইয়াছে। মেজরানী এই অপ্রীতিকর ব্যাপারের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে লইয়াছে ও ছদ্মবিনয়ের অভিনয়ে নিজ দোষ স্বীকার করিয়াছে। ইহার ফলে সন্দীপের সঙ্গে বিমলার মেলামেশা আরও বাধামুক্ত হইয়াছে।

ইহার পর সন্দীপ-বিমলার সম্পর্কটি অনিশ্চিত আভাস-ইঙ্গিতের স্তর অতিক্রম করিয়া ক্রমশঃ সুস্পষ্ট লালসার রূপ লইয়াছে। বিমলার প্রসাধন-

কলার মধ্যে সন্দীপ একটি গোপন কামনার রঙীন ইশারা, একটি প্রলয়ের পূর্বাভাস অনুভব করিয়াছে। বিমলার এই মোহকে নিজ ভোগ-তৃপ্তির উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করিবার কৈফিয়তরূপে সে নিজ বস্তুতান্ত্রিক জীবনদর্শনের নীতিকথা আওড়াইয়াছে। বাসনাচরিতার্থতার আনন্দ ও বিজয়গৌরব তাহার নিকট উলঙ্গ সত্যরূপে প্রতিভাত। সে বিমলাকেও নিজ ভোগবাদ-তত্ত্বে দীক্ষিত করিবার সব রকম উপায় অবলম্বনেই প্রস্তুত। সুতরাং দেশোদ্ধারের আয়োজনের মধ্যে আধুনিক সাহিত্য-পরিবেশিত কামশাস্ত্রের পাঠ ও আলোচনা একটি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছে। স্বদেশী মন্ত্রের ফাঁকে ফাঁকে ভোগপ্রশস্তিও সোচ্চার হইয়া উঠিয়াছে। ভোগপ্রবৃত্তি যে মানবপ্রকৃতির স্বভাবধর্ম ও নীতিসংযম যে তাহার উপর একটা কৃত্রিম, দুর্বল আরোপ এই তত্ত্ব বিমলার নিকট সহজ করিয়া তোলার জন্য সে যুক্তি, আবেগ, দৃঢ়প্রত্যয়, জীবনসত্যের সমর্থনে সমস্ত অস্ত্র নির্বিচারে প্রয়োগ করিয়াছে। পরাধীনতা হইতে মুক্তি আর নীতিবন্ধন হইতে মুক্তি যে একই সংগ্রামের পরস্পরপূরক স্তরমাত্র তাহাই সে প্রমাণ করিতে ব্যস্ত হইয়াছে। মদ যে খাদ্যের মতই জীবনপুষ্টির আবশ্যিক উপাদান তাহাই সে বিমলাকে বুঝাইতে সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়াছে। তাহার দেহ অধিকার করিবার পূর্বে তাহার আত্মাকে কবলিত করার ষড়যন্ত্রে সে লিপ্ত হইয়াছে।

শুধু বিমলাকে প্রত্যক্ষভাবে দীক্ষিত করিবার উৎসাহেই তাহার প্রয়াস সীমাবদ্ধ থাকে নাই। চন্দ্রনাথবাবু ও নিখিলের সহিত আলোচনা-যুদ্ধ বাধাইয়া সে বিমলার দিকে নিজ জ্বলন্ত চিত্ত হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়াইবার কোন উপলক্ষ্যই সে উপেক্ষা করে নাই। প্রবৃত্তির নিঃসঙ্কোচ অধিকারবাদ যে শাশ্বত জীবনসত্যের সমার্থক ইহা প্রতিপন্ন করিতে সে প্রাণপণ প্রয়াস পাইয়াছে। তাহার দীপ্ত জীবনঘোষণার পঞ্চম সুরের নিকট নিখিলের আদর্শবাদের স্পর্শে নিরুত্তাপ, প্রত্যয়-প্রশান্ত, কিন্তু প্রত্যক্ষতার সমর্থনহীন তত্ত্বপ্রতিষ্ঠা যেন কড়িমধ্যমের মত নীচু গ্রামে বাজিয়াছে।

সন্দীপ, তাহার স্বভাব-অসংযম সত্ত্বেও, প্রতীক্ষা ও প্রস্তুতির মূল্য বোঝে। সে হঠকারিতাকে অভীষ্টসিদ্ধির সংক্ষিপ্ততম পথ বলিয়া ভুল করে না। সে আগুন লাগাইয়া অগ্নিদগ্ধ জীবের ছোটাছুটিটাকেই দাহনক্রিয়া-বিস্তারের প্রকৃষ্ট উপায় মনে করে। আদর্শের ইন্ধনেই যে প্রবৃত্তির আগুন আরও স্থায়িভাবে উদ্দীপ্ত হয় এই সত্য তাহার জানা আছে।

সুতরাং এই ভাবদীক্ষার ক্ষেত্রপ্রস্তুতির জন্য যে ধৈর্যটুকু প্রয়োজন তাহার সম্বল তাহার যথেষ্ট পরিমাণে আছে। ইতিমধ্যে অনুরাগ-প্রকাশের আয়োজনে বর্ণময় বাণীর প্রলেপে সে বিমলার মনকে রাঙাইবার আর একটি উপকরণ সে সংযোগ করিয়াছে। নিখিলের সহিত তাহার যে ছবি বৈঠক-খানার টেবিলে রক্ষিত ছিল তাহা হইতে বিমলার ছবিটি সরাইয়া শূন্যস্থানে সে নিজের একটি তরুণ বয়সের ছবি বসাইয়া দিয়াছে। তত্ত্ব ও ছবি নিজের নিজের কাজ করুক—সন্দীপের উদার রণনীতিতে রূপ ও প্রবৃত্তি-সত্য উভয়েরই স্থান আছে।

নিখিলের দ্বিতীয় কিস্তির আত্মকথা মর্মন্তুদ ঘটনার দার্শনিক সমীক্ষা, অনিত্য বেদনার নিত্যমূল্যায়ন। সন্দীপের তত্ত্বকথায় নদীর দুর্বার বেগ অনুভব করা যায়, নিখিলেশের তত্ত্বালোচনায় ঘটনার স্থির জলাশয়ে আদর্শের জ্যোতিঃ-সম্পাত। সেখানে ব্যক্তির মানসযন্ত্রণার উপরে শাশ্বত সত্যের কষ্টসাধ্য আত্মপ্রতিষ্ঠা, বেদনার মুকুটে দিব্য পারিজাতের মাল্যবেষ্টনী। নিখিলেশের চিত্তের ছাঁকুনিতে সমস্ত বিক্ষোভ-আলোড়নের আবিল সংবেগ একটি শান্ত রসনির্যাসে পরিস্রুত হইবার সাধনারত।

নারীকে নিজ স্ত্রীরূপে দেখিবার যে সমাজসংস্কার ও মানস আবেগ সার্বভৌম মানুষের দ্বিতীয় স্বভাবে পরিণত হইয়াছে তাহার বাহিরে ও তাহাকে অতিক্রম করিয়া তাহার একটা নিজস্ব প্রবৃত্তি আছে। এই প্রবৃত্তির স্বীকৃতির উপরেই দম্পতির নিত্যসম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত। দাম্পত্য সম্পর্ক যতই অভ্যাস ও আকৃতির সিমেন্টে দৃঢ় করিয়া গাঁথা হউক উহাতে প্রকৃতির ভগবদ্দত্ত অধিকার নাই। সুতরাং যতই বেদনাদায়ক হউক, বিমলাকে স্ত্রীরূপে না দেখিয়া উহাকে নিজ স্বভাবে দেখিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। নিখিল স্থির বুঝিয়াছে যে সন্দীপের সহিতই তাহার যথার্থ প্রকৃতিসাম্য বর্তমান। বিমলার উপরে এই কৃত্রিম, ভাববিলাসলালিত বিশেষ অধিকার তাহাকে ত্যাগ করিতেই হইবে। তাহার যুক্তি খুব স্পষ্ট, কিন্তু পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইবার পূর্বে এই অত্যন্ত সঙ্গত সম্ভাবনার কথা কেন যে তাহার মনে উদয় হয় নাই, তাহা অনুধাবন করা কঠিন। যাহার অতীত-দৃষ্টি এত স্বচ্ছ, তাহার পূর্বানুমান এত প্রমাদগ্রস্ত হইবে কেন? বিচারবুদ্ধির সঙ্গে বাস্তবদৃষ্টির এরূপ অসঙ্গতি নিখিলেশের ব্যক্তিসত্তাকেই সংশয়বিড়ম্বিত করিয়া তোলে। সে দার্শনিক আদর্শবাদের প্রতীক, হয়ত ঠিক রক্তমাংসের

মানুষ নয়, লৌকিক পরিবেশের সঙ্গে বেমানান, জীবনাবেগের সহিত শিথিল-সংপৃক্ত একটি ভাববিগ্রহ মাত্র। তাহার শেষ সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে অস্তিত্বের আসল মূল্য তাহার এই প্রেমের পরীক্ষায় পরাজয়গ্লানির হীনমন্যতার সহিত সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্ক। বিমলা তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেও তাহার জীবন ব্যর্থ হইবে না, তাহা নিজস্ব মহিমায় চিরভাস্বর থাকিবে। মানুষ এই নিখিলপ্রবাহিত অস্তিত্বধারার অবিচ্ছেদ্য অংশ ও এই শাশ্বত জীবন-মহিমার গৌরবে চিরপ্রতিষ্ঠিত। সন্দীপের সহিত তুলনায় তাহার মানবিক শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে তাহার আত্মপ্রত্যয় অবিচলিত। এমন কি বিমলার প্রতি অপাত্রন্যস্ত সমস্ত অর্ঘ্যসম্ভারও মানসী প্রেয়সীর নিকট নিবেদিতরূপে তাহার প্রেমসাধনার হোমশিখাতে আহুতি যোগাইবে।

এই নির্মল আদর্শ-প্রশস্তির সঙ্গে এবার সংসার-জীবনের মোহে ভরা ছোটখাট দাবী করুণ আবেদন মিশাইয়াছে। ঘুমন্ত বিমলার ললাটে একটি বিদায়-চুম্বনের ছাপ রাখিবার জন্য যে আকুতি জাগিয়াছে তাহাকে স্বীকৃতি দিতেই হইবে। মেজরানী ও মাষ্টার মশায় তাঁহাদের স্নেহব্যাকুল উৎকণ্ঠা লইয়া এই দার্শনিকের হৃদয়-দুয়ারে প্রবেশাধিকার জানাইয়াছে ও এই অধিকার প্রতিষ্ঠিতও করিয়াছে। অসীমের আকাশপটে এই ক্ষুদ্র দীপশিখাগুলি শাশ্বত জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর সহিত উহাদের করুণ, শঙ্কাকম্পিত আলোককণাসমূহ একই অর্ঘ্যথালে সাজাইয়া দিয়াছে। ইহারাও এই অন্তহীন মহাকাশযাত্রায় নিজ নিজ ক্ষণিক পদচিহ্নটি অনন্তের বুকে চির-মুদ্রিত রাখিয়াছে।

৪

বিমলার তৃতীয় দফার আত্মকথা ঘটনার অগ্রগতির আর একটি স্তর চিহ্নিত করিয়াছে। এই স্তরে তাহার মোহের স্বরূপটি তাহার নিকট ক্রমশঃ স্পষ্টতর হইয়া উঠিয়াছে। এই স্পষ্ট উপলব্ধির মূল প্রেরণা আসিয়াছে সন্দীপের উগ্রতর, নির্লজ্জতর কামনাপ্রকাশে। বিমলা ধীরে ধীরে এই প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তির আকর্ষণে, একটা আশ্চর্য ব্যক্তিসত্তার সম্মোহন প্রভাবে তাহার চিরাভ্যস্ত সংযম ও শালীনতার বেষ্টনী হইতে অজানা বিপদের অতল গভীরে স্বপ্নাচ্ছন্নের মত অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। ভক্তির আবেগ ও শ্রদ্ধার দাক্ষিণ্য নিঃশেষিত হইয়া সর্বনাশের ভয়াবহ আমন্ত্রণ, রক্ত-

মাংসের দুর্বার মত্ততা, পাতালমুখী যাত্রার ঝটিকাবেগ নগ্ন বীভৎসতায় আত্মঘোষণা করিয়াছে। বিমলা আর উচ্চতর প্রেরণার ছদ্মবেশ দিয়া তাহার অধোগতির যথার্থ ধারণাটিকে অস্পষ্ট রাখিতে পারে নাই। তাহার চোখে কলঙ্কই এখন ইন্দ্রধনুর মত মনোহর বেশে দেখা দিয়াছে, সর্বনাশই পরম সার্থকতারূপে প্রতিভাত হইয়াছে।

মেজোরানীর অবিরাম শ্লেষ ও সংসারের কর্তব্যবোধ বিমলার মনে আত্মসংবরণের সঙ্কল্প উদ্দীপ্ত করিয়াছে, কিন্তু সাংসারিক কর্তব্যের বালির বাঁধ এই প্রবৃত্তির জোয়ারকে রোধ করিতে পারিল না। সন্দীপের আহ্বানে এই সৎসঙ্কল্প চূর্ণ ও বৈঠকখানা ঘরে অভিসারের পালা পুনরনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই অভিসারলগ্নে সন্দীপের ঘনিষ্ঠতা আরও উদ্ধত নৈকট্যে আগাইয়া আসিল এবং বিমলার পূজাকে চোখের ক্ষুধিত কটাক্ষে কামনার অগ্নিশিখায় প্রজ্বলিত করিল। সেই মুহূর্তে বিমলার আত্মসমর্পণ অনিবার্য-প্রায় হইয়া উঠিল—সন্দীপের প্রচণ্ড ইচ্ছার সঙ্গে ন্যূনতম দৈহিক প্রচেষ্টা যুক্ত হইলেই উহা বাস্তব ঘটনায় পরিণত হইতে পারিত। দেশের স্তবের সঙ্গে যখন বিমলার ব্যক্তিগত প্রশস্তি মেশে, তখন বিমলার সমস্ত মানস সংস্কার দূর হইয়া তাহার অন্তর কামনার রঙে প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। এইরূপ একটি বৈদ্যুতিক ক্ষণই বিমলার জীবনে আবির্ভূত হইয়া তাহাকে সর্বনাশের নেশায় আবিষ্টপ্রায় করিয়া তুলিয়াছে।

হঠাৎ আবেগের এই ক্রান্তিপর্বে রাজবাড়ীর অন্দর হইতে একটি কৌশলময় বাধা আক্ষিপ্ত হইয়া ঘটনাটিকে অসামান্যতার তুঙ্গশিখর হইতে তুচ্ছের নিম্নভূমিতে অধঃপাতিত করিয়াছে। চরম আত্মোৎসর্গের গৌরব এক দণ্ডে উপহাস্যতার জঞ্জালস্তূপে ধূলিসাৎ হইয়াছে। রাজবাড়ীর অন্দরের নর্দমার জল যেন বাসরঘরের সুবাসিত আবহকে ভিজাইয়া দিয়া প্রণয়-রোমান্স ও দেশপ্রেমের আত্মোৎসর্গের উপর দারুণ ব্যঙ্গ হানিয়াছে। মেজরানীর দাসী বিমলার খাসদাসীর সহিত একটা অকারণ ঝগড়া বাধাইয়া এই অভিনয়ের সুর কাটিয়া দিয়াছে ও গীতিকবিতার প্রহসনে রূপান্তর ঘটাইয়াছে। প্রবৃত্তি ও ভাবমোহ-রচিত মায়াজাল নিমেষে ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে ও নিয়তির সমস্ত আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজন ঘরোয়া কলহের তুচ্ছতায় বিলীন হইয়াছে। মেজরানী সমস্ত দোষ নিজের ঘাড়ে লইয়া ও তাহার এই মেয়েলি ষড়যন্ত্র যে সন্দীপের গূঢ়তর অসদভিপ্রায় ব্যর্থ করার একটা

ফন্দিমাত্র একথা অকপটে স্বীকার করিয়া সমস্ত ব্যাপারটি বহ্বারম্ভে লঘু-ক্রিয়ার পর্যায়ে আনিয়া ফেলিয়াছে। এ যেন বিদ্যাসুন্দরের বাসরকক্ষে কোটালের খানাতল্লাসী—আদর্শমুগ্ধতার খাস্ কামরায় বাস্তবের সিঁদকাটা।

যাহাই হউক, বিমলা আসন্ন চরম বিপদ হইতে অব্যাহতিতে আত্ম-সমীক্ষার অবসর পাইয়াছে। সে নয় বৎসরব্যাপী অতীত বিবাহিত জীবনের স্মৃতিরোমন্থন করিয়াছে ও স্বামীর স্নেহ ও সম্প্রীতির নিদর্শনগুলি সম্বন্ধে নূতন করিয়া অবহিত হইয়াছে। দাম্পত্যসম্বন্ধের নিবিড় প্রীতি স্মৃতির সাহায্যে পুনরুজ্জীবিত হইয়া তাহার চিত্তের ভাবমুগ্ধতাকে ঘনীভূত করিয়াছে। অতীতের একাগ্র আরাধনা বর্ত্তমান অবিশ্বাসিতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধশক্তিকে জাগাইয়াছে। নিখিলের ও সন্দীপের দুইখানি ছবি যেন পরস্পরকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানায় ও উভয়ের আকর্ষণের তারতম্য যেন তুলাদণ্ডে ওজন হয়। কিন্তু এই আত্মসমীক্ষার শেষে সন্দীপের প্রমত্ত আমন্ত্রণই জয়ী হয়। সন্দীপ নারীর প্রলয়ঙ্করী শক্তির যে প্রশস্তিগান গাহিয়াছে, বিমলাকে যে ভৈরবীমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছে তাহাই সমস্ত পূর্বস্মৃতি, সমস্ত লোকলজ্জা, সমস্ত নীতিবোধের উপর জয়ী হইয়াছে। এই আত্মকথার পরিণামেও বিমলার চিত্ত সন্দীপের দিকেই ঝুঁকিয়াছে—মনপতঙ্গ নানা স্মৃতিপরিক্রমার পরেও সর্বনাশের বহ্নিমুখবিবিক্ষুই রহিয়াছে।

সন্দীপের আত্মকথায় অবিরত হৃদয়মন্থনের ফলে তাহার অন্তরে একটি নূতন পরিণতির অঙ্কুর উদ্‌ভিন্ন হওয়ার সংবাদ মিলিয়াছে। ইহা মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া একটা বিশেষ তাৎপর্যময় উন্মেষ। সন্দীপের ক্রূরসংকল্প, লৌহ-মানবিক সত্তার কোন একটা অদৃশ্য ফাটলে একটি দ্বিধার বীজ সুপ্ত ছিল। তাহাই সুপ্রচুর আবেগবর্ষণে হঠাৎ পল্লবিত হইয়া দেখা দিয়াছে। ইহা তাহার মধ্যে এমন একটা অপ্রত্যাশিত বিকাশ, যে তাহার সমস্ত আত্মপরিচয়ই সংশয়িত ও বাষ্পবিহ্বল হইয়া উঠিয়াছে। সে বিমলাকে জয় করিয়াও অধিকার করিতে একটা দুর্বোধ্য সঙ্কোচ অনুভব করিতেছে। তাহার সন্দেহ হইয়াছে যে ভারতবর্ষের সনাতন আদর্শবাদের বিষ হয়ত অজ্ঞাতসারে তাহার অস্থিমজ্জায় সংক্রামিত হইয়া থাকিবে। তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ এই ভাববিলাস তাহার ইচ্ছার অমোঘতাকে প্রতিহত করিতেছে। তাহার দৃপ্ত বিজয়াভিযান এক ব্যর্থ চক্রপ্রদক্ষিণের মুগ্ধ নিশ্চলতায় আত্মবিস্মৃত হইয়াছে। নিরেট বস্তুতন্ত্রতার ঠাসবুনানির মধ্যে

স্বপ্নময় আবেশের বড় বড় ফাঁক দেখা দিয়াছে। নিশ্চিতপ্রায় ও নিশ্চিতের মধ্যে এক সূক্ষ্ম ব্যবধানরেখাকে কিছুতেই মুছিয়া ফেলা যাইতেছে না। এই প্রসঙ্গেই সে সীতা সম্বন্ধে রাবণের মানস দুর্বলতার উল্লেখ করিয়া তাহার স্রষ্টার উপর এক রুষ্ট প্রতিবাদের ঝড় তুলিবার হেতু হইয়াছে। হয়ত নিখিলেশের দুর্বল আদর্শস্বপ্ন তাহার বাস্তবতার দৃঢ় ভিত্তির মূল শিথিল করিয়া দিয়াছে। এই 'কিন্তু'র আকস্মিক আবির্ভাব তাহার প্রকৃতির একনিষ্ঠতায় এক দ্বৈরাজ্যের সূচনা করিয়াছে। তথাপি সে সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করে যে এই ক্ষণিক দুর্বলতাকে সে কাটাইয়া উঠিবে ও বিমলাকে সাধনসঙ্গিনীরূপে পাইয়া যুগ্মভাবে প্রলয়শক্তিরূপিণী কালীর পূজায় ব্রতী হইতে পারিবে। এই অধ্যায়ে সন্দীপের একটি নূতন পরিচয় যবনিকার অন্তরাল হইতে ধীরে ধীরে উন্মোচিত হইয়া এক দিগন্তপরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়াছে।

নিখিলেশের আত্মকথায় অতীতরোমন্থনের মধ্যে একটা নূতন উপলব্ধির আভাস শোনা যায়। ভাদ্রমাসের বর্ষাপ্রকৃতির সবুজ প্রাণোচ্ছলতায় তাহারও প্রাণে সমস্ত দুঃখের ভার ঠেলিয়া ফেলিয়া একটি নব জীবনদর্শনের প্রথম অঙ্কুর দেখা দিতে চাহে। এই নবজাত সমারোহ তাহার মনে আত্মপরিচয়ের একটি নূতন ইশারা জাগাইয়াছে। প্রকৃতির দীপ্তিময় ইঙ্গিতের সূক্ষ্ম স্বরসঙ্গতির মধ্যে সে নিজ প্রকাশবঞ্চিত নিঃসঙ্গতা সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছে। বিমলার সঙ্গে এখানে তাহার একটা প্রকাণ্ড বিচ্ছেদ। বিমলা প্রবাহিণী নদী; সে নিথর জলাশয়। তাহার মনে গভীরতা থাকিতে পারে, কিন্তু সঞ্চরণ নাই। সেইজন্য তাহার সংসর্গ বিমলার কাছে উত্তাপহীন ও অতৃপ্তিকর।

এই ভাদ্রের অবিরল বর্ষণের মধ্যে বিদ্যাপতির সেই পুরাতন বিরহ-বেদনা তাহার মনে সুর হইয়া বাজিয়া উঠিয়াছে। ভাদ্রমাসের ভরা বিলে কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণ চন্দ্রালোকে তাহাদের প্রথম মিলনোৎসব কয়েক বৎসর ধরিয়াই নবীভূত হইয়া আসিতেছিল। এবারে সেই প্রমোদোৎসবের উপর বিরতির ছেদ পড়িল। ভাবমুগ্ধ বিরহলালনের প্রতিক্রিয়ায় উদ্দীপ্ত পৌরুষ সত্যাভিমুখী হওয়ার সাহস দিয়াছে। ইহারই আনুষঙ্গিক হিসাবে প্রেমস্বরূপের দার্শনিক সমীক্ষা তাহার মনে স্বতঃই জাগ্রত হইয়াছে। ভালবাসার অতিরঞ্জিত ভাববিলাস অপেক্ষা মনুষ্যত্বের দাবী যে উচ্চতর এই প্রত্যয় তাহার মনে ক্রমশঃ দৃঢ়মূল হইতে চলিয়াছে।

এই মোহভঙ্গের সূচনা আরও বহুদিকে প্রকাশ পাইয়াছে। প্রথমতঃ নিজ নৈরাশ্যমন্থনের ব্যর্থ চক্রাবর্তন হইতে সে এখন অপরের বাস্তব দুঃখে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছে। পঞ্চুর কঠোর জীবনসংগ্রাম, তাহার অদ্ভুত নীতিনিষ্ঠা তাহার নিজের ভাববিলাসের কুহেলিকামুক্ত হইয়া সুস্পষ্ট তীক্ষ্ণতায় চেতনায় অনুবিদ্ধ হইয়াছে। বিমলার সহিত নিজ আসক্তিমলিন সম্পর্ক-বিচারণার সঙ্গে সঙ্গে মাষ্টারমশায়ের সহিত তাহার সম্পর্কের উদার সত্যটি বৈপরীত্যক্রমে উদভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। বিমলার মোহকেন্দ্র হইতে সে ধীরে ধীরে আপনাকে সরাইয়া জীবনের বিচিত্র কর্তব্যলোকে আত্মপ্রসারণের উদ্যোগ করিয়াছে। বিমলার সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপের সঙ্কোচ এখনও তাহার দেহে-মনে জড়াইয়া আছে। কিন্তু এই ঘনসম্মোহ হইতে মুক্তির পথ তাহার সম্মুখে খুলিয়া গিয়াছে। তাহার অন্তরের যে গুঞ্জনধ্বনি তাহা ধুয়া পালটাইয়াছে—মন্দিরের শূন্যতার ক্ষোভ ভগবৎপ্রেমের আকৃতিতে লীন হইয়াছে।

বিমলার পরবর্তী আত্মকথায় দেশপ্রেমের সর্বাত্মক উচ্ছ্বাস ব্যক্তিগত আকর্ষণকে উদারতর ভাবলোকে উন্নীত করিয়া গীতিমূর্ছনার সুরে ব্যক্ত হইয়াছে। বস্তুতান্ত্রিক সন্দীপ পর্যন্ত মোটা ভাঙ্গা গলায় গান গাহিয়া উঠিয়াছে—পর্বতও অনির্দেশযাত্রায় মেঘের মত উড়িতে চাহিয়াছে। এই আবেগ বিমলার জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সঞ্চারিত হইয়া তাহার লজ্জার কালিমা, তাহার অপরাধবোধের গ্লানির উপর এক দিব্য ভাবমাধুর্যের চূর্ণরশ্মি ছড়াইয়াছে। বৈষ্ণব পদাবলীর অধ্যাত্মমোহ তাহার আবেগের নৈতিকতার প্রতি তাহাকে অন্ধ করিয়াছে। ইহার মধ্যে সন্দীপের প্রতি তাহার স্থূল আকর্ষণটি আদর্শরঞ্জনের রমণীয় প্রক্ষেপে সাময়িকভাবে অন্তরায়িত হইয়াছে।

এই পর্বে সন্দীপের স্বদেশী আন্দোলনের কর্মসূচী ভাবের আড়াল হইতে বাস্তবের স্থূলতায় অবতরণ করিয়াছে। বিলিতি নুন, চিনি, কাপড় পোড়ানর অত্যুৎসাহে দেশপ্রেম যজ্ঞের মত পবিত্র ও আগুনের মত রাঙা হইয়া উঠিবার লক্ষণ দেখাইয়াছে। এই বিদেশী-বর্জনের ব্যাপারে বিমলা এ যাবৎ একটা আভিজাত্যসুলভ রুচিবিমুখতা অনুভব করিয়াছে। বরং নিখিলই হুজুগ শুরু হইবার পূর্ব হইতেই স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারে ও স্বদেশী শিল্পের উৎসাহদানে উদ্যোগী ছিল ও এব্যাপারে মেজোরানী তাহাকে বরাবর সমর্থন যোগাইয়াছে। এইবার বিদেশী-বিতাড়নে নিখিলের সোৎসাহ

উদ্যমের জন্য সন্দীপ বিমলাকে আবেদন জানাইয়াছে ও বিমলা নিখিলের উপর তাহার প্রভাব সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হইয়া সন্দীপকে পূর্ণ আশ্বাস দিয়াছে। এই পরীক্ষামুহূর্তে বিমলা স্বামীর উপর তাহার মোহিনীশক্তিপ্রয়োগে সন্দীপকে অবাক্ করিয়া দিবার অহঙ্কারে বিশেষ সাজসজ্জা করিয়া নিখিলকে আহ্বান করিয়াছে। এই পরীক্ষায় বিমলা ও নিখিল উভয়েই নিজ নিজ শক্তির সীমা সম্বন্ধে নূতন পরিচয় পাইয়াছে। এই দিক দিয়া ঘটনাটির একটা তাৎপর্যপূর্ণ গুরুত্ব আছে।

বর্তমান পর্যায়ে নিখিলেশের আত্মকথার মধ্যে মোহভঙ্গের উল্লাস ও আত্মকেন্দ্রিকতার সঙ্কীর্ণ পরিবেশ হইতে মুক্তি-আহ্বান এক নূতন গতিবেগ সঞ্চার করিয়াছে। এ যেন মাকড়সার নিজের বোনা জাল কাটিয়া আলো ও বাতাসের মধ্যে অবাধ সঞ্চরণ। প্রথমতঃ পঞ্চুর জীবনসমস্যার প্রতি সচেতনতায় নিখিল সর্বপ্রথম অপরের সুখদুঃখকে নিজের বলিয়া অনুভব করিয়াছে। পঞ্চুর বাস্তব দুঃখের অনুভূতিতে নিজ মনোবেদনার মোহচক্র হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছে। মাষ্টারমশায়ের সঙ্গে পঞ্চুর সম্বন্ধের ভাববিলাসের প্রশ্রয়হীন, নিরাসক্ত মহত্ত্ব তাহার চেতনায় যথাযথভাবে ধরা পড়িয়াছে। এই বিরাট বিশ্বজগতের অনন্য ভাবকেন্দ্র যে বিমলার সহিত তাহার চিরাভ্যস্ত প্রণয়াধিকারের প্রতিষ্ঠা নয় তাহা সে উপলব্ধি করিয়াছে। তাহার চিত্ত সত্যদৃষ্টিরোধী মোহের কবল হইতে উদ্ধার পাইয়া মুক্তির শ্বাস ফেলিয়াছে।

ইহার পর তাহার বাহির্মুখী কর্মপ্রয়াসের আরও উপলক্ষ্য মিলিয়াছে। সে ও মাষ্টারমশায় স্বদেশী নেশায় উদ্‌ভ্রান্ত স্থানীয় তরুণ সম্প্রদায়ের সহিত মতবিনিময়প্রসঙ্গে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গীকে সুস্পষ্ট আলোকে দেখিয়াছে। মাষ্টারমশায় নিখিলের জীবনাদর্শের সমর্থনে যে সূক্ষ্ম, অথচ গভীর প্রত্যয়নিষ্ঠ যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা একদিকে যেমন তাঁহার নৈতিক সাহস, অপর দিকে তাঁহার অকৃত্রিম ধর্মনিষ্ঠার পরিচয়বাহী। নিখিলের যে প্রশংসাটুকু তাহার নিজের মুখে অশোভন হইত, তাহা মাষ্টারমশায়ের মুখে খুব সুপ্রযুক্ত হইয়াছে। মোটকথা স্বদেশী প্রচারের জোরজুলুম যেমন শিষ্য তেমনি গুরুকেও সমভাবে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ ও শান্ত প্রতিরোধে উদ্দীপ্ত করিয়াছে। নিখিলেশের সঙ্গে মাষ্টারমশায়ের কোথায় সত্যিকার নাড়ীর যোগ, ও 'ঘরে-বাইরে'-র মর্মচ্ছেদী জীবনসমস্যায় তাঁহার যথার্থ ভূমিকাটি কি তাহা আমরা এই দৃশ্যে স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করি।

মাস্টারমশায়ের কাছে ধার-করা মূলধনে পঞ্চু যে বিলাতী গায়ের কাপড়ের ছোটখাট ব্যবসার সাহায্যে অতিকষ্টে সংসার চালাইতেছিল হঠাৎ তাহারই উপর সন্দীপের দলের নৈতিক রোষ বাস্তব আগুনে জ্বলিয়া উঠিল ও গরীবের সম্বল ভস্মসাৎ হইয়া বড়মানুষী খেয়ালের রোশনাই শিখা প্রসার করিল। জড় আগুনের মাধ্যমে আত্মিক শক্তির জয় ঘোষিত হইল এবং ইহার মধ্যে কোন অসঙ্গতি সেই ভাবমত্ততার যুগে ধরা পড়িল না। শেষ পর্যন্ত ছলনামুক্ত সত্যের নিকট নিখিলেশ আবেদন জানাইয়াছে যেন সত্যের দুর্গম পথের পথিক হইবার সাহস তাহার ক্ষুণ্ণ না হয়। এই আবেগই প্রমাণ করে যে সত্যদর্শনের শক্তি এখনও তাহার সহজ হয় নাই—সে এখনও দুর্লভ তপস্যার ধন, অনায়ত্ত সম্পদের ক্ষণদীপ্তি।

আখ্যানের পরবর্তী স্তর সন্দীপের প্রমুখাৎ শোনা গিয়াছে। বিমলা নিখিলেশের কাছে প্রতিশ্রুতিলাভে ব্যর্থ হইয়া চোখে অভিমানের অশ্রু ভরিয়া সন্দীপসমীপে আসিয়াছে। মেয়ে আর পুরুষের প্রকৃতিতে সূক্ষ্ম প্রভেদটি এই দৃশ্যে সন্দীপের নিকট প্রতিভাত হইয়াছে। মেয়ের 'আমি' আর পুরুষের 'আমি' দুই স্বতন্ত্র লোকের অধিবাসী, দুই বিভিন্ন ভাবের বাহন। পুরুষের অহংবোধে স্থূল তত্ত্বাভিমান, আর নারীর আত্মচেতনা ইন্দ্রধনুর সপ্তবর্ণে রঞ্জিত, শিল্পসৌন্দর্যের বিচিত্র ইঙ্গিতময়। সন্দীপের সমস্ত জীবন যে কেবল শক্তিচর্চায় নিয়োজিত হয় নাই, ভাব ও রূপের সাধনাতেও যে তাহার কিছুটা অভিনিবেশ ছিল তাহাই এই মন্তব্যে প্রমাণিত হইয়াছে।

এই আবেগঘন মুহূর্তটি সন্দীপ নষ্ট হইতে দিল না—সে বিমলার হাত চাপিয়া ধরিয়া তাহার সহিত সহমর্মিত্ব ঘোষণা করিল। কিন্তু এই বিদ্যুৎ-ভরা লগ্নটিও ঈষৎ স্পর্শসোহাগে আসিয়াই থামিয়া গেল। এই সুযোগের সম্যক্ অনুসরণে সে পরম সার্থকতার রমণীয় উপকূলে বাসনার তরীকে ভিড়াইতে পারিল না। বরং যে মাহেন্দ্রলগ্নে অমৃতপাত্র প্রায় তাহার ওষ্ঠলগ্ন হইয়াছে তাহা সে নিজের অমৃতপানের অক্ষমতার কারণবিশ্লেষণে নষ্ট করিয়াছে। এই আত্মসমীক্ষার ফলে সে নিজের প্রকৃতির মধ্যে একটি গোপন সঙ্কোচের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আরও সুনিশ্চিত হইয়াছে। তাহার সুস্থ দেহে "কিন্তু"র বীজাণু সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া তাহার ইচ্ছাশক্তিকে জীর্ণ করিয়াছে। এক আশ্চর্য স্ববিরোধের তাড়নায় সে যুদ্ধ না করিয়া যুদ্ধের প্ল্যান তৈয়ারি করার ছলনায় আশ্রয় লইয়াছে।

বিমলা একটা দারুণ সঙ্কটের মৃত্যুবর্ষী বিস্ফোরণ হইতে কেবল দৈববলেই বাঁচিয়া গিয়া প্রথমে বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছে; তাহার পরই রণকৌশল-আলোচনার এক ফাঁকে হঠাৎ সম্বিৎ পাইয়া পলায়নে আত্মরক্ষা করিয়াছে। এইরূপে তাহার প্রচণ্ডতম দুর্যোগ কাটিয়া গিয়াছে।

বিমলার অন্তর্ধানের পর ঘরের আকাশ-বাতাস, সূর্যাস্তকালে পশ্চিম দিগন্তের ন্যায় অচরিতার্থ কামনার রং-এ, কিয়ৎক্ষণের জন্য আবেশময় হইয়া রহিল। ইতিমধ্যে বিমলার স্থলে অমূল্যর আবির্ভাব ঘটিল। প্রণয়ের মুগ্ধতার পরিবর্তে সংগ্রামের উগ্র মাদকতা চিত্তকে আর এক রকমের নেশায় আবিষ্ট করিল। প্রণয়স্বপ্নবিভোর সন্দীপের মধ্যে দুর্ধর্ষ যোদ্ধা জাগিয়া উঠিল। প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি সমস্ত বাধাকে চূর্ণ করিয়া, কোন আপোষের প্রশ্রয় না দিয়া তাহার অমোঘ বিজয়রথকে সাফল্যের চরম সীমা পর্যন্ত চালাইয়া লইয়া যাইতে দৃঢ়সংকল্প। সমস্ত বিরোধী জনমতকে, মানুষের মনের সহজ গতিকে, দারিদ্র্য ও জীবিকার্জনের ন্যূনতম প্রয়োজনকে, অর্থনীতি ও মনস্তত্ত্বের সমস্ত অনুশাসনকে বিধ্বস্ত করিয়া স্বদেশী প্রচারের ঝটিকাগতি অব্যাহত থাকিবে—ইহাই বিধাতার অভিপ্রায়ের ন্যায় সন্দীপের অমোঘ নির্দেশ। বিদেশীপণ্যবাহী মাঝির নৌকা ডুবাইয়া দেওয়া এই বজ্রধরের প্রথম অশনিক্ষেপ।

যুদ্ধে নামিলে রসদ অপরিহার্য। সুতরাং টাকার প্রয়োজন এখন আশু ও উদগ্র হইয়া উঠিল। এই টাকার দাবিতেই বিমলার সঙ্গে সন্দীপের সম্পর্ক নূতন জটিলতাসূত্রে গ্রথিত হইল। ইহারই স্থূল লোলুপতা উৎকটভাবে প্রকাশিত হইয়া পরিণামে সন্দীপের দেবপ্রতিমার অন্তরালে মৃন্ময় স্তরটি উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে। দেশনেতার দিব্য জ্যোতি ধাতব পিঙ্গলতায় শেষ পর্যন্ত আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। প্রেমিক ও বীরসত্তার সহিত লোভের যে একটা স্বভাব-বৈপরীত্য বর্তমান তাহাই ক্রমে ক্রমে অতিমাত্রায় প্রকট হইয়া সন্দীপ-চরিত্রের অধোগতি ঘটাইয়াছে ও বিমলার অন্তর্দ্বন্দ্ব ঘনীভূত করিয়া তাহার মোহভঙ্গ ত্বরান্বিত করিয়াছে।

বিমলার নিকট টাকার দাবীর মধ্য দিয়া সন্দীপের মনস্তত্ত্বের বিচিত্র ও বহুমুখী প্রকাশ ঘটিয়াছে। সর্বপ্রথম ঐশ্বর্য-আহরণের নীতিগত ও দার্শনিক তত্ত্বরূপটি আশ্চর্য শক্তি ও মননের সহিত সূত্রনিবদ্ধ হইয়াছে। ইহা যেন Nietzche-র শক্তিভিত্তিক দর্শনবিচারের সমধর্মী। ইহার মধ্যে

আপাতদৃষ্টিতে মানবকৃত ন্যায়নীতি লঙ্ঘিত হইতেছে। কিন্তু ইহা গূঢ়তর জীবননীতির ও বিবর্তনবাদের, মানুষের প্রকৃতিনিহিত সত্যধর্মের, অনুবর্তী। প্রথমতঃ সৃষ্টিতত্ত্বে ইহার সমর্থন মিলে—মানবের ক্রমবর্ধমান দাবী মেটানোতেই পৃথিবীর সৌন্দর্য ও উর্বরতা উৎসারিত, প্রগতিশীল মনের আকাঙ্ক্ষাপূরণেই ইহার সার্থকতা। দ্বিতীয়তঃ নর-নারীর সত্য সম্পর্কও ঐ একই মানদণ্ডে নির্ধারিত। পুরুষের দাবী মানাতেই নারীসত্তার মাধুর্য-বিকাশ—স্ত্রীস্বভাবের পরম সৌকুমার্যময় উদ্বর্তন। পুরুষের লুব্ধ আকর্ষণেই নারীর কাব্যরমণীয়তার পুষ্পিত পেলব পরিণতি, তাহার আত্মোৎসর্গমহিমাও সেই একই প্রেরণাসঞ্জাত। পুরুষ তাহার দাবীর পরিমাণ বাড়াইয়া ও নারী সেই লুণ্ঠনক্রিয়ায় সহযোগিতা করিয়াই উভয়েই বিধাতার অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতেছে। পুরুষের নিষ্ঠুর আঘাতেই নারীহৃদয়ের কোমলতম উৎসের উন্মোচন, পুরুষের কঠোর পেষণেই নারীর মর্মস্থল হইতে সুরভিতম পরিমলের উৎসারণ। সুতরাং বিমলার নিকট মোটাটাকা দাবি করিয়াই সে বিমলাকে পরিপূর্ণ আত্মবিকাশের সুযোগ দিয়াছে। সে ইচ্ছা করিয়াই টাকার পরিমাণ বেশী করিয়াছে, নহিলে ভিক্ষুকতা রাজকরের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয় না। এই সমস্ত সূক্ষ্ম নৈতিক ও দার্শনিক কারণের সহিত স্থূলতর আত্ম-প্রয়োজনমূলক যুক্তি সমন্বিত হইয়াছে। সন্দীপ এই টাকাটা চাহে তাহার প্রকৃতিগত ভোগবিলাসের চরিতার্থতার প্রয়োজনে, তাহার রাজকীয় স্বভাবের মর্যাদানুরূপ জীবনচর্যার তাগিদে। যেমন কবি মধুসূদন অমিত-ব্যয়িতার দাবী জানাইয়াছেন শুধু তাঁহার মহাকাব্যোচিত ঐশ্বর্যপ্রকাশের জন্য নয়, তাঁহার আত্মস্বভাবের গূঢ়তর কারণে, তেমনি সন্দীপও তাহার আত্মস্বভাব ও নেতৃত্বভূমিকার যুগ্ম প্রেরণায় তাহার জীবনে ভোগের উপকরণ সঞ্চয় করিতে চাহে। লঙ্কার মণি-মাণিক্যদীপ্তি যেমন শেষ পর্যন্ত কবির অন্তর্নিহিত মানস ঐশ্বর্যের বহিঃবিচ্ছুরণ, তেমনি সন্দীপের জীবনে ভোগের ছটা নৈর্ব্যক্তিক ও ব্যক্তিগত উভয়বিধ আলোকরশ্মির সমবায়-জাত। নিখিলেশের প্রতি ঈর্ষ্যারও একটি তৃতীয় তির্যক রেখা এই বর্ণালী-সঙ্গমে যোগ দিয়াছে। যাহার স্বভাবদরিদ্র হওয়া উচিত ছিল, ঐশ্বর্য তাহার নিকট একেবারে অর্থহীন। সুতরাং প্রাকৃতিক নিয়মে তাহার অপ্রয়োজনীয় অর্থ সন্দীপেরই ন্যায়তঃ উপভোগ্য। কমলাকান্তের বিড়ালের যুক্তি এই নরখাদক ব্যাঘ্রের মুখে খুব কৌতুকজনক শোনাইয়াছে।

ইতিমধ্যে কর্মজালের বিস্তারের সঙ্গে টাকার প্রয়োজন আরও জরুরি হইয়াছে। বে-আইনি কাজের জন্য দরাজ হাতে অর্থব্যয়ের প্রয়োজন। সন্দীপের উপায় যে পরিমাণে অবৈধ, সেই পরিমাণেই ব্যয়সাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। নৌকাডোবানোর খেসারৎ শুধু মাঝিকে দিলে চলিবে না। নায়েবকে তাহার অংশ দিতে হইবে; সন্দীপের চরিত্রের একটা প্রশংসনীয় দিক হইল যে সে মানুষের স্থূল প্রবৃত্তিগুলাকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে সদা প্রস্তুত। ক্ষণেকের জন্য সে নায়েবের উপর রুষ্ট হইয়াছিল কিন্তু সে শীঘ্রই আবিষ্কার করিল যে সকল মহৎ কার্যের তলায় একটা পাঁকের স্তর আছে, উহার দাবি মিটাইয়াই ফল সঞ্চয় করিতে হইবে। যে মোহমন্ত্র সে অপরের উপর প্রয়োগে সিদ্ধহস্ত তাহা হইতে সে নিজে সম্পূর্ণ মুক্ত। এই প্রসঙ্গ-আলোচনায় তাহার যে তীক্ষ্ণ বাস্তব বুদ্ধি, অপ্রমত্ত বিচারশক্তি ও দ্রুত সিদ্ধান্তগ্রহণের উপায়-কুশলতা অভিব্যক্ত হইয়াছে তাহা সত্যই তাহার বিস্ময়কর মেধা ও নেতৃত্বগুণের পরিচয় দেয়। রবীন্দ্রনাথ আশ্চর্য ভাষণ-বিভূতি দ্বারা সন্দীপের বিদ্যুৎগতি মননক্রিয়া ও নির্ভুল সঙ্কল্প-সিদ্ধান্তের বাঙ্‌ময় রূপটি প্রতিবিম্বিত করিয়াছেন। সে আপাততঃ বিমলার প্রতি মানস মোহকে রসবিলাসের পর্যায়ে সীমিত রাখার অনুকূলে যুক্তি দেখাইয়াছে। কর্মের উত্তেজনার ঠোকাঠুকিতে যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জ্বলিয়াছে তাহাই নিখিল ও সন্দীপের বোধশক্তিকে উদ্দীপ্ত করিয়া তাহাদের অন্তর্লোকের একটা অনাবিষ্কৃত দিক্‌কে আলোকিত করিয়াছে। উভয়ে উভয়ের মধ্যে একটা অস্বীকৃত মহত্ত্বের শিখা আবিষ্কার করিয়াছে ও স্মরণীয় উক্তির মধ্যে উহাকে স্মরণযোগ্য রূপ দিয়াছে। মাষ্টারমশায় সন্দীপকে অধার্মিক না বলিয়া বিধার্মিক নামে অভিহিত করিয়াছেন ও উহাকে অমাবস্যার অদৃশ্য চাঁদ আখ্যা দিয়াছেন। সন্দীপ নিখিলেশের চরিত্রনিরূপণে অনুরূপ অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছে। তাহার উক্তি হইল "চাঁদ সদাগরের মতো ও অবাস্তবের শিবমন্ত্র নিয়েছে, বাস্তবের সাপের দংশনকে ও মরেও মানতে চায় না"। কবির হাতে চরিত্রাঙ্কনের ভার পড়িলে উহা বিশ্লেষণের পদাতিকতাবৃত্তি পরিহার করিয়া গগনচারী শিকারী পাখীর ন্যায় মুহূর্তমধ্যে শিকারের মর্মভেদ করে। দিব্য আলোকের উদ্ভাসনে উহা গূঢ়তম গহনলোকের রহস্যকে স্বতঃসিদ্ধের মত সর্বজনবোধ্য করিয়া তোলে।

কর্মসাধনার এই পর্যায়ে সন্দীপের সৃষ্টিশক্তির অপরূপ মৌলিকতা অভিব্যক্ত

হইয়াছে। সে দেশমাতৃকার প্রতিমা নির্মাণ করিয়া এক নবপূজা-উৎসবের পরিকল্পনা উদ্ভাবন করিয়াছে। এই পূজার মধ্যে তাহার লোকচরিত্রের অদ্ভুত জ্ঞান, মোহের ইন্দ্রজাল বিস্তারের অপূর্ব শিল্পচেতনা ও বিমলার মনের উপর তাহার আধিপত্য স্থায়ী করিবার অমোঘ উপায়প্রয়োগ একসঙ্গে উদাহৃত হইয়াছে। যেরূপ আবেগ-মেশানো যুক্তি দিয়া সে নিজ কার্যক্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে তাহাতে তাহার নেতৃত্বশক্তির প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব জনচিত্তকে একেবারে অভিভূত করিয়াছে। সর্বোপরি, বিমলার উপর তাহার সম্মোহন প্রভাবের এইটিই শীর্ষবিন্দু। যে কবিত্বময় ভাষায় সে বিমলার নিকট এই পরিকল্পনার ব্যাখ্যা করিয়াছে, যে উচ্ছ্বসিত ভাবকল্পনায় সে বিমলার মধ্যে দেশমাতৃকার অঙ্গজ্যোতির প্রতিফলন দেখাইয়াছে, যে দ্ব্যর্থক ভাষার প্রয়োগে সে দেশের স্তবের সহিত বিমলার প্রশস্তি অভিন্নরূপে মিশাইয়াছে তাহা তাহার প্রতিভার চূড়ান্ত প্রকাশ। এইটিই সন্দীপের জীবনের উজ্জ্বলতম মুহূর্ত। বিমলা ত প্রত্যুত্তরে তাহার নিকট সব সমর্পণ করিয়াছে ও আপনাকে দাসীরূপে তাহার চরণে নিঃসর্তভাবে বিকাইয়া দিয়াছে। তাহার রূপযৌবন, তাহার মানসম্ভ্রম, তাহার ধর্ম ও নীতির আদর্শ সবই সে তাহার বীর প্রেমিকের নিকট উৎসর্গ করিয়াছে। এই উনবিংশ শতকের যুক্তি াসিত কৃপণ জগৎ হঠাৎ পৌরাণিক অতীতের অরূপলোকে উত্তীর্ণ হইয়াছে—বৈষ্ণব কবিতার আত্মনিবেদনের সুর অতি আশ্চর্য সঙ্গতির সহিত এই স্থূল প্রতিবেশের সহিত একাত্ম হইয়া গিয়াছে। এই মুগ্ধ আত্মবিস্মরণের লগ্নে সুচতুর সন্দীপ আবার টাকার কথায় ফিরিয়া আসিয়াছে। তবে তাহার দাবী এখন পঞ্চাশহাজার হইতে অচিরদেয় পাঁচে নামিয়া আসিয়াছে। মোহের যাদুকর মোহের বস্তুভারবহনের সীমা সম্বন্ধেও তীক্ষ্ণভাবে সচেতন। ইহাই সন্দীপের অন্তিম স্বগত-ভাষণ। ইহার পরে তাহার উপন্যাসে যে অংশ তাহা বিষয়রূপে, বক্তারূপে নয়। সে উপন্যাসের অগ্রগতিতে যে ঘূর্ণীবেগ সংযোজন করিয়াছে, তাহাতে সে নিজে, বিমলা ও নিখিল আবর্তিত হইয়াছে। কিন্তু প্রত্যক্ষ বিবৃতিকারের যে দায়িত্ব, রথচক্র ঘুরাইবার যে সক্রিয়তা তাহা এইখানেই নিঃশেষ হইয়াছে। সে নিজে ও অপরে এই বেগসঞ্চারের মত্ততা অনুভব ও পরিপাক করিয়াছে, কিন্তু সুরা-পরিবেশনের যে ভূমিকা তাহা হইতে সে স্খলিত। ইহার পর দৃশ্যউদ্‌ঘাটনের যে আয়োজন তাহা বিমলা ও নিখিলেশের মধ্যে বণ্টন করা হইয়াছে। সাপের ছোবলের

পালা শেষ, এবার ধীরে সুস্থে বিষ হজম ও প্রতিষেধের পালা অপর দুই ভুক্তভোগীর উপর ন্যস্ত।

৫

নিখিলেশের আত্মকথা আদি-অন্ত বহির্ঘটনানির্ভর, কিন্তু মাঝখানে স্মৃতি-রোমন্থনে মদির। নিখিলের যে মজ্জাগত আদর্শবাদ তাহা একদিকে নীতিনিষ্ঠায় দৃঢ়, অপর দিকে প্রণয়ভাবুকতায় স্বপ্নময়। ইহার গোড়াতেই স্বদেশী আন্দোলন যে হিংস্র ও নীতিহীন ব্যক্তি-আক্রমণের রূপ লইতেছে, নিখিলকে জনমতে হেয় করিবার যে সুপরিকল্পিত প্রচারকার্যের আশ্রয় লইতেছে, তাহারই স্বরূপ-উদ্‌ঘাটন। উত্তেজিত ও শাশ্বত নীতি হইতে বিচলিত তরুণ সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাহার যে তর্ক হইয়াছে তাহা নিখিলেশের চরিত্রের এক দিক প্রতিফলিত করিয়াছে। এই তর্কের মধ্যে নিখিল অপেক্ষা সন্দীপেরই ক্রুর সঙ্কল্প ও নির্মম কর্মপদ্ধতি বেশী করিয়া ফুটিয়াছে। সন্দীপের নির্মোহ বাস্তববোধ এক নূতন নীতির প্রচার ও পোষকতা করিয়াছে। সমাজে যাহারা অত্যাচারী, নৃশংস ইচ্ছাশক্তির অধিকারী তাহারাই স্বাধীনতাসংগ্রামের নেতৃত্বের যোগ্যপাত্র।

শেষের দিকে প্রতিরোধ-সংগ্রামের বিপরীত দিক্‌টির উপর আলোক-পাত হইয়াছে। এ যুদ্ধে নীতি ও ন্যায়ের পক্ষে সেনাপতিত্ব করিয়াছেন আদর্শবাদী মাষ্টারমশায়। তিনি পঞ্চুর জাল মামীর বিবেকবুদ্ধি-উদ্দীপনে গান্ধীনীতির আশ্রয় লইয়াছেন এবং উহাতে সাফল্যলাভও করিয়াছেন। মনে হয় যে এখানে সত্যধর্মকে বৈষয়িক কূটবুদ্ধির বিরুদ্ধে কিছুটা জোর করিয়াই জিতাইয়া দেওয়া হইয়াছে। হরিশ কুণ্ডু মাষ্টারের সরল চালে মাত হইবার পাত্র নহেন। যাহা হউক, এখানে লেখকের যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ—নীতিতে হয়ত কিছুটা অবাস্তব প্রত্যয় দেখান হইয়াছে। আমাদের মনে সংশয় জাগে যে কুণ্ডুর শেষ ভীতিপ্রদর্শন কেবলমাত্র শূন্যগর্ভ আস্ফালনে পর্যবসিত হইবে না—বৃশ্চিকের পিছনকার হুলেই দংশনশক্তি নিহিত।

কিন্তু ভূমিকা ও উপসংহার বাদেও এই আত্মকাহিনীর অন্তঃসারের প্রধান উপাদান নিখিলেশের প্রেমিকসত্তার সুরভিত নির্যাসের পরিচয়। হেমন্ত-অপরাহ্ণের ম্লান আলোয় সংবেদনশীল মনের যে রঙ বদলায়, প্রকৃতির সহিত যে সূক্ষ্ম একাত্মতা মানব অনুভূতিতে সান্ধ্যছায়ার সহিত ঘনীভূত

হয়, নিখিলেশের অন্তরাত্মা তাহাতে আবিষ্ট হইয়া এক অনির্বচনীয় মুগ্ধতায় স্বপ্নময় হইয়াছে। এখানে যেন 'ছিন্নপত্র'-এর ও কাব্যের রবীন্দ্রনাথ নিখিলের মধ্যে মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন। সন্ধ্যা যখন দিবসের শত বিক্ষেপ হইতে চিত্তকে গুটাইয়া আনিয়া একে কেন্দ্রীভূত হইবার আহ্বান জানায়, তখন সমস্ত মন একটা অব্যক্ত অভাববোধে গুমরিয়া উঠে ও নিজের নিঃসঙ্গতা দুঃসহ বেদনার সহিত অনুভব করে। প্রদোষের এই আলো-আঁধারি মায়ায় নিখিলেশের দার্শনিক নির্লিপ্ততার সঙ্কল্প এক সর্বরিক্ত শূন্যতাবোধে উতলা হইয়া উঠে—তত্ত্বনিষ্ঠা কবিকল্পনায় রোমাঞ্চিত হয়। সুতরাং এই শূন্যতার তাড়নায় নিখিল অন্দরের বাগানে চন্দ্রমল্লিকার জন্য স্পর্শোন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে—বিবর্ণ হৃদয়শতদলের পরিবর্তে বাগানের তাজা ফুলের গন্ধময় আমন্ত্রণকে লালন করিতে ছুটিয়াছে। সেখানে আকস্মিকভাবে হৃদয়ভারাতুরা, উদ্‌ভ্রান্ত বিমলার সঙ্গে দেখা হইয়া তাহার নীরব মনোবেদনা চমকিত বিস্ময়ের সহিত নিখিলের হৃদয়ে স্ফুরিত হইয়াছে। এই ভাবরোমাঞ্চময় মুহূর্তে নিখিল বিমলাকে মুক্তি দিবার দৃঢ় সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছে। মুক্তি-আবেগের উপজাত তত্ত্বরূপটি মাষ্টার মশায়ের সহিত আলোচনায় কিছুটা অপ্রাসঙ্গিকভাবেই উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে—প্রাণের তরঙ্গিত উচ্ছ্বাস দার্শনিক মীমাংসার বন্ধনে আত্মসমর্থন খুঁজিয়াছে। এখানে নিখিলেশের মনের গভীর হইতে উৎসারিত একটি ভাবনির্ঝর হঠাৎ তাহাকে চরিত্রানুযায়ী অনিশ্চিত ভাবনার সমতল হইতে নিশ্চিত সঙ্কল্পের ঊর্ধ্বভূমিতে উৎক্রান্ত করিয়াছে।

বিমলার পরবর্তী আত্মকথা নিয়তির গূঢ়সঙ্কেতে ও ভাগ্যপরিবর্তনের রেখাজালে তাৎপর্যময়। তাহার নিজ সম্বন্ধে যে যাদুপ্রভাবের স্থির বিশ্বাস সন্দীপের চাটুবাক্যে ও অমূল্যর কিশোর মনের মুগ্ধ আত্মনিবেদনে পুষ্ট হইয়াছিল তাহা নিখিলের নাস্তিকতায় একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। মোহ-মদিরার নেশা এখন তাহার নিকট অপরিহার্য জীবনপ্রয়োজনের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। এখন মোহভঙ্গের বিবর্ণতা তাহার অন্তরকে শূন্য করিয়া সমস্ত পরিবেশে ব্যাপ্ত হইয়াছে। এই চরম বিষাদের মুহূর্তে সন্দীপের সঙ্গে সাক্ষাৎ আবার তাহার আত্মমর্যাদার শূন্যভাণ্ডারকে প্রাণসম্পদে পূর্ণ করিয়াছে। নিখিলের যে মুক্তির প্রস্তাব তাহার প্রশ্রয়কাঙাল অন্তর হইতে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়াছিল তাহা এই নব-উচ্ছ্বসিত আত্মবিশ্বাসের জোয়ারে

বুদ্‌বুদের ন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে। সন্দীপের পঞ্চাশ হাজারের দাবী আবার তাহাকে উপায়চিন্তায় উৎসুক ও সঙ্কল্পে দৃঢ় করিয়া তাহার শক্তিকে নূতন অবলম্বন দিল।

এই উত্তেজনাস্ফীত মানস প্রসারের মধ্যে অমূল্যর সহযোগিতা একটি বিশেষ মূল্য লইয়া তাহার নিকট প্রতিভাত হইয়াছে। সে টাকা যোগাড়ের প্রস্তাবে অমূল্যর বেপরোয়া মনের যে পরিচয় পাইয়াছে তাহাই কিন্তু সন্দীপের জীবনদর্শনের ক্রূরতার দিকে তাহার চোখ ফুটাইয়াছে। সন্দীপের নীতিহীন সুবিধাবাদ অমূল্যর মুখে বড়ই বে-মানান লাগিয়াছে। সন্দীপের ব্যক্তিত্বের যাদুতে ও কল্পনাশক্তির মোহে যে নগ্ন সত্য মনোহর ছদ্মবেশে চাপা ছিল, তাহার পরিণত মনন ও পরিবেশসৃষ্টির কুহকে যাহার স্থূল উপাদানগুলি একটা কৃত্রিম পালিশের নীচে আত্মগোপন করিয়াছিল, তাহাই যখন সরল বালকের সহজপ্রত্যয়নিষ্ঠ আন্তরিকতায় পুনরাবৃত্ত হইল, তখনই অরাজক নীতির সর্বনাশা ভয়াবহতা চরমভাবে উদ্‌ঘাটিত হইয়া পড়িল। অমূল্যর খাঁটি মুদ্রার আওয়াজের সহিত তুলনায় সন্দীপের মেকী তত্ত্বের চড়া সুর কৃত্রিম প্রতিপন্ন হইল। হরিণশিশুর বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে প্রতিবিম্বিত ছদ্মসাত্ত্বিক ব্যাঘ্রের হিংস্রতা ক্রূরতর ছায়া প্রক্ষেপ করিল। সন্দীপের মোহ কাটাইবার অতিসার্থক প্রতিষেধকরূপে অমূল্যর আবির্ভাব ঘটিয়াছে। ওস্তাদের মন্ত্রের নিষ্ফলতা সাকরেদের আবৃত্তিতে নিঃসংশয়িতভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। অমূল্যর অবলীলাক্রমে বৃদ্ধ খাজাঞ্চিকে হত্যা করিয়া টাকা লুটের প্রস্তাব বিমলার নেশা ছুটাইয়া দিয়াছে। এই কচি বালককে রক্ষা করার দৃঢ় সঙ্কল্প হইতেই বিমলার মোহিত অন্তর হইতে মা ও দিদির বিশুদ্ধ স্নেহসত্তাটি জাগিয়া উঠিয়াছে। বিমলার চিত্তশুদ্ধিতে অমূল্যর একটা বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। সে সন্দীপের অনুচররূপে প্রবেশ করিয়া ক্রমশ তাহার প্রতিযোগীরূপে উদ্বর্তিত হইয়াছে। বিমলা তাহাকে ভাইফোঁটার নিমন্ত্রণ জানাইয়া প্রণামীরূপে তাহার নিকট হইতে নরহত্যা ও আত্মবিনাশের অস্ত্র পিস্তলটি আদায় করিয়াছে।

কিন্তু এই শুভ প্রভাব দৃঢ় হইবার পূর্বেই সন্দীপের মোহ-সমুদ্র হইতে একটা প্রবল জোয়ারের ঢেউ আসিয়া বিমলাকে চরম আত্মাবমাননার অতল গহ্বরে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। তাহার দাবীর টাকা সংগ্রহের জন্য সে শেষ পর্যন্ত স্বামীর লোহার সিন্দুক হইতে গিনি চুরি করিয়াছে।

এই চৌর্যের উপলক্ষ্যে বিমলার সমস্ত সত্তা আমূল আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছে। স্বভাব-মহান চরিত্রের পরিচয় ফুটিয়া ওঠে তাহার অনুতাপদীর্ণ অন্তরের সমুদ্র-গভীর আলোড়নে ও অবিরত অস্বস্তির তরঙ্গ-উৎক্ষেপে। বিমলার টাকা চুরি তাহার বিবেকে একটা সামগ্রিক বিপর্যয় সৃষ্টি করিয়া তাহার সমস্ত জীবনবোধের রংটি পালটাইয়া দিয়াছে। তাহার সংসারের সহিত সুস্থ সম্বন্ধ, তাহার সমস্ত অতীত স্মৃতি, প্রেমচেতনা ও গৃহকর্ত্রীর সম্ভ্রম-সম্মানবোধ যেন রাহুগ্রাসে দিবালোকের মত ম্লান, বিবর্ণ ও অস্থির হইয়া গিয়াছে। তাহার আত্মগ্লানি-প্রণোদিত চিন্তাকল্পনাগুলিও যেমন সুদূরপ্রসারী, তেমনি মহৎতাৎপর্যদ্যোতক। ইহাতেই প্রমাণ হয় যে, তাহার সত্তার শিকড়গুলি কত সূক্ষ্মচেতনাবাহী ও কিরূপ ব্যাপ্তি ও গভীরতায় অন্তরে-বাহিরে প্রসারিত। অবশ্য লেখকের অনুভবগূঢ়তা ও কল্পনার ঐশ্বর্য ইহাতে পরোক্ষভাবে প্রতিফলিত, কিন্তু বিমলার মনোলোকে উহা আশ্চর্য নাটকীয় সঙ্গতির সহিত বিন্যস্ত। বিমলার পূর্বপরিচয় ও সত্তার বিকাশের সহিত এই অন্তর-গহন হইতে উৎসারিত আবেগধারা সম্পূর্ণভাবে মিশিয়া গিয়াছে। বিমলা-চরিত্রের পরিকল্পনা লেখকের চিত্তে কত নিখুঁতভাবে ও বিচিত্ররূপে জাগরূক ছিল, তাহা তাহার সমস্ত অবস্থার মধ্যে, সম্পদের উজ্জ্বল ছটায় ও আত্মাবমাননার গাঢ়তম অন্ধকারে, প্রণয়ের রোমাঞ্চিত অনুভবে ও নিঃসঙ্গতার মর্মন্তুদ আত্মবিচারে, সংসারের রানীরূপে ও দুর্ভাগ্যের বন্দিনীরূপে, সমভাবেই অভিব্যক্ত হইয়াছে। বিমলার সমস্ত প্রকৃতিটি নানা রঙের কিরণসম্পাতে, নানা প্রভাবের নির্মিতশিল্পে, আচরণের প্রকাশ্যতায় ও অন্তঃসমীক্ষার নিগূঢ়তায়, আমাদের অনুভূতির নিকট রূপময় ও প্রাণৈশ্বর্যদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

সন্দীপ ও অমূল্যর নিকট তাহার চুরির স্বীকারোক্তিতে ও চোরাই গিনিগুলির সমর্পণ-মুহূর্তে অভিজাত মহিলার লজ্জা-সঙ্কোচ তাহাকে মাটির সহিত মিশিয়া মুখ লুকাইবার অদম্য প্রেরণা দিয়াছে। পুরুষের কাছে নারীর এই আত্ম-উদ্‌ঘাটন তাহাকে অসহ্য গ্লানিতে অভিভূত করিয়াছে। অন্তঃপুরের আবরু হইতে বাহির হইয়াও তাহার অন্তরাত্মা সম্ভ্রমের শেষ পর্দা রক্ষা করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে হইয়াছে যে যাহারা তাহাকে দেশলক্ষ্মীর দিব্য মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল তাহারা কত অল্পমূল্যে, কয়েকটি গিনির বিনিময়ে সেই দেবীপ্রতিমাকে

বেদী হইতে নামাইয়া অমর্যাদার ধূলায় বিসর্জন দিল। কাঞ্চনমূল্যে অধ্যাত্ম শক্তিকে বিকাইয়া দেওয়া যে ভক্তদেরই চরম মূঢ়তা। ইহার সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি দুঃসহ অপমানের আঘাত তাহার বুকে গিয়া বাজিল। সন্দীপ ও অমূল্য উভয়েই দানের পরিমাণ-স্বল্পতার ভ্রান্ত অনুমানে এই চরম মূল্যে ক্রীত অর্ঘ্যকে অবজ্ঞা ও প্রত্যাখ্যানের দৃষ্টিতে দেখিয়া উহার সমস্ত নৈতিক মহার্ঘতাকে অপমান করিল। অমূল্য খুব দ্রুত বিকৃতবুদ্ধি-মুক্ত হইয়া প্রথম কাতর জিজ্ঞাসায়, পরে প্রসন্ন অভিনন্দনের দ্বারা তাহার সরল, হিসাব-নিকাশের অতীত কৃতজ্ঞতাবোধের পরিচয় দিয়া এই অপরাধের ক্ষালন করিল। এই অপমানের চরম ক্ষণে আধুনিকা বিমলা পৌরাণিকী সীতার ন্যায় পাতাল-প্রবেশের স্নেহাঞ্চলে নিজ নিরাশ্রয় লজ্জা গোপন করিবার প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভব করিল। বিমলার মনোভাবের আলোকে সীতার মনোভাব আমাদের নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। সন্দীপ কিন্তু এখনও তাহার অবজ্ঞায় ও ঔদাসীন্যে অটল থাকিল।

ইতিমধ্যে মোড়কের আবরণমুক্ত স্বর্ণমুদ্রাগুলি ছটা প্রকাশ করিল ও এই দীপ্তি আনন্দরূপে সন্দীপের অবজ্ঞাকুঞ্চিত মুখে প্রতিফলিত হইল। হঠাৎ আবেগে তাহার বাহিরের আচরণ উপেক্ষা হইতে আলিঙ্গনের বিপরীত সীমা স্পর্শ করিতে উন্মুখ হইয়া উঠিল। বিমলা অমূল্যর সামনে এই পাশবিক অনুরাগের প্রকাশের উদ্যোগে যেন তড়িতাহত হইয়া দৈহিক প্রতিরোধের দ্বারা গ্লানিকর অন্তরঙ্গতাকে প্রতিহত করিল। ইহার সদ্যো-পুরস্কার সে অমূল্যর সপ্রশংস দৃষ্টি ও ভক্তিমুগ্ধ প্রণতির রূপে লাভ করিয়াছে। সন্দীপ বেত্রাহত কুক্কুরের ন্যায় লোভের তৃপ্তিতে কামের ব্যর্থতা ভুলিয়া মোহরগুলি গুণিতে ও আত্মসাৎ করিতে ব্যস্ত হইয়াছে।

প্রত্যাখ্যানের নিদারুণ লাঞ্ছনার মধ্যেও সন্দীপের স্বভাবসিদ্ধ সম্মোহন শক্তি আশ্চর্যভাবে উদ্দীপ্ত হইয়াছে। কামুকের প্রাপ্য দণ্ডকে সে ভক্তের পরীক্ষার্থ দেবীর নিগ্রহরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছে ও এই শাস্তি শিরোধার্য করিয়া তাঁহার প্রীতিসাধনে আরও বদ্ধপরিকর হইয়াছে। এই অদ্ভুত প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্বের প্রয়োগে সে বিমলা ও অমূল্যর নিকট তাহার পূর্বপ্রতিষ্ঠা পুনরুদ্ধার করিয়াছে ও সার্বিক বিপর্যয় হইতে নূতন জয়মাল্য ছিনাইয়া লইয়াছে। সন্দীপের নবনবায়মান আত্মবিকাশ, বিভিন্ন অবস্থার সংঘাতে তাহার প্রকৃতির বিচিত্র অভাবিত উদ্‌ঘাটন তাহার প্রাণধর্মিতার অপূর্ব নিদর্শন।

সে কেবল পূর্বনির্দিষ্ট ধারণার যান্ত্রিক অনুবর্তন নয়, কোন শ্রেণীবিশেষের স্থাবর প্রতিনিধিমাত্র নয়, জীবনরহস্যের নানারূপে বিকশিত নব নব সম্ভাবনার অভিব্যক্তি ও উৎসারণ। সন্দীপের এই বহুরূপী প্রকাশ লেখকের অপূর্ব সৃষ্টিকল্পনার পরিচয়বাহী ও পাঠকের নিকট চিরবিস্ময়ের উদ্দীপক। সন্দীপের এই স্তবের অভিনয়কুশলতায় বিমলার মনে আবার মোহাবেশ ঘনাইয়া আসিল। "বন্দে মাতরং'-এর জ্যোতির্মণ্ডলে পাপ আবার রমণীয় হইয়া উঠিল।

ইহার অব্যবহিত পরেই মধ্যাহ্ন-আহারের জন্য অন্দরে আগত নিখিলের সহিত মুখোমুখি দেখা ও তাহার সহিত সহজ আচরণের দুরূহতার অভিজ্ঞতা। মেজোরানী ঠিক এই অবসরে নিখিলের নিকট স্বদেশী ডাকাতদের উপদ্রব-সম্ভাবনা সম্বন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া বিমলার ক্ষতস্থানের যন্ত্রণাকে তীব্রতর করিয়াছে। এই শঙ্কা-দুঃসহ আবহাওয়ায় বিমলাও দুঃসাহসিক ছলনার আশ্রয় হইয়াছে, হাস্য-পরিহাসের অভিনয়ে অস্বস্তি গোপন করিতে চাহিয়াছে। অন্দরমহলের ছলনা চুকাইয়া বিমলা আবার বৈঠকখানায় অমূল্য ও সন্দীপের—তাহার মর্মপীড়িত বিবেকের জীবন্ত স্মারকদ্বয়ের—সম্মুখীন হইয়াছে। সেখানে অমূল্যর সহিত গোপন পরামর্শের প্রস্তাব করিয়া সে সন্দীপের হীন ঈর্ষ্যাকে উদ্রিক্ত করিয়াছে। এক ছলনা পরবর্তী ছলনা-পরম্পরার অনিবার্য হেতু হয়—বিমলার ক্ষেত্রে ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে। সে চুরি-করা ছ হাজার টাকার ক্ষতিপূরণের জন্য তাহার সমস্ত অলঙ্কার বিক্রয় করিবার বিপদ্জনক ভার অমূল্যর উপর সমর্পণের প্রস্তাব করিয়াছে। রানীদিদির গহনা বিক্রয়ের উঞ্ছবৃত্তি লইয়া সন্দীপের সহিত অমূল্যর ইতিপূর্বেই মতান্তর দেখা দিয়াছিল। সুতরাং অমূল্য এ ব্যাপারে নীতিগতভাবে সন্দীপকে সমর্থন করিলেও উহার বাস্তব প্রয়োগের বেলায় নিজ সঙ্কোচকে কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই।

ইতিমধ্যে বিশ্রম্ভালাপের দৈর্ঘ্য সন্দীপের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাইয়াছে। সে বিনা আহ্বানেই কক্ষে প্রবেশ করিয়াছে। সন্দীপকে বাদ দিয়া অমূল্যকে বিশ্বাস-ভাজন করায় তাহার আত্মগৌরবে প্রচণ্ড আঘাত লাগিয়াছে। সে অমূল্যর উপর অধিকার হারাইতে মোটেই প্রস্তুত নয়। এই প্রতিযোগিতা-সংগ্রামে লিপ্ত হইয়া সে নিজের দুর্বলতারই সন্ধান দিয়াছে ও বিমলাকে তাহার মোহপাশ হইতে মুক্ত হইবার শক্তি যোগাইয়াছে। রাজার অধিকার-ঘোষণার মধ্যে ব্যর্থমনোরথ ভিক্ষুকের ক্ষোভ ক্রমশঃ স্পষ্টতর হইয়া উঠিয়াছে।

প্রণয়ের মধুগুঞ্জনের মধ্যে কলহের কটুতা উৎকটভাবে শোনা যাইতেছে। ইহারই ক্রান্তিবিন্দুস্বরূপ মত্ত লালসা সমস্ত শালীনতা-সংযম ছিন্ন করিয়া কামার্ত আলিঙ্গনে উদ্যত হইয়াছে। এই দ্বিতীয় অসংযমকে আর শোভন ছদ্মবেশ পরাইবার কোন অজুহাত খাটিল না। দেবীও ভক্তকে শাসনের প্রশ্রয় না দিয়া পলায়নে আত্মরক্ষার উদ্যোগ করিল। এমন সময় প্রতিবন্ধক আসিল দেবরোষের উদ্যত বজ্রে নয়, নিখিলের জুতার শব্দে ও তাহার আকস্মিক কক্ষপ্রবেশে।

নিখিলকে দেখিয়াই সন্দীপের উপস্থিতবুদ্ধি পুনঃপ্রদীপ্ত হইল। এবার আর দেবীপ্রশস্তির ছলনায় নয়, কবিতার মাধ্যমে প্রেমনিবেদনের প্রকাশ্য দুঃসাহসে সন্দীপের দুরন্ত প্রাণশক্তি বজ্র ও বিদ্যুতের অমোঘ দৃপ্ততায় আত্ম-ঘোষণা করিয়াছে। দৃশ্যের উপসংহারে অমূল্যর উপস্থিতি, বিমলার কল্যাণী-মাতৃমূর্তিতে প্রেয়সীসত্তার অবলুপ্তি, তাহার চরিত্রের একটা নূতন উন্মোচনের সংবাদ দিয়াছে।

এই অধ্যায়ে ঘটনার দ্রুত সঞ্চার ও সন্দীপ ও বিমলাচরিত্রের অভাবিত নূতন স্ফুরণ উপন্যাসটির বিদ্যুৎগর্ভ আবহ ও জীবনলীলার নবছন্দাশ্রিত গতিবেগ ফুটাইয়া তুলিয়াছে। তত্ত্ব ও সমষ্টি-পরিবেশের পূর্বনির্ধারিত কাঠামোর মধ্যে প্রাণের নব নব অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

৬

নিখিলেশও কিছু নূতন আবিষ্কার করিয়াছে। কিন্তু তাহার তত্ত্বনিষ্ঠ অনুভূতিতে জীবনের চমক নাই, আছে সত্যদৃষ্টির ক্ষীণ উদ্ভাসন। সে মেজোরানী ও বিমলার যে নূতন পরিচয় পাইয়াছে তাহা কোন অভাবনীয়ের আবির্ভাব নয়, তাহার কেবল তত্ত্বদৃষ্টিতে জীবনসত্যের উপর যে আংশিক অবগুণ্ঠন টানা হয়, প্রত্যক্ষের দমকা হাওয়ায় তাহার বিলম্বিত অপসারণ মাত্র। মেজোরানীর মনের নিবিড় স্নেহবুভুক্ষা সাধারণবুদ্ধিসম্পন্ন কোন মানুষের নিকট আবাল্য পরিচয়ের পর অজ্ঞাত থাকার কথা নয়। তবে নিখিলের ন্যায় আদর্শসন্ধানে ঊর্ধ্বলক্ষ্য ও পরিবেশবিমুখ চক্ষের নিকট তাহা হঠাৎ আলোর ঝল্‌কানির মত প্রতিভাত হইয়াছে। আত্মকেন্দ্রিক আদর্শবাদী ছাড়া বিমলার অন্তর্দ্বন্দ্ব ও নীরব মনোবেদনা অন্য কাহারও নিকট লুকান

থাকিত না। কিন্তু নিজের মনের চুলচেরা বিচার লইয়া উদ্‌ভ্রান্ত, নিজ মানস দিগন্তের দ্রুত পরিবর্তন লক্ষ্য করিতে ও নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠার সংকল্পে অতি ব্যগ্র নিখিল আর কাহারও দিকে দৃষ্টি দিবার অবসর পায় নাই। সুতরাং সে যেন বিমলার অন্তঃরুদ্ধ নিঃসঙ্গতার অতল শূন্যতা অনুভব করিয়া এক নূতন মহাদেশ-আবিষ্কারের বিস্ময়ে উচ্চকিত হইয়াছে। আদর্শবাদীর প্রকৃতি-নির্দিষ্ট শাস্তি এই যে, সে বাহিরে কৃত্রিম আনুগত্য ও অন্তর্জীবনে দৃষ্টিক্ষীণতার অভিশাপ বহন করিয়া বেড়ায়। নিখিলকে ঠিক সেই মূল্যই দিতে হইয়াছে। সে সহজ জীবনের সহজপ্রাপ্য সবুজ ঘাসের জন্য বন্যাবিধ্বস্ত পৃথিবীর উর্বরাশক্তির প্রত্যাবর্তনের পুনঃপ্রতীক্ষা করিয়াছে, সুস্থ জীবনের প্রসাদের জন্য ব্যাধিজীর্ণ দেহমনের নিরাময়ত্বের কৃপণ সৌভাগ্যের মুখাপেক্ষী হইয়াছে। মেজোরানীর অন্তরে তাহার জন্য যে স্নেহসুধা সঞ্চিত ছিল তাহা জানিতে তাহাকে দুর্যোগ-রজনীর নীরন্ধ্র অন্ধকারের জন্য প্রহর গুণিতে হইয়াছে। তেমনি বিমলাকে সে যদি সত্য সত্যই বুঝিত, তাহা হইলে সে শুধু দার্শনিকের নির্লিপ্ত দৃষ্টি দিয়া তাহার বিচার না করিয়া ভালবাসার রঞ্জন-রশ্মিতে তাহার অন্তর্লোকে প্রবেশ করিতে পারিত। সে মূঢ়, আদর্শের রঙীন বাষ্পে দুই চক্ষুকে আবিল করিয়া সুকুমার মনোবৃত্তির বিকৃত মূর্তিই প্রত্যক্ষ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ নিজে আদর্শনিষ্ঠ বলিয়া আদর্শবাদীর দুর্বলতার প্রতি তিনি অতিমাত্রায় প্রশ্রয়শীল ছিলেন। নতুবা সন্দীপ অপেক্ষা নিখিলেশই তাঁহার প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের লক্ষ্য হইতে পারিত। বিমলার সহিত তাহার প্রেমসাধনার নিষ্ঠা সম্বন্ধেই আমাদের সংশয় জাগে।

নিখিলের আত্মকথার আরম্ভই হইয়াছে তাহার মনোবিকার সম্বন্ধে অতিসচেতনতার উল্লেখে। তাহার মনে হয় সে যেন মরিয়া ভূত হইয়াছে ও তাহার সমস্ত অতীত জীবন যেন প্রেতস্মৃতির দুঃসহ ভারে অসাড়। তাহার জীবিত অংশ যেন তাহার মৃত অংশের দ্বারা অভিভূত। তাহার আত্ম-স্বভাবই যেন এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে সংশয়াচ্ছন্ন ও রুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। তত্ত্বের প্রলেপে হৃদয়ক্ষতকে চাপা দিতে সে এত বেশী অভ্যস্ত হইয়াছে, যে দুঃসহ আত্মনিরোধের যন্ত্রণার মধ্যেও সে মুক্তির দার্শনিক তাৎপর্য লইয়া খেলা করিয়াছে।

ইতিমধ্যে স্বদেশী-আন্দোলনসংক্রান্ত মতবিরোধ আরও উদ্দাম ও সংগ্রাম-মুখী হইয়া উঠিয়াছে। উত্তেজনার ধোঁয়া বিস্ফোরণের বহ্নিশিখায় জ্বলিয়া

উঠিবার উপক্রম করিয়াছে। ঘটনাও দ্রুত সাংঘাতিক পরিণামের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। নিখিলের কাছারিতে ডাকাতি হইয়া টাকা লুঠ হইয়াছে। হিন্দু-মুসলমানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিবার মত উভয় পক্ষেই হিংস্রতা শক্তিসঞ্চয় করিয়াছে। এই আসন্ন ঝটিকার আতঙ্কময় পরিবেশে নিখিলেশের দার্শনিক সমীক্ষাপ্রবণতা কিঞ্চিৎ অসহায়রূপে প্রতিভাত হইয়াছে। এই দার্শনিকতাবিরোধী মুহূর্তে নিখিলেশের ভাবুক সত্তা আত্মানুশীলনের এক আদর্শ উপলক্ষ্যের সন্ধান পাইয়াছে। এই নিস্তব্ধ রাত্রির গহন বক্ষ হইতে মানবাত্মার মর্ম-উৎসারিত এক বেদনার উৎস অসীমবিস্তীর্ণ নীরব আকাশের প্রতি বাক্যহীন আবেদন জানাইয়াছে। বিশ্বরহস্যের নিস্তরঙ্গ মহাসমুদ্রে এক ক্ষুদ্র অস্তিত্বের ধারা মিশিয়াছে। নিঃসঙ্গ, বঞ্চিত প্রাণের নির্ভর-আকৃতি সান্ত্বনা-পরিচর্যার মধ্যে প্রাণপণ প্রয়াসে আশ্রয় খুঁজিয়াছে। নিখিলের দার্শনিক সত্তা ও বিমলার প্রণয়িণী সত্তা উভয়েই প্রাণ বাঁচাইবার মত কিঞ্চিৎ রসদ সংগ্রহ করিয়াছে।

বিমলার আত্মকথায় অমূল্যর জন্য তাহার অস্বস্তি অহরহ তাহার শান্তিকে বিদ্ধ করিয়াছে। তাহার সমস্যাই সর্বাপেক্ষা জটিল ও দুঃসহ। সন্দীপ ও নিখিল উভয়েরই প্রকৃতি মোটামুটি একমুখী—একদিক হইতেই তাহাদের অন্তরে আঘাত আসে। বিমলার প্রকৃতি আরও বিচিত্রধর্মী, নানা পরস্পরবিরোধী ইচ্ছায় ও কর্তব্যে গ্রন্থিসঙ্কুল, নানা দিক হইতে আবেগ ও নীতিবোধের তাড়নায় ক্লিষ্ট ও জর্জরিত। তাহা ছাড়া সেই হইল এই সমুদ্রমন্থনের মন্থনরজ্জু ও উহা হইতে উত্থিত বিষামৃতের উপভোক্ত্রী। সুতরাং এই ঝটিকাবেগের মুখ্য অংশই তাহার উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে।

বিমলার এই অন্তর্দ্বন্দ্বের দুঃসহতম মুহূর্তে পরিবেশের সহিত সন্ধিস্থাপনের একান্ত প্রয়োজন ছিল। তাই সে হঠাৎ মেজোরানীকে প্রণাম করিয়া তাহার প্রসন্ন আশীর্বাদ যাচ্ঞা করিয়াছে। মেজোবউএর স্বাভাবিক ঔদার্য ছোট বৌএর আকস্মিক ভক্তিপ্রকাশের কারণ উপলব্ধি না করিয়াও উহার স্নেহ-উৎস উন্মুক্ত করিয়া দিল—ঈর্ষ্যাকালিমাকে নির্মল মমতাস্রোতে ধৌত করিয়া লইয়া গেল। মেজোরানীর উপর স্নেহের দাবী জানাইয়া কেহই তাহার দাক্ষিণ্যবঞ্চিত হয় নাই। দেওর ও ছোট জা উভয়েই এই মন্দাকিনীধারায় অভিস্নাত হইয়াছে। বিমলা তাহার প্রণামের উপলক্ষ্য-

রূপে তাহার এক কাল্পনিক, অথচ পরম ঈপ্সিত জন্মতিথির কথা উল্লেখ করিয়াছে।

বৈঠকখানায় আবার তাহাকে সন্দীপের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। সন্দীপের মুখে আর প্রতিভার যাদু নাই ও বিমলা তাহাকে সহজেই প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। কিন্তু অমূল্যর সঙ্গে প্রতিযোগিতার গূঢ় অভিমান তাহার কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া সমস্ত ঘরের আবহাওয়াকে বিষাইয়া দিয়াছে। শেষ পর্যন্ত সে অমূল্যর ট্রাঙ্ক হইতে বিমলার গহনার বাক্স অপহরণ করিয়া বিমলাকে প্রত্যর্পণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। বিমলা অহঙ্কারবশত গহনার উপর স্বত্ব ত্যাগ করিয়া সন্দীপের লোভের নিকট উহাকে উপঢৌকন দিয়াছে। সন্দীপ নিজের রাজস্বভাবের ন্যায্য রাজকররূপে যাহা পাইয়াছিল তাহা ব্যগ্রভাবে আবার ফিরাইয়া লইয়াছে। এই মুহূর্তে অমূল্যর রুক্ষ বেশে ও কড়া মেজাজে প্রবেশ। প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই সে সন্দীপের বিরুদ্ধে পরদ্রব্য-আত্মসাতের অভিযোগ আনিয়াছে। সন্দীপ আত্মসমর্থনে সম্পূর্ণ উপেক্ষা দেখাইয়া অমূল্যর হঠাৎ ভোল-বদলানোকে শাণিত ব্যঙ্গবাণে বিদ্ধ করিয়াছে। অমূল্য সন্দীপের শ্লেষের উত্তর দিবার চেষ্টা মাত্র না করিয়া সরাসরি বিমলাকে জানাইয়াছে যে তাহার দিদিকে দেওয়া উপহারের উপর আর কাহারও অধিকার সে কোনক্রমেই বরদাস্ত করিবে না। সন্দীপ যেন অমূল্যর উপর আড়ি করিয়াই গহনাদানের কৃতিত্ব যে তাহারই, এই দাবী উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছে ও অমূল্যর সঙ্গে তাহার সম্পর্কচ্ছেদের সংবাদ দিয়া বোঝাপড়ার পথ নিষ্কণ্টক করিয়া বিজয়ী বীরের ন্যায় বিদায় লইয়াছে। এই ইতর কলহের প্রতিক্রিয়া বিমলা ও অমূল্যর উপর যাহা হইয়াছে তাহা সন্দীপের নেতৃত্বগৌরবের পক্ষে মোটেই অনুকূল হয় নাই।

ইহার পরেই অমূল্য ডাকাতি-করিয়া-আনা ছয় হাজার টাকা অপহৃত গিনির পরিবর্তে বিমলাকে উপহার দিয়াছে। অমূল্যর এই দস্যুবৃত্তিতে বিমলার অনুশোচনা যেন উথলাইয়া পড়িয়াছে। এই প্রসঙ্গে অমূল্য সন্দীপের যে লোলুপতা কবিত্বময় ভাষায় নিজ স্বরূপকে একই সঙ্গে প্রকাশ ও গোপন করিয়াছিল তাহা বিবৃত করিয়াছে। নায়েবের কাছ হইতে সন্দীপের চিঠিগুলি আদায় করিয়া সে যে অর্থশোষণের বিপদ হইতে তাহাকে উদ্ধার করিয়াছে তাহা জানাইয়া সে গিনিগুলি ফেরত দিবার সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়াছে। উত্তরে সন্দীপ তাহাকে মোহাচ্ছন্নতার অভিযোগে অভিযুক্ত

করিয়া তীব্র শ্লেষের সহিত বলিয়াছে যে দেশমাতা পাতানো দিদির আঁচলে চাপা পড়িয়াছে। সন্দীপের তূণে যে অসংখ্য মোহাস্ত্র সঞ্চিত আছে, তাহার নিপুণ প্রয়োগে সরল বালকের চিত্ত অন্তরে সাময়িকভাবে আচ্ছন্ন হইয়াছে ও সে সারা রাত্রি পুকুরের চাতালে বসিয়া 'বন্দে মাতরং' মন্ত্র-জপে দেশভক্তির আদর্শকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবার সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছে। অনেক তর্ক-বিতর্কের পরও শেষ পর্যন্ত সন্দীপ গহনা ফেরত দেওয়ার বাহাদুরির মোহ ত্যাগ করিতে পারে নাই। অমূল্যকে ভুলাইয়া তাহার তোরঙ্গ হইতে গহনার বাক্স বাহির করিয়া বিমলার নিকট পৌঁছাইবার আত্মপ্রসাদ সে চুরি করিয়াছে। অমূল্যর মনে এই অন্যায়ের অনুতাপ কিছুতেই সান্ত্বনা মানিতেছে না। উদারতার প্রতিযোগিতায় এই ছেলেমানুষী দ্বন্দ্ব অমূল্যর ভাবপ্রবণ, সুকুমার চিত্তে হয়ত কতকটা শোভন ও মার্জনীয়। কিন্তু সন্দীপের ন্যায় স্থিরবুদ্ধি, ক্রূরকর্মা নেতার পক্ষে ইহা নিতান্তই হাস্যকর হইয়াছে। সন্দীপের মনের কোণে কোন্ গোপন মোহ উহাকে এই অসার ভাববিলাসে প্ররোচিত করিয়াছে তাহার উৎস কে নির্ণয় করিবে? তাহার বিদায়কালীন মহত্ত্ব-প্রকাশে হয়ত ইহার সঙ্গত ব্যাখ্যা মিলিতে পারে।

কিন্তু এই ভাবমুগ্ধতায় প্রশ্রয় দিবার পূর্বে বিমলাকে অমূল্যর উপর আর একটি দুরূহতর কর্তব্যের ভার চাপাইতে হইয়াছে। নূতন জীবন আরম্ভ করার পূর্বে পাপের শেষ কলঙ্কচিহ্নটি মুছিয়া ফেলিতে হইবে। বিমলাকে গহনা ফেরত দিবার ত্যাগযজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিতে গেলে সদ্য-অনুষ্ঠিত পরস্বাপ-হরণের অপরাধ-স্খালন আবশ্যিক অঙ্গ। তাই বিমলার হুকুম হইল ডাকাতির টাকা পূর্বমালিকের নিকট পৌঁছাইয়া দিতে। অমূল্য বিমলার পদধূলি গ্রহণ করিয়া ও ভাইফোঁটার নিমন্ত্রণগ্রহণের পূর্বপ্রস্তুতিরূপ এই বিপদসঙ্কুল প্রায়শ্চিত্ত বরণ করিয়াছে।

অমূল্যর বিদায়ের পরমুহূর্তে সন্দীপের অপ্রত্যাশিত পুনঃপ্রবেশ। পালা চুকাইয়া দিবার পূর্বে একটি শেষ দৃশ্য অনুষ্ঠানের প্রয়োজন ছিল। সেই অন্তিম ভূমিকা সম্পাদনের জন্যই সন্দীপ অন্তরে এক অনিবার্য তাগিদ অনুভব করিয়াছে। প্রথম দিকে কিন্তু ইতরতার কোন্দলই শুরু হইয়াছে। সন্দীপ বিমলাকে সম্মোহনমন্ত্রসিদ্ধার দীক্ষাত দিয়া তাহাকেও নিজ গৌরবের তুল্যাংশের অধিকার দিয়াছে। পরাভবের গ্লানি মুছিবার জন্যই সে এই শক্তি-আস্ফালনের অভিনয়ে রত হইয়াছে। বিমলা তাহার দুর্বলতার অভ্রান্ত

সন্ধান পাইয়া তাহাকে অমোঘ শ্লেষশরে জর্জরিত করিয়াছে। বিমলার তূণ হইতে এই প্রথম শ্লেষাস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইল। এতদিন শুধু বিদ্রোহ-প্রত্যাখ্যানে তাহার মোহভঙ্গ ও বিমুখতা প্রকাশ পাইয়াছে। এই সমস্ত মনোভঙ্গী শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দুর্বলের আত্মরক্ষা-প্রয়াস, হীনম্মন্যের সমকক্ষতা-অর্জনের সংশয়াকুল সাধনা। শ্লেষ কিন্তু উচ্চতর প্রতিষ্ঠাভূমি হইতে নিক্ষিপ্ত শর —এই অস্ত্রক্ষেপধারী যোদ্ধা নিজ সমযোগ্যতা ও হয়ত শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধেও দৃঢ় প্রত্যয়শীল। বিমলা এতক্ষণে সন্দীপের সমভূমিতে উত্তীর্ণ হইয়াছে— সন্দীপেরই মন্ত্রপূত অস্ত্রে তাহার মর্মভেদ করিয়াছে। সন্দীপের সম্বন্ধে তাহার শেষ সিদ্ধান্ত দ্ব্যর্থহীন অবজ্ঞার ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে। সে যে মেকী রাজা, তাহার মহত্ত্ব যে তাহার হীনতারই ছদ্মবেশ এই অভিমত তাহার অন্তিম প্রত্যয় ঘোষণা করিয়াছে।

কিন্তু ইহাই যে শেষ কথা নয় তাহা পরমুহূর্তেই নাটকীয় ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। নিখিলেশের সম্মুখেই ও দম্পতির যুগ্ম-উপস্থিতিতেই বিমলাকে এই মত প্রত্যাহার করিতে হইয়াছে। সন্দীপের সমস্ত পূর্ব হীনতাকে গৌরবময় করিয়া, তাহার সম্বন্ধে সমস্ত পূর্বধারণার বিপর্যয় ঘটাইয়া, তাহার সমস্ত মাটি-কাদা-পঙ্কস্তরকে অভাবিতভাবে রূপান্তরিত করিয়া তাহার মধ্যে নবপ্রত্যয়ের অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিয়াছে। সে তাহার মন্ত্র বদলাইয়াছে—'বন্দে মাতরং'-এর পরিবর্তে 'বন্দে প্রিয়াং, বন্দে মোহিনীং' এই নবমন্ত্রচৈতন্যে দীক্ষা ঘোষণা করিয়াছে। যে মাতৃপূজা এতদিন তাহার প্রিয়াসাধনার ছদ্ম আবরণ রচনা করিয়াছিল তাহা এই উচ্ছ্বসিত ভাবাবেগের প্রবলতায় মুহূর্ত মধ্যে সরিয়া গিয়া নিজস্ব প্রলয়দীপ্তিকে অবারিত করিয়া দিয়াছে। তাহার মনের সবটুকু শক্তি, ইচ্ছার সমস্ত একাগ্রতা, সাহসের সহস্র শিখা এই নূতন আধারে এক অদম্য সংবেগসৃষ্টিতে মিলিত হইয়াছে। নিখিলের আতিথেয়তার অপব্যবহার, তাহার পারিবারিক অন্তরঙ্গতার দুর্গে অনধিকার-প্রবেশ, বিমলার সান্নিধ্যের প্রতি সন্দীপের অতি-আকর্ষণ—যাহা এতদিন দেশসেবার অন্তরালে আত্মতৃপ্তির লুকোচুরি খেলায় লিপ্ত ছিল—তাহা সমস্ত আড়ালআবডাল ঘুচাইয়া ফেলিয়া এই আগ্নেয়ক্ষণে প্রকাশ্য স্বীকৃতিতে বজ্রধ্বনিত হইয়া উঠিল। তাহার বিধিদত্ত রাজ-অধিকারে হয়ত কিছুটা খুঁত আছে। কিন্তু সমস্ত বিকার ও অপচয়ের মধ্যে, হীনতর উপাদানের ভেজাল সত্ত্বেও তাহার অন্তরগঠনে রাজমহিমার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায়

না। মাস্টারমশায়ের যে বিস্মিত প্রশস্তিরচনা—সন্দীপ চাঁদ বটে, কিন্তু অমাবস্যার চাঁদ—তাহার সত্যতা সে আশ্চর্যভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছে। সে 'রক্তকরবী'-র জালবদ্ধ রাজা নয়, অচিন্ত্যকুমারের গল্পের 'তুবার রাজা'-র মর্মান্তিক পরিহাস নয়, রাজপ্রকৃতির মিশ্র ধাতুতে সে সত্যই গড়া। বিস্ময়-মুগ্ধতার রাজকর বিমুখ চিত্ত হইতেও আদায় করিয়া সন্দীপ উল্কার জ্বলন্ত রেখা আঁকিয়া উপন্যাস হইতে চিরনিষ্ক্রান্ত হইয়াছে। যাইবার সময় বিমলার হাত হইতে অকৃত্রিম ভক্তিঅর্ঘ্যরূপে নিবেদিত গহনার বাক্সটিও তাহার বিজয়রথে বহন করিয়া গিয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় যে, মুক্তি যে বন্ধন অপেক্ষা প্রবলতর, দূরে যাওয়া যে কাছে থাকার চেয়ে সমধিক আকর্ষণীয়, এই অধ্যাত্ম সত্যও সন্দীপের অতিবাস্তব মনে সঞ্চারিত হইয়াছে।

সন্দীপের বিদায়গ্রহণের পর বিমলাকে আবার নূতন করিয়া আত্মসমীক্ষায় ব্রতী হইতে হইয়াছে। সূক্ষ্ম বিচারে সে সন্দীপের ন্যায় সমস্ত মানুষের ভিতরে দ্বৈতসত্তার বিপরীতমুখী আকর্ষণের অস্তিত্ব আবিষ্কার করিয়াছে। যেমন মাতা সুধাভাণ্ড হস্তে সকল সন্তানকেই পরম শ্রেয়ের অমৃত পানে পুষ্ট করিয়া তাহাদের কল্যাণসাধনে নিরলস, তেমনি মোহময়ী ইন্দ্রপ্রেরিত অপ্সরাকুলও তাহাদের তপস্যার নিষ্ঠাপরীক্ষার্থ তপোভঙ্গের ষড়যন্ত্রে চিরব্যাপৃত। মানব প্রকৃতিতে এই উভয় উপাদানই নিত্য ও উহাদের বিরোধও চিরন্তন।

অগ্নিবলয় উত্তীর্ণ হইবার পর বিমলা আবার শতস্মৃতিজড়িত, অন্তর্দ্বন্দ্বে কণ্টকময় গার্হস্থ্য জীবনে ফিরিয়াছে। যে বিষ তাহার অন্তরে ও গৃহে ঢুকিয়াছে তাহার প্রতিষেধক রূপে সে স্নেহপরিচর্যায় আত্মশোধনে রত হইয়াছে। জন্মদিন উপলক্ষ্যে সে নবলব্ধ ভাইকে খাওয়াইবার জন্য পিঠা তৈয়ারি ও মেজোবৌর স্নেহ আকর্ষণ করিতেছে। বিমলা দোষ স্বীকার করার কথা চিন্তা করিয়াছে, কিন্তু মন স্থির করিতে পারে নাই। পুলিশের যাতায়াতে ও নানা উদ্ভট গুজবে ঘরের আবহাওয়া ভারী হইয়া উঠিতেছে। বিমলা সত্যপ্রকাশের আসন্ন সম্ভাবনায় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। তাহার জীবনে মর্যাদার কয়েক ঘণ্টা মাত্র মেয়াদ। প্রলয়ের বীজ দীর্ঘদিন মাটির নীচে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া অপরাধীর মনে নিরাপত্তার আশা জাগায়—কিন্তু উহার অঙ্কুর-উন্মেষ ও আকাশঢাকা বিস্তারের মধ্যে কাল-ব্যবধান খুব সামান্য। বিমলার নিয়তি হয়ত তাহাকে গ্রাস করিবার জন্য

মুখ ব্যাদান করিয়াছে। এই উৎকট উৎকণ্ঠার প্রহরে মেজোরানীর গ্রামোফোন সঙ্গীতে মনোরঞ্জনের খেয়াল দুঃসহ গুমটের মধ্যে লঘু পরিহাসের বায়ু প্রবেশ-পথ খুলিয়াছে।

রাত্রি গভীর হইলে বিমলার মনে নিঃসঙ্গতার বিভীষিকা সমস্ত আকাশকে ব্যাপ্ত করিয়া ও সমস্ত নক্ষত্রের মিটমিটে চাহনিকে তির্যক কটাক্ষকুটিল রূপে দেখাইয়া তাহার অন্তরে কল্পনার তাণ্ডব জুড়িয়া দিল। নিখিলের মত সেও একাকীত্বের মর্মবেদনা, পরিবেশচ্যুতির অস্বস্তি তীব্রভাবে অনুভব করিয়াছে। এই অসহনীয় উৎকণ্ঠা-নিবৃত্তি লাভ করিয়াছে ভগবানের নিকট আকুল আত্মনিবেদনে ও আত্মনিগ্রহসঙ্কল্পে। শেষ পর্যন্ত মনে হইল যে ভগবানের সাড়া মিলিয়াছে—ভগবানই যেন নিখিলের বেশে তাহার অনুতাপ-অশ্রুর অঞ্জলি গ্রহণ করিতে ও শ্রদ্ধা-হারানো মনে শান্তি প্রতিষ্টিত করিতে আবির্ভূত হইয়াছেন। নয়বৎসর পূর্বেকার নববধূজীবনে ফিরিয়া যাইবার জন্য তাহার কি মর্মান্তিক আকুতি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

নিখিল ও বিমলার শেষ দুইটি আত্মকথায় উপন্যাস-ঘটনার উপসংহার ঘোষিত হইয়াছে। নিখিলের সমস্ত স্বগতভাষণের মধ্যে দার্শনিকতার চির-আবর্তিত চিন্তাচক্র বারে বারে ফিরিয়া ফিরিয়া আসে—সুস্পষ্ট উত্তরণ ও অগ্রগতির বিশেষ কোন নিদর্শন চোখে পড়ে না। হয়ত আদর্শবাদীর আত্মসমীক্ষার ইহাই অনতিক্রম্য গতিপথ—একই সংশয় অন্তরে চিরন্তন জাল বোনে। তাহার মন চিরগোধূলি-অস্পষ্টতার কারাগারে বন্দী, দৃঢ় সিদ্ধান্তের মুক্তিবঞ্চিত। তাই এখনও তাহার মনে বাস্তব বিমলা ও আদর্শ প্রেয়সীর দ্বন্দ্ব কোন সমাধান খুঁজিয়া পায় নাই। এখনও বিমলাকে সে কতটা সত্যভাবে গ্রহণ করিয়াছে, কতটাই বা সে আদর্শ-মরীচিকাবিভ্রান্ত তাহা বোঝা যায় না। নিখিল এই কুহেলিকাজালে আচ্ছন্ন হইয়া শেষ পর্যন্ত পাঠকের নিকট প্রহেলিকাই রহিয়া গেল। তাহার আত্ম-বিশ্লেষণ ও মনোবেদনার যে সূক্ষ্ম ও পল্লবিত বিবরণ আমরা পাই তাহাতে প্রাণের ঝলক তাহার স্বরূপকে আলোকিত করে নাই। সে কথার অন্তরালে অর্ধনেপথ্যচারী হইয়াই রহিল।

যাহা হউক, তাহার জীবনে এই নব অধ্যায় উন্মোচনের প্রাক্‌কালে অন্তত: একটি সত্য মানবিক পরিচয় তাহার চেতনায় সংশয়মুক্ত নিশ্চয়ে উদ্ভাসিত হইয়াছে। মেজোরানীর মনোগহনে তাহার প্রতি কোন

রসবিহ্বল লালসা প্রচ্ছন্ন ছিল কি না তাহার শেষ মীমাংসা হয় নাই। মানুষের স্বভাবজটিলতায় ও প্রবৃত্তি-মিশ্রতায় হয়ত অনাবিল প্রীতির সঙ্গে নিষিদ্ধ প্রেরণার সহাবস্থান অসম্ভব নয়। সুস্থজীবনবঞ্চিতা তরুণী বিধবার চিত্তে যে অনিবার্য ক্ষোভ সঞ্চিত থাকে তাহার মূল মনের কোন্ স্তরে তাহা অঙ্ক কষিয়া নির্ণয় করা যায় না। আচরণের দ্বারা মানস অবস্থা যতটা অনুমিত হইতে পারে, সেই মানদণ্ডে বিচার করিলে বিমলার ঈর্ষ্যামিশ্র সন্দেহ সত্ত্বেও, মেজোরানীর নিখিলের প্রতি মনোভাব সম্পূর্ণ সহজপ্রীতিপ্রসূত ও অনিন্দনীয় এই ধারণাই জন্মে, অন্ততঃ ঔপন্যাসিকের সৃষ্টিপ্রেরণার কোন বক্র উদ্দেশ্যের ইঙ্গিত মেলে না। তিনি বিমলা-সন্দীপের বৈপ্লবিক মোহাকর্ষণের পাশে কোন গার্হস্থ্য অসংযমের পার্শ্বচিত্র আঁকিয়া উভয়েরই মর্যাদাহানি ঘটাইতে চাহেন নাই। মেজোরানী বিনোদিনী বা চারুলতার ক্ষীণতর সংস্করণ নয় ইহা জোর করিয়া বলা যায়। কোন মহৎ স্রষ্টা বারবার নিজেকে পুনরাবৃত্ত করেন না—তাঁহার আভিজাত্যবোধই তাঁহাকে এই শিল্পপ্রত্যবায় হইতে রক্ষা করে। মেজোরানীর কথাবার্তায় ও ভাবভঙ্গীতে খানিকটা রসলাস্যের আধিক্য ছিল ইহা মানিয়া লইলেও উহাতে তাহার প্রকাশরীতির বৈশিষ্ট্যই ফুটিয়াছে, তাহার কামনাসক্তি নয়।

বাল্য-কৈশোরের স্মৃতিসুরভিত রাজবাড়ী হইতে বিদায়ের মুহূর্তে নিখিলের প্রতি তাহার ভ্রাতৃবধূর অন্তরলালিত স্নেহরস প্রচুর ধারায় উৎসারিত হইয়াছে। তাঁহার সমস্ত ছোটখাট ঈর্ষ্যা-ক্ষোভ, সমস্ত তুচ্ছ বৈষয়িক দ্বন্দ্বদাবীর পিছনে যে স্নিগ্ধ প্রীতিরস তাহার কৈশোরবন্ধু দেবরের প্রতি ফল্গুধারার ন্যায় প্রতিরুদ্ধ ছিল তাহা এই বিদায়ক্ষণের অভিঘাতে সমস্ত বাধামুক্ত হইয়া নির্ঝরবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। দাম্পত্য সমস্যার সমাধানে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়া ব্যস্ত, স্বভাব-অন্ধ নিখিল জীবনের অন্তিম লগ্নে তুচ্ছতার আড়ালে উপেক্ষিত একটি মানবাত্মার সত্য পরিচয়ের পাথেয় সংগ্রহ করিয়া জীবনের নিকট নিজ ঋণ শোধ করিয়াছে।

নিখিল মেজোরানীর শত ধারায় উৎসারিত আন্তরিক স্নেহপরিচর্যায় অবগাহন করিয়া বাহিরে আসিয়া দারোগা ও চোর অমূল্যকে এক সঙ্গে পিষ্টকভোজনরত দেখিয়া আশ্চর্য হইয়াছে। জানা গেল যে নায়েবেরই সতর্ক কৌশলে দারোগা কাছারিতে আসিয়া অমূল্যর কাছ হইতে অপহৃত নোটগুলি উদ্ধার করিয়াছে। চোরকে ছাড়িয়া দিতে দারোগাকে রাজী করিতে

নিখিলের বিশেষ বেগ পাইতে হইল না। অমূল্যর মুখে ডাকাতির সত্য বিবরণটি জানা গেল ও নায়েবের অতিরঞ্জিত কাহিনীর মিথ্যা ধরা পড়িল। ইহার পর অমূল্য নিখিলের নিকট স্বীকার করিয়াছে যে বিমলার হুকুমেই সে নোট ফিরাইয়া দিতে গিয়াছে। তাহাকে বিপন্মুক্ত করিবার জন্যই যে এই ডাকাতি হইয়াছিল, ইহা বাক্যে অনুক্ত থাকিলেও বুদ্ধিতে অজ্ঞাত রহিল না। নিখিল মনে মনে বিমলার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়াই এই অধ্যায়ের উপর যবনিকা টানিল। নিখিলের আদর্শ ও ন্যায়নিষ্ঠা কোন তরুণ প্রাণে প্রেরণা জাগায় নাই—কাহারও মনে সে দীপ জ্বালিতে পারে নাই। পক্ষান্তরে বিমলা পলকমধ্যেই এক ধ্বংসপথের যাত্রীকে ফিরাইয়া আনিয়াছে। মেজোরানী ও বিমলার এই প্রাণপ্রাচুর্য কি তাহার রক্তহীন নীতিবাদী আদর্শের মূলকে কিছুটা শিথিল করিয়াছে?

নিখিলেশের অবাস্তব আদর্শবাদ বিমলার প্রবৃত্তিবশ্যতার লুকোচুরিতে প্রচণ্ডতম আঘাত পাইল। সে ইহাতে তাহার জীবনসাধনার চরম ব্যর্থতার সাক্ষ্যে মুহ্যমান হইয়া পড়িল। তাহার মনে মনে একটা অহঙ্কার ছিল কল্যাণ-অভিপ্রায়ের সঙ্গে যদি প্রেমের সংযোগ ঘটে তবে উহাদের সহ-যোগিতায় শুধু প্রেয়সীকে নয়, সমস্ত জীবনপরিবেশকেই আদর্শের ছাঁচে গড়িয়া তোলা নিশ্চয়ই সম্ভব। বিমলাকে লইয়া সে এতদিন সমস্ত শুভ-চেতনাপ্রয়োগে এই পরীক্ষাই চালাইয়াছে। দীর্ঘযুগব্যাপী তপস্যা যে এক সার্বিক নিষ্ফলতায় লুটাইয়া পড়িতে পারে ইহা তাহার নিকট অভাবনীয় ছিল। আজ সে তাহার প্রকৃতি ও প্রণালীর অপূর্ণতা ও প্রমাদসঙ্কুলতার অখণ্ডনীয় পরিচয়ে চমকিয়া উঠিয়াছে। প্রথম যে উদ্বৃত্ত প্রাণৈশ্বর্য নিজ আত্মার দাবী মিটাইয়া সমগ্র পরিবেশের ঊর্ধ্বাভিযানের প্রেরণা যোগাইতে পারে, তাহার আদর্শশীর্ণ অন্তরে সে শক্তিসঞ্চয় ছিল না। দ্বিতীয়তঃ তাহার আদর্শনিষ্ঠার মধ্যে একটা অত্যাচারের অলক্ষ্য বাধা ছিল। সে সহজ স্পর্শে ফুল ফুটাইতে পারে নাই; ফুলের পরিবর্তে কৃচ্ছ্রসাধনের কামারশালায় লৌহ-বর্ম উৎপাদন করিয়া তাহাকেই পুষ্পাভরণ বলিয়া সে ভ্রম করিয়াছে। এক যুগ ভুলপথে চলিয়া তাহার যৌবনের সমস্ত একাগ্রতা অপচয় করিবার পর আজ সে আবিষ্কার করিয়াছে যে সে বিমলাকে তাহার স্বভাবের বিপরীত দিকে বাঁকাইতে প্রয়াস পাইয়াছে। তাই বিমলা তাহার আদর্শসঙ্গিনী হওয়া দূরে থাকুক তাহার নিকট নিজের মনের কপাট খুলিতেও অক্ষম হইয়াছে।

মোহভঙ্গের এই বিষাদ ও বিষণ্ণ মুহূর্ত্তে সে বিমলার আত্মস্বভাব-অনুবর্ত্তনের অধিকার স্বীকার করিয়াছে ও ভবিষ্যৎ জীবনে বিমলার স্বাধীন বিকাশকে সর্বপ্রকার বাধামুক্ত করিবে এই সঙ্কল্পে স্থির হইয়াছে। এই নূতন জীবন-নীতি কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার আর সে অবসর পাইবে কি না সে বিষয়ে লেখক নিয়তির ন্যায় নিষ্ঠুর নীরবতা অবলম্বন করিয়াছেন। শেষবারের মত বিমলার সমস্ত সঙ্কোচ অতিক্রম করিয়া তাহাকে আহ্বান জানাইবার সুযোগ আসিয়াছে। নিখিলের আদর অপরাধিনীর অনুতাপের অশ্রুবন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে ও ক্ষমার স্নিগ্ধতা পূজা-ভক্তির অনিবার্য উচ্ছ্বাসে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে। এ পূজা যে তাহার বেনামিতে দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গিত নিখিলের আদর্শবাদ এই প্রত্যয়ে আত্মনিবেদনের মানবিকতাটি আচ্ছন্ন করিয়াছে—প্রিয়ের অর্ঘ্য দেবতা গ্রহণ করিয়াছেন। জানি না এই অশ্রু-জলের ফোয়ারায় নিখিলের আদর্শের পরাগে আবিল দৃষ্টি উহার স্বচ্ছতা ফিরিয়া পাইয়াছে কি না। আদর্শ-মরীচিকায় আচ্ছন্নদৃষ্টি ব্যক্তি সব শীতল পানীয়েই অমৃতের অপার্থিব স্বাদ অনুভব করে ও এই কৃত্রিম ভাবের আরোপে উহার সহজ তৃপ্তি হইতে বঞ্চিত থাকে। বিমলার অন্তর-উজাড়-করা আবেগ-উৎসার শুধু কি আদর্শের ঘটই পূর্ণ করিল, না সংসারের মৃৎ-কলসীতে কিছুটা সঞ্চিত হইল ইহাই পাঠকের সংশয়িত জিজ্ঞাসা।

বিমলার অন্তিম স্বগতভাষণে তাহারও এক নূতন সংকল্প বাজিয়া উঠিয়াছে। সেও ভালবাসার নদীকে পূজার সমুদ্রে বিলীন করিয়া দিবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছে। এতক্ষণে মন স্থির করিয়া সে যাত্রার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইবার অবসর পাইয়াছে। নিখিলও তাহার জিনিসপত্র গোছানোর কাজে যোগ দিয়া আদর্শবাদের উচ্চ শিখর হইতে সাংসারিক কর্ত্তব্যের সমভূমিতে নামিয়া আসিয়াছে। এই গার্হস্থ্য অন্তরঙ্গতার মাঝখানে অতীত দুঃস্বপ্নস্মৃতির মূর্তিমান বার্তাবহ রূপে সন্দীপ পুনঃপ্রবেশ করিয়াছে। তাহারও কিছু ভুলিবার, কিছু নূতন শিখিবার আছে। সেও বিবেকের সহিত অহোরাত্রি সংগ্রাম করিয়া জীবনের নীতিবোধের দিকটার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হইয়াছে। মানুষের স্বৈরাচার ইচ্ছাশক্তি যে একমাত্র জীবনসত্য নয়, তাহাকে যে সর্বদাই 'কিন্তু'-র বাধা অতিক্রম করিতে হয়, মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার ফলে এই প্রত্যয় তাহার জন্মিয়াছে। এই 'কিন্তু'র প্রবক্তারূপে, উপকরণের দিক দিয়া ভাঙিয়া পড়া, কিন্তু মনের গভীরে নূতন-জোড়মিলান

সংসারে তাহার আবির্ভাব ঘটিয়াছে। প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে স্বভাবদস্যুও লুটের মাল ফিরাইয়া দিবার অনিবার্য প্রয়োজন অনুভব করিয়াছে। বিমলার হুকুমে অমূল্যর ডাকাতির টাকা প্রত্যর্পণের মত কোন অদৃশ্য অন্তর্যামীর নীরব অনুশাসনে সন্দীপও ঠিক একই কাজে ব্রতী হইয়াছে। অবশ্য ইহা তাহার সার্বভৌম নীতি-পরিবর্তন নয়, মক্ষীরানীর বিশেষ অধিকারের স্বীকৃতি মাত্র। সন্দীপ এখনও নীতিরাজ্যের স্থায়ী অধিবাসী হয় নাই, তাহার বিবেক-তাড়িত চিত্তে বিশেষ উপলক্ষ্যে নৈতিকতার এক নূতন প্রবালদ্বীপ সমুদ্রের উত্তাল গর্ভ হইতে ঈষৎ মাথা তুলিয়াছে। আশা করা যায় যে, এই দ্বৈপায়ন নিঃসঙ্গতা হইতে নিগূঢ় নিয়মবদ্ধ নীতিমহাদেশে তাহার অভ্যস্ত উত্তরণ ঘটিবে —সে আত্মকেন্দ্রিকতা হইতে বিশ্বকেন্দ্রিকতায়, অরাজকতার একাকীত্ব হইতে বিশ্বমানবের কর্তব্য-অধিকারে-গাঁথা মিলনমেলায় স্থান পাইবে। তাহার লালসার ধন গিনিগুলি ও তাহার দানলব্ধ অলঙ্কারগুলি সবই সে এই চিত্তজয়-যজ্ঞের আহুতিরূপে ফিরাইয়া দিয়া গেল। নির্লোভ ও নির্মোহ সন্দীপ আবার নবজন্ম পরিগ্রহ করিল।

ঠিক এই মুহূর্তে যখন একটি বিপথগামী প্রাণ চিরন্তন শীলে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল, তখন আদর্শবাদী মাস্টারমশায় তাঁহার আদর্শবাদী ভক্তশিষ্যের আদর্শ-অভিযানের পথেই প্রাণদণ্ডাজ্ঞা বহন করিয়া আনিলেন। তাঁহার একরোখা নির্দেশ অবাস্তব আদর্শের দূতরূপে দ্বিতীয় একটি বাস্তববোধহীন আত্মাকে বহ্নিবিবিক্ষু পতঙ্গের মত অনিবার্যবেগে আকর্ষণ করিল। সাধু সংকল্পের পিছনে যে বাস্তববোধের সমর্থন প্রয়োজন, উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে যে সামঞ্জস্য কার্যসিদ্ধির জন্য অপরিহার্য, এই নির্মম প্রাকৃতিক বিধানের দিকে না মাস্টার না ছাত্র কেহই মনোযোগ দিল না। নিখিল ঘোড়া ছুটাইয়া এই মৃত্যুর আমন্ত্রণে চলিয়া গেল। এই মহৎ হঠকারিতার পিছনে পরিবারসুদ্ধ সকলের অসহায় আর্তির দুঃসহ প্রতীক্ষা স্তব্ধ হইয়া রহিল।

মেজোরানী ও বিমলা নিজ নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী এই সর্বনাশের মুহূর্তে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ায় সাড়া দিয়াছে। মেজোরানী পর্দার বিধিনিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া দেওয়ানের সামনে বাহির হইয়াছে ও নিজের মৃত্যুসংবাদ রটাইয়া ও বিমলাকে গালি পাড়িয়া নিজ স্নেহব্যাকুল উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছে। বিমলা নীরব আত্মদহনের তুষানলে দগ্ধ হইয়াছে। তাহার দুঃসহ প্রতীক্ষার প্রতি দণ্ড-পল আতঙ্ককল্পনায় বিভীষিকাময় হইয়া উঠিয়াছে।

তাহার ক্ষেত্রে অন্তঃরুদ্ধ দারুণ অস্বস্তি মুক্তির কোন পথ খুঁজিয়া পায় নাই। সন্ধ্যা হইতে রাত্রি দশটা পর্যন্ত প্রতিটি ঘণ্টা যেন এক অনির্দিষ্ট বিপদের সঙ্কেতে কণ্টকিত হইয়াছে—তাহার কালসীমা ব্যপ্তির নিবিড়তায় ও অস্বস্তির দ্রুত স্পন্দনে অনুভূতির এক নূতন তুলাদণ্ডে ওজন হইয়া গণনাতীত যুগযুগান্তরে প্রসারিত হইয়াছে। কালে যাহা কয়েক দণ্ডের ব্যাপার মনোবেদনায় তাহা অনন্তের দিগ্‌বলয় স্পর্শ করিয়াছে। সূর্যাস্ত যেন নানাবর্ণরঞ্জিত দিগন্তব্যাপী পাখা মেলিয়া অসীমাভিসারী পাখীর মত অজ্ঞাতের অভিমুখে উধাও হইয়াছে। দূরাগত অস্পষ্ট কলরব যেন অগ্নিশিখার মত রহিয়া রহিয়া রাত্রির নিঃশব্দতার উপরে রক্তনিশানা উড়াইয়াছে। পরিচিত পরিবেশ একটা আসন্ন সর্বনাশের প্রতীক্ষায় উৎকর্ণ হইয়া রহিল। রাত্রির শব্দ নানা ছদ্মবেশে ইন্দ্রিয়কে বিভ্রান্ত করিতে লাগিল ও অন্ধকারের ফাঁকে ফাঁকে আলোর সারি আলেয়ার মত মুহুর্মুহু জ্বলা-নেবার লুকোচুরিতে সমস্ত আবহাওয়াকে রহস্যময় করিয়া তুলিল। অবশেষে রাত্রি দশটার ঘণ্টা বাজার পর এই প্রেতমায়া বাস্তব ঘটনার আকারে প্রত্যক্ষগোচর হইল ও বহু লোকের পদধ্বনি দেউড়িতে প্রবেশ করিয়া পূর্ণচ্ছেদ টানিল। দেওয়ানজির উদ্বিগ্ন প্রশ্নের উত্তরে নিয়তির গর্ভস্থ বীজ মর্মান্তিক সত্যরূপে ধ্বনিদেহ পরিগ্রহ করিল, ও তিন ঘণ্টার দুর্যোগকণ্টকিত আকাশ বিদীর্ণ করিয়া বজ্রকণ্ঠে ট্রাজেডির চূড়ান্ত রায় ঘোষিত হইল। জানা গেল যে নিখিলেশ সাংঘাতিক আঘাত পাইয়া সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দোদুল্যমান আছে, আর তরুণ বালক অমূল্য আত্মিক মৃত্যু হইতে উদ্ধার পাইয়া দৈহিক মৃত্যুতে ঋণশোধ করিয়াছে। ভাইফোঁটার প্রসাদ তাহার আত্মাকে বাঁচাইয়াছে, কিন্তু তাহার পরমায়ু রক্ষা করিতে পারে নাই। এই অনিশ্চয়ের মধ্যেই উপন্যাসের অবসান হইয়াছে।

অনুমান করা যায় যে ঔপন্যাসিক নিখিলের জন্য চরম দণ্ড বিধান করেন নাই, নতুবা অমূল্যর সঙ্গে তাহার ভাগ্যের অভিন্নতাই ঘোষিত হইত। হয়ত লেখক নিখিলের আদর্শনিষ্ঠাকে নূতন জগতে কাজ করিবার আর একটি সুযোগ দিয়াছেন, নূতন পরিবেশের কষ্টিপাথরে তাহার নবার্জিত জীবনদর্শনের মূল্য যাচাই করিয়াছেন। বিমলার আত্মভাষণেও এই অন্তিম সঙ্কটের সমাধানসূত্রের সন্ধান মিলে না। তাহার অনুতাপের প্রগাঢ়তা সবই পূর্ব জীবন-সম্পর্কিত; এই চরমতম পরীক্ষার কোন প্রতিক্রিয়া তাহার অন্তরবাণীতে প্রতিফলিত হয়

বাধ্য হইয়াছে। বেগবান তরঙ্গের পূর্ণ অভিঘাত হইতে তাহারা রক্ষা পাইয়াছে সত্য, কিন্তু ফাটলের মধ্য দিয়া যে উদ্বৃত্ত উচ্ছ্বাস তাহাদিগকে ভোগ করিতে হইয়াছে তাহার ধাক্কাই তাহারা সামলাইতে পারে নাই। নিখিল ও সন্দীপ উভয়েরই জীবনবোধে একটা আমূল বিপর্যয় ঘটিয়াছে, যদিও বিপর্যয়ের পরিমাণে কিছুটা তারতম্য আছে। নিখিলের ক্ষেত্রে তাহার মূল আদর্শনীতি অক্ষুন্ন আছে, উহার প্রয়োগবিধি সম্বন্ধে উহার পূর্ব ধারণা উলটাইয়া গিয়াছে। আদর্শনিষ্ঠা তাহার দিগ্‌বিজয়ের নিশানা না হইয়া, তাহার অশ্বমেধের ঘোড়া না হইয়া, পরের উপর আরোপিত না হইয়া, নিজ চিত্তবিশুদ্ধিসম্পাদনে ও কর্তব্যনিরূপণে সীমাবদ্ধ থাকিবে। এ যেন পারিবারিক অন্তরঙ্গতার মণ্ডলীতে সহাবস্থানসহিষ্ণুতার বাস্তব প্রয়োগ। সন্দীপের ক্ষেত্রে শুধু নীতির প্রয়োগ নয়, মূল জীবননীতিরই বৈপরীত্য ঘটিয়াছে। সে এক নূতন অন্তর্যামী শক্তির নিকট, উহার স্বরূপ-উপলব্ধি না করিয়াই, আত্মসমর্পণ করিয়াছে। যে প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি, যে অসঙ্কুচিত অহংবোধ তাহার একক জীবননিয়ামক ছিল তাহার নিশ্ছিদ্র অধিকারের মধ্যে এক সূক্ষ্ম দ্বৈতভাবের নিষেধ আবির্ভূত হইয়াছে। তাহার অভিধানে যে 'কিন্তু'র কোন স্থান ছিল না তাহাই হঠাৎ অঙ্কুরিত হইয়া তাহার ব্যক্তিত্বকে দ্বিধাবিভক্ত করিয়াছে। সন্দীপ নিখিলের মত স্বভাব-দার্শনিক নয়। তাহার দর্শন সম্পূর্ণভাবে আত্মকেন্দ্রিক, নিজ সীমাহীন ভোগ-লালসার সচেতনভাবে সার্বভৌম তত্ত্বে উন্নয়ন। নিখিলের যে আদর্শবাদ ব্যক্তিস্বভাবের অতীত একটি জীবনসত্য, সন্দীপের নিকট তাহাই উদ্দাম প্রবৃত্তির দর্শনায়ন, তাহার মনোগত অভিপ্রায়ের সংসার-নীতির সমর্থনে সার্বভৌমতায় উদ্বর্তন। নৈরাজ্যের কোন শাশ্বত নীতি থাকিতে পারে না; উহা ব্যক্তিবিশেষের স্বভাব-উচ্ছৃঙ্খলতার তত্ত্ব-রূপায়ণ। অন্তঃসঙ্কটের চরম ক্ষণে প্রবৃত্তিকে দার্শনিকতার সম্ভ্রান্ত বেশে সজ্জিত করিতে না পারিলে নিজের মনই যথেষ্ট জোর পায় না, অপরকেও ভোলান যায় না। ইহার ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত নাজীবাদের গোষ্ঠীশ্রেষ্ঠতার ঘোষণা ও ইহারই আড়ালে পররাজ্যগ্রাসের পাশবিকতার আচ্ছাদন। সম্প্রতি ঘটমান ইতিহাসে সোভিয়েট রাশিয়ার সাম্যবাদ-নীতির এই জাতীয় বিকৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

নিখিল ও সন্দীপের মধ্যে শুধু আদর্শগত নয়, আচরণগত পার্থক্যও

দেখান যাইতে পারে। নিখিলের মনে দার্শনিক সংস্কার এত প্রবল, যে তাহার পূর্ব প্রত্যয়ের ধ্বংসের উপর আর একটি নূতন জীবনদর্শন গড়িয়া তুলিতে না পারিলে সে স্বস্তি পায় না। বিমলার সঙ্গে তাহার সম্পর্ক যেমনি ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, অমনই সে তাহার দাম্পত্য আচরণকে এক অখণ্ড দার্শনিক সামঞ্জস্যের অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহিয়াছে। তাহার আদর্শ অপরিবর্তিতই রহিল, তাহার নীতিবন্ধন একটুও শিথিল হইল না, কেবল তাহার আদর্শপ্রয়োগের অত্যুৎসাহ ব্যক্তিস্বভাবের মর্যাদা'স্বীকৃতির দ্বারা প্রশমিত হইল। তাহার স্বরাষ্ট্রনীতি অক্ষুণ্ণ থাকিল, পররাষ্ট্রনীতির ন্যূনতম পরিবর্তন সাধিত হইল।

সন্দীপের ক্ষেত্রে এই দার্শনিক সমীকরণের কোনও প্রয়োজনই অনুভূত হয় নাই। সে বরাবরই প্রবৃত্তিচালিত। সে 'কিন্তু'-কে আমল দিয়াছে কোন তত্ত্বসমীক্ষার ফলে নয়, ক্ষণিক আবেগের অদম্য উচ্ছ্বাসে। বিমলার সম্পর্কে তাহার যে মোহ ঘনীভূত হইয়াছিল তাহা তাহার প্রকৃতিগত সম্ভোগলোলুপতাকে হটাইয়া তাহার নিকট মুখ্যরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। সমগ্র জীবননীতির সহিত এই ব্যতিক্রমকে মিলাইয়া লইবার কোন প্রেরণাই তাহার অন্তরে উন্মেষিত হয় নাই। তাহার নীতিহীনতা অস্থি-মজ্জাগত, অত্যাজ্য সংস্কাররূপে তাহার চিরকালের আশ্রয়। কোন এক দুরন্ত আবেগক্ষণে উহা আত্মবিস্মৃত হইতে পারে, কিন্তু সিংহাসনের অধিকার ত্যাগ করিবার কোন প্রতিশ্রুতি দেয় না। উহা মুহূর্তের বিভ্রম, চিরকালীন বর্জন নয়। এই সদ্যোউন্মেষিত 'কিন্তু' হয়ত বিমলার স্মৃতি-সুরভিত আবেশ-অনুভূতির মধ্যে উহার শিথিল শিকড়জালকে সীমাবদ্ধ রাখিবে, জীবনের গভীর স্তরে উহা সঞ্চারিত করিবার কোন চেষ্টাই করিবে না। তাহার মনের শক্ত মাটিতে একহাতপরিমিত কোমল স্থান রসার্দ্র থাকিবে, সমগ্র মৃত্তিকা-সংস্থার রূপান্তর ঘটিবে না। ঝড়ের খেয়াল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষকে ভূমিসাৎ করিয়া একটি ক্ষুদ্র পুষ্পলতার পেলব দেহে মৃদু বীজনের চামর দোলায়। সন্দীপের খেয়ালের ঝড় এই জাতীয় কি না তাহা কে নিশ্চিতভাবে নির্ধারণ করিবে?

বিমলাই উপন্যাসের একমাত্র চরিত্র, যে কোন পূর্বগঠিত মানসিকতা লইয়া এই আসন্ন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় নাই। তাহার ক্ষেত্রে বহির্ঘটনার যে নিদারুণ অভিভব ঘটিয়াছে তাহা হইতে রক্ষার জন্য তাহার কোন

পূর্বনির্ধারিত ব্যবস্থা ছিল না। সমুদ্রমন্থনের সমস্ত দুর্বিষহ আলোড়ন তাহার উপর দিয়া অবাধে বহিয়া গিয়াছে। সন্দীপ নিজেই এই ঝড়ের কেতনবাহী—তাহারই অন্তরের প্রচণ্ড শক্তিকেন্দ্র হইতে বিপ্লবঝটিকার উদ্ভব ও উহার প্রমত্ত ছন্দের উৎসার। সুতরাং যে এই আলোড়নের উৎস ও নিয়ন্তা, উহার আবহতত্ত্বের সহিত তাহার নিশ্চয়ই পূর্বপরিচয় ছিল। অবশ্য তাহারও হিসাবে কিছু ভুল ছিল—সে ঝড় তুলিতে পারে, কিন্তু উহা থামাইতে জানে না। সে নিজেও যে ঝটিকাবেগে উন্মূলিত হইতে পারে এতটা আত্মজ্ঞান তাহার ছিল না। সুতরাং মোটামুট সমুদ্রসারসের সঙ্গে বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের যেটুকু প্রকৃতি-ও-পরিবেশগত সামঞ্জস্য সেটুকু তাহার আত্মজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তথাপি শেষ পর্যন্ত সে অপ্রত্যাশিতভাবে ঝড়ের বলি হইয়াছে। নিখিলেশের দার্শনিক নিরাসক্তি ও আদর্শনিষ্ঠায় অতিপ্রত্যয় তাহার মনে যে শক্তিমত্তার কল্পনা জাগাইয়াছিল তাহা পরীক্ষায় ভ্রান্ত প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। সে মুখ্যতঃ স্মৃতিবিলাসী প্রেমিক, সুখে-দুঃখে উদাসীন দার্শনিক বা সত্য-উপাসক আদর্শবাদী নয়। আদর্শের বড়াই করিয়া সে বিমলাকে যে পরীক্ষায় আহ্বান করিয়াছিল, তাহার মধ্যে যে কি বিপুল আত্মবঞ্চনা প্রচ্ছন্ন ছিল তাহা ঔপন্যাসিক ঘটনার অগ্রগতির সহিত মর্মান্তিকভাবে প্রকট হইয়াছে। পরীক্ষার চাকা ঘোরার প্রতি পাকে পাকে তাহার বেদনার নাড়ী দুশ্ছেদ্য হইতে দুশ্ছেদ্যতর গ্রন্থিতে জড়াইয়া পড়িয়াছে। বহির্জগতের চক্রাবর্তন তাহার অন্তরের কোমলতম অনুভূতিজালের মধ্যে দুঃসহতর যন্ত্রণার রক্তরেখা আঁকিয়া গিয়াছে। শক্তিমান্ পুরুষেরাও যে নিজ প্রকৃতি সম্বন্ধে কি শোচনীয়রূপে অন্ধ, নিজেদের সৃষ্ট সমস্যাও তাদের সমাধানশক্তির অক্ষমতাকে কি নিদারুণ পরিহাস জানায়, তাহা, সন্দীপ ও নিখিল উভয়ের আচরণে ও অন্তঃসমীক্ষায় সুপরিস্ফুট।

ইহাদের সহিত তুলনায় বিমলা কত তুচ্ছ ও সাধারণ! তাহার অরক্ষিত অঙ্গেই সংগ্রামের সমস্ত অস্ত্রাঘাতচিহ্ন রক্তঅক্ষরে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সেও নিজের মন হয়ত ষোল আনা বুঝিত না। তাহার গার্হস্থ্য ও দাম্পত্য জীবনের সীমিত অভিজ্ঞতা তাহাকে নদীর গভীরতলবাহী চোরা ঘূর্ণীস্রোতের কুটিল মরণফাঁদের পরিচয় দেয় নাই। কাজেই সে যে স্নান করিতে গিয়া অতল আবর্তে তলাইয়া যাইবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি আছে? মধুসূদনের 'রসাল ও স্বর্ণলতিকা' কবিতার ভাবসত্য তাহার ক্ষেত্রে সুপ্রযুক্ত হইয়াছে।

যেখানে যুগ্ম মহীরুহ—নিখিল ও সন্দীপ—প্রলয়-প্রভঞ্জনকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে স্পর্ধিত আহ্বান জানাইয়া ধরাশায়ী, যেখানে যমলার্জুন ছেলেমানুষী উদূখলের মৃদুস্পর্শে উন্মূলিত, সেখানে স্বর্ণলতিকা বিমলা ঝড়ের নিকট নত হইয়াই তাহার চরম প্রকোপ হইতে বাঁচিয়াছে। অন্তঃপুরিকার স্বভাবনির্মলতা ক্ষণেকের আবিলতা শোধন করিয়া কলুষমুক্ত হইয়াছে ও দেহমনের আদিম শুচিতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই পূর্বজীবনে ফিরিয়া গিয়াছে। যাহারা আদর্শনিষ্ঠার বা আদর্শহীনতার উৎকট আতিশয্যে স্বভাবধর্মবিচ্যুত হইয়াছে তাহাদের আঘাত প্রায়ই মারাত্মক হইয়া উঠে। এই জাতীয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে আদর্শের উন্মূলনের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের মূলও উপড়াইয়া যায় ও এই বিধ্বস্ত ভূমিতে নূতন জীবনের বীজ বোনা যায় না। ইহাদের মন ছাঁচে ঢালা বলিয়া ছাঁচ ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে মনও উহার স্থিতিস্থাপকতা ও উর্বরাশক্তি হারায়। ব্যর্থ আদর্শবাদীর জীবন বন্ধ্যাত্বের চির-অভিশাপগ্রস্ত। সন্দীপ ও নিখিল তাহাদের অন্তঃপ্রকৃতির ভূমিকম্প-বিপর্যয়ের পর কোন্ ভিত্তিতে পুনর্গঠন করিল, সূক্ষ্মসুরে বাঁধা জীবনযন্ত্রের সঙ্গীত কাটিয়া গেলে কোন্ নূতন সুর-সঙ্গতির আশ্রয়ে আত্মস্থ হইল তাহা অনিশ্চিত অনুমানের পর্যায়েই রহিল। কেননা উহাদের আত্মা ও প্রতিবেশ উভয়ই কেন্দ্রভ্রষ্ট হইয়াছে। বিমলার ক্ষেত্রে উহার একটি কোমলতম, অন্তরঙ্গতম ভাবতন্ত্রী বিকল হইলেও সমগ্র জীবন-পরিবেশ ও মানস-সংস্কার ভারসাম্য অব্যাহতই আছে। তাহার দাম্পত্য অনুরাগ ক্ষণবিধ্বস্ত হইলেও উহার পরিবারচেতনা ও স্নেহ, মমতা, সম্ভ্রমবোধ প্রভৃতি বৃত্তিসমূহের মধ্যে কোন বিকার দেখা দেয় নাই। পারিবারিক সংযমবোধ, গার্হস্থ্য কর্তব্যনিষ্ঠা ও অমূল্যর প্রতি সোদরস্নেহ উহার নারীপ্রকৃতির সুস্থতারই পরিচয়বাহী। ইহাদের অনুকূল সহযোগিতায় যে তাহার প্রমাদগ্রস্ত প্রেমানুভূতি আবার স্বাভাবিক হইবে, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ থাকে না। এই বিশল্যকরণীর প্রয়োগে যে তাহার বিষ-বিকারমূর্ছিত স্বামিপ্রেম সংজ্ঞা লাভ করিয়া সুস্থ হইয়া উঠিবে তাহা স্বতঃসিদ্ধ সত্যের ন্যায় আমাদের নিকট প্রতীয়মান হয়। নিখিল তাহার নিকট কোন একক, স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা ছিল না। বরং সে গৃহপরিবেশের বিবিধ প্রয়োজন ও স্নেহস্মৃতির জালে বিধৃত, নানা স্নিগ্ধরশ্মির মিলনগঠিত এক ভাববিগ্রহরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল। আদর্শ পতিকল্পনার প্রতীকরূপে সমস্ত ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রাণরসে পুষ্ট হইয়া, ভাবমূর্তির সাঙ্কেতিক মহিমার এই বিগ্রহ নিখিলেশের

ব্যক্তিজীবনের ঊর্ধ্বে বিরাজ করিত। বিমলার ভক্তি ও অনুতাপের অকৃত্রিমতা যে তাহার সাময়িক বিভ্রান্তির নিরসন করিয়া তাহার হৃদয়ে নিখিলেশের ধ্যানমূর্তিকে চির ভাস্বর রাখিবে তাহা বিশ্বাস করিতে আমাদের বিশেষ বেগ পাইতে হয় না।)

(এখন বিমলার পূর্ব-ইতিহাসের আলোচনা করিয়া যে প্রকৃতির মূলধন লইয়া সে এই অগ্নিপরীক্ষায় অবতীর্ণ হইয়াছিল তাহা নিরূপণ করা প্রয়োজন। বিমলার আত্মপরিচয়ের সূচনাপর্ব তাহার অনুতাপবহ্নিতে উত্তপ্ত ও আবেগ-নিঃশ্বাসে ভারাক্রান্ত। তথাপি এই মোহভঙ্গের প্রবল উচ্ছ্বাস হইতে মোটামুটি তথ্যনির্ণয় সম্ভব। সে রাজবাড়ীতে প্রবেশের সৌভাগ্য অর্জন করে তাহার রূপগৌরব বা গুণগরিমায় নয়, তাহার সুলক্ষণা হইবার সুপারিশে। অর্থাৎ গ্রহনক্ষত্রের অনুকূলতাই তাহার সৌভাগ্য-সিংহাসনে আরোহণের পথ প্রস্তুত করিয়াছিল। বধূরূপে রাজপরিবারে প্রবেশের সময় সে যে যৌতুক আনিয়াছিল তাহা তাহার মাতার পাতিব্রত্য-আদর্শের আশীর্বাদটুকু। তাহার প্রথম কৈশোরের বধূজীবনে এই আশীর্বাদের সম্বলের কতটুকু সার্থক প্রয়োগ হইয়াছিল, তাহা আমাদের অজ্ঞাত। বর্ষার দিনে দুঃখীর পুরান ছাতার ন্যায় পাতিব্রত্যধর্ম হইতে স্খলিত হইবার পর যে দুর্যোগ তাহার মস্তকে নামিয়া আসিয়াছে, অন্তরের যে গ্লানি তাহাকে অহরহ বিদ্ধ করিয়াছে তাহার প্রেরণাতেই সে এই উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া অমূল্য সম্পদের কথা স্মরণ করিয়াছে। শ্বশুরবাড়ীতে পা দিয়াই দিদিশাশুড়ীর শঙ্কাদুর্বল হৃদয়ের অকুণ্ঠ প্রশ্রয় ও স্বামীর অপরিমিত আদর-সোহাগের অভিসিঞ্চনে, এই সৌভাগ্য যে তাহার জন্মগত অধিকার এই বোধই তাহার মনে বদ্ধমূল হইয়াছে। সম্মান যে নিজগুণে অর্জনীয়, উহা যে দৈবপ্রসাদ নয়, এই কঠোর সত্য সে সাময়িকভাবে ভুলিয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ নিখিলেশের তাহাকে আধুনিকতার মর্যাদা দানের আগ্রহাতিশয্যে ও দিদিশাশুড়ীর স্নেহাধিক্যে তাহার অহংবোধ অতিপুষ্ট না হইয়া পারে নাই। পিতামহী যমের হাত হইতে তাঁহার অবশিষ্ট নাতিটিকে রক্ষা করার জন্য তাঁহার সমস্ত আজীবন সংস্কারকে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত আছেন। সুতরাং তিনি রাজবাড়ীর সাবেক আমলের অভিজাতবংশীয় চাল-চলনে চিরাভ্যস্ত থাকা সত্ত্বেও নাতবৌকে মেম রাখিয়া শিক্ষা দেওয়া ও বিজাতীয় বেশ পরানোর ব্যাপারে আপত্তি ত করেনই নাই, বরং প্রশ্রয়স্নিগ্ধ সমর্থনই

জানাইয়াছেন। যে বধূবয়সেই বৃহৎ সংসারের সর্বময়ী কর্ত্রী ও গুরুজন ও স্বামী যাহার মন যোগাইতে সর্বদা ব্যস্ত সে যদি নিজের পদগৌরব সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত ধারণা পোষণ করে তাহা হইলে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। তাহার বিরোধী পক্ষের মধ্যে আছেন কেবল দুই বিধবা জা। তাঁহাদের ঈর্ষ্যার ঝাঁঝ ও বিদ্রূপে বাঁকা বাক্যবাণ তাহাকে মাঝে মাঝে সহ্য করিতে হয়। কিন্তু এই জা-দুইজন সম্পূর্ণভাবে পরানুগ্রহনির্ভর, ছোট দেওরের উদারতাপুষ্ট বলিয়া তাহাদের প্রতিকূল মনোভাবকে অক্ষমের আস্ফালনরূপে হাসিয়া উড়ান যায়। বিমলা কিন্তু এরূপ স্বভাবদাক্ষিণ্যের কোন পরিচয় দেয় নাই। সে নিখিলের নিকট তাহার ভাজদের হিংসাদ্বেষ সম্বন্ধে বারবার অভিযোগ জানাইয়াছে ও তাহাদের যথাযোগ্য শাসনের আবদার করিয়াছে। নিখিল অতি স্নেহপূর্ণভাবে এই অসঙ্গত দাবী প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। কিন্তু বিমলার আত্মসম্মানবোধ তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হয় নাই। নিখিলের সহিত তাহার যে দুস্তর আদর্শব্যবধান, উভয়ের জীবনদৃষ্টির মধ্যে যে মূলীভূত পার্থক্য তাহা সে কোন দিনই তলাইয়া দেখে নাই। সে নিখিলের এই মৃদুতাকে দুর্বলচিত্ততার লক্ষণরূপে গ্রহণ করিয়া স্বামীর চিত্তদৃঢ়তা সম্বন্ধে কোন ধারণাই করিতে পারে নাই। সে স্বামীর উপর তাহার অকুণ্ঠিত প্রভাব-কল্পনায় নিজ অধিকারসীমা সম্বন্ধে সচেতন হয় নাই। এই অতিরঞ্জিত আত্মপ্রসাদের রন্ধ্রপথ দিয়াই তাহার দাম্পত্য জীবনে দুর্দৈব প্রবেশ করিয়াছে। অতিপ্রশ্রয়ে লালিত হইয়া সে বাস্তব জীবনের কঠোরতার দিকে সম্পূর্ণ অন্ধ ছিল। সে স্বামীকে এক তাল কাদার মত কাঁচা মাল ও তাহার ইচ্ছানুসারে যে কোন আকারে নমনীয় মনে করিয়া তাহার ব্যক্তিত্বের যথাযথ পরিমাপে চিরদিনই অনবহিত রহিয়া গিয়াছে। তাহার মোহমুগ্ধ চেতনা সন্দীপ বা নিখিল কাহারও অন্তর্লোকে স্বচ্ছদৃষ্টি প্রসারিত করিতে পারে নাই। তাহার স্বাভাবিক বুদ্ধিও খুব প্রখর ছিল না—তাহার উপর ভাবাবেশের কুয়াশা ও সঙ্কীর্ণ অভিজ্ঞতার অপব্যাখ্যা উভয়ের প্রভাবে সত্যের আলেখ্য তাহার নিকট সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ। বিমলার ট্রাজেডি এক দোষেগুণে মেশা, গৃহজীবনে স্বচ্ছন্দগতি, সাধারণ মেয়েকে অসাধারণত্বের উচ্চমঞ্চে আরোহণ করাইবার যে দারুণ অসঙ্গতি তাহারই মর্মান্তিক দাহজ্বালা। মাটির পাত্রে বারুদ ঠাসিয়া শিশুকে উহার যথেচ্ছ ব্যবহারের অনুমতি দিলে যে বহ্নিবিস্ফোরণ অবশ্যম্ভাবী, উপন্যাসে তাহাই ঘটিয়াছে। আত্মকেন্দ্রিক মানুষকে বিশ্বকেন্দ্রিক ভূমিকায়

অধিষ্ঠিত করিলে, গৃহলক্ষ্মীকে ঘরের কোণ হইতে টানিয়া বিপ্লবের রানীরূপে মর্যাদা দিলে, স্বভাবমুগ্ধাকে ছদ্মস্তবের আসবে স্বপ্নাবিষ্ট করিয়া তুলিলে সে নিজের সত্তায় ও সমস্ত পরিবেশে এক উৎকট উপদ্রবের সৃষ্টি করিবে। মক্ষিরানী কার্যতঃ সাধারণ মক্ষিকার মত অপরের জালে ও নিজের মোহে জড়াইয়া পড়িয়া নিজের অযোগ্যতাই প্রতিপন্ন করিয়াছে। ইহাই হইল বিমলার পূর্বপরিচয় ও তাহার মনোলোকের ইতিহাস।)

(সে কোন অজ্ঞাত দৈবপ্রসাদে মধ্যবিত্ত ঘর হইতে অসীম সুখসম্পদের অধিকারিণী হইয়া, সংসার ও স্বামীর উপর অবাধ প্রভাব বিস্তার করিয়া, নিজশক্তি সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত আত্মগর্ব পোষণ করিয়া, অকস্মাৎ এক অসাধারণ ভাবোচ্ছ্বাসের মুখোমুখি দাঁড়াইয়াছে। তাহার সঞ্চয়ের মধ্যে কেবল ভক্তি-সুরভিত দাম্পত্য প্রেম ও যুগযুগান্তরবাহিত পাতিব্রত্য-সংস্কার। স্বামীর সহিত তাহার যথার্থ সমপ্রাণতার মর্মবন্ধন ছিল না। সে নিখিলকে বুঝিবার কোন চেষ্টা করে নাই—তাহার আদর্শবাদ ও বিদগ্ধ রুচিশীলতার সে কোন দিনই নাগাল পায় নাই। চাকরদাসীদের সঙ্গে ব্যবহারেও তাহার বিশেষ কোন অন্তর্দৃষ্টি বা সহজ কর্ত্রীত্ববোধের নিদর্শন মিলে না। সকলের সঙ্গেই তাহার কেমন একটু সম্ভ্রান্ত দূরত্ব। সে ঝি-দারোয়ানদের ভৎ'সনা ও শাস্তির অধিকার প্রয়োগ করে—তাহাদের মনের ভিতরে প্রবেশ করার অন্তর্দৃষ্টি তাহার নাই। সে হয়ত তাহাদের মাইনের সঞ্চয় গচ্ছিত রাখে, কিন্তু কেহই তাহাকে মনের কথা খুলিয়া বলে না। মেজোরানীর সঙ্গে থাকোর সম্পর্ক যতটা অন্তরঙ্গ, বিমলার সঙ্গে ক্ষেমা-দাসীর সম্পর্কের মধ্যে সেই নিবিড়তা নাই। মেজোরানীর গায়ে-পড়া, ঈর্ষা স্নেহ-বিমিশ্র আত্মীয়তার আমন্ত্রণে সে সম্পূর্ণ উদাসীন, এমন কি প্রকাশ্যভাবে অবজ্ঞাশীল। এই বৃহৎ পরিবারে এক স্বামিপ্রেমের উপর অগাধ আস্থা ও স্বামীর উপর অধিকারবোধের ঐকান্তিকতা ছাড়া সে আর কাহারও সহিত ঘনিষ্ঠ হয় নাই। যখন ঘটনা-ক্রমে এবং হৃদয়ের বিশ্বাসঘাতকতায় সে এই একমাত্র অবলম্বন হারাইল, তখন জনাকীর্ণ সংসারপরিবেশে এক অসীম নিঃসঙ্গতা ও শূন্যতাবোধ তাহাকে গ্রাস করিল। বিমলার অন্তর্দ্বন্দ্ব সম্পূর্ণভাবে আত্মসমীক্ষারই বিষয় হইয়া রহিল। তাহার কোন সুখদুঃখভাগিনী সান্ত্বনাদায়িনীর খোঁজ মিলিল না। তাহার মর্মভেদী রুদ্ধ যন্ত্রণার একমাত্র নীরব ও অনিচ্ছুক সাক্ষী ছিল নিখিলেশ—সে মাঝে মাঝে মাথায় হাত বুলান ছাড়া সমবেদনার কোন

সার্থক পরিচয় দিতে পারে নাই। আদর্শবাদী নিখিলেশের এক সমব্যথী মিলিয়াছে—মাস্টারমশাই। কিন্তু সমতলচারিণী বিমলার দুঃখের অংশ লইবার জন্য কোন বিশ্বাসপাত্রী মিলিল না ইহা আশ্চর্য ঠেকে। বিমলার চাপা প্রকৃতি আদর্শবাদপ্ররোচিত নয়, উহা স্বভাবনিহিত। অশোক-বনে বন্দিনী সীতা সরমার কাছে নিজ দুর্ভাগ্যের কথা নিবেদন করিয়া তাঁহার অন্তরের ভার লঘু করিয়াছিলেন। আত্মকেন্দ্রিকতার দুর্গে বন্দিনী এই হতভাগিনী নারী মনের কথা বলিবার কোন লোক না পাইয়া দুঃখের অসহ্য পীড়ন নীরব নিঃসঙ্গতায় পরিপাক করিয়াছে। মধুসূদনের মহাকাব্যে স্বগতভাষণের কোন অবসর ছিল না। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে এই স্বগত-ভাষণই নিজের কাছে উপলব্ধি ও পাঠকের নিকট উহার বহির্মুখী প্রকাশের উপলক্ষ্য সৃষ্টি করিয়াছে।

এই তরুণীর নিকট স্বদেশী আন্দোলনের দেশব্যাপী উন্মাদনা যেন তাপসী শকুন্তলার নিকট প্রিয়স্মৃতিবিভোর উদ্‌ভ্রান্তের মত সমস্ত বোধশক্তিকে বিপর্যস্ত করিয়াছে। দেশপ্রেমের উন্মত্ত প্লাবন অন্তঃপুরচারিণী বিমলাকেও তাহার অভ্যস্ত কর্মপথ হইতে বিচলিত করিয়া তাহার চিত্তচাঞ্চল্য ঘটাইয়াছে। বাহিরের বন্যার ফেনা তাহার মনের উপকূলেও এক সূক্ষ্ম, অনির্দেশ্য মায়াজাল রচনা করিয়াছে। বিলাতী কাপড়পোড়ান ও বিলাতী শিক্ষিকাবিদায়ের মধ্যে বিমলার চেতনায় উত্তেজনার প্রথম ছোঁয়াচ লাগিয়াছে। নিখিল উভয় ক্ষেত্রেই তাহাকে সংযত রাখিবার চেষ্টা করিয়াছে, তবে যে অত্যুৎসাহী আত্মীয়-সন্তান মিস গিল্‌বিকে ঢিল মারিয়াছিল তাহাকে ন্যায্য শাস্তিভোগ করিতে হইয়াছে। ইহার পর অবশ্য মিস্ গিলবির বিদায়ও ঠেকাইয়া রাখা যায় নাই। এই ব্যাপারে নিখিলের প্রতি বিমলার অশ্রদ্ধা বাড়িয়াছে সে স্বামীর চরিত্রদৃঢ়তাকে উপেক্ষা করিয়া নিজ দৃষ্টিহীনতারই প্রমাণ দিয়াছে।

এই লগ্নে রঙ্গমঞ্চে সন্দীপের প্রথম প্রবেশ ও তাহার অগ্নিময় ভাষণের প্রতিক্রিয়ায় বিমলার চিত্তে প্রথম মোহসঞ্চার। সন্দীপের ব্যক্তিত্ব যেন অপরাহ্ণ-সূর্যের দীপ্তি-অভিষেকে ও সমবেত বিরাট জনতার মুগ্ধবিস্ময়ে দেব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইল। বিমলার চিকের আড়াল হইতে অনিবার্যভাবে বহিরাকৃষ্ট চক্ষুর্দ্বয় দেবপূজায় নারীপ্রাণের দীপারতি যোগাইল। বস্তুতঃ সন্দীপ যে ঐরাবতারূঢ় বজ্রধারী ইন্দ্র এবং তাহার বজ্রস্বনিত বিদ্যুৎ-জ্বালা

ভাষণে যে বিমলার নেত্রদীপই আগুন ধরাইল, এই প্রত্যয় তাহার মধ্যে দৃঢ় হইল। তাহার মনে আবেশমত্ততার নেশা সঞ্চারিত হইল ও সে একটা দুঃসাধ্য আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিল। সন্দীপের যে সকলের নিকট সব চাহিবার অধিকার আছে এবং তাহার নিকট যাহা চাহিবে তাহা যে অদেয় থাকিবে না এই মনোভাব তাহার মধ্যে প্রবল হইতে লাগিল। সন্দীপের অসমসাহসিকতার সহিত তুলনায় নিখিলের সদা-সতর্ক নীতি-বিচার তাহার নিকট অতি সাধারণ ও নিষ্প্রভ মনে হইল ও দেবোপম সন্দীপের নিকট হিসাবী, আবেগহীন নিখিল তুচ্ছরূপে প্রতিভাত হইল।

ইহার পর আহারের নিমন্ত্রণ ও ঘনিষ্ঠতর হইবার সুযোগের সন্ধান। বিমলা এতদিন অন্দরের বাহিরে আসিবার জন্য নিখিলের সনির্বন্ধ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিয়া আসিয়া আজ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সন্দীপের ভোজনস্থলে উপস্থিত থাকিবার প্রস্তাব জানাইল। এই অভিসারমুহূর্তে বিমলার বিশেষ প্রসাধন মেজো জার অর্থপূর্ণ হাসি ও গূঢ় কটাক্ষ দ্বারা অভিনন্দিত হইয়া বিমলাকে কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ করিল। মেজোরানীর ঈর্ষ্যাতীক্ষ্ণ দৃষ্টি বিমলার অন্তরে যে কত গভীরসঞ্চারী, অবচেতন হইতে চেতনলোকে এখনও অসংক্রামিত বাসনা সম্বন্ধেও যে কত অভ্রান্তলক্ষ্য তাহা উপন্যাসে বারে-বারে উদাহৃত হইয়াছে।

এই ভোজন উপলক্ষ্যে সন্দীপ নিজ দাবীর পরিমাণ আরও সুস্পষ্ট করিবার ও তাহার মনোজয়ের অস্ত্রগুলির নিপুণতর প্রয়োগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়াছে। সে লোভী ব্রাহ্মণের ন্যায় শুধু ভোজনেই সন্তুষ্ট নয়, দক্ষিণা হিসাবে বিমলার সঙ্গলাভের উৎকণ্ঠা জানাইয়াছে। সত্যমিথ্যা-নির্বিশেষে সে নারীদের মনে আবেদন পেশ করিতে ত্রুটি করে নাই। তার সপ্রতিভ গতিশীলতা ও নিঃসঙ্কোচ ইচ্ছাপ্রকাশ আপত্তির কোন অবসর না দিয়া আবেদনকে আরও অপ্রতিরোধী করিয়াছে। মেজোরানী এই দীর্ঘ আলাপের মধ্যে আড়ি পাতার আয়োজন করিয়া আসরটি যে বাসরের কাছাকাছি তাহারই ইঙ্গিত দিয়াছে। এই চতুরা, তীক্ষ্ণবুদ্ধি মহিলার নিকট কিছুই এড়াইয়া যায় না।

বিমলার ফিরিয়া আসিবার প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়া ও নিখিলকে আদেশপালনের জামিনস্বরূপ আটকাইয়া সন্দীপ বিমলাকে খাইতে যাইবার ছুটি দিয়াছে। বিমলার দ্রুত প্রত্যাবর্তন সন্দীপের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তাহার আগ্রহাতিশয্যের অশোভনতা উদ্ঘাটন করিয়াছে। সন্দীপ নিখিলের সহিত

মতবাদসম্পর্কিত তর্কযুদ্ধ বাধাইয়া দিয়া নিজ বুদ্ধিদীপ্তিপ্রদর্শনের উপলক্ষ্য খুঁজিয়াছে। এই কথাকাটাকাটির মধ্যে বিমলা শুধু যে সন্দীপের মত সমর্থন করিয়াছে তাহা নয়। সন্দীপের দুর্নীতিভিত্তিক দেশপ্রেমেরও আবেগময় পোষকতার দ্বারা নিখিলকে মর্মান্তিক বেদনা দিয়াছে। সে শুধু যুক্তিপ্রয়োগে সন্দীপের মতবাদকে জোরাল করে নাই, তাহার নৈরাজ্যবাদমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছে। এই যুক্তিসংঘর্ষের মধ্যে অকস্মাৎ সে পাপস্তুতি উদ্‌গীরণ করিয়া কলুষকে কাব্যরমণীয়তা ও আবেগসৌন্দর্যের রাজ্যে উন্নীত করিয়াছে। আবেগের এই বহ্নিদীপ্তির অন্তরালে সন্দীপ বিমলার প্রতি নিখিলের উপস্থিতিতেই তাহার প্রণয়মুগ্ধতার অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছে। ইতিমধ্যে আবির্ভূত মাস্টারমশায়ের মুখে উচ্চারিত আশীর্বাণী বিমলার বিপদের পরোক্ষ সঙ্কেত দিয়াছে। মেজোরানীর সরস বিদ্রূপ ও মাস্টারমশায়ের গম্ভীর শুভকামনা দুই বিভিন্ন উপায়ে সঙ্কেতিত একই বিপদের বার্তাবহ।

ইহার পরবর্তী স্তরে বিমলার আসক্তির ইতিহাসের পর্যায়গুলি সুস্পষ্টভাবে নির্দেশিত হইয়াছে। সন্দীপের কর্মপন্থা-পরিবর্তন, ঘুরিয়া প্রচার করার চেয়ে বিমলার অব্যবহিত নৈকট্যকেই স্বদেশসেবার শ্রেষ্ঠ উপায়রূপে নিরূপণ, সর্বোপরি বিমলাকে স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রেরণাদাত্রী ও নেত্রীর মর্যাদায় অধিস্থাপন প্রণয়াবেশের অগ্রগতির স্তরনির্দেশচিহ্ন। এই চরম সম্মানে বিমলার মোহ যে মত্ততার উচ্চতম পর্যায়ে পৌঁছবে তাহা একান্ত স্বাভাবিক। এই ঘটনাটি নিখিলের আত্মকথায় ব্যক্ত হইয়াছে। পরবর্তী পদক্ষেপগুলি বিমলার নিজের মুখের উক্তিতে গোচরীভূত। সন্দীপের কামনার শিখা যেন সমস্ত রূপকাবরণ, সমস্ত শোভনতার অন্তরাল ভেদ করিয়া প্রদীপ্ত হইতে উন্মুখ। বিমলা এই উত্তপ্ত আকর্ষণ সম্বন্ধে আনন্দ ও শঙ্কামিশ্রিত মনোভাব পোষণ করে। বিমলার অন্তঃপ্রকৃতিতে একটা রূপান্তর ঘটিয়াছে। সন্দীপের মুগ্ধ প্রশস্তি তাহার নীতিবোধে একটা সামগ্রিক ওলট-পালট ঘটাইয়া তাহাকে সমস্ত নিয়মবন্ধনের অতীত একটা অনন্য সত্তার অধিকার দিয়াছে। সে যেন সংসারসীমাবহির্ভূত একটা প্রাকৃতিক শক্তির দুরন্ত উচ্ছ্বাসের সগোত্রীয়া। তাহার রূপহীন দেহে সে অকস্মাৎ নূতন সৌন্দর্য আবিষ্কার করিয়াছে ও দেশনেত্রীর সিংহাসন যে তাহার সহজপ্রাপ্য এই বিশ্বাসও তাহার অস্থিমজ্জাগত হইয়াছে। এই মোহের ক্লোরোফর্মের অন্তরালে নিখিলের সঙ্গে তাহার নাড়ীর সম্পর্ক অজ্ঞাতসারে ছিন্ন হইয়া গিয়াছে।

সন্দীপের মুখে আরও একটি সুর উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। মেজোরানী এইবার এই অনুচিত ঘনিষ্ঠতার পথে সক্রিয় বাধা দিয়াছে। সে দারোয়ানকে দিয়া সন্দীপের অন্দরমহলে প্রবেশ নিষেধ করিয়াছে। ইহারই প্রতিক্রিয়ায় মক্ষীরানীর সন্দীপের প্রতি আকর্ষণ আরও উদ্ধত ও দুর্বার হইয়া উঠিয়াছে। বিমলার ক্রুদ্ধ আপত্তিতে নিখিল দারোয়ানকে বদলি করিয়াছে, কিন্তু বরখাস্ত করে নাই। নিখিলের বাধ্যতা সম্বন্ধে তাহার ধারণা আবার ভ্রান্ত প্রমাণিত হইল। নিখিল বিমলার স্বাধীন ইচ্ছাতেও কোন বাধা দিল না। ইহার ফলে অন্তরঙ্গতা আরও বাড়িয়াই চলিল।

বিমলার সঙ্গে সন্দীপের সম্বন্ধের অনিশ্চয়তাটুকু ধীরে ধীরে কাটিয়া গিয়া স্পষ্টতর রূপ পরিগ্রহ করিল। স্ত্রী-পুরুষের সনাতন সম্পর্কের আলোকে সন্দীপ বিমলার সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, সমস্ত সঙ্কোচ-সংযমের ছলনাময় ছদ্মবেশটি প্রত্যক্ষ করিল। এ সবই কেবল আগুনে ঝাঁপ দিবার পূর্বাবস্থা। সে নিজের শক্তি ও বিমলার প্রতিরোধের যথার্থ মূল্যায়নে ভুল করে নাই। বিমলার প্রসাধনকলার মধ্যেই সে সর্বনাশের লাল নিশান লক্ষ্য করিয়াছে। তাহার অধঃপতনের প্রত্যেকটি সোপান, তাহার আত্মবঞ্চনার ব্যর্থ প্রয়াস, তাহার সম্মোহনের মুহূর্তে মুহূর্তে ঘনায়মান আবেশ, সন্দীপের উলঙ্গ বস্তুতন্ত্রবাদ ও ভোগসর্বস্ব জীবনদর্শনের ধূমকেতু-দীপ্তিতে এক সর্বনাশের আসন্ন ব্যঞ্জনায় প্রতিভাত হইয়াছে। অজগর সাপের ক্রূর দৃষ্টিতে হরিণীর অসহায় কিন্তু সাগ্রহ প্রতীক্ষা ইহার মধ্য দিয়া মর্মান্তিকভাবে ফুটিয়াছে।

সন্দীপের চেষ্টা শুধু সম্মোহন-প্রয়োগেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই। সে বিমলার বুদ্ধিকে আধুনিক সাহিত্যের প্রবৃত্তিপ্রশস্তির প্রেরণায় অভিভূত করিতে চাহিয়াছে। ইচ্ছার পিছনে বুদ্ধি আত্মরক্ষার একটা দ্বিতীয় প্রাকার নির্মাণ করে। সন্দীপ বিমলার ইচ্ছাকে বিধ্বস্ত করিয়া পরে বুদ্ধিকেও মোহাচ্ছন্ন করার দূরদর্শী সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছে। ইহা হয়ত তাহার বিমলাচরিত্রের অপরিচয়-প্রসূত অতিরিক্ত সতর্কতা। বিমলাকে মুগ্ধ করিলেই চলে, তাহাকে বুঝাইবার দরকার হয় না।

এই উপলক্ষ্যে সন্দীপ নিখিল ও চন্দ্রনাথবাবুর সঙ্গে তুমুল তর্কযুদ্ধ বাধাইয়াছে। বিমলা এই তর্কসংগ্রামের নীরব দর্শকমাত্র। সে তাহার বিপদ সম্বন্ধে প্রথম সচেতন হইয়াছে—তাহার ভাব-ভঙ্গী হইতে সন্দীপের এইরূপ ধারণাই জন্মিয়াছে। সন্দীপ এই নূতন লক্ষণে বিশেষ চিন্তিত নয়,

কেননা সে জানে যে আগুন নিভাইবার অতিব্যস্ততা অগ্নিদাহকে আরও ত্বরান্বিত করে। অবশ্য এই জীবনমরণসংগ্রামে সে নিরপেক্ষ দর্শকের নিষ্ক্রিয় ভূমিকায় স্থির থাকিতে পারে নাই—তার নিজের মনেও ইহার শেষ ফলের জন্য একটা উৎকণ্ঠা, একটা অনাস্বাদিত, প্রতীক্ষিত আনন্দের শিহরণ ঘনঘন জাগিয়া উঠে।

সন্দীপ আর একটা শেষ অস্ত্র প্রয়োগের উপলক্ষ্য কাজে লাগাইতে ভোলে নাই। মক্ষীর ছবিটি অপহরণ করিয়া সেই শূন্যস্থানে নিখিলেশের পার্শ্বে নিজের ছবিটিকে বসাইয়াছে। যদিও সে দুর্ধর্ষ আধুনিক প্রেমিক, তথাপি চিত্রদর্শনে প্রেমোদ্দীপনের প্রাচীন রীতিতেও তাহার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। কার্যোদ্ধারের জন্য সে যেমন যৌন দর্শন, তেমনি বৈষ্ণব দর্শনের নিকট হাত পাতিতে সমভাবে প্রস্তুত।

পরের আত্মকথায় বিমলার সচেতন আত্মোপলব্ধির একটি নিখুঁত ছবি আমরা প্রত্যক্ষ করি। ইহার ছত্রে ছত্রে, বর্ণনায় বর্ণনায় এক অপূর্ব বর্ণময় আবেগ ভাষার মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছে। ইহার মাধ্যমেই বিমলার হৃদয়রহস্যের উন্মোচনের মূল চাবিটি আমাদের অধিগত হয়। বিমলার মোহ যে তাহার জীবনের নিগূঢ়তম স্তর পর্যন্ত সঞ্চারিত, সন্দীপের আকর্ষণ যে তাহার অনুভবের তন্তুতে তন্তুতে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত তাহা আশ্চর্য সত্যনিষ্ঠা ও অন্তর্দৃষ্টির সহিত এই অধ্যায়ে ব্যক্ত হইয়াছে।

সন্দীপের প্রভাবের স্বরূপ সম্বন্ধে তাহার কোন অনিশ্চয়তা নাই—উহার স্থূলতা তাহার নিকট নিরাবরণরূপে ধরা পড়িয়াছে। সন্দীপের কামনার অতিস্পষ্টতা মোহজালকে সম্পূর্ণ ছিন্নভিন্ন করিয়া দিয়াছে। স্বদেশসেবা, স্বাধীনতা-সংগ্রাম, স্তবস্তুতির ভাবমুগ্ধতার আড়াল বিপর্যস্ত করিয়া নগ্ন সত্যের অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিয়া দিগন্তকে রাঙাইয়া তুলিয়াছে। কামনাসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ সমস্ত আত্মবঞ্চনাকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে।

তাহার মনোভাবের বিশ্লেষণে সন্দীপের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব, এমন কি ঘৃণার অস্তিত্ব এই প্রলয়াকর্ষণকে ঠেকাইতে পারে নাই। বিমলা জানিয়া শুনিয়াই ভয়ঙ্কর-সুন্দরের এই অনলশিখায় ঝাঁপ দিতে উদ্যত হইয়াছে। বিমলার রক্তমাংসে যে স্থূলতা প্রচ্ছন্ন ছিল তাহা সন্দীপের স্থূলতার ডাকে অনিবার্যভাবে সাড়া দিয়াছে। কোন আদর্শের আবরণে, কোন উচ্চতর নীতির অজুহাতে এই জৈব আকাঙ্ক্ষার স্বরূপটিকে

ঢাকিয়া রাখা গেল না। এই ভাবমত্ততা বিমলার প্রাত্যহিক প্রয়োজনে অপরিহার্য হইয়াছে। সন্দীপের অবিরাম সান্নিধ্যের উন্মাদনা ছাড়া তাহার সমস্ত জীবনই বিস্বাদ হইয়া উঠিয়াছে। মাস্টারমশায়ের প্রশান্ত প্রভাব, সাংসারিক কর্তব্যের টান, মেজোরানীর বক্র কটাক্ষ, এমন কি পূর্ব-প্রণয়ের সমস্ত প্রতিবেশ-আকীর্ণ স্মৃতিচিহ্নসমূহ বন্যার মুখে তৃণখণ্ডের ন্যায় নিশ্চিহ্ন বিলুপ্তির অতলে তলাইয়া গিয়াছে। এই চরম উদ্‌ভ্রান্তির প্রহরে তাহার মানস প্রতিক্রিয়া অনেকটা নিখিলেরই অনুরূপ। সে নিখিলের মত আপনাকে অতীতের প্রেতচ্ছায়াবৎ অনুভব করিয়াছে। সে নিজের প্রাক্তন জীবনকে দুঃস্বপ্নবৎ শূন্যতাবিলীন করিয়াছে। এমন কি তাহার নিজ সত্তাও যেন তাহার অনুভূতিতে নিরবয়ব অসংলগ্ন কুয়াশার মত প্রতিভাত হইয়াছে। মনের একটা চরম বিপর্যয়মুহূর্তে দার্শনিক আত্মবিচার ও ভাবোচ্ছলতার মধ্যে সীমারেখা বিলুপ্ত হইয়া যায়—আত্মিক মৃত্যুর প্রাক্‌ক্ষণে প্রেতসত্তা সকলেরই চেতনাকে গ্রাস করে।

সন্দীপকে ভুলিবার জন্য বিমলার সৎসংকল্প দুইদিনের বেশী স্থায়ী হইল না। আবার সে সন্দীপের আহ্বানের উত্তরে গার্হস্থ্য কর্তব্য তুচ্ছ করিয়া বৈঠকখানার মদির আবহাওয়ায় হাজির হইয়াছে। সেখানে প্রশস্তির সুরা আবার নূতন করিয়া পরিবেশিত হইয়া ও মোহ ঘন হইয়া উঠিয়া চরম আত্মবিস্মৃতির প্রত্যন্ত স্পর্শ করিয়াছে। ঠিক এই মুহূর্তে সন্দীপ বাহু প্রসারিত করিলে বিমলা যে উদ্যত আলিঙ্গনে আত্মসমর্পণ করিত তাহা একান্ত সম্ভব মনে হইয়াছে। এই উন্মত্ত বিস্ফোরণলগ্নে মেজোরানীর কূটনীতি অভ্রান্ত লক্ষ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া সর্বনাশের নেশায় পাগল প্রণয়ি-যুগলকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। রসবিলাসের মধুররাগিণীনন্দিত কুঞ্জে হঠাৎ ইতর কলহের বে-সুরো কোলাহল বাজিয়া উঠিয়াছে। এ যেন প্রমোদ-মিলনের জন্য সুসজ্জিত কক্ষে হঠাৎ কাদাজল ছিটান হইয়াছে। দুই হৃদয়ের মিলননিবিড়তা হঠাৎ কাটিয়া গিয়া সংসারের কুৎসিত রূপটি উহাকে ব্যঙ্গ করিয়াছে। মেজোরানী সমস্ত ব্যাপারটিকে অত্যন্ত লঘুভাবে দেখিয়া ও নিজেই ইহার প্রতিবিধান করিবে এই আশ্বাস দিয়া এই প্রণয়-নাটকের প্রহসনোচিত অমর্যাদা ঘটাইয়াছে। মেজোরানী অন্তঃপুরিকা হইয়াও যে কত নিপুণ কূটকৌশলী উপন্যাসে তাহার একাধিক প্রমাণ পাওয়া যায়।

ধূমকেতুর অগ্নিময় পুচ্ছ যখন বিমলার জীবনকে ঈষৎ স্পর্শ করিয়াই

নিশ্চিত ধ্বংস হইতে তাহাকে মুক্তি দিয়াছে তখন এই দৈবকৃপালব্ধ উদ্ধারের ক্ষণিক স্বস্তিতে সে আত্মসমীক্ষার অবসর পাইয়াছে। আত্মসমীক্ষা তাহাকে নিজ জীবনের দুশ্ছেদ্য জটিলতা ও প্রতিবেশের সহিত সহজ সম্পর্কচ্যুতি সম্বন্ধে অবহিত করিয়াছে। তাহার বেদনাবিদ্ধ জীবনজিজ্ঞাসা তাহাকে কোন সুস্থ সমাধানের পথনির্দেশ করে নাই। তাহার বাকী জীবন যেন অসংবদ্ধ, অর্থহীন প্রলাপপরম্পরাগ্রথিত ও আগাগোড়া দুঃস্বপ্নাভিভূত এই প্রত্যয় তাহার মনে দৃঢ় হইয়াছে। সে মেজোরানীর সরল জীবনধারায় ঈর্ষ্যা করিয়াছে, কিন্তু নিজের জন্য শেষ দিগন্ত পর্যন্ত খুঁজিয়াও অনুরূপ জীবনযাত্রার আশ্বাস প্রত্যক্ষ করে নাই। তাহার সমস্ত পরিচিত পরিবেশ ও স্মৃতিপর্যালোচনা, তাহার পূর্ব গার্হস্থ্য নীতি-সংস্কার তাহাকে স্থির আশ্রয়ের প্রতিশ্রুতি না দিয়া বরং জটিল অন্তর্বিরোধের পাকে পাকে আরও উদ্‌ভ্রান্তবেগে তাহাকে ঘূর্ণিত করিয়াছে। এই সুদীর্ঘ আত্মবিচারের শেষ সিদ্ধান্ত হইল সঙ্কোচ বিসর্জন দিয়া প্রলয়মুখিতারই আবাহন। সে শেষ পর্যন্ত আগুনে ঝাঁপ দেওয়াই সর্বোত্তম জীবননীতিরূপে মানিয়া লইয়াছে। তাহার অন্তরের দ্বিধাদুর্বল বাধা ও মেজোরানীর বঙ্কিম কটাক্ষে তির্যকব্যঞ্জিত লোকলজ্জা এই ধ্বংসপথযাত্রীর গতিরোধনিবারণে অক্ষম হইল।

এইবার বিমলাকে সন্দীপের দৃষ্টি দিয়া দেখা যাইতে পারে। সন্দীপ নিশ্চিত হইয়াছে যে বিমলার শেষ পরিণতি তাহার নিকট আত্মসমর্পণে—সেইখানেই তাহার চরম সার্থকতা। কিন্তু নিজের সম্বন্ধে তাহার একটা অপ্রত্যাশিত সংশয় দেখা দিয়াছে। বিমলাকে অধিকার করাই কি তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠ পরিণাম? তাহার সংগ্রামী সত্তাকে রূপসমাধি দেওয়াই কি তাহার একান্ত প্রার্থিত জীবনব্রতসাধন? বিমলার চারিদিকে মুগ্ধ-অলসভাবে প্রদক্ষিণপ্রক্রিয়াই কি তাহার ঝটিকাগতি জীবনের বিচিত্র সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিরতি? সে অকস্মাৎ তাহার ব্যক্তিত্বের মধ্যে একটা নূতন অসঙ্গতিসূত্র আবিষ্কার করিয়া নিজ চিরন্তন প্রত্যয় হইতে স্খলনোন্মুখ হইয়াছে। তাহার নিরেট উপায়-উদ্দেশ্যের ঠাসবুনানির বস্তুবদ্ধতায় অবাস্তব কল্পনাবিলাসের ফাঁক বাহির হইয়া পড়িয়াছে। একমুখীন সন্দীপ বহু-মুখীনতায় বিদীর্ণ হইতে চলিয়াছে। বিমলাকে আত্মসাৎ করিবার অখণ্ড ইচ্ছার মধ্যে একটা সূক্ষ্ম বাধা ব্যথারূপে জাগিয়া উঠিয়াছে। নিশ্চিতপ্রায় ও সুনিশ্চিতের মধ্যে এক অলক্ষ্য ব্যবধান মাথা তুলিয়া তাহাকে ভাববিলাস-

প্রবণতার ঘোষণা করিয়াছে। আদর্শবিমুখ ও প্রবৃত্তিসর্বস্ব সন্দীপের প্রকৃতির মধ্যে এক অতিক্ষুদ্র আদর্শবীজ প্রথম অঙ্কুর মেলিয়াছে। সন্দীপের এই আত্মদর্শনের মুকুরে বিমলার ছবিও গৌণ প্রতিবিম্বনে ছায়া ফেলিয়াছে। বিমলার ভাগ্য যেন এই নবোদ্ভিন্ন দুর্বলতার ক্ষীণ সূত্রে দুলিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। অবশ্য সন্দীপ এখনও তাহার পূর্বস্বভাবের নির্মম, দ্বিধাহীন শক্তিমত্তার উপর আস্থা রাখে—আদিম বর্বর নিষ্ঠুরতার প্রয়োগেই সে বিমলাকে অধিকার করার সঙ্কল্প নূতন পথে দৃঢ়তর করিয়াছে।

নিখিলেশের আত্মকাহিনীতে বিমলার একটি নূতন পরিচয়ের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তাহার সহিত বিমলার আসল প্রকৃতি-পার্থক্য হইল বিমলার প্রবহমাণ প্রাণোচ্ছলতা ও নিখিলের অন্তঃরুদ্ধ প্রকাশকুণ্ঠতার মধ্যে নিহিত। পরবর্তী অংশে প্রতিবেশপ্রভাবে এই মৌলিক প্রভেদ আরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। বিমলার স্বভাব-আভিজাত্য ও নিখিলের গণতান্ত্রিক সহানুভূতি উভয়ের প্রকৃতি-বৈষম্যের মধ্যে একটি দুর্লঙ্ঘ্যতর ব্যবধান রচনা করিয়াছে।

এই স্তরে বিমলার মোহ মোহভঙ্গের প্রাক্-মুহূর্তে নিবিড়তম ও অমোঘ রূপে প্রতিভাত হইয়াছে। স্বদেশী আন্দোলনের দেশব্যাপী ভাবোচ্ছ্বাস বিমলার মনে কেন্দ্রীভূত হইয়া তাহাকে নিজের চক্ষে এক অনন্য-মহিমায় উদ্ভাসিত করিয়াছে; তাহার জন্য সমস্ত ব্যক্তিগত বন্ধন, সমস্ত সীমাসঙ্কীর্ণতা, সমস্ত পাপপুণ্যবিচারের ঊর্ধ্বে এক প্রতীকী সার্বভৌমতা, এক দেবীপ্রতিমার সিংহাসন পাতিয়াছে। তাহার মনোলোকে সে আর সাংসারিক নারী নয়, সে বিপ্লবের অগ্নিময়ী প্রাণশক্তি, সে নবসৃষ্টির দিব্য প্রেরণা। সে দিনে দিনে সন্দীপকে নূতন করিয়া রচনা করিতেছে। সন্দীপের প্রচণ্ড প্রাণশক্তি সবই তাহারই তেজের দীপ্যমান প্রকাশ। সন্দীপের অনুচর অমূল্যর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই তাহার তরুণ চোখে যে অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিয়াছে তাহা তাহারই জ্যোতিকেন্দ্রসঞ্চারিত। মানুষ যখন নিজেকে দৈবশক্তিসম্পন্ন বিধাতা মনে করে, তখনই তাহার আত্মবঞ্চনা চরম রূপ লয়, তখনই সে সর্বনাশের আগুনে পুড়িবার জন্য দাহ্যতম ইন্ধনরূপে প্রস্তুত থাকে। আত্মচেতনার গভীরে অবাধে আবর্তিত, সহস্রছলনালালিত এই মোহাবেশ অন্ধত্বের ঘন যবনিকার মত বোধশক্তির উপর নামিয়া আসে। রাত্রির সান্দ্রতম আঁধার যেমন উষাগমের পূর্বসূচনা তেমনি এই মোহাঞ্জন-বিলুপ্ত সাত্বিক রুদ্ধদৃষ্টির

উপর বাস্তবের চরম আঘাত তখন আসন্ন হয়। বিমলার ক্ষেত্রেই এই সার্বভৌম সত্য নিষ্ঠুরভাবে উদাহৃত হইয়াছে। বিমলা নিখিলের উপর মোহিনী মায়ার প্রয়োগ করিতে ব্যর্থ হইয়া মোহভঙ্গের প্রথম তিক্ততা আস্বাদন করিয়াছে। সে যে অলৌকিক শক্তির অধিকারিণী ও অনায়াস-বিজয়িনী নয়, পরন্তু তাহারও মানবিক দুর্বলতা ও পরাজয়ের গ্লানি আছে এই সত্য তাহার চেতনায় তীক্ষ্ণভাবে কাটিয়া বসিয়াছে।

ইহার অব্যবহিত প্রতিক্রিয়া সন্দীপের জবানিতে ব্যক্ত হইয়াছে। নিখিলের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত বিমলা নারীর সনাতন অস্ত্র—অভিমান ও অশ্রুজল—অবলম্বন করিয়াছে। বিমলার অভিমানে আরক্ত, নানাভাব-প্রতিবিম্বী মুখশ্রী সন্দীপের কবিত্বময় দার্শনিকতার অর্ঘ্যে অভিনন্দিত হইয়াছে। এই ভাববিহ্বলতার মধ্যে সন্দীপের আর একটা দুর্বার আক্রমণস্রোত তাহার উপর দিয়া বহিয়া গেল। বিহ্বল অসহায়তার ক্ষণে আত্মশক্তিপ্রয়োগে প্রতিরোধ বিমলার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু সন্দীপের পূর্ব-আভাসিত মানস-সঙ্কোচই হঠাৎ প্রবল হইয়া এই প্রবৃত্তিতরঙ্গের অবশ্যম্ভাবী অগ্রগতির পথে বাধা হইয়া দাঁড়াইল। এই গূঢ় মনস্তাত্ত্বিক উদ্‌ঘাটন বিমলার পরিবর্তে সন্দীপের ব্যক্তিসত্তারই উদ্ভাসন ঘটাইল। প্রতিহত নদীস্রোতের অন্তর্নিহিত এক অজ্ঞাত বিপরীত ঘূর্ণী উহার গতিবেগকে প্রতিহত করিল। এবার ধূমকেতু শুধু প্রান্ত স্পর্শ করিয়াই থামে নাই, উহা শিরাস্নায়ুর মধ্যেও দুর্দম দাহ সঞ্চার করিয়াছিল। উহা যে বিমলাকে সম্পূর্ণ ভস্মসাৎ করে নাই, তাহার কৃতিত্ব দৈবেরও নয়, বিমলারও নয়, দুর্বোধ্য মানস-বাধার প্রভাবে সন্দীপের পশ্চাদপসারণের প্রাপ্য।

এই ক্রান্তিশীর্ষ হইতে সন্দীপের মোহশক্তির ক্রমিক হ্রাসের আরম্ভ। অবরোহণ-প্রক্রিয়ার বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। মোহশিখা নির্বাপিত হইবার পূর্বে আর একবার সন্দীপের অসাধারণ ইন্দ্রজাল উহাকে উজ্জ্বলতরভাবে প্রদীপ্ত করিয়াছে। বিমলার মধ্যে দেশমাতৃকার বিশ্বরূপকল্পনা ও দেশমাতার প্রতিমাপ্রতিষ্ঠার পর উহার নব পূজাবিধির প্রস্তাব সন্দীপের উদ্ভাবনী-শক্তির একটি আশ্চর্য উদ্দীপ্তি। ক্ষীয়মান বাস্তবসত্যকে নূতন করিয়া সঞ্জীবনী শক্তিতে উদ্‌বুদ্ধ করা, স্থূল লালসাকে ভাবানুরঞ্জনে রমণীয় ও দিব্যসৌন্দর্যের সমগোত্রীয় করিয়া তোলা সন্দীপের যাদুবিদ্যার শ্রেষ্ঠ সম্মোহনাস্ত্র। তাহার এই মন্ত্রপূত অস্ত্রপ্রয়োগের ক্ষণও অদ্ভুত অন্তর্দৃষ্টির সহিত পরিকল্পিত;

সন্দীপের যে মুহূর্তে অর্থের প্রয়োজন, সেই স্থূল বস্তুভারমলিন রূঢ় মুহূর্তেই তাহার রঙীন নেশার উদ্দীপন সব থেকে বেশী অপরিহার্য। তাহাকে চাহিতে হইবে, কিন্তু ভিক্ষুকের কুণ্ঠিত স্বরে নয়, উচ্চতম অধিকারের অবিসংবাদিত প্রত্যয়ে, ন্যূনতম দরকারের দোকানদারী হিসাবে নয়, উদারতম কল্পনার রাজকীয় ঐশ্বর্যের পটভূমিতে। বিমলার নিকট পঞ্চাশ হাজারের রাজকর দাবী করা হইল ও বিমলাও ভাবোচ্ছলতার জোয়ারে নিজ শক্তিসীমা ভাসাইয়া দিয়া এই রাজস্ব মিটাইয়া দিতে তৎক্ষণাৎ রাজী হইল। সন্দীপ নিজ সম্মোহন-প্রভাবের চরম পরীক্ষা করিয়াই উহার চড়া সুরকে নামাইয়া দিল ও পঞ্চাশ হাজারের পরিবর্তে পাঁচ হাজারে তাহার আশু প্রয়োজন তাহা জানাইয়া বিমলার মনে আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের সংঘাতকে সহনীয় করিয়া আনিল। এইরূপে টাকার পরিমাণটা কমাইয়া বিমলার ঊর্ধ্বতর ভাব-কল্পনাকে অবাধ সঞ্চরণের অবকাশ দিবার বাস্তববুদ্ধির পরিচয়ে সে আত্মপ্রসাদ অনুভব করিয়াছে। ত্যাগের কুহকমন্ত্রে সর্বসমর্পণের আহ্বানে বিমলার কণ্ঠে বৈষ্ণব নায়িকার আত্মনিবেদনের স্বর ও দায়িত্বঘনিষ্ঠতার সম্বোধন স্ফুরিত হইয়াছে।

এই একসুরে-বাজা সঙ্গীতময় মিলনের সদ্যোফলস্বরূপ বিমলার চিত্তে সন্দীপের আকর্ষণ ঘনীভূত হইয়াছে। তাহার জীবন যে দুঃসাহসের ছন্দে বাঁধা গিয়াছে, সন্দীপই তাহার মূল উৎস ও ধ্রুবপদরূপে এক অনন্য ভূমিকায় অধিষ্ঠিত। বিমলার টাকা দিবার প্রতিশ্রুতি সন্দীপ-প্রজ্বলিত অগ্নির দীপ্ততম শিখা। সন্দীপের জীবনদর্শনে সে নিজ অবৈধ কাজ ও বিপ্লবী মনোভাবের শেষ সমর্থন পাইয়াছে। কিন্তু বহির্জগৎ তাহার এই অসম্ভব ইচ্ছাপূরণে কিছুমাত্র সহযোগিতা করিল না। তাহার অভীপ্সার ঐশ্বর্য পারিপার্শ্বিকের বাস্তব কৃপণতায় বিড়ম্বিত হইয়া রহিল। এই স্তরে সঙ্কল্পসিদ্ধির উপায়স্বরূপ অমূল্যর সাহায্যের উপর তাহাকে নির্ভর করিতে হইল।

অমূল্যর কচিকণ্ঠ হইতে উদ্গীরিত সন্দীপের নির্মম নীতির অবোধ পুনরাবৃত্তি বিমলাকে উহার ভয়াবহতা সম্বন্ধে প্রথম সচেতন করিল। সে যখন হাসিমুখে ডাকাতি ও খুনের কথা বলে তখন উহা সন্দীপের ভাবানু-রঞ্জনের ছদ্মমহিমার বাতাবরণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নগ্ন বীভৎসতায় প্রতিভাত হয়। অমূল্যর সহিত সুস্থ স্নেহসম্পর্কের সহজ প্রসন্নতাই সন্দীপের অশুভ প্রভাবের মোহমুক্ত হইবার মুখ্য প্রেরণা যোগাইয়াছে। অমূল্যর সরল অন্তর

হইতে বিচ্ছুরিত আলোকেই সে সন্দীপের ছলনাজাল ভেদ করিয়া তাহার স্বরূপ চিনিয়াছে। মোহর-চুরির অনির্বাণ গ্লানিও তাহাকে নিজ আচরণের হেয়তা বিষয়ে তীক্ষ্ণভাবে সচেতন করিয়াছে। এই ক্ষুদ্র ঘটনাটি বিমলার অন্তরের গভীরে অপ্রত্যাশিত আলোকপাত করে। স্বামীর প্রতি অবিশ্বাসিতার অন্তর্দ্বন্দ্ব সে অনুভব করিয়াছে অপেক্ষাকৃত লঘুভাবে। তাহার পূর্বস্মৃতিরোমন্থন ভাববিলাস-তৃপ্তি ছাড়া হৃদয়ের কোন মর্মভেদী আলোড়ন সৃষ্টি করে নাই। তাহার পাতিব্রত্য-সংস্কার ও স্বামিচেতনা কোন গভীর-স্তরশায়ী নাড়ীতে বেদনা সঞ্চার করে নাই—এযেন একটা অভ্যস্ত শান্তির ব্যাঘাত রূপেই তাহাকে অস্বস্তি দিয়াছে। স্বামিপ্রেম প্রতিবেশনিরপেক্ষ-ভাবে ব্যক্তিচেতনার গভীরে সংক্রামিত হয় নাই। উহাকে অনুভব করিতে হইলে দাম্পত্য কক্ষের পাঁচটা আসবাবপত্র ও কয়েকটা স্মারক-চিহ্নের সহিত জড়াইয়া দেখিতে হয়। আদর্শবাদী নিখিল বিমলার মনেও আদর্শের একটা ধূসর ছায়ামূর্তিরূপে অধিষ্ঠিত আছে। তাহাকে ছাড়িতে বা ভুলিতে বত্রিশ নাড়ীর টান ধরে না। সে দেবতার মত সাড়ম্বরে পূজনীয়, দয়িতের মত সত্তার অংশরূপে নিবিড়ভাবে একাত্ম হয় নাই।

(ইহার সহিত তুলনায় বিমলার গৃহকর্ত্রীর পদমর্যাদা, সংসার-পরিচালনায় তাহার প্রতিষ্ঠা, জা-দের ও অন্যান্য পরিজনের নিকট অক্ষুণ্ণ সুনাম তাহার জীবনে অনেক বেশী সত্য। সে নিখিলের প্রেম হারাইতে যতটুকু কাতর হয় নাই, গৃহিণীত্বের গৌরবচ্যুতির আশঙ্কায় তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী মুহ্যমান। সে গৃহস্বামীর পরিবর্তে গৃহের লৌকিক সম্ভ্রমকে দৃঢ়তরভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে। ব্যভিচার অপেক্ষা চুরি তাহার চোখে আরও কলঙ্কিতরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। মোহরচুরির উপর তাহার অন্তর্জ্বালার তীব্রতা ও অনুতাপের দুঃসহতা তুমুলতর বেদনাবিক্ষোভ জাগাইয়াছে। সে যখন বাড়ী ছাড়িয়া কলিকাতাবাসী হওয়ার জন্য নিখিলের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, তখনই তাহার সত্যকার পক্ষপাত কোন দিকে তাহা নিশ্চিত জানা গিয়াছে। নিখিলের সহিত তাহার মিলন-আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের বিসদৃশ গাঁটছড়া-বাঁধা—ইহার ভিতরে একটা গভীর ফাঁক আছে। এইটুকু আশা করা যাইতে পারে যে উভয় পক্ষের আন্তরিক সংশোধন-প্রয়াসে এই ফাঁকটুকু নিতান্ত ফাঁকিতে পরিণত হইবে না। তবে অদৃষ্টের আকস্মিকতা যে কোনদিনই স্বভাবধর্মের অঙ্গীভূত হইবে না তাহাও নিঃসন্দেহ।

মোহরপ্রাপ্তির আনন্দে উন্মত্ত সন্দীপের উদ্যত আলিঙ্গন হইতে বিমলা শেষবারের মত আত্মরক্ষা করিয়াছে। এই উদ্ধারসাধনের জন্য বিমলাকে দৈহিক শক্তিপ্রয়োগ ও সন্দীপের ধৃষ্টতার শাস্তিবিধান করিতে হইয়াছে। অমূল্যর উপস্থিতি ও বিমলার সতীত্বগৌরবরক্ষার সাহসিকতায় তাহার মুগ্ধমৌন স্তবনিবেদন বিমলার বাহুতে শক্তিসঞ্চার করিয়া তাহার মোহ-ভঙ্গের সুনিশ্চিত আশ্বাস যোগাইয়াছে। এই মুহূর্ত হইতে অমূল্য সন্দীপের প্রতিষেধক শক্তিরূপে আত্মঘোষণা করিয়াছে। সন্দীপ যদি তাহাকে মোহপঙ্কে টানে, তবে অমূল্য তাহার তরুণ মনের সবটুকু জ্বলন্ত বিশ্বাস দিয়া এই পঙ্কনিমজ্জনের প্রতিরোধ করিবে। বিমলার আত্মা এখন হইতে একটা চিরনির্ভরযোগ্য রক্ষক লাভ করিল। সন্দীপের আশ্চর্য অভিনয়-কৌশল ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব সাময়িকভাবে তাহার পরাজয়কে ঠেকাইয়াছে। কিন্তু তাহার ইন্দ্রজালশক্তি যে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হইবে এই প্রত্যয়ও আমাদের মনে জাগে।

অমূল্যর প্রতি ঈর্ষ্যা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাবোধ, সন্দীপপ্রকৃতির অস্থিমজ্জাগত স্থূল লালসা, বিমলার উপর তাহার অসংযত ক্রোধোচ্ছ্বাস, ও তাহার সহিত সংলাপে ইতরতার স্পষ্টতর প্রকাশ সবই ক্রমিক পর্যায়ে অথচ অনিবার্যভাবে এই সম্মোহন-শক্তির বিলুপ্তিকে দ্রুততর করিয়াছে। সন্দীপ রাবণের দৃষ্টিতে রামের ন্যায় "মরিয়াও মরিতে চাহে নাই।" যখন ভগ্ন প্রতিমার আবর্জনাস্তূপে তাহাকে ফেলিবার আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়াছে, তখনও হঠাৎ তাহার মধ্যে সুপ্ত দেবত্বের অনির্বাপিত দীপ্তি ঝলক দিয়া উঠিয়াছে। তাহাকে প্রত্যাখ্যান করা যায়, কিন্তু অবজ্ঞার ভস্মরাশিতে অগৌরবের সমাধি দেওয়া যায় না। বিমলার মনে সন্দীপের জ্যোতির কতটুকু স্বর্ণাভা অবশিষ্ট রহিল, লেখক তাহা সঠিকভাবে নির্ধারণ করেন নাই, পাঠকের অনুভবের উপর ছাড়িয়া দিয়াছেন। কিন্তু উহা যে স্মৃতির নিকষে হিরণ্যরেখা আঁকিয়া রহিয়া রহিয়া উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে, নিখিলেশের সমস্ত অপার্থিব তারকাদ্যুতি ও বিমলার সমস্ত অনুতপ্ত অনুরাগের স্নিগ্ধ দীপশিখা যে উহাকে সম্পূর্ণ মুছিয়া ফেলিতে পারিবে না এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। সে ষোল-আনা খাঁটি নয়, তাহার মধ্যে মৃত্তিকার উপাদান পর্যাপ্ত, তথাপি এক স্বভাবমহত্বের দীপ সমস্ত প্রতিকূল প্রভাবকে জয় করিয়া তাহার মধ্যে প্রজ্বলিত আছে। বিমলার উপর তাহার মানস-প্রতিক্রিয়া নিখিলেশের

অনিশ্চিত পরিণতি ও তজ্জনিত অস্থির উদ্‌ভ্রান্তিতে আড়াল পড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু জ্যোতিষ্কের অস্বচ্ছ আলোক আড়ালে পড়িলেও নিবাইয়া যায় না।

এদিকে বিমলার জীবনে অমূল্যর সঙ্গে যোগাযোগ গাঢ়তর হইয়াছে ও তাহার কৃতকর্মের জাল ছাড়াইবার দায়িত্ব সে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছে। সে বিমলার হুকুমে টাকা লুট করিয়াছে ও তাহারই হুকুমে সেই লুণ্ঠিত অর্থ ফিরাইতে গিয়া বিপদে পড়িয়াছে। এই জটিল কর্মবন্ধনের সহিত সমতা রক্ষা করিয়া অন্তরের তন্তুসমূহেও নিবিড়তর ফাঁস সংযোজিত হইয়াছে। বিমলা এই সম্পর্কঘনিষ্ঠতার স্নিগ্ধ প্রভাবে নিজের বিকারগ্রস্ত নারী-প্রকৃতির পুনরুদ্ধারসাধন করিয়াছে। নিখিল-সন্দীপের মধ্যে অস্থিরভাবে দোলায়িত তাহার প্রেয়সী সত্তা দিদিরূপে, কল্যাণময়ী মাতারূপে, নূতন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া নারীত্বের সনাতন ভূমিকাতে নিজ ভারসাম্য ফিরিয়া পাইয়াছে। স্বামীর সহিত তাহার মিলন ঘটিয়াছে রোমান্সের অনুতাপ-মার্জনাস্নিগ্ধ সুপরিচিত ছায়াপথে—আবেগের কোন অপ্রত্যাশিত উৎসার বা মনস্তত্ত্বের কোন অজ্ঞাত স্ফুরণ এই ভাবান্তরকে রূপবৈচিত্র্য দেয় নাই। সেই কালরাত্রির উৎকণ্ঠা বিমলার মনের পর্দায় দ্রুতসঞ্চারী ছায়াছবির মত প্রক্ষিপ্ত হইয়া উহার অস্বস্তির গতিবেগ নিরূপণ করিয়াছে। ইহার ভিতর অমূল্যর মৃত্যু ও নিখিলেশের জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে সংশয়াকুল প্রতীক্ষা সংবাদরূপে পরিবেশিত হইয়াছে, কিন্তু বিমলার অসাড় অনুভূতি উহাকে কিরূপ রেখাচিত্রে অঙ্কিত করিয়াছে, এবং বিমলার ভবিষ্যৎ চেতনায় উহা কি স্থায়ী মূর্তিতে চিরমুদ্রিত হইয়াছে তাহা লেখক আমাদিগকে জানাইবার অবসর পান নাই। এই গোধূলি-অস্পষ্টতার মধ্যেই বিমলার জীবনকাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাসেরও আখ্যানবিষয়ের উপর উপসংহারের যবনিকা-পাত ঘটিয়াছে।

মুখ্য তিনটি চরিত্রে লেখকের স্বতঃঅনুভবশীল, স্ফটিকস্বচ্ছ কল্পনা ও মনস্তত্ত্বাশ্রয়ী সম্ভ্রান্ত পরিবেশরচনার অপূর্ব সমন্বয় উদাহৃত হইয়াছে। লেখক চরিত্রগুলির অন্তর্লোকের গভীরে প্রবেশ করিয়া সার্থক তথ্য-সন্নিবেশে ও উপলক্ষ্য-প্রয়োজনায় তাহাদের জীবন্ত রূপ দিয়াছেন। সৃষ্টি ও বিশ্লেষণ এখানে এক আশ্চর্য সমন্বয়ে জীবনের নিগূঢ় ক্রিয়াকে রঞ্জনরশ্মির আলোকে প্রত্যক্ষবৎ উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে। ইহাদের কথা বাদ দিলেও দুটি গৌণ চরিত্ররূপায়ণে—মেজোরানী ও অমূল্যর জীবনব্যাখ্যায়—অনন্ত সৃষ্টিপ্রতিভার স্বাক্ষর মুদ্রিত।

রবীন্দ্রনাথ যে রাজবাড়ীর নিভৃত অন্তঃপুরবাসিনী যৌবনোত্তীর্ণা রমণীর হৃৎস্পন্দন কত নির্ভুলভাবে শুনিয়াছেন ও কর্মে তাহার কিরূপ অনবদ্য প্রকাশ সাধন করিয়াছেন তাহা ভাবিলে বিস্ময়াপ্লুত হইতে হয়। তাঁহার মানবচরিত্র-জ্ঞান যে সাধারণ অভিজ্ঞতা হইতে সংবৃত্ত, অভিজাত পরিবারের সম্ভ্রম-বোধে আচ্ছন্ন একটি অন্তরের দুষ্প্রবেশ্য প্রেরণার মধ্যে অনুপ্রবেশশীল, তাহা তাঁহার অভ্যস্ত জীবনবৃত্ত হইতে অনুমান করা যায় না। একটি ভাগ্যবঞ্চিতা, বিধবা তরুণীর অন্তরলোকে যে এরূপ সূক্ষ্ম জালবয়ন চলিতেছে, এত বিচিত্র সাধ ও আকূতি জড়াজড়ি করিয়া আছে তাহা স্বয়ং অন্তর্যামী ছাড়া আর কাহারও জানার সম্ভাবনা ছিল না। তাহার ঈর্ষ্যা, হিংসা, বঞ্চিত হৃদয়ের জ্বালা, নিরুদ্ধ কামনার তির্যক রসোচ্ছলতার তপ্ত বালুকার মধ্যে যে কৈশোরস্মৃতিমুগ্ধতা ও অনাবিল প্রীতির স্নিগ্ধ ফল্গুধারা প্রবাহিত ছিল তাহা কে কল্পনা করিতে পারিত? তাহার বহির্জগতের সহিত নিঃসম্পর্ক, অন্তরালবন্দী জীবনে যে সুড়ঙ্গচারী কুটনীতির এরূপ অপ্রত্যাশিত বিকাশ ঘটিবে, এরূপ উপস্থিতবুদ্ধি তুচ্ছ উপলক্ষ্যের আশ্রয়ে বৃহৎ সঙ্কল্পসিদ্ধির উপায় আবিষ্কার করিবে, তাহার অন্তর্লোকের এই গোপন পরিচয় উচ্চ অধ্যাত্ম-লোকে বিচরণকারী, প্রাকৃতজীবনবিমুখ রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় কোন্ অলক্ষ্য রন্ধ্রপথে উদ্‌ঘাটিত হইল তাহা এক অজানা বিস্ময়। মেয়েলি মনের মৃন্ময় আস্তরণের মধ্যে অকস্মাৎ যে এই দিব্য আভা ঝলক দিয়া উঠিবে তাহা লেখক আমাদের না দেখাইলে আমাদের নিকট চির-অজ্ঞাত থাকিত। অন্দরমহলের এই কুটিল, অথচ অতিসাধারণ ষড়যন্ত্রজালবিস্তারের সহজ দক্ষতাই মেজোরানীর প্রাণের বিদ্যুৎশক্তির পরিচয়বাহী, ইহাই তুচ্ছের মধ্যে অসাধারণের উন্মেষ।

অমূল্য এত গভীরভাবে পরিকল্পিত হয় নাই। উপন্যাসে তাহার মনের এক দিকই আমাদের নিকট প্রকাশিত। সে কিশোর বয়সে সন্দীপের মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া তাহার কোমল বৃত্তিগুলিকে, তাহার স্বভাববৈচিত্র্যকে সংবৃত করিয়াছে। সে দেশোদ্ধারের হিংস্র রাজনীতিতে জীবন সমর্পণ করিয়া অন্যান্য দিকের অনুশীলনে সম্পূর্ণ বিরত হইয়াছে। তরুণ বয়সের যে ভাবোন্মাদ কিশোরচিত্তকে সম্পূর্ণ এককেন্দ্রিক করিয়া তোলে, অমূল্যর ক্ষেত্রে তাহারই উদাহরণ মিলে। কিন্তু তাহার স্বাভাবিক স্নেহাকাঙ্ক্ষা, সংসার-জীবনের রস-উপভোগস্পৃহা চাপা থাকিলেও বিলুপ্ত হয় নাই। বিমলার

স্নেহস্পর্শে এই উদ্দেশ্যমরুচারী কাঁটাগাছ এক মুহূর্তে ফুলে ফলে বিকশিত হইয়া উঠিল। যেখানে তাহার আনুগত্য সন্দীপ ও বিমলার মধ্যে দ্বিধাবিভক্ত হইবার লক্ষণ দেখাইয়াছে, সেইখানেই বিমলার প্রতি তাহার আকর্ষণ, আবেগকোমলতার প্রতি তাহার পক্ষপাত দ্বিধাহীনভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সে নিজে সন্দীপের ডাকিনীমন্ত্রের মোহ হইতে জাগিয়াছে ও বিমলার আত্ম-উদ্বোধনের সহায়ক হইয়াছে। সে সন্দীপের হাতের আক্রমণের অস্ত্র হইতে বিমলার আত্মরক্ষার কোমল ছাদনবর্মের রূপ-ধারণ করিয়াছে। বিমলার স্বল্পকালীন প্রভাবে তাহার অকালশুষ্ক, অস্বাভাবিক প্রকৃতির যে সর্বাঙ্গীণ মুক্তি ও স্বচ্ছন্দ বিকাশ ঘটিয়াছে তাহাই তাহার ব্যক্তিস্বরূপের যথার্থ পরিচয়দ্যোতক। এই অল্প কয়েক দিনে তাহার অহল্যাজন্ম বিচিত্র সৌকুমার্য ও অফুরন্ত প্রাণোচ্ছলতার নবরসসঞ্চারে প্রবুদ্ধ হইয়াছে। তাহার অন্তিমক্ষণ আসিয়াছে অনিবার্য মৃত্যুর পথ ধরিয়া, কিন্তু এ মৃত্যু হিংস্র আততায়ীর, আদর্শভ্রষ্ট দস্যুর মৃত্যু নয়। উহা সমাজ-কল্যাণে নিবেদিত, অমরতাসন্ধানী মানবাত্মার গৌরবদীপ্ত পরিণাম। বিমলার কল্যাণকামনা তাহাকে মৃত্যু হইতে বাঁচাইতে পারে নাই, কিন্তু আত্মিক অপমৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছে। তাহার ভাইফোঁটা এই গূঢ় অর্থেই সার্থক হইয়াছে। অন্তর্দৃষ্টি ও মনীষার প্রয়োগে গূঢ় প্রাণরহস্যের মর্মভেদ উচ্চাঙ্গের শিল্প-সার্থকতার নিদর্শন। কিন্তু অবলীলাক্রমে দুই একটি বিরল বর্ণ ও রেখার সম্পাতে গৌণ চরিত্রের মধ্যে জীবনধর্মিতা ফুটাইয়া তোলা সহজাত সৃষ্টি-প্রতিভার শ্লাঘ্যতর পরিচয়।

৮

অর্থগূঢ় সংক্ষিপ্ত ভাষণে গাঢ়বদ্ধ মননশীল জীবনসমীক্ষা উপন্যাসটির একটি স্মরণীয় বৈশিষ্ট্য। মানব অন্তরের গভীর অবতরণ শুধু নয়, এই পর্যবেক্ষণ ও উপলব্ধির ফলশ্রুতি তীক্ষ্ণাগ্র ভাষণের ন্যূনতম পরিসরে পরিবেশনশক্তিও রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসে আশ্চর্যভাবে উদাহৃত করিয়াছেন। বিষয়ের অসাধারণত্বের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া তাঁহার প্রকাশরীতিও দূরোৎক্ষিপ্ত সাঙ্কেতিকতায় নিজ দ্যুতি বিকীর্ণ করিয়াছে। উপমা ও চিত্রকল্প-প্রয়োগের দীপ্তি-বিচ্ছুরণ বিষয়ের নব নব দিগন্তকে আলোকিত করিয়া

বক্তব্যের গভীরতর তাৎপর্যের ছটা ছড়াইয়াছে। প্রকাশের বিদ্যুৎচমকে বর্ণনা ও বিবৃতি নূতন অন্তর্ভেদী দ্যোতনায় প্রতিভাত হইয়াছে। 'চতুরঙ্গ' ও 'ঘরে-বাইরে' হইতে ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের জীবনতত্ত্ব-সমীক্ষাপ্রকাশের এই অভিনব রীতির সূচনা। ভাষা যদি নিজশক্তির আস্ফালনে ভাবকে ছাড়াইয়া গিয়া নিজেকে অতিদর্শনীয় করিয়া তোলে, পাঠকের স্বতন্ত্র মনোযোগের দাবী জানায়, তবে উহাতে রচনার ভারসাম্য বিচলিত হয়। রচনা নিজ স্বভাবধর্মের প্রতি বিশ্বস্ততা হারাইয়া শেষ পর্যন্ত ভঙ্গীসর্বস্বতার কৃত্রিমতাকে অবলম্বন করে। 'ঘরে-বাইরে' পর্যন্ত এই বিপদ উগ্রভাবে প্রকট হয় নাই—ভাব ও ভাষার, বিষয় ও প্রকাশের একটা সহজ সামঞ্জস্য এ পর্যন্ত রক্ষিত হইয়াছে। পরবর্তী পর্যায়ের উপন্যাসে কোথাও বা কাব্যপ্লাবনের আতিশয্যে, কোথাও বা চরিত্র ও উপলক্ষ্যের সীমাতিসারী মননের অতি প্রখরতায়, ঔপন্যাসিক স্বধর্ম হয়ত কিছুটা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। তবে এ পর্যন্ত সংলাপ যথার্থভাবে ঘটনার নির্দেশ ও চরিত্রের তাৎকালীন মানস-পরিস্থিতির স্বাভাবিক ছন্দের অনুবর্তন করিয়াছে। বিমলার অনুশোচনাকীর্ণ অন্তরের আবেগোচ্ছ্বাস, নিখিলেশের দার্শনিকোচিত তত্ত্বনিষ্ঠ আত্মসমীক্ষা ও সন্দীপের দার্শনিকতার নির্মোকাবৃত শক্তিবাদের সবই নিজ নিজ স্বভাবানুযায়ী প্রকাশ-ছন্দে বিধৃত হইয়াছে। সববাঁধভাঙা ক্ষুরধার উচ্ছলতা, তাহাদের ব্যক্তিসত্তা ও বহিঃপ্রভাবিত মানস উত্তেজনা তাহাদের সংলাপে নিখুঁতভাবে প্রতিবিম্ব ফেলিয়াছে। এই নাটকীয় সঙ্গতিই উপন্যাসের সর্বাঙ্গীণ জীবননিষ্ঠতার ও শিল্পোৎকর্ষের মূল লক্ষণ। উপন্যাসশিল্প রবীন্দ্রমানসের এই বিচিত্র ভাবপ্রেরণা ও প্রকাশ-ঔৎসুক্যের পূর্ণ দাবী মিটাইয়া নিজ স্বভাবধর্মের নমনীয়তা ও বিবিধ নব নব বাহনযোগ্যতার প্রয়োজনের আশ্চর্য পরিচয় দিয়াছে। বঙ্কিম উপন্যাসের যে ঘটনাবৈচিত্র্য ও রূপশিল্পের সীমা নির্দেশ করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাহাকে বহুদূর অতিক্রম করিয়া উহার অফুরন্ত প্রাণশক্তি ও রূপসম্ভাবনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। চরিত্র ও উপলক্ষ্যের সঙ্গে মিলাইয়া সেই মানদণ্ডে বিচার করিলেই ভাষার নাট্যোপযোগিতা বোঝা যাইবে।

বিমলার প্রথম কয়েকটি উক্তি—যথা, 'কলঙ্কের প্রশস্ত জায়গা তারার মধ্যে নেই, চাঁদের মধ্যেই আছে, (রবীন্দ্ররচনাবলী নবমখণ্ড পৃ ৪০৮) 'এখন কি কেবলমাত্র সুন্দরের দোহাই দিলে আর সত্যকে ফিরে পাওয়া

যাবে?' (ঐ পৃ ৪০৯), 'এমন মানী-সংসারের তরীটাকে একটিমাত্র স্ত্রীর আঁচলের পাল তুলে দিয়ে চালানো' (ঐ পৃ ৪১১)—এগুলি যেন নিখিলেশের দার্শনিকতার ছোঁয়াচ-লাগা মনে হয়, বিমলার নারীস্বভাবের সহজ প্রকাশরূপে ঠেকে না। ইহার কারণ হইল যে বিমলা এখানে পূর্ব-ইতিহাসের বিবৃতিকারিণী, ইহা তাহার সন্দীপপূর্ব নয় বৎসরের সংসারজীবনের অভিজ্ঞতা-নির্যাসের পরিবেশন। বিমলা মন এখানে সক্রিয়, কিন্তু হৃদয়ের সহযোগিতাহীনভাবে। যেখানে তাহার আবেগ মিশিয়াছে, যেখানে তাহার অন্তঃপ্রকৃতি কথা কহিয়া উঠিয়াছে, যেখানে সুর অন্যপ্রকার। 'প্রেম যে স্বভাববৈরাগী; সে যে পথের ধারে ধুলার পরে আপনার ফুল অজস্র ফুটিয়ে দেয়', (ঐ পৃ ৪০৯) বা 'প্রেমের থালায় ভক্তির পূজা আরতির আলোর মত' (ঐ পৃ ৪০৯) বা 'আমাদের ভালোবাসার প্রদীপ যখন জ্বলে তখন তার শিখা উপরের দিকে ওঠে—প্রদীপের পোড়া তেলই নিচের দিকে পড়তে পারে' (ঐ পৃ ৪১০) বা 'শঙ্কর ত ভিক্ষুক হয়েই অন্নপূর্ণার দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছেন, কিন্তু এই ভিক্ষার রুদ্রতেজ কি অন্নপূর্ণা বইতে পারতেন যদি তিনি শিবের জন্যে তপস্যা না করতেন' (ঐ পৃ ৪১০)—এই উক্তিগুলি আমাদের মনে মিশ্রভাব জাগায়। কেননা, ইহারা বিমলার অন্তরের কথা, কিন্তু প্রকাশে রবীন্দ্রমানসের বুদ্ধিবাদের দ্বারা সচেতনভাবে প্রভাবিত। বিমলা মনের ভাব বুঝাইতে যে এরূপ অতিপল্লবিত, কবি-দার্শনিকসুলভ উপমা-অলঙ্কার প্রয়োগ করিবে তাহা অস্বাভাবিক মনে হয়। সন্দীপের প্রতি মোহ তাহার রক্তে সংক্রামিত হইবার পর, তাহার আবেগ ও আবেগপ্রকাশ দুইটিই নূতন ছন্দ অবলম্বন করিয়াছে। 'স্রোতের জল ঘোলা হলেও অনায়াসে তার ব্যবহার চলে' (ঐ পৃ ৪২২), 'এ যেন বানের জল, এর জন্যে কোনো খিড়কির পুকুরের জবাবদিহি নেই', (ঐ পৃ ৪৩৫), 'প্রকৃতির ডাক্তারিতে ব্যথা অসাড় করবার অনেক ওষুধ আছে' (ঐ পৃ ৪৩৬)—এগুলি নারীর আলোড়িত হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত উৎক্রমণ, তীরের মত ঋজু, প্রত্যক্ষ, মননের কুয়াশায় ঢাকা, অলঙ্কারভারে মন্থর নয়।

ইহার পর বিমলা আত্মদ্বন্দ্বে ক্লিষ্টা; সমুদ্রমন্থনের সমস্ত সংবেগ তাহার অন্তরের ক্ষুদ্র আধারকে বিদীর্ণপ্রায় করিয়াছে, তাহার ধারণাশক্তির শেষ সীমা পর্যন্ত পরীক্ষিত হইয়াছে। এই অবস্থায় সে অপরের বাগ্মিতা ও

পর্যবেক্ষণনিপুণতার উদ্রেক করিয়াছে। নিজে কোন ভাষণের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়াইবার অবসর পায় নাই। তাহার অন্তঃরুদ্ধ সংঘাতের ইতিহাস আমরা সন্দীপ ও নিখিলেশের প্রত্যক্ষদৃষ্টি ও বিচারবুদ্ধির মধ্যবর্তিতায় অবগত হই। মর্মভেদী বেদনা, বিরুদ্ধ ঘটনা-তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাত, জটিল অদৃষ্টজালে অসহায় বন্দিত্ব তাহার অনুভবের সবটা অধিকার করিয়া উদ্বৃত্ত প্রকাশশক্তিকে অবরুদ্ধ করিয়াছে। সংঘাতের তীক্ষ্ণতা ও পৌনঃপুনিকতা তাহার মননকে অসাড় করিয়াছে। সে একবার নিখিলেশ, একবার সন্দীপ ও শেষের দিকে অমূল্যর সঙ্গে দ্রুতপরিবর্তনশীল, বুদ্ধিবিভ্রান্তিকারী সম্পর্কের জালে এত জড়াইয়া পড়িয়াছে, নূতন নূতন মুহূর্তের তাৎক্ষণিক দাবী মিটাইতে সে এত বিব্রত হইয়াছে যে ধীর-মন্থর, অতীত ও অনাগত কালব্যাপ্তিতে দূর-প্রসারিত প্রকাশে তাৎপর্যতীক্ষ্ণ আত্মসমীক্ষা তাহার পক্ষে অসম্ভব। সে অপরের নিকট মনস্তাত্ত্বিক ও আবেগময় কৌতূহলের বিষয় হইয়াছে, কিন্তু নিজে বাহিরের অভিভব সামলাইতে অন্তরের দরজা খুলিয়া দেখিবার সময় ও সুযোগ তাহার ছিল না। একেবারে শেষ অধ্যায়ে নিখিলেশ ও অমূল্যর অসহ্য অবস্থাসঙ্কট তাহার মনে একটি সর্বগ্রাসী, সমস্তচেতনালোপী উৎকণ্ঠার গোধূলিচ্ছায়া ঘনীভূত করিয়াছে। এই অর্ধচেতন বিমূঢ়তার মধ্যে বাহিরের ঘটনা অজ্ঞাত আশঙ্কার আভাসে, কাল্পনিক বিভীষিকার সঙ্কেতে তাহার রুদ্ধ অনুভূতিকে দুঃস্বপ্নের কানা-গলিতে লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরাইয়াছে। এই ঘটনাপারম্পর্যের বিহ্বল উদ্‌ভ্রান্তি তাহার ইচ্ছাশক্তি ও বাস্তব চেতনা উভয় বৃত্তিকেই ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। ঘটনানিয়ন্ত্রণের অত্যধিক প্রয়াসই প্রতিক্রিয়ারূপে তাহাকে স্বপ্নাচ্ছন্নতার সীমান্তরেখায় দাঁড় করাইয়াছে। তাহাকে এত সহ্য করিতে হইয়াছে যে তাহার স্বচ্ছদৃষ্টি ও ইচ্ছাস্বাধীনতা অসাড় হইয়া আত্মবিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্তনির্ণয় উভয় কার্যের জন্যই শক্তি হারাইয়াছে। বিমলার অন্তর-ঐশ্বর্য ও উহার বাঙ্‌ময় প্রকাশের মধ্যে সংযোগসূত্রটি ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

নিখিলেশের চিত্তবৃত্তি সূক্ষ্ম ভাবতন্তুনির্মিত। তাহার স্বভাবপ্রবণতা হইল দার্শনিক সমীক্ষা ও সত্যানুসন্ধিৎসার প্রতি। বাস্তব জগতের সঙ্গে তাহার ততটুকু সম্পর্ক যতটুকু ইহা তাহার অন্তঃপরীক্ষার প্রেরণা ও উপলক্ষ্য যোগায়। সে সংসারকে দার্শনিকতার দুরারোহ তপোভূমিতে উত্তীর্ণ করিবার সোপানস্বরূপ দেখে, কোন স্থায়ী বাসগৃহরূপে নয়।

জমিদারীর ধন-সম্পদ, পারিবারিক জীবনের স্নেহনিবিড়তা মূলতঃ তাহার মর্মগত আদর্শবাদকে বাস্তব রূপ দিবার উপকরণ মাত্র। অন্ততঃ সে তাহাই বিশ্বাস করে। বিমলার ভালবাসায় সে তৃপ্ত নয়, কেননা সত্য-পরিচয়ে উৎসুক মন বাহিরের খোলা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হইয়া তাহার অধিকার সাব্যস্ত করিতে চায়। কিন্তু যখনই এই দুরূহ পরীক্ষা সুরু হইল, তখনই তাহার দার্শনিক নিরপেক্ষতার ছদ্মগৌরব আসক্তির করুণ আচ্ছন্নতায় নিজ অসারত্ব প্রতিপন্ন করিল। দার্শনিক প্রশান্তি তাহার অনায়ত্ত আদর্শ, উহা তাহার পরীক্ষাস্বীকৃত জীবনসত্য নয়। তাহার সচেতন যুক্তি ও অনুশীলনবাদ যাহা সত্যরূপে প্রতিষ্ঠা করিতে চাহে, তাহার সহজ সংস্কার তাহার ক্ষুব্ধ বিরোধিতা জানায়। কৃচ্ছ্রসাধনের সংকল্প তাহাকে যে উচ্চ প্রতিষ্ঠাভূমিতে আরোহণের নির্দেশ দেয়, তাহার স্বাভাবিক জীবন-প্রবৃত্তি তাহা হইতে বারবার স্খলিত হয়। সুতরাং নিখিল সংকল্পে দার্শনিক, স্বভাবে দার্শনিক নয়।

তাহার দার্শনিক অন্তঃসমীক্ষা সাধারণতঃ দীপ্ত, স্মরণীয় ভাষণের উপযোগী নয়। সে বিষয়ের গভীরে যতটা প্রবেশ করিতে চাহে, ততটা জোর-গলায় উহার ফলশ্রুতি ঘোষণা করে না। দার্শনিকেরা স্বভাবতঃই বিচারশীল, নানা দৃষ্টিকোণ হইতে একই বিষয়কে পর্যবেক্ষণ করিতে অভ্যস্ত। এই অতিরিক্ত বিচারপ্রবণতা দৃঢ় তীক্ষ্ণভাষণের বিপরীতমুখী। এই জাতীয় ব্যক্তির পর্যালোচনার পরিধি ও গভীরতা যত বেশী, ততই বৈচিত্র্যসন্ধানী। তাহারা পাঠকের মনে দূরপরিক্রমায় যত প্রেরণা জাগায়, যত নূতন বিষয়ের ইঙ্গিত উন্মোচন করে, নিশ্চিন্ত সিদ্ধান্তে ততটা বাঁধে না। তাই আমরা নিখিলের গোটা মনটা যত বিস্তারিত আয়তনে উপলব্ধি করি, ঠিক সেই পরিমাণে উহার বিশেষ ক্রান্তিক্ষণগুলিতে আকৃষ্ট হই না। উহার মানস দিগন্তে সমস্যামেঘের ঘটা যতটা পুঞ্জীভূত, বিদ্যুৎচমকের ততটা উদ্ভাসন দেখি না। তাহার আত্মবিশ্লেষণ ও ভাষণ বহু বিচিত্র পথে ব্যাপ্ত হয়, কোন আগ্নেয় সন্ধিক্ষণে জ্বলিয়া উঠে না। দর্শনতত্ত্ব যতটা মনের কৌতূহল জাগায়, ততটা সিদ্ধান্ত-প্রতিষ্ঠার অমোঘতায় স্মৃতিতে উৎকীর্ণ হয় না। দার্শনিকগোষ্ঠীর রচনা সাধারণতঃ স্মরণীয় সুভাষিত-তীক্ষ্ণতায় চেতনাকে বিদ্ধ করে না।

এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হইল তর্কযুদ্ধের উত্তেজনা। ঘাত-

প্রতিঘাতের অস্ত্রবিনিময়ে দার্শনিকের ধীর প্রকৃতি সময় সময় উত্তপ্ত হইয়া ওঠে ও তাহাদের যুক্তিসমাবেশের নিবিড়তা হঠাৎ অগ্নিময় দীপ্তি বিকিরণ করে। নিখিলের আদর্শবাদের মধ্যে যে আবেগ সত্যনিষ্ঠার সহায়ক-শক্তিরূপে ক্রিয়াশীল, যে অস্বীকৃত ক্ষোভ তাহার কণ্ঠে বাষ্পাকুল, তাহাই সময় সময় ভাষণে সুগভীর প্রত্যয়ের স্বর ফোটায়। এই উত্তেজনাই তাহার যুক্তিপ্রধান উক্তিগুলিকে আবেগমূর্ছনা ও ছন্দোময় স্মরণীয়তার পর্যায়ে উন্নীত করিয়াছে। সন্দীপের সহিত তর্কযুদ্ধে তাহার শান্তিবাদী মন কখনও কখনও যুদ্ধোন্মাদনায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার অস্ত্রক্ষেপ-নৈপুণ্য কিন্তু প্রায়শ পরোক্ষবিবৃতিরূপে উপন্যাসে প্রকটিত। হয় বিমলা, না হয় সন্দীপ এই যুদ্ধের সংবাদদাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছে। পরোক্ষবিবৃতিই যুদ্ধকালীন উত্তেজনাকে কিছুটা প্রশমিত করিয়া, সংগ্রামের আবহাওয়া হইতে বক্তাকে কতকটা সরাইয়া আনিয়া, নিখিলের উদার, নিরাসক্ত স্বভাবের সহিত উক্তিগুলির সঙ্গতি রক্ষা করিয়াছে।

নিখিলের ভাবোদ্দীপ্ত, স্মরণযোগ্য কতকগুলি উক্তি এখানে সঙ্কলিত হইল। সন্দীপের ব্যঙ্গবাণে আহত হইয়া নিখিলেশ একটি সমান তীক্ষ্ণ প্রত্যুত্তর দিয়াছে। 'হাঁ, ডিমের ভিতরকার পাখি যেমন তার ডিমের খোলাটাকে লোকসান করার জন্যে মরিয়া হয়ে ওঠে। খোলাটা খুব বাস্তব জিনিস বটে, তার বদলে সে পায় হাওয়া, পায় আলো—তোমাদের মতে সে বোধ হয় ঠকে।' (ঐ পৃ ৪৩৩)। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে এই উক্তিটি পরিবেশিত হইয়াছে তাহার প্রতিপক্ষ সন্দীপের মুখে, নিখিলের নিজের শ্লেষদিগ্ধ কণ্ঠস্বরে নয়। রণক্ষেত্রের উত্তেজনা তখন অনেকটা শান্ত হইয়া আসিয়াছে। এ যেন দুর্যোধনের মুখে অর্জুনের অভ্রান্ত লক্ষ্যবেধের তারিফ।

নিখিলের সঙ্গে সন্দীপের দ্বিতীয় তর্কযুদ্ধ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির আলোচনা-মূলক। এখানে নিখিল নিবৃত্তির পক্ষাবলম্বী; সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই ইহার মধ্যে যতটা নীতিসমর্থন আছে, ততটা চমকজাগান মননমৌলিকতা নাই। সত্য যাহার দিকেই থাকুক, ঔজ্জ্বল্যটা সন্দীপের দিকেই। সুতরাং নিখিলের বুদ্ধিশিক্ষা ও ভাষণতীক্ষ্ণতা এখানে অভ্যস্ত নীতিবাদের নির্মোকে আবৃত। এই তর্কে নিখিলের বুদ্ধিদীপ্তি অপেক্ষা অবরুদ্ধ বেদনা-বোধই বেশী অনুভূত হইয়াছে। অস্ত্রাঘাতের নির্মমতা অকস্মাৎ অশ্রুজলের আভাসে করুণ হইয়া কোমল হইয়াছে।

আর্টসম্বন্ধীয় তৃতীয় তর্কযুদ্ধও বিমলার জবানিতে আমাদের নিকট জনশ্রুতির মত ক্ষীণ, নৈর্ব্যক্তিক প্রতিধ্বনিরূপে পৌছিয়াছে। বিমলা ইহার মধ্যে স্বামীর একটি অনভ্যস্ত আঘাতস্পৃহা লক্ষ্য করিয়া তাহার প্রচ্ছন্ন বেদনার পরিচয় পাইয়াছে।

নিখিলেশের স্বগতভাষণের মধ্যে অনুচ্চারিত চিন্তা তীক্ষ্ণ আক্রমণের ঝাঁঝে মনের গুহা হইতে নিঃসৃত হইয়াছে। সে বিমলার স্বভাব-অনুধাবন-উপলক্ষ্যে তাহার প্রতি সঞ্চিত তিক্ততার একটি ঝলক হঠাৎ প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে। তাহার আভিজাত্যবোধ ও নিম্নশ্রেণীর দরিদ্রদের প্রতি ঔদাসীন্যের উৎস সন্ধান করিতে গিয়া বিমলার সম্বন্ধে প্রশ্রয়ে স্নিগ্ধ ও সত্য-নিষ্ঠায় তীক্ষ্ণসন্ধানী একটি মন্তব্য করিয়াছে—'সে ভগবান মনুর দৌহিত্রী বটে' (ঐ পৃ ৪৬৭)। কথাটা ভূতপূর্ব প্রেয়সী-সম্বন্ধে মর্মান্তিক। কয়েক দিনের অন্তর্দ্বন্দ্বে, বিমলার সহিত স্বভাববৈষম্যের হেতু-বিশ্লেষণে তাহার পূর্বের মোহ কতখানি কাটিয়া গিয়াছে, সত্যবোধ আদর্শ স্বপ্নের সুষমা কতটা টুটাইয়া দিয়াছে তাহা এই একটি বাক্যে আশ্চযভাবে প্রকট।

স্বদেশী আন্দোলনের নীতিহীনতা ও জোরজবরদস্তির আত্মঘাতী কাপুরুষতা-সম্বন্ধে সন্দীপ ও নিখিলের তর্ক আবার বিমলার মারফত প্রতিবেদিত (reported) হইয়াছে। এখানেও যুক্তি ও সত্যনিষ্ঠা নিখিলেশের পক্ষে, কিন্তু আদর্শকল্পনার রমণীয়তা ও দেশব্যাপী ভাবোন্মত্তার নিকট অসম্ভবের অচিরসিদ্ধির আশ্বাস সন্দীপেরই জনপ্রিয়তা ঘোষণা করে। মাস্টারমশায়ের সন্দীপের স্বরূপ সম্বন্ধে অন্তর্ভেদী মন্তব্যটি (ঐ পৃ ৪৮০) তাঁহার ও নিখিলেশের যৌথ রচনা। মহাভারত-রচনায় বেদব্যাস ও গণেশের একাত্ম সহযোগিতার মত এটি দুইজন আদর্শবাদীর স্বচ্ছদৃষ্টির একটি চিরন্তন মর্মরস্তম্ভের মত—উভয়েরই স্বাক্ষরে চিহ্নিত। বাস্তববাদী সন্দীপও এই প্রশস্তির যোগ্য প্রত্যুত্তর দিয়াছে তাহার নিখিলেশের সূক্ষ্ম চরিত্রায়নে (ঐ পৃ ৪৯১)। এই দুইটি উক্তি-প্রত্যুক্তি বিপরীত মেরুতে অধিষ্ঠিত উৎকট বস্তু-উপাসক ও অবিমিশ্র আদর্শসাধকের মধ্যে একটা সাধারণ প্রতিষ্ঠা-ভূমি আবিষ্কার করিয়াছে ও মিলনের এক অদৃশ্য সূত্রের সন্ধান দিয়াছে। অমাবস্যার চাঁদ ও অবাস্তবের শিবভক্ত ভাবরাজ্যের কোন্ অজানা সীমারেখায় পাশাপাশি দাঁড়াইয়াছে।

উপন্যাসবর্ণিত সংঘাতময় সংযোগের ফলে বিপরীতকোটিস্থিত দুইটি

চরিত্রই পরস্পর-প্রভাবিত হইয়াছে। নিখিলেশের কঠিন দুঃখমূল্যে ক্রীত বাস্তবচেতনা অন্ততঃ বিমলার অন্তঃপ্রকৃতি বোঝার পক্ষে নব দৃষ্টির উন্মীলন করিয়াছে। আর সন্দীপের ভোগলিপ্সার নিরেট লৌহবাসরের কোন্ এক অলক্ষিত রন্ধ্র দিয়া তাহার চিত্তে আদর্শনাগিনী 'কিন্তু'-র সূক্ষ্ম-সূত্রাকারে প্রবেশ করিয় উহার জীবনে বিবেকদংশনের জ্বালা ধরাইয়াছে।

নিখিলেশের প্রকৃত মনন-ঐশ্বর্য ব্যক্ত হইয়াছে ঘাত-প্রতিঘাতের অগ্নিগর্ভ ভাষণের সূচিমুখে নয়, নিবিড় আত্ম-সমীক্ষায়, হৃদয়বিশ্লেষণের ব্যাপ্তি ও অন্তর্ভেদিতায়, আর প্রকৃতিচেতনার সহিত ব্যক্তিমানসের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবসম্পর্কের অনুভবে। বিমলার সহিত তাহার দাম্পত্য জীবনের স্বল্প-কালীন ইতিহাসটি বস্তুতন্ত্রতার বেষ্টনী ছাড়াইয়া স্মৃতি, দার্শনিক মনন, আক্ষেপানুরাগ ও আদর্শসন্ধানের মুগ্ধ ভাবপরিমণ্ডলে বিধৃত হইয়া নূতন প্রদীপ্ত চেতনার সঞ্চার করিয়াছে। প্রণয়রাজ্যের কোণে কোণে, ঘটনা-রিক্ততার ফাঁক পূর্ণ করিয়া, অনেক দীর্ঘশ্বাস, প্রচুর প্রজ্ঞা, সুকুমার হৃদয়বৃত্তির মৃদু, অস্ফুট গুঞ্জন স্তব্ধ হইয়া আছে। উহার বস্তুপরিচয় এক অধ্যাত্ম সত্তার সৌরভে ঘন-পরিব্যাপ্ত ও গোত্রান্তরিত। নিখিলেশের আত্মকথার মধ্যে ইহারই দ্যোতনা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। সে বিমলার, সন্দীপের ও নিজের ব্যক্তিস্বভাব সম্বন্ধে যেসব নূতন দিক্ আবিষ্কার করিয়াছে তাহা সবই এই দার্শনিক প্রজ্ঞায় উদ্ভাসিত। বিমলার যে তাহার পত্নী-সম্পর্কের ঊর্ধ্বে এক লৌকিকবন্ধনহীন নারী-প্রকৃতি আছে ও তাহাই যে তাহার সম্বন্ধে চরম সত্য, সন্দীপের ইন্দ্রজালশক্তি সত্ত্বেও সে যে মানব হিসাবে নিখিলেশের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নয়, বিমলার প্রতি উৎসর্গিত তাহার সমস্ত প্রেম-সাধনা যে শাশ্বত প্রেয়সীর উদ্দেশ্যে নিবেদিত, সুতরাং সার্থক—এইসমস্ত বোধই তাহার দার্শনিক চেতনাপ্রসূত। আর ভাদ্রের বন্যায় ভরাপ্রকৃতি-সৌন্দর্যের পটভূমিকাতেই তাহার অন্তরমন্দিরের শূন্যতা ও এই শূন্যতাকে চিরসুন্দরের আবাহন দ্বারা পূর্ণ করার সাধনা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। তাহার মুক্তির আবেগ ও কর্মসাধনার উদ্যম হেমন্তমধ্যাহ্নের নির্মল রৌদ্রে উদ্ভাসিত বিশ্ব-প্রকৃতির নিরুদ্বেগ শান্তির মধ্যেই, বৃহৎ জগতের সহিত আত্মীয়তাবোধ ও নিজ অস্তিত্বের প্রসারিত মহিমা সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছে। এই বোধই তাহাকে বিশ্বব্যাপী তামসিকতাকে আত্মার সমস্ত শক্তি দিয়া প্রতিরোধের প্রেরণা যোগাইয়াছে। গভীর শ্রান্তি ও অবসাদের বিষণ্ণক্ষণে সন্ধ্যাগোধূলি

যখন ঘনীভূত হইয়া সমস্ত দৃশ্যমান জগৎকে আড়াল করে, তখন কাজের বহুমুখী বিক্ষেপ যে মানুষের নিগূঢ়তম আকৃতি মিটাইতে পারে না, তখন সে যে তাহার সমস্ত ছড়ান সত্তা গুটাইয়া আনিয়া একের নিকট আত্মনিবেদনে উৎসুক হইয়া উঠে—এই অধ্যাত্ম সত্যটিও প্রকৃতির সূক্ষ্ম শুশ্রূষায় তাহার বিক্ষুব্ধ চিত্তের গভীরে সঞ্চারিত হইয়াছে। অমৃতে অভিষিক্ত হওয়ার দেবদত্ত অধিকারলোপের আশঙ্কাই প্রকৃতির ইঙ্গিত অনুসরণে নিখিলেশের বেদনাক্ষুব্ধ চিত্তে হাহাকারগুঞ্জন তুলিয়াছে। প্রেয়সীর আশ্রয়-বঞ্চিত নিখিলেশ পুষ্প-পরিচর্যায় সেই বঞ্চিত হৃদয়ের আর্তি-সান্ত্বনার এক বিকল্প উপায় খুঁজিয়া পাইয়াছে।

দার্শনিক প্রত্যয় কিন্তু অশান্তিক্ষুব্ধ চিত্তে স্থায়ী হয় না। নিখিলেশের জীবনচেতনা দার্শনিক প্রশান্তিকে ক্ষণে ক্ষণে স্পর্শ করিয়াছে, কিন্তু এই সুদৃঢ় গিরিশৃঙ্গে সে স্থির আশ্রয় পায় নাই। তাহার মনে নব নব অনুভূতির দ্বার মাঝে মাঝে খুলিয়া গিয়াছে, কিন্তু দার্শনিক ধ্যানকক্ষের চাবি তাহার কোন দিনই আয়ত্ত হয় নাই। তাহার আত্মার উত্তরণ প্রক্রিয়া অসম্পূর্ণই রহিয়া গিয়াছে। সে মুহুর্মুহু নূতন সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু উপন্যাসের প্রতি দৃশ্যেই যে সংশয়ক্লিষ্ট মনের পরিচয় দিয়াছে। দার্শনিকের সত্যসন্ধানের ন্যায়, এমন কি স্রষ্টার ইচ্ছানিহিত সৃষ্টির পূর্ণতাবিধানের ন্যায় নিখিলেশেরও জীবনদর্শন সাধনার বিভিন্ন পর্যায়ে আবর্তিত হইয়াছে, পরম সিদ্ধির স্বর্ণচূড়ায় স্থির আশ্রয় পায় নাই। সে বরাবরই পাখা মেলিয়াছে। কোন চির-ঈপ্সিত শান্তির নীড়ে ডানা গুটাইতে পারে নাই। চির পথপরিক্রমাই আদর্শবাদী দার্শনিকের বিধিলিপি।

পথিকরূপেই জীবনমহিমার কিছু কিছু আস্বাদন সে লাভ করিয়াছে। এক গভীর নিশীথে, যখন অসংখ্য তারা আকাশের নীরবতার মধ্যে ব্যথার অনির্বাণ দীপালি জ্বালাইয়াছে, যখন সমগ্র নিখিলের মর্মোৎসারিত বেদনা-ধারা এক অজ্ঞাত বিধাতাপুরুষের সিংহাসনতলে উর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত হইতেছে, সেই আরতিলগ্নে বিমলার দুঃখ এই নিখিলপ্রবহমাণ দুঃখস্রোতের বিন্দুরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। সে উহার অনন্যমেয় ব্যাপ্তি ও গভীরতার উপলব্ধিতে বিচারের স্পর্ধা প্রত্যাহার করিয়াছে ও অবাক্ বিস্ময়ে উহার দিকে বিনম্র দৃষ্টি মেলিয়াছে। মেজোরানীর স্নেহগভীরতার পরিচয়ও তাহার আর একটি বিস্মিত উপলব্ধি। সর্বশেষে বিমলার মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন কল্যাণশক্তি বিদ্যমান

অমূল্যর ক্ষেত্রে তাহার চাক্ষুষ প্রমাণ পাইয়া সে আর একবার জানার মধ্যে অজানার, পরিচিতের মধ্যে অপরিচয়ের, সত্তার অন্তরালশায়ী সুপ্ত সম্ভাবনার চমকিত আভাস-রোমাঞ্চ অনুভব করিয়াছে। এই পাথেয়কণাগুলিই অচেতন মুষ্টিতে সংগ্রহ করিয়া সে হয় নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা না হয় নূতন জীবনের প্রেরণা আহরণ করিয়াছে। ভাষণের হীরক-দ্যুতি নয়, সিদ্ধির নিশ্চিত আশ্বাস নয়, সমীক্ষার প্রজ্ঞাভাস্বর সঞ্চয় ও অনুসন্ধানের নিবিড় একাগ্রতাই তাহার অস্তিত্বের যথার্থ অভিজ্ঞান।

কামারশালায় যেমন হাতুড়িপেটার ফলস্বরূপ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, সন্দীপের অন্তরের লালসাতপ্ত বহ্নিকুণ্ড হইতে দীপ্ত ভাষণচ্ছটা সেইরূপ প্রচুর বিকীর্ণ হইয়াছে। সন্দীপের মন সর্বদা অতৃপ্ত দুরাকাঙ্ক্ষার নিঃসরণে উত্তপ্ত। তাহার উপর ঘটনার সংঘাত তাহার এই মানস উত্তাপকে সর্বদা ইন্ধন-সংযোগে শিখা-দহনপরিণতি দিয়াছে। তাহার ভিতর ও বাহির একযোগে তাহাকে বাষ্পায়িত ও ভাষাকে তীক্ষ্ণ ঔজ্জ্বল্যে ও অন্তর্ভেদী উক্তিতে চমকপ্রদ করিয়াছে। তাহার উক্তি হইতেই একটি সুভাষিত-সংকলনের উপাদান সহজেই সংগৃহীত হইতে পারে। তাহার অগ্নিস্রাবী বাগ্মিতা অন্তঃপ্রেরণার অবিচল দৃঢ়তাপ্রসূত ও বিমলার মুগ্ধ উচ্ছ্বাসে উহার কুহকশক্তি প্রমাণিত। যে ষোল আনা মন দিয়া চাহে, সে তাহার দুর্বার আকাঙ্ক্ষার উপযোগী অধিকারবোধও সহজে আয়ত্ত করে। অর্থ ও বাণীর ন্যায় তাহারা নিত্যসম্বন্ধযুক্ত। ইহার উপর তাহার পরিবর্তনশীল চিত্তের নব নব প্রেরণা প্রকাশশক্তিকে নব নব পরীক্ষার সম্মুখীন করিয়াছে। সন্দীপের আশ্চর্য বাগ্‌বিভূতি তাহার চরিত্রের অভিব্যক্তি ও অভিজ্ঞতার প্রতিক্রিয়া হইতে একটি ঋজু হীরককঠিন ও হীরকের ন্যায় দ্যুতিময় বিকিরণ। সে সহজেই উপন্যাসমধ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অতুলনীয় ব্যক্তিসত্তারূপে স্থান অধিকার করিয়াছে। মোগলসম্রাট আরংজেব যেমন নির্মমভাবে তাঁহার উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সরলতম ও সংক্ষিপ্ততম পথ অবলম্বন করিয়াছেন, তেমনি সন্দীপও নিজ প্রচণ্ড ইচ্ছাপূরণের জন্য কঠিন ও কোমল, বিনীত ও গর্বিত যে কোন উপায় সর্বাপেক্ষা নিশ্চিতফলপ্রসূ তাহার অনুসরণে কোন কুণ্ঠা অনুভব করে নাই। তাহার এই বিচিত্র প্রবল আবেগের নানামুখী তৃপ্তির অনিবার্য তাগিদে সে যে বিবিধতন্ত্রীবিশিষ্ট ভাষাশিল্পের উপর সর্বাত্মক অধিকার অর্জন করিবে তাহা স্বাভাবিক। কখনও রূঢ় বাস্তব সত্য, কখনও যুক্তিশৃঙ্খলে দৃঢ়বদ্ধ জীবনদর্শন,

কখনও দুঃসাহসে নির্লজ্জ লোলুপতা, কখনও বা হঠাৎ উৎসারিত কাব্যসৌন্দর্য-ধারায় অভিস্নাত কামনা-প্রশস্তি—এইসব সুরই তাহার কণ্ঠ হইতে অনায়াস-নিঃসৃত হইয়াছে। সে যে মোহসৃষ্টির সব কয়েকটি উপকরণ প্রয়োগেই সিদ্ধহস্ত তাহাই প্রমাণিত। মানবপ্রবৃত্তির শতশীর্ষ সর্পফণার উপর যে সে সমান নৃত্যচ্ছন্দে চরণক্ষেপপটু, ও বাঁশী বাজাইয়া সকল বিষধরকেই মুগ্ধ করিতে পারে তাহা সন্দীপের আচরণে ও বাক্‌বৈদগ্ধ্যে সুপরিস্ফুট।

সন্দীপের প্রথম স্বগত ভাষণ তাহার বৈপ্লবিক জীবনদর্শনের তত্ত্বপ্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত। যে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সহিত সে তাহার মতবাদ ব্যাখ্যা করিয়াছে তাহাতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে এই জীবননীতি বহুপরীক্ষিত ও বাস্তববোধসমর্থিত একটি চরম সত্যের বদ্ধমূলতায় অধিষ্ঠিত। ইহারই মানদণ্ডে তাহার সমস্ত জীবনব্যাপার, ব্যক্তি ও সমাজের বিচিত্র সম্পর্ক ও প্রয়োজন সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত। ইহার মধ্যে কোন নিপাতন-সিদ্ধ ব্যতিক্রমের স্থান নাই। এই নীতির বিরাট্ চক্রে দেশাত্মবোধ ও পরনারী-প্রেম, দেশনেতার আরাম-সচ্ছলতা ও লোভ, অহংকেন্দ্রিকতা ও জনকল্যাণ, ত্যাগ ও ভোগ, আদর্শপ্রচার ও দস্যুতার অবিরোধী সহাবস্থান অতিসহজ, ও দ্বন্দ্বনিরসন-নিরপেক্ষ। এই জীবনদর্শনের প্রতি স্থির আনুগত্য তাহার ব্যক্তি ও ঘটনার মূল্যায়নে এক অপ্রমত্ত বিচারবুদ্ধি, এক অন্তর্ভেদী তীক্ষ্ণদৃষ্টি যোগাইয়াছে। আতিথেয়তার আদর্শের অপহ্নব বিষয়ে স্বেচ্ছাবৃত অন্ধতা বা অনবধান, বিমলার হৃদয়-আলোড়নের সূক্ষ্মতম কম্পনরেখা, তাহার প্রসাধনের অন্তরালে অবদমিত কামনাশিখার ঈষৎ রক্তিম আভাসন সবই সন্দীপের এই নীতির জালে আবদ্ধ ও উহারই ফাঁকে ফাঁকে ইঙ্গিতময়। তর্কে সন্দীপের মানস দীপ্তি ছটা বিকীর্ণ করে বলিয়া সন্দীপের সম্মোহন-যজ্ঞের ইহা একটি প্রধান উপকরণ। তাহার মানব-চরিত্রাভিজ্ঞতা বিমলার ক্রমবর্ধমান মোহ ও এই মোহের অনিবার্য পরিণতি সম্বন্ধে তাহার অন্তর্দৃষ্টিকে অসামান্য তীক্ষ্ণতা দিয়াছে। মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম জ্ঞান তাহাকে সচেতন প্রয়াস ও আত্মস্বভাবপ্রবর্তিত বীজপরিণতির অমোঘতা সম্বন্ধে নির্ভুলভাবে সজাগ করিয়াছে। আধুনিকতম মনোবিজ্ঞানের সহিত সুপ্রাচীন অনুরাগ-উদ্দীপনের আলঙ্কারিক পদ্ধতির সমন্বয়সাধনে সে সমানভাবে প্রস্তুত।

বিমলার প্রতি আসক্তি-আবেশচর্চার নব অভিজ্ঞতার উন্মাদনায় সে

নিজের জীবননীতির পূর্বাদর্শকে পুনর্বিচার করিয়াছে। কোথাও বাধা পাইলে সেই বাধার স্বরূপনির্ণয় ও মানস-প্রতিক্রিয়া, তাহার মধ্যে নূতন ভাবচেতনার উন্মেষ—এইসব বাস্তব পরিস্থিতিপ্রসূত বোধগুলির উন্মোচনকে সে যথাযথ গুরুত্ব দিয়াছে ও ইহাদের অনিশ্চিত ঝিলিকে তাহার ব্যক্তিসত্তার নূতন পরিচয়ের জন্য সে মনকে প্রস্তুত করিয়াছে। সে তাহার প্রকৃতিকে যতটা একমুখী বলিয়া ভাবিয়াছিল, হঠাৎ আবিষ্কার করিল যে উহা ততটা ছাঁচে ঢালা, আইডিয়া-নিয়ন্ত্রিত নয়। তাহার মধ্যেও কোন্ অভাবিত অন্তর্দ্বন্দ্বের সঙ্কোচ ও বেদনা কোন্ গভীরে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া তাহার ঝটিকাবেগ অগ্রগতিকে পিছন দিকে টানে। তাহার এমনও সন্দেহ হয় যে ভারতের যে সনাতন আদর্শসংস্কার নিখিলেশের মধ্যে মূর্ত হইয়াছে তাহাই তাহার অবচেতন মনে বীজাকারে প্রসুপ্ত থাকিতে পারে। এইভাবে সে সর্বদাই নূতন সাক্ষ্যপ্রমাণ লইয়া নিজ অন্তর্লোক সম্বন্ধে মুক্ত মনের পরিচয় দিয়াছে। এই অন্তর্দ্বন্দ্বের সূচনা-অধ্যায়ে তাহার উক্তিগুলি প্রাসঙ্গিক তাৎপর্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে।

"এযে জালের মতো, সূত্র বরাবর চলেছে। কিন্তু সূত্র যতখানি ফাঁক তার চেয়ে বেশি বৈ কম নয়। এই ফাঁকাটার সঙ্গে লড়াই করে একে সম্পূর্ণ হার মানানো গেল না" (পৃ ৪৬১)।

"নিঃসঙ্কোচ বলের সঙ্গে নিশ্চিতপ্রায়কে এক নিমেষে নিশ্চিত হয়ে উঠতে দিই নি (পৃ ৪৩২)।

"ইন্দ্রদেব এই তপস্যাকে সহজ করতে দিলেন না। তিনি কোথা থেকে বেদনার অপ্সরীকে পাঠিয়ে দিয়ে সাধকের দৃষ্টিকে বাষ্পজালে অস্পষ্ট করে দেন" (পৃ ৪৬২)

"যে পশ্চিমের ঝড়ে আমার স্বদেশলক্ষীর মুখের উপর থেকে ন্যায়-অন্যায়ের ঘোমটা উড়ে গেছে সেই ঝড়েই বিমলার মুখে বধূর ঘোমটা খুলবে" (পৃ ৪৬৩)।

"আমাদের যখন বিধাতা তৈরী করছিলেন তখন ছিলেন তিনি ইস্কুল-মাস্টার, তখন তাঁর ঝুলিতে কেবল পুঁথি আর তত্ত্ব, আর ওদের বেলা তিনি মাস্টারিতে জবাব দিয়ে হয়ে উঠেছেন আর্টিস্ট; তখন তুলি আর রঙের বাক্স" (পৃ ৪৮৪)।

"বুঝতে পারলুম জীবনের স্রোতঃপথের গভীরতম তলাটা বহুকালের

গতি দিয়ে তৈরী হয়ে গেছে। ইচ্ছার বন্যা যখন প্রবল হয়ে বয় তখন সেই তলার পথটা কোথাও বা ভাঙে, আবার কোথাও বা এসে ঠেকে যায়" (পৃ ৪৮৫)।

"ধূমকেতু তো পাশ দিয়ে সোঁ করে চলে গেল। কিন্তু তার আগুনের পুচ্ছের ধাক্কায় ওর মনপ্রাণ কিছুক্ষণের জন্য যেন মূছিত হয়ে পড়ল" (পৃ ৪৮৫)।

"তারা তাদের সমস্ত সুখের হীরে এবং দুঃখের মুক্তো আমাদের রাজকোষে জমা করে দিতে গিয়েই তবে তার সন্ধান পেয়েছে" (পৃ ৪৮৮)।

"ও গরিব হলে ওকে কিছুতেই বেমানান হত না। তা হলে ও অনায়াসে অকিঞ্চনতার স্যাকরা গাড়িতে ওর চন্দ্রমাষ্টারের জুড়ি হতে পারত (পৃ ৮৮৯)।

"এখনই যেটা দরকার সেটাতে যারা মন দিতে পারে নি, যারা অন্যকালের বাঁশি শুনছে তারা বিরহিনী শকুন্তলার মতো; কাছের অতিথির হাঁক তারা শুনতে পায় না। সেই শাপে দূরের যে অতিথিকে তারা মুগ্ধ হয়ে কামনা করে তাকে হারায়। যারা কামনার তপস্বী তাদেরই জন্যে মোহমুদ্গর" (পৃ ৪৯০)।

৪৯৩ পৃষ্ঠায়, বিমলার দেশলক্ষ্মীরূপে কল্পনা, দেশের ভৌগোলিক বৈচিত্র্যের সহিত তাহার একাত্মতার প্রশস্তি-রচনা সন্দীপের কবিজনোচিত প্রতিমারূপসৃষ্টির আশ্চর্য নিদর্শন। যে সন্দীপ বুদ্ধিসর্বস্ব, স্থূলভোগাসক্ত, সুকুমার বৃত্তির একান্ত বিরোধী, আদর্শবাদের প্রতি ব্যঙ্গপরায়ণ তাহার বিচিত্র, মিশ্র স্বভাবের মধ্যে এরূপ নির্মল কাব্যনির্ঝরের অস্তিত্ব সন্দীপ-চরিত্রেও একাধিকবার প্রকটিত হইয়াছে। মনে হয় রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসত্তার অনেকগুলি ধারা সন্দীপের চরিত্রজটিলতায় মিশিয়াছে। সে সমগ্রভাবে না হউক, আংশিক ভাবে, কোন কোন ক্ষণিক মেজাজের প্রতিফলনে তাহার স্রষ্টার প্রতিনিধি।

মোহাবেশের ক্রান্তিলগ্নের পর সন্দীপের ছদ্মরাজবেশ ক্রমশঃ খুলিতে আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু এই মোহভঙ্গের উপেক্ষা ও অবজ্ঞার মধ্যেও সন্দীপের দীপ্ত ব্যক্তিত্ব তাহার ভাষণের অমোঘ আত্মপ্রকাশের ভিতর দিয়া বারবার জ্বলিয়া উঠিয়াছে। যেমন মেকি ও খাঁটি টাকার মধ্যে পার্থক্য বোঝা যায় উহার নিক্কণের সুরবিভিন্নতায়, তেমনি অন্তরাত্মার সত্য পরিচয় ফুটিয়া উঠে প্রকাশের আন্তরিকতায় ও অনুরণনগভীরতায়। বিচার-বিশ্লেষণ-বিবৃতির সাহায্যে হয়ত সত্তার একটা মোটামুটি প্রকৃতি নির্ণয় করা যায়। কিন্তু যে

মূল উৎস হইতে উহার অনন্যতার উদ্ভব, তাহা কেবল কথার কষ্টিপাথরে অব্যবহিত স্বাক্ষর মুদ্রিত করে। সন্দীপের জটিল চরিত্রটি উহার সমস্ত স্ববিরোধসহ তাহার বাগ্‌ভঙ্গীর প্রতিটি উচ্চারণে, বিন্যাসরেখার প্রতিটি বঙ্কিম ছন্দে, মননের ও আবেগের প্রতি তরঙ্গোৎক্ষেপে নিজ মর্মসত্তার সন্ধান দিয়াছে। সাহিত্যজগতে মুষ্টিমেয় বিরল চরিত্রই স্রষ্টার অন্তর্দৃষ্টির আনুকূল্যে নিজ সংলাপের মাধ্যমেই অন্তঃপ্রকৃতির সমস্ত দলগুলি উন্মোচন করে। এখানেও সন্দীপ 'ঐকস্ত'-উপগ্রহের বাঁকা আলোকসম্পাতে অমাবস্যাচাঁদের সার্বিক অদৃশ্যতা হইতে অন্ততঃ ভাদ্রচতুর্থীর নষ্ট-চাঁদের কলঙ্কমলিন খণ্ডবিম্বের আংশিক প্রত্যক্ষতায় উত্তীর্ণ হইয়াছে।

উপন্যাসের মানবহৃদয়মন্থনের সর্বগ্রাসী চেতনাজগতে প্রকৃতির স্নিগ্ধ পরিচর্যার বিশেষ কোন উপলক্ষ্য ঘটে নাই। বিমলা ও সন্দীপ উভয়ের কাহারও ক্ষেত্রে অন্তরসমস্যার একাধিপত্যের মধ্যে প্রকৃতিবোধের সূক্ষ্ম আবেদনটি সঞ্চারিত হয় নাই। মানবিক দ্বন্দ্বে আকণ্ঠমগ্ন এই চরিত্র দুইটির অন্তরে বহিঃপ্রকৃতির প্রতি কোন স্বভাবদাক্ষিণ্য ছিল না। বিমলার যে ভাবসৌকুমার্য তাহা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়বৃত্তির অনুবর্তী। তাহার আবেগময় স্মৃতিচারণা পলাতক প্রেমের সমাধিক্ষেত্রে গুঞ্জন করিয়া ফিরিয়াছে—সে ফুল বা ছবি বা প্রকৃতির সহযোগিতাকে প্রেমের তাম্বুলকরঙ্কবাহী অনুচরত্বে নিয়োজিত করিয়াছে। সন্দীপের স্থূল, আত্মতৃপ্ত, কর্মচক্রঘূর্ণিত জীবনচর্যায় প্রকৃতিরূপবিলাসের সূচ্যগ্রপরিমিত রন্ধ্রও অবশিষ্ট ছিল না। এমন কি প্রণয়কলাচর্চাতে আবিষ্ট থাকিয়াও সে নিশ্চল অশ্বারোহীর মত অস্বস্তি অনুভব করিয়াছে—তাহার দুর্দান্ত বিজিগীষা মানস মদিরতার মুহূর্তেও ক্ষণাবিরতির সম্ভাবনাতে অধীর হইয়াছে। এক নিখিলেশের দার্শনিক নির্লিপ্ততা একদিকে যেমন সূক্ষ্ম আত্মবিচার ও তত্ত্বনির্ণয়ের, অপর দিকে তেমনি প্রকৃতিরোমাঞ্চ-অনুভবের কিঞ্চিৎ অবসর পাইয়াছে। তাহার কয়েকটি ভাবঘন অনুভূতি প্রকৃতির সহিত একাত্মতাবোধের ব্যঞ্জনায় ঊর্ধ্বলোকে উত্তীর্ণ হইয়াছে। কিন্তু তাহারও প্রকৃতিমুগ্ধতা সহজ সংস্কার নয়, দার্শনিকতার বহুব্যাপ্ত জালে বন্দীকৃত ক্ষণোন্মেষিত ভাবকল্পনারই প্রকাশ। রবীন্দ্র-রূপসৃষ্টিতে প্রকৃতির এই একান্ত গৌণ ভূমিকা তাঁহার শিল্পী স্বভাবের বিরল ব্যতিক্রম—উপন্যাসের চরিত্র ও ঘটনার নির্মম প্রয়োজনের নিকট কাব্যমুগ্ধতার নতিস্বীকার।

বিংশ অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প—তৃতীয় পর্যায়

(১৮৯৮—১৯১৪, ১৩০৫—১৩২১)

১

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পধারায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের মধ্যে আড়াই বৎসরের একটি ক্ষুদ্র ছেদ আছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রথম গল্প 'ইচ্ছাপূরণ'-এর প্রকাশকাল আশ্বিন ১৩০১, আর তৃতীয় পর্যায়ের প্রথম গল্প 'দুরাশা' প্রকাশিত হইয়াছে, বৈশাখ, ১৩০৫-এ। এই স্বল্পব্যবধানের অন্তরালেই কিন্তু লেখকের জীবনদৃষ্টির একটা তাৎপর্যময় পরিবর্তনের অনুভব করা যায়।

মনে হয় এই তিন বৎসরের মধ্যেই লেখক জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত রসরূপ অপেক্ষা উহাকে পরোক্ষ তত্ত্বদর্শনের উপলক্ষ্যরূপে প্রয়োগ করিতে বেশী মনোযোগী হইয়াছেন। জীবনের যে পরিচয় এই স্তরের ছোটগল্পে উপস্থাপিত হইয়াছে তাহা লেখকের পরিহাসরসিকতা, সৌন্দর্যমুগ্ধতা বা বিশেষ পরিস্থিতি-উদ্ভূত মনস্তাত্ত্বিক সমস্যাকেই বেশী আশ্রয় করিয়াছে। মানব-জীবনের অব্যবহিত অভিজ্ঞতা-আস্বাদন অপেক্ষা উহার উপজাত ফলের দিকেই গল্পকার বেশী পক্ষপাত দেখাইয়াছেন। মৃত্তিকার রস যেন এখানে একটু ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে—প্রত্যক্ষতায় যেটুকু ঘাটতি প'ড়িয়াছে লিপিকুশলতা, মনন ও আরোপিত রূপসৃষ্টির দ্বারা তাহার ক্ষতিপূরণ হইয়াছে। জীবনের রূপকার এখন উহার সমীক্ষক, ব্যাখ্যাতা বা সৌন্দর্যসচেতন শিল্পীরূপেই প্রতিভাত হইবার অভিলাষ পোষণ করিতেছেন। কাহিনী এখন জীবনরসিকতার পরিচয় নয়, জীবনশিল্পীর কারুকার্যগ্রথিত সৌন্দর্যরূপান্তরের নিদর্শন। কবি ও আখ্যানকারের যে অপরূপ ভারসাম্য ছোটগল্পগুলিতে এ পর্যন্ত রক্ষিত হইয়াছিল, তাহা এখন হইতে একটু বিচলিত হইবার উপক্রম করিয়াছে। জীবনের স্বয়ংসম্পূর্ণ রসোচ্ছলতা যেন একটু একটু করিয়া সমস্যানির্ভর রূপে, পরোক্ষ উদ্দেশ্যের অস্তিত্ব-বীজ গর্ভে ধারণ করিয়া, লেখকের মিশ্র সাহিত্যিক চেতনার পোষকতার জন্য পরিকল্পিত হইয়াছে। যাহা বিশুদ্ধ পিপাসা ছিল তাহা এখন স্বর্ণভৃঙ্গারের শিল্পাধারের জন্য প্রতীক্ষমান। অবশ্য দ্বিতীয় পর্যায়ের সর্বশেষ গল্প 'ইচ্ছাপূরণ'-এ (আশ্বিন ১৩০২), এই পরিবর্তনের পূর্বাভাস

সূচিত হইয়াছে। এই গল্পে জীবনের একটি উদ্ভট কল্পনাপ্রধান মুহূর্তের সঙ্কেতকে ছোটগল্পের আকারে রূপ দেওয়ার চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। প্রৌঢ় পিতা সুবলচন্দ্র ও কিশোর পুত্র সুশীলচন্দ্র পরস্পর অবস্থাবিনিময়ের যে গূঢ় বাসনা অবচেতন মনে পোষণ করিত, তাহা দৈবাৎ সত্য হইয়া উঠিয়া উভয়ের জীবনে নানা কৌতুককর অসঙ্গতির সৃষ্টি করিয়াছে। এই অসঙ্গতিময় আচরণের সরস বর্ণনাই গল্পটির উপজীব্য। স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে এখানে লেখকের বিষয়নির্বাচনের প্রেরণা সূর্যালোকিত বাস্তবচিত্রাঙ্কন নয়, উহার কল্পনাকুয়াশাচ্ছন্ন তির্যক পরিহাসরশ্মিবিদ্ধ ইঙ্গিতের চকিত উদ্‌ঘাটন ও সম্প্রসারণ। জীবন বস্তুনিষ্ঠ বা রসপিপাসু বিবৃতিকারকে নয়, এক কৌতুকপরায়ণ কল্পনাকোবিদ্‌কে এই খণ্ডাংশটি উপহার দিয়া নেপথ্যাপসৃত হইয়াছে। তৃতীয় পর্যায়ের অনেকগুলি গল্পে এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর নিদর্শন মিলিবে।

২

পরোক্ষ প্রেরণা-প্রভাবিত গল্প

'দুরাশা' (বৈশাখ ১৩০৫), 'ডিটেক্‌টিভ' (আষাঢ় ১৩০৫), 'অধ্যাপক' (ভাদ্র ১৩০৫—বড় গল্প), 'রাজটিকা' (আশ্বিন ১৩০৫), 'সদর ও অন্দর' (আষাঢ় ১৩০৭), 'উদ্ধার' (শ্রাবণ ১৩০৭), 'ফেল' (আশ্বিন ১৩০৭) 'শুভদৃষ্টি' (আশ্বিন ১৩০৭), 'প্রতিবেশিনী' (১৯০১), 'দর্পহরণ' (ফাল্গুন ১৩০৯)।

'দুরাশা' রবীন্দ্র-প্রতিভার একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তথাপি ইহা জীবনের প্রত্যক্ষ প্রেরণাজাত নয়। ইহা 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর মত, অথচ অতিপ্রাকৃত-স্পর্শহীন একটি কল্পনাকুহকরচিত ইন্দ্রজালপ্রাসাদ। গল্পটি যেন গল্পকার রবীন্দ্রনাথের প্রতি কবি-রবীন্দ্রনাথের একটি অপরূপ কল্পনাসমৃদ্ধিময় উপহার। গল্পকার হয়ত পুরাপুরি এই উপহারটিকে স্বাধিকারভুক্ত করিয়া লইতে পারেন নাই। একটি অপূর্বসৃষ্টিনির্মাণক্ষমা কবিচেতনা ইহার বিসদৃশ উপাদান-গুলিকে দূর-দূরান্তর হইতে সংগ্রহ করিয়া রাসায়নিক সংশ্লেষে মিশাইয়াছে,

কিন্তু ইহার বিকাশ ও পরিণতির উপর বাস্তব সত্য নিজ স্বত্বাধিকারচিহ্ন সম্পূর্ণ মুদ্রিত করিতে পারিয়াছে কি না সন্দেহ। উত্তর প্রদেশের অখ্যাত বদায়ুনদুর্গ, সিপাহী বিদ্রোহের অগ্ন্যচ্ছ্বাস, হিন্দুবীর ও স্বধর্মনিষ্ঠ সেনাপতির প্রতি মুসলমান নবাবপুত্রীর সর্বজয়ী প্রণয়মুগ্ধতা, নিরুদ্দিষ্ট প্রেমিকের সন্ধানে তাহার হিন্দুতীর্থসমূহে পরিভ্রমণ ও হিন্দুধর্মসাধনায় দীক্ষা, আধুনিক মেকী সভ্যতার কেন্দ্রস্থল দার্জিলিঙের সমীপবর্তী ভুটিয়া পল্লীতে আচারভ্রষ্ট, অনার্য-পত্নীক প্রেমিকের সহিত সাক্ষাতে প্রেমিকার আজীবনপোষিত স্বপ্নভঙ্গ, সবশেষে ক্যালকাটা রোডের কুয়াশাচ্ছন্ন নেপথ্যলোকে এক ইঙ্গবঙ্গীয় নকল সাহেবের নিকট নায়িকার মর্মোদ্‌ঘাটন—এই সমস্ত বিচিত্র উপাদান যেন আরব্যরজনীর মায়াপুরী হইতে আসিয়া কোন এক আশ্চর্য ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ায় জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে সংসক্ত হইয়াছে। লেখকের অসাধারণ যাদুশক্তি ও ঐশ্বর্যময়ী কল্পনাসত্ত্বেও সমস্ত গল্পটির স্বাদ যেন সম্পূর্ণ মৃত্তিকা-রসগন্ধী হইয়া উঠে নাই। গল্পটির উপসংহারে আমরা যেন কল্পনা-বাস্তবের মধ্যে অনিশ্চিতভাবে দোদুল্যমান হইতে থাকি। এ যেন বঙ্কিমরোমান্সের রবীন্দ্রদৃষ্টি-পরিস্রুত এক বিশুদ্ধ রসনির্যাস। মনে হয় দার্জিলিঙের দিগন্তব্যাপ্ত কুয়াশা যেমন পরিচিত জগতের নানা অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটায়, তেমনি গল্পটিও যেন বাতাবরণের একটি অনুরূপ মায়াবিভ্রম। বাস্তব অভিজ্ঞতার আধারে ইহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখা যায় না। গল্পটির বস্তুবিন্যাসে কোন অতিলৌকিক উপাদান বা অভিপ্রায় না থাকিলেও, উহার অন্তরাত্মার নিগূঢ়ে অপ্রাকৃত গোধূলিমায়া অলক্ষিতভাবে সঞ্চারিত হইয়াছে। ইহার বাস্তব পরিবেশটি চিহ্ন রাখিয়াছে বাঙালী সাহেবের মুখনিঃসৃত প্রচুর চুরুটের ধোঁয়ায় ও নবাবদুহিতার খানদানী উর্দুর অজ্ঞতার স্বীকৃতিতে। নকল অভিজাত এক পোশাক ছাড়া অন্য সব দিক দিয়াই আভিজাত্যমর্যাদাবঞ্চিত ও খাঁটি আভিজাত্যের সংস্পর্শে হীনমন্যতাক্লিষ্ট। যেমন নকল রাজধানী দার্জিলিং দিল্লী-আগরার কৌলীন্যে অনধিকারী, তেমনি বদায়ুননবাবদুহিতা দার্জিলিং-এ বেমানান। সে ক্যালকাটা রোডের কুয়াশাচ্ছন্ন নির্জনতায় কথঞ্চিৎ আত্মরক্ষা ও হালফ্যাশানি সাহেবকে নিজ মেকী সংস্কৃতি বিষয়ে সচেতন করিয়াছে।

'ডিটেক্‌টিভ' যেমন কাহিনীর দিক দিয়া ব্যতিক্রমস্থানীয়, তেমনি উহার গল্পরসটিও একটু অদ্ভুত ধরনের। উহার ঘটনাপরিস্থিতিটি ঠিক জীবনের

উপহার নয়, মননের উদ্ভাবন। অপরাধ-অনুসন্ধানে নিরত গোয়েন্দাপুলিশ জীবনকে একটি বিশেষ তির্যক্ দৃষ্টিতে দেখিতে অভ্যস্ত। উহার সুকুমার বিকাশ অপেক্ষা উহার কুটিল সুড়ঙ্গসঞ্চরণই তাহার মনোযোগকে বেশী আকৃষ্ট করে। বর্তমান গল্পের প্রবক্তা পুলিশ কর্মচারীটি কলিকাতা মহানগরীর সর্পিল অলিগলিতে সরীসৃপগতি অপরাধের ক্লেদাক্ত সঞ্চরণের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে এবং অপরাধীর সঙ্গে বুদ্ধি-পরীক্ষার দ্বন্দ্বে উত্তেজনা অনুভব করে। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাসে যখন সে চোর ধরিতে ব্যস্ত, তখন তাহার নিজের দাম্পত্যদুর্গে চোরের অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছে। সে একজন ব্যক্তিকে ছদ্মবেশী অপরাধী মনে করিয়া তাহার অনুসরণ ও তাহাকে ফাঁদে ফেলিবার জন্য নানা অপকৌশল অবলম্বন করিয়াছে। শেষ পর্যন্ত সে আবিষ্কার করিয়াছে ও ঐ ব্যক্তি তাহারই স্ত্রীর পূর্বপ্রণয়ী ও সে তাহার নিজের স্বীকারোক্তির উপর নির্ভর করিয়া তাহার বিরুদ্ধেই দাম্পত্যধর্ম-লঙ্ঘনের অভিযোগ আনিয়াছে। তথাকথিত চোরের জন্য পাতা ফাঁদে পুলিশ নিজে ধরা পড়িয়াছে ও সমস্ত ঘোরাল ব্যাপারটির একটি হাস্যকর পরিণতি ঘটিয়াছে। গল্পটির একমাত্র সম্পদ হইল অপরাধতত্ত্বসম্বন্ধীয় গূঢ় মননশীলতা।

'অধ্যাপক' গল্পটি 'নষ্টনীড়', 'কর্মফল', 'মাস্টারমশায়', 'রাসমণির ছেলে', 'পণরক্ষা' 'হালদারগোষ্ঠী' প্রভৃতির ন্যায় ছোট উপন্যাসের লক্ষণান্বিত। ইহার কাহিনীটি আয়তনে ক্ষুদ্র, কিন্তু কবিত্বে প্রগাঢ় ও কল্পনায় সমৃদ্ধ। উহার অতিপল্লবিত পরিধিবিস্তারও ঠিক ছোট গল্পের সাংকেতিকতা ও আয়তন-সংক্ষেপের সমধর্মী নয়। উহার আরম্ভ ও উপসংহার উভয়ই শ্লেষাত্মক, মধ্য অংশটি অপূর্ব কাব্যরসে অনুবাসিত। এক কলেজের ছাত্র নিজ পাণ্ডিত্য, মৌলিক রচনাশক্তি ও মননশীলতা সম্বন্ধে অসম্ভব উচ্চ ধারণা পোষণ করে। সহপাঠীদের প্রায় সর্বসম্মত স্বীকৃতিতে এই আত্মশ্রেষ্ঠতাবোধ স্বতঃসিদ্ধ প্রত্যয়ে পরিণত। এমন সময় এক তরুণ অধ্যাপকের আবির্ভাব ও স্পষ্টভাষণ এই যশোবুদ্বুদকে বিদীর্ণপ্রায় করিয়াছে। উচ্চাসনচ্যুত ছাত্রটি নিজ মনীষাকে অবিসংবাদিত প্রতিষ্ঠাদানের উদ্দেশ্যে নবীন অধ্যাপকের প্রতি অকথিত অসূয়া পোষণ করিয়া গঙ্গাতীরে চন্দননগরের এক বাগানবাড়ীতে অমর কাব্যরচনায় আত্মনিয়োগ করার সংকল্প লইয়াছে। সেখানে অকস্মাৎ পাশের বাগানবাড়ীতে এক তরুণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও পরিচয় তাহার অন্তরসুপ্ত

প্রেম-উৎসকে অজস্রধারায় উন্মোচিত করিয়া দিয়াছে ও তাহার কবিচেতনাকে উদ্দীপ্ত করিয়াছে। এখানে প্রকৃতি, প্রেমানুভূতি, নারীসৌন্দর্য ও দর্শন-ভাবুকতার সংমিশ্রণে তাহার যে আশ্চর্য কল্পনামননের প্রকাশ ঘটিয়াছে তাহা তাহার উচ্চাঙ্গের সৃষ্টিশক্তির পরিচয়বাহী। তাহার মন যদি যথার্থই অন্তঃসারশূন্য অলীক ভাববাষ্পে স্ফীত হইত, তবে তাহার পক্ষে এইরূপ পরিণত সৌন্দর্যবোধ ও চিন্তাপ্রগাঢ়তার সমন্বয়সাধন সম্ভব হইত না। সে এখানে রবীন্দ্রমানসের শ্রেষ্ঠ উত্তরসাধকরূপে নিজ পরিচয়কে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। সুতরাং মনে হয় তাহাকে প্রথম দিকে যে লঘু-তরল, আত্মশ্লাঘায় অন্ধ মনের অধিকারীরূপে দেখান হইয়াছিল, তাহার সহিত পরবর্তী চিত্রের কোন সঙ্গতি নাই। কিরণবালাকে দেখার পর তাহার মনোজগতে যে দীপ্তি ও কল্পনামুগ্ধতা ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা কোন মন্দকবিযশঃপ্রার্থী উদ্বাহু বামনের নিশ্চয়ই অনায়ত্ত। সেইজন্য মনে হয় লেখক ক্ষণিক আত্মবিস্মৃতির ফলে মহীন্দ্রকুমারের খোলশের মধ্যে রবীন্দ্র-আত্মার শাঁস অন্তর্ভুক্ত করিয়া তাঁহার সৃষ্টির অখণ্ডতায় কিছুটা স্ববিরোধ ঘটাইয়াছেন।

সে যাহাই হউক, মহীন্দ্রকুমার কিরণবালা ও তাহার পিতার নিকট যে আত্মপরিচয় দাখিল করিয়াছে তাহাও নিজ শ্রেষ্ঠত্বপ্রচারের হাস্যকর প্রয়াসে বিড়ম্বিত। কিরণবালা কিন্তু তাহার নারীসুলভ অন্তর্দৃষ্টিবলে মহীন্দ্রকুমারের যথার্থ মূল্যবোধ উপলব্ধি করিয়াছে। সে তাহার বুদ্ধি-প্রকাশের প্রগল্‌ভতাকে, তাহার আকাশবিহারকে বারবার প্রতিহত করিয়া তাহাকে ঘরোয়া সমতলভূমির দিকে টানিয়া আনিয়াছে। সে নিজেকে বুঝুক আর নাই বুঝুক, কিরণবালা তাহাকে আত্যন্ত বুঝিয়াছে। মহীন্দ্রও দর্শনতত্ত্ববিলাস হইতে গার্হস্থ্য কর্তব্যের মাধ্যাকর্ষণে ভূতলশায়ী হইয়া স্বস্তি অনুভব করিয়াছে ও ইহাই যে তাহার স্বভাবানুকূল তাহার প্রমাণ দিয়াছে। শেষ পর্যন্ত কিরণবালার সগৌরবে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া ও তাহার নিজের ফেল-করা উভয়ের মধ্যে ব্যবধানের যথার্থ পরিমাপ করিয়াছে ও নায়ক অধ্যাপকের সহিত বাগ্‌দত্তা কিরণবালার পরিণয়ের যোগ্যতা উপলব্ধি করিয়া নিজ স্বপ্ন-টুটা বাস্তব হীনতাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে। এইরূপে এই আশ্চর্য সুন্দর, কিন্তু কৃত্রিম-পরিস্থিতিসম্ভব গল্পটির পরি-সমাপ্তি ঘটিয়াছে। ইহাতে জীবননিষ্ঠতার পরিবর্তে জীবননিরপেক্ষ ও আদর্শান্বিত তত্ত্বভাবুকতা ও প্রকৃতিমুগ্ধতাই প্রধান স্থান অধিকার

করিয়াছে—জীবননিঃসৃত কয়েকটি বিচ্ছিন্ন রশ্মিসমবায়ে ও তির্যক দ্যোতনার পটভূমিকায় ইহার বাতাবরণ নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে।

'রাজটিকা' আর একটি পরিহাসমধুর, ব্যঙ্গসরস ছোট গল্প। ইহার আখ্যানের সহিত এক শ্রেণীর সরকারী খেতাবলোলুপ, রাজপ্রসাদভিক্ষু অভিজাতসম্প্রদায়ের জীবন-কাহিনীর সমধর্মিতা লক্ষণীয়। রায়বাহাদুর পূর্ণেন্দু-শেখরের পুত্র নবেন্দু পিতৃদৃষ্টান্ত-অনুসরণকেই জীবনব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। অকস্মাৎ দৈবনির্বন্ধে এক স্বদেশী আদর্শে দীক্ষিত পরিবারে তাহার বিবাহ হওয়ায় এই সেলামমসৃণ পথে চলিবার পক্ষে তাহার বিঘ্ন দেখা দিল। শ্যালীদের সকৌতুক শ্লেষ ও শাসন তাহার অনন্যমনা সাধনাকে অপ্সরাবিভ্রমের ন্যায় বিড়ম্বিত করিতে লাগিল। নবেন্দুর অন্তরক্ষেত্র দুই বিরোধী শক্তির অবিরত সংঘর্ষে পীড়িত হইয়া উঠিল। সবচেয়ে মুশকিল হইল যে সে নিজেও এই অন্তর্দ্রোহে নিজ শত্রুপক্ষীয়দের সহিত যোগ দিতে বাধ্য হইয়াছে। ইংরাজের কাছে সম্মানলাভ ও শ্যালীদের নিকট সম্মান-হারান এই উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধে তাহাকে নিজের ইচ্ছারই বিরোধিতা করিতে হইল। শ্যালীসংঘের মনোরঞ্জনের জন্য সে ইংরাজের নিকট প্রত্যাশিত সম্মানের প্রতি মৌখিক উপেক্ষা দেখাইয়াছে। সুচতুরা পত্নী-সহোদরাদের ফাঁদে পড়িয়া তাহাকে অনেক নাকানি-চোবানি সহ্য করিতে হইয়াছে। এমন কি তাহার স্বাধীনচিত্ততার অখণ্ডনীয় প্রমাণ-স্বরূপ সে কংগ্রেসে চাঁদাও দিয়াছে ও সে দান যথারীতি সংবাদপত্রে ঘোষণায় সায় দিয়াছে। এত ষড়যন্ত্রের উপর পত্নী অরুণলেখার ঔদাসীন্য নবেন্দুর সঙ্কটকে ঘনীভূত করিয়াছে। শেষ পর্যন্ত নবেন্দু তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে একজন প্রচণ্ড দেশপ্রেমিকরূপে প্রতিষ্ঠিত হইল ও তাহার রাজসম্মান তাহাকে বঞ্চিত করিয়া মরীচিকার ন্যায় অন্তর্ধান করিল। বড় শালী লাবণ্যলেখার যে রূপবর্ণনা তাহা অবিকল গল্পটির প্রতি প্রযোজ্য। গল্পটিও লাবণ্যের মত "স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্যের অরুণে পাণ্ডুরে পূর্ণপরিপুষ্ট হইয়া নির্মল শরৎকালের নির্জন-নদীকূললালিতা অম্লানপ্রফুল্লা কাশবনশ্রীর মতো হাস্যে ও হিল্লোলে ঝলমল" করিতেছে। গল্পের পাত্রপাত্রী বাস্তব জগতের অধিবাসী হইয়াও সৌন্দর্য ও জীবনোল্লাসের বৃন্তে যে কল্পলোক বিকশিত হয় তাহারই মর্মকোষে অধিষ্ঠিত।

'সদর ও অন্দর' (আষাঢ় ১৩০১) একটা কৌতুককর জীবন-খেয়ালের

উপর বিধৃত কাহিনী। জমিদার ও জমিদারগৃহিণীর প্রশ্রয় ও তিরস্কারের চক্রে ঘূর্ণ্যমান, উদার, সংসারজ্ঞানহীন, শিল্পী বিপিন-বেচারা জীবন-প্রহেলিকায় বিমূঢ় হইয়াছে। কেন যে কর্তা ও গিন্নী পর্যায়ক্রমে তাহাকে কাছে টানেন ও দূরে সরাইয়া দেন তাহার মর্মভেদে সে অক্ষম। শেষ পর্যন্ত এই টানা-পড়েনে সে দিশাহারা হইয়া করুণ পরিণামে তাহার পরনির্ভর জীবনযাত্রাকে শেষ করিয়াছে। তাহার যদি কিছুমাত্র সাংসারিক বুদ্ধি থাকিত তবে সে বুঝিতে পারিত যে এই আপাত-অহেতুক অনুরাগ-বিরাগের সূত্র মুনিবদের রুচি-পরিতৃপ্তির মধ্যেই নিহিত। এখানে জমিদারই প্রবল পক্ষ, সুতরাং গৃহকর্ত্রীর পক্ষপাতের উপর গৃহস্বামীরই আক্রোশ জয়ী হইল ও বিপিনকে দীর্ঘকালের আশ্রয় ত্যাগ করিতে হইল। এই গল্পে জীবনের একটি প্রান্তিক অসঙ্গতি করুণ পরিহাসে বিদ্ধ হইয়া পাঠকের দৃষ্টি-আকর্ষণ করিয়াছে। ইহাতে কোন তাৎপর্যময় জীবনসত্য অনুপস্থিত। ইহা জীবনের গভীররসাশ্রিত সমীক্ষা নয়, জীবনের কৌতুক লইয়া খেলা।

'উদ্ধার' (শ্রাবণ ১৩০৭) উহার মর্মান্তিক পরিণতি সত্ত্বেও অনুরূপ লঘু মেজাজের রচনা। এই গল্পে এক সন্দিগ্ধস্বভাব স্বামীর অপমানকর নির্যাতনে অতিষ্ঠ হইয়া তাহার তরুণী, স্বাধীনচেতা স্ত্রী গৌরী সংসারত্যাগের ইচ্ছায় গুরুদেবের আশ্রয় লইয়াছে। গুরুদেব প্রথমে সাধুচরিত্রই ছিলেন, কিন্তু অকস্মাৎ সুন্দরী শিষ্যার প্রতি তাঁহার পাপলালসা উদ্ভিন্ন হইয়াছে। প্রলোভনের বশীভূত হইয়া তিনি শিষ্যার সহিত গৃহত্যাগের আয়োজন ঠিক করিয়া স্বামীর অনুপস্থিতির সুযোগে দিন ও সময় নির্দেশ করিয়া শিষ্যাকে পত্র দিলেন। এই পত্র স্বামীর হাতে পড়িয়া তাহার হঠাৎ উত্তেজনায় মৃত্যু ঘটাইল। এই চরম সঙ্কটেও গুরুদেব পূর্বসঙ্কেত-অনুসারে গৌরীর জন্য বাগানে প্রতীক্ষা করিয়া তাঁহার অধঃপতনের হেয়তম পরিচয় দিলেন। গৌরীর মনে যে তীব্র প্রতিক্রিয়া হইল তাহারই ফলে সে আত্মহত্যা করিয়া স্বামীর সহিত সহমৃতা হইবার সতীত্বপুণ্য অর্জন করিল ও সে আদর্শ সতীরূপে সমাজে ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র হইল। অদৃষ্টের এই পরিহাসে জীবনের যথার্থ মূল্যায়নের একটা সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ লোকচিত্তে প্রতিভাত হইয়াছে। এখানেও লেখক একটা লঘু, দায়িত্বহীন, অঘটনবিলাসী মনোবৃত্তির প্রেরণায় ঘটনার স্বৈরাচারকে জীবননিয়ন্ত্রণের মর্যাদা দিয়াছেন। তিনি শিল্পবোধ ও বিশ্লেষণদায়িত্ব ভুলিয়া বিবৃতিকারের গৌণ ভূমিকাই নির্বাচন করিয়াছেন,

রূপকথার পর্যায়ে স্বচ্ছন্দচিত্তে নামিয়াছেন। এ যেন নিপুণ বীণাবাদকের শিথিলতারে অলস অঙ্গুলিসঞ্চালনের মত ব্যাপার।

'ফেল' (আশ্বিন ১৩০৭), 'শুভদৃষ্টি' (আশ্বিন ১৩০৭), 'প্রতিবেশিনী' (মজুমদার লাইব্রেরি কর্তৃক প্রকাশিত গল্পগুচ্ছের দ্বিতীয় খণ্ডে প্রথম প্রকাশিত, ১৯০১) ও 'দর্পহরণ' (ফাল্গুন, ১৩০৯) গল্পগুলি পরিবারজীবননির্ভর। কিন্তু ইহাদের মধ্যেও খেয়ালের বাষ্পময় অনির্দেশ্যতার অন্তরালে জীবনের এক একটি আকস্মিক কৌতুকবিন্দু ঝলসিয়া উঠিয়াছে। 'ফেল'-এ দুই নবযুবকের পাত্রী-প্রতিদ্বন্দ্বিতা কৌতুকসৃষ্টির হেতু হইয়াছে। দুই জ্ঞাতি ভাইএর মধ্যে একতম, নলিন, লেখাপড়ায় হারিয়া বিবাহসৌভাগ্যে জয়ী হইবার কঠিন পণ গ্রহণ করিয়াছে ও ভাইএর পাত্রীর রূপগুণের সন্ধান লইয়া তাহাকে হারাইবার মতলব আঁটিয়াছে। এই প্রতিযোগিতা এতদূর গড়াইয়াছে যে তাহার পদে পদে বিচারবিভ্রম ঘটিয়াছে। তাহার নিজের প্রত্যাখ্যাত পাত্রীকে যখন তাহার ভাই বিবাহ করিয়াছে তখন সে নিজের পছন্দশক্তির উপর আস্থা হারাইয়াছে ও যাহাকে সে হেলায় বর্জন করিয়াছে তাহাকেই ফিরিয়া পাইতে আকুল হইয়াছে। এই কাঞ্চনকৌলীন্য-শাসিত বৈশ্যযুগে এই জাতীয় বৈবাহিক দ্বন্দ্ব দীর্ঘকাল প্রলম্বিত করা যায় না—সুতরাং এই খেয়ালের লড়াই স্বল্পায়ু হইতে বাধ্য। যাহা হউক, অকৃতার্থ প্রেমের অবরুদ্ধ ক্ষোভ হুজুকপ্রিয় মোসাহেবের উপর ফাটিয়া পড়িয়া আমাদের ন্যায়নিষ্ঠার প্রত্যাশাকে পূর্ণ করিয়াছে।

'শুভদৃষ্টিতে'ও অনুরূপ দৈবপ্রসাদ সমস্ত অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়ার অপনোদন করিয়া আমাদের প্রত্যাশাকে তৃপ্তি দেয়। মনে হয় এই গল্পগুলিতে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের প্রসন্ন, জটিলতাহীন জীবনদর্শন রবীন্দ্রনাথের মধ্যে পূর্বসূচিত হইয়াছে। এখানে লেখক যেন সমস্ত মনস্তাত্ত্বিক গ্রন্থিলতা পরিহার করিয়া জীবনের অবাধ আনন্দস্রোতে অবগাহন করিয়াছেন। বিপত্নীক জমিদার কান্তিচন্দ্র মনের শূন্যতাপূরণের জন্য সদলবলে নৌকাযোগে শিকারে বাহির হইয়াছে। অকস্মাৎ এক সুন্দরী বালিকার গৃহপালিত হাঁস বন্দুকের লক্ষ্যীভূত হইয়া পালিকার মনে ত্রস্ত ভীতিবিহ্বলতার সঞ্চার করিয়াছে। কান্তিচন্দ্র সেই বালিকার সন্ধান লইতে গ্রামমধ্যে গিয়া এক শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের আতিথ্যে অভ্যর্থিত হইয়াছে। সেই রূপসী বালিকাটি যে ঐ ব্রাহ্মণেরই কন্যা ইহাই তাহার দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছে। সেই প্রত্যয়ে

সে মেয়ে না দেখিয়াই ব্রাহ্মণদুহিতার পাণিপ্রার্থী হইয়াছে। শেষে বাসর-ঘরে তাহার ভুল ভাঙিয়াছে, সে জানিতে পারিয়াছে যে তাহার পরিণীতা স্ত্রী সেই পূর্বদৃষ্টা রূপসী তরুণী নয়। সঙ্গে সঙ্গে সে ইহাও জানিয়াছে যে তাহার পছন্দকরা মেয়েটি বোবা ও কালা। বলা বাহুল্য যে, এই আবিষ্কারের পর তাহার ক্ষোভ সহজেই শান্ত হইয়াছে। গল্পটির ঘটনা, মনস্তত্ত্বের অগভীরতা ও প্রসন্ন উপসংহার—সবই প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের সহিত সমধর্মী।

'প্রতিবেশিনী' বালবিধবা, ব্রহ্মচর্যনিষ্ঠা যুবতীর চিত্তজয় করিবার এক বেনামী সাহিত্যিক প্রয়াসের কৌতুককর কাহিনী। এক সাহিত্যিকের অসাহিত্যিক বন্ধু তাহারই রচিত কবিতার সম্মোহিনী-শক্তিতে ঐ কৌমার্য-ব্রতে দৃঢ়া বিধবার প্রণয় আকর্ষণ করিয়াছে। তাহারই অস্ত্রে তাহার ঈপ্সিত প্রণয়িনীকে লাভ করিয়াই সে ক্ষান্ত থাকে নাই, তাহার সঞ্চিত অর্থ হইতে মাসোহারারও ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছে। কিন্তু গল্পের যে আসল আকর্ষণ—সেই প্রণয়বিবিক্তা, ভোগসুখে উদাসীনা নায়িকার চিত্ত কেমন করিয়া প্রেমাভিমুখী হইল, বরফ কি করিয়া গলিল, তাহা সম্পূর্ণভাবে নেপথ্যের অন্তরালে রহিয়া গিয়াছে। কবিত্বময় সাঙ্কেতিকতা ছাড়া তাহার বিস্তারিত বিশ্লেষণের কোন প্রয়াসই নাই। ঘটনার কৌতূহল নিগূঢ় কার্যকারণ-নির্ণয়কে প্রতিহত করিয়াছে। বঞ্চিত কবির বিমূঢ়তাই গল্পে প্রধানতঃ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

'দর্পহরণ' (ফাল্গুন ১৩০৯) দাম্পত্য মধুর রসের একটি হাস্যকর উপজাত-ফল-বিষয়ক। স্বামী উকিল ও নিজের পাণ্ডিত্যসম্বন্ধে সচেতন। স্ত্রী নির্ঝরিণী একজন সুপ্রতিষ্ঠিতা লেখিকা কিন্তু সে তাহার জীবনের ন্যায় সাহিত্যখ্যাতিকেও গোপন রাখিতে সচেষ্টা। মাসিকপত্রিকাকর্তৃক আয়োজিত ছোটগল্প-প্রতিযোগিতায় স্ত্রী ও স্বামী উভয়েই গল্প পাঠাইয়াছে। যথাসময়ে দেখা গেল যে স্ত্রীর গল্পটি প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত ও স্বামীর গল্পটি না-মঞ্জুর হইয়াছে। এই ফলঘোষণায় স্ত্রী স্বামীর আশাভঙ্গে মর্মাহত হইয়া তাহার নিজের জয়ের বার্তা গোপন রাখিয়াছে। পরিশেষে অনুতপ্ত স্বামীর নিজ ব্যর্থতার স্বীকৃতিকে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে স্ত্রী একটি বর্ণাশুদ্ধি-পূর্ণ, অমার্জিত পত্রে উহার প্রতিবাদ জানাইয়াছে। এইভাবে এই কৃত্রিম দাম্পত্যযুদ্ধের এক পরিহাসমধুর, আত্মবিলোপে স্নিগ্ধ উপসংহার ঘটিয়াছে। গল্পটি জীবনানুগামী হইয়াও জীবনের প্রান্তচারী মনোজ্ঞ কল্পনারসে পুষ্ট।

'মাল্যদান' (চৈত্র ১৩০৯) গল্পে জীবনের সহিত কল্পনার ব্যবধান আরও দুরতিক্রম্যরূপে দেখা দিয়াছে। এখানে কাল্পনিকতা উদ্দাম হইয়া জীবনমূলের ন্যূনতম নিয়ন্ত্রণকেও অস্বীকার করিয়াছে। কুড়ানির জন্ম-ইতিহাস ও পটলের ঘরে তাহার আশ্রয়প্রাপ্তি, তাহার চরিত্রের অবোধ সরলতা, পটল ও যতীনের মধ্যে পরিহাসের উৎকট আতিশয্য-বিড়ম্বিত সম্পর্ক, পটল কর্তৃক কুড়ানির মনে যতীনের প্রতি প্রেমসঞ্চারের ধনুর্ভঙ্গ পণ, সেই সঙ্কল্পের অভাবনীয় সিদ্ধি, প্রণয়বিবশা কুড়ানির যতীনের হাসপাতালে মৃত্যুবরণ—সবই গল্পটিকে এক প্রবল আকস্মিকতার দমকা হাওয়ায় বিশ্বাস-যোগ্যতার শেষ প্রান্তে উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে। এখানে জীবনের এক তত্ত্বসম্ভব পরিণতি সহজ সঙ্গতিকে ব্যঙ্গ করিয়া নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস-কণ্টকিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের আর কোন গল্পে এরূপ নিরঙ্কুশ খেয়ালিপনা প্রশ্রয় পায় নাই। স্থানে স্থানে বসন্তপ্রকৃতির রহস্যময় ভাবদ্যোতনা ও মানবচিত্তের উপর উহার অনির্বচনীয় মুগ্ধতাসঞ্চার ঘটনা-বিন্যাসের এই খামখেয়ালি আকস্মিকতার মধ্যে এক অভাবনীয় তাৎপর্যগভীরতা সংক্রামিত করিয়াছে। কুড়ানির মনোলোকে যে গহন আলো-ছায়ার খেলা, মর্মর-গুঞ্জনের ঐকতান এক নিগূঢ় ভাবান্তর সাধন করিয়াছে, তাহা গল্পের মধ্যে সমভাবে বিকীর্ণ না হইলেও পাঠককে এক অজানা অনুভূতির আস্বাদে ক্ষণে ক্ষণে রোমাঞ্চিত করিয়া তোলে।

'পুত্রযজ্ঞ' (জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫) বাঙালী মনের দৈবের উপর একান্ত আস্থা, উহার অতিপ্রাকৃতের উপর নির্ভরশীলতার ও বাস্তবমূঢ়তার দৃষ্টান্ত। বৈদ্যনাথ প্রেম অপেক্ষা পিণ্ডকেই অধিক গুরুত্ব দিয়াছিল ও স্ত্রী বিনোদিনীকে নিছক শাস্ত্রীয় প্রয়োজনের উপায়রূপে বিবেচনা করিয়া প্রণয়চর্চায় শিথিলপ্রযত্ন ছিল। ফলে তরুণী স্ত্রী পাড়ার প্রতিবেশী যুবকের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িল ও নির্মম শাস্ত্রনিয়মবদ্ধ স্বামীর দ্বারা গর্ভবতী অবস্থাতেই পরিত্যক্ত হইল।

ইহার পরের ইতিহাস বৈদ্যনাথের বৈষয়িক সমৃদ্ধির ও নানারূপ জটিল তান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে ও উপর্যুপরি তিনবার দারান্তরগ্রহণে পুত্র-লাভের ব্যর্থ প্রয়াসের ধারাবাহিক বিবরণ মাত্র। কিন্তু তাহার আশাপূরণের বিশেষ কোন সম্ভাবনা লক্ষ্যগোচর হইল না। ইতিমধ্যে গৃহবিতাড়িতা প্রথমা স্ত্রী ও তাহার অজ্ঞাতপিতৃপরিচয় বালকপুত্র দুর্দশার চরম সীমায় পৌছিয়া শেষ পর্যন্ত সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণভোজনে অকাতরে-মুক্তহস্ত

বৈদ্যনাথের প্রাসাদদ্বারে ভিক্ষান্নের জন্য কাঙালীর সঙ্গে ভিড় জমাইয়াছে। ভিখারীভোজনের পুণ্যফল যেহেতু শাস্ত্রকীর্তিত ও ব্রাহ্মণ্যসংস্কার-সমর্থিত নয়, সেইজন্য শাস্ত্রনিষ্ঠ, পুত্রকামী বৈদ্যনাথের গৃহদ্বার হইতে তাহার সন্তান ও সন্তানের মাতা অপমানের সহিত বিতাড়িত হইয়াছে। প্রকৃতিদত্ত অধিকারকে অস্বীকার করিয়া দৈবপ্রসাদের উপর মূঢ় আশ্বাস যে পরিণতি ঘটাইয়াছে, তাহা করুণ ও ব্যঙ্গরসের সম্মিশ্রণে এক যৌগিক ফলশ্রুতি ঘটাইয়াছে।

'গুপ্তধন' (কার্তিক ১৩১৪) প্রায় পাঁচ বৎসর পরের রচনা হইলেও ঘটনার দিক্ দিয়া দ্বিতীয় পর্যায়ে আলোচিত 'সম্পত্তি-সমর্পণ' ও 'স্বর্ণমৃগ'-এর সমশ্রেণীভুক্ত। তবে এখানে কোন সত্যিকার অতিপ্রাকৃতের স্পর্শ বা বদ্ধমূল সংস্কারের বিশেষ কোন প্রভাব অনুপস্থিত। তৎপরিবর্তে বাঙালী লোকমনের প্রহেলিকাপ্রিয়তা, দুর্বোধ্য সংকেতের অন্তরালে গোপনীয় তথ্যনির্দেশের তির্যক্ রীতিটি উদাহৃত হইয়াছে। জ্যোতিষগণনার রাশিকুণ্ডলীর ছদ্মসাদৃশ্যে এই বিশুদ্ধ পার্থিব ঐশ্বর্যসন্ধানের মধ্যে দৈব দুর্জ্ঞেয়তা-আরোপের প্রয়াস এখানে লক্ষণীয়। যাহাই হউক এই গুপ্তধন-উদ্ধারের পিছনে দৈবপ্রসাদের জন্য দেবতার সন্তোষবিধান তন্ত্রসাধনার সহিত সাদৃশ্য স্মরণ করাইয়া দেয়। সুতরাং পূর্বপুরুষের সঞ্চিত ঐশ্বর্যসন্ধানও শুধু বুদ্ধিসমাধান নয়, ভক্তির একাগ্রতার উপরও নির্ভরশীল। এখানেও সঙ্কেতসূত্রটি হস্তগত করার জন্য প্রাণান্তিক প্রয়াস, উৎকট জীবনপণপ্রতিজ্ঞা, ছদ্মবেশধারণ ও মন্ত্রসিদ্ধির জন্য দীর্ঘ প্রতীক্ষা দুই শতক পূর্বের বাঙালী গৃহস্থের বিকৃত ধর্মপ্রাণতার নিদর্শন যোগায়। শেষ পর্যন্ত মৃত্যুঞ্জয় তাহার খুল্লপিতামহ, অধুনা-সন্ন্যাসী শঙ্করের সহিত সন্ধান-প্রতিযোগিতায় অভীপ্সিত লক্ষ্যের তোরণদ্বারে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তাহার অগ্রবর্তী আত্মীয় অনুসন্ধানের যে নিশানা রাখিয়া আসিয়াছে তাহারই সূত্রানুসরণে মৃত্যুঞ্জয়ও ধনাগারের বহির্দ্বারে দাঁড়াইয়াছে। এখন একটি অতি সূক্ষ্ম ব্যবধান তাহার ও তাহার চরমসিদ্ধির মধ্যে শেষ অন্তরালের মত অবশিষ্ট আছে। প্রাক্-সিদ্ধিমুহূর্তের উৎকণ্ঠা, আশা-নৈরাশ্যের দুঃসহ দ্বন্দ্ব, করায়ত্ত সফলতার অন্তিম বঞ্চনার আশঙ্কা মৃত্যুঞ্জয়ের হৃদয়ে এক তুমুল ঝড় তুলিয়াছে। এই সন্ধিক্ষণে সে প্রস্তরাঘাতে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রাণনাশে পর্যন্ত উদ্যোগী হইয়াছে। শেষে শঙ্কর তাহার দাবী প্রত্যাহার করিয়া মৃত্যুঞ্জয়ের পথ বাধামুক্ত করিয়াছে। কিন্তু সে

তাহাকে লালসাপূরণে কোন সহায়তা করিতে রাজী হয় নাই। মৃত্যুঞ্জয়কে ভূগর্ভস্থ, আলোবাতাসহীন ঐশ্বর্যভাণ্ডারের একাধিপত্য ছাড়িয়া দিয়া সে অবসর লইয়াছে। সে মৃত্যুঞ্জয়ের চিত্তপরিবর্তনের জন্য অদূরেই প্রতীক্ষমান, কিন্তু নির্মমভাবে নিরপেক্ষ। চরম লগ্নে মৃত্যুঞ্জয়ের মনে একদিকে শ্বাসরোধী ভূগর্ভস্থ অন্ধকার ও স্বর্ণমরীচিকাদীপ্ত, জীবনসম্পর্কহীন নির্জনতা ও অন্যদিকে সূর্যালোকিত, পরিচিত ধরণীর তুচ্ছতম স্নেহস্পর্শের জন্য আকুলতার মধ্যে যে মর্মান্তিক দেবাসুরসংগ্রাম অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহার সবটুকু তীব্রতা, রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য বর্ণনাশক্তি ও ব্যঞ্জনাসঞ্চারকুশলতার মাধ্যমে জ্বালাময় স্পষ্টতার সহিত ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই অংশে গল্পটি বিবৃতির কৌতূহল ছাড়াইয়া এক নিগূঢ় মানস বিপর্যয়ের দ্রুত স্পন্দনের অন্তর্গূঢ়তামণ্ডিত হইয়াছে। মৃত্যুঞ্জয় শেষ পর্যন্ত ঐশ্বর্যের লোভ বিসর্জন দিয়া সাধারণ জীবনের সুখদুঃখে ফিরিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়াছে। 'সম্পত্তি সমর্পণ'-এ মানবিক বেদনা আরও তীব্র ও মর্মভেদী, অপরিচয়ের ট্রাজেডি আরও সুদুঃসহ, নিয়তির শ্লেষ আরও নিগূঢ়সঞ্চারী, কিন্তু 'স্বর্ণযুগ'-এর তুলনায়, 'গুপ্তধন' অনেক বেশী রোমাঞ্চকর ও হৃদয়ের ঘাতপ্রতিঘাতে বেগবান ও চঞ্চল। এই গল্পটিই প্রাচীন হিন্দুসমাজের ধর্মসংস্কারের সহিত রবীন্দ্রনাথের শিল্পজীবনের শেষ সংযোগবিন্দু। ইহার পর তিনি আধুনিকতার ক্রমবর্ধমান জোয়ারে তাহার গল্পতরণীকে ভাসাইয়া দিয়াছেন। সমাজের রক্ষণশীলতা ও প্রচলিত মূল্যবোধের সহিত তাঁহার সংযোগ এখনও ছিন্ন হয় নাই, তবে ইহার পর হইতে তিনি নূতন জীবনবোধের কাছির সহিত তাঁহার সৃষ্টিকার্যকে বাঁধিবার বেশী আগ্রহ দেখাইয়াছেন।

'স্বর্ণমৃগ-এর বৈদ্যনাথ ও 'পুত্রযজ্ঞ'-এর বৈদ্যনাথ নামে এক হইলেও উহাদের কাহিনী, জীবনসমস্যা ও ভাগ্যবঞ্চনার ইতিহাস স্বতন্ত্রপ্রকৃতির। সন্ন্যাসীতোষণ ও দৈবনির্ভরতা উভয়ের সাধারণ লক্ষণ, কিন্তু এই সাধারণ লক্ষণ পূর্বগামী গল্পে গৃহস্বামী অপেক্ষা গৃহিণীকেই অধিক আশ্রয় করিয়াছে। পরবর্তী গল্পে সমস্ত কর্মসূত্র ও উদ্যোগ গৃহস্বামীর উপরেই ন্যস্ত। প্রথম বৈদ্যনাথের মর্মবেদনা গৃহিণীর উগ্র অসহিষ্ণুতা ও উৎপীড়নপ্রবৃত্তিজাত। লেখকের ব্যঙ্গদ্যোতনা অসহায়, দুর্বলচিত্ত, গৃহবিবাদে বিব্রত বৈদ্যনাথের প্রতি সহানুভূতিতে স্নিগ্ধ ও মোক্ষদার আচরণের প্রতিবাদে কিঞ্চিন্মাত্র তীক্ষ্ণ। উপসংহারে বৈদ্যনাথের প্রতি সমবেদনা পাঠকের চিত্তকে করুণরসে আপ্লুত

করে। ইহার বৈপরীত্যে দ্বিতীয় গল্পে শ্লেষাভিপ্রায় অধিকতর প্রকট, ও গল্পের সর্বদেহে পরিব্যাপ্ত। উহার পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে গূঢ় ব্যঙ্গার্থের শাণিত ঝলকে, ধনী, আচারমূঢ় গৃহকর্তার নির্বোধ আত্মবিরোধের প্রতি কুটিল কটাক্ষে।

সমাজ-সমালোচনামূলক গল্প

এই বিষয়ে 'যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ,' 'উলুখড়ের বিপদ,' ও 'হৈমন্তী' (জ্যৈষ্ঠ ১৩২১) এই তিনটি গল্পের নাম করা যাইতে পারে। সমাজের মূঢ় নির্যাতন, সমাজনীতির অসঙ্গতি ও অন্যায়, ব্যক্তির সহিত সমাজসত্তার সংঘর্ষ রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের বহু ছোটগল্প ও কিছু উপন্যাসের প্রেরণা যোগাইয়াছে। তবে রবীন্দ্রনাথের চেতনায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ এত প্রবল, যে তিনি খুব কম গল্পেই ব্যক্তিকে প্রতিষ্ঠানের ক্রীড়নকরূপে দেখাইয়া সমাজকে নিরঙ্কুশ প্রাধান্য দিয়াছেন। ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, তাহার প্রতিক্রিয়ার স্বকীয়তা প্রায় সব ক্ষেত্রেই সমাজসংঘর্ষের কাহিনীতে কোনরূপ বৈচিত্র্য সঞ্চার করিয়াছে। শরৎচন্দ্রের কথাসাহিত্যে ব্যক্তিমনের সচেতন বিদ্রোহ সামাজিক উৎপীড়নের নাট্যসংঘর্ষে ঘাতপ্রতিঘাতের তীব্রতার ও মানসবিস্ফোরণের সুযোগ দিয়াছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের গল্পে বিশুদ্ধ সামাজিক প্রেরণা মাত্র কয়েকটি গল্পে—যথা 'দেনা-পাওনা', 'রামকানাই-এর নির্বুদ্ধিতা' ও 'ত্যাগ'-এ—উদাহৃত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কেবল 'দেনা-পাওনা' খাঁটি সামাজিক প্রথার নিষ্ঠুরতার কাহিনী ও সম্পূর্ণ করুণরস-মূলক। ইহাতে করুণরস ছাড়া আর কোন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মিশ্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু শ্রেষ্ঠ জীবনশিল্পী এরূপ এককেন্দ্রিক যান্ত্রিক সংঘর্ষের চিত্রে তৃপ্তিলাভ করেন না, শুধু সমাজের বৈষম্য ও অত্যাচারের মুখপাত্র হইয়া প্রচারধর্মী কাহিনীর মধ্যে তিনি প্রতিভার যোগ্য অনুশীলনক্ষেত্র খুঁজিয়া পান না। কাজেই রবীন্দ্রনাথ শিথিল-বিস্তীর্ণ সমাজক্ষেত্র ছাড়িয়া পারিবারিক অন্তরঙ্গতার অন্তঃপুরে যে নিগূঢ়জটিল সমস্যার জাল বয়ন হইয়া থাকে তাহারই সূত্রনির্দেশে আত্মনিয়োগ করেন। 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা, ও 'ত্যাগ' এই দিক হইতে কিছুটা বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন। ইহারা সমাজপ্রথাশাসিত পরিবারজীবনের অন্তরঙ্গতর কাহিনী-

সমাজসমুদ্রবেষ্টিত, সাগরতরঙ্গতাড়িত গৃহদ্বীপের সূক্ষ্মতর কম্পনের ইতিহাস। রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা হইল চিরাচরিত সমাজনীতির অতিক্রমণজাত। সে সমাজচিহ্নিত দাগের অনুবর্তন না করিয়া স্বাধীন বিবেকবুদ্ধি ও সহজ ন্যায়বোধের দ্বারা চালিত হইয়া পরিবারমধ্যে এই অখ্যাতি অর্জন করিয়াছে। মৃত্যুকালে সে স্বজননিন্দিত হইয়া মহাযাত্রায় পা বাড়াইয়াছে। এখানে সমাজের প্রভাব প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষ। সমাজের জোলো দুধ পারিবারিক কটাহে সিদ্ধ হইয়া ঘনতা অর্জন করিয়াছে। 'ত্যাগ'-এ সমস্ত কাহিনীর পশ্চাৎপটে সমাজের বজ্র উদ্যত হইয়া আছে, কিন্তু এ বজ্রক্ষেপ আপতিত হইয়াছে স্নেহময় পিতা ও অন্যান্য হিতৈষী পরিজনবর্গের হাত হইতে। সামাজিক নিগ্রহের এই কাহিনী-বিন্যাসের মধ্যে বধূ কুসুমের আর্তি, স্বামী হেমন্তের নির্ভীক, সংগ্রামশীল প্রেমচেতনা, প্রতিবেশী প্যারীশঙ্কর ঘোষালের প্রতিহিংসামূলক চক্রান্ত ও বসন্তের মাদকতাময় ইন্দ্রজাল একটানা স্রোতে কিছুটা ঘূর্ণাবর্তের সঞ্চার করিয়া আখ্যানের বৈচিত্র্য ও আকর্ষণীয়তা বাড়াইয়াছে। সমাজচক্রের অন্ধ আবর্তনে ব্যক্তিত্ব কিয়ৎ-পরিমাণে নিজ গতিবেগস্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছে।

'যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ' সামাজিক উৎপীড়নের কাহিনী হইয়াও কিছুটা বিশেষ-লক্ষণচিহ্নিত। যজ্ঞেশ্বরের স্বল্পবিত্তশালিনী জ্যাঠাইমার নাতিনীর জন্য জমিদারনন্দনকে বররূপে পাওয়ার দুরাশা ও বিভূতিভূষণের উপযাচক হইয়া গরীবের মেয়ের পাণিপ্রার্থনা এই অসম মিলনের ভিত্তি রচনা করিয়াছে। জামাই-এর অভিজাত জমিদারপিতা এই সম্বন্ধকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিয়া শেষ পর্যন্ত অতি অনিচ্ছুকভাবে ছেলের মতে মত দিয়াছেন। কিন্তু যখন তাঁহার বংশগৌরব ও ঐশ্বর্যসমারোহের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তিনি নিজের বাড়ীতে বিবাহ দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন তখন দিদিমার আহত সম্মান অশ্রুজলসিক্ত হইয়া ও হবু জামাতার সঙ্কল্পের সিমেণ্টে গাঁথা হইয়া এই বড়-মানুষী, কিন্তু দেশাচারবিরুদ্ধ প্রস্তাবের পথে এক দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর তুলিয়াছে। অনেক বাদবিতণ্ডা ও তিক্ততাসৃষ্টির পর ছেলেরই ইচ্ছাশক্তি জয়ী হইয়াছে। শেষ বাদ সাধিয়াছে দৈবদুর্যোগ। অবিশ্রান্ত বর্ষণ কন্যাকর্তার সামান্য আয়োজনকে বিপর্যস্ত করিয়া দিয়া তাঁহার বরযাত্রী-সম্বর্ধনার সমস্ত ব্যবস্থাকে বানচাল করিয়াছে। বরকর্তা ও বরযাত্রীদের আভ্যন্তরীণ উত্তাপ এই অকালবর্ষণে প্রশমিত না হইয়া বরং কন্যাকর্তার অসহায়তায় আরও ক্রূর

জিঘাংসায় উদ্দীপ্ত হইয়াছে। আহারের একমাত্র সম্বল ছানা বরানুগামীদের দৌরাত্ম্যে উদরস্থ না হইয়া কর্দমে লুটাইয়াছে। এমন সময়ে বর আবার বরাভয় মূর্তিতে আবির্ভূত হইয়া সমস্ত সঙ্কটের অবসান ঘটাইয়াছে। ধনী-দরিদ্রের অসম কুটুম্বিতা প্রধানতঃ বরের উদারতা ও দৃঢ়সঙ্কল্পে প্রত্যাশিত বিয়োগান্ত পরিণতি হইতে মিলনমধুর সমাপনে প্রচলিত রীতির ব্যতিক্রম করিয়াছে। সমাজ ও পরিবারের প্রতিকূলতা একক ব্যক্তিশক্তির নিকট হার মানিয়াছে।

'উলুখড়ের বিপদ' গল্পে কিন্তু এরূপ রূপকথাসুলভ প্রসন্ন পরিণাম ঘটে নাই, দুর্জনের কুটিল চক্রান্ত মানবিক উদারতার শুভ্র প্রয়াসকে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। নায়েবের গৃহের যুবতী দাসীকে নায়েবের লালসা হইতে রক্ষা করিতে গিয়া দেশবিখ্যাত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হরিহর ভট্টাচার্য জমিদারী শাসনের জালে জড়াইয়া পড়িলেন। মিথ্যা মোকদ্দমার দায়ে পড়িয়া ভট্টাচার্য মহাশয় মুন্সেফ ও জজের সরকারী মনোমালিন্যের ফলভোগী হইয়া ন্যায়বিচার হইতে চূড়ান্তভাবে বঞ্চিত হইলেন। রাহু ও কেতুর অশুভ প্রভাবের সম্মিলন তাঁহার ভাগ্যাকাশে প্রতিকারহীন দুর্দৈব ঘটাইল। জমিদারী অপকৌশলের সহিত হাকিমী মর্যাদা যুক্ত হইয়া যে দুশ্ছেদ্য ফাঁস রচনা করিল তাহা হইতে হতভাগ্য ব্রাহ্মণ মুক্তির কোন উপায় পাইলেন না। ছোটগল্পের ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যে যে সমাজে পাপের জয় ও পুণ্যের পরাজয় অনিবার্যভাবেই ঘটে তাহার বীভৎস বাস্তবচিত্র উন্মোচিত হইল।

'হৈমন্তী' (জ্যৈষ্ঠ ১৩২১)—প্রায় বার বৎসর ব্যবধানের পর 'সবুজপত্র' যুগে লেখা গল্প। কিন্তু সময়ের দিক দিয়া 'সবুজপত্রের' সমকালীন হইলেও রীতির দিক্ দিয়া ইহাতে 'সবুজপত্র'-এর রচনাশৈলী ও জীবনদর্শনের কোন ছাপ নাই। যদিও 'সবুজপত্র'-এর প্রথম আবির্ভাব ঘটে ১লা বৈশাখ ১৩২১, তথাপি মনে হয় যে এই জ্যৈষ্ঠমাসে প্রকাশিত গল্পটি 'সবুজপত্র-এর পূর্বকালীন ও উহার প্রাক্-ধারারই অনুসরণ। ইহা একটি পরিবারজীবনের নববধূর প্রতি শ্বশুরালয়ের হৃদয়হীন ও স্বার্থকলুষিত আচরণের কাহিনী, কিন্তু এই বর্ণনা ইহার বাহিরের কাঠামোর সহিত শিথিলসংশ্লিষ্ট, ইহার অন্তঃপ্রকৃতির ইঙ্গিতবাহী নয়। এই অতিসাধারণ খোলসের মধ্যে একটি অসাধারণ, আত্মসমাহিত নারী-স্বভাবের মাধুর্য, একটি বিশুদ্ধ, পবিত্র চেতনার শুভ্র দীপ্তি, একটি সূক্ষ্ম সৌকুমার্যের সৌরভ বিচরণশীল। গল্পটির



ভূমিকা ও বর্ণনাভঙ্গীও আশ্চর্য শিল্পকৌশলের নিদর্শন। হৈমন্তীর স্বল্পায়ু জীবনকাহিনীর পটভূমিকারূপে তাহার গুণমুগ্ধ স্বামীর দাম্পত্যসম্পর্কের অনুতপ্ত বিচার, নিজের ও নিজ পরিবারে রুচিস্থূলতার মননশীল স্বীকৃতি বিন্যস্ত হইয়া হৈমন্তীর চরিত্রসুষমাকে আরও বিকশিত করিয়াছে।

হৈমন্তীর পিতা ও হৈমন্তী উভয়ের চরিত্র পরস্পরের পরিপূরকরূপে না দেখিলে উভয়েরই পরিচয় অসম্পূর্ণ থাকে। পিতা ও কন্যার মধ্যে একই আত্মার দুইটি প্রতিচ্ছবি দেখা যায়। উভয়েই নিঃসঙ্গ পর্বতের মত মৌন বা মৃদুভাষী মহিমায় চিহ্নিত, উভয়েরই মধ্যে পর্বতশৃঙ্গের ঋজু সরলতা প্রতিভাসিত, উভয়ের চরিত্রেই একটা নিগূঢ় আত্মসংবৃতি সম্ভ্রম জাগায়। তফাতের মধ্যে পিতা বালসূর্যকিরণস্নাত গিরিচূড়ার ন্যায় প্রসন্নস্মিতহাস্যদীপ্ত; আর মেয়ে পার্বত্য লতার মত নিরুচ্ছ্বাসলাবণ্যময়ী। প্রণয়ের আবেশময় দিক্‌টা হৈমন্তীর জীবনে একেবারেই অবিকশিত—তাহার যৌবনচাঞ্চল্য মনের গণ্ডী ছাড়াইয়া দেহতটে তরঙ্গিত হইয়া উঠে নাই। দাম্পত্যপ্রেমের মাদকতা সে অপূর্ব সংযমের সহিত আত্মনিরুদ্ধ রাখিয়াছে। তাহার কৌমার্যের হিমানীস্তূপ কখন যে গলিয়া যৌবনস্রোতস্বতীতে প্রবাহিত হইয়াছে তাহার কোন রূপরেখা হাবভাবভঙ্গীতে চিহ্ন রাখিয়া যায় নাই। সে শ্বশুরবাড়ীর রূঢ় প্রতিবেশে দেহ-মনে শুকাইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু কোন প্রতিবাদ বা বিক্ষোভে তাহার অশালীনতা প্রকট হয় নাই। তাহার মনে যাহা দারুণতম আঘাত হানিয়াছে তাহা তাহার পিতার প্রতি শ্বশুরবাড়ীর লোকের অসম্ভ্রম ও অবজ্ঞা। মূল কাটা গেলে যেমন সতেজ তরু বিবর্ণ হইয়া যায়, তেমনি পিতৃনির্ভরতার বন্ধন শিথিল হইয়া যাওয়াতে তাহার সমস্ত জীবন বিস্বাদ ও অর্থহীন হইয়া গিয়াছে। তাহার পিতা তাহাকে লইয়া যাইতে আসিয়া রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যাত হইয়াছেন। অলক্ষিত ব্যাধির বীজাণুতে তাহার জীবনীশক্তি নিঃশেষ হইয়া সে ধীরে ধীরে জীবনবৃন্ত হইতে খসিয়া পড়িয়াছে। তাহার জীবনচরিতকার তাহার যে চিত্রটি আঁকিয়াছে তাহা যেমন সুকুমার তেমনি অন্তর্মুখী। তাহার স্বভাবকোমলতার সহিত পরিবেশসম্পর্কের বিরোধ, প্রাত্যহিক সংসারযাত্রার ছোটখাট মিথ্যাচার, অসঙ্গতি কত মর্মান্তিকভাবে তাহাকে আঘাত করিয়াছে, ও সেই আঘাত-পরম্পরার নিঃশব্দ পরিপাকে সে ভিতরে ভিতরে কতটা জীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, তাহার স্বামীর ক্লীব নিশ্চেষ্টতা যে এই ক্ষয় প্রতিরোধে কতটা অক্ষম

প্রতিপন্ন হইয়াছে—এই সমস্ত কার্যকারণসূত্রের জটিল বয়নশিল্প আশ্চর্যভাবে রূপ পাইয়াছে। রবীন্দ্র-প্রতিভা একটি অতিসাধারণ পরিবারচিত্র-অঙ্কনের সংক্ষিপ্ত পরিসরে ব্যক্তিসত্তার নিগূঢ়তায় কত গভীর ও অভ্রান্তভাবে প্রবেশ করিয়াছে গল্পটি তাহারই এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত।

অতিপ্রাকৃত ঘটনামূলক

তৃতীয় পর্যায়ের একমাত্র এই শ্রেণীর গল্পটি—'মণিহারা' (অগ্রহায়ণ ১৩০৫) পূর্বতন পর্যায়ের আর দুইটি অতিপ্রাকৃত গল্পের সহিত তুলনায় নূতন দৃষ্টিভঙ্গী ও পরিবেশরচনার লক্ষণান্বিত। 'নিশীথে' (মাঘ ১৩০১) ও 'ক্ষুধিত পাষাণ' (শ্রাবণ ১৩০২)—ইহাদের সহিত কালগত ব্যবধান দুই বৎসরের অধিক। 'নিশীথে' গল্পটি সম্পূর্ণভাবে মনোবিকারভিত্তিক। দাম্পত্য আদর্শচ্যুতির জন্য অপরাধবোধ এই মনোবিকারের উদ্দীপক, নিশীথরাত্রির নির্জনতার মধ্যে হঠাৎশ্রুত ধ্বনিতরঙ্গ উহার উপলক্ষ্য ও আত্ম-উদ্‌ঘাটনের অদম্য আবেগ উহার প্রকাশের পিছনে বিস্ফোরক শক্তির ন্যায় উৎক্ষিপ্ত। দক্ষিণারঞ্জনের মানস গঠনের মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল যাহার জন্য একটা ক্ষণিক অভিঘাত উহার চেতনাকোষে চিরসঞ্চিত রহিয়াছে ও স্মৃতি-অনুষঙ্গের সূত্রে অতীত বেদনা অনুভবলোক হইতে আর্তধ্বনির বিভ্রমে ইন্দ্রিয়জগতে আর্তধ্বনির বিভ্রমে পুনরুদ্ধৃত হয়। প্রথম পক্ষের স্ত্রীর চরিত্রগাম্ভীর্য, তাঁহার সেবাগ্রহণে অনিচ্ছা ও স্বামীর সমস্ত আত্মসুখলোলুপতার অকুণ্ঠ প্রশ্রয়, মনোরমার সহিত বিবাহ নিষ্কণ্টক করিবার উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছামৃত্যুবরণ—এই সমস্ত স্বামীর মনে এরূপ অনপনেয় রেখায় অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল, যে কালের ও জীবনের নব অভিজ্ঞতার প্রলেপ উহাকে মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই। উপলক্ষ্য পাইলেই পূর্বস্মৃতি আবার অবচেতন হইতে চেতনলোকে জাগিয়া উঠিত। সাময়িকতার ক্ষীণ বন্ধন ছাড়াইয়া প্রথমা স্ত্রীর মনোরমার প্রথম আবির্ভাবক্ষণে সেই ত্রস্ত প্রশ্ন—"ও কে, ও কে, ও কে গো!" যেন অসীম দেশে ও অনন্তকালে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, মানবাত্মার চিরন্তন মর্মকোষে চিরমুদ্রিত হইয়া অমরতা লাভ করিয়াছে। এই একটি ক্ষুদ্র প্রশ্নের অসাধারণ বেধশক্তির কারণ বোধ হয় এই যে এই কয়েকটি সামান্য কথায় প্রথমা স্ত্রীর চির-অবদমিত আবেগোৎকণ্ঠা একবারমাত্র

আত্ম-উন্মোচন করিয়াছে, জীবনভোর চাপা সত্য বারেকের আত্মবিস্মৃতিতে সবেগে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে। ইহাই প্রথমা স্ত্রীর মনোভাবের সত্য দ্যোতনারূপে অনুতপ্ত স্বামীর চেতনায় অনুবিদ্ধ রহিয়াছে। ইহার পরিবেশ-রচনার জন্য প্রয়োজন কেবল নদীতীরের নির্জনতা ও এই নির্জনতায় হঠাৎ উদ্গীরিত ধ্বনি-কাকলী। বলাকার পক্ষধ্বনির মত এখানেও শব্দতরঙ্গ বিশ্বরহস্যের মর্মবিদারণে নিয়োজিত। প্রকৃতপক্ষে গল্পটি অতিপ্রাকৃত নয়, আত্মদমনে অক্ষম বিকারেরই অভিব্যক্তি।

'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর মধ্যে অতিপ্রাকৃতের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। অতীতের অতৃপ্ত বিলাসবিভ্রম যেন প্রাচীন প্রাসাদটির আবহের প্রতি অণু-পরমাণুর মধ্যে চিরসংসক্ত রহিয়াছে। পূর্বানুভবসমষ্টি যেন চিন্ময় সত্তায় পুনর্জন্মগ্রহণ করিয়া সমস্ত আকাশ-বাতাস ও আধুনিক যুগের প্রাসাদবাসী বিভিন্ন জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত ও নূতন আদর্শে লালিত সরকারী কর্মচারীর চেতনাকে আবিষ্ট করিয়াছে। অতীতের এই সম্ভোগলালসা এমন প্রবল ও সর্বগ্রাসী যে ইহা জড়বস্তু হইতে চেতনসত্তায় সঞ্চারিত হইয়া অতীতের দৃশ্যাবলীর পুনরভিনয় ঘটাইয়াছে। অতীত যেন মূর্তি ধরিয়া, শব্দে, নৃত্যে ও ভাবদ্যোতনায় একটা ইন্দ্রিয়াতীত তরঙ্গ তুলিয়া বস্তুবিভ্রমে ঘনীভূত হইয়াছে। অনির্বাণ জীবনপিপাসা যে ইহজন্মের সীমা অতিক্রম করিয়া জন্মান্তরের ব্যক্তিসত্তায় সঞ্চারিত হইয়া উহার রুচি ও মনোবৃত্তিকে সূক্ষ্মভাবে প্রভাবিত করে তাহা অধ্যাত্মবিজ্ঞানের স্বীকৃত সত্য। ভূতপূর্ব বিলাসলীলার নিষ্ক্রিয় রঙ্গভূমি বাড়ীঘরও যে অনুরূপ-অনুভূতি-উদ্দীপনে সমর্থ তাহা জনশ্রুতি বা ব্যক্তি-অভিজ্ঞতায় অনিশ্চিত প্রমাণে লোকসংস্কারে বদ্ধমূল। আলোচ্য গল্পে এই প্রত্যয় কল্পনার ঐশ্বর্যময় উদ্বোধনে ও মনস্তাত্ত্বিক অনুবাসনে উপলব্ধ সত্যরূপে বোধিলোকে সংক্রামিত করার আশ্চর্য সফল চেষ্টা উদাহৃত হইয়াছে। সুদূর অতীতে অভিনীত দৃশ্যাবলী ইন্দ্রিয়গ্রামের নিকট প্রত্যক্ষবৎ অনুভবঘনতায় নূতন জীবন লাভ করিয়াছে। এক যুগের জীবনাভিজ্ঞতা অন্য-যুগের শিরাস্নায়ু-ধমনীতে সংক্রামণের মধ্যে এই অতিপ্রাকৃতবোধ নিহিত। পাগলা মেহের আলিকে এই মায়াপ্রাসাদের মোহাবেশ-উদ্‌ভ্রান্তির বাস্তব প্রমাণরূপে হাজির করা হইয়াছে। তাজমহলকে যদি একনিষ্ঠ প্রেমের প্রশান্ত আনন্দসত্তার শুভ্র মর্মররচিত প্রতীক রূপে অভিহিত করা যায়, তবে 'ক্ষুধিত-পাষাণ'-এর অট্টালিকাটি উহার বিপরীত-ব্যঞ্জনাবহ

জরাতুর কামনার অশান্ত মরীচিকা-প্রতিচ্ছবি রূপে গৃহীত হইতে পারে।

'মণিহারা' গল্পটি জটিলতর, স্ববিরোধদীর্ণ উপাদানে গঠিত। প্রথম দুইটি-গল্পের বাস্তব পটভূমিকা উহাদের অন্তর্লোকের সঙ্গে মোটামুটি সঙ্গতি রক্ষা করিয়াছে। বাস্তব জীবন বিপরীত সাক্ষ্যে অতিপ্রাকৃতের আবেশ-ঘনতাকে বিড়ম্বিত করার প্রত্যক্ষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় নাই। কল্পনার ইন্দ্রজাল যে তাৎক্ষণিক প্রত্যয়নিবিড়তাকে উদ্বোধন করিয়াছে তাহাকে বস্তুজগতের বিরুদ্ধাচরণের সম্মুখীন হইতে হয় নাই। গৃহশত্রু বাহিরের অবিশ্বাসের সঙ্গে যোগ দেয় নাই। এই গল্পে কিন্তু ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে। 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এ দীর্ঘপ্রতীক্ষিত ট্রেনের আগমন লেখককে কার্যকারণসূত্র-নির্দেশের দায়িত্ব হইতে মুক্তি দিয়া ভৌতিক আবির্ভাব-কাহিনীর আকস্মিক পরিসমাপ্তি ঘটাইয়াছে। লেখক অপ্রত্যাশিতের নদীগর্ভ হইতে অপ্রাকৃতের রূপালি মাছ জাল ফেলিয়া ধরিয়াছেন কিন্তু এই জালক্ষেপটির সত্যতা সম্বন্ধে তাঁহাকে পাঠকের নিকট কোন জবাবদিহি করিতে হয় নাই। 'মণিহারা' গল্পে জালক্ষেপের ব্যাপারটাই বর্ণিত ঘটনার যাথার্থ্যেই আমাদের মনে সংশয় জাগাইয়াছে।

আখ্যানটির বিবৃতিকার স্বয়ং-ভুক্তভোগী নহে, ঘটনার সহিত অসংশ্লিষ্ট, ও জনশ্রুতির মাধ্যমে উহার পরোক্ষ-জ্ঞাতা একজন তৃতীয় ব্যক্তি। আরও কৌতুকের বিষয় এই যে ভৌতিক রহস্যের সাক্ষাৎ-অভিজ্ঞ পুরুষটি কৌতূহলী শ্রোতারূপে অপরের প্রমুখাৎ তাহার নিজসম্বন্ধীয় রোমাঞ্চকর কাহিনী শুনিতেছিল। এই দীর্ঘ বিবৃতির মধ্যে সে সম্পূর্ণ নীরব ছিল, নিজ ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়ার কোন ইঙ্গিতই দেয় নাই। আখ্যায়িকার শেষে সে কেবল গল্পের সত্যতা সম্বন্ধে বক্তার নিজ অভিমত জিজ্ঞাসা করিয়াছে ও বক্তার প্রশ্নের উত্তরে তাহার নিজের নাম স্বীকার করিয়া তাহার স্ত্রীর তাহার নাম যে মণিমালিকার পরিবর্তে গদ্যময় নৃত্যকালী ছিল ইহাই প্রকাশ করিয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে শ্রোতা বা বক্তা কেহই গল্পটির তথ্যভিত্তিকতা সম্বন্ধে নিঃসংশয় ছিল না। ইহা খুবই স্বাভাবিক, এক হিসাবে অনিবার্য, যে এই কাল্পনিকতার সংশয় পাঠকের ফলশ্রুতিতেও সংক্রামিত হইবে।

মণিমালিকা নামটি যদি কাল্পনিক হয়, তবে গল্পের পটভূমিকারূপে

উপস্থাপিত উহাদের দাম্পত্যসম্পর্কের বিবরণ ও উহার পিছনে সমস্ত সমাজতাত্ত্বিক মনন-ভাবনা, সমস্ত পরিবেশের পুনর্গঠন-ক্রিয়াটিও অমূল তরুর মত পল্লবিত কল্পনাবিলাস মাত্র। ঘটনাটির যে মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উহাকে মানবস্বভাবের সহিত সমন্বিত করিয়াছে তাহার কোন অস্তিত্বই নাই। সুতরাং কল্পনাশ্রয়ী আখ্যায়িকাটি যেমন বাস্তবভিত্তিহীন, উহার মনোবিকারের শূন্যগর্ভতাও তেমনি স্বতঃসিদ্ধ। স্তম্ভহীন প্রাসাদের ন্যায় ইহার বস্তুবন্ধন ও মানসবৃত্তির সূক্ষ্ম সমর্থন এক নিরালম্ব ইন্দ্রজাল-কুহকের পর্যায়ভুক্ত। রবীন্দ্রনাথ যে সৃষ্টিপ্রত্যয় লইয়া তাঁহার পূর্বতন দুইটি অতিপ্রাকৃত গল্প রচনা করিয়াছিলেন এই গল্পের শিল্পীর সেই আত্মনিষ্ঠারও অভাব প্রকট। তিনি প্রথমতঃ পরের মুখে গল্পটি সন্নিবিষ্ট করিয়া, অপরের জীবনদর্শন উহার উপর আরোপ করিয়া ও উপসংহারে উহার মূল উপজীব্যের প্রতি সংশয়ের ইঙ্গিত দিয়া সমস্ত গল্পটির মধ্যে স্ববিরোধের বীজ বপন করিয়াছেন ও পাঠকের মনে এই সংশয়াত্মিকাবুদ্ধির গূঢ় অনুপ্রবেশে প্রশ্রয় দিয়াছেন। উদ্ভাবনী-শক্তির দিক্ দিয়া এমন একটি অনবদ্য শিল্প-নির্মিতিকে ত্রিশঙ্কুর মত মধ্যআকাশে অবলম্বনহীনভাবে ঝুলাইয়া রাখিয়া তিনি স্রষ্টার মুখ্য দায়িত্বকেই অস্বীকার করিয়াছেন। সৃষ্টির বিশ্বাসযোগ্যতার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়াই তিনি একটি মনোহর ইমারত তুলিয়াছেন। এই স্ফটিক প্রাসাদ মনুষ্যবাসের উপযোগী হইল কি না সে বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন রহিয়াছেন।

গল্পের ভিত্তিস্থাপনে শৈথিল্য ও উহার যাথার্থ্য সম্বন্ধে সংশয়-উদ্রেকের কথা বাদ দিলে, উহাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি মানস-বিভ্রান্তির চিত্ররূপে বিচার করিলে, উহার স্থাপত্যশিল্প, অন্তঃসঙ্গতিপূর্ণ অঙ্গসন্নিবেশকে অনবদ্য বলিয়া মনে হয়। ফণিভূষণের অনুভূতিতে যে উহার অন্তর্হিতা স্ত্রীর অঙ্গে অঙ্গে আভরণদ্যুতিময় অস্থিকঙ্কালটি উপর্যুপরি তিন রাত্রি ব্যাপিয়া প্রেতচ্ছায়ারূপে আবির্ভূত হইয়াছিল তাহা চিত্তের একাগ্রতাপ্রসূত স্বপ্নবিভ্রম বলিয়া মনস্তত্ত্বসম্মতভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহা ঠিক অলৌকিক নয়, সমস্ত মানস-বৃত্তির কেন্দ্রীভূত তন্ময়তায় একান্তভাবে প্রতীক্ষিত মৃত প্রিয়জনের ছায়া-প্রক্ষেপ। পরলোকের তিমির-যবনিকা ভেদ করিয়া সমস্ত মনপ্রাণ দিয়া কাঙ্ক্ষিত প্রেয়সী যেন জাগ্রৎ-সুষুপ্তির মধ্যবর্তী স্বপ্নলোকের রূপবলয়ের মধ্যে ধরা দিয়াছে। আমাদের সব স্বপ্নই এই অবচেতননিমজ্জিত বাসনা-

সংস্কারের বহির্নিষ্ক্রমণ। সুতরাং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ইহার মধ্যে অলৌকিকের কোন বোধাতীত রহস্যস্পর্শ না থাকিতেও পারে। আসল প্রশ্ন হইল যে এখানে মৃতের পুনরাবাহনের উপযোগী পর্যাপ্ত মানস-উৎকণ্ঠা, ইন্দ্রিয়বিক্ষেপ-মুক্ত সর্বাত্মক ইচ্ছাশক্তি ও সর্ববিষয়-প্রত্যাহৃত, এককেন্দ্রসংহত নিবিষ্টচিত্ততার সমাহার হইয়াছে কি না। লেখক এই সীমিত পরিসরে অপূর্ব দক্ষতার সহিত আখ্যানের সমস্ত গ্রন্থিগুলিকে সংযোজিত করিয়াছেন। বক্তা মাস্টারের ফণিভূষণের দাম্পত্য জীবনের বিশ্লেষণ কতটা তথ্যানুগ তাহা মীমাংসিত না হইলেও, ফণিভূষণ তাহার কল্পিত ধ্যানতন্ময়তার অকৃত্রিমতার কোন প্রতিবাদ জানায় নাই। তাহার স্ত্রীর প্রতি আকর্ষণের প্রগাঢ়তা জীবনদর্শন-প্রভাবিত হউক না হউক তাহার আকুল কৃচ্ছ্র সাধনে তাহা স্বয়ংপ্রকট। সে সর্বস্ব পণ করিয়া তাহার মৃতা স্ত্রীর দর্শনলাভের জন্য যে মানস-অনুষ্ঠান করিয়াছিল তাহাতেই তাহার প্রেমিক সত্তা সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। যোগের সংজ্ঞা যদি চিত্তবৃত্তিনিরোধ হয়, তবে সে যোগাসনে স্থির হইয়াই পত্নীদর্শনের জন্য সাধনা করিয়াছে। সমস্ত পরিজনসংসর্গবিবিক্তি ও একাকীত্ববরণ, সমস্ত জড় বাধার অপসারণ, দেহমনের সমস্ত প্রবেশপথের অকুণ্ঠ উন্মোচন প্রভৃতি প্রক্রিয়ার দ্বারা সে এই জীবনমৃত্যুর ব্যবধানবিলোপের দুশ্চর তপস্যায় ব্রতী হইয়াছে তাহার আত্মিক প্রস্তুতি সর্বাঙ্গীণ ও সম্পূর্ণ। বাতাবরণের আনুকূল্য এই মানস-নিষ্ঠার সহিত পূর্ণ সহযোগিতা করিয়াছে। বর্ষানিশীথে অবিরত বৃষ্টিপাতের নিশ্ছিদ্র যবনিকা, দূরাগত, বর্ষণস্তিমিত যাত্রার গানের সুর, অন্তরের সদা-শঙ্কিত উৎকণ্ঠা,—এসবই লৌকিক জগতের ভিড় সরাইয়া, সব বস্তুচিহ্ন মুছিয়া অশরীরী আবির্ভাবের সহিত আত্মিক সংযোগের পথটি সর্ববাধামুক্ত রাখিয়াছে। যাত্রার দলের গানের সুরটি যেন পরলোকপ্রবাসিনীকে আগমনসঙ্কেত জানাইয়াছে—এই মর্মবিগলিত, ভাষাহীন সুরের আভাসসূত্র-অনুসরণেই যেন অদৃশ্যচারিণী মরলোকে প্রত্যাবর্তনের সরণিটি খুঁজিয়া পায়। শেষ পর্যন্ত নদীর শেষ সোপানে পা দিয়া ও নদীজলস্পর্শ করিয়াই তাহার স্বপ্ন টুটিয়া গেল। কিন্তু আখ্যায়িকামধ্যে তাহার যে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সঙ্কেতিত হইয়াছিল, তাহা কার্যতঃ মিথ্যা প্রতিপন্ন হইয়াছে। সে যে নদীর প্রবল স্রোত-বাহিত হইয়া সলিলসমাধি লাভ করে নাই, পরন্তু জীবিত থাকিয়া

নূতন ব্যবসায়সূত্র অবলম্বন করিয়াছে ও নিছক স্বাভাবিক স্মৃতিপ্রেরণায় পূর্ববাসভূমিতে ফিরিয়াছে তাহা গল্পের উপসংহারে নিশ্চিত সত্যরূপে জানা গিয়াছে।

৩

জীবননিষ্ঠ ও জীবনের মর্মরসলালিত গল্প

এই শ্রেণীতে বর্তমান পর্যায়ের বিভিন্নবিষয়ক ও বিচিত্র আঙ্গিকে রচিত শ্রেষ্ঠ গল্পগুলি অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। ইহাদের মধ্যে 'দৃষ্টিদান' (পৌষ ১৩০৫), ও 'দুর্বুদ্ধি' (ভাদ্র ১৩০৭), নাটকের বহির্লক্ষণ ও অন্তঃপ্রকৃতি-বিশিষ্ট 'কর্মফল' (পৌষ ১৩১০) 'মাস্টারমশায়' (আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩১৪), 'রাসমণির ছেলে' (আশ্বিন ১৩১৮), 'পণরক্ষা' (পৌষ ১৩১৮) ও 'সবুজপত্রে' প্রকাশিত 'হালদারগোষ্ঠী' (বৈশাখ ১৩২১) ও 'হৈমন্তী' (জ্যৈষ্ঠ ১৩২১)-র নাম করা যাইতে পারে। ইহাদের ভিতর 'হৈমন্তী' পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। 'হালদারগোষ্ঠী' ও 'হৈমন্তী' 'সবুজ পত্রে' প্রকাশিত হইলেও যেহেতু ইহারা 'সবুজপত্র'-যুগের জীবনদৃষ্টি ও রচনারীতির বিশিট লক্ষণবর্জিত সেইজন্য উহাদিগকে বর্তমান কাল-ও প্রেরণা-পর্বে সন্নিবিষ্ট করা গেল। ইহাদের মধ্যে কথিত ভাষার প্রয়োগ ও সমীক্ষার তীক্ষ্ণ, তির্যক ভঙ্গী অনুপস্থিত। সেইজন্য মনে হয় যে এই দুটি গল্প 'সবুজপত্র'-প্রকাশের পূর্বে প্রাচীন ধারা অনুসরণে লেখা ও কিছু পরে আবির্ভূত মাসিক পত্রিকায় মুদ্রিত। এগুলিকে নবজাত পত্রিকার সাধারণ আদর্শের ছাঁচে না ঢালিয়াই ও তদুপযোগী পরিবর্তন-পরিমার্জন ছাড়াই পত্রিকার অঙ্গীভূত করা হইয়াছে। আরও লক্ষণীয় যে, 'কর্মফল', 'মাস্টারমশায়', 'রাসমণির ছেলে' ও 'হালদারগোষ্ঠী' ছোট গল্প অপেক্ষা সংক্ষিপ্ত উপন্যাসেরই বেশী সমধর্মী। ইহাদের ক্ষেত্রে প্রাক্-কথনের দীর্ঘ ও সযত্নরচিত ভূমিকা, কাহিনীর কালব্যাপ্তি ও চরিত্র-রূপান্তরের নিগূঢ়তা, শৃঙ্খলযোজনার পারিপাট্য ও প্রতি গ্রন্থি-পরীক্ষার ত্বরাহীন, পর্যাপ্ত আয়োজন। মনন-বিশ্লেষণের প্রাচুর্য ও সাঙ্কেতিক পদ্ধতির আপেক্ষিক অভাব—এই সবকেই ইহাদের উপন্যাসধর্মিতার প্রমাণরূপে উপস্থাপিত করা যাইতে পারে। উপন্যাসধর্মী ছোটগল্পের অন্তঃপ্রকৃতি ও

রূপকল্প সম্বন্ধে 'নষ্টনীড়'-প্রসঙ্গে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে, এখানে উহার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

মনে হয় এই সুপরিসর ছোট গল্পগুলিতে রবীন্দ্রনাথ পারিবারিক ঐতিহ্য-প্রভাবিত ব্যক্তিজীবনসমস্যার বিশেষ জটিলতা পরিস্ফুট করিতে চাহিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে পরিবার-পরিবেশ ও অন্তর্জীবনসঙ্কট সমতুল্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ও উভয় উপাদানই কার্যকারণসম্বন্ধে নিবিড়ভাবে সমন্বিত। কাজেই ইহাদের ভূমিকাংশ মূল ঘটনার সহিত সমপরিমাণ সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও প্রকাণ্ড আয়তনের দাবী করে। এইজন্যই ইহাদের বক্তব্যকে ছোটগল্পের নির্ধারিত সীমার মধ্যে সঙ্কুলান করার অসুবিধা আছে। এক এক জাতীয় ফলের রস-আস্বাদনের জন্য ইহারা কিরূপ মৃত্তিকা হইতে পুষ্টি আহরণ করে, কিরূপ আবহাওয়ায় লালিত হয় তাহা জানিবার প্রয়োজন থাকে। সেইরূপ এইরূপ সম্প্রসারিত ছোটগল্পের পাত্র-পাত্রীরা স্বয়ংসম্পূর্ণ বা সাধারণধর্মচিহ্নিত জীবনের অধিকারী নয়। তাহাদিগকে বুঝিতে হইলে তাহাদের উত্তরাধিকারলব্ধ, বা বংশচেতনাপ্রভাবিত মানস-বৈশিষ্ট্য ও জীবনদর্শনের উৎসমুখে পিছন-হাঁটা অপরিহার্য হইয়া উঠে। ইহাদের চারিত্রিক প্রতিক্রিয়ার ব্যাখ্যাস্বরূপ উহাদের প্রাতিবেশলালনরীতিরও প্রভাব পরিমাপ করার প্রয়োজনকে মানিতে হয়। প্রত্যেকটি গল্পের পূর্ণতর আলোচনার সময় এই যুক্তির প্রযোজ্যতা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা হইবে। এখানে গল্পগুলির অবয়বস্ফীতির কারণনির্দেশ-উপলক্ষ্যে ইহা উল্লিখিত হইল।

'দৃষ্টিদান' ও অপেক্ষাকৃত নিম্নতর উৎকর্ষস্তরের 'দুর্বুদ্ধি' গল্পে ছোট-গল্পের প্রচলিত পরিসর উল্লঙ্ঘনের কোন প্রয়োজন অনুভূত হয় নাই। ইহারা জীবনের কেন্দ্রক্ষরিত রসে পুষ্ট হইলেও ছোটগল্পের নির্দিষ্ট সীমার মধ্যেই সহজ পরিণতি লাভ করিয়াছে। 'দৃষ্টিদান' রবীন্দ্র-প্রতিভার একটি শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি—ইহা রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প-রচনার স্বর্ণযুগের মুদ্রাঙ্কিত। এখানে একটি পরিপূর্ণ আনন্দময় দাম্পত্য জীবনের স্বচ্ছ প্রবাহ দৈবশাপে অভিহত ও চরিত্রবিকারে কলুষিত প্রতিবন্ধকের দ্বারা খণ্ডিত হইয়াছে। এই অশুভ আবির্ভাবটিই সমস্ত গল্পটির ঘটনা ও পাত্র-পাত্রীদের চিত্তসঙ্কটের উৎসরূপে উহার গতি-প্রকৃতিকে নিরূপিত করিয়াছে। নায়িকা কুমুর চোখের অসুখ হইয়া উহার স্বামী হবু ডাক্তারের মূঢ় আত্মবিশ্বাসে দুরারোগ্য হইয়া উঠিয়াছে ও শেষ পর্যন্ত অন্ধত্বে চরম রূপ লইয়াছে। কিন্তু এই চোখ-হারানর চেয়ে

যাহা কুমুর মনে দারুণতর উৎকণ্ঠা জাগাইয়াছে তাহা চিকিৎসা লইয়া তাহার স্বামী ও দাদার মধ্যে মতভেদ ও তীব্র মনোমালিন্য। সে চোখ হারাইবার বিপদ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন থাকিয়াও স্বামীর উপরই ষোল আনা নির্ভর করিয়াছে ও দাদাকে তাহার চিকিৎসার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়াছে। এমন কি গোঁয়ার স্বামীর আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিতে সে তাহারই চিকিৎসাধীনে আত্মসমর্পণ করিয়াছে ও জানিয়া-শুনিয়া অন্ধতার পথে অগ্রসর হইয়াছে। সাহেব ডাক্তার আসিয়া যখন স্বামীকে ভৎর্সনা করিয়াছে, তখনও সে স্বামীর উপর পূর্ণ আস্থার কপট সম্মান জানাইয়াছে। সুতরাং সে স্বেচ্ছায় অন্ধত্ব বরণ করিয়া লইয়াছে আর দাদা ও স্বামীর মনান্তর মিটাইতে তাহার নিজের ভুল ঔষধ-প্রয়োগের মিথ্যা অজুহাত সৃষ্টি করিয়াছে। দাদা ও স্বামী উভয়েরই আত্মপ্রসাদ যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয়, সেজন্য সে নিজের অনবধানতা ও দৈব দুর্ঘটনার উপর সমস্ত দোষ চাপাইয়াছে। এই চরম মূল্যে সে পারিবারিক শান্তি ক্রয় করিয়াছে।

অন্ধত্বের পর অনুতপ্ত স্বামী অতি বিলম্বে নিজের দোষ স্বীকার করিয়াছে ও আত্মগ্লানির প্রবল আবেগে জীবনে দারান্তর গ্রহণ না করিবার কৃচ্ছ্রসাধ্য প্রতিজ্ঞায় স্বেচ্ছাবন্দী হইয়াছে। স্ত্রীর মৃদু আপত্তিতে সেই প্রতিজ্ঞা দেবতার নামে আরও পবিত্র ও অলঙ্ঘনীয় ব্রতের মর্যাদা লাভ করিয়াছে।

অন্ধ কুমু অভ্যাসের গুণে ক্রমশঃ সংসারের চিরন্তন কাজগুলি নিপুণতার সহিত সম্পন্ন করিতে শিখিয়াছে ও সংসাররথ মসৃণ পথে অগ্রসর হইয়াছে। এই আপাত-নিরাপত্তার মুহূর্তে বাহিরের আত্মীয়ের প্রভাব ও কষ্টনিরুদ্ধ লালসার প্রত্যাবৃত্ত জোয়ার সংসারযাত্রায় জটিলতা সঞ্চার করিয়াছে। ধীরে ধীরে ডাক্তারের ক্রমবর্ধমান অর্থপিপাসা মানবিকতাকে প্রতিহত করিয়া প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। এই সম্পদের মোহ স্বামীর চরিত্রে আরও অধঃপতনের জন্য পথ খনন করিয়াছে।

এই কামনাপিচ্ছিল, ঢালু পথে ধাক্কা দিয়া পতনের বেগ বাড়াইবার লোকের অভাব হইল না। ডাক্তারের পিসি হঠাৎ তাহার এক অনূঢ়া দেওর-ঝিকে লইয়া আসিয়া পড়িল ও হেমাঙ্গিনীর সঙ্গে ডাক্তারের বিবাহ গোপনে ঠিকই হইয়া গেল। ইতিমধ্যে কুমুর দাদা আসায় তিনি সমস্ত অবস্থাটা বুঝিয়া লইলেন ও কুমুর অদৃষ্টে ফাঁসবন্ধন ও মোচনের ব্যবস্থা এক সঙ্গেই বিধাতা কর্তৃক স্থিরীকৃত হইল। কুমু প্রাণপণ শক্তিতে স্বামীর

উদ্দেশ্য যেন দাদার সম্মুখেই ধরা না পড়ে তাহার জন্য ছলনাজাল বিস্তার করিল। প্রতিজ্ঞাভঙ্গের কথা স্মরণ করাইয়া দিতে কুমু যে নির্ঘাত উত্তর শুনিল তাহা স্বামীর নির্লজ্জ স্বীকারোক্তি। তাহার সারমর্ম এই যে দেবী স্ত্রী অপেক্ষা মানবী স্ত্রীর প্রতিই স্বামীর স্বভাব-পক্ষপাত।

গল্পটির উপসংহার ঘটিয়াছে একটা আকস্মিক ও চমকপ্রদ পরিণতিতে। বিবাহ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বিবাহের বর কুমুর স্বামী নয়, চিরস্নেহময় প্রৌঢ়বয়স পর্যন্ত অকৃতদার তাহার দাদা। সুতরাং ডাক্তার হাতে সুতাবাঁধা শিশুপালের ন্যায় ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়াছে। দেবতা পরিহাসরসিকের ভূমিকায় তাহার মর্মোৎসারিত প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া বিষাদান্ত নাটককে কৌতুকময় উপসংহারে শেষ করিয়াছেন।

ঘটনাবিন্যাসের এই কাঠাম গল্পটির অপরূপ অন্তরসৌকুমার্যের সামান্যই পরিচয় দেয়। বিংশ শতকের প্রথম পাদ পর্যন্ত হিন্দু নারীর ভাবজীবন যে পৌরাণিক পাতিব্রত্য ও আত্মবিসর্জনের আদর্শের দ্বারা কত গভীর ভাবে প্রভাবিত ছিল, তাহার স্বর্গ যে তাহার গৃহাঙ্গনের কত স্পর্শযোগ্য নৈকট্যে ছিল, তাহা কুমুর চরিত্রে অতি আশ্চর্য ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে উদাহৃত হইয়াছে। এই আদর্শ তাহার বাস্তব জীবনযাত্রার সহিত নিঃশ্বাসবায়ুর ন্যায় অতি সহজভাবে অঙ্গীভূত হইয়াছে। আদর্শ-অনুসরণ তাহার প্রতিটি কর্মে ও চিন্তায় স্বাভাবিক প্রকৃতিধর্মের সহিত একাত্ম হইয়া গিয়াছে। ইহার সমর্থনে কোন নীতিকথার আড়ম্বরপূর্ণ ঘোষণাকে, কোন অন্তর্দ্বন্দ্বের ক্লিষ্ট প্রয়াসকে, কোন তত্ত্বকথার মনভোলানো সান্ত্বনাকে আবাহন জানান হয় নাই। স্বভাব নিজ অন্তর্লীন শক্তিতেই এই নিদারুণ সঙ্কটকে অতিক্রম করিয়াছে। রক্তস্রাবী হৃদয়-ব্যবচ্ছেদের সমস্ত যন্ত্রণা-লক্ষণগুলি সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্নভাবে অবলুপ্ত হইয়াছে। স্বামীর হৃদয়হীনতা ও কাপট্যের প্রত্যক্ষ পরিচয়ের পরেও সে তাহার নিকট দেবতাই রহিয়া গিয়াছে ও আধুনিক যুগের স্বামীনির্বাচন-প্রথা সে নূতন অর্থে প্রয়োগ করিয়াছে। প্রথমবারের স্বামীলাভ ও বিচ্ছেদের যমালয় হইতে স্বামীকে ফিরাইয়া আনা উভয়ই তাহার কৃতিত্বের ফল বলিয়া সে দাবী করিয়াছে—কিন্তু আত্মশক্তি যে দেবাশীর্বাদপুষ্ট তাহাও স্বীকার করিতে ভোলে নাই। তাহার বিবাহিত জীবনের সমস্ত জটিলতা তাহার অন্ধত্বের ন্যায় যে তাহারই জন্মান্তরদুষ্কৃতির পরিণাম তাহা সে অকুণ্ঠভাবে মানিয়া লইয়াছে। তাহার সমস্ত মনোবৃত্তি ও আত্মবিচার হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ

আদর্শের দ্বারা অবিচলিতভাবে নিয়মিত। অদৃষ্টবাদে এই ঐকান্তিক নিষ্ঠা তাহার নিরপেক্ষ ও স্বাধীন বিচারবুদ্ধিকে, অন্ধত্ব যেমন করিয়া তাহার দৃষ্টিশক্তিকে নির্বাপিত করিয়াছিল, তেমনি মুছিয়া দিয়াছে। স্বামীর মূঢ়তায় সে দৃষ্টি হারাইয়া মহান্ প্রতিশোধরূপে স্বামীকে সত্যদৃষ্টি ফিরাইয়া দিয়াছে।

গল্পটির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইল অন্ধ নারীর দৃষ্টিশক্তির অভাবপূরণের জন্য অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতর সক্রিয়তার, বিশেষতঃ ইন্দ্রিয়াতীত একরূপ অভ্রান্ত অনুভবশক্তির উদ্বোধনের অতি অপূর্ব উপস্থাপনা। একটা ইন্দ্রিয়ের কর্মশক্তি নষ্ট হইলে অপরাপর ইন্দ্রিয় যে নিগূঢ় প্রাকৃতিক নিয়মে উহার ক্ষতিপূরণে সহযোগিতা করে ইহা বিজ্ঞানসম্মত ও অভিজ্ঞতা-সমর্থিত সত্য। বঙ্কিমচন্দ্রের 'রজনী' উপন্যাসে ইহার কুশল সাহিত্যিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই গল্পে এই দেহাতীত অনুভূতির সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা সমস্ত কাহিনীর আকাশ-বাতাসে মৃদু সৌরভের ন্যায় যেরূপ পরিব্যাপ্ত তাহা তুলনারহিত। অন্যান্য ইন্দ্রিয়গ্রামের প্রখরতর কর্মশক্তি সম্বন্ধে লেখক বিশেষ কিছু সংবাদ পরিবেশন করেন নাই। কিন্তু দৃষ্টিশক্তির বিকলতার পরিবর্তে যে একটি ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় অন্ধের চেতনায় বিকশিত হইয়া তাহার আলোকবঞ্চিত তমসালোকের মধ্যে জীবনের সহিত নূতন স্পর্শসংযোগের উন্মোচন করে, এক অতীন্দ্রিয় অনুভূতি যে মনোগহনে দীপ জ্বালিয়া ভাব-সত্যের রূপ প্রত্যক্ষগোচর করে তাহা পুঞ্জীভূত প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্তসহযোগে লেখক প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বিশেষতঃ হেমাঙ্গিনীর প্রতি তাহার স্বামীর যে নবোদ্ভিন্ন আকর্ষণ তাহার বৃদ্ধি ও প্রসার সম্বন্ধে তাহার অনুভব কোন নিগূঢ় অন্তর-প্রক্রিয়ায় তাহার নিকট অসামান্যরূপে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হইয়াছে। বোধ হয় হৃদয়ের সর্বাপেক্ষা স্পর্শকাতর অংশটি ইন্দ্রিয়নিরপেক্ষ মনের কেন্দ্রায়িত উৎকণ্ঠাতেই নিজ গোপন অনুভবটি জানাইয়া দেয়। স্মৃতি-রোমন্থন এই ভাবদৃষ্টির প্রত্যক্ষদর্শনের কাজে সহায়তা করিয়াছে। অন্ধের সমস্ত জগৎ স্মৃতির প্রতিফলনে ও নির্মল মানস-নিষ্ঠার প্রেরণায় এক নূতন অবয়বঘনতায় ভরিয়া উঠিয়াছে। কলিকাতার চিত্তবিক্ষেপ ও ভাববিকার অন্ধের অন্তরে প্রবেশের পথ না পাইয়া তাহার ধ্যানসমাধিকে অবিঘ্নিত রাখিয়াছে। বাহিরের বস্তুপিণ্ড সেখান হইতে প্রতিহত হইয়া উহার বিশুদ্ধ রসনির্যাসটুকুই অন্তরের সূক্ষ্মতম সংবেদনশীলতাকে পুষ্ট করিয়াছে। এই

বহির্বিমুখ, আদর্শধ্যানতন্ময় অন্ধ নারীর দৃষ্টিতে বিশ্বসংসার কি চিন্ময়রূপে প্রতিভাত হয়, তাহাই বাস্তবজীবনের প্রেক্ষাপটে আশ্চর্যভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং মানবপ্রকৃতির চিত্রপ্রদর্শনীতে একটি অভিনব ছবি সংযোজিত হইয়াছে। প্রতিভা যে যুগসীমা-উত্তীর্ণ, অতীত-আধুনিকের দ্বন্দ্বমুক্ত হইয়া প্রাচীন স্মৃতিচর্যাকে শাশ্বত সৌন্দর্যলোকে প্রতিষ্ঠা করিতে পারে, এখানে সেই চিরসত্যই সগৌরবে প্রমাণিত।

'দুর্বুদ্ধি' (ভাদ্র ১৩০৭) গল্পটি সাধারণ ষড়যন্ত্রমূলক পুলিশী উৎপীড়ন-কাহিনীর নৈতিক সমালোচনার ঊর্ধ্বে অত্যাচারের সহযোগী দুর্বৃত্তের আকস্মিক অনুতাপে ও পারিবারিক দুর্ঘটনার মর্মান্তিকতায় উচ্চতর আর্টস্তরে উন্নীত হইয়াছে। ডাক্তার ও দারোগা যে নিষ্ঠুর সহযোগিতায় সরল পল্লীবাসীদের কাছ হইতে অর্থ আদায়ের ফাঁদ পাতিয়াছিল, তাহা ডাক্তারের অতিবিলম্বিত বিবেক-উন্মেষে ও কন্যার বিবাহের জন্য অবৈধসঞ্চয়স্ফীত ধনভাণ্ডারের সেই কন্যার মৃত্যুতে প্রয়োজন ফুরাইবার আঘাতে ফাঁসিয়া গিয়াছে। তাহার পর দারোগার প্রসাদ-অর্জনে ব্যর্থ চেষ্টার পর ডাক্তারকে শেষ পর্যন্ত ভিটাত্যাগ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছে। হতভাগ্য ডাক্তার ভগবান ও মানুষ উভয়েরই উদ্যতবজ্র সহ্য করিয়াছে। একান্ত বেদনাময় করুণ পরিণতির অন্তর্ভুক্তি গল্পটির গোত্রান্তর ঘটাইয়াছে। যাহা সস্তা নীতি-উপদেশের উপলক্ষ্য ছিল, তাহা করুণরসে আপ্লুত হইল ও লেখকের ও পাঠকের রোষবহ্নি নয়নের নীরে নিভিয়া গেল।

'কর্মফল' (পৌষ ১৩১০) ছোটগল্পের নাট্যরূপে আবির্ভাব। এই গল্পে ছোটগল্প ও নাটকের অন্তর্নিহিত ধর্মের অভিন্নতাই প্রতিপন্ন হইয়াছে। ছোটগল্পের রূপসংহতি যে কত সহজে ও কোন মৌলিক পরিবর্তন ব্যতীতই নাটকীয় আকারে বিন্যস্ত হইতে পারে এখানে তাহাই বিস্ময়জনকভাবে উদাহৃত। লেখকের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, প্রাক্-কথন ও সূত্রসংযোজনা ছাড়াই যে নাটকের নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতিতে ছোটগল্প পাঠকের নিকট সহজ-বোধ্য হয় তাহা এখানে প্রমাণিত। ইহাতে দেখা গেল যে কেবল সংলাপের মাধ্যমেই চরিত্রাবলীর সম্পর্কজটিলতার গ্রন্থিচ্ছেদ ও পশ্চাৎপটের পরিস্ফুটন সম্পূর্ণ সম্ভব। লেখক এখানে সৃষ্টির নেপথ্যে আত্মগোপন করিয়া ঘটনার নিজ গতিবেগেই উহার অগ্রগতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন, ও ঘটনার চক্রাবর্তনে পাত্র-পাত্রীর অন্তরে যে দ্বন্দ্ব ও আবেগ

সঞ্চিত হইয়াছে তাহার দ্বারাই সমস্যার উদ্ভব ও সমাধান সাধন করিয়াছেন। বরং তাঁহার স্বকীয়চিন্তার অন্তর্বর্তিতার বর্জনে নাটকীয় সংঘাত আরও তীব্র ও প্রত্যক্ষ-নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে। সলিতা উস্‌কান ছাড়াই নিজ অন্তর্নিহিত তেজোময়তায় নাটক উজ্জলতর আলোক বিকিরণ করিয়াছে। ঘটনা-পরিস্থিতি সরল হওয়ার জন্যই দ্বন্দসংঘাতের স্বরূপ ফুটাইতে কোন ভাষ্যকারের প্রয়োজন হয় নাই।

সতীশের চরিত্র বোঝার জন্য, তাহার বে-হিসাবী, দায়িত্বমুক্ত, ভবিষ্যৎ-ভাবনাহীন বিলাসাসক্তির মূল উদ্‌ঘাটন করিতে হইলে তাহার পরিবার-প্রতিবেশের সহিত পরিচয় একান্ত প্রয়োজনীয়। সতীশের স্বভাব গঠিত হইয়াছে নিঃস্নেহ শাসন ও অপরিমিত প্রশ্রয়ের বিরুদ্ধ প্রভাবে। তাহার একদিকে পিতার কঠোরতা, আর একদিকে মা ও সন্তানহীনা মাসীর অজস্র আদর-সোহাগ তাহাকে স্থির জীবনাদর্শের, নিশ্চিত আত্মজ্ঞানের আশ্রয় হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। বিশেষতঃ পিতা-মাতার প্রকাশ্য ও রূঢ় মতান্তর, ও তাহার মাত্রাতিরিক্ত খেয়াল পূর্ণ করিবার জন্য তাহার মায়ের মাসীর উপর আত্মসম্মানহীন নির্ভরতা তাহাকে অসহায়ভাবে পরাশ্রয়ী করিয়া তুলিয়াছে। তাহার মেসো শশধরই একমাত্র অভিভাবক যিনি স্নেহের সহিত সম্ভ্রম মিশাইয়া তাহাকে এই ঘূর্ণাবর্ত হইতে রক্ষা করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু তিনের বিরুদ্ধে একজনের দাঁড়াইবার সম্ভাবনা কতটুকু? যেখানে পিতা তাহাকে কঠোর শাসনের মরুভূমিতে নির্বাসিত করিয়াছে ও মা ও মাসী অতিরিক্ত স্নেহবন্যায় ভাসাইয়া দিয়াছে, সেখানে একা মেসো নিরাপদ বন্দরের আশ্রয় দিতে, তরঙ্গ উত্তীর্ণ হইয়া তীরে পৌছাইয়া দিতে কতটুকু সক্ষম হইতে পারে?

সতীশের আর একটি খেয়াল ইঙ্গবঙ্গ-সমাজে মিশিয়া ব্যারিস্টার-দুহিতা নলিনীর হৃদয়ে প্রেমের আসন-অধিকারের দুর্জয় অভিলাষ। এইজন্যই তাহার পোশাক-পরিচ্ছদের বিলাস সব সীমা লঙ্ঘন করিতে সদা উদ্যত। সে বিলাতফেরত ব্যারিস্টার নন্দীর সহিত প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইবার জন্য নিজের বহিঃসৌষ্টব আরও আকর্ষণীয় করিবার, আদবকায়দায় আরও দুরস্ত হইবার, কৃচ্ছ্রসাধনে দৃঢ়সংকল্প। দৈবপ্রসাদে যাহা তাহার সর্বাপেক্ষা মারাত্মক নেশা হইতে পারিত, তাহাই তাহার রক্ষার মহৌষধের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। যে নলিনীর প্রেম তাহার উদ্বন্ধনরজ্জু হইয়া তাহার

শ্বাসরোধ ঘটাইত, তাহাই তাহার কণ্ঠে সর্বব্যাধিহর অক্ষয় স্বর্ণকবচরূপে শোভমান হইয়াছে।

যদিও নলিনী সতীশের অন্তিম সঙ্কটে বরাভয়দাত্রী দেবীরূপে আবির্ভূতা হইয়া তাহাকে আসন্ন সর্বনাশ হইতে রক্ষা করিয়াছে, তথাপি প্রেম সতীশের জীবনে মুখ্য সমস্যা নয়। সে যে নলিনীর প্রেমলাভের দুরাশা পোষণ করিয়াছে, তাহার কারণ নলিনীরই প্রশ্রয়-দাক্ষিণ্য। পরিবার-প্রভাবই তাহার জীবনগঠনে প্রধান অংশ অধিকার করিয়াছে। বিশেষতঃ তাহার মাসী সুকুমারীই তাহার সমস্ত আদর-আবদার নির্বিচারে পূরণ করিয়া তাহার খেয়ালী অব্যবস্থিতচিত্ততাকে ও পরানুগ্রহপ্রত্যাশিতাকে বদ্ধমূল হইবার নিরঙ্কুশ সুযোগ দিয়াছে। এই নিঃসন্তান মাসী যেমন স্নেহপ্লাবনে ও আতিশয্যে সমস্ত হিতাহিতবুদ্ধি বিসর্জন দিয়াছে, তেমনি সন্তানজন্মের পর সতীশ সংবন্ধে সাধারণ চক্ষুলজ্জা ও কর্তব্যবোধ হারাইয়াছে। তাহার এই দুই মনোভাবের মেরু-বৈপরীত্য চরমে উঠিয়া সতীশের জীবনকে প্রচণ্ড ধিক্কারবোধ ও দারুণ নৈরাশ্যে বিস্বাদ করিয়া দিয়াছে। যাহাকে একসময় এই মাসী বাৎসল্যের জোয়ারে হাবুডুবু খাওয়াইয়াছিল তাহাকে এখন চাকরের মত অপমান করিতেও তাহার কোথাও বাধে না। মেসোমশায়ের সুপারিশে সতীশ একটি চাকরী জোগাড় করিয়া মাসীর অন্নদাসের গ্লানি মুছিয়াছে। কিন্তু মাসীর দুর্বাক্য ও গঞ্জনা তাহার পক্ষে এত অসহ্য হইয়াছে যে সে শেষ পর্যন্ত অপিসের তহবিল ভাঙিয়া মাসীর অন্নঋণ-পরিশোধের জুয়ারী সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছে। ধরা পড়িয়া জেল যাইবার প্রাক্‌কালে যখন সে আত্মহত্যা করিতে উদ্যত, ঠিক সেই জীবনসন্ধিক্ষণে নেলির প্রণয়দত্ত উপহার, তাহার সমস্ত অলঙ্কারের সমর্পণ তাহাকে একসঙ্গে বিপন্মুক্ত ও জীবনসার্থকতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার সম্মুখে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছে।

এই ছোটগল্পে সতীশের জীবনের কয়েকটি দ্বন্দ্বদুঃসহ, আবেগরুদ্ধ দৃশ্য অপূর্ব নাটকীয় মর্মস্পর্শিতার সহিত চিত্রিত হইয়াছে। এই সমস্ত দৃশ্যে নায়কের অসংবরণীয় ভাবোচ্ছ্বাস উত্তপ্ত লাভাস্রোতের ন্যায় নিঃসৃত হইয়া তাহার অন্তরের প্রজ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের সাক্ষাৎ পরিচয় দিয়াছে। এইসব উপলক্ষ্যে তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি ও মন্তব্য শুধু অপ্রয়োজনীয় নয়, বিসদৃশও হইত। ইহাদের মধ্যে সপ্তদশ পরিচ্ছেদে সতীশের নাটকীয়ভাবে মাসীমার

ঋণশোধ, অন্তিমে তাহার প্রথমে হরেনকে পিস্তলের গুলিতে হত্যা করার প্রবল প্রলোভনদমন ও পরে আত্মহত্যার ও জেলে প্রায়শ্চিত্ত করার সঙ্কল্প, ও শেষ মুহূর্তে নলিনীর অলঙ্কারমূল্যে তাহার প্রেমিকের প্রসন্ন জীবনবোধের পুনরুদ্ধার একটি অবিস্মরণীয় নাট্য-পরিস্থিতির ক্রান্তিলগ্ন ঘোষণা করিয়াছে। ইহার দৃশ্যবিভাগে 'পরিচ্ছেদ' শব্দটির প্রয়োগ নাট্যরূপাশ্রিত ছোটগল্পের আদিম পরিচয়টির চিহ্নস্বরূপ বর্তমান।

বাকী চারিটি গল্পের মধ্যে—'মাস্টার মশায়' (আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩১৪), 'রাসমণির ছেলে' (আশ্বিন ১৩১৮), 'পণরক্ষা' (পৌষ ১৩১৮), এবং 'হালদার-গোষ্ঠী' (বৈশাখ ১৩২১)—গল্পগুলিতে অভিন্ন গঠনশিল্প ও জীবনসমীক্ষা-প্রণালীর ছাপ সহজেই লক্ষণীয়। এইসব গল্পেই ব্যক্তিজীবনকে পরিবার-পটভূমিকার সহিত ঘনিষ্ঠসম্পর্কিত করিয়া দেখান ও বংশ-ঐতিহ্যের বর্ণনা ও চরিত্র-বিশ্লেষণকে সমমর্যাদায় উপস্থাপিত করা হইয়াছে। 'মাস্টার-মশায়'-এ হরলালের জীবন-ট্রাজেডি তাহার ব্যক্তিস্বভাবজাত নয়, অতীত পারিপার্শ্বিকের দ্বারা অমোঘভাবে প্রভাবিত। যে দুর্বলতার রন্ধ্রপথে তাহার অদৃষ্টশনির প্রবেশ ঘটিয়াছে তাহা তাহার নিরীহ ও মুখচোরা স্বভাব। আর তাহার জীবনে সর্বনাশের যে হেতু সেই বেণুগোপালও তাহার পরিবার-নীতি ও লালনক্রিয়ার অনিবার্য ফল। সে বাবার ধনগৌরবে ও মায়ের মাত্রাতিরিক্ত বাৎসল্যে সমস্ত পরিমিতিবোধ হারাইয়াছে ও নিজ খেয়াল যে কোন মূল্যে তৃপ্ত করাকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। তাহার মাস্টারমশায়ের জন্য যে খানিকটা অকৃত্রিম প্রীতি ছিল তাহাই জীবনের একমাত্র উদার মনোবৃত্তি এবং ইহারই আকর্ষণে সে চরম বিপদক্ষণে তাহার আশ্রয়ের জন্য ছুটিয়া আসিয়াছে। ইহারই সুযোগ লইয়া সে যে হরলালের লোহার সিন্দুক হইতে অফিসের গচ্ছিত টাকা সরাইয়াছে তাহা অপরাধীর অপহরণ-প্রবৃত্তির প্রেরণায় নয়, অবিবেচনা ও পিতার উপর অবাস্তব আস্থা-প্রসূত। উদ্দেশ্য যাহাই হউক, এই প্রাক্তন স্নেহভাজন ছাত্রই বেচারা হরলালকে নিশ্চিত অসম্ভ্রম ও সংবিত্ত মৃত্যুর দিকে ঠেলিয়া দিয়াছে। অধরলালের পরিবার-পরিস্থিতিতেই যে বিষতরুর বীজ উপ্ত হইয়াছিল, তাহারই পরিণত ফল-আস্বাদনে হরলাল আত্মিক ও দৈহিক উভয়বিধ মৃত্যু বরণ করিয়াছে। সুতরাং ট্রাজেডির কারণ হিসাবে হরলালের

শান্তিময় সরল জীবনযাত্রা বা বেণুগোপালের দুষ্প্রবৃত্তি অপেক্ষা যে বিশেষ পটভূমিকায় মাস্টার-ছাত্রের মধ্যে এই অভিশপ্ত সম্পর্কজটিলতাপুষ্ট হইয়াছিল তাহাই মুখ্য ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানে বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত এক অতর্কিত বিপৎপাত জীবনের দুর্জ্ঞেয়তা সম্বন্ধে পাঠককে চমকিত করিয়া তোলে।

গল্পটিতে জীবনের সরল প্রবাহ ও সর্বনাশের আকস্মিক আবির্ভাবের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল না। উহার পূর্বাভাস-নির্দেশের কোন উপলক্ষ্যই গল্পে সূচিত হয় নাই। কিন্তু ধ্বংস যখন সুনিশ্চিতভাবে নিজ অস্তিত্ব ঘোষণা করিল, তখন ট্রাজেডির বলি হরলালের মনে যে মন্থন চলিল, যে চেতনাবিভ্রমকারী উদ্‌ভ্রান্তি এক জরাতুর দিন ও অর্ধরাত্রি ব্যাপিয়া সমস্ত পরিচিত জগৎকে তাহার নিকট ছায়াবাজীর মত মুছিয়া দিল, তাহার বর্ণনা কাব্য ও মনস্তত্ত্ব উভয় মানদণ্ডেই অতুলনীয়। তাহার এই মানস-সঙ্কটের কোন সাক্ষ্য অসংখ্যজন-অধ্যুষিত মর্ত্যজগতে চিহ্ন রাখিয়া গেল না। কিন্তু অপ্রাকৃত জগতে, যেখানে অপ্রকাশিত ভাব নিজ মর্মান্তিক যন্ত্রণা উৎকীর্ণ করে, সেই অলৌকিক বায়ুস্তরে এই শব্দাতীত বেদনা চিরদিন অনুরণিত হইতে থাকিল। বহু বর্ষপরে এক অপ্রকৃতিস্থ, মাতাল সাহেবের চেতনায় এই বেতার-পরিবাহিত, অন্তঃরুদ্ধ বেদনার রেশটি অনুবিদ্ধ হইয়া সেখানে এক অশরীরী হৃৎকম্প জাগাইয়াছে। যে নীরব, মর্মান্তিক ব্যথা মানুষে কেহ শুনিল না, বুঝিল না, সর্বজনপরিত্যক্ত সেই নিঃসঙ্গ হরলালের আর্তি নিয়তির কোন্ নিগূঢ় লীলায় ঘোড়াগাড়ীর জড় আধারে ও গাড়োয়ানের বিমূঢ় অনুভবে সঞ্চিত থাকিয়া যথাকালে যথার্থ অপরাধীর চেতনাগভীরে নিজ অমোঘ বার্তাটি পৌঁছাইয়া দিয়াছে। নীতিবিধানের রহস্যময় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কি অভাবনীয় উদ্‌ঘাটন!

'রাসমণির ছেলে' (আশ্বিন ১৩১৮) কালীপদর স্বল্পায়ু জীবনে শানিয়াড়ির জমিদারবংশের সমস্ত বিলুপ্ত বৈভব, অন্তর্হিত আভিজাত্য-গৌরব ও অতীত ঐশ্বর্যের সমাধিতে আলেয়ার মত জ্বালাইয়া-রাখা, অনির্বাণ আশা-দীপ—প্রাক্তন ও অনাগতের সমস্ত আলো-আঁধারি বিহ্বল অনিশ্চয়তায় কেন্দ্রীভূত হইয়া উহার সীমিত প্রতিরোধশক্তিকে বিদীর্ণ করিয়াছে। পিতার অবুঝ স্নেহাতিশয্যের সহিত মাতার অতন্দ্র সত্যদৃষ্টি ও তপঃসাধনীক্ষার মর্মান্তিক সংগ্রামের সমস্ত জটিল অস্ত্রাঘাতচিহ্ন কালীপদর ক্ষুদ্র ললাট-ফলকে

অনুপমের রেখায় উৎকীর্ণ হইয়াছে। বাবা সন্ত-অন্তর্হিতা ঐশ্বর্যলক্ষ্মীর স্মৃতি ও অদূর ভবিষ্যতে তাঁহার পুনরাগমনের আশায় বিভোর হইয়া বর্তমানের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন; বর্তমান তাহার নিকট সৌভাগ্য-বিদ্যুৎছটার দুইটি ঝলকের স্বল্পতম ফাঁক পুরাইবার স্বতন্ত্রমূল্যহীন কালখণ্ড মাত্র। মা রাসমণি তদ্‌বিপরীতে তীক্ষ্ণভাবে বাস্তবসচেতনা, প্রখরব্যক্তিত্বশালিনী ও সর্ববিধ মোহবর্জিতা। বাপ কালীপদকে জমিদারবংশের ননীর পুতুলরূপে রাখিতে চাহে; মা কিন্তু তাহাকে জীবনযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত, আত্মনির্ভর যোদ্ধারূপে লালন করিবার জন্য দৃঢ়সংকল্প। কালীপদ খেয়ালি শৈশবে পিতার দলভুক্ত ছিল, কিন্তু বিবেচনার বয়সে পৌঁছিয়া সে মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত হইল। সেইজন্যই সে পিতার সন্তান না হইয়া মায়ের ছেলে পরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই পরস্পরবিরোধী জীবনাদর্শের বিপরীতমুখী টানে তাহার সচেতন ইচ্ছাশক্তি অভিভূত না হইলেও তাহার অবচেতন সত্তায় এই দুই দেবতার পূজা তাহার জীবনে মারাত্মক রূপ লইয়াছে। পিতার স্বপ্নকল্পনা খুব বাঁকা পথে মাতার অপ্রমত্ত কল্যাণশাসনকে ব্যর্থ করিয়াছে। পিতার ক্ষুধিত স্নেহ প্রেতাত্মার মত তাহার আত্মপ্রতিষ্ঠাপ্রয়াসের অনুসরণ করিয়া তাহার যজ্ঞে পূর্ণাহুতির অদৃশ্য বিঘ্ন ঘটাইয়াছে।

মা-বাপের এই অশ্রান্ত ইচ্ছাসংঘাতে কালীপদ এমন একটা স্বভাবপ্রবণতা অর্জন করিয়াছে, যাহার ফলে তাহার জীবনে ট্রাজেডির অনুপ্রবেশ সম্ভব হইয়াছে। তাহার সাধনার লৌহকক্ষে একটা অদৃশ্য সূচপরিমাণ ফাঁকের ভিতর দিয়া দুর্ভাগ্যসর্প তাহাকে দংশন করিবার অবসর পাইয়াছে। বাবার আভিজাত্যের অবাস্তব প্রত্যাশাকে রূঢ় আঘাত দিবার সঙ্কোচ হইতেই তাহার কলিকাতা-প্রবাসের সমস্ত দুঃসহ গ্লানি, দারিদ্র্যের সহিত কঠোর সংগ্রাম তাহাকে পিতার নিকট হইতে সম্পূর্ণ গোপন রাখিতে হইয়াছে। সে যে কলিকাতায় জমিদারসন্তানসুলভ আরাম-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন কাটাইতেছে এই মিথ্যা ধারণাই তাহাকে নানা ছদ্মপ্রচারে সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। ইহার ফল হইয়াছে যে কালীপদর স্বভাবই চাপা, আত্মগোপনশীল হইয়া উঠিয়াছে। যেরূপ সপ্রতিভ ও মিশুক হইলে মেসজীবন তাহার পক্ষে সহজ হইয়া উঠিত সেই মনোবৃত্তিই তাহার অবিকশিত রহিয়া গিয়াছে। সে মেসের লঘু তরল, সতীর্থবৃন্দের প্রীতিসরস, আনন্দময় জীবনযাত্রা হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া নিঃসঙ্গ আত্মকেন্দ্রিকতায় সঙ্কুচিত হইতে বাধ্য হইয়াছে।

সে যদি সকলের সহিত মিশিতে পারিত, তবে শৈলেনের নির্যাতন এত হিংস্র ও মর্মঘাতী হইত না। তাহার এই সঙ্কোচের মধ্যে তাহার মেস-বন্ধুরা অহঙ্কার ও আত্মাভিমানের লক্ষণ কল্পনা করিয়া তাহার প্রতি বিরাগ আরও চরমে উঠাইয়াছে। মুখচোরা যুবকের আত্মরক্ষার আচ্ছাদনের সহচরবৃন্দের দ্বারা এই ভুল ব্যাখ্যা তাহার নির্যাতনকে অসহনীয় করিয়াছে। উহাদের প্রতিটি বাক্য, প্রতিটি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, প্রতিটি উপহাসের আয়োজন তাহার সূক্ষ্মতম, কোমলতম অনুভূতিপুঞ্জের প্রতি মর্মান্তিক আঘাত হানিয়া তাহার সুস্থ জীবনীশক্তিকে জীর্ণ করিয়া তাহার শরীর ও মনে পীড়া-প্রতিরোধের ক্ষমতা আরও ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। শৈলেনের মধ্যে উদারতার অভাব ছিল না, এবং কালীপদর পিতার আগমনকে কেন্দ্র করিয়া তাহার জীবনে যে অনাবিল প্রীতি-সহৃদয়তার নির্ঝর বহিয়াছে, তাহার শীকরকণা যদি কিছু পূর্বে কালীপদর উত্ত্যক্ত দেহমনকে স্নিগ্ধতায় ভিজাইয়া দিত, তাহা হইলে হয়ত এই করুণ পরিণতি নিবারিত হইত। যখন আরোগ্যের সুধা শেষ পর্যন্ত মিলিয়াছে, তখন উহার অতি-বিলম্বিত প্রয়োগই ট্রাজেডিকে আরও মর্মান্তিক করিয়াছে।

রাসমণি ও তাহার ছেলের মনুষ্যত্বলাভের জীবনপণসাধনা ব্যর্থ হইয়াছে তাহাদের কোন পরিকল্পনাগত বা আচরণগত ত্রুটির জন্য নয়। দৈব-প্রতিকূলতা ছাড়া উহার যদি কোন নীতিগত কারণ থাকে, তাহা ভবানীচরণের একান্ত ছেলেমানুষী বাস্তববিমুখতা, স্বপ্নকল্পনালালন ও প্রাচীন ঐশ্বর্য-গৌরবের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সুনিশ্চিত প্রত্যয়সংস্কার তাহাদের কাঁধে যে অতিরিক্ত বোঝা চাপাইয়াছে তাহা বহিবার অক্ষমতা। মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া জীবিকার্জনের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে, অথচ একজন নিকটতম আত্মীয়ের নিকট জমিদারসুলভ সচ্ছলতার অভিনয় করিতে হইবে এই দ্বৈত অভিনয়ের উপযুক্ত মনোবল ও সপ্রতিভতা কালীপদর শক্তির অতীত হইয়া পড়িল। উঞ্ছবৃত্তিকে জমিদারী বিলাসের ছদ্মবেশে আড়াল করিতে যে অভিনয়দক্ষতার প্রয়োজন, কালীপদর ততটুকু সম্বল ছিল না। সুতরাং তাহার সমস্ত প্রকৃতিই এই অভিনয়ের নিদারুণ প্রয়োজনে সুস্থ আত্মবিকাশ ও তরুণসুলভ জীবনোল্লাস হইতে বঞ্চিত হইয়া প্রীতিলেশহীন কর্তব্যভারে ক্লিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। প্রতি মুহূর্তে যাহাকে হাঁপাইতে হয়, জীবনের দুর্ভর ভার-বহনের যে কোন ক্ষতিপূরণ পায় না, তাহার পরমায়ু স্বল্পকালীন হওয়াই

স্বাভাবিক। যাহার অবিরত কণ্টকবেধের ক্ষতে কোন শুশ্রূষার স্নিগ্ধ প্রলেপ পড়িল না, তাহার সেই প্রতিদিনের নবীভূত ক্ষত যে বিষাইয়া উঠিবে তাহাতে আশ্চর্যের কি আছে? রাসমণির সঙ্কল্প ও তাহার ছেলের ঐ সঙ্কল্পের বাস্তব রূপায়ণপ্রয়াস জীবনরসের এই মৌলিক অপ্রাচুর্যের জন্যই যে ধূলিসাৎ হইয়াছে তাহা এই একান্ত-করুণ পরিণতির একমাত্র সঙ্গত মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা।

গল্পটির পটভূমিকা সেইজন্য ত্রিধাবিভক্ত। প্রথম, শানিয়াড়ির নির্মম সত্য ও করুণ স্বপ্নাতুরতার দুইপায়ে-দাঁড়ানো পরিবারজীবন, যেখানে রাসমণি প্রাণান্ত পরিশ্রমে খাদ্য যোগাড় করেন ও ভবানীচরণ তাঁহার অবজ্ঞা-প্রাপ্য, চিরাভ্যস্ত রাজভোগের গ্রাস নিশ্চিন্ত হাতে মুখে তোলেন ও পুত্র কালীপদ শৈশবক্রীড়ার স্বপ্নলোক হইতে ধীরে ধীরে নিষ্করুণ জীবনসংগ্রামের প্রতি সচেতন হইয়া উঠে। দ্বিতীয়, কালীপদর কলিকাতাপ্রবাসে তিক্ততার শেষ বিন্দু পর্যন্ত আস্বাদন, অভাব ও অপমানের সহিত সহনশীলতার চরম সীমা পর্যন্ত প্রসারিত, নৈরাশ্যপীড়িত, একক প্রাতরোধ চেষ্টা ও উহার শোকাবহ অবসান। তৃতীয়, আশাহীন, নিরানন্দ শানিয়াড়িতে মূল লইতে উচ্ছিন্ন প্রৌঢ় দম্পতির শোকস্তব্ধ, নিঃসঙ্গ প্রহরাগণনা—এখানেও রাসমণি ও ভবানীচরণ নিজ নিজ অভ্যস্ত অংশ অভিনয় করিয়াছে। শোকোচ্ছ্বাসের বিলাসিতা ভবানীচরণের উপভোগ্য, আর রাসমণির ভাগ্যে জুটিয়াছে শোক-নিরুদ্ধ আত্মদমনের দুরূহতর সাধনা। ভবানীচরণের দিকে আছে শোক-প্রকাশের উচ্ছলতা, স্মৃতিমন্থন, দীর্ঘশ্বাস, বাচনিক অভিব্যক্তি প্রভৃতি বিভিন্ন পথে উহার শতধারে উৎসারণ। আর রাসমণি স্বামীর শোকাবেগ-উদ্দীপনের ভয়ে নিজে পাষাণবৎ নীরব ও প্রকাশকুণ্ঠ। একটি উৎকটতর মর্মান্তিক পরিহাসে গল্পটির উপসংহার। ভবানীচরণের আশামরীচিকা, উইলপ্রাপ্তিসম্বন্ধে তাহার মূঢ়, অবোধ সংস্কার অতি আশ্চর্যভাবে সত্যরূপ লইয়াছে। সে উইল সত্যই ফিরিয়া আসিয়াছে ও ভবানীচরণের অলীক কল্পনা রাসমণির সমস্ত বাস্তববোধ ও আত্মনিগ্রহের উপর আপাতদৃষ্টিতে জয়ী হইয়াছে। কিন্তু যখন উইল হাতে পৌঁছিল, তখন যে মন উহার পুনঃপ্রাপ্তির প্রত্যাশায় সারাজীবন প্রতীক্ষা করিয়াছিল তাহার আনন্দ-অনুভবের শক্তি নিঃশেষিত। রবীন্দ্রনাথ কি এখানে সত্যানুভূতিবিষয়ে সচেতন-প্রয়াসের আত্মনির্ভরতা ও বৈজ্ঞানিক কার্যকারণশৃঙ্খলা অপেক্ষা অবচেতনের সুপ্ত সংস্কারকেই তাঁহার কবিমনের পরোক্ষ সমর্থন জানাইলেন?

'পণরক্ষা' (পৌষ ১৩১৮) গল্পে 'রাসমণির ছেলে'-র বিষয় ও সমস্যার আংশিক অনুবর্তন দেখা যায়। এখানেও পারিবারিক সম্পর্কের জটিলতা ব্যক্তিজীবনে কেমনভাবে প্রতিফলিত হয় তাহার একটি দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত উদাহৃত। অবশ্য এখানে সমস্যার গাঢ়তা ও তীব্রতা পূর্ববর্তী গল্পের তুলনায় অনেক নিম্নস্তরের। উপসংহারও ট্রাজেডিতে নয়, লঘুতর আশাভঙ্গে। বংশীর মধ্যে রাসমণির বংশের প্রতি কর্তব্যনিষ্ঠা ও কৃচ্ছ্রসাধন স্বল্পতর পরিমাণে পুনরাবৃত্ত। বংশী অনভিজাত সমাজের একজন তাঁতশিল্পী। তাহার নিকট ব্যবসায়ের মর্যাদা জমিদারের আভিজাত্যের মতই মূল্যবান। কিন্তু জমিদারী পরিবারে অতীতগৌরবস্মৃতি যেমন বাস্তবভীরু স্বপ্নবিলাসের প্রশ্রয় দেয়, ছোট ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে জীবিকার্জনের আবশ্যিকতা সেইরূপ কোন কৃত্রিম প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে না। তথাপি বংশী বংশরক্ষা সম্বন্ধে একটি অবর্জনীয় সংস্কার পোষণ করে। সেইজন্য সে দিনরাত খাটিয়া ছোট ভাই রসিকের বিবাহের জন্য পণের টাকা সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে তাহার জীবন উৎসর্গ করিয়াছে। কিন্তু রসিক খামখেয়ালি স্বভাবের ছেলে, সে পৈতৃক ব্যবসায়সম্বন্ধে উদাসীন ও একনিষ্ঠ-কর্তব্য-বিমুখ। নানা চমকলাগানো, অথচ অকেজো বিদ্যাঅর্জনের দিকেই তাহার স্বাভাবিক ঝোঁক। সুতরাং দাদা যদিও তাহাকে স্নেহপ্রশ্রয় দিয়া আসিয়াছে, তথাপি সে প্রাপ্তবয়স্ক রসিককে কাজে যোগ দিবার জন্য প্রথমে উপদেশ, পরে ভর্ৎসনা জানাইল। এই মৃদু তিরস্কারই রসিককে গ্রাম ছাড়াইয়া প্রবাসযাত্রায় প্রণোদিত করিল ও দাদার সঙ্গে তাহার একটা মর্মান্তিক বিচ্ছেদ ঘটাইল।

গল্পের ধারা নানা বিচিত্রপথগামী হইয়া অনেকটা আকস্মিকতার লক্ষণযুক্ত হইয়াছে ও আকর্ষণের নিবিড়তা হারাইয়াছে। রসিক গ্রাম ছাড়িয়া নানারূপ অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছে ও রূপকথার রাজপুত্রের ন্যায় রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া তাহার জীবনের সাধ একখানা সাইকেল যৌতুক-স্বরূপ পাইয়াছে। এই সাইকেলে চড়িয়া ও ভদ্রোচিত পোষাক-পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া যখন সে বিজয়ী বীরের ন্যায় দীর্ঘ-পরিত্যক্ত গ্রামে প্রবেশ করিয়াছে, তখন দাদার মৃত্যু ও বাগ্‌দত্তা সৌরভীর অন্যত্র বিবাহের

সংবাদ তাহাকে মৃত্যুকালীন দুর্যোধনের ন্যায় যুগপৎ হর্ষ-বিষাদে অভিভূত করিয়াছে।

ঘটনাবিন্যাসে বিবৃতি ও বৈচিত্র্য যতটা প্রকট, কেন্দ্রিকতা সে পরিমাণে ফুটে নাই। ইহা অনেকটা রূপকথাধর্মী, এবং ইহার ভাবানুবন্ধে বিশেষ কোন জটিলতা বা উদ্দেশ্য-গভীরতা লক্ষণীয় নয়। ইহাতে কোন মানসিক সঙ্কটের তীব্রতা, বা চরিত্রসৃষ্টির উৎকর্ষও অভিব্যক্ত হয় নাই। তথাপি ইহার দুইটি প্রধান চরিত্র—বংশী ও রসিক সুচিত্রিত ও পাঠকমনে স্মরণীয় হইয়া থাকে। বংশী সরল, কর্তব্যনিষ্ঠ, স্নেহশীল, আত্মবিসর্জনে উন্মুখ, পল্লী-পরিবারের গৃহকর্তার শ্রেণী-প্রতিনিধি। এই জাতীয় চরিত্র বাংলা পল্লী-সমাজের মেরুদণ্ডস্থানীয় ও একান্নবর্তী পরিবার-জীবনের আশ্রয়-স্তম্ভ। তাহার চিন্তা যে সঙ্কীর্ণ পরিসরে আবদ্ধ, তাহাতে নূতনত্বের কোন প্রবেশাধিকার নাই, তবে উহার সীমার মধ্যে উহা সনাতন মহিমায় বিরাজিত। বহু শতাব্দীর উত্থান-পতনের মধ্যে অপরিবর্তনীয় হিন্দুসমাজ-ব্যবস্থা ইহাদেরই অবিচল আনুগত্যে ও নৈতিক দৃঢ়তার গুণে কালপ্রবাহের ঊর্ধ্বে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সুদূর সভ্যতাবিবিক্ত পল্লী-অঞ্চলে অতি-আধুনিকতার প্লাবনে ইহা এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। ভ্রাতৃবিরোধ ও বিচ্ছিন্নতার যুগে এই সৌভ্রাত্রের নিদর্শন এখনও পুরাণ-কাহিনীর স্মৃতি-মাত্রে পর্যবসিত হয় নাই।

কিন্তু রসিকই দুয়ের মধ্যে অধিকতর জীবন্ত ও চিত্তাকর্ষক। সে বংশীর ন্যায় শুধু শ্রেণী-প্রতিনিধি নয়, ব্যক্তিসত্তায় স্বতন্ত্র ও উজ্জ্বল। পল্লীগ্রামে ব্যতিক্রমস্থানীয় এক একজন খেয়ালী, অস্থিরমতি, সব রকমের কারুশিল্পে সহজ-নিপুণ, বিবিধ মনোরঞ্জনবিদ্যায় সিদ্ধহস্ত ছেলে দেখা যায় যাহারা পল্লীমাতার স্তনরসে লালিত হইয়া উহার নিগূঢ় প্রাণস্পন্দনের সহিত স্বতঃস্ফূর্ত সঙ্গতি রক্ষা করে। ইহারা প্রকৃতিদত্ত প্রাণপ্রাচুর্য হইতে প্রতিবেশে আনন্দরস বিকিরণ করে, গ্রামের সকল শ্রেণীর লোকের সহিত অনায়াস-আত্মীয়তায় আবদ্ধ হয়, গ্রামের শিশু-পল্টনের নেতৃত্বে স্বতঃ-অভিষিক্ত থাকে। রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছে যে স্বল্পসংখ্যক মানবক—ফটিক, নিতাই (সম্পত্তি-সমর্পণ), তারাপদ, নীলকণ্ঠ, বলাই—মা ধরিত্রীর ধূলাকাদামাখা কোল হইতে সোজা কবিকল্পনার স্বর্ণসিংহাসনে উঠিয়া আসিয়াছে, তাহাদের মধ্যে সে একটি অনন্যস্থানের অধিকারী।

ইহার সহিত তারাপদের নিরাসক্ত, বিশ্বমৈত্রীর জন্ম উৎসুক প্রকৃতির কিছুটা মিল আছে, কিন্তু তারাপদ স্বভাব-পরিব্রাজক, আর রসিক সাময়িক ভ্রমণপিপাসাচরিতার্থতার পর পল্লীজননীর স্নেহক্রোড়ে প্রত্যাবর্তনের জন্ম ব্যাকুল। সে পল্লীর একঘেয়ে জীবনে বিরক্তিবোধ করিয়াছে, বাহিরের হাতছানিতে তাহার বৈচিত্র্যপিয়াসী মন বন্ধন-অসহিষ্ণু হইয়াছে, কিন্তু তাহার চরিত্রে তারাপদর ন্যায় চির-পথিকের অদম্য, অক্লান্ত অগ্রগতির দুর্নিবার আকর্ষণ ছিল না। নৈকট্যে যাহা অতিপরিচিতের উপেক্ষা ও অবজ্ঞার উদ্রেক করিয়াছে দূর হইতে তাহাই স্মৃতির বিচিত্রবর্ণে অনুরঞ্জিতরূপে রমণীয় হইয়া উঠিয়াছে। গ্রাম ছাড়িবার আগে সে উদারতার আতিশয্যে আপনার প্রিয় বস্তুগুলির স্বত্বত্যাগ করিয়া বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে বিলাইয়া দিয়াছে, যেন সে গ্রামের সহিত শেষ সম্বন্ধটি ছিন্ন করিতে কৃতসংকল্প। কিন্তু কিছুদিন বহির্জগতের রূঢ় আঘাত সহ্য করিয়াই সে মোহমুক্ত হইয়াছে ও জননীর স্নেহাকর্ষণ আরও তীব্রভাবে অনুভব করিয়াছে। তাহার এই জ্ঞানচক্ষু-উন্মীলনের মধ্যে লেখকের মনস্তত্ত্বকুশলতার অপূর্ব নিদর্শন রহিয়াছে। স্মৃতিপটে সে যেসব পরিচিত দৃশ্যচিত্র উদ্বোধন করিয়াছে, তাহার মধ্যে অনুরাগের প্রগাঢ়তা ও অনুভব-কল্পনার বর্ণাঢ্য ঐশ্বর্য যুগপৎ পরিস্ফুট হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কবিসুলভ অন্তর্দৃষ্টি ও সৌন্দর্যসৃষ্টি এখানে স্পষ্টতঃ রসিকের উপর আরোপিত, কিন্তু এই আরোপ তাহার স্বভাবধর্মবিরোধী হয় নাই। ওয়ার্ডসওয়ার্থের পল্লীজীবন-মূলক কাব্যতত্ত্ব হয়ত সার্বভৌম স্বীকৃতি পায় নাই, কিন্তু উহা বহু কবি ও অকবির প্রত্যক্ষ-অভিজ্ঞতা-সমর্থিত। পল্লীবাসী প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হইতেই তাহার ভাবে একটি স্বভাবকবিত্ব অর্জন করে ও উহার সহজ, অলঙ্কারহীন প্রকাশের মধ্যে একটা অকৃত্রিম কাব্যগুণ ব্যঞ্জিত হয়। অনেক অশিক্ষিত কৃষকের নিত্যশ্রমের ক্ষেত্র, প্রকৃতি-পরিবেশের একটি নিখুঁত, অনুরাগময় পর্যবেক্ষণের ফলে তাহার মনের গভীরে সৌন্দর্যরস সঞ্চিত হয় ও এই অনুভূতিমুগ্ধতা নানা পরোক্ষ উপায়ে শিল্পমার্জনা ছাড়াই মেঠো ফুলের সৌরভের মত চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হয়। রসিকের স্মৃতিচর্যায় সেই কাব্যশিল্পহীন কবিস্বভাবেরই ভাবুক প্রকাশ ঘটিয়াছে। তাহার বাল্যপ্রণয়িনী ও বাগ্‌দত্তা বধূ সৌরভীও রসিকের পরলোকগত দাদার অকৃপণ আত্মত্যাগে তাহার পুনরাগমনের জন্ম সলজ্জ উৎকণ্ঠার সহিত

প্রতীক্ষমানা। কিন্তু ধনের নিকট মূঢ় আত্মবিক্রয়ের ফলে সে সেই বিরল অনায়ত্ত সৌভাগ্যের অনায়াস-অধিকার হইতে আপনাকে বঞ্চিত করিয়াছে। এই বিহ্বল আত্মদ্বন্দ্বের মধ্যেই রসিকের পরিচয় আমাদের নিকট সম্পূর্ণ হইয়াছে। 'পণরক্ষা' আবেগ ও মননের লঘু ও যথেচ্ছ মিশ্রণ ও কেন্দ্র-পরিণতির অভাব সত্ত্বেও, বিচ্ছিন্ন অংশের আবেদনের জন্য একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্পরূপে স্থান লইয়াছে।

'হালদারগোষ্ঠী' বর্তমান খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত শেষ ছোটগল্প। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে এই গল্পটি 'সবুজপত্র'-এর প্রথম আবির্ভাবের মাঝে (বৈশাখ ১৩২১) প্রকাশিত হয়, কিন্তু ইহা পত্রিকাটির জীবনাদর্শ বা রচনারীতির কোন প্রত্যক্ষলক্ষণ-চিহ্নিত নয়। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রকাশিত 'হালদারগোষ্ঠী' ও 'হৈমন্তী' 'সবুজপত্র'-এর প্রভাববৃত্তবহির্ভূত বলিয়া মনে হয়। হয়ত এক দিক দিয়া গল্পটির মধ্যে পত্রিকাটির জীবনবোধতত্ত্বের কিঞ্চিৎ ক্ষীণ আভাস লক্ষ্য করা যাইতে পারে। ইহা বাহ্যতঃ পরিবারসত্তার সহিত ব্যক্তিমনের বিরোধ ও ব্যাপক অর্থে যৌবনবিদ্রোহের অঙ্গীভূতরূপে প্রতিভাত হয়। কিন্তু বনোয়ারিলাল মোটেই বন্ধন-অসহিষ্ণু, বাষ্প-বিস্ফোরণে উন্মুখ, বিক্ষুব্ধ যুবশক্তির প্রতীক নয়। তাহার পরিবার-প্রথার নিষ্পীড়ন হইতে মুক্তিকামনার যথেষ্ট সুনির্দিষ্ট ও সঙ্গত কারণ আছে। নীতি হিসাবে পারিবারিক কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে তাহার কোন অভিযোগ নাই। সে নিজে এই নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া জমিদারী-শক্তির হিতকর প্রয়োগে খুবই উৎসুক। তাহার প্রধান আপত্তি হইল যে জমিদারের যে বিপুল প্রভাব তাহা তাহার জ্যেষ্ঠাধিকারকে স্বীকার না করিয়া এক অধস্তন, বেতনভুক্ কর্মচারী নীলকণ্ঠের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। পিতা বা স্ত্রী কাহারও নিকট অভিযোগ করিয়া সে কাহারও সমর্থন পায় নাই—উভয়েই নীলকণ্ঠের প্রতি সুস্পষ্ট পক্ষপাত দেখাইয়াছে ও তাহার সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবার ইচ্ছাকে অনধিকারপ্রবেশের মত নিন্দনীয় মনে করিয়াছে। তাহার মধ্যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধের স্ফুরণ, সমষ্টিগত সত্তার গ্রাস হইতে ব্যক্তিচেতনাস্পন্দনের অনুভবই আধুনিকতার একমাত্র লক্ষণ।

প্রেমানুভূতিও তাহার স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তার আর একটি প্রবল আকাঙ্ক্ষা। বহির্জীবনে ও অন্তর্জীবনে এই স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠার অশান্ত প্রেরণা তাহাকে পরিবারনীতিশৃঙ্খলে স্বেচ্ছাবন্দী অভিজাতবংশের সাধারণ প্রতিনিধি হইতে

বিশিষ্ট করিয়াছে। কিন্তু চিরপ্রচলিত আধারের মধ্যে যদি এই দুর্দম ইচ্ছার স্বচ্ছন্দবিকাশের স্থান হইত তবে বনোয়ারিলালের জীবনে তাহার বিপ্লবী অধ্যায় অলিখিতই থাকিত। এখানে আরও বলা প্রয়োজন যে, বনোয়ারির ক্ষেত্রে যে বিপর্যয় ঘটিয়াছে তাহা কোন প্রথার অনিবার্য গাণিতিক ফল নয়, তাহা একটি বিশেষ পরিবারের আকস্মিক গোষ্ঠীবিন্যাসের অসাধারণ সংঘর্ষ-বিস্ফোরণের পরিণতি। রবীন্দ্রনাথ নিজেই গল্পটির প্রারম্ভিক অনুচ্ছেদ-গুলিতে উহার এই বিশিষ্ট পরিবেশটি পরিস্ফুট করিয়াছেন। সেই কয়েকটি অনুচ্ছেদেই সমগ্র কাহিনীটির মর্মগত শ্লেষাভিপ্রায়টি আশ্চর্য বিশ্লেষণগূঢ়তায় আভাসিত হইয়াছে। সব জমিদারসন্তানের আত্মপ্রতিষ্ঠাপ্রয়াসই এরূপ লৌহবেষ্টনীতে প্রতিহত হইয়া অবরুদ্ধ হয় না। জমিদারী ঐশ্বর্যের সুরক্ষিত, রুদ্ধদ্বার কোষাগারে নিয়তির পরিহাসরসিকতায়, যে কয়েকটি দাহ্য উপাদান আসিয়া সঞ্চিত হইয়াছে তাহাদেরই সংঘর্ষে বিরাট অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়াছে।

বনোয়ারি, তাহার পিতা মনোহরলাল, তাহার দেহরক্ষক রামচরণ ও ধনরক্ষক নীলকণ্ঠ, বনোয়ারির স্ত্রী কিরণলেখা প্রভৃতি সকলের মনোলোকটি অপূর্ব সঙ্কেতধর্মী, সংক্ষিপ্ত বর্ণনার তীক্ষ্ণ রশ্মিবিক্ষেপে ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে। এই পরিবেশ-দ্যোতনা আশ্চর্য নাটকীয় সম্ভাবনাপূর্ণ ও সমস্ত ভবিষ্যৎ সংঘর্ষের বীজ উহার মধ্যে নিহিত। এই ব্যক্তিগুলির পরস্পরসংসক্তি শুধু ঘটনার স্থূল প্রয়োজনে নয়, সূক্ষ্মতর মানস আকর্ষণের চুম্বকশক্তির দ্বারা নিরূপিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বিধাতার মত সর্বতোদৃষ্টি হইয়া তাঁহার সৃষ্ট এই ক্ষুদ্র জগতের ভিতর-বাহির, উহার ঘটনা-চক্রের আবর্তন ও অন্তরের নিগূঢ় প্রেরণা সমস্তই উদ্ঘাটিত করিয়াছেন ও এই জগৎ একটি অখণ্ড সত্তায় আমাদের প্রত্যয়লোকে স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে।

বনোয়ারির সঙ্গে হালদারগোষ্ঠীর প্রথম সংঘর্ষ বাধিয়াছে তাহার সুকুমার কবিত্বময় প্রেমচেতনার বাস্তব রূপায়ণের বাধা লইয়া। তাহার প্রণয়ের সূক্ষ্ম কলালালিত্য নীলকণ্ঠরক্ষিত টাকার সিন্দুকের উপর আসিয়া প্রতিহত হইয়াছে। নীলকণ্ঠের কর্তব্যবোধপুষ্ট প্রকৃতি-কৃপণতাই ইহার মূল কারণ। ইহা কেবল চাকর-মুনিবের অসম দ্বন্দ্ব নয়, স্বভাবশীর্ণতার সহিত প্রকৃতিদাক্ষিণ্যের সূক্ষ্মতর বিরোধ। এই বিরোধ বৈষয়িকতার ঊর্ধ্বে চরিত্রস্বরূপের মধ্যে মূল বিস্তার করিয়াছে। বনোয়ারির আবেগ-উচ্ছলতার

সহিত নীলকণ্ঠের অতিহিসাবী সতর্কতার যে দ্বৈরথযুদ্ধ তাহা শাশ্বত-নীতি-সম্মত। বনোয়ারির পরিবার-পরিস্থিতি উহাকে একটা উপলক্ষ্যমাত্র যোগাইয়াছে।

কিন্তু বনোয়ারির আরও মর্মান্তিক অনুযোগ হইল তাহার স্ত্রী কিরণ-লেখার অন্তঃকরণের রহস্যভেদে অক্ষমতার জন্য। বাঙলা সমাজের সম্ভ্রান্ত-বংশীয় নারীরা তাহাদের সাংসারিক পদমর্যাদা ও কর্তব্যজালের পুরু আবরণে নিজেদের অন্তঃপ্রকৃতি সম্বন্ধে প্রায়ই অচেতন থাকে। তাহাদের কি করা উচিত এই সংস্কারই তাহারা সত্যি সত্যি কি চায় তাহাকে অস্পষ্ট করে। এই সাধারণ প্রবণতা ছাড়াও কিরণের ব্যক্তিস্বভাবের উদাসীনতা তাহার অন্তরঙ্গ প্রকৃতির উপলব্ধিকে ব্যাহত করিয়াছে। বনোয়ারি যখন সংস্কৃতকাব্য-সুরভিত ও হৃদয়াবেগে স্পন্দমান প্রেমার্ঘ্য তাহার নিকট নিবেদন করিত, তখন উহা কিরণের অন্তরকে স্পর্শ না করিয়া হালদারগোষ্ঠীর বড় বৌ-এর গৃহিণীত্বসচেতন বর্মাবৃত হৃদয় হইতে প্রতিহত হইয়া ফিরিত। কিরণের মধ্যে এমন একটা সুদূর অনির্দেশ্যতা ছিল, যাহা ধরা-ছোঁয়ার অতীত, যাহা অনুমানকেও এড়াইয়া যায়। তাহার মনের সূক্ষ্ম অনুভূতি নিষ্ক্রিয় থাকিয়া বনোয়ারির সমস্ত আকূতি-জড়িত উপহারকে জড়বস্তুর ন্যায় নিতান্ত নির্লিপ্তভাবে গ্রহণ করিয়াছে—উহার মানস-আবেদনটি অনুভব করিতে পারে নাই। যখন বনোয়ারির সঙ্গে তাহার পরিবারের সংঘর্ষ বাধিয়াছে, তখন সে স্ত্রীর প্রকাশ্য-সমর্থন ত বটেই, অন্তরের আনুকূল্য হইতেও বঞ্চিত রহিয়াছে। সেই বৃহদাকার বলিষ্ঠপ্রকৃতি তেজস্বী পুরুষটি সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ থাকিয়া শত্রুপুরীবেষ্টিত বন্দীর মত অসহায় বোধ করিয়াছে। এই অসহায়তার নৈরাশ্যই তাহাকে চরম হঠকারিতায়, একটির পর আর একটি ভুল চালে প্রণোদিত করিয়া তাহার পরাজয়কে মর্মান্তিক করিয়া তুলিয়াছে। বৈষয়িক দ্বন্দ্বে নীলকণ্ঠের নিকট হারের সঙ্গে স্ত্রীর অনুরাগ-উদ্দীপনে ব্যর্থতাজাত পৌরুষের অপমান যুক্ত হইয়া তাহার তিক্ততার পাত্রকে পরিপূর্ণ করিয়াছে।

কিন্তু ইহার অপেক্ষাও আরও গ্লানিকর লাঞ্ছনা তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল—পিতার উইলে তাহার ত্যাজ্যপুত্ররূপে ঘোষণা। এতদিন অটুট আত্মসম্ভ্রমের আড়ালে তাহার পরাভব-লজ্জা আত্মসংবৃত ও অপ্রকাশ্য ছিল। কিন্তু এই শেষ অবমাননা তাহার রক্তক্ষরা হৃদয়ক্ষতকে উদ্‌ঘাটিত করিয়া তাহাকে সর্বজনসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করিয়াছে। এই উপর্যুপরি

গোপন ও প্রকাশ্য আঘাত-পরম্পরায় সে যে-কোনরূপ প্রতিঘাত-স্পৃহায় উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে ও হিতাহিতবোধ হারাইয়া উপহাস্যতার চরম সীমায় নামিয়াছে। প্রথম নীলকণ্ঠের আইনসঙ্গত অধিকারের বিরুদ্ধে ব্যর্থ বিক্ষোভ দেখাইয়া সে অক্ষমের রোষাভিনয়ে নিজ অবোধ অভিমানের পরিচয় দিয়াছে। এমন কি বিষয়ের উত্তরাধিকারী স্নেহাস্পদ ভ্রাতুষ্পুত্র হরিদাসের প্রতি একটা অহেতুক আক্রোশে সে জলিয়াছে ও দলিল চুরি করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী জমিদারের হাতে তুলিয়া দিবার হীন চক্রান্তের আশ্রয় লইয়াছে। এই চিন্তা ও আচরণের মধ্যে উদার, পৌরুষশালী বনোয়ারির বিরাট ব্যক্তিত্বের ক্রমিক অধঃপতনের স্তরগুলি নির্দেশিত। উপসংহারে পিতার শ্রাদ্ধ অসম্পন্ন রাখিয়াই হালদারগোষ্ঠীর সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া সে অজ্ঞাতকুলশীলের স্বেচ্ছানির্বাসন বরণ করিয়াছে। যে পারিবারিক ঐতিহ্যের সুরক্ষিত বেষ্টনীতে তাহার ব্যক্তিসত্তা ধীরে ধীরে নিজ অনন্য স্বাতন্ত্র্যে বিকশিত হইয়াছিল, সেই বিচিত্রপ্রভাবঋদ্ধ, কর্তব্য ও অধিকার, আত্মবিস্তার ও অন্তঃনিমজ্জনের দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধ পরিবেশ হইতে স্খলিত হইয়া সেই নিঃসঙ্গ আত্মা ধূমকেতুর মত উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে। মহাকাব্যের ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ, উত্থান-পতন-বন্ধুর বিরাট ইতিহাস অপরূপ ব্যঞ্জনাধর্মে একটি ব্যক্তির ক্ষুদ্র জীবনকাহিনীর মধ্যেও ছোটগল্পের সীমিত আয়তনে, শঙ্খের মধ্যে সমুদ্রস্বননের ন্যায় আভাসিত হইয়াছে।

এইখানেই ছোটগল্পের তৃতীয় পর্বের আলোচনায় ও 'রবীন্দ্র-সৃষ্টি-সমীক্ষার' দ্বিতীয় খণ্ডের সমাপ্তিরেখা টানা গেল। ইহার পরের গল্প 'বোষ্টমী' হইতেই 'সবুজপত্র'-পর্বের সূচনা। 'হালদারগোষ্ঠী'তে হয়ত সবুজপত্রযুগের কিছুটা পূর্বাভাস মিলে। ব্যক্তির সহিত পরিবারের দ্বন্দ্ব রবীন্দ্রভাবকল্পনার একটি বহুধা-পুনঃরাবৃত্ত বিষয় হইলেও এই গল্পে উহার যে মর্মান্তিক বিদ্রোহ-পরিণতির প্রকাশ দেখান হইয়াছে তাহা নূতন যুগের উগ্রতর সমাজচেতনার নিদর্শন। তবে এখন পর্যন্ত পটভূমিকার সযত্ন প্রস্তুতি, ব্যক্তির সহিত পরিবারের নিবিড় সংযোগ, সংঘর্ষের সম্পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা ও ব্যক্তির একাধারে তথ্যনিষ্ঠ ও সংকেতধর্মী সামগ্রিক পরিচয়—সবই রবীন্দ্রনাথের পূর্বতন উপস্থাপনারীতির অনুসৃতি। রবীন্দ্রনাথ এখনও আখ্যানের ধারাবাহিকতা উপেক্ষা করিয়া, সমাজ ও ব্যক্তিমানসের অন্যোন্যনির্ভরতা অস্বীকার করিয়া ব্যক্তিত্বের এককস্বাতন্ত্র্যতন্ত্রে দীক্ষিত হন নাই। ইঙ্গিতের ক্ষণ-চমকের দ্বারা পাঠকের কল্পনাবৃত্তির উদ্বোধনে খণ্ডিত আখ্যানের পাদপূরণ সম্বন্ধে একান্ত

প্রত্যয়শীল তিনি এখনও পুরাপুরি হইয়া উঠেন নাই। উপন্যাস ও ছোটগল্পের ক্ষেত্রে উভয়ত্রই তিনি প্রাচীন পদ্ধতিরই যথাসম্ভব অনুসরণ করিয়াছেন, ঘটনা-নিরপেক্ষ কাহিনীব্যঞ্জনা ও সমাজবিবিক্ত স্বয়ম্ভূ ব্যক্তিমানসের প্রতি তাঁহার অবিমিশ্র আনুগত্য এখনও ঘোষণা করেন নাই। এই ক্রান্তিলগ্নে পৌঁছিয়া তিনি অতীতের সহিত সংযোগসূত্র শিথিল করিয়া অপরীক্ষিত পথে দুঃসাহসিক পদক্ষেপ শুরু করিয়াছেন। বাঙলার জীবনভূমি হইতে কাব্যানুভূতি, বস্তুনিষ্ঠতা ও মননশীল জীবনসমীক্ষার সমাহারজাত কর্ষণশক্তি-প্রয়োগে সমস্ত রসধারা উদ্ধার ও পরিবেশন শেষ করিয়া, তিনি নূতন উপায়ে সমস্যাকণ্টকিত সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের কলের লাঙল লাগাইয়া উহার ভূগর্ভপ্রচ্ছন্ন ও বিরলক্ষরিত রসবিন্দুসমষ্টি সঞ্চয় করিতে চাহিয়াছেন। শরশয্যাশায়িত ভীষ্মের ন্যায় স্বর্ণভৃঙ্গারে সংরক্ষিত সুশীতল জল অপেক্ষা গাণ্ডীববিদীর্ণ ভোগবতীধারার জন্যই রবীন্দ্রনাথ এখন হইতে আগ্রহান্বিত হইয়াছেন।